ঢাকার ইতিহাস

(২য় খণ্ড)

জানুয়ারি ২০০০

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

1910

PUBLISHED BY NARENDRA NATH MAZUMDER

Research House—Mymensingh.

CALCUTTA

70, BARANOSI GHOSE'S STREET
"INDIAN PATRIOT PRESS"
PRINTED BY FAKIR CHUNDER DAS

DEDICATED

As an Humble token of the

Author's

Sincere Esteem and Gratitude

in honour of

The Distinguished Gentleman

To whose kind Sympathy and Encovergement

THIS LITTLE WORK

Owes its origin

ASUTOSH PRESS DACCA

ভূমিকা

জেলার সাধারণ ও ভৌগলিক বৃত্তান্ত লইয়া ঢাকার বিবরণ লিখিত হইল। গবর্নমেন্টের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বিবরণী, চিঠিপত্র ও প্রাচীন গ্রন্থ হইলে এবং জেলার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে এই গ্রন্থের অনেক তত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছে।

গবর্নমেন্টের কাগজ পত্রাদি হইতে তত্ত্ব সংগ্রহ বিষয়ে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্নমেন্টের নিকট সহৃদয় চিফ সেক্রেটারি Honourable Mr. H. Lemesurier. I.C.S., C.I.E., ঢাকা বিভাগের কমিশনার Honourable Mr. R. Nathan I.C.S., C.I.E., ঢাকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট Mr. A. J. Laine. I.C.S., ময়মনসিংহের ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট Mr. R. Garlick I.C.S., মহোদয়গণ যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। Honourable Mr. Lemesurier. মহোদয় আমাকে গবর্নমেন্ট হইতে কতকগুলি পুস্তক প্রদান করিয়া ও গবর্নমেন্ট লাইব্রেরী সমূহে গ্রন্থ প্রাপ্তির অধিকার প্রদান করিয়া যে সম্মান ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমি আমার সাহিত্যপথ যাত্রার মহামূল্য পাথেয় স্বরূপ চিরদিন স্মৃতির ভাণ্ডারে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত সংরক্ষণ করিব। Honourable Mr. R. Nathan মহোদয় তাহার অফিস হইতে কয়েকখানা দুর্লভ বিবরণী প্রেরণ করিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। মিঃ লেইনি আমাকে ঢাকার কালেক্টরী হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহের অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি ইহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী করিবার নিমিত্ত "ঢাকার বিবরণ" অতি সহজ ও দেশপ্রচলিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করা গেল। এই কারণে ইহাতে অনেক প্রাদেশিক ও ব্যবহারিক শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থের মুদ্রণব্যয় ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড প্রদান করিয়াছে, তজ্জন্য আমি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। পরিশেষে পাঠকগণের নিকট বিনীত নিবেদন—তাঁহারা গ্রন্থে কোন প্রমাদ লক্ষ্য করিলে অনুগ্রহপূর্বক আমাকে জানাইবেন।...

ময়মনসিংহ
ফাল্গুন, ১৩১৬

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার

সূচী

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

সাধারণ বিবরণ

দ্বিতীয় অধ্যায়

শাসন, বিচার ও রাজস্ব বিভাগ

তৃতীয় অধ্যায়

আদমসুমারি



প্রথম অধ্যায়
সাধারণ বিবরণ

প্রাকৃতিক সীমা ; অবস্থান ; প্রাকৃতিক বিভাগ ; পরিমাণ কাল ; প্রাচীন ও আধুনিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ ; ঢাকা ; "ঢাকা" নামের কারণ

প্রাকৃতিক সীমা :

ঢাকা জেলা পূর্ব বাংলার একটি প্রসিদ্ধ জেলা। এই জেলার উত্তর সীমায় ময়মনসিংহ জেলা, পূর্ব সীমায় ত্রিপুরা জেলা, দক্ষিণ সীমায় ফরিদপুর জেলা ও পশ্চিম সীমায় ফরিদপুর ও পাবনা জেলা।

অবস্থান :

ঢাকা জেলা উত্তরে নিরক্ষ ২৩°—১৪´ ও ২৪°—২০´ কলার মধ্যে ও পূর্ব দ্রাঘিমা ৮৯°—৪৫´ ও ৯০°—৫১´ কলার মধ্যে অবস্থিত।

প্রাকৃতিক বিভাগ :

ঢাকা জেলা সাধারণত তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত। পূর্ব ঢাকা, মধ্য ঢাকা, ও দক্ষিণ ঢাকা। মেঘনা ও শীতলক্ষ্যার মধ্যবর্তী স্থান পূর্ব ঢাকা ও শীতলক্ষ্যা ও ধলেশ্বরীর মধ্যবর্তী স্থান মধ্য ঢাকা ও ধলেশ্বরী ও পদ্মার মধ্যবর্তী স্থান দক্ষিণ ঢাকা।

পরিমাণ :

এই জেলার আকার বৃহৎ নহে। আয়তনে ইহা ময়মনসিংহ জেলা হইতে প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছোট। এই জেলার পরিমাণ ২৭৮২ বর্গ মাইল।

প্রাচীন ও আধুনিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

অতি পূর্বকালে ঢাকা জেলার উত্তরভাগ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং দক্ষিণ ভাগ সমতট নামে পরিচিত ছিল। মহারাজ বল্লালসেনের রাজত্ব সময় এই ভূখণ্ড "বঙ্গ" নামে অভিহিত হয়। অতঃপর মোঘল শাসন প্রবর্তিত হইলে দিল্লিশ্বর আকবর শাহ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তদীয় রাজস্ব সচিব টোডরমল্ল বাংলার রাজস্ব ও ভূমির বন্দোবস্ত করেন। টোডরমল্লের বন্দোবস্ত কাগজে ঢাকা জেলার দক্ষিণভাগ ও পূর্বভাগ সরকার সোনারগাঁও এবং উত্তরভাগ সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল। ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হইলে সরকার সোনারগাঁও ও সরকার বাজুহা "ঢাকা নেয়াবতের" অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ক্রমে জেলা স্থাপিত হইলে তাহা "ঢাকা জেলা" নামে অভিহিত হইয়াছে।

এ পর্যন্ত এই জেলা বাংলার লেফ্‌টেন্যান্ট গবর্নরের শাসনাধীন ছিল। ভারত গভর্নমেন্টের অনুমত্যানুসারে ১৯০৫ সনের ১৬ অক্টোবর বঙ্গদেশ বিভাগ হইয়া "পূর্ববঙ্গ ও আসাম" প্রদেশ গঠিত হইলে, এই জেলা পূর্ববঙ্গ ও আসাম গভর্নমেন্টের শাসনাধীন নীত হইয়াছে।

ঢাকা :

ঢাকা জেলার সদর স্টেশন ঢাকা। ঢাকায় পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছে।

'ঢাকা' নামের কারণ :

ঢাকা নামটি অতি প্রাচীন। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবাদ ও গল্প প্রচলিত আছে। কেহ বলেন, ঢাক নামক এক প্রকার বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মিত বলিয়া এই স্থান "ঢাক" নামে পরিচিত হয়।[১] ঢাক ক্রমে ঢাকায় পরিণত হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রবাদ—ঢাকেশ্বরী দেবীর নাম হইতে ঢাকা নামের উৎপত্তি। কেহ কেহ এই প্রসঙ্গে আদিশূর ও বল্লালসেনের নাম যুক্ত করিয়া ঢাকা নামের প্রাচীনতা প্রতিপাদন করেন।

এই প্রবাদ প্রচলিত গল্পটি এইরূপ :

"রাজা আদিশূর তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর ধর্মবিদ্বেষ ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহার বনবাস ব্যবস্থা করেন। রানি এই অপমানে মর্মাহত হইয়া জীবন বিসর্জন জন্য ব্রহ্মপুত্রে ঝাঁপ দেন। দেবরাজ ব্রহ্মপুত্র রানিকে সযত্নে রক্ষা করিয়া বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিতা দেবী ভগবতীর হস্তে প্রদান করেন। সেই স্থানে রানির একটি পুত্র প্রসূত হয়, পুত্র দেবীর কৃপায় বর্ধিত হইতে থাকে। প্রবাদ এই পুত্রই বল্লাল সেন। একদিন রাজকুমার ভ্রমণ করিতে করিতে সেই নিবিড় অরণ্যে দেবীর মূর্তি দেখিতে পাইয়া সেই দেবীকেই তাঁহার রক্ষাকর্ত্রী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং তাহার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন এবং দেবীকে ঢাকেশ্বরী দেবীর নামে অভিহিত করিলেন। ক্রমে এই দেবীর নাম হইতে ঢাকা নামের উৎপত্তি হইল।

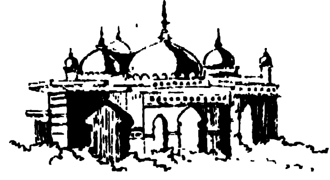
তৃতীয় প্রবাদ এইরূপ—বাংলার শাসনকর্তা ইসলাম খাঁ পূর্ববঙ্গে মগদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাংলার রাজধানী রাজমহল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া মেঘনার উপকূলে আনিতে ইচ্ছুক হন। তিনি বহুস্থান পরিদর্শন করিয়া আসিয়া বুড়িগঙ্গার তীরে উপনীত হন এবং এই স্থানকে রাজধানীর উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্বাচন করেন। এই সময়ে একদল বাদ্যকর ঢাক বাজাইয়া পূজা করিতেছিল দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং মনোনীত স্থানে ঢাক বাজাইতে আদেশ করিলেন। ঢাকের শব্দ পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরে যতদূর পর্যন্ত ধ্বনিত হইল, ততদূর পর্যন্ত রাজধানীর সীমা নির্দিষ্ট হইল। নবাব ইসলাম খাঁ এইরূপে সীমা নির্দেশ করিয়া রাজধানী স্থাপন করায় তাহা ঢাকা নামে আখ্যাত করিলেন।[২]

এই সকল গল্প ও প্রবাদের সহিত ঐতিহাসিক তত্ত্বের কতদূর সম্বন্ধ আছে তাহা "ঢাকার ইতিহাসে" আলোচিত হইবে। প্রবাদ যেরূপই প্রচলিত থাকুক না কেন ঢাকা নামটি অতি প্রাচীন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ঢক্কা শব্দ হইতে ঢাকা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা অনুমিত হইতে পারে। ঢাকার নাম আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে 'ঢাকাবাজু' নামে যে পরগণার নাম লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতেই ঢাকা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে টোডরমল্ল ঢাকাবাজুর (পরগণার) বন্দোবস্ত করেন ; তৎকালে বুড়িগঙ্গার উত্তর তীরভূমি ঢাকাবাজু নামে পরিচিত থাকিয়া তাহা সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দের নবাব ইসলাম খাঁ এই ঢাকাবাজুতে আসিয়া স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন ও পরগণা বা বাজুর নামানুসারে রাজধানীর নাম প্রদান করেন। তদবধি এই স্থান ঢাকা নামে পরিচিত।

এই জেলা স্থাপনের সময় ইহার আকার বর্তমান আকার অপেক্ষাও ৬ গুণ বৃহৎ ছিল। ক্রমে পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ অধিষ্ঠিত হইলে ইহার আয়তন হ্রাস পাইয়া বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে।

১. Topography and Statistics of Dacca
The Romance of an Eastern Capital.
২. Notes of the Antiquities of Dacca.



দ্বিতীয় অধ্যায়

শাসন, বিচার ও রাজস্ব বিভাগ

প্রাচীন প্রথা ; ইংরেজ শাসন-হুজুরি ও নিজামত বিভাগ ; রাজস্ব পরিদর্শক ; দেওয়ানি আদালত ; প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা ; কালেক্টর জজ-ম্যাজিস্ট্রেট ; থানা, ফাঁড়িথানা, চৌকি, কমিশনারি বিভাগ, মহকুমা, রেজেস্টারি কার্যালয় ; পরগণা ও তপ্পা।

প্রাচীন প্রথা :

মুসলমান শাসনকালে সোনারগাঁও একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত থাকিতেন। তিনিই এতৎপ্রদেশ শাসন করিতেন, স্থানে স্থানে কাজি ও কানুনগুদিগের কার্যালয় ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে এতৎপ্রদেশে দ্বাদশ ভৌমিকের প্রভুত্ব বিস্তৃত হয় এবং কিছুদিন তাহাদের হস্তেই দেশ শাসিত হয়।

১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা নগরী স্থাপিত হইলে এই স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজধানীতে যথারীতি বিচার, শাসন ও রাজস্ব বিভাগের কার্য চলিতে থাকে। মফঃস্বলের বিচার ও শাসন ক্ষমতা তখনও কাজিদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। কানুনগু জমাজমির বিচার করিতেন। কেন্দ্রে কেন্দ্রে ফৌজদারি প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরগণার জমিদারগণও নিজ নিজ "এলাকার" বিচার করিতেন। রাজস্বের জন্য জমিদারগণ দায়ী ছিলেন। পরগণার জমিদারগণের রাজস্ব প্রদানের ত্রুটির বিচার রাজধানীতে হইত। রাজস্ব প্রদানের ত্রুটি ব্যতীত জমিদারদিগের অন্য কোন বিষয়ের ত্রুটি, ত্রুটি বলিয়াই গণ্য হইত না। ক্ষমতাবান জমিদারেরা রীতিমত রাজস্ব প্রদান করিলে, 'সাতখুন মাফ' পাইতেন। এইরূপ অবস্থায় প্রজাসাধারণ যমযাতনা ভোগ করিত। ঢাকা হইতে বিভিন্ন সময়ে রাজধানী রাজমহল ও মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হইয়াছিল।[১] ঐ ঐ সময় ঢাকায় নায়েব নাজিমের কার্যালয় থাকিত ; সুতরাং বিচার, শাসন ও বাজস্ব বিভাগের কার্য যথারীতি পূর্ব্ববৎ পরিচালিত হইত।

ইংরেজ শাসন—হুজুরি ও নিজামত বিভাগ :

ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে এই জেলার শাসন প্রথার কতকটা পরিবর্তন হয়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি সনন্দ গ্রহণ করিয়া ঢাকায় হুজুরি ও নিজামত বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেন। হুজুরি বিভাগ মুর্শিদাবাদের দেওয়ান রেজা খাঁর অধীন থাকে। ঢাকায় উক্ত বিভাগের কার্য পরিচালনার জন্য একজন ডেপুটি দেওয়ান নিযুক্ত হন। ঢাকার ডেপুটি দেওয়ান কেবল এতৎপ্রদেশের রাজস্ব আদায় ও রাজস্ব সংক্রান্ত গোলযোগের মীমাংসা করিতেন। নিজামতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার হইত। নিজামতের নিজ খরচ ও কর্মচারীগণের বেতন ইত্যাদির জন্য নিজামত নির্দিষ্ট পরিমাণে ভূমিকরও গ্রহণ করিতেন।

রাজস্ব পরিদর্শক :

১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে হুজুরি ও নিজামত এই উভয় বিভাগের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন রাজস্ব পরিদর্শক (Revenue Supervisor) নিযুক্ত হন।

দেওয়ানি আদালত :

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে উক্ত রাজস্ব পরিদর্শকই কালেক্টর নামে অভিহিত হন। ঐ সনে কোম্পানি রেজা খাঁর নিকট হইতে দেওয়ানি বিভাগের কার্য হস্তান্তরিত করিয়া ঢাকায় এক দেওয়ানি আদালত প্রতিষ্ঠিত করেন। কালেক্টর দেওয়ানি আদালতের সুপারিন্টেডেন্ট হন।

১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানি আদালতের কার্য নির্বাহের জন্য নায়েবের পদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্ত্রিসভা দেওয়ানি আদালতের নিষ্পত্তির বিচার আপিল করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা :

১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা উঠিয়া গিয়া নতুন নিয়ম প্রবর্তিত হয় এবং ঢাকা কালক্টেরি ও দেওয়ানি আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকার কালেক্টর 'চিফ' নামে অভিহিত হয়।

মিঃ ডে ঢাকার প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর এবং মিঃ ডানকেনসন প্রথম জজ নিযুক্ত হন।

এই সময় ঢাকা জেলার আয়তন ১৫৩৯৭ বর্গ মাইল ছিল। ক্রমে ময়মনসিংহ ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থান ঢাকা কালেক্টরি হইতে পৃথক হইয়া যায়। অতপর ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর ও ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে বাকরগঞ্জ ঢাকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে ঢাকার কালেক্টর ক্ষুদ্র হইয়া যায়।

থানা, ফাঁড়ি থানা, চৌকি, কমিশনারি, বিভাগ, মহকুমা, রেজিস্টারি কার্যালয় :

ক্রমে শাসন সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে পুলিশ স্টেশন (থানা), আউট পোস্ট (ফাঁড়ি থানা) চৌকি প্রভৃতি স্থাপিত হয়। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে রেভিনিউ কমিশনারের কার্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথম প্রথম রেভেনিউ কমিশনার, কমিশনার অফ সারকিট (Commissioner of Circuit) নামে অভিহিত ছিলেন। পূর্বে কাছাড় এবং শ্রীহট্ট জেলাও ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অতঃপর মহকুমা বিভাগ প্রথা প্রবর্তিত হইলে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মুন্সিগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত হইয়া জেলার শাসন কার্য দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে মানিকগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত হয়। ঐ সময় মানিকগঞ্জ মহকুমা ফরিদপুরের অধীন এবং মাদারিপুরের কতক অংশ ও আটিয়া থানা ঢাকা জেলার অধীন ছিল। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে মানিকগঞ্জ মহকুমা ও নবাবগঞ্জ থানার কতক অংশ ফরিদপুর জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন[২] করিয়া ঢাকা জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে আটিয়া থানা ঢাকা জেলা হইতে ময়মনসিংহ জেলায় পরিবর্তিত হয়।

১৮৬৬-৬৭ খ্রিস্টাব্দে এ জেলার কোন কোন স্থানে মহকুমা, চৌকি, থানা, ফাঁড়ি থানা ছিল তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

মহকুমা	চৌকি	থানা	ফাঁড়িথানা
ঢাকা সদর	সদর	ঢাকা	ফরিদাবাদ, লালবাগ, টঙ্গী
	পলাশ	কাপাসিয়া, রায়পুর, রূপগঞ্জ, সাভার, নবাবগঞ্জ	নরসিংদি
মুন্সিগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	বৈদ্যের বাজার, রোহিতপুর
	বহর	রাজবাড়ি	
		শ্রীনগর	মুন্সিগঞ্জ
মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ	বালিয়াটি
	লেছরাগঞ্জ	জাফরগঞ্জ	
		হরিরামপুর	

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে পদ্মার গতি পরিবর্তিত হইয়া বিক্রমপুর পরগণার অর্ধাংশ ঢাকা জেলা হইতে পৃথক হইয়া যায়। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুনের গভর্নমেন্ট বিজ্ঞাপনী অনুসারে ঐ সনের ১ আগস্ট হইতে বিক্রমপুরের দক্ষিণভাগ (৪৫৮ থানা গ্রাম) বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।[৩]

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলাদ্বয় ঢাকা বিভাগ হইতে পরিত্যক্ত হয় এবং ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা জেলা ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরাও ঢাকা বিভাগ হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে নারায়ণগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত হইয়া জেলার কার্যভার চারিভাগে বিভক্ত হয়।

এক্ষণে এই জেলায় ৪টি মহকুমা, ৪টি চৌকি, ১৩টি থানা, ৫টি ফাঁড়িথানা ও ১৩টি রেজেস্টারি কার্যালয় স্থাপিত আছে।

মহকুমা—(১) সদর (২) নারায়ণগঞ্জ (৩) মুন্সিগঞ্জ (৪) মানিকগঞ্জ।

চৌকি—সদর মহকুমায় (১) সদর, নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় (২) নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ মহকুমায় (৩) মুন্সিগঞ্জ এবং মানিকগঞ্জ মহকুমায় (৪) মানিকগঞ্জ।

থানা—সদর মহকুমায় (১) সদর (২) কেরানিগঞ্জ (৩) কাপাসিয়া (৪) সাভার (৫) নবাবগঞ্জ,

নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় (৬) নারায়ণগঞ্জ (৭) রূপগঞ্জ (৮) রায়পুরা,

মুন্সিগঞ্জ মহকুমায় (৯) মুন্সিগঞ্জ (১০) শ্রীনগর,

মানিকগঞ্জ মহকুমায় (১১) মানিকগঞ্জ (১২) ঘিওর ও (১৩) হরিরামপুর।

ফাঁড়ি থানা—সদর মহকুমায় (১) কালিয়াকৈর, নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় (২) নরসিংদি (৩) মনোহরদি,

মুন্সিগঞ্জ থানায় (৪) রাজাবাড়ি ও

মানিকগঞ্জ মহকুমায় (৫) সিয়ালো আর্চা।

রেজেস্টারি কার্যালয়—সদর মহকুমায় (১) সদর (২) কালিগঞ্জ (৩) সাভার (৪) জয়কৃষ্ণপুর,

নারায়গঞ্জ মহকুমায় (৫) নারায়ণগঞ্জ (৬) রায়পুরা,

মুন্সিগঞ্জ মহকুমায় (৭) মুন্সিগঞ্জ (৮) শ্রীনগর (৯) লৌহজঙ্গ ও (১০) রাজাবাড়ি এবং

মানিকগঞ্জ মহকুমায় (১১) মানিকগঞ্জ (১২) ঘিওর ও (১৩) হরিরামপুর।

এই জেলা বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজস্ব আদায়ী পরগণা ও তপ্পায় বিভক্ত যথা :

পরগণা—(১) আগলা, (২) আজিমপুর, (৩) আমিরাবাদ, (৪) ইয়ারপুর (৫) ইদগা, (৬) ইব্রাহিমপুর (৭) ঈশাখাবাদ, (৮) ইদিলপুর, (৯) একরামপুর (১০) এনাএতনগর, (১১) উত্তর শাহাপুর (১২) উত্তর সাহাবাজপুর, (১৩) কাশীমপুর-কল্যাণশ্রী, (১৪) কাশীমপুর শাসনবাসন, (১৫) কাশীমনগর, (১৬) কাশীপুর, (১৭) কার্তিকপুর-সুজাবাদ, (১৮) খানপুর (১৯) খলিলাবাদ, (২০) খিজিরপুর, (২১) গঞ্জসাকরাবাদ, (২২) গৃহবন্দর, (২৩) গোবিন্দপুর, (২৪) গুনানন্দী (২৫) চুনাখালি, (২৬) চন্দ্রদ্বীপ, (২৭) চরমুকুন্দিয়া, (২৮) চরমুকুন্দিয়া কাশীমনগব, (২৯) চন্দ্রপ্রতাপ, (৩০) জাহানাবাদ, (৩১) জাফরউজিয়াল, (৩২) জাহাঙ্গীরনগর, (৩৩) জালালপুর, (৩৪) তালিপাবাদ, (৩৫) দক্ষিণ শাহাপুর, (৩৬) দুর্গাপুর, (৩৭) দোহার, (৩৮) নছিবশাহী, (৩৯) নরসিংহপুর, (৪০) নছরতশাহী, (৪১) নাত্তি, (৪২) নুরুল্লাপুর, (৪৩) পুরচণ্ডী, (৪৪) পাটপাশার, (৪৫) বাগমারা কাশীমপুর, (৪৬) বহর, (৪৭) বলরামপুর, (৪৮) বন্দর একরামপুর, (৪৯) বিহোরোল, (৫০) বলোর, (৫১) বীররহিমপুর, (৫২) বরদাখাত, (৫৩) বাঙ্গরোড়া, (৫৪) বন্দরখোলা, (৫৫) বড়বল্কি, (৫৬) বৈকুণ্ঠপুর, (৫৭) বিক্রমপুর, (৫৮) ভাওয়াল, (৫৯) মহবতপুর, (৬০)

মকিমপুর, (৬১) মক্ষমপুর, (৬২) মাদারিপুর, (৬৩) মজিদপুর, (৬৪) মাহাম্মদপুর, (৬৫) মবারকউজিয়াল, (৬৬) মহিয়াঙ্গপুর, (৬৭) রামপুর, (৬৮) রোকনপুর, (৬৯) রায়পুর, (৭০) রঞ্জাপ, (৭১) রসিদপুর, (৭২) রায়পুর নওয়াবদি (৭৩) রায়নন্দলালপুর, (৭৪) রাজনগর, (৭৫) রছুলপুর, (৭৬) সৈয়দপুর, (৭৭) সাহাবন্দর, (৭৮) শ্যামপুর, (৭৯) শিবপুর-শ্যামপুর, (৮০) সুজাপুর, (৮১) সাহেবাবাদ, (৮২) সুজাবাদ সাজাপুর, (৮৩) সেলিমপ্রতাপ, (৮৪) সাহা উজিয়াল, (৮৫) শিবপুর, (৮৬) সরাইল, (৮৭) সুলতানপুর, (৮৮) সুজাবাদ কুতুবপুর, (৮৯) সাহাজাতপুর, (৯০) সিন্দুরী, (৯১) সাজাদাপুর, (৯২) সোনারগাঁও, (৯৩) সায়েস্তানগর, (৯৪) সোলতানপ্রতাপ (৯৫) হাসায়া, (৯৬) হজতরপুর, (৯৭) হাবেলি জাহানাবাদ।

তপ্পা—(১) আরঙ্গাবাদ, (২) আম্রপুর, (৩) আউলিয়ানগর, (৪) আমিরপুর, (৫) আমিরাবাদ (৬) আঘরা কলাকোপা, (৭) ইছাপুর, (৮) এতবারনগর, (৯) এবাদতনগর, (১০) কুড়িখাই, (১১) কলনা, (১২) কাষ্ঠসাগরা, (১৩) কাটবার, (১৪) কামরাপুর, (১৫) খোর্দধামরাই, (১৬) খলসি, (১৭) গোবিন্দপুর, (১৮) গোপালপুর, (১৯) জাফরনগর, (২০) তৈয়ারপুর, (২১) দেয়ানতপুর, (২২) দৌলতপুর, (২৩) নন্দলালপুর, (২৪) নারান্দিয়া, (২৫) পাড়িল, (২৬) ফতুল্লাপুর, (২৭) বলরামপুর, (২৮) বাকিপুর, (২৯) বড়িকান্দি, (৩০) ভবানীপুর, (৩১) ভবানীনগর, (৩২) মকষুদপুর, (৩৩) মিরকপুর, (৩৪) মিরকপুর-সাবন্দর, (৩৫) মির্জাপুর, (৩৬) মহেশ্বরদী, (৩৭) রাধাকান্তপুর খোর্দা, (৩৮) রছুলপুর, (৩৯) রায়পুর, (৪০) রামকৃষ্ণপুর, (৪১) রনভাওয়াল, (৪২) সবকদ্দিনগর, (৪৩) শ্রীধরপুর, (৪৪) সাকিপুর খোর্দা, (৪৫) সকদ্দিপুর, (৪৬) সায়েস্তানগর, (৪৭) সরিপপুর, (৪৮) সাখিনী, (৪৯) সখীনগর, (৫০) হুসেনাবাদ, (৫১) হাজিপুর, (৫২) হাজিখাঁপুর, (৫৩) হাজিপুর-গোবিন্দপুর, (৫৪) হাবিলি মাহাম্মদপুর, (৫৫) হায়দরাবাদ, (৫৬) হাবিলি।

১. সুলতান সুজা ঢাকা হইতে রাজধানী রাজমহলে পরিবর্তন করেন। মীরজুমলা পুনরায় রাজধানী ঢাকায় আনয়ন করেন। অতঃপর মুর্শিদকুলী খাঁ তাহা মুর্শিদাবাদে স্থাপন করেন।

২. ফরিদপুর বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্ন কালেক্টরি হইলেও ফরিদপুরের দেওয়ানি আদালত তখনও ঢাকাতেই স্থাপিত ছিল।

৩. এই গ্রামগুলি মুলকতগঞ্জ থানার অধীন ছিল। ১৮৬৬ সালের পূর্বেই মুলকতগঞ্জ থানার শাসন সংক্রান্ত কার্য বাকরগঞ্জ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট অধীনে ন্যস্ত করা হইলেও কার্যত তাহা হয় নাই। ঐ থানার অধিবাসীগণ এই পরিবর্তনে আপত্য উত্থাপন করিলে এতকাল ঐ পরিবর্তন স্থগিত থাকে। মুলকতগঞ্জ থানাসহ মাদারিপুর মহকুমা ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।



তৃতীয় অধ্যায়

আদমসুমারী

প্রাচীন বিবরণ ; লোকসংখ্যার তুলনা ; অধিবাসী, আগন্তুক ও দেশান্তরগতের সংখ্যা ; প্রবাসীর সংখ্যার বিবরণ ; আগন্তুক ও দেশান্তরগত জনসংখ্যার তুলনা ; প্রতিবর্গ মাইলে বসতি ; থানাওয়ারি এলাকার পরিমাণ, গ্রামসংখ্যা, বসতি ও লোকসংখ্যা। ধর্ম—মুসলমানধর্ম ও বাবা আদম ; পূর্ববঙ্গে মুসলমান ; পীর ; ফেরাজি ; সরিতুল্লা ও দুদুমিঞা ; মুসলমান ধর্ম মিশন ; অক্সফোর্ড মিশন ; ব্রাহ্মসমাজ ; বৈষ্ণব সম্প্রদায় ; হিন্দু দেবালয় ও তীর্থস্থান ; বৌদ্ধ ও প্রেতোপাসক ; ধর্মাবলম্বী ১৯০১ সনের ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ; ১৮৯১ সনের ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধির গড় ও কারণ ; মুসলমান ও হিন্দু অধিবাসী সংখ্যার তুলনা ; থানা ও মহকুমাওয়ারি ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা। জাতি—বিভিন্ন জাতীয় লোকের সংখ্যা ; শ্রেণীবিভাগ ; ব্রাহ্মণ ; কৌলীণ্য প্রথা ; প্রাচীন বিবরণ ; বহুবিবাহ ; সমাজ সংস্কারক রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ; অর্ধকালিবংশ ; কায়স্থ ; বৈদ্য ; নবশাখা ; হালুয়া দাস ; মধ্যশ্রেণী ; নিম্নশ্রেণী ; নিকৃষ্টজাতি ; কিচক ; মুসলমান শ্রেণী ; সৈয়দ, শেখ, পাঠান, মোঘল, মল্লিক, মির্জা ; অন্যান্য জাতি ; পঞ্চাইতি ; পর্তুগিজ ; মণিপুরী ; টীপরা ; লোকচরিত্র ; বিবাহিত ও অবিবাহিতের সংখ্যা ; ভাষা—বিভিন্ন ভাষীর সংখ্যা ; উচ্চারণের বিভিন্নতা ; ভাষার নমুনা ; গ্রাম্য শব্দ।

ইংরেজ শাসনকালের প্রারম্ভ হইতে জেলার লোকগণনার চেষ্টা হইয়া আসিতেছে।

প্রাচীন বিবরণ :

১৮০১ খ্রিস্টাব্দে যখন বাকরগঞ্জ এবং ফরিদপুর জেলা ঢাকা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল ; তখন সাধারণভাবে একবার লোকগণনার চেষ্টা করা হয়। ঐ গণনায় ঢাকা জেলার লোকসংখ্যা ৯৩৮৭৪২ হইয়াছিল। ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জ ঢাকা হইতে পৃথক হইয়া গেলে, পর ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট পুনরায় জনসংখ্যা গণনা করেন। ঐ গণনায় ঢাকার লোকসংখ্যা ৫১২৩৮৫ হইয়াছিল। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের গণনায় ৬০০০০০ লোক নির্ধারিত হয়। ইহার পর রেভেনিউ সার্ভে গণনায় লোকসংখ্যা ৯০৪৬১৫ এবং ১৮৬৮-৬৯ খ্রিস্টাব্দের রেভিনিউ বোর্ডের প্রদত্ত হিসাবে লোকসংখ্যা ১০১৯৯২৮ ধার্য হয়। বিভিন্ন সময়ের এই সকল গণনা সম্পূর্ণ অনুমানমূলক হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে গভর্নমেন্ট হইতে প্রকৃত জনসংখ্যা নির্ধারণের চেষ্টা হয় এবং তদনুসারে ঐ সনের ১৬ জানুয়ারি প্রাতঃকালে ঢাকা জেলার সর্বত্র লোকসংখ্যা গণনা হয়। এই গণনা অনুসারে এই জেলার লোকসংখ্যা ১৮৫২৯৯৩ নির্ধারিত হইয়াছিল। ইহার পর প্রতি দশ বৎসরে লোকসংখ্যা গণনা করা হইতেছে।

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি রাত্রে দ্বিতীয় গণনা হয়।

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের লোকগণনার সময় অশিক্ষিত লোক ভীত হইয়াছিল। তাহারা প্রথমে মনে করিয়াছিল, গভর্নমেন্ট কোন দুরভিসন্ধিমূলে এইরূপ মাথাগন্তির আয়োজন করিতেছেন নতুবা এইরূপ সাধারণ কার্যে এত টাকা কড়ি ফেলাইবার আবশ্যকতা কি?[১] অশিক্ষিত লোকের মনোভাব শীঘ্রই পরিবর্তিত হইয়াছিল।

লোকসংখ্যার তুলনা :

জনসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতি দশ বৎসরে কি পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১
পুরুষ—	৮৯৩২৪৪	১০২১০৫৪	১১৮৭৭৩৯	১৩১২৪১৭
স্ত্রী—	৯৩৪৬৮৭	১০৬৯৮২৩	১২০৭৬৯১	১৩৩৭১০৫
মোট	১৮২৭৯৩১[২]	২০৯০৮৭৭[৩]	২৩৯৫৪৩০	২৬৪৯৫২২
	১৮৫২৯৯৩	২১১৬৩৫০		

অধিবাসী, আগন্তুক ও দেশান্তরগত জনসংখ্যা :

বর্তমান গণনায় জেলার লোকসংখ্যা ২৬৪৯৫২২-এ জেলার স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রতি গণনায়ই অধিক দেখা যায়। ইহার কারণ—এই জেলার বহু পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চাকরি ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। এই জেলায়ও ভিন্ন স্থানের লোক আসিয়া চাকরি ব্যবসায় করিয়া থাকে। এই জেলার কত লোক ভিন্ন স্থানে বাস করে ও ভিন্ন স্থানের কত লোক এ জেলায় বাস করে এই উভয় সংখ্যা এবং জেলার প্রকৃত নিবাসীরও মোট অধিবাসীর সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল। প্রকৃত নিবাসী বলিতে যাহাদের মাতৃভূমি ঢাকা জেলায় তাহাদিগকে বুঝাইবে।

	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
আগন্তুক	৮৫২৯৯	৫৬৭৬৭	২৮৫৩২
দেশান্তরগত	১২৮৪৮৭	৯৪৮৪২	৩৩৬৪৫
জেলার প্রকৃত নিবাসী	২৬৯২৭১০	১৩৫০৪৯২	১৩৪২২১৮
মোট অধিবাসী	২৬৪৯৫২২	১৩১২৪১৭	১৩৩৭১০৫

প্রবাসীর সংখ্যার বিবরণ :

উপযুক্ত তালিকা হইতে অবগত হওয়া যায় যে ১৯০১ সালের লোক গণনার সময় ভিন্ন স্থানের ৮৫৩৯৯ জন লোক এ জেলায় ছিল এবং এই জেলার ১২৮৩৮১ জন লোক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছিল। কোন স্থানের কত লোক এ জেলায় ছিল এবং এই জেলার কত লোক কোন কোন স্থানে ছিল, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :

এই জেলার লোক অন্য কোন স্থানে কত।

জেলা	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
বর্ধমান	৩২৭	২৬৭	৬০
বীরভূম	৯৬	৫৪	৪২
বাঁকুড়া	২৫	৯	১৬
মেদিনীপুর	২৪৯	১৯০	৫৯
হুগলি	৫২০	৪৩০	৮৯
হাওড়া	১০৬০	৯৬২	১৪৮
২৪ পরগণা	১৪৬১	১১৭১	২৯০
কলকাতা	১৫১৪১	১২৪৭৫	১৬৬৩

অন্য স্থানের লোক এই জেলায় কত।

জেলা	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
বর্ধমান	৪৩৫	১৫৯	২৭৬
বীরভূম	২২	১২	১০
বাঁকুড়া	৬৫	৪৭	১৮
মেদিনীপুর	৯৬	৩১	৬৫
হুগলি	২৩১	১৩৬	৯৫
হাওড়া	৪৭	২৮	১৯
২৪ পরগণা	১২৪	৭২	৫২
কলকাতা	৮৬২	৩৩০	৫৩২

এই জেলার লোক অন্য কোন স্থানে কত।

জেলা	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
নদীয়া	৬০৫	৩১২	২৯৩
মুর্শিদাবাদ	৭০৪	৪৩৫	২৬৯
যশোহর	৩৫০	২৫৭	৯৩
খুলনা	১৭৪৫	১৬৫১	৯৪
রাজশাহী	১৩৯৫	১১০৭	২৮৮
দিনাজপুর	৯২৭	৭৩৬	১৯১
জলপাইগুড়ি	১০৯১	৮৮৭	২০৪
দার্জিলিং	১৪৮	১০৫	৪৩
রংপুর	২৭৯৩	২৩২০	৪৭৩
বগুড়া	৬৩৮	৪৪১	১৯৮
পাবনা	৩০২৩	২৩৬৭	৬৫৬
ময়মনসিংহ	২২৪৩৪	১৫১৩৫	৭২৯৯
ফরিদপুর	১৯১৯৪	১২৭২৫	৬৪৬৯
বাকরগঞ্জ	১৪৫০৭	১৩১৮০	১৩২৭
ত্রিপুরা	১৬৫৬১	১০৬৩২	৫৯২৯
নোয়াখালি	৫৩০৭	৩১১২	২১৯৫
চট্টগ্রাম	৮৪৮	৬০৬	২৪২
পার্বত্য চট্টগ্রাম	১৭	১৪	৩
পাটনা	৯১	৬০	৩১
গয়া	৫০	৩৪	১৬
সাহাবাদ	৬৬	৪৬	২০
শারন	৪৯	৩৬	১৩

অন্যস্থানের লোক এই জেলায় কত।

জেলা	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
নদীয়া	১৯৭৭	১৮১৫	১৬২
মুর্শিদাবাদ	২০৬	১১৭	৮৯
যশোহর	৭৭০	৬৯৪	৭৬
খুলনা	৮১	৪৭	৩৪

জেলা	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
রাজশাহী	২৩১	১৯৭	৩৪
দিনাজপুর	৬২	৩৮	২৪
জলপাইগুড়ি	৩৮	২৮	১০
দার্জিলিং	১৪	৯	৫
রংপুর	১৩৯	১০৯	৩০
বগুড়া	২৪	১১	১৩
পাবনা	৫২৩৫	৩১৮২	২০৫৩
ময়মনসিংহ	২৭২৭৭	১৩১৪৫	১৩১৩২
ফরিদপুর	৬১৭৭	৪১৩৫	২০৪২
বাকরগঞ্জ	১১৫৮	৪৩৭	৩১১
ত্রিপুরা	১০০৬৭	৬০৩৪	৪০৩৩
নোয়াখালি	৭৯২	৭৩০	৬২
চট্টগ্রাম	৫৯১	৫৪১	৫০
পার্বত্য চট্টগ্রাম	৫৯১	৫৪১	৫০
পাটনা	১০৬৪	৭৭০	২৯৪
গয়া	২২০	১৬২	৫৮
সাহাবাদ	১২৭৮	৯৬৯	৩০৯
শারন	২৯৩৭	২৬৫৩	২৮৪

এই জেলার লোক অন্য কোন স্থানে কত।

জেলা	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
চম্পারন	৩৮	২৬	১২
মজঃফরপুর	৪১	২৭	১৪
দ্বারভাঙা	৮৮	৬৩	২৫
মুঙ্গের	১৫০	১৩১	১৯
ভাগলপুর	১৭৫	১০৩	৭২
পূর্ণিয়া	১৬৮	১১৯	৪
মালদহ	৩৪৯	৩০৭	৪২
সাঁওতাল পরগণা	১২৬	১০২	২৪
কটক	১১৫	৭১	৪৪
বালেশ্বর	৪২	৩০	১২
অঙ্গুল	২	২	—
পুরী	৩০১	১১৯	১৮২
হাজারীবাগ	৯	৮	১
রাঁচি	৩৯	২৬	১৩
পালামৌ	১৯	১৪	৫
মানভূম	১৩২	৮৩	৪৯
সিংভূম	৩৭	৩২	৫
কোচবিহার	১১৫০	৯০৮	২৪২
উড়িষ্যাকরদমহল	২৫	১৮	[illegible]

জেলা	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
ছোটনাগপুর করদমহল	৬	৬	—
পার্বত্য ত্রিপুরা	৬৫২	৪৩৫	২১৭
সিকিম	—	—	—

অন্য স্থানের লোক এই জেলায় কত।

জেলা	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
চম্পারন	৩০	২৯	১
মজঃফরপুর	১৩৩৮	১২৪১	৯৭
দ্বারভাঙা	১০৩৩	১০০৩	৩০
মুঙ্গের	৬৩৬৯	৫৯৮২	৩৮৭
ভাগলপুর	১৬৫	১৫১	১৪
পূর্ণিয়া	৬২	৫১	১১
মালদহ	৩৭	৩২	৫
সাঁওতাল পরগণা	১৪	১২	২
কটক	৩১৩	২৭৯	৩৪
বালেশ্বর	৮৫	৮৩	২
অঙ্গুল	—	—	—
পুরী	৫৪	৪৯	৫
হাজারীবাগ	৬৭	৩৬	৩১
রাঁচি	১২	৪	৮
পালামৌ	১	১	—
মানভূম	৯	৭	২
সিংভূম	১	১	—
কোচবিহার	৪৯	২৪	২৫
ওড়িষা করদমহল	—	—	—
ছোটনাগপুর করদমহল	—	—	—
পার্বত্য ত্রিপুরা	—	—	—
সিকিম	২	২	—

এই জেলার ২৬৭৯৩০৯ জন লোক বাংলা প্রদেশে (পূর্ববঙ্গসহ) আছে। অবশিষ্ট ১৩৪০১ জন বাংলার বাহিরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ও ভারতবর্ষের বাহিরে বিভিন্ন দেশে অবস্থিতি করিতেছে। বাংলার বাহিরের ও অন্যান্য দেশের কত লোক এই জেলায় আছে তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল।

	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
বাংলার বাহিরের	১৩১৭৬	১০৫৩৫	২৬৪১
এশিয়ার	১৩৭	১২১	১৬
ইউরোপের	১১৭	৭৯	৩৮
আমেরিকার	—	—	—
আফ্রিকার	১	১	—
অস্ট্রেলিয়ার	১	১	—
সমুদ্রের	৬	৫	১
মোট	১৩৪৩৮	১০৭৪২	২৬৯৬

আগন্তুক ও দেশান্তরগত জনসংখ্যার তুলনা :

ঢাকা জেলার আগন্তুক ও দেশান্তরগত জনসংখ্যাই অধিক। গড়ে হাজার প্রতি ৩২২ জন আগন্তুক ও ৪৮৫ জন দেশান্তরগত। চাকরি ব্যবসায় উপলক্ষে দেশান্তরে বাস করার জন্য বিক্রমপুরের অধিবাসী প্রসিদ্ধ। বাংলায় এমন স্থান নাই, যে স্থানে প্রচুর পরিমাণে বিক্রমপুর পরগণার লোক দেখিতে না পাওয়া যায়।[৪]

প্রতি বর্গমাইলে বসতি :

ঢাকা জেলায় প্রতি বর্গ মাইলে ৯২৩ জন লোকের বসতি। লোকসংখ্যা মুন্সিগঞ্জ মহকুমায় সর্বাপেক্ষা অধিক। প্রতি বর্গ মাইলে ১৬৫৪ জন। এত ঘন বসতি অন্য কোথাও নাই। এই মহকুমায় সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমপুর পরগণা অবস্থিত। বিক্রমপুর খুব বৃহৎ পরগণা নহে; কিন্তু লোকসংখ্যায় ইহা বাংলার অদ্বিতীয় পরগণা। বিক্রমপুর প্রতিবর্গ মাইলে প্রায় ১৭০০ লোকের বাস। ঘনবসতি বিষয়ে হাওড়া জেলা প্রথম, ২৪ পরগণা দ্বিতীয়[৫] ও ঢাকা জেলা তৃতীয় স্থানীয়। হাওড়ার প্রতিবর্গ মাইলে ১৩৫১, ২৪ পরগণা ৯৮৬ ও ঢাকায় ৯২৩ জন লোকের বাস।

থানাওয়ারি এলাকার পরিমাণ, গ্রামসংখ্যা, বসতি ও লোকসংখ্যা :

বিগত আদমসুমারির সময় প্রতি থানার এলাকায় কত অধিবাসী ছিল, এলাকার পরিমাণ কত, গ্রামসংখ্যা, গৃহসংখ্যা ও প্রতিবর্গ মাইলে অধিবাসীর সংখ্যা, পূর্ব আদমসুমারীর জনসংখ্যা সহ প্রকাশিত হইল। (পরিশিষ্ট "ক" দ্রষ্টব্য)।

ধর্ম

মুসলমান ধর্ম-বাবা আদম :

ঢাকা জেলায় কোন্ সময় মুসলমান ধর্ম সর্বপ্রথম প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। প্রবাদ যে রাজা বল্লাল সেনের শাসন সময়ে বাবা আদম নামক জনৈক পীর সোনারগাঁয়ে প্রবেশ লাভ করেন। এই প্রবাদ প্রকৃত হইলে মুসলমান ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে বাবা আদমই যে এ জেলায় সর্বপ্রথম আগমন করেন ইহা বলা যাইতে পারে। বাবা আদমের মসজিদ রামপালের অনতিদূরে এখনও দৃষ্ট হয়। এই মসজিদ নির্মাণের তারিখ ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে। অনেকে বলেন এই মসজিদ বাবা আদমের মৃত্যুর বহুদিন পরে নির্মিত হইয়াছিল।

পূর্ববঙ্গে মুসলমান :

বক্তিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পর হইতেই যে মুসলমানগণ পূর্ববঙ্গে প্রবেশলাভ করিয়াছিল ইহাই প্রকৃত এবং সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ঐতিহাসিকগণও ঐ সময়কেই পূর্ববঙ্গে (সোনারগাঁও) মুসলমান আগমনের সময় বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। এরপর ক্রমে এতদঞ্চলে (ঢাকা জেলায়) মুসলমান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছে। মুসলমান সমাজ সিয়া ও সুন্নি এই দুইভাগে বিভক্ত। ইহাদিগের মধ্যে মতবিরোধ বড়ই প্রবল। ১৮৬৯ সনে কোন ঘটনা উপলক্ষে ইহাদের মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধের (?) অবতারণা হইয়াছিল। রাজপুরুষদিগের চেষ্টায় তাহা নিবারিত হয়।

পীর :

প্রায় ৫১ বৎসর হইল গভর্নমেন্ট পীলখানার নিকট আজিমপুর, মগবাজার এবং বিক্রমপুর এই তিনস্থানে তিনজন পীর বাস করিতেন। ঢাকা জেলার বহু মুসলমান ইঁহাদিগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ফেরাজি :

বিগত শতাব্দীর প্রথমভাগে এক, নতুন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই সম্প্রদায় 'ফেরাজী' নামে পরিচিত। ফরিদপুর জেলার দৌলতপুর গ্রামের সরিতুল্লা নামক এক ব্যক্তি এই দলের প্রবর্তক।

সরিতুল্লা ও দুদুমিঞা :

১৮ বৎসর বয়সে সরিতুল্লা মক্কা গমন করিয়া ওহাবি সম্প্রদায়ের সহিত যোগদান করেন ও নতুনভাবে প্রমত্ত হন। অতঃপর ২০ বৎসর তীর্থবাস করিয়া সরিতুল্লা দেশে আসিয়া এক অভিনব সম্প্রদায় গঠন করেন। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার অভিনবমতে দীক্ষিত হইয়া এই জেলার বহু মুসলমান তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সরিতুল্লার মৃত্যুর পর তৎপুত্র দুদুমিঞা তাঁহার মত প্রবল রাখিয়া ফেরাজি সম্প্রদায়ের উপর কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন। দুদুমিঞা গ্রামে গ্রামে শিষ্য প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগের সাম্প্রদায়িক মত বিস্তারের চেষ্টা করিলে অনেক স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। গভর্নমেন্টের চেষ্টায় এই দলের দৌরাত্ম্য নিবারিত হয়।[৬]

মুসলমান ধর্মমন্দির :

এই জেলার নিম্নলিখিত স্থানসমূহ মুসলমানদিগের ধর্মস্থান বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। ঢাকার সন্নিকটে প্রতিষ্ঠিত "হোসেনী দালান"— এই দালান ঢাকার নবাব মহম্মদ আজিমের সময় নাওয়ারা মহলের দরগা মীর মোরাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। নবাবী আমলে মহরমের সময়ে এই স্থানে মহাসমারোহের সহিত নমাজ ও অন্যান্য ধর্মকর্ম সম্পন্ন হইত। ঈদঘর—১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান সুজার দেওয়ান মীর আবদুল কাসেম প্রস্তুত করেন। নারায়ণগঞ্জের অন্তর্গত 'কদম রসুলের দরগা' মানিকগঞ্জের অন্তর্গত 'হায়দর খাঁ কি দরগা' প্রভৃতি।

খ্রিস্টধর্ম—রোম্যান ক্যাথলিক, পর্তুগিজ মিশন :

এই জেলায় বহু খ্রিস্টানের বাস। খ্রিস্টানের সংখ্যা ১১৫৫৬। ইহাদের অধিকাংশ রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের খ্রিস্টান এবং এতদ্দেশীয় মগ স্ত্রীলোক ও পর্তুগিজ পুরুষের সংশ্রবে জন্ম। এইরূপ বহু দেশি ফিরিঙ্গি ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে নবাব শায়েস্তা খাঁ কর্তৃক চট্টগ্রাম হইতে আনীত হইয়া ঢাকার ১২ মাইল দক্ষিণে উপনিবেশিত হয়। যে স্থানে তাহারা প্রথম উপনিবেশের স্থান প্রাপ্ত হয়, এই স্থান "ফিরিঙ্গিবাজার" নামে পরিচিত। ফিরিঙ্গিবাজারে এখন অধিক ফিরিঙ্গি নাই। নবাবগঞ্জ ও রূপগঞ্জ থানার এলাকায় ইহাদের সংখ্যা অধিক।

চার্চ :

রোম্যান ক্যাথলিক চার্চের পর্তুগিজ মিশন এ জেলার তিন স্থানে স্থাপিত আছে (১) তেজগাঁও, (২) নাগরি ও (৩) হোসেনাবাদ। তেজগাঁও চার্চ সেন্ট আগস্টিন মিশনারি সম্প্রদায় কর্তৃক ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে স্থাপিত হইয়াছে।[৭] ইহাতে একজন ধর্মযাজক ও ২১৫ জন দেশিয় খ্রিস্টান আছেন। ভাওয়ালের অন্তর্গত নাগরি চার্চ ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়; সেখানে একজন ধর্মযাজক ও ১৫০০ খ্রিস্টান আছেন। নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত হোসেনাবাদ চার্চে ২ জন ধর্মযাজক ও ২৫১৮ খ্রিস্টান আছেন। এতদ্ব্যতীত ঢাকাতেও এই সম্প্রদায়ের একটি চার্চ আছে। এখানে দুইজন ধর্মযাজক ও ১২০ জন খ্রিস্টান আছেন। এই চার্চগুলি ময়লাপুর চার্চের প্রধান ধর্মযাজকের (Bishop) অধীন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সহিত গোয়ার পর্তুগিজ মিশনের মতভেদ উপস্থিত হয়। ইহার ফলে ঢাকার প্রধান ধর্মযাজকের কর্তৃত্বাধীনে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় রোম্যান ক্যাথলিকদিগের আর একটি চার্চ স্থাপিত হয়। এই চার্চের অধীনে ধর্মশালা ও অনাথ আশ্রম আছে। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান চার্চ ও ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে গ্রীক

চার্চ নির্মিত হয়। ১৮১৯ সনে সেন্ট থমাস প্রটেস্টান্ট চার্চ নির্মিত হয় ও ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে তাহার প্রতিষ্ঠা হয়।

ইংলিশ ব্যাপ্টিস্ট মিশন :

১৮১৬ অব্দে ঢাকায় ইংলিশ ব্যাপ্টিস্ট মিশন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশপ হিবর ঢাকায় আসিয়া ১৮২৪ সনের ১৬ জুলাই চার্চ ও করখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪০ অব্দে ইহাতে ১৯ জন সভ্য ছিল। বর্তমান সময় পর্যন্ত দুই শতাধিক লোক এই মিশনে দীক্ষিত হইয়াছে।

অক্সফোর্ড মিশন :

অক্সফোর্ড মিশনও কিছুদিন হইল ঢাকায় এক শাখা মিশন স্থাপন করিয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজ :

১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমে ইহার শক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে। ১৮৫৭ সন পর্যন্ত ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের কার্য একটি ভাড়া বাড়িতে চলিতেছিল। এরপর একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স্বীয় গৃহে সমাজের স্থান প্রদান করেন। ১৬৮৯ সনে পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মগণের চাঁদা দ্বারা ঢাকা ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় প্রায় তিনশত সভ্য সমাজে যোগদান করিতেন। ১৮৭৭ সনে নববিধান সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্রাহ্মসমাজ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এই জেলায় ২২১ জন ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী।[৮]

বৈষ্ণব সম্প্রদায় :

ভেকধারী বৈষ্ণব বা বৈরাগীর সংখ্যা এ জেলায় ৯২৪০। তন্মধ্যে পুরুষ ৩১২৫, স্ত্রী ৬১১৫। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী দ্বিগুণ। ইহারা নানাস্থানে 'আখড়া' করিয়া আছে। বৈষ্ণবদিগের একটি পবিত্র স্থান 'গুপ্ত বৃন্দাবন'—মধুপুরগড়ে অবস্থিত। তাহা ময়মনসিংহ জেলার অধীন। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজনগরে এক প্রসিদ্ধ আখড়া ছিল। এ জেলার অধিকাংশ বৈষ্ণব রাজনগর আখড়ার শিষ্য। এ জেলায় বিথঙ্গলের রামকৃষ্ণ গোসাঞির শিষ্যও দেখা যায়। বিথঙ্গলের শ্রীহট্ট জেলায়। এ জেলায় অনেক সম্ভ্রান্ত বৈষ্ণব পরিবারও আছেন। তাঁহারা উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের শিষ্য। সেন্সাসে তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবশ্রেণীভুক্ত করা হয় নাই। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি স্ব স্ব শ্রেণীতে ভুক্ত করা হইয়াছে। ধর্মাবলম্বী স্থানে তাঁহারা হিন্দু বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন।

হিন্দু দেবালয় ও তীর্থস্থান :

এই জেলার হিন্দুদিগের ধর্মকর্মের জন্য ঢাকার ঢাকেশ্বরীর বাড়ি, রমনার কালীবাড়ি, ধামরাইয়ের মাধববাড়ি প্রসিদ্ধ। অশোক অষ্টমীতে লাঙ্গলবন্ধ পূণ্যতীর্থে পরিণত হয়। লাঙ্গলবন্ধ ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাতের তীরে অবস্থিত।

বৌদ্ধ ও প্রেতোপাসক :

বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর সংখ্যা এ জেলায় মাত্র ৩০ জন। ইহার মধ্যে মগ ১৫ জন, ব্রহ্ম দেশিয় ১২ জন ও চীন দেশিয় ৪ জন[৯]। প্রেতোপাসক একজন, ঐ একজন গারো।

ধর্মাবলম্বী

১৯০১ সনের ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা :

এই জেলায় হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। গত ১৯০১ সনের সেন্সাসের সময় কোন ধর্মাবলম্বী কত লোক এ জেলায় বাস করিতে, তাহা প্রদর্শিত হইল।

ধর্মাবলম্বী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
হিন্দু	৯৮৮০৭৫	৪৮৭২৭৪	৫০০৮০১
ব্রাহ্ম	২২১	১১০	১১১
মুসলমান	১৬৪৯৬৩৯	৮১৯৫৮৭	৮৩০০৫২
খ্রিস্টান	১১৫৬৬	৫৪১৯	৬১৩৭
বৌদ্ধ	৩০	২৬	৪
প্রেতোপাসক	১	১	—
মোট	২৬৪৯৫২২	১৩১২৪১৭	১৩৩৭১০৫

১৮৯১ সনের ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা :

১৮৯১ সনে জনসংখ্যা গণনার সময় হিন্দু-মুসলমান ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী লোক কত ছিল, তাহার সংখ্যাও প্রদত্ত হইল।

ধর্মাবলম্বী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
হিন্দু	৯৩৩৯৫৫	৪৫৯৭১৫	৪৭৪২৪০
মুসলমান	১৪৫০১৮৬	৭২২৬৫১	৭২৭৫৩৫
খ্রিস্টান	১০৪৭৬	৪৯০০	৫৫৭৬

বৃদ্ধির গড় কারণ :

১৮৭২, ১৮৮১, ১৮৯১, ১৯০১ সনে মোট জনসংখ্যার প্রতি দশহাজারে কত হিন্দু ও কত মুসলমান ছিল তাহা প্রদর্শিত হইল।

	১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১
হিন্দু	৪২৯০	৪০৯০	৩৮৯৯	৩৭২৯
মুসলমান	৫৬৭০	৫৮৬৭	৬০৫৪	৬২২৬
অন্যান্য	—	৪৩	৪৬	৪৫

প্রতি সেন্সাসে গড়ে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে ও হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস হইতেছে। অনেক দরিদ্র হিন্দু, অভাবে পড়িয়া মুসলমান ধর্মগ্রহণ করিতেছে। অনেকস্থলে স্ত্রীলোকের আকর্ষণেও অনেক হিন্দু যুবা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। শ্রীযুক্ত গাইট সাহেবের উদ্ধৃত তালিকায়[১০] পরবর্তী কারণেই অধিকাংশ লোক ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ তালিকা ঢাকার একজন হিন্দু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সংগৃহীত।

মুসলমান ও হিন্দু অধিবাসী সংখ্যার তুলনা :

এই জেলায় মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর প্রায় দ্বিগুণ। হিন্দু সঙ্গে তুলনায় মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাতও অধিক। দশ বৎসরে হিন্দু পুরুষ সংখ্যা শতকরা ৫.৯ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৫.৬ অনুপাতে বৃদ্ধি হইয়াছে এবং মুসলমান পুরুষের সংখ্যা শতকরা ১৩.৪ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১.৪ অনুপাতে বৃদ্ধি হইয়াছে। বৃদ্ধির অনুপাত হিন্দু জনসংখ্যা অপেক্ষা মুসলমান জনসংখ্যা প্রায় তিনগুণ। মুসলমান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিক কেন না সকল ধর্মাবলম্বীই ঐ ধর্মমত গ্রহণ করিতে পারে।

থানা ও মহকুমাওয়ারি ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা :

এই জেলার সদর থানা ও শ্রীনগর থানায় মুসলমান জনসংখ্যা অপেক্ষা হিন্দু জনসংখ্যা অল্প অধিক। অন্যান্য সকল থানায়ই মুসলমান অধিক। রায়পুরা থানায় মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু সংখ্যার চারিগুণেরও অধিক। প্রতি থানা ও মহকুমায় হিন্দু-মুসলমান খ্রিস্টান প্রভৃতির সংখ্যা কত তাহা পৃথক করিয়া প্রদর্শিত হইল। (পরিশিষ্ট 'খ' দ্রষ্টব্য)

জাতি

বিভিন্ন জাতীয় লোকের সংখ্যা :

• এই জেলায় বহুজাতীয় লোকের বাস। কোন জাতীয় লোকের সংখ্যা কত তাহা প্রদর্শিত হইল। (পরিশিষ্ট গ দ্রষ্টব্য)

শ্রেণীবিভাগ :

বাংলার হিন্দুদিগকে বিগত সেন্সাস রিপোর্টে সাত পর্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা প্রথম—ব্রাহ্মণ; দ্বিতীয়—ক্ষত্রিয় রাজপুত; বৈদ্য ও কায়স্থ; তৃতীয়—শূদ্র ও নবশাখা; চতুর্থ—চাষী কৈবর্ত্ত্য ও গোয়ালা; পঞ্চম—জল অনাচারণীয়; ষষ্ঠ—নীচ জাতি কিন্তু অভক্ষ্য ভক্ষণ করে না; সপ্তম—অতি নীচ।

ব্রাহ্মণ :

ব্রাহ্মণের প্রাধান্য সর্ববাদীসম্মত। ব্রাহ্মণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক। যাঁহারা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের পৌরোহিত্য করেন তাঁহারা বর্ণ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদিগের স্থান উল্লিখিত বিভাগের চতুর্থ পর্যায়ের নিচে। হালুয়া দাসের ব্রাহ্মণের অন্ন হালুয়া দাসও গ্রহণ করে না। অগ্রদানী, লগ্নচার্য ও ভাটদিগের স্থান অপেক্ষাকৃত উচ্চে। অগ্রদানী ব্রাহ্মণ কেবল ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর কার্য করিয়া থাকেন। লগ্নাচার্য অনেক নীচ জাতির কার্যই করিয়া থাকেন। ভাট জল আচরণীয়।

কৌলীণ্যপ্রথা :

এ জেলায় বহু কুলীন ব্রাহ্মণের বাস। শ্রীনগর ও মুন্সিগঞ্জ থানায় কুলীন ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক। রাজা বল্লাল সেন এই কৌলীন্য প্রথার প্রতিষ্ঠাতা।

প্রাচীন বিবরণ :

বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের শিক্ষা দীক্ষা ক্রমশ লোপপ্রাপ্ত হইয়া যায়। মহারাজ আদিশূর ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংস্কার জন্য কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ গোত্রের পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ইহাদের নাম সুধানিধি (কাশ্যপ), তিথি মেধা (ভরদ্বাজ), বীতরাগ (বাৎস্য), সৌভরি (সাবর্ণ) ও ক্ষিতীশ (শাণ্ডিল্য)।[১১]

আদিশূরের পর বল্লাল সেন এই ব্রাহ্মণদিগের বংশধরদিগকে তাঁহাদিগের বাসস্থানের নামানুসারে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। পদ্মার দক্ষিণতীরে যাহারা বাসস্থান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা রাঢ়ী ও পদ্মার উত্তর তীরে যাঁহারা আবাসস্থান গ্রহণ করেন, তাঁহারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইলেন। বল্লাল সেন কেবল এই রাঢ়ী বারেন্দ্র দুই শ্রেণী করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; রাঢ়ী ব্রাহ্মণদিগের ৫৯ ঘরের মধ্যে ২২ ঘরকে কৌলীণ্য খ্যাতি প্রদান করিলেন এবং অবশিষ্টকে শ্রোত্রিয় আখ্যা প্রদান করেন।

বারেন্দ্রদিগেরও ১৭ ঘরের মধ্যে ৯ ঘরকে কুলীন এবং ৮ ঘরকে শ্রোত্রীয় শ্রেণীভুক্ত করিলেন। ঢাকা জেলার কুলীন ব্রাহ্মণেরা রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বাংলার প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা যাঁহারা বল্লালের এই বিভাগ স্বীকার করিলেন না, তাঁহাদিগকে বল্লাল বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়া আখ্যাত করিলেন। ঢাকা জেলার বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ আছেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে লক্ষ্মণ সেন এই ব্রাহ্মণ সমাজের পুনসংস্কার করেন। তিনি কুলীনদিগের কার্যকলাপ পরীক্ষা করিয়া কুলীন কুলকে তিনভাগে বিভক্ত করিলেন। যাঁহারা তৎকালে অনুষ্ঠানাদি রক্ষা করিয়া স্বধর্মে নিরত ছিলেন তাঁহাদিগকে মুখ্যকুলীন ও যাঁহারা কোন কোন বিষয় আচার ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে গৌণ 'কুলীন' এবং অবশিষ্টদিগকে বংশজ বলিয়া আখ্যাত করেন।[১২]

এরপর দেবীবর ঘটক কুলীনদিগের মেল সৃষ্টি করিলেন। এই মেল সৃষ্টিতে কুলীনদিগের বিবাহক্ষেত্র সংকীর্ণ হইয়া গেল। কোন কুলীন মেল ছাড়িয়া সম্বন্ধ করিতে পারিতেন না। কেবল তাহাই নহে, নিজ মেলেও যাহার তাহার সহিত সম্বন্ধ করিলে বংশ গৌরব অক্ষুণ্ন থাকিত না। এইরূপে ঘরের সৃষ্টি হয়। কুলীনের বিবাহ স্বঘরে হওয়া চাই। শুধু তাহা নহে। যে ঘরের কন্যার যে ঘরের পাত্রের সহিত বিবাহ হইবে তাঁহাদের উভয়ের বংশ পর্যায় গণনায় এক হওয়া চাই।

বহুবিবাহ :

এইরূপে কুলীনের আদান প্রদানের ক্ষেত্র সংকীর্ণ হইয়া যাওয়ায় কুলীন সমাজে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলন আবশ্যক হইয়া পড়িল। উপায় নাই কেন না পুরুষের বিবাহ না হইলেও চলিতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত কন্যার বিবাহ না হইলে সমাজ কলুষিত হয়—বালিকাদিগকে আজীবন কুমারী অবস্থায় থাকিতে হয়। সুতরাং সমাজে বহুবিবাহ চলিতে লাগিল এবং ক্রমে তাহা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দশ বৎসরের বালক ৩৫ বৎসরের কুমারীকে এবং ৮০ বৎসরের বৃদ্ধ ১২ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করিতে লাগিলেন। কারণ অন্যত্র পর্যায় মিলিতেছে না। ক্রমে বহুবিবাহ জঘন্য ব্যবসায়ে পরিণত হইয়া গেল। কুলীন জামাতা অর্থ পাইয়া এক রাত্রে এক স্থানে বসিয়া বিভিন্ন পরিবারের ২০/২৫টি বালিকা, কুমারী ও বৃদ্ধার পানি পীড়ন করিয়া উপায়হীন কন্যাদাতাগণের দায় ও কুল উদ্ধার করিতে লাগিলেন এবং পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া সেই ধর্মপত্নীদিগকে তাঁহাদিগের পূর্ব প্রতিপালকের হস্তে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। খাতায় পনের টাকা জমার সহিত বিবাহের বিবরণ লিখিত রহিল মাত্র। এইরূপ কুৎসিৎ আচার সত্ত্বেও অনেক কুলীন ঘরের মেয়ে চিরজীবন কুমারী অবস্থায় থাকিতে লাগিলেন। অনেক কুমারী গঙ্গাযাত্রীর অন্তিম সময়েও তাহার গলায় মাল্য দিয়া কুলরক্ষা করিতেন।

কুলীন শ্রোত্রিয়ের মেয়ে বিবাহ করিতে পারেন এবং তাহাতে কুলীনের কুলভঙ্গ হয় না। কুলীন বংশজের কন্যাগ্রহণ করিলে 'ভঙ্গকুলীন" নামে আখ্যাত হন ভঙ্গকুলীনের মেয়ে বিবাহ করিলেও নৈকষ্য কুলীন "ভঙ্গ" হন। ভঙ্গকুলীন সাত পুরুষে বংশজ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হন। তখন পূর্বের কুলীন "বাড়ুয্যা" "বাড়ুরী", "মুখুজ্যা", "মুখুটী" "চাটুজ্যা" চাটার্জিতে (চক্রবর্তীতে) পরিণত হন।

এই কৌলিন্য প্রথার প্রার্দুভাব এক সময়ে অত্যন্ত প্রবল ছিল। তখন কুলীন পাত্র বিরল ছিল বটে কিন্তু পাত্র জুটিলে বিশেষ টাকা পয়সার দরকার হইত না। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগেও কুলীন কন্যা কুলীন পাত্রে পাত্রস্থ করিতে ৭, ১৫, ২১, ৩১, ৪১, ৫১ (এইরূপ) পণ দিতে হইত। জামাতার উপযুক্ততার নিদর্শনের কোনই প্রয়োজন হইত না। বয়স ও বিবাহের সংখ্যা অনুসারে পনের টাকার হ্রাস বৃদ্ধি পাইত। অনেক স্থলে এক ঝাড় বাঁশ লইয়াও অনেক সদাশয় কুলীন জামাতা নিরূপায় স্বধর্মীকে শ্বশুরপদে বরণ করিয়াছেন।[১৩]

সমাজ সংস্কারক রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় :

কুলীনদিগের বহু বিবাহ নিবারণের জন্য বিক্রমপুরের রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইনিও বহু বিবাহ করিয়াছিলেন। ১২৮২ সনে ইনি পর্যায় ভঙ্গ করিয়া স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। ইহাই কুলীনসমাজে বিপর্যয় বিবাহ। বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক ঢাকা আসিলে, রাসবিহারী এই বিষয়ে তাঁহার সমীপে এক আবেদনপত্র উপস্থিত করেন। বড়লাট হিন্দুর সামাজিকতায় হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। রাসবিহারী ইহাতে ক্ষান্ত হইলেন না। ১২৮৪ সনে তিনি পুনরায় ভিন্ন মেলে নিজ পুত্রকন্যার সম্বন্ধ করিলেন। এরপর তাঁহার যত্নে অনেক নৈকষ্য কুলীন মোহভঙ্গ করিলেন। সমাজ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিল না।

রাসবিহারীর চেষ্টায় এখন কুলীনদিগের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা প্রায় তিরোহিত হইয়া গিয়াছে।[১৪]

অর্ধকালী বংশ :

এই জেলার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মিতরার অর্ধকালী বংশ শ্রেষ্ঠ। ময়মনসিংহ জেলার পণ্ডিতবাড়ি গ্রামে দ্বিজদেবের ঔরসে নিতম্বিনী দেবীর গর্ভে জয়দুর্গা নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। জয়দুর্গা মিতরানিবাসী রাঘবরামের সহিত বিবাহিতা হন। কথিত আছে এই জয়দুর্গা দেবী অর্ধকালীরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিতবাড়ির দ্বিজদেববংশ মিতরার ভট্টাচার্য দিগের কুলগুরু। রাঘব গুরুর অনুরোধে গুরুকন্যাকেই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, মিতরার ভট্টাচার্যদিগের বাড়িতে পূজায় চণ্ডীপাঠ হয় না এবং পশ্চিমচারী মণ্ডপে দেবীর অর্চনা হইয়া থাকে। এই বংশ রাঘবরাম হইতে ১১ পুরুষে পদার্পণ করিয়াছে।[১৫]

কায়স্থ :

বিক্রমপুর পরগণায় কায়স্থদিগের মধ্যে কৌলিন্যপ্রথা প্রচলিত আছে। এই কৌলিন্যপ্রথাও বল্লাল সেন প্রতিষ্ঠিত। বিক্রমপুরের কায়স্থদিগের মধ্যে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র এই চারিঘর শ্রেষ্ঠ কুলীন। বিবাহের পাত্রের মূল্য এখন আর কৌলিন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির উপর নির্ভর করে। বি এ পাশ কুলীন জামাতা হাজার হইতে ২০০০ টাকা পর্যন্ত পণ দাবি করিয়া থাকেন। এরপর যৌতুক সামগ্রী ও গহনাপত্রেরও পৃথক ফর্দ থাকে। ঢাকার কায়স্থের সংখ্যা সমগ্র বঙ্গের পনের ভাগের এক ভাগ।

বৈদ্য :

বৈদ্যের সংখ্যা ঢাকা জেলায় অনেক। বাকরগঞ্জ ব্যতীত ঢাকার ন্যায় আর কোথাও এত বৈদ্য নাই। বৈদ্যদিগের পাঁচ সমাজ (১) রাঢ়ী, (২) পঞ্চকোটী, (৩) বারেন্দ্র, (৪) পূর্বউপকুলী ও (৫) শ্রীফলী। মুন্সিগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ মহকুমার বৈদ্যগণ বারেন্দ্র সমাজের। নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকার উত্তরভাগের বৈদ্যগণ পূর্বউপকুলী সমাজের বৈদ্য। বৈদ্যদিগের মধ্যেও কৌলীন্য আছে। যাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ তাহারা কুলীন বৈদ্য, ২য়—মধ্য বা সিদ্ধ বৈদ্য, ৩য়—সাধ্য বৈদ্য, ৪র্থ—কষ্টসাধ্য বৈদ্য। সম্বন্ধ গৌরবে এই শ্রেণী বিভাগ হইয়া থাকে। মহেশ্বরদি ও ভাওয়াল পরগণার কোন কোন স্থানে বৈদ্য কায়স্থে সম্বন্ধ আছে। ঢাকার অন্যান্য স্থানে বৈদ্য কায়স্থ সম্বন্ধ নাই। বৈদ্যসমাজ সর্বত্র উন্নতশীল। এই সমাজের ২/৩ অংশ পুরুষ এবং ১/৩ অংশ স্ত্রীলোক লেখাপড়া জানে এবং মোটের উপর ১/৩ অংশ লোক ইংরেজি জানে। বৈদ্যগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পুনরায় যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতেছেন। রাজা রাজবল্লভ সেনের চেষ্টায় বৈদ্যসমাজ এই অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নবশাখা :

তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নবশাখা। বারুই, কামার, কুমার, মালাকার, ময়রা (মোদক), নাপিত, সদগোপ, তাঁতি ও তিলি (তেলি) এই নয় ঘরই প্রকৃত নবশাখার অন্তর্গত। এই নবশাখা ব্যতীত গন্ধবণিক, কালিতা, কাঁসারি, কান্ত্রা, কুড়ী, মধুনাপিত, পাটিয়াল, রাজু, শাখারি, শূদ্র এবং তামলী ও এই শ্রেণীর মধ্যে সদরের তাঁতি সমাজ উন্নত। ইহারা দুই সমাজে বিভক্ত ঝাপানিয়া ও ছোটবাগিয়া। দুই সমাজে খাওয়া বসা ও সম্বন্ধ চলে না। এই সময়ে ইহাদের নাম ঢাকাই মসলিনের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র পরিচিত ছিল। ঢাকার তাঁতিগণ বসাক উপাধিতে পরিচিত। ইহারা নানা ব্যবসায় লিপ্ত। ইঁহাদের অনেকে গভর্নমেন্টের চাকরি করিয়া থাকেন। শাঁখারিরা শঙ্খের কার্য করে। ঢাকার শাঁখারিবাজারে ইহাদের বাস। ঢাকা জেলার উচ্চ শ্রেণীর তেলি তৈপাল নামে আখ্যাত।

হালুয়া দাস :

ঢাকা জেলায় চাষা কৈবর্ত বা হালুয়া দাসের জল চল নাই। শ্রীহট্ট প্রভৃতি কোন কোন স্থানে হালুয়া দাস জল আচরণীয়। হালুয়া দাসগণ মাহিষ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে আবেদন করিয়াছিলেন। গভর্নমেন্ট আবেদন অগ্রাহ্য করেন। ঢাকা জেলার অনেক হালুয়া দাস মৎস্যের ব্যবসাও করিয়া থাকেন।

মধ্যশ্রেণী :

যুগী, নট্ট সাহা, সুবর্ণবণিক সূর্যবংশী, সূত্রধর প্রভৃতি পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীকে মধ্যশ্রেণীও বলা যাইতে পারে। ইহাদের জল চল না এবং ব্রাহ্মণ পৃথক। অনেক স্থলে নাপিত ইহাদের পায়ের নখ কাটে না এবং ইহাদের বিবাহে যোগদান করে না। যুগী মৃতদেহ পুড়ে না। যোগাসনে উত্তর পূর্বমুখী বসাইয়া পুতিয়া ফেলে। যুগীদিগের ক্রিয়াকলাপ নিজ সমাজের লেখাপড়া জানা লোকে করিয়া থাকে। ঐ সকল শিক্ষিত লোক মহাত্মা যুগী বা পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত হয়। তাহারা যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া থাকে। মহাত্মারা নাথের অন্নগ্রহণ করে না। নাথ আবার ব্যবহার দ্বারা মহাত্মা যুগী হইতে পারে। ইহারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা মহাত্মা যুগী, একাদশী যুগী, মাসিয়া যুগী, নাথযুগী ইত্যাদি। যুগীরা 'যোগী' হইবার দাবি করে।

সাহাদিগের মধ্যে এ জেলায় অনেক ধনী লোক আছেন। সাহারা ক্ষত্রিয় পর্যায়ে উন্নীত হইতে আবেদন করিয়াছিলেন। সুবর্ণ বণিক বৈশ্যশ্রেণীর দাবি করিয়াছিলেন।

নিম্নশ্রেণী :

ধোবা, ঝাল, মাল, কাপালি, চণ্ডাল, পাটনি, পোদ, রাজবংশী, কোচ প্রভৃতি যাহারা হিন্দুর অভক্ষ্য ভক্ষণ করে না, তাহারা উচ্চ শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীকে নিম্নশ্রেণী বলা যাইতে পারে। চণ্ডালেরা ১৮৯১ সনে নমশূদ্র আখ্যা লাভ করিয়াছে। ১৯০১ সনে 'নম' পরিত্যাগ করিয়া শূদ্র আখ্যার আবদার করিয়াছিল। আবদার রক্ষিত হয় নাই। এই জেলার চণ্ডালদিগের মধ্যে এক শ্রেণী সূত্রধরের কার্য করে তাহারা বারই চণ্ডাল বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়। জেলার উত্তরাংশে রাজবংশী ও কোচদিগের বাস। ইহারা সম্ভবত এতৎ প্রদেশের আদিম অধিবাসী। ঢাকার কালেক্টর ১৮৭১ সনে লিখিয়াছেন, ইহারা ৪/৫ পুরুষ হইল এ জেলায় আসিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইহারা রাজা দরং ও দণ্ডর বংশধর। দুর্ভিক্ষ ইহাদিগকে দেশবিদেশে বিতাড়িত করিয়াছে। কোচেরা উন্নত হইলে রাজবংশী নামে অভিহিত হয়। এ জেলার কোচেরা রাজবংশী শ্রেণীর অন্তর্গত। গাড়োয়ার নামক এক জাতীয় লোক ঢাকা জেলায় বাস করিত ও কুম্ভীর শিকার করিত। বর্তমান সময়ে ইহাদের অস্তিত্ব লক্ষিত হয় না। ঢাকায় সূর্যবংশী আছে, ময়মনসিংহ ব্যতীত এই জাতি অন্য কোথাও নাই। সেন্সাস ডেপুটি কালেক্টর ইহাদিগকে কোচশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া অনুমান করেন। ১৮৭১ সন হইতে সূর্যবংশীরা যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়াছে।

নিকৃষ্ট জাতি :

চামার, ডোম, গার, হাড়ি, মালি, মুচি প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতি সপ্তম শ্রেণীভুক্ত। গারোদিগের বাস ভাওয়ালের জঙ্গলে। ইহারা প্রায় সর্বভূক। ডোমেরা শূকর প্রতিপালন করিয়া থাকে।

কিচক :

কিচক ঢাকা ব্যতীত আর কোথাও নাই। ইহারা ঢাকায় ঝাড়ুদারের কার্য করিয়া থাকে। কথিত আছে ইহারা ডাকাইতের বংশধর। ইহাদের পূর্বপুরুষগণ ডাকাতি করিয়া রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ৬০/৭০ বৎসর হইল নির্বাসিত হয়।[১৬] ইহাদের জল কোন জাতি গ্রহণ করে না। শশক শিকারে ইহারা অত্যন্ত পটু।

মুসলমান শ্রেণীবিভাগ :

হিন্দুদিগের ন্যায় মুসলমানদিগের মধ্যেও জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত আছে। এই ভেদমূলে মুসলমান সমাজ তিনশ্রেণীতে বিভক্ত। যথা (১) অসরফ (সম্ভ্রান্ত শ্রেণী), (২) আজলফ (নিম্নশ্রেণী) এবং (৩) আবজল (নিকৃষ্ট শ্রেণী)। প্রথম শ্রেণীতে যথাক্রমে সৈয়দ, সেখ, পাঠান, মোঘল, মল্লিক ও মির্জা। দ্বিতীয় শ্রেণীতে—(ক) শাখায় চাষী সেক। (খ) শাখায় দর্জ্জি, জুলা, ফকির, (গ) শাখায় দাই, ধুনিয়া, কসাই, কুলু, মাহিফরস, মাল্লা, নিকারি ইত্যাদি। (ঘ) শাখায়, বাদিয়া, ধুরী, হাজম, মুচি, নাগার্চি, নট প্রভৃতি। তৃতীয় শ্রেণীতে কসবি, লালবেগী, মেথর আবদাল প্রভৃতি।

তৃতীয় শ্রেণীর নিকৃষ্ট মুসলমানেরা মসজিদে উঠিতে পারে না। সাধারণের কবরখানায়ও তাহাদের মৃতদেহের স্থান নাই। ইহাদের সংস্পর্শও নিষিদ্ধ।

সৈয়দ, সেখ, পাঠান, মোঘল, মল্লিক, মির্জা :

প্রকৃত সৈয়দ যাঁহারা, তাঁহারা খলিফা আলির বংশধর ও সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। এই জেলায় প্রকৃত সৈয়দ আছে কিনা সন্দেহ। অনেক লোক সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া সৈয়দ উপাধি গ্রহণ করে। এইরূপ সৈয়দ এ জেলায় দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু বা মুসলমান ধর্মগ্রহণ করিলে আপনাকে সৈয়দ বলিয়া পরিচয় দেন। আকবর শাহ ধর্মান্তর গ্রহণকারীদিগকে সম্মান করিয়া সৈয়দ উপাধি প্রদান করিতেন। সেখ অতি উচ্চ বংশীয়। কিন্তু এতৎ প্রদেশে 'সেখ' উপাধির কোন বিশেষত্ব নাই। সাধারণ মুসলমানেরাই সেখ বলিয়া পরিচিত। পাঠান এ জেলায় অনেক। ধামরাইর অন্তর্গত পাঠানতলিতে সম্ভ্রান্ত পাঠানেরা বাস করিতেন। এখন জেলার সর্বত্রই পাঠান আছেন। যাঁহাদের পূর্বপুরুষেরা আফগানিস্থান হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারাই আফগান বা পাঠানবংশীয়। এই জেলার উত্তরে অনেক সম্ভ্রান্ত মোঘলবংশধর বাস করিতেন। বর্তমান সময়ে ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম। মল্লিক ও মির্জা এ জেলায় অতি অল্প। অনেক জুলা মল্লিক বলিয়া পরিচিত। সুতরাং বর্তমান সময় এই সকল সম্ভ্রান্ত উপাধি দ্বারা প্রকৃত বংশমর্যাদা অবগত হওয়া যায় না। সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা নিম্নশ্রেণীর সহিত সম্বন্ধ করেন না।

অন্যান্য জাতি :

এই জেলার বহু জুলা কসাইর ব্যবসায় করিয়া থাকে। যাহারা নাপিতের কাজ করে, তাহারা হাজমে বলিয়া পরিচিত। বেলদারেরা মাটি কাটে ও বেহারা পালকি বহন করে। উভয়ই চণ্ডাল হইতে মুসলমান হইয়াছে। যাহাদের পূর্বপুরুষ কাজি ছিলেন, তাহারা কাজি বলিয়া পরিচিত, দফাদার ও নলুয়া পাটি বুনিয়া থাকে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে আহার বিহার নিষিদ্ধ। যাহাদের স্ত্রীলোকেরা ধাত্রীর কার্য করে, তাহারাই দাই বলিয়া পরিচিত। বাদিয়ারা জেলায় সাময়িক অধিবাসী। ইহারা জলাভূমি হইতে ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন বাদিয়া বাঘ মারিয়া থাকে, তাহাদিগকে 'বাঘমারিয়া' বলে। কেহ কেহ ইঁদুরের গর্ত হইতে ধান তুলিয়া থাকে, তাহাদিগকে 'বিন্দা' বলে।

পঞ্চায়েতি :

নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা সামাজিকভাবে আপনাদের অপরাধের বিচার ও দণ্ড করিয়া থাকে। এই সামাজিক বিচারপ্রথাকে 'পঞ্চায়েতি' বলে। ঢাকা সদরের প্রত্যেক মহল্লায় এইরূপ 'পঞ্চায়েতি' প্রতিষ্ঠিত আছে।

পর্তুগিজ :

উপনিবেশিকদিগের মধ্যে পর্তুগিজদিগের সংখ্যা এ জেলায় সর্বাপেক্ষা অধিক। ইহারা এ জেলায় প্রাচীন উপনিবেশী। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে জন ডি সিল ভেরিয়া ৪ খান জলযানসহ

মলয়দ্বীপ হইতে 'বাঙ্গালা' অভিমুখে আগমন করেন। ঢাকা তখন বাঙ্গালা নামে পরিচিত ছিল। তিনি দলবলসহ চট্টগ্রামে অবতরণ করেন ও জলদস্যুর ব্যবসায় বৃদ্ধি হইতে থাকে। ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে নবাব ইব্রাহিম খাঁ ইহাদের একদলকে বন্দুকচিরূপে নিযুক্ত করেন। তখন বহু পর্তুগিজ আরাকানরাজের অধীনে গোলন্দাজের কার্য করিত। ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে নবাব শায়েস্তা খাঁর সময় ইহারা আরাকানরাজের কার্য হইতে বিতাড়িত হইলে, তিনি ইহাদের বহু সংখ্যককে ঢাকায় আনিয়া বাসস্থান প্রদান করেন।[১৭] ইহাদের বংশধরেরা এখন ঢাকা জেলার অধিবাসী। ইহারা এখন দেশি ফিরিঙ্গি নামে পরিচিত। ঢাকা, তেজগাঁও, বলধুরা, হোসেনাবাদ, সুয়ালপুর, তুমিলিয়া, নাগরি প্রভৃতি স্থানে ইহারা বাস করে। ইহাদের অধিকাংশ কৃষিকার্য করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। স্ত্রীলোকেরা আয়ার ও ধাত্রীর কার্য করে। ইহাদের বিলাতি নামগুলি এখন দেশি নামে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। যথা—ডোমিঙ্গো কোষ্ঠা (Domingo Costa)—ডেঙ্গুকান্ত, মেনুয়েল ডি ক্রোজ (Menual-de-croz) মনু, হেরি ক্রেজার (Harry Fraser), হরিপ্রসাদ ইত্যাদি।

মণিপুরী :

ঢাকার উত্তর লালকুঠি নামক স্থানে মণিপুরের রাজভ্রাতা দেবেন্দ্রসিংহ[১৮] সপরিবারে গভর্নমেন্ট কর্তৃক 'নজরবন্দি' অবস্থায় রক্ষিত ছিলেন। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে আরও কতিপয় মণিপুরী স্বেচ্ছায় আসিয়া ঢাকায় বাস করিতে থাকে। ইহারা ভাওয়ালের রাজার অধীন তেজপুর গ্রামে স্থান লইয়া কৃষিকার্যে মনোযোগ প্রদান করে এবং ক্রমে এ জেলার অধিবাসীরূপে গণ্য হইয়া যায়। এরপর কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার আরও ২১ জন মণিপুরীকে অভিযুক্ত করিয়া ঢাকায় প্রেরণ করেন।[১৯] তাহারা গভর্নমেন্টের খোরাক পোষাকে প্রতিপালিত হইতে থাকে। এই সকল মণিপুরীদিগের বংশধরগণ এখন ঢাকার অধিবাসী। ইহাদের সংখ্যা ৮১৫০ এর অধিক নহে। আদমসুমারিতে ইহাদের ভাষা মণিপুরী লিখিত হইয়াছে এবং জাতিস্থলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে। বর্তমান সময় এ জেলার মণিপুর ও জেতপুর নামক স্থানদ্বয়ে মণিপুরীরা বাস করিতেছে। ইহাদের কেহ কেহ 'পলো' খেলায় সুদক্ষ।

এই সময় জয়ন্তীয়ার রাজাও ঢাকায় আবদ্ধ ছিলেন। ১৮৬২ সনে জয়ন্তীয়ার আবদ্ধ রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহাব ওয়ারিশ ঢাকা আসিয়া পেনসন পাইতেছিলেন। বর্তমান সময়ে ঐ স্থানের কোন লোক এ জেলায় নাই।

টীপরা :

ভাওয়ালে টীপরা আছে। ইহাদের সংখ্যা অল্প। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে ভাওয়ালের জঙ্গল পরিষ্কার করিবার জন্য ভাওয়ালের রাজা পার্বত্য ত্রিপুরা হইতে প্রায় শতাধিক লোক আনয়ন করিয়া বাসস্থান প্রদান করেন। ইহাদের বংশধরগণই এখন এ জেলার স্থায়ী অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইয়া গিয়াছে।

ঢাকায় এখন কোন ইউরোপীয় জাতির স্থায়ী বাসস্থান নাই। ফরাসিরা ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় স্থায়ী অধিকার স্থাপন করিয়াছিল। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি ইংরেজদের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইংরেজ ঢাকার ফরাসি কুঠি অধিকার করিয়াছিলেন এবং পুনরায় তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে ফরাসি গভর্নমেন্ট ১৮৩০ সনে তাঁহাদের স্বত্ব বিক্রয় করিয়া গিয়াছেন।[২০]

ঢাকায় ওলন্দাজদিগেরও কুঠি ছিল। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ইহাদের কুঠিও অধিকার করিয়া ফেলেন।

১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় প্রথম ইংরেজ কুঠি স্থাপিত হইয়াছিল "ঢাকার ইতিহাসে" তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

লোকচরিত্র :

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে এ এল ক্লে সাহেব ঢাকার একটিং ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি তাঁহার রিপোর্টে ঢাকা জেলার লোকচরিত্রে যথেষ্ট দোষারোপ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'এ জেলাবাসী ভীরু, অলস, ধীর, ক্ষুধায় কাতর অসহিষ্ণু, মামলাবাজ, অসৎ, মিথ্যাবাদী ইত্যাদি। প্রকৃত প্রস্তাবে ক্লে সাহেব ফৌজদারী বিচারাসনে বসিয়া যে সকল ফৌজদারী আসামীর চরিত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাদিগের সেই নীচ চরিত্রকেই জাতীয় চরিত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া এই অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাহার এইরূপ সিদ্ধান্তের অন্য কোন ভিত্তি নাই। ঢাকার লোক যথার্থ কর্মশীল ও কর্মবীর। বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্র যতটা বিকশিত হইয়াছে, ঢাকাবাসীরও তাহাই হইয়াছে। এতৎ বিষয়ে ঢাকাবাসী কোন জেলাবাসী অপেক্ষা পশ্চাৎ নহে। বিশেষত বুদ্ধি বিবেচনায় ও কার্য ক্ষমতায় ঢাকাবাসী বাঙ্গালীর অগ্রণী। কোন প্রসিদ্ধ ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর বিক্রমপুরবাসীদের কার্যদক্ষতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন 'যদি হংসপুচ্ছধারীগণ বীর বলিয়া গণ্য হন, তবে বিক্রমপুরবাসীরাই যথার্থ বীরশ্রেষ্ঠ। ইহাদের অতি অল্প লোকেরই বৃত্তি সম্পত্তি আছে। ইহারা স্বীয় তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও মনীষা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকেন।'[২১] পক্ষান্তরে ক্লে সাহেব ও ঢাকাবাসীর উন্নত কার্যকারিতা শক্তির উল্লেখ করিতে কৃপণতা করেন নাই। ক্লে সাহেব ঐ রিপোর্টেই ঢাকাবাসীর বিবিধ শিল্প নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছেন—ঢাকাবাসীর রাজভক্তিরও প্রশংসা করিয়াছেন। ক্লে সাহেবের মন্তব্য অবিকল উদ্ধৃত হইল।

'At the sametime they are sharp and clever and possess great manual dexterity and fineness of touch combined with unwered perseverance in the persuit of occupation of a sedentary nature & c & c.

"As a political community they are quiet peace able and have always been distinguished for their obedience to their rulers.'

বিবাহিত ও অবিবাহিতের সংখ্যা :

এই জেলার হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে বিবাহিত, অবিবাহিত, বিধবা ও বিপত্নীক অধিবাসীর সংখ্যা কত তাহা বয়ঃক্রম অনুসারে প্রদর্শিত হইল। (পরিশিষ্ট 'ঘ' দ্রষ্টব্য)

ভাষা

বিভিন্ন ভাষীর সংখ্যা :

বাঙ্গালা, হিন্দি, কোচ, গারো, মণিপুরী, টীপরি(?) প্রভৃতি ভাষাই এই জেলাবাসীর কথিত ভাষা। আগন্তুক প্রবাসীরা তাহাদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় বাক্যালাপ করিয়া থাকে। এই জেলার অধিবাসীদিগের মধ্যে কোন ভাষায় কতজন কথোপকথন করিয়া থাকে, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল :

কথিত ভাষা	ভাষীর সংখ্যা	কথিত ভাষা	ভাষীর সংখ্যা
বাঙ্গালা ভাষা	২৫৯৭৭২৪	হিন্দি	৩৯৭৮৬
উড়িয়া	৬৬২	খাসিয়া	৫
আসামী	১০	মারওয়ারি	২
পাঞ্জাবী	৪	গুজরাটী	১৩
কঙ্কনী	১২	কাশ্মীরি	৩
মান্দারী	২০১	কেরো	২২

কথিত ভাষা	ভাষীর সংখ্যা	কথিত ভাষা	ভাষীর সংখ্যা
সাঁওতালী	২	তেলেগু	১২
তামিলি	১	গারো	৪৮৯
টীপরি	১৬২	কোচ	১০১৩১
মণিপুরী	১৩২	ব্রহ্মী	১৪
পারস্য	৭	আরমেনিয়ান	৬৮
পাষ্টু	৩৩	গ্রিক	৫
ফ্রান্স	১২	পর্তুগিজ	৭
ইংলিশ	৩৩২	জারমেন	২
আরবি	২২	চীন	৪
মোট	২৬৪৯৫২২		

ঢাকা প্রভৃতি স্থানে যে বাঙ্গালা ভাষায় কথোপকথন হয়, তাহাকে মুসলমানী বাঙ্গালা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।[২২] গ্রীয়ার্সন সাহেব বলেন পূর্ববাঙ্গালার অধিবাসী প্রায় অধিকাংশ মুসলমান, তাহারা আরবী ও পারসী শব্দের সংমিশ্রণে বাঙ্গালা কথাবার্তা বলিয়া থাকে, এজন্য পূর্ব বাঙ্গালার ভাষাকে মুসলমানী বাঙ্গালা বলা যায়।[২৩]

মেচ, কোচ, টিপরী, গারো প্রভৃতি বদোশ্রেণী ভুক্তদিগের ভাষা তিব্বতী ব্রহ্মী (Tebeto-Bur nan-Language) ইহারা ঢাকার উত্তরে ভাওয়ালের জঙ্গলে বাস করে।

কিচকেরা গুজরাটী ভাষায় বাক্যালাপ করে। হিন্দি ভাষায় বাক্যালাপকারীদিগের মধ্যে ৮৬০১ জন উর্দু ভাষায় বাক্যালাপ করিয়া থাকে।

উচ্চারণের বিভিন্নতা :

শব্দের উচ্চারণ ও ধ্বনি জেলার সকল স্থানে একরূপ নহে। মানিকগঞ্জ মহকুমার উত্তরাংশের অধিবাসীদিগের উচ্চারণের সহিত ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার দক্ষিণভাগের অধিবাসীদিগের উচ্চারণে সাদৃশ্য আছে। মানিকগঞ্জের দক্ষিণাংশের সহিত ফরিদপুর জেলার ভাষার ও উচ্চারণের সাদৃশ্য আছে। এইরূপ ঢাকার পূর্বাংশের সহিত ত্রিপুরার ও ঢাকার উত্তরাংশের সহিত ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণাংশের অধিবাসীদিগের ভাষাগত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বিক্রমপুরের অধিবাসীদিগের ভাষায় ও বাক্যালাপে বিশেষত্ব আছে। ইহাদের বাক্যের শেষে যে দীর্ঘ উচ্চারণ থাকে তাহা দ্বারা বিশেষ রূপে ইহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ উচ্চারণ অবশ্য কোমল। ঢাকা শহরের নিম্নশ্রেণীর লোকের ভাষা বড়ই কদর্য। উহাই প্রকৃত মুসলমানী বাঙ্গালা। এই মুসলমানী বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক প্রচার জন্য মুসলমান শিক্ষা সমিতিতে প্রস্তাব হইয়াছিল। শিক্ষিত মুসলমানদিগের বিশেষ আপত্তি নিবন্ধন প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে। ঢাকা নগরের উচ্চশ্রেণীর অধিবাসীদিগেরও ভাষা কর্কশ।

ভাষার নমুনা :

ডাঃ গ্রীয়ার্সন মানিকগঞ্জের ভাষায় যে নমুনা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা তাহার মতে মুসলমানী বাঙ্গালার নমুনা।

'য়্যাকজনের দুইডী ছাওয়াল আছিলো। তাগো মৈদ্দে ছোটডি তার বাপরে কৈলো, বাবা, আমার ভাগে ঘেয বিত্তি ব্যাসাদ পরে তা আমারে দ্যাও। তাতে তিনি তান্ বিষয়সোম্পত্তি তাগো মৈদ্দে বাইটা দিল্যান্ তারপর কিছুদিন পরে ঐ ছোড ছাওয়াল্‌ডি তার সগল টাকা করি য়াকাত্র কইরা য়্যাকা দূর দ্যাশে চইলা গ্যেলো। সেখানে গিয়া তার যা কিছু আছিলো তা বদ্‌খ্যালী কৈরা উড়াইয়া দিলো. তারপর তার যা আছিলো তা যখন সব খোয়াইল তখন

সেই দ্যাশে বর আকাল্ পোইলো। তারপর সে ঐ দ্যাশের য়্যাকজন মাইনসের কাছে গিয়া আশ্রয় লইলো। সে তারে শুওর চড়াইবার লইগা মাঠে পাঠাইয়া দিলো। শওরেরা যে খোসা খাইতো তা দিয়া প্যাট ভরনের লইগা তার কত ইচ্ছা কইর্তো কিন্তু কেওই তারে তা দিতো না। তারপর যখন তার চৈতন্য হৈলো। তখন সে ভাইব্লো আমার বাপের কত ময়না করা চারকেরা ফালাইয়া ছারাইয়া খায়, আর আমি খিদায় মরি। আমি উইঠা বাবার কাছে গিয়া কোর্মু, বাবা আমি তোমার সখ্যাতে পরমেশ্বরের কাছে পাপ কোরচি। আমি আর তোমার ছাওয়াল হওনের উপোযুক্তো না। আমারে তোমার মায়না করা চাকরের মত কইরা রাখো। তারপর সে উইঠা তার বাপের কাছে আইসলো। কিছু সে দূরে থাইক্তেই তার বাপের তারে দেইখা তার উপুর বর মায়া হৈলো। সে লোরাইয়া গিয়া ছাওয়ালের গলা ধইরা চুমা খাইলো। ছাওয়াল কৈলো বাবা আমি তোমার চোখ খুর উপুর ঈশ্বরের কাছে পাপ কোরচি, তোমার ছাওয়াল হওনের আমি যুইগ্গি না। বাপে ছাকরগো কৈলো সগ্গলের থ্যাইকা ভালো কাপোর আইনা ওয়ারে পরাও, ওয়ার হাতে য়্যাকটা আঙ্গুট দিয়া দ্যাও, আর পায় জুতা দিয়া দ্যাও, আর খাওয়া লওয়া করন য়াইক। আমার এই ছাওয়ালডি মইরা গিচিলো, আবার বাইচ্চে হারাইয়া গিচিলো, আবার তারে পাইচি তখন তারা খুব আমোদ আহ্লাদ কোইরবার আরম্ভ কৈল্লো।

"তার বর ছাওয়াল তখন মাঠে আছিল। সে বারির দিগে যতই আগগাইবার লাইগলো ততই বাজনা আর নাইচ শুইনবার লাইগলো। তারপর য়্যাকজন চাকরে ডাইকা জিগ্গাসা কৈল্লো ইয়ার মানে (?) কি? সে কৈলো তোমার ভাই আইচে তারে ভাল আলে পাইয়া তোমার বাপে য়্যাক খায়ো দিচেন। তাতে তার বর রাগ হৈলো, আর সে বারিতে যাইবার চাইলো না। তারপর বাপে আইসা তারে তোষাইবার লাইগলো। সে বাপেরে এই জওয়াব দিলো। দ্যাখ এই কয় বছর ধইরা আমি তোমার কাম কৈরবার লাকচি আর কোনো দিনো তোমার হুকুম অন্যান্য করি নাই তাতেও তুমি আমার বন্ধুবান্ধব লৈয়া খাইয়া আমোদ কৈরবার লইগা য়্যাক দিনো য়্যাকটা কিছু দ্যাও নাই। আর তোমার এই ছাওয়াল খানকী লৈয়া তোমার সোম্পত্তি খাইয়া উরাইয়া আইসতে আইসতেই তুমি তার লাইগা য়্যাকটা খাওয়া দিলা। বাপে কৈলো, তুমি তো আমার কাছে বরাবর আছেই—আমার যা কিছু আছে[১২] তোমারই। একটু আমোদ আহ্লাদ কইরা ভালই কোরচি। তোমার এই ভাইটি মোইরা গিচিলো আবার বাইচ্চে, হারাইয়া গিচিলো আবার পাওয়া গিচে।"

মানিকগঞ্জের ক্রিয়াপদগুলি যথা—কোইরবো, লোইরতে লাইগলো, যাইক, ভাইবলো প্রভৃতি যথাস্থানে বিক্রমপুরে করমু করতে লাগ্ল, যাউক, ভাবল রূপে উচ্চারিত হয়। তবে উচ্চারণে বিশেষত্ব আছে।

ঢাকার বিভিন্ন স্থানের কতকগুলি গ্রাম্য শব্দের নমুনা অর্থসহ—প্রদত্ত হইল। (পরিশিষ্ট 'ঙ')

১. ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার কালেক্টর লিখিয়াছিলেন : They (the people) cannot understand why Government shout direct the expenditure of so much money and labour if not for the sake of some Aangible objects "District Administration Report".

২. ৩. ১৮৭২ খ্রি স্টাব্দে লোক গণনার পরে জেলার কতকস্থান ভিন্ন জেলার পরিবর্তিত হয়। ঐ সকল পরির্বর্তিত স্থান সমূহের লোক সংখ্যা বাদ না দিলে মোট লোক সংখ্যা ১৮৫২৯১৩ হয়। ঐরূপ ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে সংখ্যাও ২১১৬৩৫০ হয়। গবর্নমেন্টের কাগজপত্র এই দুই সংখ্যাই প্রদত্ত হইয়াছে।

৪. Philips সাহেব তাহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন—"Paragana Bikrampur is the Dacca District is famous for the migrating spirit of its inhabitants. There is not a single district in Bengal in which men of Bikrampur cannot be found in considerable members in Government or private services."

৫. Gait সাহেব বলিয়াছেন—Sons of Bikrampur are found all over Bengal and Assam and even further afield practising as pleaders of holding posts ***
Sutherland সাহেব লিখিয়াছেন—"Bikrampur the officina of the amlaginas in Eastern Bengal".

৬. ফরিদপুর বিবরণে দুদুমিঞার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

৭. Imperial Garetteer Eastern Bengal and Assam (Draft) এই চার্চের অন্তর্গত সমাধিস্থানের কোন প্রস্তর ফলকই ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব্বে দেখা যায় না। এই কারণে অনেকে এই চার্চকে আরও আধুনিক বলিয়া মনে করেন।

৮. ১৯০১ সনের সেন্সাসে ৭৩ জন ব্রাহ্ম জাতিতে "ব্রাহ্ম" বলিয়া লিখাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, ২৯ জন বৈদ্য, ১৩ জন ব্রাহ্মণ, ৭ জন কৈবর্ত, ৯০ জন কায়স্থ, দুই জন নমশূদ্র পর্যায়ে নাম লিখিয়াছেন।

৯. ১৫ + ১২ + ৪ = ৩১। গণনায় ৩১ হ.। সেন্সাস রিপোর্টে এই বৃদ্ধির কোন কারণ প্রদর্শিত হয় নাই।

১০. Census Report Part I Page XIII (1902).

১১. এতৎ সম্বন্ধ মতভেদ আছে।

১২. এই সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। কৌলীন্য প্রথায় বিস্তৃত বিবরণ "ঢাকার ইতিহাসে" আলোচিত হইবে।

১৩. জনৈক শ্রদ্ধাভাজন সতীর্থ বলিয়াছেন যে তাঁহার মাতামহ মহাশয় এরূপ স্বত্ব লাভেই অনেক দরিদ্রের কুলরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিবাস শ্রীনগর থানার অধীন।

১৪. ১৩০১ সনের ২৮শে চৈত্র ৭২ বৎসর বয়সে এই কর্মবীর দেহত্যাগ করিয়াছেন।

১৫. রাঘবদীপিকা ও অর্ধকালী পঞ্জিকা দ্রষ্টব্য।

১৬. গাইট সাহেব ১৯০১ সনে লিখিয়াছেন, ৬০ বৎসর হইল ইহারা নির্বাসিত হইয়াছিল।

১৭. নবাব জাফর খাঁর সময় ৯২৩ জন ফিরিঙ্গি নবাবের বন্দুকচিরূপে নিযুক্ত ছিল।

১৮. ১৮৫০ সনে রাজা নরসিংহের মৃত্যু হইলে কীর্তিচন্দ্র মণিপুরের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। রাজা নরহসিংহের ভ্রাতা দেবেন্দ্রসিংহ রাজ্য বহিষ্কৃত হইয়া বারংবার মণিপুর আক্রমণ করেন ও ভীষণ হত্যা ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করেন। রাজা কীর্তিচন্দ্র বৃটিশ গভর্নমেন্টের শরণাপন্ন হইলে দেবেন্দ্র সিংহ ধৃত হন (১৮৫১-৫৮) প্রথমে নদীয়া, তৎপর মুর্শিদাবাদ ও তৎপর ঢাকা আনীত হন। দেবেন্দ্র সিংহ ও তৎপরিবারভুক্ত ৪ জনে ১২, টাকা হইতে ৯০ মাসে পেনসন পাইতেন। অন্যান্যেরা পুরুষ ও স্ত্রীলোক ৯০ আনা হিসাবে দৈনিক খোরাকি পাইতেন।

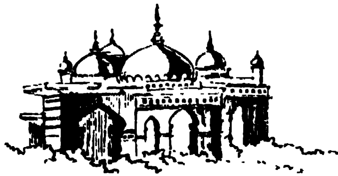
১৯. Report and Statistics of cachar.

২০. ফরাসি গভর্নমেন্ট এখনও ঢাকাতে তাহাদের স্থায়ী রাজকীয় অধিকার দাবি করিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বর্তমানে ঢাকায় তাহাদের কোন রাজকীয় স্বত্ব নাই। ঢাকায় বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করিয়া তাঁহারা যে স্বত্ব সৃষ্টি করিয়া ছিলেন তাহা ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুন ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। এরপর ইংরেজ সন্ধিসূত্রে তাঁহাদিগকে সেই স্থান পুনরায় ফিরিইয়া দেন। পরিশেষে ১৮৩০ সনে ফরাসি গভর্নমেন্ট ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিয়া ফেলেন। বিক্রয়ের পরে ঐ স্থানে বর্তমান নবাব প্রাসাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া ফরাসি চিহ্ন লোপ করিয়া ফেলিয়াছে।

২১. If quilt drivers are heroes it is a veritable midess et matriak heroum & C & C. Very few (of the people of Bikrampore) have lands and they have to get their livelihood by their wits and brains. Philips-Report (1891)

২২. Eastern of Musalmani Bengali spoken in Jessor, Khulna. Tipparah and the district of Dacca. Cencus Report (1901) page 317.

২৩. Nearly all the inhabitants of Eastern Bengal are Mahomadans and hence the dialect is sometimes called Musalmani Bengali & C—Linguistic survey of India. vo. V. part I.



চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষা

প্রাচীন শিক্ষার স্থান ; ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাত ; কলেজিয়েট স্কুল ; ঢাকা কলেজ ; মফঃস্বলে উচ্চ বিদ্যালয় ; স্ত্রীশিক্ষা ; অর্ধশতাব্দী পূর্বের স্কুল কলেজের সংখ্যা ; ট্রেইনিং স্কুল ; ঢাকা মাদ্রাসা ; মেডিকেল স্কুল ; ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল ; ইডেন স্কুল ; বর্তমান স্কুল ; কলেজ ; মাদ্রাসা ; টোল ; শিক্ষা সম্বন্ধে ঢাকার স্থান ; স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের স্ত্রী ও পুরুষ ; বয়স হিসাবে শিক্ষিত অশিক্ষিতের সংখ্যা ও গড় ; থানাওয়ারি শিক্ষিত অশিক্ষিতের সংখ্যা। পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ।

প্রাচীন শিক্ষার স্থান :

এই জেলার বিক্রমপুর পরগণা সংস্কৃত শিক্ষার একটি কেন্দ্র স্থান। নবদ্বীপ ব্যতীত এরূপ স্থান এতদ্দেশে আর নাই। সেকালে বিক্রমপুরের পল্লিতে পল্লিতে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ছিল। বহু দূরবর্তী স্থান হইতে এই সকল চতুষ্পাঠীতে আসিয়া শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করিত। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকেরাই ছাত্রদিগের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেন।

চতুষ্পাঠী ব্যতীত আরবি ও পার্শি ভাষা শিক্ষার জন্য স্থানে স্থানে 'মোক্তব' এবং বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষার জন্য পাঠশালা স্থাপিত ছিল। প্রাচীন গ্রাম্য প্রথা অনুসারে মৌলবী ও গুরু মহাশয়েরা 'গ্রামকাননের' চাঁদা দ্বারা প্রতিপালিত হইতেন। তাঁহাদের বেতনস্বরূপ শস্যাদি গ্রহণেরও রীতি ছিল। পড়ুয়ারাও যাহার তাহার সুবিধা অনুসারে কড়ি, শস্য, মুদ্রা প্রভৃতি দ্বারা বেতন প্রদান করিত।

টেইলার সাহেব লিখিয়াছেন, ১৮৩৮ সনে ঢাকা শহরে এইরূপ হিন্দু বিদ্যালয় ১১টি ও মুসলমান বিদ্যালয় ৯টি ছিল। হিন্দু স্কুল সমূহে কলার পাতে লিখান, টানা অক্ষর পড়ান, জমিদারি, মহাজনীর হিসাবপত্র রাখা, কড়া কিয়া, গণ্ডা কিয়া ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইত। মুসলমান স্কুল সমূহে পার্সি সাহিত্য, ধর্মপুস্তক ইত্যাদি পড়ান হইত।

ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাত :

ইহার কিছুকাল পূর্ব হইতেই মিশনারীর চেষ্টায় ঢাকায় ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সূত্রপাত হয় এবং গভর্নমেন্ট ব্যয়ে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুলাই ঢাকা ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই মফঃস্বলের প্রথম উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়।[১] ঢাকা কলেজ স্থাপিত হইলে ইহাই ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল নামে পরিচিত হয়।

ঢাকা কলেজ :

১৮৪১ সনের ২০ নভেম্বর তারিখে কলিকাতার লর্ড বিশপ আসিয়া ঢাকা কলেজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৬ সনে ২৪৫০০ টাকা ব্যয়ে কলেজ গৃহ প্রস্তুত হয়। ঢাকা কলেজ গৃহের স্থানে পূর্বে ইংরেজের বাণিজ্য কুঠি ছিল। ১৯০৮ সনে এই কলেজ পুনরায় রমনার নতুন বাড়িতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ১৯০৪ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ প্রতিনিধি লর্ড কার্জন ঢাকা আসিয়া এই নতুন গৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। নতুন গৃহ আজও শেষ হয় নাই।

মফঃস্বলে ইংরেজি বিদ্যালয় :
ক্রমে ইংরেজি বিদ্যা শিক্ষা অর্থকরী হইয়া দাঁড়াইলে লোকের মন ইংরেজি শিক্ষার দিকে একটু অগ্রসর হইতে লাগিল এবং গ্রামে গ্রামে ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। কালিপাড়া ও তেঘরিয়া দুইটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। এরপর ক্রমে বালিহাটী হাইস্কুল, ঢাকা পাগোজ, বাঙ্গালা বাজার হাইস্কুল, গিনিমিএগ্রা হাইস্কুল, জগন্নাথ স্কুল প্রভৃতি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্ত্রীশিক্ষা :
এই সময়ে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি লোকের মন ধাবিত হইলেও স্ত্রীশিক্ষার প্রতি হিন্দু সমাজের তত শ্রদ্ধা ছিল না। অনেকেই স্ত্রীশিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন না বরং এতৎ সম্বন্ধে প্রতিকূল মত পোষণ করিতেন। হিন্দু সমাজের এইরূপ প্রতিকূল মত থাকা সত্ত্বেও মিশনারিগণ ঢাকায় বালিকা স্কুল স্থাপন করেন এবং তাঁহাদের অনুসরণে শহরে এবং গ্রামে গ্রামে অনেকগুলি বালিকা ও মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৬ সনে এ জেলার স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটি নর্মাল স্কুল, একটি বয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের স্কুল ও ২৪টি বালিকা স্কুল প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহাদের নাম ও বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা দ্বারা কোন কোন স্থান স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে উন্নত ছিল, তাহা জানা যাইবে।

(১) সূত্রাপুর নর্মাল বালিকা বিদ্যালয় (গভর্নমেন্ট),
(২) বাঙ্গালা বাজার মহিলা বিদ্যালয়—গভর্নমেন্টের সাহায্যে ও রাধিকামোহন রায়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত,
(৩) সূত্রাপুর বালিকা বিদ্যালয়, গভর্নমেন্টের সাহায্যে ও ব্রেনেন্ড সাহেবের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
(৪) চৌধুরী বাজার বালিকা বিদ্যালয়, গভর্নমেন্টের সাহায্যে ও ব্রেনেন্ড সাহেবের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
(৫) নবাবপুর বাজার বালিকা বিদ্যালয়, গভর্নমেন্টের সাহায্যে ও ব্রেনেন্ড সাহেবের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
(৬) পাঁচদোনা বালিকা বিদ্যালয়, (৭) নরোন্দিয়া বালিকা বিদ্যালয়, (৮) সিমুলিয়া বালিকা বিদ্যালয়, (৯) ভারারিয়া বালিকা বিদ্যালয়, (১০) বিক্রমপুর জননা বিদ্যালয়, (১১) চাইরগাঁও মহিলা বিদ্যালয়, (১২) শ্রীধর খোলা বালিকা স্কুল, (১৩) বরিখালি বালিকা স্কুল, (১৪) ব্রাহ্মণগাঁও বালিকা স্কুল, (১৫) আউটসাহী বালিকা স্কুল, (১৬) ভাগ্যকুল বালিকা স্কুল, (১৭) কোল্লাপাড়া বালিকা স্কুল, (১৮) কামারগাঁও বালিকা স্কুল. (১৯) সবুকডুল বালিকা স্কুল, (২০) ষোলঘর বালিকা স্কুল, (২১) রশুনিয়া বালিকা স্কুল, (২২) খলিয়াবরগা বালিকা স্কুল, (২৩) বাথুরা বালিকা স্কুল, (২৪) লক্ষীকোল বালিকা স্কুল। এতদ্ব্যতীত মুলকতগঞ্জ থানার অধীন ও দুইটি বালিকা স্কুল ছিল।

স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার জন্য বিক্রমপুর ও ঢাকায় 'অন্তপুর স্ত্রী শিক্ষা সভা' নামে দুইটি সভা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই জেলার অধিবাসীর মধ্যে শতকরা একজন স্ত্রীলোক লেখাপড়া জানে।

অর্ধশতাব্দী পূর্বের স্কুল কলেজের সংখ্যা :
১৮৫৬-৫৭ সনে এ জেলায় মোট ১৩টি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল ছিল। এই ১৩টি স্কুলে মোট ১৪৪৯ জন ছাত্র ও ছাত্রী পাঠ করিত। এই স্কুলগুলির জন্য গভর্নমেন্টকে মোট ৬১৭৪০ টাকা খরচ করিতে হইয়াছিল। ইহাই অর্ধশতাব্দী পূর্বের শিক্ষার অবস্থা।

১৮৭০-৭১ সনে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যা ১৪৯টি এবং ছাত্র সংখ্যা ও ছাত্রীর সংখ্যা ৭১৫৫ হয় এবং তজ্জন্য গভর্নমেন্টকে ৬৯৫৪০ টাকা খরচ করিতে হয়।

নিম্নে এই উভয় সনের সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যা ও কোন সময়ে কোন স্কুলে কোন জাতীয় ছাত্র কত ছিল তাহা প্রদত্ত হইল।

স্কুলের নাম		সংখ্যা	হিন্দু ছাত্র	মুসলমান ছাত্র	অন্যান্য	মোট
ঢাকা গভর্নমেন্ট কলেজ	১৮৫৬-৫৭	১	৩৮	১	৪	৪৩
	১৮৭০-৭১	১	১০৮	২	১	১১২
ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল	১৮৫৬-৫৭	১	৩০৫	১২	২৫	৩৪২
	১৮৭০-৭১	১	২২৬	১০	১০	২৪৬
গভর্নমেন্ট বাঙ্গালা স্কুল	১৮৫৬-৫৭	১	১৫১	১৪	...	১৬৫
	১৮৭০-৭১	১	১৩১	২৪	...	১৫৫
গভর্নমেন্ট বিশেষ বিদ্যালয়	১৮৫৬-৫৭	১	৯৫	...	...	৯৫
	১৮৭০-৭১	৩[২]	১৮৮	৩	১৮	২০৯
সাহায্যপ্রাপ্ত ইংরেজি স্কুল	১৮৫৬-৫৭	৭	৬৯৬	২৫	৪	৭২৫
	১৮৭০-৭১	৯	১৮৩১	৬৫৪	২৫	২০১০
সাহায্যপ্রাপ্ত বঙ্গবিদ্যালয়	১৮৫৬-৫৭	২	৭২	৪	৩	৭৯
	১৮৭০-৭১	৯২	৩৭৪৭	৩৭৬	৩০	৪১৫৩
সাহায্যপ্রাপ্ত বালিকা স্কুল	১৮৫৬-৫৭	...	...	...	...	
	১৮৭০-৭১	১২	২১২	৮	১০	২৩০
মোট	১৮৫৬-৫৭	১৩	১৩৫৭	৫৬	৩৬	১৪৪৯
	১৮৭০-৭১	১৪৯	৬৪৮৪	৫৭৭	৯৫	৭১৫৫

ট্রেইনিং স্কুল :

১৮৫৭ সনে ঢাকা নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। ইহাই বর্তমান ট্রেইনিং স্কুল। এতকাল ভাড়াটিয়া গৃহে স্কুল হইত। অবশেষে ১৯০৬ সনে গভর্নমেন্ট ৭০ হাজার টাকা ব্যয়ে বর্তমান গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিলে, স্কুল তাহাতে স্থানান্তরিত হইয়াছে এই ট্রেইনিং স্কুলে একটি মূল্যবান পুস্তকালয় আছে, তাহাতে ৫০০০ হাজার বাঙ্গালা, ইংরেজি ও সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। ঢাকা মহিলা ট্রেইনিং ও ইংরেজি ট্রেইনিং স্কুল ২টি উঠিয়া গিয়াছে। শহরে সত্বরই একটি ট্রেইনিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

১৮৭১ সনে সাব জর্জ কেম্বেলের নিম্নশিক্ষা বিষয়ক মন্তব্য প্রকাশিত হইলে জেলার স্থানে স্থানে বহু প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঢাকা মাদ্রাসা :

১৮৭৪ সনে ঢাকা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। ইহার $^{৩}/_{৫}$ অংশ ব্যয় মহসীন ফান্ড[৩] হইতে প্রদত্ত। ১৮৮০ সনে মাদ্রাসার বর্তমান গৃহ নির্মিত হয় ও ১৬ আগস্ট কমিশনার বিমস সাহেব সেই গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই গৃহ নির্মাণে মোট ৫৯১৫৪ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৫৫০০্ টাকা নবাব আছানউল্লা বাহাদুর প্রদান করেন, ৩০০০্ টাকা সাধারণের চাঁদায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, বাকি গভর্নমেন্ট মহসীন ফান্ড হইতে প্রদান করেন। মাদ্রাসার সহিত বোর্ডিং আছে, তাহাতে ৩৮ জন ছাত্র থাকিতে পারে।

মেডিকেল স্কুল :

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হয়। মেডিকেল স্কুলের বর্তমান গৃহ ১৮৮৯ সনে ৬৪০০০্ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছে। এই টাকা সাধারণের চাঁদায় উঠিয়াছিল।[৪] এই স্কুলে চারি বৎসর পড়িলে হসপিটেল এসিস্টেন্ট হওয়া যায়। মিটফোর্ড হাসপাতাল এই স্কুলের সহিত সংসৃষ্ট।

ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল :

১৮৭৬ সনে ঢাকায় প্রথম সার্ভে স্কুল স্থাপিত হয়। এই স্কুলের ছাত্রগণ ২ বৎসর পাঠ করিয়া সার্ভোয়ার কানুনগু অথবা আমিনীর জন্য পরীক্ষা দিতে পারিতেন। ১৮৯৭ সনে এই নিয়ম পরিবর্তিত হয় এবং ১৮৯৮ সনে গভর্নমেন্ট এই স্কুলের সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। ১৯০২ সনে এই স্কুলের জন্য গভর্নমেন্ট ৬০ হাজার ও ঢাকার নবাব আমানুল্লা বাহাদুর ১১২০০০৲ টাকা প্রদান করেন। এই টাকায় স্কুলের নতুন গৃহ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত হয় এবং এই স্কুল আমানুল্লা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল নামে অভিহিত হয়।

ইডেন স্কুল :

১৮৭৮ সনে ইডেন ফিমেল স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৮২-৮৩ সনে এই স্কুল এন্ট্রান্স স্কুলে পরিণত হইয়াছে।

জগন্নাথ স্কুল ও কলেজ :

১৮৮৪ সনের ২১ জুলাই জগন্নাথ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৬-০৭ সনে এই কলেজের পরিচালকগণ কলেজটিকে Board of Trustee-র হস্তে প্রদান করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষ হইতে ইহা প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হইবে। জগন্নাথ কলেজ লাইব্রেরীতে ৮০০ পুস্তক আছে। ১৮৮৭ সনে জগন্নাথ স্কুল ও নেসনেল স্কুল একত্র হইয়া যায়। ঐ সনের মার্চ মাসে জগন্নাথ স্কুলের কর্তৃপক্ষ স্কুলটিকে উঠাইয়া দেন। ঐ সঙ্গে জুবিলী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্রাহ্ম মডেল স্কুলের সহিত একত্র পরিচালিত হইতে থাকে।

১৮৮৯ সনে গ্রীগরি স্কুল স্থাপিত হয়। ইতঃপূর্বে ঢাকায় একটি ইয়োরেসিয়ান স্কুল ছিল। ১৮৭৭ সনে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর তাহাতে দশ হাজার টাকা দান করিয়া স্কুলটির দৈন্য ঘোচাইয়া ছিলেন। কালে তাহা লোপ পাইয়াছে। ইতিমধ্যে মুন্সিগঞ্জে একটি কলেজ স্থাপিত হইয়া অল্পদিন ছিল।

১৯০১-০২ সনে এ জেলায় কতটা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও ১৯০১ সনের স্কুল টোল ছিল, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নাম	মোট সংখ্যা	মোট ছাত্র সংখ্যা	গভর্নমেন্ট স্কুল	ছাত্র	সাহায্য প্রাপ্ত স্কুল	ছাত্র	অপ্রাপ্ত সাহায্য স্কুল
আর্ট কলেজ	২	৬৪৩	১	৪১২	×	×	১
উচ্চ ইংরেজি স্কুল	৩৮	১০২১২	২	৬০৪	১০	২৮৮২	২৬
মধ্য ইংরেজি	৪৬	৩৪৩৪	১	১০৭	২৯	২৩২৭	১৬
মধ্য বাঙ্গালা	৮২	৩৯৫০	×	×	৭৭	৩৭৪১	৫
উচ্চ প্রাইমারি	২৫৫	১০১১২	×	×	২৪১	৯৬৮১	১৪
নিম্ন প্রাইমারি	১০৯৭	২৯২৯৭	×	×	৮২২	২৩৮২১	২৫৭
ল ক্লাস	১	১২৩	১	১২৩	×	×	×
সার্ভে স্কুল	১	১০৪	১	১০৪	×	×	×
মেডিকেল স্কুল	৩	×	১	১৮৩	×	×	×
ট্রেইনিং স্কুল	২	৮২	২	৮২	×	×	×
মাদ্রাসা	৩	৮৫৯	১	৫৯৮	১	৩২	১
টোল	৩৯	×	×	×	৯	১১৩	৩০
মোট	১৫৫১	৫৯৫৯১	১০	২২১৩	১১৮৯	৪২৫১৭	৩৫২[৫]

বর্তমান ১৯০৮-০৯ সনের সাধারণ স্কুলের সংখ্যা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :

	মোট	গভর্নমেন্ট	সাহায্যকৃত	অপ্রাপ্ত সাহায্য
ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়	৪৭(১)	৩	১০	৩৪
মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়	৪৯	×	৩২	১৭
মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়	৭১	×	৬৮	৩
উচ্চ প্রাথমিক	২৭৯	×	২৭৭	২
নিম্ন প্রাথমিক মধ্য মাদ্রাসা	১০	×	৩	৭
গুরু ট্রেইনিং স্কুল	৪	×	৪	×
মাদ্রাসা	৩	১	×	২
টোল	৫৭	×	২৭	৩০

শিক্ষা সম্বন্ধে ঢাকার স্থান :

শিক্ষা সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গের মধ্যে ঢাকার স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ। মিঃ গাইট তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন, 'কলিকাতা, হাওড়া, হুগলি, ২৪ পরগণা, বর্ধমান ও নদীয়ার পর ঢাকার স্থান। এই কয়েকটি জেলা শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ উন্নত। ঢাকার পুরুষ অধিবাসীর $\frac{১}{৮}$ অংশ শিক্ষিত। স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যা শতকরা একজন লেখাপড়া জানে।'

এইরূপ হার ঢাকার পক্ষে অবশ্য সন্তোষজনক নহে। এই হার লক্ষ্য করিয়া গাইট সাহেব বিস্মিত হইয়াছেন এবং স্বীয় রিপোর্টে বিক্রমপুরের বিরুদ্ধে একটু মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।[৬] বাস্তবিক এই হার ঠিক নহে। বিক্রমপুর পরগণার বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক সপরিবারে স্থানান্তরে থাকিয়া চাকরি ব্যবসায় করিয়া থাকেন। ইহাদের সংখ্যা গণনায় আনিলে শিক্ষিতের সংখ্যা গাইট সাহেবের প্রদর্শিত সংখ্যা হইতে অনেক বৃদ্ধি হইবে।

স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের স্ত্রী-পুরুষ :

এ জেলায় ১৯৬৮৬২ পুরুষ ও ২০০৫৬৬ স্ত্রীলোকের স্কুলে পড়িবার উপযুক্ত বয়স। এই ৩৯৭৪২৮ (প্রায় চারি লক্ষ) স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত লোকের মধ্যে মাত্র ৬৪৫২৬ পুরুষ (বালক ও যুবক) বিদ্যালয়ে যাইয়া থাকে। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের সংখ্যা আরও অল্প—এই সংখ্যার অষ্টম ভাগমাত্র। গড়ে প্রদর্শিত সংখ্যার শতকরা ৩২.৮ জন পুরুষ ও ৪.১ জন স্ত্রীলোক বিদ্যালয়ে যায়। পুরুষ ও স্ত্রীলোক একত্র গড়ে শতকরা ১৮.৩ জন মাত্র স্কুলে যাইয়া থাকে।[৭]

বয়স হিসাবে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সংখ্যা ও গড় :

শিশু, বালক, যুবক ও বয়স্কের হিসাব এই জেলার শিক্ষিতের হার হাজারে কত পুরুষ ও কত স্ত্রীলোক তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

বয়স	হাজার করা সাধারণ লেখাপড়া জানে		হাজার করা ইংরেজি লেখাপড়া জানে	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
০-১০	২২	২	১৫	২
১০-১৫	১৩৭	১৫	২১৩	৫
১৫-২০	১৮৪	২০	৪২৩	৬
২০ বছরের ঊর্ধ্বে	১৭১	১৩	১৬৯	৪
মোট গড়	১২১	১০	১৪৮	৩

শিক্ষিতের হার পূর্ব বৎসর অপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি দেখা যায় না। শিক্ষিত স্ত্রীলোকের সংখ্যার গড় ১৮৮১ হইতে ১৮৯২ সনে দ্বিগুণের অধিক এবং ১৯০১ সনে তিন গুণেরও

বেশি হইয়াছে নিম্নে ঐ হার প্রদর্শিত হইল :

১৯০১	১৮৯১	১৮৮১
পুং-স্ত্রী	পুং-স্ত্রী	পুং-স্ত্রী
১২১-১০	১২২-৭	১০২-৩

উপযুক্ত রূপ বয়সের হিসাবে এ জেলায় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা প্রদর্শিত হইল (পরিশিষ্ট 'চ')।

থানাওয়ারি শিক্ষিত অশিক্ষিতের সংখ্যা

এই জেলার হিন্দু মুসলমান অধিবাসীদিগের মধ্যে কোন থানায় কত লোক ইংরেজি ও বাঙ্গালা জানে তাহাও বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইল। পরিশিষ্ট (ছ)।

পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ

সংস্কৃত শাস্ত্রের পুনরুজ্জীবন ও শাস্ত্রার্থীদিগের উৎসাহ প্রদান জন্য পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীযুত শ্রীনাথ রায় মহোদয়ের সর্বপ্রথম প্রস্তাবে তত্রত্য বাবু মথুরামোহন রায়, বাবু কিশোরীমোহন রায়, বাবু গোপীমোহন রায়চৌধুরী প্রভৃতির অনুমোদনে ঢাকা বিভাগের কমিশনারের তদানীন্তন পার্সন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট রায় অভয়চন্দ্র দাস বাহাদুর, বিক্রমপুরের তৎকালীন সর্বপ্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিত সারদাচরণ তর্কপঞ্চানন, ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব সংস্কৃতাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও ভাওয়াল স্টেটের ভূতপূর্ব চীফ ম্যানেজার সাহিত্য সম্রাট রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর সি আই ই, প্রভৃতির মন্ত্রনা ও প্রযত্নে ১২৮৫ সনের (ইংরেজি ১৮৭৮) ৯ আশ্বিন মহালয়ার দিন ঢাকা নগরীতে 'পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ' স্থাপিত হয়। ভাগ্যকুল ও জয়দেবপুরের ভূস্বামীবর্গই এই সমাজের প্রধান প্রাণ বল। স্থাপনাবধি তাহারা প্রতিবর্ষেই প্রচুর অর্থদান করিয়া ইহার জীবনরক্ষা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত স্বাধীন ত্রিপুরাধীশ্বর স্বর্গগত মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুর, মহারানি স্বর্ণময়ী, মহারাজ সূর্যকান্ত আচার্য বাহাদুর, রায় অভয়াচরণ মিত্র বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্রকিশোর রায় প্রভৃতি এককালীন ও বার্ষিক দান করিয়া এই সমাজকে যথেষ্ট উপকৃত করিয়াছেন ও করিতেছেন।

সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর ছাত্রদিগের নিমিত্ত পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন, পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তীর্ণদিগকে উপাধি ও প্রশংসাপত্রাদি দান, অধ্যাপক ও ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্ধনার্থ সমুচিত পারিতোষিক ও বৃত্তি প্রদান প্রভৃতি উপায় দ্বারা এই সমাজ মৃতপ্রায় সংস্কৃত শাস্ত্রের পুনরুজ্জীবন এবং শাস্ত্রার্থীদিগের উৎসাহ প্রদান করিয়া আসিতেছেন।

পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজাধীন বার্ষিক পরীক্ষা বৈশাখ মাসের শেষ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম ভাগে গৃহীত হইয়া থাকে। নব্য ও প্রাচীন ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত, স্মৃতি, সাহিত্য, বিবিধ ব্যাকরণ, পুরাণ, আয়ুর্বেদ ও জ্যোতিশাস্ত্রে উপাধি, মধ্য ও আদ্য এই তিনটি পরীক্ষা গৃহীত হয়। ঢাকা, সুধারাম (নোয়াখালি) কুমিল্লা, কলিকাতা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম-পটীয়া ও ফরিদপুর কবিরাজপুরে এই সমাজের পরীক্ষাকেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়াছে। উপাধি পরীক্ষা তিনদিন এবং আদ্য ও মধ্য পরীক্ষা দুইদিন গৃহীত হয়। উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণ পারিতোষিক ও উপাধি এবং আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সর্বপ্রথম ছাত্রগণ বৃত্তি লাভ করিয়া থাকেন। বিদ্যোৎসাহী ধনাঢ্যগণের অর্থসাহায্যে তাহাদের ইচ্ছানুসারে বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রে উপাধি পরীক্ষোত্তীর্ণ সর্বপ্রথম ছাত্রদিগকে স্বর্ণ ও রজত পদক প্রদত্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত

সমাজাধীন পরীক্ষা প্রদানার্থ কোনরূপ শুল্ক দিতে হয় না। সকল শাস্ত্রের সমস্ত পরীক্ষার্থী ছাত্রকেই সংস্কৃত ভাষায় উত্তর লিখিতে হয়। পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের লব্ধ প্রতিষ্ঠ অধ্যাপকগণ পরীক্ষক হইয়া থাকেন। সারস্বত সমাজের কার্যাবলী সাধারণ সভা কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মানুসারে পরিচালিত হইয়া থাকে।

প্রতি বৎসর মহালয়ার দিন সারস্বত সমাজের বার্ষিক অধিবেশন (Convocation) হয়। ঐ অধিবেশনে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাকরগঞ্জ, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, শ্রীহট্ট এবং নবদ্বীপ, ভাটপল্লী, কলিকাতা, চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানের অধ্যাপকবর্গ নিমন্ত্রিত ও বার্ষিক বিদায়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ছাত্রগণের পদক, উপাধি ও প্রশংসাপত্রাদি ঐ সভায়ই প্রদত্ত হয়।

কার্যসৌকর্যার্থ সারস্বত সমাজের একটি কার্যনির্বাহক সভা আছে। পূর্ববঙ্গের সমস্ত জেলার কতিপয় প্রবীণ অধ্যাপক ঐ সভার সভ্য। স্থাপনাবধি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন সারস্বত সমাজের সম্পাদকপদে অভিষিক্ত আছেন। বিক্রমপুরের প্রধান স্মার্ত পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন ইহার বর্তমান সভাপতি। গভর্নমেন্ট সারস্বত সমাজের উৎকর্ষসাধনার্থ বার্ষিক পঁচিশ টাকা দান করিতেছেন।

১. ১৮৩৮ সনের শিক্ষা কমিটির রিপোর্টে অবগত হওয়া যায় যে ঐ সময় ঢাকায় বালক বলিকাদের জন্য আরও ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল। ঐ সকল স্কুল ব্যাপ্তিষ্ট মিশন সোসাইটির খরচে পরিচালিত হইত। এই সকল স্কুলের জন্য গভর্নমেন্ট মাসিক দুই শত টাকা করিয়া সাহায্য প্রদান করিতেন।

২. ১. ঢাকা কলেজের আইন ক্লাস, ২. ঢাকা নর্ম্মাল স্কুল, ৩. ট্রেইনিং স্কুল শিক্ষয়িত্রীর জন্যে মোট ৩টি।

৩. মহসীন ফন্ড হুগলির হাজি মহম্মদ মহসীন ১২১৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে) তাঁহার বিপুল সম্পত্তি সৎকার্যে দান করেন। ঐ সম্পত্তি হইতে ৫২০১৩ টাকা বাংলার মুসলমান ছাত্রদিগের শিক্ষার জন্য প্রদত্ত হয়। বঙ্গবিভাগের পর ঐ টাকার ৩০০০০ টাকা পূর্ববঙ্গ বিভাগের মুসলমান ছাত্রদিগের জন্য পূর্ববঙ্গ শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের হস্তে আসিয়াছে। (Vide— Report on the Progress of Education E. B. & Assam) (1901-2 1906-07) Vol- 1 page 95.

৪. রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ২০০০০, রাজা সূর্যকান্ত আচার্য ১০০০০, বাবু রঘুনাথ দাস ১৫০০০, সৈয়দ মামুদালী খাঁ ৫০০০, শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী দেবী ২০০০, অন্যান্য ১২০০০, মোট ৬৪০০০।

৫. স্থানাভাবে "অপ্রাপ্ত সাহায্য স্কুলের" ছাত্র সংখ্যা দেওয়া গেল না।

৬. ইহার একটি ন্যাশনাল স্কুল।

৭. গাইট সাহেব ঢাকার শিক্ষিতের হার এইরূপ কম দেখিয়া লিখিয়াছেন, The low rate in Dacca, is some what surprising in view of the large number of Educated Bhadraluks in the Bikrampur pargana (C. R. page 2987 of 1901)

৮. Report on Prgress of Education.



পঞ্চম অধ্যায়

সাহিত্য

সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন পণ্ডিতগণ। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য— প্রাচীন কবি ; কবি সঞ্জয় ; ঈশাননাগর ; হলায়ুধ ভট্টাচার্য ; জগন্নাথ দাস ; গদাধর পণ্ডিত ; ষষ্টীবর সেন ; গঙ্গাদাস সেন ; হরিহর সঞ্জয় ; অদ্ভুত আচার্য ; রামনারায়ণ ঘোষ ; শিবচন্দ্র সেন ; রঘুনাথ গোসাঞি ; অন্যান্য কবি ; পত্র ও পত্রিকা ; প্রথম সাময়িক পত্র ; প্রথম সংবাদপত্র ; অন্যান্য পত্রিকা। গ্রন্থ ও গ্রন্থকার—কালীপ্রসন্ন ঘোষ ; গদ্যগ্রন্থ ও গ্রন্থকার ; কবি ও কাব্য ; অন্যান্য গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ; মহিলা কবি ; ভাওয়ালে সাহিত্যচর্চ্চা ; বান্ধব কুটিরে সাহিত্য চর্চ্চা ; পুস্তকালয়।

সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন পণ্ডিতগণ :

প্রাচীন কালে বিক্রমপুর পরগণা সংস্কৃত বিদ্যালোচনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের গৃহে এবং টোলে অহরহ নানা শাস্ত্রের আলোচনা হইত। কথিত আছে যে এই বিক্রমপুরে বসিয়াই "ভট্টনারায়ণ" ও "শ্রীহর্ষ" প্রভৃতি কবিগণ তাহাদিগের গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন; মহারাজ বল্লাল সেন বল্লাল বাড়িতে (বর্ত্তমান রামপাল) অবস্থান কালে "দানসাগর" রচনা করিয়াছিলেন; বল্লালের শিক্ষাগুরু গোপাল ভট্ট বল্লালচরিত রচনা করিয়াছিলেন; এই বিক্রমপুরের অধিবাসী হলায়ুধ ভট্টাচার্য "ব্রাহ্মণ সর্বস্ব" রচনা করিয়াছিলেন। উদয়নাচার্য ভাদুড়ি মানিকগঞ্জের অন্তর্গত বালিয়াটি গ্রামে থাকিয়া "কুসুমাঞ্জলি" রচনা করিয়াছিলেন ; আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ ঢাকা জেলায় থাকিয়া সুপ্রসিদ্ধ—"সাহিত্যদর্পণ" রচনা করিয়াছিলেন। বান্ধব সম্পাদক রায় কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর সি, আই, ই বাহাদুর বলিয়াছেন যে, বিশ্বনাথের বংশধরগণ এখনও বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভরাটের গ্রামে বাস করিতেছেন।

বিক্রমপুরে যাঁহারা শাস্ত্র আলোচনা করিতেন তাঁহাদিগের মধ্যে কাঠাদিয়ার কমল সার্বভৌম, ইছাপুরার তারিনীচরণ ন্যায় বাচস্পতি, ভোজেশ্বরের কালীনাথ তর্কভূষণ প্রসিদ্ধ ছিলেন; স্মার্ত্ত পণ্ডিতদিগের মধ্যে কুরাপাড়ার কালীকান্ত শিরোমণি, দীনবন্ধু ন্যায়পঞ্চানন (মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ইহার ছাত্র) প্রভৃতি প্রধান। বৈয়াকরণের মধ্যে কুরাপাড়ার নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার, শুভাড্যার কৃষ্ণনন্দ সার্বভৌম প্রধান। সাহিত্য বিষয়ে পণ্ডিত ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার "মনোদূত" লিখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু লেখক বহু সংস্কৃত কুলপঞ্জিকা, চিকিৎসা ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ লিখিয়াছেন।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য

প্রাচীন কবি :

প্রাচীনকালে এ জেলার স্থানে স্থানে বহু কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয় গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন, "ঢাকা জেলার সোনারগাঁ ও মহেশ্বরদী পরগণাতেই অনেক কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিক্রমপুর বা মানিকগঞ্জের কোন প্রাচীন কবির গ্রন্থ আমার অনুসন্ধানে পাওয়া যায় নাই।"

ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানের প্রাচীন কবিদিগের বিবরণ যথাসাধ্য প্রদান করা গেল।

কবি সঞ্জয় :

বাঙ্গালার কবিদিগের মধ্যে সঞ্জয় কবি অতি প্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ। ইনি চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্তী সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের কোন এক স্থানে আর্বির্ভূত হইয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন ইহার নিবাস ঢাকার জিলার অন্তর্গত মহেশ্বরদী পরগণার কোন স্থানে ছিল।[১] সঞ্জয় রচিত মহাভারত বাঙ্গালা ভাষার— আদিম মহাভারত। কাশীদাস সঞ্জয় মহাভারত দৃষ্টে স্বীয় গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। মহাভারত ব্যতীত সঞ্জয়ের রচিত গীতা এবং ভারত সাবিত্রী নামে আরও দুইখানা গ্রন্থ আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। ভাগবদগীতার সরল বঙ্গানুবাদে সঞ্জয়ের অগাধ সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সঞ্জয়ের গীতা পূর্ব্ববঙ্গের অমূল্য বিধি। বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট দপ্তরে সঞ্জয়ের রচিত যে মহাভারত রক্ষিত আছে তাহাতে কবির আত্মপরিচয় স্থলে কেবল এই একটি মাত্র কথা লিখিত আছে :—

ভরদ্বাজ উত্তমবংশেতে যে জন্ম।
সঞ্জয়ে ভারত কথা কহিলেক মর্ম্ম।।

ইশাননাগর :

সুবিখ্যাত অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থের ইশাননাগর ১৪১৪ শকে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পদ্মাতীরস্থ তেওথা গ্রামে তাঁহার শ্বশুরালয়। তিনি শ্বশুরালয়ে থাকিয়া বৃদ্ধ বয়সে "অদ্বৈত প্রকাশ" রচনা করেন। এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৪৮২ শক। অদ্বৈত প্রকাশ রচনার পর তিনি শ্রীহট্টে যাইয়া ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। 'অদ্বৈত প্রকাশ' একখানা প্রামাণিক গ্রন্থ।

হলায়ুধ ভট্টাচার্য :

বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাষ্টকাটা গ্রামে রাঢ়ীয় কাশ্যপ গোত্রে শুদ্ধ শোত্রিয় ব্রাহ্মণ কুলে হলায়ুধ ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন ইনিই বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মণ সেন দেবের মন্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ "ব্রাহ্মণসর্বস্ব" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা। এই হলায়ুধের বংশে বহু পুরুষ পরে রত্নাকর মিশ্র নামক এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। রত্নাকরের দুই পুত্র সর্বানন্দ ও প্রকাশনন্দ। চৈতন্যদেবের প্রিয় পার্শ্বদ জগন্নাথ দাস গোস্বামী সর্বানন্দের পুত্র।

জগন্নাথ দাস :

বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে ইনি কাষ্টকাটা জগন্নাথ দাস নামে পরিচিত। যথা—"শ্রীনাথ চক্রবর্তী আর উদ্ধব দাস। জিতোমিশ্র কাষ্টকাটা জগন্নাথ দাস।"

(শ্রীমচ্চৈতন্য চরিতামৃত)

বলা বাহুল্য বাসস্থানের নাম হইতেই এই উদ্ভট উপাধির সৃষ্টি। জগন্নাথ তৎকালে বঙ্গদেশের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও সাহিত্যালোচক ছিলেন।

জগন্নাথ অল্পবয়সেই পিতৃমাতৃহীন হইয়া পিতৃব্য প্রকাশানন্দের অভিবাবকত্বে লালিত

পালিত হন। ইনি শৈশব হইতেই বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। যথাকালে পিতৃব্যের যত্নে জগন্নাথ টোলে প্রেরিত হইলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হইলেন ও আচার্য উপাধি লাভ করিলেন। এই সময় নদিয়ায় প্রেমভক্তির প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইতেছিল। সে বন্যাস্রোত জগন্নাথের হৃদয়ের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গেল। জগন্নাথ গৃহত্যাগ করত। হৃদয়ে অপরিসীম আকাঙ্খা লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্দর্শনে চলিলেন। কথিত আছে জগন্নাথ দাস আচার্য বিক্রমপুরের পণ্ডিতসমাজের অগ্রগণ্য বলিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রী চৈতন্যদেব তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাহাকে নিজ পার্শ্বদরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শান্তিপুরে যাইয়া মহাপ্রভুর আদেশে তিনি শ্রীমদ্‌গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট দীক্ষিত হন। জগন্নাথের দীক্ষা গ্রহনের পর খুল্লতাত প্রকাশানন্দ শান্তিপুর উপস্থিত হন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের সৌভাগ্য দেখিয়া প্রীতি প্রফুল্ল চিত্তে নিজেও অদ্বৈতপ্রভুর নিকট একাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন। অতঃপর পিতৃব্যের অনুরোধে জগন্নাথ গৃহে প্রত্যাগমন করত; দারিপরিগ্রহ করিয়া সংসারাশ্রম গ্রহণ করিলেন এবং কিছুকাল কাষ্টকাটায় বাস করিয়া ঐ গ্রামের নিকটবর্তী আড়িয়ল গ্রামে নবাব সরকার হইতে জায়গীর তালুক পাইয়া তথায় আসিয়া বাস করেন। কাষ্টকাটা গ্রাম এখন কাঠাদিয়া নামে পরিচিত। এখনও কাঠাদিয়াতে ঠাকুর জগন্নাথ দাসের পাট বর্তমান আছে। জগন্নাথের বংশধরগণ এখন আড়িয়াল, পাইকপাড়া, কামারখারা প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন।

গদাধর পণ্ডিত :

চৈতন্যের পারিষদ গদাধর পণ্ডিত একজন কবি ছিলেন। ১৪০৮ বৈশাখী অমাবস্যা তিথিতে চট্টগ্রামে কাশ্যপ গোত্রীয় বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ শ্রীমাধব মিশ্রের ঔরসে ও রত্নাবতী দেবীর গর্ভে গদাধর মিশ্রের জন্ম। গদাধর দ্বাদশ বর্ষ বয়সে মানিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বালিয়াটি গ্রামে আসিয়া বাসস্থান নির্দেশ করেন। এই স্থানে গদাধরের প্রেমভক্তি প্রকাশ পাইতে থাকে। অতঃপর তিনি মাতুলালয় নবদ্বীপে গমন করেন। নবদ্বীপে যাইয়া পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এবং শ্রীগৌরাঙ্গ ও মুরারী গুপ্তের সতীর্থরূপে গঙ্গাদাশ পণ্ডিতের টোলে ভর্তি হন। সপ্তচত্বাবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে গদাধরের তিরোভাব হয়। তিনি আজীবন অকৃতদার বৈরাগী ছিলেন।

ষষ্ঠীবর সেন :

ষষ্ঠীবর সেন প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। ষষ্ঠীবর অশ্বমেধ পর্ব (অনুগীতা) ও মহাভারতের অন্যান্য কতিপয় পর্ব রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অক্রুরচন্দ্র সেন মহাশয় আমাকে লিখিয়াছিলেন। "আমি ষষ্ঠীবরের যে অশ্বমেধ (অনুগীতা) জয়দেবপুর সাহিত্য সম্মিলনীতে মুদ্রিত হইতে দিয়াছিলাম, তাহাতে ষষ্ঠীবরের বাসস্থান "দীনার দ্বীপ" বলিয়া লিখিত ছিল। এই দীনার দ্বীপ মহেশ্বরদী পরগণার অন্তর্গত বর্তমান ঝিনারদী।" ষষ্ঠীবরের গুণরাজ খাঁ উপাধি ছিল। ষষ্ঠীবর সম্পূর্ণ মহাভারত লিখিয়াছিলেন। ষষ্ঠীবর মহাভারত ব্যতীত পদ্মপুরাণ এবং রামায়ণেরও কোন কোন প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ, তিনি জগদানন্দ নামক কোন অনার্য ব্যক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া 'ভারতকথা' লিখিয়াছিলেন।

অমৃত লহরিছন্দ, পূণ্য ভারতের বন্দ
কৃষ্ণের চরিত্র শেষ পর্বে।
শ্রীযুক্ত জগদানন্দে, অহর্নিশি হরি বন্দে,
কবি ষষ্ঠীবর কহে সর্বে।
(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।)

গঙ্গাদাস সেন :

ষষ্ঠীবরের পুত্র গঙ্গাদাসও পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কাব্য-কাননে প্রবেশ করিয়াছিলেন। গঙ্গা দাসের লিখিত জন্মেজয়—উপাখ্যান, সভাপর্ব, ভীষ্মপর্ব ও স্বর্গারোহনপর্ব আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থে ষষ্ঠীবর এবং গঙ্গাদাস উভয়েরই ভনিতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয়, একের অবসরে অন্যজন গ্রন্থের রচনাকার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। জন্মেজয় উপাখ্যানে গঙ্গাদাস এইরূপে নিজ পরিচয় দিয়াছেন—

"পিতামহ কুলপতি পিতা ষষ্ঠীবর।
যার যশঃ গায় লোকে অবনী ভিতর।।"

গঙ্গাদাসের রচনা কৌশল, ষষ্ঠীবর অপেক্ষা প্রশংসনীয়।

হরিহর সঞ্জয় :

"ধর্মের পাঁচালী" লেখক হরিহর সঞ্জয় মানিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত দিঘুলিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পিতার নাম বানেশ্বর অজ্ঞয়।

অদ্ভুত আচার্য :

অদ্ভুত আচার্যের নাম নিত্যানন্দ শর্মা। অদ্ভুত আচার্য সম্পূর্ণ রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কতকগুলি খণ্ডিত অধ্যায়ে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসুর নিকট কবির রচিত যে রামায়ণ আছে তাহাতে কবি আত্মপরিচয় স্থলে এইরূপ লিখিয়াছেন।

প্রপিতামহোবন্দ্যো যাহার খণ্ড।
তাহার পুত্র উপজিল নামেতে প্রচণ্ড।।
তাহার তনয় হলো নামে শ্রীনিবাস।
শুন মহাশয় তেঁহো নারায়ণের দাস।।
তাহে উপজিল পুত্র মানিক প্রচার।
জন্মিল চারিপুত্র চারি সহোদর।।
সোনারাজ্যে নাম ছিল বড়বাড়ি গ্রাম।
শুভক্ষণে হইল যে নিত্যানন্দ নাম।।
মাঘমাসে শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী তিথি।
ব্রাহ্মণ বেশে পরিচয় দিলেন রঘুপতি।।
প্রভুর কৃপা হইল রচিতে রামায়ণ।
অদ্ভুত হইল নাম সেই সে কারণ। ইত্যাদি

অদ্ভুত আচার্য প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। তাঁহার বাসস্থান সোনাররাজ্য, সরকার সোনারগাঁর নামান্তর মাত্র। তাঁহার লেখায় অনেক অদ্ভুত কথা আছে। এই জেলায় বিগত শতাব্দীতে এই গ্রন্থের বিশেষ আদর ছিল।

রামনারায়ণ ঘোষ :

নৈষধ রচয়িতা রামনারায়ণ ঘোষ ঢাকা জেলার অধিবাসী। ইহার নিবাসও মেঘনা নদীর পশ্চিম তীরে মহেশ্বরদী পরগণার কোন স্থানে ছিল। রামনারায়ণ ঘোষের "নৈষধ" জয়দেবপুর সাহিত্য সম্মিলনী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। নৈষধের রচনা উচ্চশ্রেণীর।

শিবচন্দ্র সেন :

কাঁচাদিয়া গ্রামে শিবচন্দ্র সেনের জন্ম। শিবচন্দ্র "সারদা মঙ্গল" সত্যনারায়ণের পাঁচালী, সাবিত্রী উপাখ্যান প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন। সারদামঙ্গলে কবির এইরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

বৈদ্যকুলে জন্ম হিন্দু-সেনের সন্ততি।
সেনহাটি গ্রামে পূর্ব পুরুষ বসতি
রামচন্দ্র নাম গুনধাম প্রতিষ্ঠিত।
যশে কুলে কীর্তিতে বিখ্যাত বিরাজিত।।
রত্নেশ্বর গুণিবর তাহার তনয়।
রতন স্বরূপ কুলে হইলা উদয়।।
তাহার তনয় হইল ভুবন বিখ্যাত।
রামনারায়ণ সেন ঠাকুর আখ্যাত।।
সেন ঠাকুরের পুত্র তুলনায় অতুল।
রামগোপাল নাম উভয় শুদ্ধকুল।।
গঙ্গাদেব দত্তক পুত্র তার পবিত্র।
গঙ্গাপ্রসাদ সেন নামে সুপবিত্র।।
বিক্রমপুরেতে কাচাদিয়া গ্রামে ধাম।
ধন্বন্তরী বংশে জন্ম প্রাণনাথ নাম।।
তাহার তনয়া মহামায়া নাম তান্।
সালঙ্কারে সুপাত্রে কন্যা কৈল দান।।
গঙ্গাপ্রসাদ সেন ঠাকুর কীর্তি মান।
জনমিল তাহার এই তিন সন্তান।।
শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র নাম।
সম্প্রতি বসতি স্থান কাঁচাদিয়া গ্রাম।।

কবি শিবচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জীবিত ছিলেন। সারদামঙ্গল বৃহৎ গ্রন্থ, ইহা রামায়ণের নামান্তর মাত্র। রাম সারদার পূজা করিয়া তাহার মাহাত্ম্যে রাবণবধ করিয়াছিলেন। এই অর্থে কবি রামায়ণকে সারদামঙ্গল আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। সারদামঙ্গল বহুদিন পূর্বে স্কুল পণ্ডিত কেদারেশ্বর চক্রবর্তী মুদ্রিত করিয়াছিলেন। সারদামঙ্গলের ভাষা বিশুদ্ধ ও লালিত্য সম্পন্ন। কবির নিবাস কাঁচাদিয়া গ্রাম এখন কীর্তিনাশার বিশাল উদরে স্থান পাইয়াছে। কবির বংশধরগণ এখন স্বর্ণনাম (কামারখারা) বাস করিতেছেন।

রঘুনাথ গোসাঞি :

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী কালিয়াপুর গ্রামে এক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ পরিবারে রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করেনে। রঘুনাথ একজন সাধক ও কবি ছিলেন। তাহার বহুসাধন সঙ্গীত শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। কবির জীবনীসহ ঐ সকল সঙ্গীত ১৩০৮ সনের আরতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। রঘুনাথ চিরকুমার ছিলেন। তাহার সঙ্গীতগুলি অতি চিত্তাকর্ষক, তিনি মধুর ভাষায় বৈষ্ণব সমাজের গূঢ় সাধন প্রণালী ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথের বংশে কেহ জীবিত নাই।

অন্যান্য কবি :

বিক্রমপুরের দ্বিজ রামপ্রাসাদ ও রাজকৃষ্ণ সেন সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন, গুরুদাস গুপ্ত রাজবল্লভের জীবনী রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু লেখক কুটপত্রিকাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। জপসায় অনেক উচ্চশ্রেণীর কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[২]

পত্র পত্রিকা

প্রথম মাসিক পত্র :

ঢাকা জেলার প্রথম মাসিকপত্র "কবিতা কুসুমাঞ্জলি"। হরিশচন্দ্র মিত্র ও কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ইহার সম্পাদক ছিলেন। কবিতা কুসুমাঞ্জলিতে সম্ভাবশতকের কবিতাগুলি প্রথম বাহির হয়। এরপর বিদ্যাধর দাস ও মহেশচন্দ্র গাঙ্গুলির সম্পাদকতায় "গদ্যমাসিক" নামে আর একখানা পত্রিকা বাহির হয়।

প্রথম সংবাদপত্র :

কবিতা কুসুমাঞ্জলি উঠিয়া গেলে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সোমপ্রকাশের আকারে প্রথম "ঢাকা প্রকাশ" বাহির করেন। ১৮৬১ সনে ঢাকা প্রকাশ প্রথম প্রচারিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার তাহার প্রথম সম্পাদক হন। ইহাই ঢাকার প্রথম সংবাদপত্র।

অন্যান্য পত্রিকা :

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার পৃথক হইয়া গেলে হরিশচন্দ্র মিত্র "ঢাকা দর্পণ" বাহির করেন এবং হারানচন্দ্র সাহা "ঢাকা বার্তা" প্রচার করেন। অতি অল্প দিন জীবন ধারণ করিয়া "ঢাকা দর্পণ" ও "ঢাকা বার্তা" কালসাগরে লয় পাইয়া যায়। ঢাকা প্রকাশ সমভাবে চলিতে থাকে। ঢাকা প্রকাশ কিছুদিন পরে ব্রাহ্মভাবে পরিচালিত হইতে থাকে। ইহা দেখিয়া শহরের হিন্দুগণ একখান হিন্দুভাবাপন্ন সাপ্তাহিক পত্রের প্রচার আবশ্যক মনে করেন। এই সময় বাবু জগন্নাথ রায় চৌধুরীর যত্নে ঢাকা ধর্মরক্ষিণী সভা হইতে "হিন্দুহিতৈষিণী" নামে ঢাকা প্রকাশের প্রতিযোগী একখানা পত্রিকা বাহির হয়। প্রতি শনিবার হিন্দু হিতৈষিণী ও প্রতি রবিবার ঢাকা প্রকাশ প্রতিযোগিতার সহিত বাহির হইতে থাকে।

ইহার পর ঢাকা নীলকরগণও তাঁহাদের কার্যকলাপ সমর্থনের জন্য একখানা পত্রিকা পরিচালন আবশ্যক মনে করেন। তদনুসারে মিঃ কেমারন, মিঃ পগোজ, মিঃ ওয়াইজ, মিঃ গ্রিগ ও নবাব খাজে আবদুলগণি (তখনও উপাধি প্রাপ্ত হন নাই।) Dacca News নামে একখানা Planters Journal বাহির করেন।

কর্মবীর হরিশচন্দ্র মিত্র বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি "পল্লীবিজ্ঞান" নামে একখানা মাসিক পত্র প্রচার করিলেন। ১৮৬৬ সনে এ জেলায় ৫টি প্রেস ও ৪ খানা পত্রিকা পরিচালিত করেন। (১) ঢাকা নিউজ যন্ত্র হইতে ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র "ঢাকা নিউজ" গ্রাহক সংখ্যা ২২৫ জন। (২) বাঙ্গালী যন্ত্র হইতে রামশঙ্কর মৌলিকের সম্পাদকতায় "ঢাকা প্রকাশ"— গ্রাহক সংখ্যা ২৫০ জন। (৩) সুলভ যন্ত্র হইতে "হিন্দুহিতৈষিণী" গ্রাহক সংখ্যা ৩০০ ও "পল্লীবিজ্ঞান" (মাসিক পত্র) গ্রাহক সংখ্যা ৩০০। এই সনে ধানকোড়া জমিদারদিগের বিজ্ঞাপনী যন্ত্র ঢাকা হইতে ময়মনসিংহে উঠিয়া যায়।

১৮৬৯-৭০ সনে ঢাকা News উঠিয়া গিয়া Bengal Times জন্মগ্রহণ করে। এই সময় ঢাকার সাহিত্যালোচনার স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। স্থানে স্থানে সাহিত্যসভা, লিটারেচার সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কালীপ্রসন্ন ঘোষ "শুভসাধিনী" পত্রিকা প্রকাশ করেন। হরিশচন্দ্র "পল্লীবিজ্ঞান" বন্ধ করিয়া "মিত্রপ্রকাশ" পত্রিকা বাহির করেন। ক্রমে রাজনৈতিক দল কর্তৃক "ভারতবান্ধব", ব্রাহ্মসমাজ হইতে "বঙ্গবন্ধু", হিন্দুসমাজ হইতে "আর্যধর্ম প্রকাশিকা", ছাত্র সমাজ হইতে "Weekly Times" প্রভৃতি অনেকগুলি পত্রিকা বাহির হয়। দেখিতে দেখিতে টোলের পণ্ডিত মহাশয়দিগেরও হস্ত কণ্ডুয়ন উপস্থিত হইল। তাহারা কলেজে পণ্ডিতদিগের সহায়তায় "সংস্কৃত সঞ্জীবনী" নামে এক পত্রিকা প্রচার করেন। সাহিত্য, ধর্ম ও রাজনীতি চর্চায় ঢাকা প্রাধান্যলাভ করিতে লাগিল।

অতঃপর ১৮৭৫ সনে "ইষ্ট" বাহির হয়। ১৮৭৬ (১২৮১ আষাঢ়) কালীপ্রসন্নের অমরকীর্ত্তি "বান্ধব" বাহির হইতে আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে "বাঙ্গালীর মহাপাপ" ও "বাল্যবিবাহ" নামে দুইখান আকস্মিক পত্রের আবির্ভাব হয় এবং "মিত্র প্রকাশ", "ভারতবান্ধব", 'আর্য্যধর্ম প্রকাশিকা" ও "সংস্কৃত সঞ্জীবনী" প্রভৃতি লয় পাইয়া যায়।

এই সময় "বান্ধবের" ন্যায় পত্রের প্রচুর আদর থাকিলেও অন্যান্য সাহিত্যিক রাজনৈতিক বা ধর্মবিষয়ক পত্রিকার জন্য প্রচুর যত্ন চেষ্টা করিয়া ও অধিক গ্রাহক সংগ্রহ করা যাইত না। রাজনৈতিক ও ধর্মবিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রগুলির অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। গ্রামে তখন যাঁহারা পত্রিকা লইতেন, তাঁহারা নামের জন্য লইতেন।[৩] তাহাদের মধ্যে পাঠক অতি অল্পই থাকিত।

১৮৭৯ সনে ভারতহিতৈষিনী নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইয়া ঐ সনেই লয় পাইয়া যায়। ১৮৮০ সনে "বিজ্ঞাপনী" নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্র এবং শহরের ছাত্রগণের চেষ্টায় "Students' Magazine, নামে ও কতিপয় যুবকের উদ্‌যোগে "ভারত ভিখারিনী" নামে ২খানা মাসিক কাগজ বাহির হয়।

১৮৮১ সনে বিজ্ঞাপনী ও হিন্দু হিতৈষিণী উঠিয়া যায় এবং মেডিকেল স্কুলের তত্ত্বাবধানে 'ভিষক' ও মিসনারিদিগের যত্নে Pilgrims Progress নামে আর দুইখানা মাসিক পত্র বাহির হয়।

১৮৮২ সনে বেঙ্গল টাইমস Biweekly হয় ও Pilgrim's Progress "Pilgrim's Journey" নামে পরিবর্তিত হয়। "ভারত ভিখারিণী" উঠিয়া "সদানন্দ" নামে নতুন একখানা মাসিক পত্রিকা বাহির হয়।

১৮৮৩ সনে সারস্বত সমাজের মুখপত্র "সারস্বত পত্র" ও বৈজ্ঞানিক মাসিক পত্রিকা "রামধেনু" প্রচারিত হয় এবং 'সদানন্দ' ও "Pilgrim's Journey" লীলা সম্বরন করে।

১৮৮৪ সনে "বিক্রমপুর বার্তাবহ" নামে একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বাহির হইয়া কয়েক সপ্তাহ চলিয়া বন্ধ হইয়া যায় এবং নববিধানের "The New light" বাহির হইতে আরম্ভ করে।

১৮৮৫ সনে 'ভিষক' উঠিয়া যায়।

১৮৮৬ সনে 'ঢাকা গেজেট' জন্মগ্রহণ করে।

১৮৮৭ সনে 'গরীব' নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্র বাহির হয়। এই সময় ঢাকার মুসলমান সমাজেও পত্রপত্রিকা প্রচারের ক্ষীণ ইচ্ছা দেখা যায় এবং ১৮৮৭ সনে ঐ সমাজ হইতে 'সনাভান' 'নিজাতন মসবি' ও 'আলেকনাম' নামে তিনখানা মাসিক কাগজ বাহির হয়। এই সনে 'মহাবিদ্যা' নামে একখানা মাসিক এবং 'হোমিওপ্যাথিক অনুবাদক' নামে মাসিক গ্রন্থও বাহির হইতে থাকে।

১৮৮৮ সনে 'গৌরব' ও 'শক্তি' দুইখানি নতুন সাপ্তাহিকের উদ্ভব হয় এবং 'বান্ধব' ও 'বঙ্গবন্ধু' ব্যতীত অন্যান্য মাসিক কাগজগুলি নির্বাণ মুক্তি লাভ করে।

১৮৮৯ সনে ঢাকা প্রকাশ ও গরীবের বিরুদ্ধে মানহানিকর প্রবন্ধ প্রকাশের জন্যে মোকদ্দমা স্থাপিত হয়। ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক শাস্তিপ্রাপ্ত হন। গরীব ক্ষমা চাহিয়া মাসিকপত্রে পরিবর্তিত হয়।

১৮৯০ সনে 'গৌরব' উঠিয়া যায় এবং 'সারস্বত পত্র' কিছুদিন বন্ধ থাকে।

১৮৯১ সনে 'গরীব'ও উঠিয়া যায়। "সারস্বত পত্র" চলিতে থাকে।

১৮৯২ সনে "শক্তি" উঠিয়া যায়, "বান্ধব" প্রাথমিক বিদায় গ্রহণ করে এবং "সেবক" নামে ব্রাহ্মসম্মিলনী হইতে একখানা নতুন পত্রের আবির্ভাব হয়।

১৮৯৩ সনে "প্রকৃতি" নামক একখানা "স্বাস্থ্যবিজ্ঞান" ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা বাহির হয়।

১৮৯৪ সনে মুন্সিগঞ্জ হইতে "বিক্রমপুর" ও ঢাকা হইতে "ভারতবাসী" নামে দুইখানা সাপ্তাহিক এবং "আশা" ও "শান্তি" নামে দুইখানা মাসিক কাগজ বাহির হয়। এদিকে "প্রকৃতি" ও "সেবক" উঠিয়া যায়।

১৮৯৫ সনে সেবকের পুনরাবির্ভাব হয়।

১৮৯৮ সনে "শিক্ষাসুহৃদ" নামে একখানা নতুন পত্রিকা বাহির হয়।

বিগত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ঢাকায় সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার অবস্থা একরূপ থাকে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ঢাকার সাহিত্যিকগণ "বান্ধবে"র অভাব দূরীকরণ মানসে "আর্যগৌরব" নামে একখানা সাময়িক সাহিত্য প্রচারের আবশ্যকতা অনুভব করেন। তদনুসারে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের (১৯০১ খ্রিষ্টাব্দ) আশ্বিন মাসে "আর্যগৌরব" বাহির হয়। আর্যগৌরব সূতিকা গৃহেই বিনষ্ট হওয়ায় ১৩০৯ সনের বৈশাখে পুনরায় "বান্ধব" সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় এবং "অতিথি" নামে আর একখানা সচিত্র মাসিক পত্রের প্রচার আরম্ভ হয়। পর বৎসর ঢাকার সাহিত্যগগনে ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়। "অতিথি" দেড় বৎসর থাকিয়া বিদায় গ্রহণ করে। তিন বৎসর চলিয়া "বান্ধব" এবং "ধূমকেতু"ও লয় পাইয়া যায়।

১৩১৩ সনে "পূর্ববাঙ্গালা" সাপ্তাহিক পত্র প্রচারিত হয়। ১৩১৫ সনের বৈশাখ মাসে পাক্ষিক 'শিক্ষা সমাচার' সাপ্তাহিকে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতার মহিলা পরিচালিত "ভারত মহিলা" মাসিক পত্রিকাও বর্তমান বর্ষে ঢাকা হইতে পরিচালিত হইতেছে। ইহাই বর্তমান সময় ঢাকার একমাত্র সাহিত্য পত্রিকা।

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

কালীপ্রসন্ন ঘোষ :

রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, সি আই ই, বাঙ্গালা সাহিত্যের সংস্কারক। বর্তমান সময় তাঁহার স্থান বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের শীর্ষ স্থানে। তাঁহার রচিত "প্রভাত চিন্তা", "নিভৃত চিন্তা", "ভ্রান্তিবিনোদ" "মা না মহাশক্তি", "জানকীর অগ্নি পরীক্ষা", "ভক্তির জয়" প্রভৃতি বঙ্গ সাহিত্যের কৌস্তভমণি ঢাকার সাহিত্য গৌরবের চরম আদর্শ।

গদ্যগ্রন্থ ও গ্রন্থকার :

রায় বাহাদুরের গ্রন্থাবলী ব্যতীত গদ্যগ্রন্থের মধ্যে ৺রজনীকান্ত গুপ্তের "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস", ৺ত্রৈলক্যনাথ ভট্টাচার্যের "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" এ জেলার মহাগৌরবের সামগ্রী।

কবি ও কাব্য :

কাব্য গ্রন্থাদি যাহারা বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এ জেলার 'কবিকাহিনী' প্রণেতা ৺দীনেশচন্দ্র বসু, হেলেনা, কাব্যপ্রণেতা ৺আনন্দচন্দ্র মিত্র নির্বাসীতা সীতা প্রণেতা ৺হরিশচন্দ্র মিত্র "প্রেম ও ফুল" প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস, "ছুছুন্দরী বধ কাব্য" প্রণেতা বাবু জগবন্ধু ভদ্র, "মুকুর" প্রণেতা শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ, "মালঞ্চ" প্রণেতা মিঃ চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "যমুনা লহরীর" কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় এই একটিমাত্র সঙ্গীত রচনা করিয়াই অমর হইয়া গিয়াছেন।

অন্যান্য গ্রন্থ ও গ্রন্থকার :

উপন্যাস ও অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে ˚সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর "রায় পরিবার", উমেশচন্দ্র গুপ্তের "মূর্খ", শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের "ক্লিওপেট্রা", ˚গোবিন্দচন্দ্র রায়ের "শকুন্তলা" উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রবিনোদ পালচৌধুরীর "শ্রীশ্রী চৈতন্যদেব ও প্রেমধর্ম", চন্দ্রকিশোর "গুনসাগর গ্রন্থাবলী:" গুরুগোবিন্দ আইচ চৌধুরীর "নিদর্শনতত্ত্ব", ডঃ চন্দ্রশেখর কালীর চিকিৎসা গ্রন্থ, কবিরাজ অভয়ানন্দ দাসের আয়ুর্বেদ গ্রন্থাবলী, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "চরিতাভিধান" প্রভৃতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

মহিলা কবি :

মহিলা গ্রন্থকর্ত্রীদিগের মধ্যে আলো ও ছায়া রচয়িত্রী শ্রীমতী কামিনী রায়ের নাম গৌরবের সহিত উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্তমান সময় বঙ্গীয় কবি সমাজে ইহার শ্রেষ্ঠ স্থান। শেখর নগরের শ্রীমতী চারুলতা ঘোষের 'চারুকুসুমাঞ্জলি' এবং বজ্রযোগিনীর ˚পঙ্কজিনী বসুর "স্মৃতিকণা" ও শ্রীমতী সুরমা সুন্দরী ঘোষের "সঙ্গিনী" ও "রঙ্গিনী" উল্লেখযোগ্য।

ভাওয়ালে সাহিত্য চর্চা :

ভাওয়ালের "রাজগৃহ" এক সময় সাহিত্য চর্চার কেন্দ্রস্থল ছিল। রায় বাহাদুরের যত্নে ভাওয়ালে "সাহিত্য সমালোচনী সভা" প্রতিষ্ঠিত হইয়া সে স্থানে সাহিত্যালোচনা প্রসার পায়। এই সভা হইতে বাঙ্গালার প্রাচীন কবিদিগের গ্রন্থপ্রকাশের উদ্যোগ হইয়াছিল।[৪]

বান্ধবকুটীরে সাহিত্য চর্চা :

রায় বাহাদুরের 'বান্ধবকুটীর' ঢাকার সাহিত্য চর্চার শ্রেষ্ঠ স্থান। বান্ধবকুটীরে রীতিমত সাহিত্য চর্চা হইয়া থাকে। ঢাকায় রাজকার্য উপলক্ষে ও অন্যান্য কারণে যে সকল সাহিত্যসেবী উপস্থিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা বান্ধবকুটীরে সাহিত্য চর্চা করিয়া থাকেন। বিভিন্ন জেলাবাসীদিগের মধ্যে ˚প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ˚দীনবন্ধু মিত্র, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ˚কৃষ্ণকমল গোস্বামী, ˚কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঢাকার শিক্ষিত মুসলমান সমাজেও সাহিত্যচর্চা হইয়া থাকে। তাহার ফলে একটি শিক্ষিতা মুসলমান রমণী একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

পুস্তকালয়

ঢাকার শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরী "নর্থব্রুক হল লাইব্রেরী"। গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুকের ঢাকা আগমন স্মরণীয় রাখিবার জন্য ১৮৮০ সনের ২৫ মে নর্থব্রুক হল ও ১৮৮২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি এই হলে এই সাধারণ পুস্তকালয়টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১১৮১ সনেই বিলাত হইতে এই পুস্তকালয়ের জন্য মূল্যবান পুস্তক সমূহ আনীত হইয়াছিল। এই পুস্তকালয় সাধারণের চাঁদায় স্থাপিত হয়। ভাওয়ালের রাজা স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ৫০০০৲ ত্রিপুরার মহারাজ ১০০০৲, বালিয়াটির বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় ১০০০৲, মহারানি স্বর্ণময়ী ৭০০৲, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ৫০০৲, বিশ্বেশ্বরী দেবী ৫০০৲ টাকা প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত ৩০০৲ হইতে নিম্নে ২৫৲ টাকা পর্যন্ত বহু লোকেই দান করিয়াছিলেন। প্রথম ১৫০০ পুস্তক লইয়া এই লাইব্রেরী স্থাপিত হয়, লাইব্রেরী তহবিলে ৮১৬৫ আনা সেভিং ব্যাঙ্ক রক্ষিত থাকে। এই লাইব্রেরী পরিচালনের ভার একটি কমিটির হস্তে স্থাপিত আছে। বিভাগীয় কমিশনার এই কমিটির প্রেসিডেন্ট।

জুবিলি উপলক্ষে মানিকগঞ্জ জুবিলি লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। ১৮৮৫ সনে ঢাকা রেলওয়ে ইনস্টিটিউট লাইব্রেরী স্থাপিত হয়।

ঢাকা কলেজের লাইব্রেরী সাধারণের জন্য উন্মুক্ত নহে। এই লাইব্রেরীতে ৭/৮ হাজার পুস্তক ও ২টি পাঠগৃহ আছে। ২টি পাঠ গৃহে ২০ জন পাঠক বসিয়া পাঠ করিতে পারেন। কলেজ লাইব্রেরীর জন্য বৎসর ১০০০৲ প্রদত্ত হয়।

পারিবারিক লাইব্রেরীর মধ্যে রায় কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর সি আই ই বাহাদুরের লাইব্রেরী প্রধান। এই লাইব্রেরীতে বহু দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ আছে।

ঢাকায় কোন সাহিত্য সভা নাই।

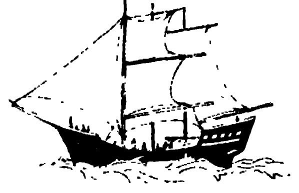
---

১. রায় কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর সি আই ই বাহাদুর আমাকে বলিয়াছেন। তাঁহার নিকট যে সঞ্জয় মহাভারত ছিল তাহাতে কবির বাসস্থান মহেশ্বতী বলিয়া লিখিত ছিল। রায়বাহাদুর বলেন মহেশ্বতীই মহেশরদী।

২. পদ্মার গতি পরিবর্তনে জপসা ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সুতরাং জপসার কবিকাহিনী 'ফরিদপুরের বিবরণে' প্রদত্ত হইল।

৩. Those who do subscribe to a paper do so more for show than for actual reading (Annual Report 1877-78)

৪ এই গ্রন্থ প্রচার সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যালোচক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয় আমাকে লিখিয়াছেন, "আমি অর্থাভাবে ও শ্রদ্ধাভাজন বঙ্গসাহিত্য কুলচূড়ামণি রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বাবুর অনুরোধে আমার সংগৃহীত গ্রন্থগুলি জয়দেবপুর 'সাহিত্য সমালোচনা' হইতে সম্মতি প্রদান করি। কথা এই থাকে যে, প্রত্যেক পুস্তকের ভূমিকা রায়বাহাদুর স্বয়ং লিখিয়া বাহির করিবেন। 'নৈষধ' শেষ হয়। 'মায়া তিমির চন্দ্রিকা' শেষ হয়। সঞ্জয় মহাভারতও প্রায় শেষ হয়, কিন্তু রায় বাহাদুর অনবসর প্রযুক্ত ভূমিকা লিখিতে পারেন না। অবশেষে নৈষধ উচ্চশ্রেণীর ভূমিকা সহ প্রকাশিত হয়। মায়া তিমির চন্দ্রিকা প্রকাশিত হয় নাই। সঞ্জয় মহাভাবতের কতকগুলি ফর্মা প্রেস হইতে খোয়া যায়।"



নদনদী—ব্রহ্মপুত্র নদ, প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, পদ্মা, পদ্মার প্রাচীন খাত, কীর্তিনাশা, যমুনা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা ও শাখা প্রশাখা, শীতলক্ষ্যা, জোয়ার ভাটা, খাল ও বিল, বন, গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান।

নদনদী

ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, পদ্মা ও যমুনা এই জেলার প্রাকৃতিক সীমা রক্ষা করিতেছে।

ব্রহ্মপুত্র নদ :

ব্রহ্মপুত্র ময়মনসিংহ জেলা হইতে আসিয়া টোকচাঁদপুরের নিকট এ জেলার উত্তর সীমায় পড়িয়াছে এবং তথা হইতে পূর্বাভিমুখে চারি মাইল আসিয়া পুনরায় ময়মনসিংহ জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। অতঃপর ময়মনসিংহ জেলার ভিতর দিয়া আরও কতক দূর অগ্রসর হইয়া নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় উত্তর সীমা রক্ষা করিয়া পূর্বাভিমুখে চলিয়াছে। এবং রায়পুরা থানার পূর্বদিকে আসিয়া মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। টোকচাঁদপুর হইতে মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থল ২৬ মাইল।

প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র :

ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত টোকচাঁদপুরের পূর্বদিকে আসিয়া মহেশ্বরদী পরগণার মধ্য দিয়া এই জেলায় প্রবেশ করত দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁর পশ্চিমদিক দিয়া প্রবাহিত হইত। এই প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র কলাগাছিয়ার নিকট ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়া মেঘনায় পতিত হইত। ইহারই তীরে পঞ্চমীঘাট ও লাঙ্গলবন্ধ (বন্দ) অবস্থিত। এই নদী এখন মরা নদী নামে অভিহিত হয়। শীতকালে এই নদীর অনেক স্থান শুষ্ক হইয়া শস্যক্ষেত্রে পরিণত হয়। *[বর্তমান সংস্করণের ৭৪৮ পৃঃ দেখুন]*

মেঘনা :

মেঘনা ময়মনসিংহ জেলার পূর্বসীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়া এ জেলার পূর্ব উত্তর সীমায় ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। অতঃপর উভয়ের সম্মিলিত প্রবাহ মেঘনা নামেই পরিচিত থাকিয়া জেলার পূর্বসীমা রক্ষা করত দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। মেঘনাকে ঢাকা জেলার পূর্বসীমা বলা যাইতে পারে। মেঘনার পূর্ব তীরে ত্রিপুরা জেলা। মেঘনা ঢাকা জেলার দক্ষিণ পূর্ব কোণে আসিয়া পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থল হইতে পদ্মার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত মেঘনা প্রায় ৯০ মাইল দীর্ঘ। *[বর্তমান সংস্করণের ৭৪৯ পৃঃ দেখুন]*

পদ্মা :

পদ্মা, পাবনা ও ফরিদপুর জেলার সীমারূপে আসিয়া এ জেলার পশ্চিম সীমায় যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে। যমুনার সহিত মিলিত হইয়া পদ্মা এই জেলার দক্ষিণ সীমা রক্ষা করিয়া দক্ষিণ পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া আসিয়া (বর্তমানে) জেলার পূর্ব দক্ষিণ কোণে মেঘনার

সহিত মিলিত হইয়াছে এবং পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের সম্মিলিত প্রবাহ দক্ষিণাভিমুখী হইয়া সাগরে পড়িয়াছে।

পদ্মার প্রাচীন খাত :

পূর্বে পদ্মা ফরিদপুর জেলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাকরগঞ্জ জেলার মেহেন্দিগঞ্জ থানার নিকট মেঘনার সহিত মিলিত হইত। পদ্মার এই প্রাচীন প্রবাহ এখন ময়নাকাটা ও আড়িয়ালখাঁ নামে পরিচিত।

কীর্তিনাশা :

পদ্মা হইতে একটি ক্ষুদ্র খাল বাহির হইয়া বিক্রমপুরের প্রাচীন রাজধানী শ্রীপুরের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত। ঐ ক্ষুদ্র খাল রথখোলার খাল নামে পরিচিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যমুনার প্রবল প্রবাহে উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রাচীন গতি পরিত্যাগ করত ক্ষুদ্রতোয়া রথখোলার ক্ষুদ্র কলেবর তরঙ্গায়িত করিয়া প্রবাহিত হইল। পদ্মার এই গতি পরিবর্তনে বিক্রমপুরের বহু স্থান পদ্মার কুক্ষিগত হইল। দেখিতে দেখিতে চাঁদরায় কেদার রায়ের কীর্তিবাশিসহ রাজধানী শ্রীপুর পদ্মার সেই বিশাল গর্ভে বিলীন হইল। চাঁদ রায় কেদার রায়ের কীর্তি গ্রাস করিয়া ক্ষুদ্র রথখোলা সেই অবধি কীর্তিনাশা নামে পরিচিত হইয়াছে।

যমুনা :

যমুনা ব্রহ্মপুত্রের নতুন প্রবাহ। এই প্রবাহ ময়মনসিংহ জেলার উত্তর পশ্চিম কোণে ব্রহ্মপুত্র হইতে বহির্গত হইয়া আসিয়া ঢাকা জেলার পশ্চিম সীমায় পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। পদ্মা ও যমুনার এই মিলন স্থানের নাম বাইশ কোদালিয়ার মোহনা। বর্ষার সময় এই মোহনা অতি ভীষণ আকার ধারণ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যমুনার উৎপত্তি হইয়াছে। যমুনার উৎপত্তি হইতে পদ্মার গতি পরিবর্তন—পদ্মার গতি পরিবর্তনে শ্রীপুর ধ্বংস ও কীর্তিনাশা নামের উৎপত্তি।

ধলেশ্বরী :

ধলেশ্বরী যমুনার একটি বৃহৎ শাখা। বর্তমান সময় ধলেশ্বরী যমুনার একটি শাখা বলিয়া পরিচিত হইলেও ইহা যমুনা অপেক্ষা অনেক প্রাচীনা। যমুনার উৎপত্তির পূর্বে ধলেশ্বরী করতোয়া ও আত্রাইর সম্মিলিত প্রবাহ হুরাসাগরের সহিত মিলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যমুনার উৎপত্তির পর হইতে করতোয়ার সহিত ধলেশ্বরীর সম্বন্ধ ছিন্ন হয় এবং ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিম দক্ষিণ কোণ হইতে যমুনার একটি শাখা আসিয়া ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়া ধলেশ্বরীকে যমুনার শাখারূপে পরিণত করিয়া তোলে। ধলেশ্বরী জেলার উত্তর পশ্চিম কোণ হইতে কোনাকোনিভাবে জেলার মধ্যভাগ দিয়া আসিয়া পূর্ব দক্ষিণ কোণে মেঘনায় পড়িয়াছে।

বুড়িগঙ্গা ও শাখাপ্রশাখা :

বুড়িগঙ্গা ধলেশ্বরীর একটি শাখা। সাভার থানার ৪ মাইল দক্ষিণে ধলেশ্বরী হইতে উৎপন্ন হইয়া নারায়ণগঞ্জের ৪ মাইল পশ্চিমে পুনরায় ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে। বুড়িগঙ্গা ২৬ মাইল দীর্ঘ। বুড়ি গঙ্গা এই ২৬ মাইল দীর্ঘ ও ৫/৬ মাইল প্রস্থ স্থানকে একটি দ্বীপাকারে পরিণত করিয়াছে। এই দ্বীপাকার ভূমি পাড়জোয়ার নামে পরিচিত। বুড়িগঙ্গা ক্রমে শুষ্ক হইয়া চড় পড়িয়া যাইতেছে। ১৮৮৭ সনে ঢাকায় কমিশনার লারমেনি সাহেব বুড়িগঙ্গার সংস্কার জন্য গভর্নমেন্টে রিপোর্ট করেন। তদনুসারে Mr. J. C. Verlannes Superintending Engineer এতৎ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে নিযুক্ত হন। স্বর্গীয় নবাব আছানউল্লা বাহাদুর ইহার সংস্কারকল্পে এক লক্ষ টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৮৯০ সনে বুড়িগঙ্গা সার্ভে হয়।

১৮৯৫-৯৬ সনে নবাব বাহাদুর বুড়িগঙ্গা সংস্কার জন্য ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড হস্তে ১৫০০০ টাকা প্রদান করেন।

ইছামতী ধলেশ্বরীর আর একটি শাখা—সাহেবগঞ্জের নিকট ধলেশ্বরী হইতে উৎপন্ন হইয়া মদনগঞ্জের পূর্বদিকে ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।

তুরাগ ময়মনসিংহ জেলা হইতে আসিয়া বুড়িগঙ্গায় পড়িয়াছে। টঙ্গী নদী তুরাগের শাখা।

বংশাই ব্রহ্মপুত্রের শাখা—ময়মনসিংহ জেলা হইতে আসিয়া সাভারের নিকট ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে। *[বর্তমান সংস্করণের ৭৫১ পৃঃ দেখুন]*

শীতললক্ষ্মীয়া :

লক্ষ্মীয়া বা শীতলক্ষ্যা ব্রহ্মপুত্রের শাখা। লক্ষ্মীয়া টোকচাঁদপুরের নিকট ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়া জেলার উত্তর সীমায় বানারের সহিত মিলিত হইয়াছে। অতঃপর দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া নারায়ণগঞ্জের দক্ষিণে ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে। লক্ষ্মীয়ার তীর অতি উচ্চ ও বৃক্ষরাজি সমাচ্ছন্ন। ইহার জল অতি নির্মল। এই জন্য এই স্বচ্ছ সলিলা স্রোতস্বতী শীতল লক্ষ্মী নামেও পরিচিতা।

বালু লক্ষ্মীয়ার উপনদী রূপগঞ্জ থানার দক্ষিণে লক্ষ্মীয়াতে পড়িয়াছে।

আড়িয়াল খাঁ বেলাবর নিকট ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া মেঘনায় পড়িয়াছে।

এই জেলার দক্ষিণ পূর্বভাগ ঢালু। এইজন্য এ জেলার নদী সমূহ ও দক্ষিণ পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়। বর্ষার সময় ঐ সকল স্থানে ১৪ হইতে ১৭ ফিট পর্যন্ত জল হইয়া থাকে। ১৮৯০ সনে ১৭ ফুট জল হইয়াছিল।

জোয়ার ভাটা :

ঢাকা জেলার নদী সমূহে জোয়ারভাটা লক্ষিত হয়। বুড়িগঙ্গায় ২½ ফিট পর্যন্ত জলের বৃদ্ধি ও হ্রাস লক্ষিত হইয়া থাকে।

খাল ও বিল

ঢাকা জেলায় অনেকগুলি খাল আছে। ইহার মধ্যে তালতলার খাল প্রসিদ্ধ। কথিত আছে এই খাল রাজনগরের রাজা রাজবল্লভ ঢাকা হইতে গমনাগমনের সুবিধার জন্য নিজ ব্যয়ে কর্তন করাইয়াছিলেন। ইহা তালতলার নিকট ধলেশ্বরী হইতে উৎপন্ন বহরের নিকট পদ্মায় পড়িয়াছে। শ্রীনগর খাল এবং ইলশামারী ধলেশ্বরী হইতে বহির্গত হইয়া পদ্মায় পড়িয়াছে।[১]

মেন্দিখালি ব্রহ্মপুত্র হইতে বহির্গত হইয়া মেঘনায় পড়িয়াছে। দোলাই খাল, বালু নদী হইতে আসিয়া বুড়িগঙ্গায় পড়িয়াছে। এই খাল ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে গভর্নমেন্ট ব্যয়ে কর্তিত হইয়াছিল। ১৮৬৭ সনের এপ্রিল হইতে এই খালের মাশুল ধার্য হয়।[২] ময়মনসিংহের মহাজনদের পক্ষে এই পথে মাল লইয়া যাওয়া সুবিধাজনক। ইহা অন্যান্য জলপথ অপেক্ষা ২২ মাইল সোজা। ১৮৩০ সনে সাধারণের চাঁদায় দোলাইর উপর লোহার ঝোলান সেতু প্রস্তুত করা হয়। ঐ সময় ওয়ালটার সাহেব ঢাকা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

১৮৮০ সনে পানিয়া খাল কাটান হয়।

ঢাকা জেলার কোন খালেই বর্ষা ব্যতীত নৌকা চলে না। এদিকে বর্ষায় জেলার দক্ষিণ ভাগ জলে প্লাবিত থাকে। এবং নদনদী খাল বিল একাকার হইয়া যায়।

এই জেলার উল্লেখযোগ্য কোন বিল নাই। বর্ষা অন্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিলের উদ্ভব হয় বটে, কিন্তু তাহা অচিরেই শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়া যায়। শ্রীনগরের উত্তরের আড়িয়ল বা চারণ

বিল অতি বৃহৎ ছিল। তাহা এখন শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ভাওয়ালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বিল আছে।

বন

জেলার উত্তর ভাগে বিস্তৃত অরণ্য। এই অরণ্যের পূর্বভাগ ভাওয়ালের গড় ও পশ্চিম ভাগ মধুপুর গড় নামে পরিচিত। মধুপুরের গড় উত্তরে করিবাড়ি ও দক্ষিণে বুড়িগঙ্গার তীর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বনের ভূমি লৌহ কঙ্করময় এবং স্থানে স্থানে লাল। বনভূমি সমভূমি হইতে স্থানে স্থানে ১০ ফিট হইতে ৬০ ফিট পর্যন্ত উচ্চ। এই গড়ের গজারী কাঠ ঘরের খুঁটি ও কয়লারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্বকালে এই বনে হাতির খেদা হইত এবং অনেক হাতি ধরা পড়িত। এখন এই অরণ্যে হাতি নাই। পুর্বে এই জঙ্গল হিংস্র জন্তু ও দস্যু তস্করের জন্য অতিশয় ভয়ানক ছিল। এখন ঐ সমস্ত ভয়ের কারণ দূর হইয়াছে।

গ্রাম

এই জেলায় মোট ৭২৬৫ খানা থানা গ্রাম ও নগর। ইহার এক খানায় ৫০ হাজার অধিক লোক বাস করে। একখানায় ২০ হাজারের অধিক, একখানায় ৫ হাজারের অধিক, ৯৫ খানা গ্রামে দুই হাজারের অধিক, ৩৪১ খানা গ্রামে এক হাজারের অধিক, ১০৬২ খানা গ্রামে ৫ শতের অধিক ও ৫৭৬৪ খানা গ্রামে ৫০০ শতের অপেক্ষা ন্যূন লোক বাস করে।

সদর মহকুমায় ২৬৪৮ খানা গ্রাম। কোতালী থানায় ১১ খানা—ঢাকা, ব্রাহ্মণ চিরান, চৌধুরী বাজার প্রভৃতি।

কেরানিগঞ্জ থানায় ৯২৮ খানা গ্রাম। কেরানিগঞ্জ, হাসলি, সুভাড্যা, তেঘরিয়া, কুণ্ডা, পশ্চিমদি, রোহিতপুর, শাক্তা, কলাতিয়া, মীরপুর, কুর্মীটোলা, ডেমরা, টঙ্গী, বোয়ালী, গাছা, জয়দেবপুর, রাজেন্দ্রপুর প্রভৃতি।

কাপাসিয়া থানায় ৫৫৫ খানা গ্রাম—কাপাসিয়া, লাখপুর, মামুদপুর, পারলিয়া, ঘরশাল, কালীগঞ্জ, ব্রাহ্মণগাঁও, বলধা, পুবাইল, বরিশার, উলুসারা, বক্সি, শ্রীপুর, কাওরাইদ, টোক চাঁদপুর ইত্যাদি।

নবাবগঞ্জ থানায় ৩০২ খানা গ্রাম—নবাবগঞ্জ, আগলা, মামাইল, চোরাইল, গোবিন্দপুর, দোহার, নারিয়া, মুকসুদপুর, কালীকাপুর, দেবীনগর, মামুদপুর, মৈনট, হোসেনাবাদ, কলাকোপা, নয়াবাড়ি, জয়কৃষ্ণপুর, দাউদপুর ইত্যাদি।

সাভার থানায় ৮৫২ খানা গ্রাম—সাভার, রাজফল রাড়ীয়া, তেঁতুল ঝোড়া, সোঙ্গর, রোয়াইল, অলকদিয়া, রঘুনাথপুর, সুয়াপুর, নান্নর, বালিশূর, শশুরা, কাটিগ্রাম, আমতা চৌহাট, যাদবপুর, বালিয়াদি, কালিয়াকৈর, আশুলিয়া, সিমুলিয়া, কাশিমপুর, বিরুলিয়া, ধামরাই, দেবতার পটি ইত্যাদি।

নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় ৭০৬ খানা গ্রাম

নারায়ণগঞ্জ থানায় ৭০৬ খানা—নারায়ণগঞ্জ, মদনগঞ্জ, ফতুল্যা, নবীগাঁও বা কদমরসুল, সোনারগাঁও, আমিনপুর, লাঙ্গলবন্দ, বৈদ্যের বাজার, বারপাড়া হরিহরপুর, আটী, বারদি, লক্ষ্মীবারদী, মুড়াপাড়া, রুকমি, দোপতারা, বানিয়াপাড়া প্রভৃতি।

রূপগঞ্জ থানায় ৮০১ খানা গ্রাম—রূপগঞ্জ, মাঝিনা, নোয়াগাঁও, সাবামপুর, পিতলগঞ্জ, পমি, ব্রাহ্মণকীর্তি, বিরাব, আড়াই হাজার, মনোহরদি, সুলতানসাহাদি, পাঁচদোনা, শিলামদ্দি, নরসিংদি, হোসেনকাটা, দাসপাড়া ইত্যাদি।

রায়পুরা থানার ৮৭১ খানা গ্রাম—রায়পুরা, আমিরাবাদ, রামনগর, মামদাবাদ, বেলাব,

গোতালিয়া, চাকলাকর, নরেন্দ্রপুর মনোহরদি, সিমুলিয়া, একদোয়ারিয়া, জয়নগর, পুঠিয়া, চক্রধা, শিবপুর ইত্যাদি।

মুন্সিগঞ্জ মহকুমায় ৯৭৮ খানা গ্রাম

মুন্সিগঞ্জ থানায় ৫৪৮ খানা—মুন্সিগঞ্জ, পঞ্চসার, কমলাঘাট, ফিরিঙ্গিবাজার, মীরকাদিম, রামপাল, বেতকা, পাইকপাড়া, কৈচাল, আউসসাহী, সোনারং, বজ্রযোগিনী, কেওর, ছলিমপুর, বালিগাঁও, পুড়াপাড়া, আড়িয়াল, সিমুলিয়া, রাউতভোগ, রাখিয়া কলমা, কালাদিয়া, পাঁচগাঁও, ভরারৈক, স্বর্ণগ্রাম, মূলচর, বিদগাঁও, গাউপাড়া, তেলিবাগ, বানুরী, হাসাইল, রাজাবাড়ি, বহর ঘোষের পুকুরপাড়, বলসিয়া ইত্যাদি।

শ্রীনগর থানায় ৪৩০ খানা গ্রাম—শ্রীনগর, শ্যামসিদ্ধি, মাঝপাড়া, ষোলঘর, বারৈখালি, শেখরনগর, রাজানগর, কুচিয়ামোরা, হাসারা, টোলবাসাইল, রশুনিয়া, কেরটখালি, তাজপুর, কোলা, সিরাজদি, চন্দনভোগ, ইছাপুর, সিয়ালদি, মালখানগর, মালকদিয়া, পশ্চিমপাড়া, মধ্যপাড়া, জৈনসার, আটপাড়া, রোষদি, কুকুটিয়া, বেলতিলি, খিদিরপাড়, বেজগাঁও, কনকসার, ব্রাহ্মণগাঁও, লৌহজং, হলদিয়া, কুমারভোগ, কউরহাটি, ভাগ্যকুল, বাঘরা, মেদিনীমণ্ডল, দোগাছি, কাটিয়াপাড়া ইত্যাদি।

মানিকগঞ্জ মহকুমার ১৬৪১ খানা গ্রাম

মানিকগঞ্জ থানায় ৫৯৪ খানা—মানিকগঞ্জ, জাগির, ধনকুড়া, সাতুরিয়া, বালিয়াটি, দড়গ্রাম, ছনকা, সিমুলিয়া, তিল্লি, উথলি, গড়পাড়া, বেতিলা, বনখুরা, নবগ্রাম, হাটিপাড়া, বলধরা, বায়রা, মিতরা, মও, আটিগ্রাম, সিঙ্গাইর, জায়মণ্ডপ, বান্দিয়ারা, চান্দহর প্রভৃতি।

ঘিওর থানায় ৫২৭ খানা গ্রাম—ঘিওর, পৈলা, মীরপুর, ধলসি, জাফরগঞ্জ, তেওতা, বরাদিয়া, উথুলি, শিবালয়, আরিচা, ইলিচপুর, বাজখাড়া, উলাইল, কর্নপুর, বুতুলি, বালিয়াজুরি, তরা প্রভৃতি।

হরিরামপুর থানায় ৩৪০ খানা গ্রাম—হরিরামপুর, লেছরাগঞ্জ, নটাখোলা, লক্ষ্মীকোল, কাঞ্চনাপুর, মালুচি, ঝিটকা, নালী, বয়রা, মানিকনগর, কালিকাপুর প্রভৃতি।

ঐতিহাসিক স্থান : ঢাকা জেলার ঐতিহাসিক স্থানগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই সকল গ্রামের প্রাচীন কীর্তির ভগ্নাবশেষগুলি ঢাকার প্রাচীন বিভবের ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দেয়।

ঢাকা—প্রাচীন মুসলমান রাজধানী।

মাধবপুর—যশপালের রাজধানী।

কাটিবাড়ি—হরিশচন্দ্র পালের রাজধানী।

ইদ্রিকপুর (মুন্সিগঞ্জ) মুসলমান দুর্গ।

বল্লালবাড়ি বা রামপাল সেন বংশীয় রাজাদিগের রাজধানী।

সোনারগাঁও প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান রাজধানী।

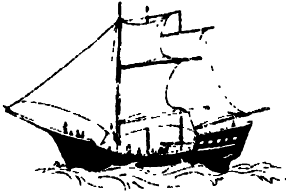
মুসলমান দুর্গ : ত্রিবেণী, একডালা, কলাগাছিয়া, হাজিগঞ্জ, দরদরিয়া, সোনাকান্দি, গণকপাড়া, গৌরীপাড়া প্রভৃতি।

রাজাবাড়ি—চাঁদরায় কেদার রায়ের নির্মিত মঠ।

---

১. অনেকদিন হইল গভর্নমেন্ট এই খালের সংস্কার জন্য প্রস্তাব করিয়া ছিলেন। এই খালে বরিশালবাসীদিগের নৌকা পথে ঢাকায় মাল আনিবার সুবিধা আছে। কীর্তিনাশা ঘুরিয়া যাওয়া অপেক্ষা এই রাস্তা ২০/২৫ মাইল সোজা।

২. পঞ্চাশ মন বা তদুর্দ্ধ বোঝাই নৌকার প্রতি মন মালে দুই আনা হিসাবে মাশুল ধার্য ছিল।



সপ্তম অধ্যায়

উৎপন্ন ও বাণিজ্য

ভূমি, ভূমির প্রকারভেদ, কৃষি, আবাদি ও অনাবাদি ভূমি, ফসল, ধান্য, পাট, অন্যান্য ফসল, খনি, বাণিজ্য উপযোগী হাটবাজার, মেলা, আমদানি রপ্তানি, আমদানি রপ্তানির তালিকা, ইতরপ্রাণী, গৃহপালিত পশুপক্ষী, বন্যপশু, পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি উদ্ভিদ। বস্ত্রশিল্প—মসলিন, মসলিনের বিভিন্ন নাম, কাসিদা, জামদানি, ছিট, মসলিনের ব্যবসায়, ব্যবসায়ে অধঃপতন, মসলিনের আড়ং, দাদনে অত্যাচার, অন্যান্য বস্ত্র, সোনা-রূপার কাজ, শঙ্খের কাজ, অন্যান্য শিল্প। ভূমির স্থানীয় মাপ, স্থানীয় ওজন ও পরিমাপ।

ভূমি :

এই জেলার ভূমি সাধারণত দুইভাগে বিভক্ত, পাহাড়িয়া বস্তি ও পয়বস্তি। জেলার উত্তর ভাগের জমি পাহাড়িয়া বস্তি—স্থানে স্থানে লৌহকঙ্করময় এবং স্থানে স্থানে আঠাল ও লাল বর্ণ। জেলার দক্ষিণ ভাগের ভূমি নিম্ন বা পয়বস্তি। এই সকল জমি বর্ষার সময় কোন কোন স্থানে দুই ফুট হইতে ১৪ ফুট পর্যন্ত জলের নিচে থাকে।

ভূমির প্রকারভেদ :

এই সকল জমি তিন প্রকারের। (১) উচ্চভূমি। (২) অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি ও (৩) জলাভূমি। উচ্চভূমিতে ধান, পাট, কার্পাস, ইক্ষু ও হৈমন্তিক ধান্য, শীতকালীয় ফসল, সরিষা, কলাই প্রভৃতি জন্মে। অপেক্ষাকৃত নিম্ন ভূমিতে রোয়া ধান অতি নিম্ন বা জলাভূমিতে বোরো ধান, আমন ধান ও আউস ধান প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে।

কৃষি :

এই জেলার ভূমি কৃষিকার্যের পক্ষে উপযোগী। মুসলমান শাসনকালে ভূমিতে প্রজা বা তালুকদারের উন্নতি ছিল না। তৎকালে এতদ্দেশের প্রায় $\frac{৩}{৪}$ ভূমি অনাবাদি ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে পর্যন্ত ভূমির এইরূপ দুরবস্থা ছিল। বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া গেলে গভর্নমেন্ট কৃষিকার্যের উন্নতিকল্পে দেশিয় কৃষকদিগকে 'তাগাবি' ও পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করিতে থাকেন। তাহারাও গভর্নমেন্ট হইতে অর্থ পাইয়া উৎসাহে কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত হয় ও বহু ভূমি আবাদ করিতে থাকে।

১৭৯৭ সনে এ জেলায় বিলাতি আলুর চাষ প্রথম প্রবর্তিত হয়। রেভেনিউ বোর্ড হইতে ঢাকার কালেক্টর নিকট বিলাতি আলুর বীজ আসিলে কালেক্টর গ্রামে গ্রামে তাহা বিতরণ করেন এবং বিজ্ঞাপনী প্রচার করিয়া কৃষকদিগকে বিলাতি আলুর চাষ করিতে বাধ্য করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই জেলায় নীলের চাষ আরম্ভ হয়। নীলের চাষ অতি অল্পকাল মধ্যেই বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

এই জেলায় অনেকদিন পূর্বে চার চাযের পরীক্ষা হয়। গনি মিঞা (তখন নবাব উপাধি প্রাপ্ত হন নাই) তাঁহার বেগম বাড়ির (বেগুনবাড়ি) বাগানের ও কালীনারায়ণ রায় (তখনও

রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন নাই) ভাওয়ালে চার চাষ করেন। বেগুনবাড়ির ৩০ বিঘা জমিতে কাছাড়ি বীজ দ্বারা পরীক্ষা হইয়াছিল। ভাওয়ালের জমিদার মাত্র এক একর জমিতে চার চাষ করিয়াছিলেন। তথায় ভাল ফল হয় নাই।

বিগত ১৯০১-১৯০২ সনে এ জেলার কত জমিতে কি ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আবাদ কাল	মোট জমি	
ধান্য	৯০১৭০০	একর
বার্লি	২২০০	,,
কলাই ও অন্যান্য	১০১২০০	,,
তিসি	৫১০০	,,
তিসি	১৩৮০০	,,
সরিষা	৯৪০০০	,,
অন্যান্য তৈলিক ফসল	৩৩৫০০	,,
মসলা, লঙ্কা, মরিচ ইত্যাদি	১৭৩০০	,,
ইক্ষু	১৯৯০০	,,
পাট	১৬৫০০	,,
তামাক	৯৫০০	,,
বাগানের ফসল-শাকসবজি	১৯৮০০	,,
অন্যান্য খাদ্য ফসল	৪৪২০০	,,
ফুলবাগান প্রভৃতি ও অখাদ্য গাছপালা	১০১০০	,,
মোট	১২০৮৮০০	,,

এই বার লক্ষ আট হাজার আট শত একর জমির ২২৮৫০০০ একর জমিতে দুই ফসল করা হইয়াছিল।

ঢাকা জেলার মোট জমি ঐ সময় ১৭৮০৪৩০ একর ছিল। এই জমির মধ্যে আবাদি জমি ব্যতীত ৪৯০০০ একর একেবারে আবাদের অযোগ্য ও ৮১৬৮০ একর আবাদের যোগ্য অবস্থাতেও পতিত ছিল।

১৯০৩-০৪ সনে এই জেলায় কত জমি আবাদি ও কত জমি অনাবাদি ছিল, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল।

বিভাগ	মোট জমি	আবাদি	আবাদের যোগ্য পতিত	অনাবাদি
সদর	১২৬৬ বর্গমাইল	৮০৮	৫০	৪০৮
নারায়ণগঞ্জ	৬৪১ ,,	৪২২	৩০	১৮৯
মুন্সিগঞ্জ	৩৮৬ ,,	২৭৩	২১	৯২
মানিকগঞ্জ	৪৮৯ ,,	৩৭৬	২৬	৮৭
মোট	২৭৮২ ,,	১৮৭৯	১২৭	৭৭৬

এই আবাদি জমির শতকরা ১৯ ভাগ জমিতে একাধিক ফসল উৎপন্ন করা হয়।

তালিকাদৃষ্টে দেখা যায় যে মোট জমির ও আবাদি জমির পরিমাণ সদরে সর্বাপেক্ষা অধিক ও মুন্সিগঞ্জ মহকুমায় সর্বাপেক্ষা কম। অনাবাদি জমির পরিমাণ ও সদর বিভাগে সর্বাপেক্ষা অধিক এবং মানিকগঞ্জে সর্বাপেক্ষা কম। মোটের উপর সদর বিভাগে $\frac{2}{3}$ অংশ আবাদি ও $\frac{1}{3}$ অংশ অনাবাদি রহিয়াছে। সদর মহকুমার অনাবাদি জমির পরিমাণ এতে অধিক

হইবার কারণ—ভাওয়ালের জঙ্গল। অন্যান্য স্থানের অনাবাদি জমি অধিকাংশ খাল, বিল, নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতিতে অধিকৃত রহিয়াছে।

এই আবাদি জমির কত ভূমিতে কি সকল উৎপন্ন হয় তাহা প্রদর্শিত হইল।

ধান্য	১৩৯০ বর্গমাইল
পাট	২৬৭ বর্গমাইল
কলাই	১৫৭ বর্গমাইল
সরিষা প্রভৃতি	১৪৬ বর্গমাইল
মোট	১৯৬০ বর্গমাইল[১]

এই জেলার প্রধান ফসল ধান্য। ১৩৯০ বর্গ মাইল জমিতে ধান্যের চাষ হয়। ধান সাধারণত তিন প্রকার (১) বোরো, (২) আউস, ও (৩) আমন। এই তিন প্রকার ধান্যকে যথাক্রমে বৈশাখী, শ্রাবণী (আশু) ও অগ্রহায়নী (হৈমন্তিক) ধান্য বলে।

ধান্য :

কৃষি বা চাষের প্রণালী প্রায় সর্বত্রই একরূপ। হৈমন্তিক ধান্য এই জেলায় দুই প্রকারের উৎপন্ন করা হয়। (১) নিম্ন জলমগ্ন স্থানে ধানের বীজ ছড়াইয়া বুনিলেই তাহা হইতে চারা হইয়া ধান হয়। এই ধানকে বাওয়া ধান বলে। বাওয়া মুন্সিগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ মহকুমায় প্রচুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ধান জলে হয়। জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধানের চারাও বড় হয়। এই চারা ২৪ ঘণ্টায় ১২ ইঞ্চি পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। হঠাৎ অত্যধিক জল হইয়া চারা ডুবাইয়া ফেলিলে ফসল ও চারা নষ্ট হইয়া যায়। ১২ ফিট জল যে মাঠে হয় সে স্থানেও এই ধানের বীজ বপন করা হয়। (২) জেলার উত্তর ও পূর্বভাগ হৈমন্তিক ধান্য হয়, হৈমন্তিক ধান প্রথম এক ক্ষেত্রে বপন করা হয়। ঐ ক্ষেত্রে চারা হইলে, ঐ চারা উঠাইয়া ক্ষেত্রান্তরে একটি একটি করিয়া পৃথক পৃথক রোপন করিতে হয়। এই রোপিত চারার উৎপন্ন ধানকে রোপ বা রোয়া ধান বলে। বোরো ধানও এইরূপ রোপন করিতে হয়। বোরো ধান তিন প্রকার—(১) বোরো, (২) লিপা বোরো ও সাইটা বোরো। উড়ি বা ঝড়া ধান নামক আর এক প্রকার ধান এবং চিনা কাওন প্রভৃতি বিল ও জলাভূমিতে উৎপন্ন হয়।

পাট :

ধানের পর প্রধান ফসল পাট। ১৮৭২/৭৩ সনে ঢাকার গভর্নমেন্ট হইতে পাটের চাষের জন্য Experimental Farm স্থাপিত হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে পাটের চাষে ২৬৭ বর্গ মাইল জমি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই জেলায় তিন প্রকার পাটের আমদানি হয়। (১) করিমগঞ্জী, (২) বাকেরাবাদী ও (৩) ভাটিয়াল। ত্রিশ বৎসর পূর্বে যে পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইত, এখন তাহার চতুর্গুণ জমিতে তাহার চাষ হইয়া থাকে। ১৮৫৫ সনে নারায়ণগঞ্জে পাটের মন ১ টাকা ৪ আনা ছিল। ঐ সনে নারায়ণগঞ্জে মাত্র ৭০ হাজার মন পাটের ১ কারবার হইয়াছিল এবং এই ৭০ হাজার মন পাটের কারবারই অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। ১৮৬৮ সনে পাটের মূল্য ২ টাকা ৮ আনা টাকা মন হয়। বর্তমান সময় ৭ টাকা ৮ আনা হইতে ১০ টাকা মন চলিতেছে। এখন প্রায় ৫০ হাজার টন পাট এ স্থান হইতে রপ্তানি হয়।

অন্যান্য ফসল :

কলাই, সরিষা, তিল প্রভৃতি লক্ষ্মীয়ার তীরে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। মীরকাদিনের পান প্রসিদ্ধ। রামপালের কলা অতি বৃহৎ ও সুস্বাদু। ইক্ষু, তামাক প্রভৃতি জেলার উত্তর ভাগে অল্পাধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। চেরাপুঞ্জির আলু কলাটিয়ার হাটের নিকট প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

পূর্বে এ জেলার উত্তরভগে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন হইত। সোনারগাঁও, কাপাসিয়া, টাক প্রভৃতি মেঘনা এবং ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী স্থানেও প্রচুর পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন হইত। ১৮৪৮ সনে ও তৎপরে এখানে আমেরিকান তুলার চাষের চেষ্টা হইয়াছিল। সে চেষ্টা সুফল প্রসব করে নাই। এখন ভাওয়ালে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে কার্পাসের চাষ হইতে পারে, সেই জন্য ভাওয়ালের রানি বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। নীল ও কুসুমফুলের চাষ এই জেলায় প্রচুর পরিমাণে হইত। কুসুমফুলের রঙ এর মূল্য মন প্রতি ১০ টাকা ছিল। ইহা সর্বত্র রপ্তানি হইত। বিলাতি এনিলিন রঙ প্রচলিত হওয়ার পর কুসুমফুলের রঙ এর মূল্য ১০০ টাকা হইতে ৩০ টাকায় নামিয়া যায়। ক্রমে ইহার চাষ ও জেলা হইতে উঠিয়া গিয়াছে। জেলার উত্তরভাগে অপর্যাপ্ত কাঁঠাল চাষ হয়। আম সামান্য পরিমাণে হইয়া থাকে। জাগিরহাটে প্রচুর তামাক পাওয়া যায়, ঐ তামাক রঙপুরী তামাক।

ঢাকায় প্রচুর সন উৎপন্ন হইত। ১৮০৬ সনে ঢাকার কমর্সিয়াল রেসিডেন্ট মাত্র ৭০ হাজার মন সন ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী জেলা হইতে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮০৮ সনে গভর্নমেন্ট ঢাকা জেলার কৃষকদিগকে সনের চাষ করিতে অনুরোধ করেন। এরপর ঢাকায় প্রচুর সনের চাষ হইয়াছিল।

মরিচ, হরিদ্রা, আদা প্রভৃতি সোনারগাঁও ও বিক্রমপুরে অধিক উৎপন্ন হয়। জেলার দক্ষিণভাগে নারিকেল পাওয়া যায়। ভাওয়াল পরগণায় পূর্বে সনবানিয়া নারিকেল প্রচুর হইত। এই নারিকেল হুক্কার খোল প্রস্তুত হয়। ঢাকায় বিলাতি শাকসবজি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। জলাভূমিতে মাখনা পাওয়া যায়। মধু ও মোম ভাওয়ালে পাওয়া যায়।

খনি :

বর্তমান সময় এ জেলায় কোন খনি দেখা যায় না। আকবর সাহের রাজত্ব সময় এই প্রদেশে লৌহখনি ছিল। ভাওয়াল ও মধুপুরের গড়ের স্থানে স্থানে প্রচুর পরিমাণে লৌহচুর্ণ পাওয়া যায়। ১৮৭৭ সনে দীননাথ সেন মধুপুরের বনভূমি পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন, এই স্থানে লৌহখনি আবিষ্কৃত হইতে পারে। দীননাথ বাবুর মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়া গভর্নমেন্ট স্থান পরিদর্শন জন্য রাসায়নিক পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। গভর্নমেন্টের নিযুক্ত রাসায়নিক পরীক্ষক ও দীননাথ বাবুর মতের সমর্থন করেন। বেলাবর নিকট ২/৩টি লৌহ স্তূপ আছে।

বাণিজ্যোপযোগী হাট বাজার :

নিম্নলিখিত স্থানগুলি এ জেলার বাণিজ্যোপযোগী প্রধান হাট বাজার বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সদরবিভাগে—সদর, মীরপুর, সাভার, ধামরাই, ডেমরা, পলাস, ভাড়ারিয়া, বক্ষি, টেকচাঁদপুর, কলাকোপা, গালিমপুর প্রভৃতি।

নারায়ণগঞ্জ, মহকুমায়—নারায়ণগঞ্জ, মদনগঞ্জ, বৈদ্যেরবাজার, হাজিগঞ্জ, রূপগঞ্জ, মুন্সিরহাট, নরসিংদি রায়পুরা, বেলাব প্রভৃতি।

মুন্সিগঞ্জ মহকুমায়—মুন্সিগঞ্জ, মীরকাদিম, লৌহজঙ্গ, ভাগ্যকুল, বহর, হাসারা, শ্রীনগর, ষোলঘর হলদিয়া প্রভৃতি।

মানিকগঞ্জ মহকুমায়—মানিকগঞ্জ, জাগীরহাট, তেওতা, জাফরগঞ্জ প্রভৃতি।

মেলা :

এ জেলায় অনেকগুলি সাময়িক মেলা হয়। তন্মধ্যে মুন্সিগঞ্জের নিকট বারুনীর মেলা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই মেলা ধলেশ্বরীর দক্ষিণ তীরে জমিয়া থাকে। পূর্বে এই মেলা কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া তিন সপ্তাহকাল স্থায়ী হইত। এখন অগ্রহায়ণ অথবা পৌষ মাসে আরম্ভ হইয়া ফাল্গুন মাস পর্যন্ত থাকে। এই মেলা হইতে চতুঃপার্শ্ববর্তী জেলা সমূহের ব্যবসায়ীগণও মালপত্র ক্রয় করিয়া নিয়া থাকে। অনেক ব্যবসায়ী বৎসরের মালও

এই মেলা হইতে ক্রয় করিয়া থাকে। এত বড় মেলা এতৎপ্রদেশে আর নাই। এই মেলা প্রায় সহস্রাধিক দোকান খোলা হয় এবং ৩০ হইতে ৫০ লক্ষ টাকার মাল বিক্রয় হয়। মেলার সময় প্রচুর চোর, জুয়াচোর ও গাঁইটকাটার আমদানি হয়। ইহাদিগের দমনের জন্য মেলার সময় মেলাস্থানে বিশেষ পুলিশ পাহারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মেলায় লক্ষাধিক লোক ও ২০/২৫ হাজার নৌকা উপস্থিত হইয়া থাকে।

কার্তিক বারুণীর পর লাঙ্গলবন্ধের ও পঞ্চমীঘাটের অশোক অষ্টমী মেলা। অশোক দিন ব্রহ্মপুত্রে স্নানের জন্য লাঙ্গলবন্ধে বহু দূরবর্তী স্থান হইতে বহু যাত্রিক আসিয়া থাকে। এই যাত্রিক সমাগম উপলক্ষে ব্রহ্মপুত্রের তীরে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ মেলা জমিয়া থাকে। এই মেলা সমূহের মধ্যে লাঙ্গলবন্ধের মেলা সর্বশ্রেষ্ঠ। এই মেলা হতে ২।৩ দিন মাত্র স্থায়ী হয় এবং গড়ে তাহাতে প্রায় ২৫০০ লোক উপস্থিত হইয়া থাকে। এরপর মানিকগঞ্জের দোল মেলা ও ধামরাইর রথ মেলা যথাক্রমে দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে ও রথপূর্ণিমা উপলক্ষে আরম্ভ হইয়া ১০।১৫ দিন স্থায়ী হয়। লৌহজঙ্গে ঝুলন মেলা হয়। চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে স্থানে স্থানে চড়ক ও নীল পূজার মেলা হইয়া থাকে। শিবরাত্রির সময় মানিকগঞ্জে মেলা হয়। জন্মাষ্ঠমী উপলক্ষে ঢাকায় বিশেষভাবে মেলা না জমিলেও বহু লোকের সমাগত হয় এবং বহু জিনিস ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে।

১৮৬৪ সনে ঢাকায় কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী হইয়াছিল।

১৮৭৭ সনের ১ জানুয়ারী হইতে মহারানি ভারতেশ্বরীর উপাধি গ্রহণ স্মরণার্থে বৎসর বৎসর ঢাকায় শিল্প প্রদর্শনী হইত। স্বর্গীয় নবাব আছানউল্লা বাহাদুর মেলার ব্যয়ভার বহন করিতেন।

আমদানি-রপ্তানি :

উল্লিখিত হাটবাজারগুলি হইতে প্রতি বৎসর বহু পরিমাণে পাট রপ্তানি হইয়া থাকে। বর্তমান সময় রপ্তানি জিনিসের মধ্যে পাটই সর্বাপেক্ষা প্রধান।

নারায়ণগঞ্জ, মদনগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও পদ্মার তীরবর্তী , বড় বড় বাজারগুলি এ জেলার প্রধান আমদানি রপ্তানির স্থান। চট্টগ্রামের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ থাকায় ১৮৭৯-৮০ সনে নারায়ণগঞ্জ Sea Custom Act অনুসারে স্বাধীন বন্দর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল।[২] নারায়ণগঞ্জের ন্যায় কারবারের স্থান পূর্ববঙ্গে আর নাই। নারায়ণগঞ্জে এবং উপযুক্ত স্থান সমূহে আসাম, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ হইতে পাট, যশোহর, তারপুর ও গাজিপুর হইতে চিনি, শ্রীহট্ট হইতে চুন, কমলা ও কমলা মধু, আসাম এবং রংপুর হইতে কাষ্ঠ, রংপুর ও পূর্ণিয়া হইতে তামাক, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও আরাকান হইতে কার্পাস, ত্রিপুরা হইতে সুপারি মরিচ, দক্ষিণ হইতে নারিকেল, ময়মনসিংহ হইতে চামড়া, পনির,[৩] আবির, ব্রহ্মদেশ হইতে সেগুন কাষ্ঠ, হস্তীদন্ত, গোলমরিচ, মোম, কেরোসিন তৈল ও চাউল, আসাম হইতে এন্ডি, তসর ও মুগার কাপড়, পাটনা হইতে নানাবিধ কলাই, বাকরগঞ্জ হইতে বালাম চাউল, কলিকাতা হইতে নানাপ্রকার মনোহারী জিনিস, মদ, কেরোসিন তৈল, স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, লোহা, চাউল, চিনি ব্যবহারের জিনিস—ছাতা, জুতা, কাপড়, সুতা ইত্যাদি, লঙ্কাদ্বীপ ও মালাবার হইতে শঙ্খ প্রভৃতি আমদানি হইয়া থকে।

পাট, চামড়া, ঢাকাই বাংলা সাবান, শাঁখা ও রৌপ্যালঙ্কার, পনির বাসনপত্র, ঢাকাই বস্ত্র প্রভৃতি এ জেলা হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। মানিগঞ্জ নারয়ণগঞ্জ ও মীরকাদিমে ভাল তৈল প্রস্তুত হয়।

মীরকাদিমের পান পার্শ্ববর্তী জেলা সমূহে রপ্তানি হইয়া থাকে। সুপারি এ জেলা হইতে আসাম ও ব্রহ্মদেশে রপ্তানি হয়।

ভাওয়ালের গড় হইতে প্রতি বৎসর বহু পরিমাণে গজারি কাষ্ঠ বাহির হইয়া থাকে। ঐ সকল কাষ্ঠ ব্রহ্মির ঘাটে ও অন্যান্য স্থানে বিক্রয় হইয়া থাকে। ব্রহ্মি লক্ষ্মীয়ার তীরে অবস্থিত।

নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের আমদানি ও রপ্তানির হিসাবে গড়ে আমদানি দ্রব্যের পরিমান অধিক।

৩০।৪০ বৎসর পূর্বে চাউল আমদানির প্রয়োজন হইত না। এখন প্রতিবৎসর প্রচুর পরিমানে চাউল আমদানি হইয়া থাকে। এই চাউল আমদানি এখন সময়ের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

আমদানি রপ্তানির তালিকা :

গত বৎসর (১৯০৮-০৯) এই জেলা হইতে চট্টগ্রাম, পূর্ববঙ্গ ও আসামের পূর্বভাগ, কলিকাতা ও অন্যান্য জেলার কোন কোন জিনিস কত মন রপ্তানি হইয়াছে, তাহার এবং ঐ সকল স্থান হইতে এই জেলায় কোন কোন জিনিস কত মন আমদানি হইয়াছে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

দ্রব্য	চট্টগ্রাম	পূর্বদিক	কলিকাতা	অন্যান্য স্থান	মোট
কয়লা রপ্তানি	—	—	১২১৪	—	১২১৮
কয়লা আমদানি	—	—	১৯৬০৪০৭	—	১৯৬০৪০৭
তুলা-রপ্তানি	—	১২০	২৭২০৮	—	২৭৩২৮
তুলা-আমদানি	১২৫৩৫	৯৬৭৫	১১৯২	—	২৩৪০২
বিলাতিসুতা-আমদানি	২১	—	২৪৯৫৭	—	২৮৯৭৮
দেশিসুতা-আমদানি	—	—	৫৫৩৭	—	৫৫৩৭
দেশিসুতা-রপ্তানি	—	১১১	৫৭	—	১৬৮
বিলাতিবস্ত্র রপ্তানি	—	১০০৫	—	১	১০০৬
বিলাতিবস্ত্র আমদানি	—	—	৯৩৬৫৪	৫২	৯৩৭০৬
দেশিবস্ত্র রপ্তানি	—	২৭০০	৬	—	২৭০৬
দেশিবস্ত্র আমদানি	১০৭৬	২০২৬	৩৬৬৭৮	১৯৮	৩৯৯৭৮
ধান্য রপ্তানি	—	১১৫০	২১২	২০২	১৫৬৪
ধান্য আমদানি	৭০	৩৮৯২	৬৫৫৪	১০৮৩	১১৫৯৯
চাউল রপ্তানি	—	২৪০৬৬৪	১৩৮৭৮	২৮৭	২৫৪৮২৯
চাউল আমদানি	৬০৮৮	৫৪৫৫০	৪২৮২৫	৩৩৯	১০৩৮০২
চামড়া রপ্তানি	—	৩৯	৮৩৩৪২	—	৮৩৩৮১
চামড়া আমদানি	১৭০১	১৬৮০৬	৩৫	৩৮	১৮১৮০
ভেড়া প্রভৃতির চামড়া রপ্তানি	—	৩৮	৭২৯০	—	৭৩২৮
ভেড়া প্রভৃতির চামড়া আমদানি	১০৯	২৩৪৬	২৫৪	—	২৭০৯
পাট রপ্তানি	৪৭৫৬২০	৮০	৩৪৭৫২৮১	৪৬২৫৭৮	৪৪১৩৫৫৯
পাট আমদানি	—	৭২৩০০১	২৩৯	২৭	৭২৩২৬৭
লৌহ ও লৌহ সামগ্রী রপ্তানি	১০৫	১৯১৫৬	৬৫০	২১২	২০১২৩
লৌহ ও লৌহ সামগ্রী আমদানি	৫৪২৩	১৪৩২	৩২৮৩৭৪	৫৮৮	৩৩৫৮১৭
কেরোসিন তৈল রপ্তানি	—	৭৫	—	২৫৬৫	২৬৪০

কেরোসিন তৈল আমদানি	—	১৩৭০৫	—	—	১৩৭০৫
চুনা ও পাথর					
চুন আমদানি	—	১০৪৫৭	—	১৯৮	১০৬৫৫
তৈল রপ্তানি	—	৭৬৩	১০২	—	৮৬৫
তৈল আমদানি	—	৬৯	৬১৪১৪	—	৬১৪৮৩
তিল, সরিষা রপ্তানি	১১৪৭	৪৯৯	—	১০৭২০	১২৩৬৬
তিল, সরিষা আমদানি	—	২২৬১২	৬২১	—	২৩২৩৩
লবণ রপ্তানি	—	৭২৭২	—	—	৭২৭২
লবণ আমদানি	—	—	৫১০৩১২	—	৫১০৩১২
সুপারি রপ্তানি	—	২৭২৮৪	৩৩৭৩৫	২১	৬১০৪০
সুপারি আমদানি	৬৪	১৭৪৭	৯৭৭৬৯	—	৯৯৫৮০
চিনি রপ্তানি (পরিষ্কৃত)	—	৯৭০১	২২	—	৯৭২৩
চিনি আমদানি (পরিষ্কৃত)	—	—	১৬০১৯৩	৪৯	১৬০২৪২
চিনি আমদানি অপরিষ্কৃত	—	২২২	১৩৪৯২৫	৬০২০	১৪১১৬৭
চিনি রপ্তানি অপরিষ্কৃত	—	১০৩১৯	—	—	১০৩২৯
ভারতীয় চা রপ্তানি	—	—	—	—	—
ভারতীয় চা আমদানি	—	১১	৪১৬	—	৪২৭
তামাক রপ্তানি	—	২২৬৫	১৩০	—	২৩৯৫
তামাক আমদানি	৯৭	৫৬৪০	২৬৮২	৩২২৯	১১৬৪৮

মোট রপ্তানি দ্রব্য	৪৯২০১২২/মন
মোট আমদানি দ্রব্য	৪৩৭৫৮১৮/মন

রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে পাট, তুলা, চাউল ও চামড়ার পরিমাণ আমদানি দ্রব্য অপেক্ষা অধিক। অন্যান্য যাবতীয় দ্রব্যের আমদানি পরিমাণ অধিক।

[illegible] কি কি জিনিস কত আমদানি হইয়াছে ও প্রধান প্রধান কি কি জিনিস কত এই জেলা হইতে কালকাতায় রপ্তান হহয়াছে, তাহার তালকা প্রদত্ত হহল।

প্রধান প্রধান রপ্তানি জিনিস

চাউল	৩০৩৭২ মন
ধান	২২৫ মন
যব গম প্রভৃতি	২৭২৪ মন
কলাই ডাল প্রভৃতি	১৩৮৭ মন
পাট	৩২০১৭৭৯ মন
ছোলা	৫৭০৯০ টা
তিল ও তিসি	১৫১৫৫ মন
সরিষা	৭২২০ মন
ভারতীয় চা	৭ মন
কার্পাস	৩২৬৭২ মন
নীল	২ মন
চিনি	১৪৪ মন
তামাক	১২৬ মন

প্রধান প্রধান আমদানি জিনিস

কাপার্স বস্ত্র (বিলাতি)	৬৬২৮১৫২ মন
কাপার্স বস্ত্র (দেশি)	৪৮০১ মন
সুতা (বিলাতি)	২৭৫৫৫ মন
সুতা (দেশি)	৭৪৭ মন
লবন	৫৮৬৪৮৩ মন
কেরোসিন তৈল	২৯৩৩৯৯ মন
ছালা	১৩৮১৫৫ টা

শিল্প

বস্ত্রশিল্প, রৌপ্যালঙ্কারের কারুকার্য এবং শঙ্খ নির্মাণ নৈপুণ্যের জন্য ঢাকা সুপ্রসিদ্ধ।

বস্ত্রশিল্প-মসলিন :

ঢাকার-বস্ত্রশিল্প একদিন জগতের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঢাকার সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র ইউরোপের গৃহে গৃহে অতিআদরের সহিত গৃহীত হইত। ধনী মহিলাগণ মসলিনের সুচিক্কন পোষাকে তাঁহাদের পরিচ্ছদে-ভূষিত-অঙ্গ আপাদমস্তক ঢাকিয়া ভ্রমণ করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। ঢাকাই মসলিনের শিল্প নৈপুণ্য এত সূক্ষ্ম হয় শুনিয়ে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। ভ্রমণকারী ট্রাভার্নিয়ার লিখিয়াছেন পারস্যের দূত মহম্মদ আলি বেগ ভারতবর্ষ হইতে প্রতিগমন কালে পারস্যের শাহকে উপহার প্রদান জন্য ৬০ হাত দীর্ঘ একখানী মসলিন একটি অতি ক্ষুদ্র নারিকেলের খোলের ভিতর করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ১ গজ প্রস্থ ২০ হাত লম্বা একখানা মসলিন জড়াইয়া একটি অঙ্গুরীর ছিদ্র দ্বারা এদিক ওদিক নেওয়া যাইত। এইরূপ ৩০ হাত দীর্ঘ ২ হাত প্রস্থ এক খণ্ড মসলিন ওজনে ৪।৫ তোলা হইত এবং তাহা ৪০০্‌। ৫০০্‌ টাকা বিক্রয় হইত। নুরজাহান বেগম ঢাকাই মসলিনের প্রভূত আদর করিতেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রিয়তমা পত্নির জন্য অগণিত অর্থ ঢাকাই মসলিনের জন্য ব্যয় করিতেন। এরপর শাহাজাহান ও ঔরঙ্গজেব ঢাকাই মসলিন দিল্লির অন্তপুরে একচেটিয়া করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং যাহাতে মসলিন ভারতবর্ষ হইতে বাহির হইয়া না যাইতে পারে, তাহার জন্য রাজকীয় আদেশ ও প্রচার করিয়াছিলেন।

মসলিনের ভিন্ন ভিন্ন নাম :

ঢাকাই মসলিন বিভিন্ন নামে পরিচিত হইত। যথা— সঙ্গতি, সরবতি, ঝুনা, আবরুয়া, সরকার আলি, সব্‌নম্‌, মলমল খাস, রং, বদনখাসা, আলবল্লা, তনজেব, তরন্দাম, নয়নসুখ, সরকন্দ, ইত্যাদি। এক সকল নামের অবশ্যই বিশেষ বিশেষ অর্থ আছে।

আবরুয়া জলে ফেলিলে জলের সহিত মিশিয়া থাকে। জল হইতে না তুলিলে কাপড় বলিয়া বুঝা সুকঠিন। সব্‌নম্‌ ঘাসের উপর রাখিলে শিশির পাতে ঘাসের সহিত মিশিয়া যায় এবং ঘাস বলিয়া ভ্রম হয়। এতৎ সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। একদা নবাব আলিবর্দী খাঁ পরীক্ষাচ্ছলে একখান সব্‌নম্‌ বস্ত্র ধুইয়া ঘাসের উপর মেলিয়া রাখিয়াছিলেন, একটা গরু ঘাস খাইতে খাইতে ক্রমে সেই বহুমূল্য বস্ত্রখানা ও উদরস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল।

কাসিদা :

ঢাকার বুটা তোলা মসলিন কাসিদা নামে পরিচিত। কাসিদা এক সময় আরব দেশিয় বণিকগণ কর্তৃক পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে নীত হইত এবং তদ্দেশীয় সৈনিক পুরুষদিগের পাগড়ি রূপে ব্যবহৃত হইত। কাসিদা প্রায় ৫০।৬০ প্রকারের প্রস্তুত হইত এবং বিভিন্ন নামে পরিচিত

ছিল। কাসিদা রেশম মিশ্রিত। নবাবি আমলে এক একখানা রেশমী কাসিদা ৪।৫ শত টাকার বিক্রয় হইত। কেবল সূতা দ্বারা যে কাসিদা প্রস্তুত হয়, তাহা "চিকন" নামে অবিহিত হয়। ১৮৪০ সনে কাসিদার মূল্য ৫০ হইতে ৮০ ছিল। তখন অবশ্য নবাবী আমলের ন্যায় উৎকৃষ্ট কাসিদা প্রস্তুত হইত না। ঐ সনেও (১৮৪০) ১২০০০০ খণ্ড কাসিদা বস্ত্র ঢাকা হইতে রপ্তানি হইয়াছিল। এর পঞ্চাশ বৎসর পর ১৮৯৫ সনেও ৯০০০০ টাকার কাসিদা ঢাকা হইতে রপ্তানি হইয়াছিল এবং তৎপরবর্তী বৎসর ২৫০০০০ টাকার মাল আরব দেশে রপ্তানি হয়। বর্তমান সময় ঢাকা হইতে প্রায় দুই লক্ষ টাকার কাসিদা বস্ত্র বৎসর রপ্তানি হইয়া থাকে। এখন এক একখানা কাসিদার মূল্য ৮ হইতে ৫০ টাকা। কাসিদার শহরের উপকণ্ঠের সানেরা, বিলিশ্বর, মাতাইল, দাগর প্রভৃতি স্থানের মুসলমান স্ত্রীলোকেরা করিয়া থাকেন।

জামদানি :

বিচিত্র কারুকার্য খচিত মসলিনের নাম জামদানি। জামদানিও বিভিন্ন প্রকারের প্রস্তুত হইত। যথা— কারেলা, তোড়াদার, বুটীদার, তেরেছা, জলবার পান্নাহাজরা, ছাওয়াল, দুবলী জাল, মেল ইত্যাদি। এক একখানা জামদানি ২৫০ হইতে ৪৫০ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইত।[৪] এখন ২০০ মূল্যের কয়েকখানা বস্ত্র মাত্র প্রতি বৎসর ত্রিপুরার মহারাজ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে ৪০০ টাকা মূল্যের জামদানি ও প্রস্তুত হয়।[৫] ১৮৮৪ সনে ৩৫০০০ টাকার, ১৮৮৬ সনে ৪৫০০০ টাকার, ১৮৮৭ সনে ২৮৭০০০ টাকার বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল।

এখন প্রতি বৎসর দুই লক্ষ টাকার অধিক এই বস্ত্র প্রস্তুত হয় না। নাভি, ডেমরা, সিদ্ধিগঞ্জ, কাচপুর, ধামরাই প্রভৃতি স্থানেও জামদানি হয়। ঐ সকল স্থানের বস্ত্র শহরে প্রস্তুত বস্ত্র অপেক্ষা স্বল্প মূল্যে বিক্রি হইয়া থাকে।

ছিট :

মসলিনের নানা রকম ছিটও প্রস্তুত হইত। ঐ সকল ছিট নন্দনসাহি, আনারদানা, কাবাতার খোপ, সাকুতা, পাদাদার কুণ্ডিদার প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল।

মসলিনের ব্যবসায় :

১৬৬৬-৭০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাই মসলিন সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডে পরিচিত হয়। সেই সময় হইতে ফরাসি, ইংরেজ ও দিনেমারগণ ঢাকার কুঠি স্থাপন করিয়া মসলিনের ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। ঢাকার সেই উন্নত সময় ঢাকা হইতে বৎসর ক্রোড় টাকার মসলিন কেবল ইয়োরোপেই রপ্তানি হইত। এতদ্ব্যতীত দিল্লির বাদশাহ ও বেগমদিগের জন্য এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শাসনকর্তা ও আমীর উমরাওগণের জন্য প্রচুর পরিমাণে ঢাকাই মসলিন প্রস্তুত হইত। ১৭৮৭ সন পর্যন্ত ইয়োরোপে অন্যান্য স্থানে এইরূপ সমভাবে মসলিনের ব্যবসা চলিয়াছিল। ইহার পর হইতে ঢাকাই বস্ত্র শিল্পের অধঃপতনের সূচনা হয়।

ব্যবসার অধঃপতন :

১৭৮৫ সনে কলের সূতার আমদানি হয়। এই সূতার আমদানির সঙ্গে সঙ্গে মসলিনের বাজারও মন্দা পড়িয়া যায়। ঐ বৎসর মাত্র ৫ লক্ষ খানা বস্ত্র ইংলণ্ডে রপ্তানি হয়। ১৮০০ সনে কোন কোন ভারতীয় বস্ত্র ইংলণ্ডে রপ্তানি হইবার নিষেধ আজ্ঞা প্রচারিত হয় এবং ১৮০১ সনে ঢাকাই মসলিনের উপর শতকার ১৫ টাকা শুল্ক নির্ধারিত হয়। এইরূপ অবস্থায় ১৮০৭ সনে মাত্র ৮½ লক্ষ টাকার মসলিন বস্ত্র ইয়োরোপে রপ্তানি হয় এবং ১৮১৩ সানে ৩½ লক্ষ টাকার মসলিন বস্ত্র ইউয়োরোপে হয়। ইহার পর ১৮৭৭ সনে ঢাকার ইংরেজ বাণিজ্য কুঠি উঠিয়া গেলে, ঢাকাই বস্ত্রের রপ্তানি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। ১৮২১ সনে বিলাতি চিকন সূতার আমদানি হইতে আরম্ভ হইলে দেশি সূতাও অচল হইয়া পড়ে। ১৮২৫ সনে

মিঃ হাসকিসেন বস্ত্রের মাশুল ১০্ দশ টাকায় হ্রাস করিয়া দেন। কিন্তু এ অসাময়িক অনুগ্রহ, ঢাকার বস্ত্র শিল্পের আর উন্নতি করিতে পারিল না।[৫] অবশেষে ১৮২৮ সন হইতে বিলাতি সূতায় মসলিন প্রস্তুত হইতে লাগিল।

এই অধঃপতনের পরেও ঢাকায় বৎসরে প্রায় বিশ হাজার খণ্ড মসলিন প্রস্তুত হইত। টেলর সাহেব লিখিয়াছেন ঐ সময় (১৮৩৮ খ্রিঃ) একখানা ৯ তোলা (১৬০০ গ্রেন) ওজনের মসলিন ১০ পাউণ্ড (তখনকার ১০০্ টাকা) পর্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। ১৮৯০সনে কলিন্স সাহেব লিখিয়াছেন, "যাহারা বিলাতি সূতায় সাধারণ রকম মসলিন প্রস্তুত করিতে পারেন, ঢাকাতে এখনও এইরূপ ৫০০ ঘর-ব্যবসায়ী আছে এবং ২।১টি পরিবারে এখনও সেই সুপ্রসিদ্ধ ঢাকাই মসলিনই প্রস্তুত করিতে পারে।" ঢাকার কমিশনার পিকক সাহেব তাঁহার বার্ষিক বিবরণীতে লিখিয়াছেন "১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে নবাব আবদুলগনি বাহাদুর প্রিন্স অব-ওয়েলস্‌কে। উপহার দেওয়ার জন্য যে তিনখানা মসলিন প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, সেই তিনখানা সর্ববিষয়ে প্রাচীন সূক্ষ্ম শিল্পের আদর্শানুরূপ হইয়াছিল। এই তিনখানার ওজন ৯½ তোলা মাত্র হইয়াছিল। আকারে এক-একখানা ২০ গজ লম্বা ও ১ গজ প্রস্থ ছিল।" মিঃ গুপ্তের রিপোর্ট হইতে অবগত হওয়া যায় উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইলে এখনও এইরূপ বস্ত্র ঢাকায় প্রস্তুত হইতে পারে।

এখনও ঢাকার মসলিন আফগানিস্থান, পারস্য, আরব ও তুরস্কে রপ্তানি হইয়া থাকে। তুরস্কে পূর্বে প্রচুর পরিমাণে মসলিন রপ্তানি হইত। রোম-তুরস্কের যুদ্ধের পর তুরস্কের রপ্তানিও অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। ১৮৭৯-৮০ সনে ৮০ হাজার টাকার মসলিন বিক্রয় হইয়াছিল, এরপর ক্রমে কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৮৮১ সনে ২০০০০্ টাকার মসলিন প্রস্তুত হয়। ইহার অর্ধেক বিক্রয় হয়, অর্ধেক অবিক্রীত থাকে। পর বৎসর ১৮৮২ সনে ২৫০০০্ টাকার মসলিন বিক্রয় হয়। ১৮৮৩ সনে মাত্র এক হাজার টাকার এবং ১৮৮৪ সনে পাঁচ হাজার টাকার মসলিন প্রস্তুত হয়। এরপর বৎসর নেপালে ১৫২৮০্ টাকার মসলিন নীত হয়। ১৮৮৬ সনে বিক্রি আরও কিছু বৃদ্ধি হয়। ঐ সনে ২৭০০০ টাকার মসলিন বিক্রয় হয়। তারপর ক্রমে রপ্তানি হ্রাস হইয়া গিয়াছে।

মসলিনের আড়ৎ :

ঢাকাই মসলিন বলিয়া যাহা পরিচিত ছিল, তাহা যে কেবল ঢাকাতেই প্রস্তুত হইত তাহা নহে। ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে মসলিন প্রস্তুতের আড়ৎ ছিল। ঢাকার জেলার মধ্যে সোনারগাঁও, ডেমরা, তীতবন্দি, কাপাসিয়া, বাজিতপুর, মুড়াপাড়া, জঙ্গলবাড়ি, কাটাখালি, আবদুল্লাপুর, কলাকোপা, জালালপুর প্রভৃতি স্থানে কার্পাস শিল্পের আড়ৎ ছিল। ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভ্রমণকারী রলফ্‌ফিচ্ সোনারগাঁর মসলিনের আড়ৎ দর্শন করেন। জঙ্গলবাড়ি ও বাজিতপুর এখন ময়মনসিংহ জেলার অধীন। বাজিতপুর মেঘনার পশ্চিমতীরে অবস্থিত। এইখানেই (বাজিতপুরে) প্রকৃত মলমলখাস প্রস্তুত হইত। এই মলমলখাস কেবল দিল্লির খাস মহলের বেগমদিগের জন্যই প্রস্তুত হইত। মলমলখাসের উৎকৃষ্ট ফোটী কাপাস কাপাসহাটি নামক স্থানে উৎপন্ন হইত। এই কাপাসহাটি "মলমলখাস" নামে পরিচিত ছিল।

দাদনে অত্যাচার :

দিল্লির বাদশাহের বস্ত্র সরবরাহের জন্য তাঁতিরা নিষ্কর তালুক পাইত এবং বিদেশে রপ্তানির জন্য বিদেশীয় বণিকদিগের নিকট হইতে অগ্রিম দাদন পাইত। অনেক সময় এই দাদন লইয়া তাঁতিদিগের উপর অযথা অত্যাচার হইত। অনেক ব্যবসায়ী ও রাজকর্মচারী ৫০০্ টাকার মালের জন্য ১০০্ টাকার মাত্র মূল্য প্রদান করিতেন। অথবা এইরূপ দাদন গচ্ছিত রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁতিরা দাদন না লইলে তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া ঐ দাদন গচ্ছিত করা

হইত। বিচারালয়ে গেলে তথায় ইহা অপেক্ষা আরও শোচনীয় পরিণাম হইত। সিরাজউদ্দৌলার সময় রাজকর্মচারীদিগের এইরূপ অত্যাচারে বহু তাঁতি বাড়ি ঘর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কোম্পানির বণিকেরাও এইরূপ অসহনীয় অত্যাচার করিয়া দাদনের টাকা গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিত। এইরূপ অত্যাচারে দাদন লইয়া অনেকে সর্বস্বান্ত হইত। পাঁচ শত টাকার মাল এক শত টাকায় দিতে বাধ্য হইত। অনন্যোপায় হইয়া এই সময় বহু তাঁতি নিজ নিজ বৃদ্ধাঙ্গুলি কর্তন করিয়া তন্তুধারণের অক্ষমতা জ্ঞাপনপূর্বক আত্মরক্ষা ও সম্পত্তি রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। অনেক শ্রেষ্ঠ শিল্পীও এই সময় বৃদ্ধাঙ্গুলি কর্তন করিয়া চিরকালের জন্য মসলিনের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছিল।[৬] ঢাকায় মসলিন ব্যতীত অন্যান্য বস্ত্রও প্রস্তুত হইত। এই সকল বস্ত্রের নাম বাফতা, বুন্নি, একপাট্টা, জোর, শাড়ি, হাম্মাম, গজি ও ঢাকাই ধুতি। এখনও ঢাকায় ধুতি গোলাবতন, তনজাব, উড়ানি প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। মিঃ গুপ্তের রিপোর্ট হইতে অবগত হওয়া যায় যে, স্বদেশী আন্দোলনে ঢাকার বস্ত্রশিল্পের অধিক উন্নতি হয় নাই। ঢাকার গোলাবতন বস্ত্র প্রসিদ্ধ। বালিয়াটি, ধামরাই আবদুল্লাপুর প্রভৃতি স্থানের কৃষক-তাঁতিরাও তাহা প্রস্তুত করে। ঢাকা শহরের বস্ত্র ব্যবসায়ীদিগের অপেক্ষা গ্রাম্য ব্যবসায়ান্তরে লিপ্ত গৃহস্থেরা অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে বস্ত্র বিক্রয় করিতে পারে এবং করিয়া থাকে।

স্বর্ণরৌপ্য কারুকার্য :

ঢাকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের জিনিস ও অলঙ্কার অতি সুন্দর। পূর্ববঙ্গ ও আসামের কুত্রাপি এইরূপ কারুকার্য হয় না। কটকের সুপ্রসিদ্ধ স্বর্ণরৌপ্য জিনিসের সহিত ঢাকার জিনিসের এখন সমভাবে তুলনা হইয়া থাকে। বিগত শতাব্দীর প্রথমভাগে বহু মসলিন ব্যবসায়ী তাঁতি তাঁত ছাড়িয়া এই ব্যবসায় মনোযোগ প্রদান করিয়াছিল। ঢাকায় বৎসরে ৩ লক্ষ টাকার সোনা রূপার জিনিস বিক্রয় হয়।

শঙ্খের কার্য :

ঢাকার শাঁখারিরা উৎকৃষ্ট শঙ্খ প্রস্তুত করিয়া থাকে। শাঁখা সামুদ্রিক শঙ্খ কাটিয়া প্রস্তুত করা হয়। ঐ সকল শঙ্খ লঙ্কাদ্বীপ, মলয়দ্বীপ, মাদ্রাজ উপকূল প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানি করা হয়। শঙ্খ নানা জাতীয়। নিম্নে কতকগুলির নাম মূল্য ও কোথায় পাওয়া যায়। তাহা প্রদত্ত হইল।

শঙ্খ	প্রাপ্তিস্থান	মূল্য
তিতকৌড়ী শঙ্খ	লঙ্কাদ্বীপ	৮-১০ শতকরা
পটীশঙ্খ	সেতুবন্ধ-রামেশ্বর	৮-১০ শতকরা
জাহাজী	—	৬ শতকরা
ধলা	—	৪-৫ শতকরা
গড়বাকি শঙ্খ	মাদ্রাজ	৪ শতকরা

সুরতী, দুয়ানাপটি ও আলাবিলা এই কয় প্রকার শঙ্খ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এইগুলি বোম্বাই প্রদেশে পাওয়া যায়। ঢাকায় কদাচিৎ আমদানি হয়। এই শঙ্খের মূল্যও অধিক; শতকরা ১৫-২৫।

শঙ্খ দ্বারা শাঁখা, অঙ্গুরী, বালা, ঘড়ির চেন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। শাঁখা ও বালা ১০ হইতে ২০ পর্যন্ত জোড়া বিক্রয় হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর লক্ষ টাকার শঙ্খ সমুদ্র উপকূল হইতে ঢাকায় আমদানি হইয়া থাকে এবং পাঁচ লক্ষ টাকার শাঁখার দ্রব্য ঢাকা হইতে বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে।

অন্যান্য শিল্প :

ঢাকায় বৃহৎ বৃহৎ কোষা নৌকা ও বজরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঢাকার মৃত্তিকা মৃৎশিল্পের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই মাটির গাঁথুনিতে বড় বড় দালান প্রস্তুত হইতেছে। ঢাকার কারিকরেরা উৎকৃষ্ট চুনকাম করিতে পারে। এই চুনকাম সায়েস্তাখাঁনি চুনকাম (Stucco panelling) নামে প্রসিদ্ধ। নর্থব্রুক হলে এই চুনকামের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। জেলার অনেক স্থানে মাটির জিনিস প্রস্তুত হয়। বিক্রমপুরের কুম্ভকারেরা প্রতিমা নির্মাণে সুদক্ষ। কাচাদিয়ার শম্ভুচন্দ্র সেন উচ্চশ্রেণীর মৃন্ময় মূর্তি প্রস্তুত করিতে পারিতেন। ধামরাই কাঁসার বাসন প্রস্তুত হয়। এক সময় জেলার স্থানে স্থানে দেশি কাগজ প্রস্তুত হইত। কাগজ প্রস্তুতকারগণ "কাগজী" নামে পরিচিত ছিল। এই কাগজই দেশে ব্যবহৃত হইত। ঢাকায় বহুকাল হইতে বাঙ্গালা সাবান প্রস্তুত হয়। শহরে একটি সাবানের কারখানা আছে, তাহা "বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরী"। ঢাকার বস্ত্র রঞ্জনের ব্যবসায় আছে। লক্ষ্মীবাজার, মালি-টোলা ও নবাবপুরের মুচিরা ভাল জুতা প্রস্তুত করে। স্বদেশী আন্দোলনে ঢাকাই জুতার কাটতি বৃদ্ধি হইয়াছে।[৭]

এখানে ৫০০০০ টাকা মূলধনে একটি চামড়ার কারবার ও ২৫০০০ টাকা মূলধনে একটি লোহার কারবার স্থাপিত হইয়াছে। ঢাকার স্থানে স্থানে শৃঙ্গের কারবার আছে। ঢাকায় ভাল কাঁচের চুড়ি প্রস্তুত হইত। ফিরোজাবাদের কাঁচের চুড়ির কাটতি বৃদ্ধি হওয়ায় ঢাকার চুড়ির ব্যবসায়ে মন্দা পড়িয়াছে। এখনে ঝিনুকের বোতাম প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত নামাস্থানে মোজা, গেঞ্জি সোডা, লেমনেড, তৈল, বরফ প্রভৃতির কল স্থাপিত আছে।

ইতরপ্রাণী

গৃহপালিত পশুপক্ষী :

গৃহপালিত পশুপক্ষী এ জেলার সর্বত্র পাওয়া যায়। গরু, ঘোড়া ক্রয় বিক্রয়ের জন্য এ জেলার মহেশ্বরদীর অন্তর্গত চালাকের চরের ও মানিকগঞ্জের অন্তর্গত ঝিটকার হাট প্রসিদ্ধ। পশ্চিমদেশীয় ব্যবসায়ীরা সময় সময় ঘোড়া ও গরু বিক্রয় জন্য লইয়া আইসে। ঢাকাই গরুর ন্যায় গরু বঙ্গদেশের আর কোথাও নাই। এই সকল ঢাকাই গরু ঢাকাই দেওশাল ষাঁড়[৮] দ্বারা উৎপাদিত। ঢাকার নবাব শায়েস্তা খাঁ দিল্লি হইতে যে সকল উৎকৃষ্ট ষাঁড় আনাইয়াছিলেন ঐ সকল ষাঁড়ের সন্তান-সন্ততি দেওশাল ষাঁড় ও দেওশাল গাভী নামে পরিচিত।[৯] জেলার স্থানে স্থানে ভেড়া পাওয়া যায়। মহিষ দুই প্রকার খাচর ও বাঙ্গর। খাচর অপেক্ষাকৃত ভীষণতর। পালিত মহিষ জেলার পূর্বপ্রান্তে মেঘনার নিকটবর্তী স্থানে রক্ষিত হয়। গর্ভনমেন্টের খেদায় ধৃত হস্তী সমূহ গর্ভনমেন্ট পিলখানায় আনিয়া সময় সময় রক্ষিত ও বিক্রিত হয়। ভাওয়ালের ঋষি, চামার ও ডোম প্রভৃতি বরাহ প্রতিপালন করে। কুকুর বিড়ালের অভাব নাই। পাঁঠা, খাসি, জেলার উত্তরভাগে পাওয়া যায়। ২০ বৎসর পূর্বে ভাওয়ালে সাধারণ পাঁঠার মূল্য চারি আনা ও খাসির মূল এক টাকা ছিল। এখন সাধারণ পাঁঠা ৩ টাকা ও ছোট খাসি ৫ টাকা। জেলার অন্যান্য স্থানে এই মূল্যেও পাওয়া যায় না।

গৃহপালিত পক্ষীর মধ্যে মোরগ, হংস ও কবুতর সর্বত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। ময়না, টিয়া, মদনা প্রভৃতি সর্বত্র ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না। ঢাকা শহরে সময় সময় পাওয়া যায়।

গৃহপালিত পশুপক্ষীর উন্নতির জন্যে বহুদিন পূর্বে, ঢাকা কালেক্টরের তত্ত্বাবধানে এক আদর্শ ফারম্ স্থাপিত ছিল।

বন্যপশু :

বানর ঢাকার উত্তরে বহু পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, বন্যবিড়াল,

বন্যশুকর, বন্য মহিষ, নানা জাতীয় হরিণ, শজারু প্রভৃতি জেলার উত্তরভাগে অল্পাধিক পাওয়া যায়। বন্য হস্তী পূর্বে কাপাসিয়া থানার অন্তর্গত জঙ্গলে পাওয়া যাইত। ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সালটিয়ার ভোলানাথ চাকলাদার ঐ স্থানে হাতি ধরার এক খেদা করিয়াছিলেন। খেদার চিহ্ন আজও বর্তমান আছে। বৃহৎ বৃহৎ বিষধর সর্প ও নানা জাতীয় সরিসৃপ ভাওয়ালে দেখিতে পাওয়া যায়।

পক্ষী :

মানিকজোড়, ধনঞ্জয়, ভৃঙ্গরাজ শ্যামা, ময়না, টিয়া, মদনা, তোতা প্রভৃতি পাহাড়িয়া পাখি সাময়িক ভাবে জেলার উত্তরভাগে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পাখি উত্তর—পাহাড় হইতে হেমন্তকালে আইসে ও বর্ষার পূর্বে চলিয়া যায়। এ জেলা হইতে এক সময় মৎস্যরাজ পক্ষীর পালক বহু পরিমানে চীনদেশে ও ব্রহ্মদেশে রপ্তানি হইত। এই সকল পালক দ্বারা মগদিগের পোষাক প্রস্তুত হইত।

বুলবুল, সারস, কাক, রামশালিক, বনমোরগ, ঢুপি, বাবুই, বাদুড়, গৃধ্র, শকুনি প্রভৃতি সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

সোনাগঙ্গা এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৮৬৮ সনে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট একটি সোনাগঙ্গা পাখি দেখিয়াছিলেন, তাহা ৪২ ইঞ্চি লম্বা ছিল।

বুলবুল ও কোঁড়া দ্বারা শিকারীরা পক্ষী শিকার করিয়া থাকে। নিম্নভূমি ও বিল সমূহে বন্য হাঁস, বক, পানিখাউরী, পানিভেলা প্রভৃতি পাওয়া যায়। পানিভেলা পক্ষী দ্বারা পদ্মা নদীতে শিকারীরা মৎস্য ধরিয়া থাকে। ময়ূর পূর্বে ভাওয়ালের গড়ে ছিল, এখন নাই। পঙ্গপালের উপদ্রব কম।

মৎস্য প্রভৃতি :

চিতল, মৃগা, রোহিত, কাতল প্রভৃতি পদ্মা ও মেঘনায় অপর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সকল বড় বড় নদীতে শিশুক দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুকের তৈল বাতরোগের পক্ষে উপকারী। এক-একটি শিশুকে আধমন হইতে দেড় মন তৈল পাওয়া যায়। পদ্মার ইলিশ অতি সুস্বাদু। হাঙ্গর মেঘনায় পাওয়া গিয়াছিল। কৈ, খলিসা, মাগুর, ফলি প্রভৃতি সর্বত্র পাওয়া যায়। বহু মৎস্য শুষ্ক করিয়া এ জেলা হইতে নানা স্থানে প্রেরিত হয়। ঢাকা মৎস্য প্রধান স্থান।

পূর্বে এই জেলায় মৎস্য ধরার জন্য কর ছিল। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার নদী সমূহ হইতে গর্ভনমেন্ট ৭২৬০্ টাকা মৎস্য মাশুল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঢাকা জেলায় মৎস্যের আমদানির পক্ষে ইহা তখন প্রচুর আয় বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। ঢাকার তৎকালীন কালেক্টর লিখিয়াছিলেন, "আমি এ জেলার মৎস্য মাশুল লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করি।"

কুম্ভীর বর্ষাকালে পদ্মায় ও মেঘনায় দেখিতে পাওয়া যায়। কচ্ছপ, কূর্ম (কাউঠা) শীতকালে অধিক পাওয়া যায়। কচ্ছপ ভদ্রলোকে খায় না।

তপসি মাছ ও আনোয়ারি প্রভৃতি কদাচিৎ পাওয়া যায়।

উদ্ভিদ :

নানাজাতীয় অশ্বত্থ, বট, জাম, মান্দার, জিয়ল, তেঁতুল, পিত্তরাজ (রশুনিয়া) প্রভৃতি লোকালয় জাত বৃক্ষ সর্বত্র অল্পাধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বাঁশ সর্বত্রই আছে। বনজ ঔষধি বৃক্ষ লতাও সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। জেলার উত্তরাংশে গজারী, শিরিশ, নিহর, নাগেশ্বর চাম্বল, চামা, গাম্ভারী, পারুল, জারৈল, কাটাখসিয়া, খাড়াজোড়া, কড়ই, আসই, পিপ্পলী, খিলা, বিটখদির, আমুগী প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে।

ঢাকা জেলার ভূমি উর্বরা। এখানে সকল প্রকার শাক সবজিই উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেশি পুষ্প প্রায় সর্বদাই পাওয়া যায়। ঢাকার প্রাচীন লাইনের পূর্বদিকে এক সময় কোম্পানির

বাগান ছিল। ঐ বাগানে সেগুন বৃক্ষ ছিল। কাপ্তেন গ্রেহাম (অথবা কর্নেল স্টেকি) এই বৃক্ষ সমূহ রোপন করিয়াছিলেন। দেশি সৈন্য লালবাগে স্থানান্তরিত হইলে গভর্নমেন্টের আদেশে ঐ কোম্পানির বাগান মিউনিসিপ্যালিটির হস্তে প্রদত্ত হয়। এর পর ঐ সেগুন বৃক্ষগুলি কাটিয়া ফেলান হইয়াছে।[১০] কাহার আদেশে কাটা হইয়াছে জানা যায় না।

ফলিকস পার্কের পশ্চাতেও কতকগুলি সেগুন বৃক্ষ ছিল। এগুলিও পূর্বে গভর্নমেন্টের ছিল। ১৮৫৫ সনে কমিসনার মিঃ ডেবিডসনের আদেশে ঐগুলি বিক্রয় করা হয়।

১৮৬৮ সনের পূর্বে এ জেলার মেহগনি বৃক্ষ ছিল না। ক্লে সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া এ বিষয়ে গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করান। তিনি বলেন, নিম্নবঙ্গের ভূমি মেহগনি চাষের বড়ই উপযোগী এর পর গভর্নমেন্ট ঢাকার মেহগনির গাছ লাগাইয়া ছিলেন।

১৮৭৮-৭৯ সনে রোড সেস্ কমিটি ঢাকায় নানা জাতীয় চারা বৃক্ষের বাগান করেন। অতঃপর ঐ সকল চারা বৃক্ষ তুলিয়া নানা স্থানে লাগান গিয়াছে।

ভূমির স্থানীয় মাপ

গর্ভনমেন্ট জরিপকার্যে পূর্বে একর রোড পোলের মাপ প্রচলিত ছিল। ক্রমে বিঘা-কাঠা-ছটাকের মাপ প্রচলিত ছিল। এই জেলার এক এক স্থানে এক এক রকম মাপ। কোন স্থানে দ্রোণ, কোন স্থানে খাদা, কোন স্থানে বিঘার মাপে জমির পরিমান হইয়া থাকে।

দ্রোনের মাপের হিসাব এইরূপ :—

৩ ক্রান্তিতে = ১ কুড়া।

৪ কুড়াতে = ১ গণ্ডা।

৫ গণ্ডায় = ১ কুনি।

৪ কুনিতে = ১ কানি।

১৬ কানিতে = ১ দ্রোন।

ভূমির মাপ নল দ্বারা হয়। নলেরও পরিমান সকল স্থানে একরূপ নহে। দ্রোনের মাপের নল ৭ হাত হইতে ৯ হাত দীর্ঘ। এই নলের ২৪ নল দীর্ঘ × ২০ নল প্রস্থ = ১ কানি।

খাদার-মাপ এইরূপ :—

৪ কাকে = ১ কড়া।

৪ কড়ায় = ১ গণ্ডা।

৭½ গণ্ডায় = ১ পাখি।

১৬ পাখি = ১ খাদা।

নলের পরিমাণ ৬ হাত হইতে ৮ হাত দীর্ঘ।

৬ নল দীর্ঘ × ৫ নল প্রস্থ = ১ পাখি।

এ জেলায় বিঘার দুই প্রকার মাপ প্রচলিত।

	রোড	পার্চ	ফিট
(১) ১০০ হাত দীর্ঘ × ১০০ হাত প্রস্থ =	২	২	১৭৯¾
(২) ১০০ হাত দীর্ঘ × ৮০ হাত প্রস্থ =	১	২৬	৩১¾

বিঘার মাপ এইরূপ :

৪ কড়ায় = ১ গণ্ডা

২০ গণ্ডায় = ১ ধারা।
২০ ধারায় = ১ কাঠা।
২০ কাঠায় = ১ বিঘা।

এই বিঘার সহিত গভর্নমেন্টের প্রচলিত বিঘার ঐক্য নাই।

এক কানির ১/৪ অংশকে বিক্রমপুরে কুনি বলে। বিক্রমপুরের এক কুনি সোনারগাঁও পরগণার ১ কানির সমান এবং চন্দ্রপ্রতাপ, মহেশ্বরদী, ভাওয়াল ও পাড়জোয়ারের এক পাখির সমান।

জেলার কোন কোন স্থানে ভূমির দুই প্রকার মাপ প্রচলিত। কাচ্চা মাপ ও পাক্কা মাপ। কাচ্চা মাপকে কাশুরী ও পাক্কা মাপকে 'সাহী' মাপ বলে। কাচ্চা বা কাশুরী মাপে জমির খাজনার হিসাব হয় এবং পাক্কা বা সাহী মাপে জমি ক্রয় বিক্রয় হয়।

কাচ্চা মাপের পরিমান পাক্কা মাপের ৪/৫ অংশ।

গর্ভনমেন্ট থাকের পর যে জরিপের মাপ প্রচলিত করিয়াছেন, তাহা এইরূপ :—
৬ ফিট × ১½ ফিট অথবা ৯ বর্গফিট = ১ কৌড়ি
৪ কৌড়ি অথবা ৬ ফিট × ৬ ফিট অথবা ৩৬ বর্গ ফিট ১ গণ্ডা।
২০ গণ্ডা বা ৭২০ বর্গ ফিটে ১ কাঠা
২০ কাঠা বা ১৪৪০০ বর্গফিটে ১ বিঘা
নিম্নে ভিন্ন পরিমিত নলের হিসাব প্রদর্শিত হইল।

	একর	রোড	পোল	গজ	ফুট	ইঞ্চি	সমান	প্রচলিত বিঘা	কাঠা	ধর	গণ্ডা	কড়া
বিক্রমপুরের ১ কানি												
৭ হাত নলের	১	—	৩৪	১১	—	৬	=	৩	১৩	১০	—	—
৭½ হাত নলের	১	১	২৩	৪	—	৩	=	৪	৪	৭	৭০	—
৮ হাত নলের	১	২	১৩	২৬	—	৯	=	৪	১৬	—	—	—
৯ হাত নলের	১	—	১	—	—	৯	=	৬	১	১০	—	—
১ খাদা												
৬½ হাত নলের	৪	—	২০	১১	—	—	=	১২	১৩	১৪	—	—
৭ হাত নলের	৪	৩	৬	২৮	—	৬	=	১৪	১৪	—	—	—
৭½ হাত নলের	৫	২	১২	১৭	—	—	=	১৬	১৭	১০	—	—
৮ হাত নলের	৬	১	১৫	১৬	—	—	=	১৯	৪	—	—	—

স্থানীয় ওজন ও পরিমাণ

জমির মাপের ন্যায় জিনিসের ওজনেরও স্থানে স্থানে বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবে। সকল জিনিস সর্বত্র সমান ওজনে ক্রয় বিক্রয় হয় না। ওজন দুই প্রকার কাচ্চা ও পাক্কা। কাচ্চা ৬০ তোলায় ১ সের ও পাক্কা ৮০ তোলায় ১ সের। ১৮৪০ সনে (টেলর সাহেবের সময়) ৮০½ তোলায় সের প্রচলিত ছিল। তখন কোন কোন জিনিসপত্র ৭৮ তোলায়ও সের ধরা হইত।

বর্ত্তমান সময় কাঁসার জিনিস কাচ্চা হিসাবে ও চাউল তৈল পাক্কা হিসাবে বিক্রি হয়। অনেক স্থলে পাক্কাতেও প্রভেদ আছে। কোন কোন স্থানে ৮০ তোলা কোন কোন স্থানে ৮২ তোলা, কোন কোন স্থানে ৮৪।৵ ও কোন কোন স্থানে ৯০ তোলায় পাক্কা মাপ ধরা হইয়া

থাকে। মিরকাদিমে গুড় ৯০ তোলা ওজনে বিক্রয় হয়। আবার এই বাজারেই কোন কোন জিনিস ৮২ তোলা সের হিসাবেও বিক্রয় হয়।

প্রচলিত ওজনের ধারা এইরূপ ঃ

৪ ধানে = ১ রতি, ৪ রতিতে = ১ মাসা, ১২ মাসায় = ১ তোলা, ৫ তোলাতে = ১ ছটাক, ১৬ ছটাকে = ১ সের, ৫ সেরে = ১ পসারি, ৮ পসারিতে = ১ মন।

সোনা রূপা প্রভৃতি ১০ মাসা = ১ তোলা

ঔষধ ও মসল্লা ১২ মাসা ২ রতিতে = ১ তোলা

মণিরত্ন, প্রবাল প্রভৃতি ১২½ মাসায় = ১ তোলা।

কাপড় খরিদ বিক্রয়ে পূর্বে সোলতানি গজ প্রচলিত ছিল। ঐ গজ ৩৬½ ইঞ্চি। অতঃপর কোম্পানির গজ প্রচলিত হয়। কোম্পানির গজ ৩৯½ ইঞ্চি। বর্তমানে ৩৬ ইঞ্চি গজ প্রচলিত।

মসলিন ওজনে বিক্রয় হইত। ঐ ওজনকে "খুদি" বলে। উৎকৃষ্ট বস্ত্র যত ওজনে পাতলা ততই মূল্য অধিক হইত।

১. কোন কোন জমিতে দুই ফসল হয়। ঐ জমি দুইবার গনিত হওয়ায় জমির মোট পরিমাণ ৮১ বর্গমাইল বৃদ্ধি হইয়াছে।

২. ১৯০৬ সনের ১২ই মে তারিখের গভর্নমেন্ট বিজ্ঞাপনী অনুসারে নারয়ণগঞ্জ পোর্ট উঠিয়া গিয়াছে। এখন তাহা চট্টগ্রামের অধীন বন্দব।

৩. এই পনির ঢাকা 'চিজ' (cheese) বলিয়া পরিচিত। ইহা তুর্কী স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে।

৪. সম্রাট ঔরঙ্গজেবের জন্য ২৫০্ টাকা একখানা জামদানি প্রস্তুত হইত। ঢাকার নায়েব নাজিম মহম্মদ রেজা খাঁর জন্য প্রত্যেক খান ৪৫০, টাকা করিয়া বাড়িত।

৫. Historical Acct. of Cotton Manufacture and Mr. G. N. Gupta's Report.

৬. "This both came too late"— Clay

৭. They have been treated also with such injustice that instance have been known of their cutting off their thoumbs to prevent their being forced to wind silk"

W. Bolts (1772)

৮. মিঃ গুপ্ত লিখিয়াছেন. "যে দোকানে পর্বে ২৫০০০্ টাকার বিলাতি জুতো আমদানি হইত, তথায় মাত্র ১০০্ টাকার বিলাতি জুতা আমদানি হয়।

৯. ১৮৬৪ সনে কলিকাতা প্রদর্শনীতে ঢাকার জে. পি, ওয়াইজ সাহেবের দেওশাল ষাঁড় বাঙ্গালোর গো-কুলের মধ্যে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল।

১০. শায়েস্তা খাঁ এই গরু প্রতিপালনের জন্য দেওশালী চাকরের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের নামও দেওশাল গাভী, দেওশাল ষাঁড় হইয়াছে। এই দেওশালী গোপাল বংশধরেরা প্রকর আহির গোয়ালা নামে পরিচিত। ঢাকায় এই আহির গোয়ালার সংখ্যা প্রচুর।

১১. ঢাকার তদানিন্তন ম্যাজিস্ট্রেট ক্লে সাহেব লিখিয়াছে: "The trees have been cut down by whose order does not appear."

১২. এই ওজন প্রাচীন সিক্কার মাপে ধরিতে গেলে ৮৪।।৯ আনাই প্রকৃত পাক্কা ওজন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সিক্কা তোলা কোম্পানি তোলা অপেক্ষা প্রায় এক খানা অধিক। এই হিসাবে সিক্কা আশি তোলায় সের কোম্পানির ৮৪।।৯ আনার সমান হয়। এই হিসাবেই ৮৪।।৯০ আনারও সৃষ্টি। অন্যান্য পাক্কা সেরের কোন ভিত্তি নাই। ঐ সকল সের ব্যবসায়ীদের সুবিধা অনুসারে সৃষ্টি হইযাছে।



অষ্টম অধ্যায়

ভূমিকর ও রাজস্ব

হিন্দু শাসনকালের রাজস্বের নিয়ম; মুসলমান শাসনকালের নিয়ম; ইংরেজ শাসনকালের প্রাথমিক অবস্থা; ভূম্যধিকারীদিগের ভূমিরস্বত্ব; নিষ্করস্বত্ব; প্রজাস্বত্ব; নাওয়ারা; বাঘমারা; জমি ও জমার বিবরণ; ধর্মগোলা; প্রজা ভূম্যধিকারীর ভাব; রাজস্ব।

হিন্দু-শাসনকালের রাজস্বের নিয়ম :

হিন্দু শাসনকালে জমির উৎপন্ন ফসল হইতে সর্বসাধারণের প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের ব্যয় রাখিয়া বাকী ফসল রাজা ও প্রজার মধ্যে বিভাগ হইত। সর্বসাধারণের প্রয়োজনীয় বিষয় বলিতে— গ্রাম বিদ্যালয়ের ব্যয়, চৌকিদারের বেতন, ব্রাহ্মণ ও জ্যোতিষদিগের প্রাপ্য বুঝাইত। রাজার রাজস্ব উৎপন্ন ফসল দ্বারা অথবা ফসলের মূল্য দ্বারা প্রদত্ত হইত। রাজস্ব বিষয়ে গ্রামের প্রধান ব্যক্তির সহিত রাজকীয় সম্বন্ধ ছিল। প্রজা সাধারণ সেই প্রধান ব্যক্তির নিকট রাজার রাজস্ব বুঝাইয়া দিতেন।

মুসলমান শাসনকালের নিয়ম :

মুসলমান শাসনকালে এই নিয়ম পরিবর্তিত হইয়া পরগণাদারী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়। পরগণারদারগণ প্রজার খাজনা সংগ্রহ করিয়া রাজস্ব প্রদান করিতেন। ইহাতে প্রজার প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার হইত। জমিদার বা পরগণাদারগণ ইচ্ছানুসারে মাথট, আবুয়াব, নজর প্রভৃতি নানাপ্রকার বাজে কর আদায় করিয়া প্রজাকে সর্বস্বান্ত করিয়া ফেলিতেন। প্রজা ভূমি ছাড়িয়া পলায়ন করিত। জমিদারগণ সেই স্থানে নতুন প্রজা বসাইতেন। অত্যাচারের ভয়ে ঐ স্থানে নতুন প্রজা না আসিলে সেই গ্রামের পার্শ্ববর্তী স্থানের প্রজাদিগের নিকট হইতে সেই পলাইত প্রজার বাকি খাজনা ও মাথট আদায় করিতেন। জমিদারের খাজনা কোন প্রকারেই অনাদায়ী থাকিত না। মুসলমান শাসনে জমিদারদিগেরও রক্ষা ছিল না। নিয়মিত রাজস্ব প্রদান না করিতে পারিলে জমিদারদিগকে অনেক সময়েই "বৈকুণ্ঠের"[১] শোচনীয় পরিণাম উপভোগ করিয়া রাজস্ব প্রদান করিতে হইত। অনেক স্থলে জমিদারি ইস্তফা দিয়া এবং জাতিধর্ম বিসর্জন দিয়া রাজস্বের দায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইত।

ইংরাজ শাসনকালের প্রাথমিক অবস্থা :

ইংরাজ শাসনকালের প্রারম্ভেও জমিদারদিগের উপরেই পরগণার রাজস্ব প্রদানের ভার ন্যস্ত ছিল। জমিদারদিগের তখন ভূমিতে কোনরূপ স্বত্ব ছিল না। রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হইলে জমিদারগণ জমিদারি ছাড়িয়ে দিতে বাধ্য হইতেন।

দশশালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত :

ভূমিতে জমিদারদিগের এবং প্রজা সাধারণের বিশেষ স্বত্ব না থাকায় ভূমির উৎকর্ষসাধন পক্ষে জমিদার বা প্রজা কেহই বিশেষ যত্ন লইতেন না। এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া কোম্পানি ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে দশ বৎসরের ন্যায় জমিদারদিগের সহিত ভূমির বন্দোবস্ত করিতে জেলা

কালেক্টরদিগকে আদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় দশশালা বন্দোবস্তের উদ্যোগ হয়। ১৭৯৪ সনে ঢাকায় দশশালা বন্দোবস্ত শেষ হইয়াছিল। এদিকে দশশালা বন্দোবস্ত শেষ হইতে না হইতে বোর্ড অব ডিরেক্টরের আদেশে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ঐ বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলিয়া গণ্য হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা ভূমির উপর জমিদার বা তালুকদারের চিরস্থায়ী স্বত্ব জন্মিয়াছে।

ভূম্যধিকারীদিগের স্বত্ব :

ভূমির উপর জমিদার ও তালুকদার দিগের নানাপ্রকারের স্বত্ব এ জেলায় প্রচলিত আছে। খারিজা তালুকে ভূম্যধিকারীদিগের চিরস্থায়ী[২] স্বত্ব। পঞ্চসনা বন্দোবস্তের সময় পরগণার তালুদারগণ জেলা কালেক্টরের নিকট যে তালুকের জমাজমির হিসাব প্রদান করিয়াছিলেন ঐ সকল তালুক পরগণার জমিদারি হইতে পৃথক হইয়া হুজুরি বা খারিজা তালুক বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। ঐ সময় যে সকল তালুকদার গভর্নমেন্টে হিসাব দাখিল করেন নাই, তাঁহাদিগের তালুক কালেকটরীর তৌজিভুক্ত হয় নাই। ঐ সকল তালুক পরগণার জমিদারের অধীনই রহিয়া গিয়াছে। এই সকল জমিদারির অধীন তালুকের নাম 'সিকিমি' তালুক। সিকিমি ও খারিজা এই উভয় তালুকের স্বত্বই চিরস্থায়ী এবং তাহাদিগের রাজস্ব অপরিবর্তনীয়। অন্য কোন তালুকের সহিত যে তালুকের রাজস্ব গভর্নমেন্টকে দিতে হয় তাহাকে সামিলাত 'অধীন' বা ভুক্ত তালুক বলে। অধীন তালুকের অন্তর্গত ক্ষুদ্র তালুককে হাওলা তালুক বলে। হাওলার অধীন তালুক নিমহাওলা। সামিলাত ও হাওলার স্বত্ব ও ধার্য রাজস্ব চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। নিমহাওলার স্বত্ব দলিল অনুযায়ী হইয়া থাকে।

মৌরশি ও মুশকমি তালুকের স্বত্ব বংশানুক্রমে স্থায়ী। পাট্টার স্বত্ব ক্রমে যে তালুক বা ভূমি গ্রহণ করা যায় তাহা পাট্টাই তালুক। ইহার স্বত্ব পাট্টানুযায়ী। ভাওয়ালের জমিদারের অধীন "জঙ্গলবুড়ি" তালুক আছে। জঙ্গল আবাদ করিবার সর্তে যে তালুক গ্রহণ করা যায় তাহাকে 'জঙ্গলবুড়ি' তালুক বলে। জোর খরিদ তালুক এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

নিষ্কর স্বত্ব :

নিম্নলিখিত নিষ্কর স্বত্ব এ জেলায় প্রচলিত। (১) নফরান বা নানকার, (২) চাকরান, (৩) পাইকান, (৪) দেবোত্তর, (৫) ব্রহ্মোত্তর, (৬) পীরান, (৭) চেরাগাম (মসজিদে আলো দেওয়ার জন্য)

প্রজাস্বত্ব :

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় প্রজার স্বত্ব দুই প্রকার ছিল। (১) খোদকাসতি ও (২) পাইকাসতি। খোদকাসতি বা স্থায়ীপ্রজা, ইহাদিগকে ভূমি হইতে উচ্ছেদ করা যাইত না। কিন্তু ইহাদিগের জমা বৃদ্ধি করা যাইত। পাইকাস্তি অস্থায়ী চাষা, ইহাদিগের স্বত্ব যখন ইচ্ছা তখনই উচ্ছেদ করা যাইত এবং ইচ্ছামত ইহাদিগের খাজনাও বৃদ্ধি করা যাইত।

১৮৫৯ সনে পূর্বোক্ত প্রথা রহিত হইয়া যায়। এখন চাষের স্বত্ব এ জেলায় তিন প্রকার। (১) বায়তি স্বত্ব (২) জোতস্বত্ব ও (৩) ম্যাদিস্বত্ব।

গো গ্রামের জমি জেলার দক্ষিণভাগে একেবারেই নাই। ভাওয়ালে এখনও অনেক গো গ্রামের জমি আছে।

নাওয়ারা :

ঢাকার বিস্তৃত নাওয়ারা মহাল ছিল। মোঘল শাসন সমস্ত আরাকান ও পর্তুগিজ জলদস্যুদিগের আক্রমণ হইতে বঙ্গদেশ রক্ষা করার জন্য বাঙ্গলার নবাবকে পূর্ববঙ্গের জেলা সমূহ হইতে নৌকা ও নৌসৈন্য দ্বারা সাহায্য করা যাইত। এই নৌকাদি সরঞ্জাম রক্ষার ব্যয় নির্বাহ জন্য

নবাব বহু তালুক হুজুরি সিরেস্তা হইতে পৃথক করিয়া দেন। ঐ মহাল বা তালুকগুলি নাওয়ারা মহাল নামে পরিচিত। ঢাকার এই নওয়ারা মহালের খাজনাদি আদায় জন্য পৃথক সিরেস্তা ছিল। ঐ সিরেস্তা "নাওয়ারা সিরেস্তা" নামে পরিচিত ছিল। ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হইলে এই নাওয়ারার খাজনা মুর্শিদাবাদের নবাব ও ঢাকার-নবাব গ্রহণ করিতেন।

১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে মিঃ সাইকস কতকগুলি নাওয়ারা মহাল গভর্নমেন্টে বাজেয়াপ্ত করেন।[২] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর অনেক নাওয়ারা মহালের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ঢাকা বা মুর্শিদাবাদের নবাব তাঁহাদিগের প্রাপ্য খাজনা পাইতেন না।[৩] অবশেষে তাঁহারা রেভিনিউ বোর্ডে প্রতিকার প্রার্থী হইলে, গভর্নমেন্ট হইতে এই সকল নাওয়ারা মহালের অনুসন্ধান হয়। এই সময় (১২০৩ বঙ্গাব্দে) শিবপ্রসাদ বসু ঢাকার নাওয়ারা সিরেস্তার কানুনগু ছিলেন। কানুনগুর চেষ্টায় কোন কোন মহালের তত্ত্ব পাওয়া গিয়াছিল। অতঃপর উভয় নবাবই স্বীয়-স্বীয় প্রাপ্য পাইবেন বলিয়া নির্ধারিত হয়। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার নবাব নছরতজঙ্গ ও ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদের নবাব পরলোক প্রাপ্ত হইলে, এই নওয়ারা মহালগুলিও বাজেয়াপ্ত হইয়া গভর্নমেন্ট খাস মহালে পরিণত হইয়া যায়।

বাঘমারা :

ইতিপূর্বে দেশে ব্যাঘ্রের প্রাদুর্ভাব থাকায় ব্যাঘ্র শিকারের জন্যও অনেক ভূমি বিনা জমায় হস্তান্তরিত ছিল। ঐ সকল ভূমি "বাঘমারা" তালুক নামে অভিহিত হইত। ১৭৭১ সনে ঐ সকল "বাঘমার" তালুক গভর্নমেন্ট হইতে বাজেয়াপ্ত করা হয়।

জমি ও জমার বিবরণ :

জমির শ্রেণী অনুসারে জমা ধার্য হইয়া থাকে। জঙ্গলভূমি ও নদীর নতুন চর প্রথম প্রথম বিনা জমায় দেওয়া হয়। ফসল উপযোগী হইলে পরে খাজনা ধরা হয়। ভিটী জমির জমা বস্তির উচ্চতা, ফলবান বৃক্ষাদির সংখ্যা ও স্থানের সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ধার্য হয়। চাষী জমিরও প্রকার ভেদ আছে। মাঠের অবস্থা ও উৎপন্ন ফসলের সংখ্যা অনুসারে জমির জমা ধার্য হইয়া থাকে। যে জমিতে দুই ফসল হয়, তাহার জমা এক ফসলি জমি অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে।

সকল স্থানের জমার হার একরূপ নহে। নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জমার হার প্রদত্ত হইল।

বিভাগ	ভিটী জমির জমা	ফসলি জমির জমা
সদর মহকুমা প্রতি একর	১৫—২০	৩
নারায়ণগঞ্জ প্রতি একর	৪—২০	১৷৷৽—৫
মুন্সিগঞ্জ প্রতি একর	১৫	২৷০
মানিকগঞ্জ প্রতি একর	৪	১৷৷০

জমির শ্রেণীর অনুসারে এই নিরিখের হ্রাস বৃদ্ধিও হইয়া থাকে। জমাধার্যের বিশেষ কোন বাঁধাবাধি নিয়ম নাই। প্রজাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া যেরূপ হারে গ্রহণ করা যায়, সেইরূপেই সাধারণত জমা ধার্য হইয়া থাকে। প্রকৃত জমা ব্যতীত অনেক স্থলে নানাপ্রকার বাজে কর ও জমার সহিত আদায় করা হইয়া থাকে।

আধিবর্গা প্রথা এ জেলায় বিশেষভাবে প্রচলিত। এই প্রথায় প্রজামালিকের খামার জমি চাষ করিয়া ফসল অর্জন করে ও অর্ধেক ফসল জমির মালিককে প্রদান করে। এইরূপ স্থলে বীজ ধান ক্ষেত্রস্বামী চাষীকে দেন। খাটুনির পয়সা আধিদার দিয়া থাকে অথবা নিজে খাটিয়া থাকে। যে ফসলে আধিদারকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয় সেই সকল ফসলে প্রজা দুই ভাগ রাখে ও ভূম্যধিকারী এক ভাগ পান। এইরূপ বন্দোবস্তকে[৪] তেভাগী বলে। এইরূপ স্থলে ভূম্যধিকারী ফসল উৎপাদনের ন্যায় খরচ বহন করিলে, প্রজা অর্ধাংশ লইয়া থাকে।

জেলার উত্তরাংশে বন্দোবস্ত প্রথাও প্রচলিত আছে। এই প্রথানুসারে জমিতে কোন ফসল না হইলেও প্রতি বিঘার নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল চাষী ভূম্যধিকারীকে দিতে বাধ্য থাকে। জেলার অন্যান্য অংশেও— যে স্থানে হঠাৎ ফসল নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই— সেই সকল স্থানে এইরূপ বন্দোবস্ত প্রথা প্রচলিত আছে। ফসল জেলার উত্তরভাগে পরিমাণ মত হয়। জেলার দক্ষিণ ভাগে অধিক বৃষ্টি হইলে বা হঠাৎ বর্ষা (প্লাবন) হইলে ফসল নষ্ট হয়। কম বর্ষা হইলে প্রচুর পরিমাণে ফসল হইয়া থাকে। এবৎসর ভাদই[৫] ফসল ঢাকা জেলার অপর্যাপ্ত পরিমাণে হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। পূর্ববঙ্গ ও আসাম গেজেটে প্রকাশিত কৃষি বিভাগের ডিরেক্টরের রিপোর্টে প্রকাশ এবার (১৯০৮) ঢাকার ন্যায় এত ফসল পূর্ববঙ্গের কোন স্থানেই আশা করা যায় না।[৬]

বিক্রমপুরের প্রতি একর জমিতে সাধারণতঃ ২০।২২ মন ও ভাওয়ালের প্রতি একর জমিতে সাধারণতঃ ৩০।৩২ মন ধান হইয়া থাকে। ভাওয়ালে এক জমিতে প্রায়ই দুই ফসল করে না। অন্যান্য স্থানে ধান্য কাটিয়াই ঐ জমিতে অন্য ফসল 'বাইন' করা হয়।

চাউল প্রস্তুত করিবার জন্য সর্বত্র ঢেকির প্রচলন আছে।

ধর্মগোলা :

তেওতার—সুযোগ্য জমিদার রায় পার্বতীশঙ্কর চৌধুরীর চেষ্টায় ও উদ্যোগে তেওতা ও রাহাতপুর দুইটি ধর্মগোলা স্থাপিত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ ও সাময়িক অভাবের সময় ধর্মগোলা হইতে সাহায্য প্রার্থীদিগকে ধান্য ধার দিয়া সাহায্য করা হইয়া থাকে। সাহায্য গ্রহণকারীদিগকে ফসল তুলিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান্য পুনরায় গোলায় ফেরৎ দিতে হয়। ১৯০০ সনে মার্চ মাসে এই গোলাদ্বয় স্থাপিত হইয়াছে। চতুঃপার্শ্ববর্তী দরিদ্র গৃহস্থেরা এই ধর্মগোলা দ্বারা প্রচুর পরিমাণে সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে।

প্রজা ভূম্যধিকারীর ভাব :

এই জেলার প্রজারা জমিদারের বশীভূত। প্রজা বিদ্রোহের কথা এই জেলায় প্রায় শুনা যায় না। ১৮৮৫ সনে এই জেলার প্রজাদিগের মধ্যে ধর্মঘটের সূচনা দেখা দিয়াছিল। চারিদিকে হঠাৎ রাষ্ট্র হইয়া পড়িল যে ছোট লাট প্রজাদিগের প্রতি কৃপাপরায়ণ হইয়া জমির নিরিখ প্রতি বিঘা ৬ আনা করিয়া ঠিক করিয়া দিয়াছেন। প্রজাগণ এই সংবাদে দৃঢ়চিত্ত হইয়া তালুকদারদিগকে চলিতহারে খাজনা দিতে অস্বীকার করে। এই সময় Wyer সাহেব ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট কালেকটর। তাঁহার যত্নে এই গোলযোগ অল্পেই মীমাংসা হইয়া যায়।[৭]

রাজস্ব :

মোঘল শাসন সময় সরকারি রাজস্ব কড়ি, দাম সিক্কা দ্বারা প্রদত্ত হইত। রাজস্ব তখন ঢাকার দেওয়ান খানায় প্রদান করিতে হইত। কোম্পানির দেওয়ানি গ্রহণের পরও কিছুকাল পর্যন্ত এই নিয়ম প্রচলিত ছিল।[৮] ঐ সময় ঢাকায় কোম্পানির খাজনাখানা ছিল এবং বারো কিস্তিতে খাজনা প্রদানের নিয়ম ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ৪ কিস্তিতে রাজস্ব প্রদানের নিয়ম অবধারিত হয়। ২৮ ডিসেম্বর, ২৮ মার্চ, ২৮ জুন ও ২৮ সেপ্টেম্বর।

ইহার পর ২৮ ডিসেম্বর সম্বন্ধে সর্বসাধারণের আপত্তি উত্থাপন করেন। ঐ সময় ফসল কাটার পূর্ব সময় ও টাকা পয়সার অভাবের সময় ইত্যাদি কারণ প্রদর্শিত হইলে রেভিনিউ বোর্ড ঐ তারিখ পরিবর্তন করিয়া ১২ই জানুয়ারি কিস্তি ধার্য করেন।

এই জেলার গভর্নমেন্ট রাজস্ব ইত্যাদি ঢাকার 'বেঙ্ক অব বেঙ্গলে' (শাখা) দখিল করিতে হয়।

এই জেলার জমিদারি নাই। জেলার তৌজির অধীন জমিদারি ও তালুকের সংখ্যা প্রায় ১১ হাজার। ইহার মধ্যে ৪টি মাত্র দশ হাজার টাকার উর্ধে রাজস্ব প্রদায়ী।

এই জেলায় ১৯০১—০২ সনের গভর্নমেন্ট রাজস্বের তালিকা প্রদত্ত হইল।

ভূমিকর	৫০৮১১৪
স্ট্যাম্প	৯১৫৬২৫
আয়কর	৯৬২০৩
আবগারী	২৭৭৩৪৪
আফিম	৩১৮৫৭
অন্যান্য	২২৮৭৮০
রোড ছেচ পাবলিক সেচ	১৯৮৭০৩
ডাকটেক্স	৬৮
মোট	২২৫৬৬৯৪

পূর্বে ২০০ টাকা যাহার আয় হইত, তাহাকেই আয়কর (Income tax) দিতে হইত। ১৮৭৮-৮৯ সনে লাইসেন্স টেক্স ধার্য হয় এবং ২০০ আয়ের উপর যে আয়কর ছিল তাহা উঠিয়া যায়। ১৮৮১ সনে এই নিয়মও উঠিয়া যায় এবং ৫০০ টাকা ও তদূর্ধ আয়ের উপর লাইসেন্স টেক্স স্থাপিত হয়। ইহাতে সাধারণ তালুকদারগণ করের দায় হইতে রক্ষা পায়। ১৮৮৬ সনে এই টেক্স পুনরায় ইনকাম টেক্স নামে পরিবর্তিত হয়। ১৯০৫-০৬ সনে ১০০০ টাকার নিম্নে যাহাদের আয় তাঁহাদের আয়কর রহিত হইয়া গিয়াছে। ১৯০৩-০৪ সনে ভূমি রাজস্ব ৫২১০০০ ও অন্যান্য সহ মোট রাজস্ব ২০৮৪০০০ টাকা প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১৯০৫-০৬ সনে ডাকটেক্সও উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

শতাধিক বৎসর পূর্বে (১৭৯৫-৯৬) এই জেলার গভর্নমেন্ট রাজস্ব ৩৮ লক্ষ টাকা ছিল। তখন পূর্ব বাঙ্গালার অনেক জেলাই ঢাকা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৮৬৫—৬৬ খ্রিস্টাব্দে ও ১৮৭০—৭১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার সরকারি রাজস্ব কত ছিল, তাহা প্রদত্ত হইল।

	১৮৬৫—৬৬	১৮৭০—৭১
ভূমিরাজস্ব	৫৯৯৬৭৪	৫৩৬৭২০
মালিকানা	৭৩৯	৭০০
আবগারী	১২১২০৭	১৩৩৫৪০
স্ট্যাম্প	২১৫৫৩৬	২৩০৮৫০
পুলিশ থানাদারী	২১	১৩০
আয়কর	×	১৫৮৭৬০
অন্যানা	৫২৩	৫৭০
পোস্টঅফিসের প্রাপ্য	×	১৯০৭০
জেলাজাত দ্রব্যের মূল্য	×	৮৫০

১. বৈকুণ্ঠের "শোচনীয় চিত্র" ঢাকার ইতিহাসে প্রদত্ত হইবে।

২. Imperial Gazetteer (Draft)

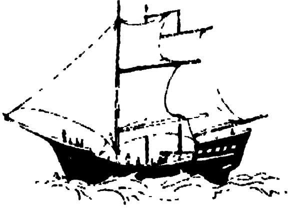
৩. ঢাকা বা মুর্শিদাবাদের নবাব কেন খাজনা পাইতেন না, তাহার কোন কারণ পাওয়া যায় না। গভর্নমেন্টের চিঠিপত্রেও কোন কারণ নির্দেশ করা হয় নাই। সম্ভবতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় নিকটবর্তী তালুকের তালুকদারগণ ঐ সকল নাওয়ারা মহালের ভূমিও নিজ তালুকের সামিল করিয়া দখল করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

৪. জুন মাসের মধ্যভাগ হইতে নভেম্বরের মধ্যভাগ পর্যন্ত যে ধান সংগ্রহ করা হয়, গভর্নমেন্ট গেজেটে তাহাই 'ভাদই' বা আশু-ধান্য বলিয়া গণ্য।

৫. Eastern Bengal and Assam Garette, dated 23-9-08 App. I.

৬. এতৎ সম্বন্ধে ঢাকার তৎকালীন কমিশনার Mr. W. R. Larmini লিখিয়াছেন— In Dacca a report was Circulated that the rent had been fixed at six annas per gigna by order of the Lieutenant Governor and hence forthe the people were. to pay at that rate and no more. The magistrate Mr. Wyer under my instruction took immediate steps to disabuse the minds of the people and the agricultural classes have now been convinced of their mistake. Gl. Ad. Report 1885—86 page 10.

৭. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ও শ্রীহট্ট জেলার রাজস্ব কড়ি দ্বারা প্রদত্ত হইত এবং তাহা নৌকা ভরিয়া ভরিয়া ঢাকা খাজনাখানায় প্রেরিত হইত। ঢাকার খাজনা খানায় ঐ কড়ির বিনিময় হইত।



নবম অধ্যায়

স্বায়ত্তশাসন

মিউনিসিপ্যালিটি ; আয়ব্যয়; লোকসংখ্যা; জলের কল; ইলেকট্রিক লাইট; ঠিকা গাড়ি; জেলা বোর্ড; আয়ব্যয়; লোকাল বোর্ড; গোদারা; পাউণ্ড; চিকিৎসালয়; পাগলা গারদ; মহাত্মা মিটফোর্ড ও মিটফোর্ড হাসপাতাল; লেডি ডাফরিন হাসপাতাল; জেল হাসপাতাল; মফঃস্বলের ঔষধালয়; টিকা; পথ; পথকর।

[বর্তমান সংস্করণের ৮৬৮—৮৯৫ পৃঃ দেখুন]

মিউনিসিপ্যালিটি :

১৮৬৪ সনের ১ আগস্ট ঢাকায় স্বায়ত্তশাসন প্রথা প্রবর্তিত হয়। ১১ আগষ্ট কমিশনারগণের প্রথম সভা আহুত হয়। ঐ সভায় শহরের গৃহাদির উপর এবং ভূমির উপর আয় ধরিয়া আয়ের উপর শতকরা ৭।০ টাকা হারে ট্যাক্স ধার্য হয়। ঐ সময় ঢাকা শহরের উপর করদাতার সংখ্যা ১৬০৬০ হইয়াছিল। কার্যের সুশৃঙ্খলা বিধান জন্য শহর ১৬৬ মহল্লায় বিভক্ত করিয়া ট্যাক্স আদায়ের জন্য ১৪[১] জন তহসিলদার নিযুক্ত করা হয়।

১৮৬৫—৬৬ সনে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির আয় ৫৯৪৯২্ ও ব্যয় ৪৮৪০৯্ টাকা হইয়াছিল।

১৮৫৬ সনের ২০ আইন অনুসারে ১৮৬১ সনের জুন মাসে নারায়ণগঞ্জ ও ১৮৬২ সনের জুলাই মাসে মানিকগঞ্জে চৌকিদার রাখিবার বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হইয়াছিল। ঢাকাতে এইরূপ বন্দোবস্ত বহুপূর্বে হইতেই চলিয়া আসিতেছিল।

১৮৭৬ সনের ৮ সেপ্টেম্বর মদনগঞ্জকে নারায়ণগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয়। নারায়ণগঞ্জ এই প্রদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মিউনিসিপ্যালিটি।

বর্তমান সময় এই জেলার দুইটি মিউনিসিপ্যালিটি। নিম্নে মিউনিসিপ্যালিটি দুইটির ১৯০৬ সনের আয়ব্যয় ও সদস্যের সংখ্যা প্রদত্ত হইল।

	মনোনীত সভ্য	নির্বাচিত সভ্য	মোটসভ্য	আয়	ব্যয়
ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি	৭	১৪	২১	১৯৮১৫৩্	২১৭৩৪২্
নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি	৮	৮	১২	৭৭১২৫্	৮৭৯৬০্

আয়ব্যয় :

উভয় মিউনিসিপ্যালিটিই ঋণগ্রস্থ। নিম্নে এই উভয় মিউনিসিপ্যালিটির আয় ও ব্যয়ের বিষয়গুলি পৃথক পৃথকভাবে প্রদর্শিত হইল।

আয়	ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি	নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি
	মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে গৃহীত	
ভূমির ও গৃহের ট্যাক্স	৯৪৪৯৪্	৩৭৯৮৪্
জীবজন্তু ও গাড়ি প্রভৃতির ট্যাক্স	৬০০৪্	×
ব্যবসায়ের ট্যাক্স	১১২৬্	৬২৭্
গোদারার আয়	১৩০৭৮্	৭৭০১্
জলের ট্যাক্স	×	×
আলোর ট্যাক্স	×	×
পায়খানার ট্যাক্স	৪২৯৩২্	২২৭২৯্
জরিমানা আদায়	৩৮্	৯৩্
পাউন্ড	৪০৭্	৫২৬্
	বিশেষ আইন অনুসারে	
ঘোড়ার গাড়ি	৬৩৯্	×
টিকার ফিস	৯্	৪১্
	মিউনিসিপ্যাল সম্পত্তির আয়	
ভূমি ও গৃহাদির ভাড়া	৩৩৮১্	৪৮৬্
উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য	২৭্	৩২৮্
পথঘাট পরিষ্কারের বাজে আয়	২৯০৩্	২১৯্
বাজারের আয়	১১৫্	১৮১১্
শ্মশানঘাট ও কবরখানার আয়	২৮২৬্	×
অন্যান্য	৯৮৫১্	১্
	মিউনিসিপ্যাল ও অন্যান্য আইন অনুসারে	
জরিমানা	৮৬৫্	৪৯২্
টাকার সুদ	১২৬৪্	×
গভর্নমেন্ট হইতে ও অন্যান্য ফাণ্ড হইতে প্রাপ্ত	১১৮২৫্	২৬৮৮্
বিবিধ আয়	৬৩৬৭্	১৩৯৯্
মোট	১৯৮১৫৩্	৭৭১২৫্

ব্যয়	ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি	নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি
অফিসের ব্যয়, আমলাগণের বেতন, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটগণের কার্যালয়ের ব্যয়, গোদারা, ভূমি জরিপ ইত্যাদির ব্যয়।	১৬৫৫৪্	৪৫৭০্
আলোপ্রদানের ব্যয়	৮১১৮্	৪৮৫১্
পুলিশের ব্যয়	৪৮১্	১৬২্
বন্যজন্তু ও সম্পদাদি নাশের পুরস্কার	৫৪০্	৩০্
জল সরবরাহের ব্যয়	২২৪১১্	৭১৩৪্
পয়ঃ প্রণালী	৪৮৩৫্	৪৭৪২্
পথঘাট পরিষ্কার	৬৭৯৬০্	৩৫৮১৪্
হাসপাতাল ও ঔষধালয়	১১৩০০্	৫০১১্
প্লেগে	১৬৭্	×

১৮৯০ সনে ঢাকা হইতে শিবালয় পর্যন্ত ট্রামগাড়ি চালাইবার এক প্রস্তাব হয়। ঢাকা ডিস্ট্রিক বোর্ড ১৫ লক্ষ টাকা খরচ এষ্টিমেন্ট করেন। ফলে সে কল্পনা কার্যকরী হয় নাই।

জেলা বোর্ড :

১৮৮৬ সনের ১ অক্টোবর ঢাকা জেলার স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন (Local Self Govt. Act.) প্রবর্তিত হয় এবং তদনুসারে ১৮৮৭ সনের ১ এপ্রিল ঢাকা জেলা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলার কালেক্টর জেলা বোর্ডের সভাপতি। সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে সভাপতিসহ মোট ২৯ জন সদস্য (Member)। সদস্যদিগের মধ্যে ১৪ জন লোকাল বোর্ডের সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত ও ১৫ জন গভর্নমেন্ট কর্তৃক মনোনীত হন। গভর্নমেন্টের মনোনীত সভ্য ১৫ জনের ৮ জন রাজকর্মচারী (Ex otticio)।

১৯০৬—০৭ সনের বোর্ডের আয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পথকর	৯৯৬৯৮
টাকার সুদ	৩৬৩
পাউন্ডের আয়	১১০১৪
শিক্ষার জন্য প্রাপ্ত সাহায্য	৫৪৯২
চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রাপ্তদান	২৫৮৪
মেলার	২১৭৫
পুরাতন জিনিস বিক্রয় ও বিবিধ আয়, রাস্তাঘাট, গৃহ ইত্যাদি (Civil Work)	৩৪৬৫৯
প্রাপ্ত সাহায্যে (From Imperial to Local)	৭৮২৫৪
মোট	২৩৭১৮৯

জেলা বোর্ড সাধারণত শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যোন্নতি, পশুচিকিৎসা, রাস্তা, জলাশয় প্রভৃতি সাধারণের উপকারজনক কার্যে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন।

১৯০৬-০৭ সনে ঢাকা জেলা বোর্ড এই সকল কার্যের জন্য টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

আমলার বেতন ও অফিসের খরচ	৭৯৫৬
পাউন্ডের খরচ	৪৫৮
শিক্ষার জন্য ব্যয়	৫৯৭০৯
ঔষধালয় হাসপাতাল ও টিকার ব্যয়	১২৫৫৬
মেলা ও পশুচিকিৎসালয়	২২২৩
পেন্সন	৯০০
স্টেশনারি ও ছাপা খরচ	৬৭৯
বিবিধ	৬৮২
গৃহাদি প্রস্তুত ও রাস্তা, জলাশয় প্রভৃতির ব্যয়	১৪৪৮১৪
চাঁদা	১১০৫
মোট	২৩১০৮২

ঢাকা জেলা বোর্ডের পরিমাণ ফল ২৭৭২ বর্গ মাইল ও লোক সংখ্যা ২৫৩৪৫০৪।

লোকাল বোর্ড :

জেলা বোর্ডের কার্য ও সৌকার্যর্থে জেলার চারি বিভাগে চারিটি লোকাল বোর্ড আছে। যথা সদর, লোকাল বোর্ড, নারায়ণগঞ্জ লোকাল বোর্ড, মুন্সিগঞ্জ লোকাল বোর্ড ও মানিকগঞ্জ

লোকাল বোর্ড। জনসাধারণের মতে লোকাল বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকে। লোকাল বোর্ডগুলির সভ্য সংখ্যা বোর্ডের পরিমাণ ফল ও লোকসংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	মেম্বারের সংখ্যা	পরিমাণ ফল	লোকসংখ্যা
সদর লোকাল বোর্ড	১২	১২৫৯.৫	৭৯০৯৭৫
নারায়ণগঞ্জ লোকাল বোর্ড	১০	৬৩৬.৫	৬৩৬২৪০
মুন্সিগঞ্জ বোর্ড	১৬	৩৮৬.০	৬৩৮৩৫১
মানিকগঞ্জ বোর্ড	৯	৪৮৯.০	৪৬৮৯৪২
মোট	৪৭	২৭৭১.০	২৫৩৪৫০৮

গোদারা :

গোদারা ঘাটে পূর্বে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব ছিল। ১৮১৬ সনে গভর্নমেন্ট গোদারা স্বত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। জেলা বোর্ড স্থাপিত হইলে গোদারা বন্দোবস্ত জেলা বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত হয়। নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জের মধ্যে একটি স্টিমার দ্বারা পারাপারের কার্য পরিচালিত হয়। ১৮৮৬ সনে ১৬০০০্ টাকা ব্যয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড এই স্টিমার ক্রয় করেন। ১৮৮৮ সনে ট্রাফিক বিভাগ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের হস্তে হইতে ইহার পরিচালনভার গ্রহণ করেন। ১৮৮৯-৯০ সনে বোর্ড পুনরায় তাহা নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। ১৮৯১ সন হইতে এই স্টিমার গোদারা ইজারা বিলির বন্দোবস্ত হইয়াছে।

দুই বৎসর হইল, নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকা ও লাখপুরে দুইখানা স্টিমার গোদারা চলিতেছে।

পাউন্ড :

এই জেলার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীন ১৯৬টি পাউন্ড। গোদারা ঘাট ও পাউন্ডগুলি বৎসর বৎসর প্রকাশ্য ডাকে নিলাম হইয়া থাকে। যে, অধিক জমা দিতে স্বীকার হয়, তাহাকেই মেয়াদি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাউন্ড, ব্যতীত মিউনিসিপ্যালিটির অধীনও পাউন্ড আছে। গোদারা ও পাউন্ডের আয় শিক্ষা কার্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে। ১৮৭৯ সন হইতে মানিকগঞ্জ ব্যতীত অন্যান্য স্থানের পাউন্ডগুলি নিলামে বিলি পাইবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। ১৮৮১ সন হইতে মানিকগঞ্জের পাউন্ডগুলিও ডাকে বিলি হইতেছে।

চিকিৎসালয়

ঢাকার প্রধান চিকিৎসালয় পাগলা গারদ, মিটফোর্ড হাসপাতাল ও লেডি ডাফরিন জননী হাসপাতাল।

পাগলা গারদ :

১৮১৯ সনে শহরের পশ্চিমাংশে চকের নিকট পাগলা গারদ প্রস্তুত হয়। ১৮৬৬ সনে এই গারদে ৫টি বড় আঙ্গিনা, ৭টি ৪জন করিয়া থাকিবার কামরা এবং ৩২টি একজন করিয়া থাকিবার কামরা ছিল। বর্তমান সময় হইতে ২১৭ জন পুরুষ ও ৪৫ জন স্ত্রীলোক বাসের স্থান আছে। এই পাগলা গারদে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের এবং শ্রীহট্ট ও কাছার জেলার রোগী (পাগল) প্রেরিত হইয়া থাকে। পাগলের সংখ্যা অধিকাংশই ফৌজদারী মোকদ্দমার আসামী। এ পর্যন্ত গড়ে বৎসরে ৫২ জন করিয়া পাগল গৃহীত হইতেছে। গারদের বার্ষিক ব্যয় গড়ে ২৬০০০্ টাকা। ব্যয় গভর্নমেন্ট প্রদান করেন। ঢাকার সিভিল সার্জন গারদের সুপারিন্টেডেন্ট ও বড় বড় রাজকর্মচারী ও সম্মানিত লোকগণ সম্মানিত পরিদর্শক (Honorary Visitors)

মহাত্মা মিটফোর্ড ও মিটফোর্ড হাসপাতাল :

১৮৫৮ সানের ১ মে রর্বাট মিটফোর্ড সাহেবের নামে মিটফোর্ড হাসপাতাল স্থাপিত হয়। মিঃ মিটফোর্ড প্রথম ঢাকার কালেক্টর ও শেষ প্রাদেশিক আপিল আদালতের (Provincial Court of Appeal) জজ ছিলেন।

১৮৩৬ সনে মিঃ মিটফোর্ড প্রাণত্যাগ করেন। তিনি মৃত্যুকালে তাহার বিপুল সম্পত্তি (প্রায় ৭।৮ লক্ষ টাকা) ঢাকায় জনসাধারণের উন্নতি ও উপকারের জন্য দান করিয়া সেই দান গভর্নমেন্টের হাতে রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর দানপত্র সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপিত হয়। বিলাতে সেই আপত্তির বিচার আরম্ভ হয়। ১৮৫০ সনে বিচার মীমাংসা হয়। বিলাতের কোর্ট অব চেনসির বঙ্গীয় গভর্নমেন্টকে আংশিক ডিক্রি প্রদান করেন। ঐ ডিক্রি ক্রমে ১৬৬০০০৲ টাকা (প্রায় বার হাজার পাউন্ড) বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট দাতার অভিপ্রেতদানের জন্য প্রাপ্ত হন। অতঃপর ১৮৫৪ সনে হাসপাতালের দালানের কার্য আরম্ভ হয়। যে স্থানে পূর্বে ওলন্দাজদিগের কুঠি ছিল, সেই স্থানে হাসপাতালের দালান প্রস্তুত হইল।

১৮৫৮ সালে মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইলে, গভর্নমেন্টের দেশি হাসপাতাল উঠাইয়া আনিয়া ইহার সহিত মিলিত করিয়া দেওয়া হয় এবং দেশি হাসপাতালের জন্য গভর্নমেন্ট যে ব্যয় প্রদান করিতেন তাহা মিটফোর্ড হাসপাতালে প্রদত্ত হয়। এখন গভর্নমেন্টের উক্ত সাহায্যে ও মহাত্মা মিটফোর্ডের দানের টাকার সুদ হইতে হাসপাতালের খরচ পরিচালিত হইতেছে।[৩]

১৮৬৬ সনে হাসপাতালে ৯২ জন রোগীর স্থান হইত। স্থাপনের তারিখ হইতে ঐ সনের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯০০৫৭ জন রোগী ঔষধ পাইয়াছিলেন।

১৮৮৭ সনে এই হাসপাতালে একটি ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ড খুলিবার প্রস্তাব গভর্নমেন্ট মঞ্জুর করেন।

১৮৮৯—৯০ সনে বাবু শ্রীনাথ রায় (পরে রাজা) তাঁহার স্বর্গীয়া জননীর স্মৃতি সংরক্ষণ জন্য মিটফোর্ড হাসপাতালের সংশ্রবে একটি চক্ষু-চিকিৎসালয় স্থাপন জন্য ৩০০০০৲ হাজার টাকা প্রদান করেন। তদনুসারে একটি Eye ward স্থাপিত হইয়াছে।

১৯০৩ সনে এই হাসপাতালে ১৩৩ জন পুরুষ ও ৩৭ জন স্ত্রীলোক থাকিবার স্থান ছিল। ঐ বৎসর ৩৩৮৪ জন রোগি হাসপাতালে থাকিয়া ও ২৭৭২৬ জন রোগি কেবল ঔষধ দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৪১৮১ জনের অস্ত্র চিকিৎসা হইয়াছে। ঐ বৎসর চিকিৎসালয়ে ব্যয় হইয়াছিল ৫৪০০০৲[৪] বর্তমান সময় এই হাসপাতাল তহবিলে ১৭৬৩০০৲ টাকা রক্ষিত আছে।

১৮৮২ সনে ফিমেল ওয়ার্ড স্থাপিত হয়। নবাব আসানউল্লা ২৭০০০৲ ও ভাওয়ালের রাজা ওয়ার্ডের স্থান ক্রয়ের জন্য ২০০০০৲ টাকা প্রদান করেন।

লেডি ডাফরিন জননী হাসপাতাল :

১৮৮৮-১৮৮৯ সনে রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডাফরিনের ঢাকা আগমন স্মরণীয় রাখিবার জন্য নবাব আসানউল্লা বাহাদুর ৫০০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া লেডি ডাফরিন জননী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করেন। এই হাসপাতালে ৪ জন স্ত্রীলোক থাকিয়া চিকিৎসিত হইবার স্থান আছে। ১৯০৬ সনে এই হাসপাতালে ২৭০৪ জন স্ত্রীলোক চিকিৎসিত হইয়াছিল। হাসপাতাল তহবিলে বর্তমান সময় ৬১৮০৬৲ টাকা আছে।

জেল হাসপাতাল :

প্রাচীন নবাবী টাকশালে জেল হাসপাতাল স্থাপিত। ১৮৩৬ সন পর্যন্ত টাকশালে কোতালী স্থাপিত ছিল। অতঃপর তাহা পাহারাওয়ালাদিগের বাংলোতে পরিণত হয়। ১৮৪৯ সনে

বিনাশ্রমে কয়েদিদিগের জন্য এই স্থান মনোনীত করা হয়। অবশেষে ১৮৫৯ সনে এই টাকশালায় জেল হাসপাতালের স্থান হইয়াছে। এই স্থানে জেলের কয়েদিদিগের চিকিৎসা হয়।

মফঃস্বলের ঔষধালয় :

১৮৭০ সনে পাঁচটি ডিস্পেন্সারি (ঔষধালয়) ছিল। মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর, জৈনসার, ভাগ্যকুল ও কালীপাড়া। ১৮৬৪ সনের ১ আগস্ট মানিকগঞ্জ ডিস্পেন্সারি স্থাপিত হয়। ১৮৬৬ সনে ১ আগস্ট জয়দেবপুরের জমিদারবাবু কালীনারায়ণ রায় জয়দেবপুর ডিস্পেন্সারি স্থাপন করেন। ঐ সনের ১৬ই নভেম্বর ছোট আদালতের জজবাবু অভয়কুমার দত্ত পরগণা বিক্রমপুরের অন্তর্গত জৈনসার নামে ডিস্পেন্সারি স্থাপন করেন। ১৮৬৮ সনে ভাগ্যকুল ও ১৮৭০ সনের মে মাসে কালীপাড়ার ডিস্পেন্সারি স্থাপিত হয়। এই পাঁচটি ডিস্পেন্সারির ডাক্তারের বেতন গভর্নমেন্ট হইতে প্রদত্ত হইত। ১৮৭২ সনে নারায়ণগঞ্জ ও মালুচি ডিস্পেন্সারি স্থাপিত হয়। বাবু ঈশানচন্দ্র রায় মৃত্যুকালে তাহার রঙ্গপুরের এক সম্পত্তি মালুচি ডিস্পেন্সারির ব্যয় নির্বাহের জন রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতেই এই ডিস্পেন্সারির ব্যয় নির্বাহ হয়।[৫]

এরপর ১৮৭৪ সনে মুন্সিগঞ্জ ও বালিয়াটি ডিস্পেন্সারি স্থাপিত হয়। ১৮৭৭ সনে কালীপাড়া ডিস্পেন্সারি শিমুলিয়া স্থানান্তরিত হয় এবং ১৮৮২ সনে শিমুলিয়া ডিস্পেন্সারি উঠাইয়া দেওয়া হয়। জুবিলি উপলক্ষে (ফেব্রুয়ারি মাসে) নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাসপাতল ও ১৮৯০—৯১ সনে নাগরি মিশন ডিস্পেন্সারি স্থাপিত হয়।

বর্তমান সময় এই জেলায় মোট ২৩টি ডিস্পেন্সারি ও হাসপাতাল। এই ২৩টির, ৮টি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের, ২টি মিউনিসিপ্যালিটির একটি মিশনারীদের ও ১২টি স্থানীয় ভূম্যাধিকারীদিগের ব্যয়ে পরিচালিত হয়। এই ২৩টি ডিস্পেন্সারির মধ্য ১৫টিতে গভর্নমেন্টও কিছু কিছু সাহায্য করেন। এই ডিস্পেন্সারিগুলির নাম প্রদত্ত হইল।

(১) ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতাল, (২) নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল, (৩) বলধরা, (৪) বনঘোরা, (৫) মূলচর, (৬) মহাদেবপুর, (৭) তেঘরিয়া, (৮) চূরাইন, (৯) রায়পুরা, (১০) মনোহরদী, (১১) জৈনসার, (১২) মানিকগঞ্জ, (১৩) মুন্সিগঞ্জ, (১৪) নাগরি, (১৫) ঢাকা লেডি ডাফরিন জননী হাসপাতাল।

জয়দেবপুর, ভাগ্যকূল, বালিয়াটি, যোলঘর প্রভৃতি স্থানের ডিস্পেন্সারিগুলি স্থানীয় ভূম্যধিকারীগণের অর্থে পরিচালিত হয়।

এই জেলায় প্রতি লক্ষ অধিবাসীতে ০.৮ টি ও হাজার বর্গমাইলে ৮.২টি ঔষধালয়।

টিকা : পূর্বে সর্বত্র বাঙ্গলা টিকার প্রথা প্রচলিত ছিল। বর্তমানে ইংরেজী টিকা প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। টিকাদারগণ সরকারি ডাক্তারের অধীন। বিগত দশ বৎসরে (১৮৯২-১৯০২) এই জেলায় হাজারে ৩৯ হইতে ৫৯টি টিকা ফলপ্রদ হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে সকলেই টিকা লইতে বাধ্য।

পথ :

মুসলমান রাজত্বে শের সাহ সোনারগাঁও হইতে দিল্লি পর্যন্ত এক রাস্তা প্রস্তুত করেন। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম ভাগে এ জেলায় কোন বাঁধা পথ ছিল না। ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ হইয়া বৈদ্যের বাজার পর্যন্ত ১৬ মাইল পথ গভর্নমেন্টের ব্যয়ে প্রস্তুত হয়। ইহাই গভর্নমেন্টের একমাত্র সড়ক বলিয়া পরিচিত ছিল। অতঃপর গোদারা তহবিলের টাকা দ্বারা (District ferry fund) ঢাকা হইতে টোকচাঁদপুর পর্যন্ত সুবৃহৎ রাস্তা প্রস্তুত হয়। এই রাস্তা ঢাকা হইতে উত্তরাভিমুখে ভাওয়ালের জঙ্গলের মধ্য দিয়া টোকচাঁদপুর পর্যন্ত গিয়াছে এবং তথা হইতে

ময়মনসিংহে গিয়াছে। ঢাকা হইতে টোকা ৪৫ মাইল। এই রাস্তা এ জেলার সর্বপ্রধান রাস্তা। এই রাস্তার উপর স্থানে স্থানে পুল আছে। টঙ্গীর নিকট বালু নদীর[৬] পুল অতি প্রাচীন দর্শনীয়।

ঢাকার সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট কর্নেক সিপাহীদিগের গতিরোধের জন্য ইহার এক অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। ১৮৭৮ সনে ৪৩ হাজার টাকা ব্যয়ে ঐ পুল পুনরায় মেরামত করা হয়। ১৮৯১ সনে ইহা পুনরায় ভাঙ্গিয়া যায়। এরপর পুনরায় মেরামত হইয়াছে। এই প্রাচীন পুল মুসলমান শাসন সময়ের প্রস্তুত। কেহ কেহ বলেন, নবাব ইব্রাহিম খাঁর সময় সাহাটঙ্গী[৭] নামক জনৈক ফকির এই পুল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ মীরজুমলার সময় পুল প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়াও অনুমান করেন। এই পুল ঢাকা হইতে ১৪ মাইল দুরবর্তী। টোক রাস্তার একটি ক্ষুদ্র শাখা ভাওয়ালের রাজার ব্যয়ে ভাওয়াল রাজবাড়ি পর্যন্ত গিয়াছে। ১৮৬০ সনে মুন্সিগঞ্জ হইতে শ্রীনগর পর্যন্ত ১৬ মাইল রাস্তা আরম্ভ হইয়াছিল। বর্ষার জলপ্লাবনে কার্য শেষ হইতে পারে নাই। রিকাবী বাজার পর্যন্ত মাটির কার্য হইয়া স্থগিত থাকে; পরে শেষ হয়। ১৮১৭ সনের মধ্যে আরও ২টি রাস্তা প্রস্তুত হয়। (১) কেরানিগঞ্জ হইতে কোলাটিয়া ৭ মাইল। (২) মানিকগঞ্জ হইতে মহকুমা কাছারি (দাসরা) ২ মাইল। ১৮৭২—৭৩ সনে মানিকগঞ্জ হইতে সিয়ালো পর্যন্ত যাইবার রাস্তা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৭৯ সনে মীরপুর রাস্তা ও ডাঙা-নরসিংদি রাস্তার কার্য হয়। ১৮৮৯—৯০ সনে ডাঙ্গা-কালীগঞ্জ রাস্তা, টঙ্গি-কালীগঞ্জ রাস্তা শ্রীপুর-গসিঙ্গা রাস্তা, পালোরা ও সাভারের রাস্তা প্রস্তুত হয়।

বর্তমান সময় এ জেলায় ৫২২-৩৭ মাইল রাস্তা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের খরচে নির্মিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সাধারণ গ্রাম্য রাস্তা প্রায় ৪০০ মাইল আছে। এই রাস্তাগুলির মধ্যে কেবল ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের রাস্তাটি পাকা।

এই জেলার অধিকাংশ স্থানে বর্ষার সময় নৌকায় যাতায়াত সুবিধাজনক হওয়ায় ঐ সময় সড়কের প্রয়োজন হয় না। অন্যান্য সময় ক্ষেত্রের উপর দিয়া সোজা পথ ধরিয়া লোক চলা ফিরা করিয়া থাকে। সুতরাং সড়কের বা কোন প্রকার রাস্তার অভাব একেবারেই অনুভূত হয় না।

এ জেলার পার্শ্ববর্তী সদর স্টেশন হইতে পার্শ্ববর্তী জেলা সমূহের সদর স্টেশনে যাওয়ার গ্রাম্যপথগুলির বিরণ প্রদত্ত হইল। পূর্বে এই পথে সৈন্য পরিচালিত হইত। (পরিশিষ্ট "জ")

পথকর :

১৮৭২ সনের ১ সেপ্টেম্বর এই জেলায় পথকর স্থাপিত হয়। পূর্বে পথকরের টাকা রোড সেস্, কমিটি হইতে খরচ হইত। জেলা বোর্ড স্থাপিত হইলে পথকরের আয়ব্যয় জেলা বোর্ডের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে।

১. পরবর্তী সময় সংখ্যা হ্রাস করিয়া ১০ জন করা হইয়াছিল।
২. GI Ad. Report 1890-91 page 22.
৩. ১৮৬৬—৬৭ সনে ১৬৬০০্ টাকার সুদ ও গভর্নমেন্ট সাহায্য এরূপ ছিল।
মাসিক সুদ— ৫৭৭।।৫ পাই
মাসিক গভর্নমেন্ট সাহায্য—৪৫৩।।০ (দেশি হাসপাতলের জন্য)
মোট — ১০১৩।।৫
তখন এই মাসিক ব্যয়ে হাসপাতাল চলিত।
৪. এই টাকার ৩৩০০০্ টাকা দালান মেরামত ও প্রস্তুত হইয়াছিল।
৫. DI. Commr's Report—1880-81 Page 26.
৬. টঙ্গী নদী নামেও পরিচিত।
৭. টঙ্গী স্থানটিও তাহা হইলে ফকিরের নামের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত।



দশম অধ্যায়

দেশের অবস্থা

সুভিক্ষ—দুর্ভিক্ষ—নবাবী আমলের রাজার দর; ছিয়াত্তরের মন্বন্তর; মনুষ্য বিক্রয়; দ্রব্যের বিনিময়; শতবৎসর পূর্বের ক্রিয়াকাণ্ডের খরচ; কড়ির মূল্য; দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমানের বিবাহ ও শ্রাদ্ধ ব্যয়; অর্ধ শতাব্দী পূর্বের সুভিক্ষ-দুর্ভিক্ষ; ২৫ বৎসর পূর্বের পারিবারিক খরচ। শ্রমজীবী সাহেবদিগের চাকরের বেতন। জীবিকা—ব্যবসায়ীর সংখ্যা ও অনুপাত, প্রকৃত ব্যবসায়ী; চাকরিজীবীর সংখ্যা; অক্ষম ও অকর্মণ্য। দস্যুতা ও ডাকাতি—স্থলদস্যু, ভাওয়ালের জঙ্গল; দস্যুদমন; লেপ্টেনান্ট শ্লিমান; জলদস্যু—যমুনার পদ্মায়, মেঘনায়। জলবায়ু ও সাধারণ স্বাস্থ্য—কলেরা; গো মড়ক; মেট্রলজি। দৈবঘটনা—ভূমিকম্প; তুর্নড ও জলপ্লাবন; অনাবৃষ্টি।

সুভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষ

নবাবী আমলের রাজার দর :

সপ্তদশ শতাব্দীতে নবাব সায়েস্তা খাঁর শাসনকালে ঢাকায় চাউল এক টাকায় আট মন বিক্রয় হইত। তখন দাম, দামড়ি, কড়ি, সিক্কা[১] প্রভৃতি মুদ্রা প্রচলিত ছিল। ক্রমে এই রাজার দর বৃদ্ধি হইয়া যায় এবং পরবর্তীকালে মুর্শিদকুলি খাঁর সময় টাকায় চারি মন চাউল বিক্রয় হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পুনরায় ঢাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সরপরাজ খাঁর শাসন সময় ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় চাউলের মন পুনরায় ৫ দাম (দুই আনার সমান) হইয়াছিল।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর :

১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশ ব্যাপী মহাদুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। এই দুর্ভিক্ষ ইতিহাস প্রসিদ্ধ "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে পরিচিত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে এতদ্ অঞ্চলে সাধারণ চাউল টাকায় ১২ সের বিক্রয় হইত। এই দুর্ভিক্ষে এ জেলার বহু লোক অন্নাভাবে স্ত্রী পুত্র বিক্রয় এবং আত্মবিক্রয় করিয়া উদর পালনের চেষ্টা করিয়াছে।

মনুষ্য বিক্রয় :

মনুষ্য বিক্রয়ে দলিল সম্পাদন হইত।[২] এই সকল দলিল পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ঐ সময় এক একটি মানুষ ২ ৩ হইতে ৭ ৮ টাকা পর্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হইত। এই দুর্ভিক্ষ সময় অবস্থাপন্ন লোক বহু দিঘি, পুষ্করিনী ও ইষ্টকালয় প্রস্তুত করাইয়া বহু লোকের আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দরিদ্র লোক পেটের জ্বালায় তখন কেবলমাত্র আহার পাইয়াই মজুরি করিত। ১৭৮৭—৮৮ সনে পুনরায় এ জেলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষে টাকায় ৪ সের মাত্র চাউল বিক্রয় হইয়াছিল।

দ্রব্যের বিনিময় :

সেকালে দেশে অর্থের অভাব ছিল। দুর্ভিক্ষের সময় ব্যতীত জিনিসের তেমন অভাব হইত না। অর্থাভাবে এক দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্য পাওয়া যাইত। অতি বৃষ্টি অনাবৃষ্টি বা অন্য

কোন দৈবদুর্বিপাকে ফসল নষ্ট না হইলে টাকার অভাব তখন কেহ অনুভব করিত না। যুগী বস্ত্র বিনিময়ে কৃষকের নিকট হইতে ধান চাউল গ্রহণ করিত। কৃষক ও তাহার কৃষিজাত দ্রব্যের বিনিময়ে তৈল লবণ মৎস্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করিত। সরকারি রাজস্ব প্রদান ও তদনুরূপ গুরুতর কার্য ব্যতীত নগদ মুদ্রার প্রয়োজন প্রায় হইত না। ভৃত্যের বেতন, গুরু মহাশয়ের বেতন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধান্য দ্বারাই প্রদত্ত হইত। নাপিত, ধোপা, পুরোহিত, প্রভৃতির কার্যের জন্য পৃথক পৃথক জমির বন্দোবস্ত ছিল।

শত বৎসর পূর্বের ক্রিয়াকাণ্ডের খরচ :

তৎকালে ধনী সম্প্রদায়ের ব্যাপারাদিতে কিরূপ ব্যয় হইত তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য মৎপ্রণীত "ময়মনসিংহের বিবরণ" হইতে ঐ জেলার কোন জমিদার পরিবারের শত বৎসর পূর্বের একটি ব্যাপারের ব্যয় তালিকা উদ্ধৃত করা গেল। ময়মনসিংহ ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলা; সুতরাং এই তালিকা হইতে মোটামুটি তৎকালীন দেশের অবস্থা কতক পরিমাণে অবগত হওয়া যাইতে পারে।

শ্রীশ্রী দুর্গা

সন ১২১১

হিসাব জিনিস খরিদ হাট সাহাগঞ্জ

(তারিখ ২৮ জ্যৈষ্ঠ)

আসামী	জিনিস	রোপৈয়া-কৌড়ি
হরিদ্রা	২	৭ আনা
সিন্দুর	১দফা	৩ আনা ১০ পাই
চুন	২।। সের	১ আনা ১০ পাই
পান	২০ কুড়ি	১ টাকা ৮ আনা
তামাক	১	১ আনা
ডিঙ্গাকলা	১ ছড়ি	১৩ আনা
মরিচ	১২ সের	৭ আনা
মাষ কলাই	৫	১ টাকা ৫ আনা
মসলা	১ দফা	২ আনা ১০ পাই
দাইল	সাড়ে ৭ সের	৭ আনা ১০ পাই
লবন	৭ সের	৪ টাকা ৬ আনা
চিনি	৭ সের	৫ আনা ১০ পাই
আমলি	আড়াই সের	২ আনা ১৫ পাই
ভার	৫ টা	২ আনা ১০ পাই
কাছলা	২ টা	২ আনা
পাতিল	৫ টা	১ আনা সাড়ে ১৭ পাই
××	২ টা	২ আনা ১০ পাই
তেজপাতা	১ দফা	১ আনা
টিকিয়া	১ দফা	১ আনা
বাঁশ	১ দফা	১ টাকা ১২ আনা
পাট	সোয়া সের	২ আনা ১৫ পাই
সন্ধক লবণ		
ডিম	১ দফা	

ছিকর	১ দফা	আড়াই পাই
লঙ্গ	আধ তোলা	৪ আনা
সাদা কাগজ	দেড় দিস্তা	৪ আনা
সুপারি	৪ সের	৫ টাকা ৯ আনা
মৎস্য	১ টা	৫ আনা
মটুকের-রাংচা	১ দফা	৫ আনা
××		
নাও কেরেয়া ××		
আয়না মাল	৮ আনা	
কেবলা পাটুনি	৯ আনা	
দুয়ারিয়া পাটুনি	৫ আনা	
		২১ টাকা ৯ আনা
সাবেক পাওনা ইত্যাদি		১ টাকা ৯ আনা ৫ পাই
বাদ কৈকিয়ৎ ফেরত		৯ আনা
		২৩ টাকা ১৪ আনা ৫ পাই

কাপড়		রেপৈয়া	কৌড়ি
গুনি	১ জুর	১২ আনা	
(অস্পষ্ট)	৩ খান	১ টাকা ১৪ আনা	
পাচ যাতি	১ খান	৪ আনা	
গামছা	১ খান	৪ পয়সা	
গাজি	১ খান	৪ পয়সা	
এক পাট্টা	১ খান	১৩ আনা ১০ পাই	
পাগোড়ি পটাক	৪ গাছ	১২ আনা ১০ পাই	
		৫ টাকা ৫ পাই	

কড়ির মূল্য :

এই সময় টাকায় সোওয়া তিন কাহনের অধিক কড়ি পাওয়া যাইত। ফর্দের লিখিত ২৩ ৫ কড়ি ৭ টাকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়েছিল। সুতরাং এই ব্যাপার ১২ টাকায় সম্পন্ন হইয়াছিল। চাউল, চিড়া, তৈল প্রভৃতির ব্যয় এই ফর্দে নাই। এই সকল দ্রব্য ক্রয় থাকিলেও এই ব্যাপারে ২০ টাকার অধিক ব্যয় হয় নাই।

দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমানের বিবাহ ও শ্রাদ্ধ ব্যয় :

১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে টেলার সাহেব "Topography of Dacca" লিখিয়াছিলেন। ঐ সময়ের দ্রব্যের মূল্য ও সাধারণের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমানের বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদির যে তালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই তালিকা দ্বারা ও ৬০।৭০ বৎসরের পূর্বের অবস্থা অনুমান করা যাইতে পারে।

দরিদ্র হিন্দুর বিবাহ ব্যয়

ব্রাহ্মণ	১ টাকা
বাদ্যকর	৪ আনা
বরকন্যার কাপড়	২ টাকা
শাঁখা ও অন্যান্য অলঙ্কার	২ টাকা
চিরুনি ও সিন্দুর	৪ আনা

ধোপা	৪ আনা
নাপিত	৪ আনা
ভোজন ব্যয়	২ টাকা
অন্যান্য	১ টাকা
বর কন্যার মুকুট	১ টাকা
	১০ টাকা

দরিদ্র মুসলমানের বিবাহের ব্যয়

কাজি	৮ আনা
বর কন্যার-কাপড়	৩ টাকা
নাপিত	৪ আনা
চিরুনি প্রভৃতি	৪ আনা
অলঙ্কার (লাক্ষার চুড়ি)	৮ আনা
ভোজন ব্যয়	২ টাকা
বাদ্যকর ও অন্যান্য খরচ	৩ টাকা
বর কন্যার মুকুট	৮ আনা
	১০ টাকা

দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয়

হিন্দু—		মুসলমান—	
নতুন বস্ত্র	৮ আনা	কবর প্রস্তুত কারক	১২ আনা
জ্বালানি কাষ্ঠ	১ টাকা ৪ আনা	কাপড় বাঁশ প্রভৃতি	১ টাকা
ঘৃত, চন্দন, বাঁশ	৪ আনা	মোল্লা	৪ আনা
	২ টাকা		২ টাকা

দরিদ্র হিন্দুর শ্রাদ্ধ

ব্রাহ্মণ	১ টাকা
কাপড়	১ টাকা
চাউল দাইল	২ টাকা
ব্রাহ্মণ ভোজন	১ টাকা
তৈজস পত্র	১ টাকা
নাপিত	৪ আনা
ধোপা	৪ আনা
বিবিধ	৮ আনা
	৭ টাকা

দরিদ্র মুসলমানের ৪র্থ ফতেহা

মোল্লা	১ টাকা
খাদ্য	৪ আনা
তাম্রপাত্র প্রভৃতি	১ টাকা
দরিদ্র বিদায় (কড়ি)	৪ আনা
১ম, ২য় ও ৩য় ফতেহার খরচ	২ টাকা ৮ আনা
	৫ টাকা

টেলার সাহেবের ব্যয় তালিকা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। টেলার লিখিয়াছেন, ঐ সময় ঢাকা জেলায় সাধারণ একটি মজুরের ভোজনে দৈনিক ১২।। আড়াই

পয়সা মাত্র ব্যয় হইত। দুইজন চারজন একত্রে বাস করিলে গড়ে প্রতিজনের খরচ ১২।। অপেক্ষা ও কম পড়িত। ঐ সময় ঢাকায় কোন সরাই বা হোটেল খানা ছিল না। আগন্তুক লোক আখরায় ভোজন করিত। শহরের বহু সম্ভ্রান্ত আফিসের কর্মচারীরাও আখরায় খাইয়া কার্য করিতেন। ঢাকা শহরে তখন অনেক আখরা ছিল। আখরায় প্রতিজনে রোজ খোরাকী এক আনা করিয়া দিলেই দুই বেলা ডাল ও ভাত উদরপূর্ণ করিয়া খাওয়া যাইত। সুতরাং তখন দুই টাকায় ৬০।৭০ জন লোক সাধারণভাবে ভোজন করিতে পারিত ইহা অতিশয় উক্তি নহে।

অর্ধশতাব্দী-পূর্বের সুভিক্ষ-দুর্ভিক্ষ :

১৮৬৫ সনে এ জেলার চাউল বেশ সস্তা ছিল। ঐ সনে উৎকৃষ্ট চাউল প্রতি টাকায় ১৪ সের, আতপ চাউল ৩০সের ও সাধারণ চাউল টাকায় এক মন ছিল। ঐ সনে উড়িষ্যায় ভীষণ দুর্ভিক্ষের সূচনা দেখা যায়। ক্রমে এ জেলা হইতে বহু চাউল উড়িষ্যায় প্রেরিত হয়। ১৮৬৬ সনে একেবারে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় এ জেলায়ও ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ঐ বৎসর প্রতি মাসে শস্যের মূল্য কিরূপ ছিল, তাহা প্রদর্শিত হইল।

সময়	উৎকৃষ্ট চাউল	আতব চাউল	সাধারণ চাউল	খেশারি চাউল	নতুন চাউল
মে, জুন, জুলাই	/৬ সের	/৮ সের	/৯ সের	/৯ সের	—
আগস্ট	।৫।। সের	/৮ সের	।৮ সের	।৪।। সের	—
সেপ্টেম্বর	/৬—৭ সের	/৮ সের	/৯ সের	।৬ সের	—
অ'ৌবর	/৫।। সের	।৮ সের	/৯ সের	।৪ সের	—
নভেম্বর	/৬ সের	।১ সের	।৫ সের	।৪ সের	৩
ডিসেম্বর	/৬ সের	।৩ সের	।৭ সের	।।২ সের	।৫

ঢাকার তদানিন্তন ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর ক্লে সাহেব লিখিয়াছেন, ঐ সময় সাধারণ লোক এক বেলা খাইত এবং বহু লোক চিনা কাওন খাইয়া দিন যাপন করিত। অনেক ভদ্র পরিবারেরও এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় দিন অতিবাহিত হইত। কেহ কেহ বার্লি, সাগু ও ফলমূল খাইয়া থাকিত। এই সময় ঢাকার লোক দরিদ্র ভিখারিদিগকে অন্নদান করিতেন।

লঙ্গরখানা :

গনি মিঞা সাহেব দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখিয়া ভিখারি প্রতিপালনের জন্য "লঙ্গরখানা" স্থাপন করিয়াছিলেন। এই লঙ্গরখানায় বহু দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট লোক প্রতিপালিত হইয়াছিল।[৩]

সে বৎসর বৃষ্টিমাত্র ২৯.৪২ ইঞ্চি হইয়াছিল।

পর-বৎসরের মধ্যভাগে জিনিসের দর কমিয়াছিল। ঐ সময় ঢাকার যে সকল জিনিস ক্রয় বিক্রয় হইত, তাহার মূল্য প্রদত্ত হইল।

পাট (ভাল)	প্রতি মন	২ টাকা ৫ আনা
পাট (সাধারণ)	প্রতি মন	২ টাকা ১ আনা
তিসি	প্রতি মন	২ টাকা ১২ আনা
সরিষা	প্রতি মন	২ টাকা ৯ আনা
তিল	প্রতি মন	২ টাকা ৯ আনা
ভারতীয় রবারের বল	প্রতি মন	৩০ টাকা
লাক্ষা (লম্বা)	প্রতি মন	৮ টাকা
লাক্ষা (পাত)	প্রতি মন	১২ টাকা ১১ আনা
লাক্ষা (বীজোৎপন্ন)	প্রতি মন	১০ টাকা ১২ আনা
সুপারি (মানিকচণ্ডী)	প্রতি মন	৭ টাকা ১২ আনা

সুপারি (রায়পুরা)	প্রতি মন	৭ টাকা ৪ আনা
চাউল (সাধারণ)	প্রতি মন	১ টাকা ১৩ আনা
চাউল (রাইমুখী)	প্রতি মন	২ টাকা ২ আনা
কত (মগা)	প্রতি মন	১২ টাকা ১২ আনা
ঘৃত (মধ্যম)	প্রতি মন	২৭ টাকা ৮ আনা
তামাকপাতা	প্রতি মন	৮ টাকা ৮ আনা
তামাক নিকৃষ্ট পাতা	প্রতি মন	৪ টাকা ২ আনা
হরিদ্রা	প্রতি মন	৫ টাকা ৮ আনা
তুলা	প্রতি মন	২২ টাকা ৪ আনা
কার্পাস বীজসহ	প্রতি মন	৭ টাকা ১০ আনা
শুকনো মরিচ	প্রতি মন	৫ টাকা ২ আনা
ধান	প্রতি মন	১ টাকা ২ আনা
সরিষা	প্রতি মন	১০ টাকা ১২ আনা
বুট (পাটনাই)	প্রতি মন	২ টাকা ২ আনা
বুট (দেশি)	প্রতি মন	১ টাকা ১৪ আনা
কলাই	প্রতি মন	১ টাকা ৮ আনা
মুগ	প্রতি মন	২ টাকা ৮ আনা
গম (চাম্পূরী)	প্রতি মন	২ টাকা ১০ আনা
গম (গঙ্গাজলী)	প্রতি মন	২ টাকা ১২ আনা
বার্লি	প্রতি মন	২ টাকা ৮ আনা
ঢাকাই সাবান	প্রতি মন	১০ টাকা
গোল মরিচ	প্রতি মন	১২ টাকা ৮ আনা
লবণ	প্রতি মন	৫ টাকা
চাকের মোম	প্রতি মন	৪৮ টাকা
চাকের মোম (মিশ্রিত)	প্রতি মন	৩৮ টাকা
দস্তা	প্রতি মন	১৩ টাকা ৮ আনা
টিন বা রাং	প্রতি মন	৩২ টাকা ৮ আনা
লোহা (বিলাতি)	প্রতি মন	৫ টাকা
লোহা (দেশি)	প্রতি মন	৭ টাকা
তামার নতুন জিনিস	প্রতি মন	৫০ টাকা
তামার পুরাতন জিনিস	প্রতি মন	৩৫ টাকা
সোনার পাত (চীনা)	প্রতি ভরি	১৬ টাকা ৬ আনা
সোনার মোহর (নতুন)	১টা	১৫ টাকা ৪ আনা
চুন	১০০ মন	৫৭ টাকা
ছালা (পূর্ব দেশি)	১০০টা	১৫ টাকা
ছালা (বিক্রমপুরী)	১০০টা	১৫ টাকা
ছালা (কশুরা)	১০০টা	১৩ টাকা
চামড়া (মৃত পশুর)	১০০টা	১০০—১২৫ টাকা
চামড়া (ধৃত পশুর)	১০০টা	১৫০—১৭৫ টাকা

২৫ বৎসর পূর্বে

পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বেও এ জেলার চাউলের মন দেড় টাকা ছিল। তখন সাধারণভাবে

থাকিতে গেলে জন প্রতি মাসে ২।৩ টাকার অধিক ব্যয় হইত না। ১৮৭১ সনে ঢাকার তদানীন্তন কা'লেক্টর ৫ জন লোক সমন্বিত ধনী পরিবারের মাসিক ব্যয় দুগ্ধ ঘৃত সহ ২ পাউন্ড ৬ পেন্স (তৎকালীন ২০ টাকা ৪ আনা) অনুমান করিয়াছিলেন। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব করিয়াই এইরূপ অনুক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার সেই হিসাব প্রদত্ত হইল। তখন চাউলের মন দেড় টাকা ছিল।

পরিবারে লোক পাঁচজন। ৩ জন পরিণত বয়স্ক ও ২ জন অল্প বয়স্ক।

চাউল	৩ মন	৪ টাকা
দাইল	সের	১২ আনা
লবন	২	৪ আনা
তৈল	৫	দেড় আনা
মাছ	১ দফা	২ টাকা
তরকারি	১ দফা	১২ আনা
হরিদ্রা	১ দফা	৪ আনা
লঙ্কা	১ দফা	২ আনা
মসল্লা	১ দফা	২ আনা
পান সুপারি	১ দফা	৮ আনা
চিনি	১ দফা	১ টাকা
দুগ্ধ	১ দফা	দেড় টাকা
ফল ফলারি	১ দফা	১০ আনা
চাকর	১ দফা	৪ আনা
লাকুরী	১ দফা	১ টাকা
বস্ত্রাদি পোষাক পরিচ্ছদ	১ দফা	৩ টাকা
গৃহ মেরামত	১ দফা	দেড় টাকা
বিবিধ	১ দফা	
		২০ টাকা ৪ আনা

হান্টার সাহেব এই তালিকার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, এইরূপ জনসংখ্যাযুক্ত (৫ জন) গৃহস্থ পরিবারে ইহা অপেক্ষাও অনেক অল্প ব্যয় পড়িত। গৃহস্থ চাউল, দাইল, তরিতরকারি, রসুন, পিঁয়াজ, লঙ্কা, তামাক, সুপারি, সকলই নিজ ক্ষেত্রে উৎপন্ন করে। মৎস্যও অবসর সময়ে প্রায় প্রতিদিনই ধরিয়া আনে।

তিনি এইরূপ গৃহস্থ পরিবারের মাসিক ব্যয় তাহাদের ক্ষেত্রে উপার্জিত জিনিসের মূল্য ধরিয়াও ১০৲ টাকার অধিক অনুমান করেন না। হান্টার সাহেবের প্রদর্শিত হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই হিসাবের পার্শ্বে ঐরূপ সাধারণ গৃহস্থ গৃহের বর্তমান ব্যয়ও প্রদর্শিত হইল।

পরিবার— সাধারণ গৃহস্থ; জনসংখ্যা ৫ পাঁচজন, ৩ জন পরিণত বয়স্ক, ২জন অল্প বয়স্ক।

জিনিস	পরিমাণ	মূল্য	বর্তমান সময়ের বাজার দর
চাউল	৩।।০ মন	৪ টাকা ১২ আনা	১৯ টাকা ৪ আনা
দাইল	/৮ সের	৮ আনা	১ টাকা ৮ আনা
লবণ	/২	৪ আনা	২ আনা ১০ পাই
তৈল	/২	৯ আনা	১ টাকা ২ আনা
তরকারি	১ দফা	৪ আনা	২ টাকা
চিনি গুড়	১ দফা	৪ আনা	১ টাকা
হরিদ্রা	/.	১ আনা .	১ আনা

দেশের অবস্থা

লঙ্কা	২ আনা	৮ আনা
পিয়াজ	৪ আনা	১ আনা
পান সুপারি	৪ আনা	১ টাকা
জ্বালানি কাষ্ঠ	৮ আনা	৪ টাকা
মাছ	৮ আনা	৪ টাকা
কাপড় ইত্যাদি	১২ আনা	৪ টাকা
ঘর মেরামত	৪ আনা	—
অতিরিক্ত	৯ আনা	—
	৯ টাকা ৮ আনা	১২ টাকা ৮ আনা ১০ পাই

গভর্নমেন্টের দুর্ভিক্ষবিধি (Famine code) অনুসারে টাকায় দশ সের চাউল বিক্রি হইলে "দুর্ভিক্ষ" বলিয়া গণ্য করা হয়। ঢাকার সর্বত্র সাধারণ চাউল ৫।।০ টাকা মন বিক্রয় হইতেছে। চাউলের এই মূল্য এখন প্রায় স্থায়ী মূল্যে দাঁড়াইয়াছে। ৩৫ বৎসর পূর্বে কেহই এরূপ সুদীর্ঘ "আকালের" কথা ভাবিতে পারিয়াছিলেন না। তখন অনেকেই পূর্ববঙ্গকে "আকালমারা" দেশ বলিয়া মনে করিতেন।[৪] উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ ঢাকাতে এখন আর হইতেই পারে না— এইরূপ ধারণাও অনেকের ছিল।[৫]

শ্রমজীবী :

পূর্বাপেক্ষা বর্তমান সময়ে চাকরের বেতন অনেক বৃদ্ধি পাইতেছে। শত বৎসর পূর্বে পেটে ভাতেই লোক চাকুরি করিত। ২।৪।১০ দিনের কাজ লোক ডাকিয়া আনিয়া মুখের দুটি মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়াও করাইয়া লাওয়া যাইত। বর্তমান সময়ের ন্যায় "জীবনসংগ্রাম" তখন ছিল না, তাই বিনা পয়সায় অথবা পেটে ভাতে এইরূপ কাজ হইত। ৫০ বৎসর পূর্বে ১২ বৎসরের বালক চাকরের বেতন মাসিক ২ আনা হইতে ৪ আনা ছিল। ১৮৭০ সনে ও ঢাকায় বালক চাকরের বেতন ৪ আনা ছিল। ঐ সময় পূর্ণ বয়স্ক চাকরের বেতন দেড় টাকা পর্যন্ত ছিল। ২৫ বৎসর পূর্বে দৈনিক "ঘরামী" এক বেলা খাইয়া ২ আনা ও আপ খোরাকী ২ আনা পাইত। ৩০।৪০ বৎসর পূর্বে সাধারণ শ্রমজীবীদিগের উপার্জন কিরূপ ছিল, তাহা জেলা বিবরণী হইতে উদ্ধৃত হইল।

সাধারণ দৈনিক মজুর মাসিক	৩ টাকা ১২ আনা
ভাল দৈনিক মজুর মাসিক	৫ টাকা—৬ টাকা
রাজমিস্ত্রী দৈনিক মজুর মাসিক	৪ টাকা—১২ টাকা
সূত্রধার দৈনিক মজুর মাসিক	সাড়ে ৭ টাকা—১৩ টাকা
কর্মকার দৈনিক মজুর মাসিক	১০ টাকা
স্বর্ণকার দৈনিক মজুর মাসিক	১২ টাকা

সাহেবদিগের চাকরের বেতন :

ইয়োরোপীয় বণিক সমাজ যখন এ দেশে আসিয়াছিলেন, সে সময় পয়সা লইয়া চাকুরি করিবার প্রথা এ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল না। ভদ্রলোকদিগের গৃহকার্য ক্রীতদাস বা গোলাম দ্বারা পরিচালিত হইত। ক্রীতদাশ পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে চাকুরি করিত। অন্যান্য কার্যের জন্য সকলেই নানকার "লাখেরাজ" প্রভৃতি ভোগাধিকারের স্বত্ব পাইয়া কার্য করিত। ইংরেজ ও অন্যান্য বৈদেশিক বণিকগণ তখন চাকর অভাবে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতেন। যে চাকর যখন যাহা দাবী করিত তাহাকে তাহা দিয়াই কার্য করাইতে বাধ্য করিতেন।

১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে তদানিন্তন কোর্ট অব জমিন্দাস বা জমিদার সভা সাহেবদিগের এইরূপ অসুবিধা দেখিয়া তাঁহাদিগের চাকরের বেতন নির্ধারিত করিয়া দেন। কোন শ্রেণীর লোকের কিরূপ বেতন নির্ধারিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

খানসামা	মাসিক	৫ টাকা
চোপদার	মাসিক	৫ টাকা
বাবুর্চি	মাসিক	৫ টাকা
কোচওয়ান	মাসিক	৫ টাকা
প্রধান চাকরানি	মাসিক	৫ টাকা
জমাদার	মাসিক	৪ টাকা
বাবুর্চির সাহায্যকারী	মাসিক	৩ টাকা
ধাত্রী	মাসিক	৩ টাকা
প্রধান বেহারা	মাসিক	৩ টাকা
সাহায্যকারিনী দাসী	মাসিক	৩ টাকা
পিয়ন	মাসিক	২ টাকা ৮ আনা
বেহারা	মাসিক	২ টাকা ৮ আনা
ধোপা (বিবাহত ব্যক্তির)	মাসিক	৩ টাকা
ধোপা (অবিবাহিত ব্যক্তির)	মাসিক	দেড় টাকা
ঘোড়ার সহিস	মাসিক	২ টাকা
মশালচি	মাসিক	২ টাকা
নাপিত	মাসিক	দেড় টাকা
কারপরদার	মাসিক	২ টাকা
মালি	মাসিক	২ টাকা
ঘোড়া ঘসেরা	মাসিক	দেড় টাকা

এই হার কিছুদিন পর্যন্ত চলিয়াছিল। ইহার পর দেশিয় লোক ভয়ে ও নানা কারণে সাহেবদিগের নিকট চাকুরি করিতে সাহস পাইত না। অগত্যা সাহেবেরা পূর্বোক্ত হার ধার্য থাকা সত্ত্বেও ইহাদিগের বেতন দ্বিগুণ এবং কোন স্থলে ত্রিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এইরূপে শ্রমজীবীদিগের ন্যায় কৃষিজীবীদিগেরও পারিশ্রমিকের হার ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে।[৬]

শ্রমজীবীদিগের বর্তমান সময়ের পারিশ্রমিক ডিস্ট্রিক্ট গেজেটে টীয়ার হইতে উদ্ধৃত হইল শ্রমজীবীর বেতন।

উৎকৃষ্ট মিস্ত্রি	দৈনিক	১২ আনা
সাধারণ মিস্ত্রি	দৈনিক	৬ আনা
উৎকৃষ্ট সূত্রধর	দৈনিক	৬ আনা
সাধারণ সূত্রধর	দৈনিক	৬ আনা
কুলি	দৈনিক	২ আনা ১০ পয়সা
স্ত্রীলোক	দৈনিক	২ আনা
বালক	দৈনিক	৫ আনা
ঘরামী	দৈনিক	১০ আনা
উৎকৃষ্ট কর্মকার	দৈনিক	৫ আনা
সাধারণ	দৈনিক	৬ আনা

জীবিকা

ব্যবসায়ীর সংখ্যা ও অনুপাত :

এই জেলার মোট অধিবাসীর সংখ্যার মধ্যে ১৭২৯৯০৮ জন কৃষিজীবী, ৪৯৩০৬৫ জন শিল্পজীবী, ৪৭৯১৪ জন বাণিজ্য ব্যবসায়ী ও ৭১৩১০ জন পৈত্রিক ব্যবসায় রক্ষা করিয়া আছে। জেলার লোক সমষ্টির হিসাবে গড়ে হাজার প্রতি ৬৫৩ জন কৃষিজীবী, ১৮৬ জন শিল্পজীবী, ১৮ জন বাণিজ্য ব্যবসায়ী এবং ২৬ জন পৈত্রিক ব্যবসায়ী।

প্রকৃত ব্যবসায়ী :

ব্যবসায়ী বলিয়া যে সংখ্যা প্রদত্ত হইল, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই প্রদত্ত সংখ্যার সকলেই ব্যবসা লিপ্ত নহে। কৃষিজীবীদিগের মধ্যে শতকরা ২৯ জন মাত্র কৃষিকার্য করিয়া থাকে। এইরূপ শিল্প ব্যবসায় শতকরা ৩৩ জন, বাণিজ্য ব্যবসায় শতকরা ২৮ জন ও পৈত্রিক ব্যবসায় শতকরা ৩৬ জন নিযুক্ত আছে। অবশিষ্ট, স্ত্রীলোক, শিশু, অক্ষম, অকর্মণ্য অথবা অন্যান্য কারণে প্রকৃত কার্যকারীদিগের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

চাকুরিজীবীর সংখ্যা :

ঢাকা জেলায় চাকরিজীবীর সংখ্যা অধিক। বাঙ্গালা ও আসামের সর্বত্র এই জেলার লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বিক্রমপুর পরগণার লোক সর্বপেক্ষা অধিক। মানিকগঞ্জের অনেক লোক নানা স্থানে দপ্তরির ও খানসামার কার্য করিয়া থাকে।[৭] বিক্রমপুরবাসীদিগের অধ্যবসায়ের তুলনা নাই। কোন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লিখিয়াছেন, "অভাব এবং দারিদ্রতাই ইহাদিগকে গৃহ হইতে বাহির্গত করিয়াছে"।[৮]

শ্রীনগর থানার শতকরা ৫৩ জনকে কৃষি ব্যতিরেকে কেবল চাকরি ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়। মুন্সিগঞ্জের শতকরা ৩৯ জনকে কৃষি ব্যতিরেকে চাকরি ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়। ঢাকার অন্যান্য স্থানে চাকরিজীবির সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক কম। কৃষিজীবির সংখ্যা বেশি। কাপাসিয়া থানায় শতকরা ১৩ জন মাত্র কৃষি ব্যতিরেকে চাকরি ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে।

ঢাকা জেলার তালুকদারদিগের মধ্যে ১৭৩৬ জন চাকরি ব্যবসায়ী। ইহাদের ১৬৮০ জন পুরুষ ও ৫৫ জন স্ত্রীলোক। প্রজা সাধারণের মধ্যে ৩৬৩৬৩ জন চাকরি ও ব্যবসায়ী। ইহাদের ৩৫৫৮৮ জন পুরষ ও ৭৭৫ জন স্ত্রীলোক। এ জেলার সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে কত জন চাকরি ব্যবসায়ী ও কত জন কিরূপ ভাবে জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে, তাহা প্রদর্শিত হইল। (পরিশিষ্ঠ "ঋ")

অক্ষম ও অকর্মণ্য :

উপার্জন অক্ষম বালক বালিকা ব্যতীত এ জেলায় ৫৬১৮ জন লোক শারীরিক ব্যধিতে অকর্মণ্য। তাহাদের তালিকা প্রদত্ত হইল।

	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
পাগল	১৩৯৮	৮৬৯	৫২৯
কালা-বোবা	১৭০৬	৯৭২	৭৩৪
অন্ধ	১৮৫৩	১০৪১	৮১২
কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ	৬৭০	৫১৫	১৫৫
	৫৬২৭[১০]	৩৩৯৭	২২৩০

যাহারা মস্তিষ্কের বিকৃতি দোষে পাগল হইয়াছে, তাহাদের অনেকেই "গাঁজাখোর।" কেহ

কেহ মনে করেন গাঁজার মূল্য বৃদ্ধি হইয়া যাওয়ায় গাঁজা না খাইতে পাইয়া অনেকে পাগল হইয়াছে।[১১]

এ জেলার ধানের চাষে ৯ লক্ষ একর বা ২৭ লক্ষ বিঘা জমি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ জেলার প্রকৃত লোকসংখ্যাও ২৭ লক্ষ। সুতরাং ধানজমি জন প্রতি ১বিঘা করিয়া পড়িয়াছে। এ জেলায় ধানের চাষে যে জমি ব্যবহৃত আছে, তাহা জেলার লোক প্রতিপালনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। ঢাকা জেলার অধিবাসী পার্শ্ববর্তী জেলা সমূহের ফসলের উপর প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে।[১২]

ঢাকার কমিশনার লায়েল সাহেব লিখিয়াছেন, "এই জেলার সাধারণ লোকের অবস্থা সময় সময় অত্যন্ত শোচনীয় বলিয়াই মনে হয় বটে, কিন্তু তাহাদিগের রুচি, সখ, আমোদ-প্রমোদ, বাড়ি-ঘর, পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কারপত্র এবং স্ত্রীর সংখ্যাধিক্যের (!) বিষয় আলোচনা করিলে তাহাদিগের আভ্যন্তরিক শোচনীয়তা অনুভূত হয় না। এই মন্তব্য সকল স্থলে ঠিক নহে। শহরের অধিবাসীদিগের সম্বন্ধেই এই মন্তব্য প্রযোজ্য হইতে পারে।

দস্যুতা ও ডাকাতি :

সে সময় দস্যুর ভয়ে দেশের লোক অস্থির থাকিত। অনেক ভদ্র গৃহস্থ তখন দস্যু প্রতিপালন করিতেন এবং সময় সময় নিজেরাও দস্যুবৃত্তি করিতেন। ধলেশ্বরীর উত্তর তীর ভাগ নিবিড় জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। ঐ সকল জঙ্গলে হিংস্র জন্তুর ন্যায় দস্যু লুকাইয়া থাকিত ও পথিকের প্রাণ হনন করিয়া তাহার যথা সর্বস্ব লুণ্ঠন করিত।

স্থলদস্যু ভাওয়ালের জঙ্গলে :

ভাওয়ালের বনে কেহ একা পথ চলিতে পারিত না। এই বনে বহু দুর্ভাগ্য পথিককে দস্যুহস্তে বিপন্ন হইয়া প্রাণ দিতে হইয়াছে। ঢাকা হইতে টোক পর্যন্ত যে পথ গিয়াছে ঐ পথের পার্শ্বে, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'মুদি দোকান' ছিল। দোকানীদিগের সহিত দস্যুদিগের যোগ থাকিত। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমাগত পথিকদিগকে যথারীতি আশ্রয় ও আহার প্রদান করিয়া গভীর নিশীথে সেই আশ্রয়দাতা মুদীই সংহারক-মূর্তি ধারণ করিয়া আশ্রিত পথিকের যথা সর্বস্ব লুণ্ঠন করিত।[১৩]

এই বনে এক কেহ পথ চলিত না, সন্ধ্যার পূর্বে পথিকগণ আসিয়া একে একে ঐ সকল দোকানে মিলিত হইত, ক্রমে ৫।৭।১০ জন মিলিত হইলে সকলে মিলিয়া রাত্রি থাকিতে পুনরায় রওয়ানা হইত। রাত্রিকালে হিংস্র জন্তুর ভয়ে পথিকগণ মশাল জ্বালিয়া এই ভীষণ অরণ্য অতিক্রম করিতেন।

ঠগ :

বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই জঙ্গলে দেশিয় দস্যু ব্যতীত পশ্চিম দেশিয় ঠগের প্রাদুর্ভাব হয়। এই ঠগী সম্প্রদায় তখন ভারতবর্ষময় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারা ভদ্রলোকের বেশ ধারণ করিয়া আসিয়া ঐ সকল বনপথ অতিক্রম করিতে যাইয়া নিরীহ পথিকের গলদেশে গামছা, বাধিয়া তাহাকে বিপন্ন করিত, এই সেই ভদ্রবেশধারী ঠগের ইঙ্গিতে এদিক ওদিক হইতে আরও ২।৪ জন আসিয় সেই পথিকের যথাসর্বস্ব অপহরণ করিত।

ঠগীদমন—লেপ্টেন্যান্ট স্লিম্যান :

এই সকল ঠগ দমনের জন্য ১৮৩৫ সনে লেপ্টেন্যান্ট স্লিম্যান সিংহে ঠগী অফিস স্থাপিত হয়। নবাবের টাকশালা (বর্তমান জেলা হাসপাতাল) ঠগী কারাগারে পরিণত হয়। ক্রমে বহু ঠগ ধরা পড়ে। এইরূপে পশ্চিমা ঠগের-উপদ্রবও কিছুকালের জন্য নিবারিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে দস্যু ডাকাতের উপদ্রব কিছুকালের জন্য নিবারিত হইয়াছিল। অতঃপর ঠগী অফিস উঠিয়া গেলে, ভাওয়ালের জঙ্গল পুনরায় দস্যু ডাকাতের লীলাভূমি হইয়া দাঁড়ায়।

জলদস্যু :

জেলার দক্ষিণ ভাগে স্থলদস্যুর তেমন ভয় ছিল না। দক্ষিণে—পদ্মায়, পশ্চিমে—যমুনায় ও পূর্বভাগে— মেঘনায় জলদস্যুর ভয় প্রবল ছিল। সেকালে গয়া, কাশী তীর্থ যাত্রীর সংখ্যা বিরল ছিল না। কিন্তু দুই চারিজন সঙ্গী মাত্র লইয়া কেহই তীর্থে যাইতে সাহসী হইত না। ২।৪।১০ গ্রামের লোক একত্রে ৮।১০ খানা নৌকা করিয়া এক বছরে তীর্থযাত্রা করিত। এইরূপ দলবদ্ধ অবস্থাতেও দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইতে হইত। মেঘনা, যমুনা ও পদ্মায় দস্যুর দল নৌকাযোগে বিচরণ করিত। ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে নিম্নবঙ্গের তৎকালীন সার্ভেয়ার জেনারেল রেনেল সাহেব এইরূপ একদল জলদস্যু হস্তে পড়িয়া ভয়ানক আহত ও বিপদগ্রস্থ হইয়াছিলেন। তখন রেনেল সাহেব ঢাকায় অবস্থান করিতেন।

লক্ষ্মার মধ্যে একডালার বাঁক; বৈদ্যের বাজারের নিকট মেঘনার "খাড়ি", পদ্মা-যমুনার সঙ্গম স্থল— বাইশ কোদালিয়ার মোহনা প্রভৃতি ডাকাতির প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। পদ্মা পাড়ের লাঠিয়ালেরা দিনে লাঠি মারিত ও রাত্রে ডাকাতি করিত। রেনেল সাহেব আরোগ্য হইয়া এই সকল জলদস্যু দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন জলদস্যু নিবারণের জন্য জলপুলিশের ব্যবস্থা ছিল। এখনও ঢাকায় জলপুলিশ আছে।

৩০।৩৫ বৎসর পূর্বে যশোহরের কিচকেরা ঢাকার স্থানে স্থানে ডাকাতি করিয়া বেড়াইত।

বর্তমান সময়ে এই জেলায় ডাকাতির সংখ্যা কম। ১৮৯৬ সনে ১৭টি ডাকাতি হইয়াছিল। ইহার পর ১৮৯৭ সনে ২টি, ১৮৯৮ সনে ২টি, ১৮৯৯ সনে ৯টি, ১৯০০ সনে ১৭ টি, ১৯০১ সনে ৩টি ও ১৯০২ সনে ৪টি ডাকাতি হইয়াছে।

জলবায়ু ও সাধারণ স্বাস্থ্য

মোটের উপর ঢাকা জেলার জলবায়ু ও সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল।

ঢাকার দক্ষিণভাগে নিম্নভূমিতে অবস্থিত হইলেও বর্ষা অন্তে তাহাতে জল আবদ্ধ থাকে না। সুতরাং ঐ স্থানের স্বাস্থ্যও মন্দ নহে। মানিকগঞ্জের পশ্চিমভাগে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক। ভাওয়ালের জলবায়ু খুব ভাল নহে। শীতলক্ষ্মার তীরবর্তী স্নানের স্বাস্থ্য ও জলবায়ু উৎকৃষ্ট। শহরের সাধারণ জলবায়ু ও স্বাস্থ্য ভাল, কিন্তু শহরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলির অনেক গৃহই ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর। গৃহগুলির অবস্থিতির নমুনাও ভাল নহে। ঐ সকল স্থানে সদাসর্বদা অস্বাস্থ্যজনিত নানা রোগের প্রার্দুভাব হইয়া থাকে। নারায়ণগঞ্জ স্বাস্থ্যকর স্থান। শীতলক্ষ্মার পানীয় জল অতি উৎকৃষ্ট।

এই জেলায় ম্যালেরিয়া, জ্বর-প্লীহা, উদরাময়, অজীর্ণ, কুরুন্দ, গোদ এবং চর্মরোগের প্রার্দুভাব অধিক।

কলেরা :

১৮১৭ সালে প্রথম যশোহরের কলেরা ক্রমে ঢাকায় বিস্তৃত হয়। জলের কল স্থাপনের পূর্বে ঢাকা শহরে প্রায় সদাসর্বদাই কলেরা দেখা দিত। ঢাকা শহরের গলিগুলি বড়ই অপরিষ্কার এই কারণেও অনেক সময় ঢাকায় কলেরা দেখা দিয়া থাকে।

এই জেলায় দশবৎসরের জন্ম মৃত্যুর হার প্রদর্শিত হইল। (পরিশিষ্ট "ঞ")

গো-মড়ক :

১৮৩৭ সনের এপ্রিল মাসে এ জেলার উত্তরভাগে গো-মড়ক আরম্ভ হয়। এপ্রিল, মে, জুন এই তিন মাসে বহু সহস্র গো কালগ্রাসে, পতিত হয়। ১৮৭০ সনেও পুনরায় মড়ক উপস্থিত হইয়াছিল। এই মড়কে গভর্নমেন্ট পিলখানার ২৫টি হাতি এবং বহু গরু মারা যায়। এরপর বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন মড়ক উপস্থিত হয় নাই।

মেট্রলজি :

ঢাকা জেলার বায়ুর উষ্ণতা সর্বত্র সমান। এপ্রিল মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত মৃত্তিকা আর্দ্র থাকে। এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উষ্ণতা গড়ে ৮৪° থাকে। শীতকালে ৬৭° পর্যন্ত হয়। বৎসর গড়ে ৭২" ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। গড়ে মে মাসে ৯.৬; জুন মাসে ১২.৭; জুলাই মাসে ১৩.৫ এবং আগস্ট মাসে ১২.৬; সেপ্টেম্বরে ইঞ্চিরও কম এবং অক্টোবরে ৪ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। অবশিষ্ট বৃষ্টি অন্যান্য সময় হয়। চারি বৎসরের বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ প্রদত্ত হইল। (পরিশিষ্ট "ট")

দৈবঘটনা :

১৭৬২ সনের এপ্রিল মাসে এ জেলায় ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। এই ভূমিকম্পে অনেক খালবিল উত্থিত হইয়া নৌকা চলাচলের পথ বন্ধ করিয়া ফেলে। অতঃপর ১৭৭৫ সালে ১০ এপ্রিল ও ১৮১২ সনের ১১ মে প্রবল ভূমিকম্প হয়। এরপর ১৮৯৭ সনের ১২ জুনের ভূমিকম্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ ভূমিকম্পেও জেলার উত্তরাংশের অনেক খালবিলের মুখ বন্ধ করিয়াছে এবং বহু দলান কোঠা ও প্রাচীন কীর্তি নষ্ট করিয়াছে। এই ভূমিকম্পে ঢাকা ময়মনসিংহ রেল লাইন ভাঙ্গিয়া গিয়া প্রায় দুই সপ্তাহ রেল চলাচল বন্ধ ছিল। ১১৯২ সনের ৩০ আষাঢ়ের ভূমিকম্পে জেলার কোন কোন স্থানের ক্ষতি হইয়াছিল।

তুর্নড :

১৮৮৮ সনের ৭ এপ্রিল ঢাকায় ভীষণ তুর্নড হয়। ঐ তুর্নডে ঢাকা শহরের ৩৫২৭ খানা গৃহ একেবারে ধরাশায়ী হয়। ঢাকার বর্তমান নবাব বাড়ি এবং শহরের ১৪৮ খানা ইষ্টকালয় ভগ্ন হয়। ১২১ খানা নৌকা ও পুলিশ স্টিমার জলমগ্ন হয়। এতদ্ব্যতীত ১৩০ জন লোক হত ও ১৫০০ লোক আহত হইয়াছিল।

এই বাত্যা মুন্সিগঞ্জ মহকুমার দিকে হইতে ঢাকা শহর স্টেশনের দিকে আসিয়াছিল। মুন্সিগঞ্জ মহকুমার ৫।৬ খানা গ্রাম নষ্ট হইয়াছিল এবং ৭ জন লোক হত হইয়াছিল।

১৯০২ সনের এপ্রিল মাসে দ্বিতীয়বার তুর্নড হয়। এইবার পাড়জোয়ারের দিক হইতে বায়ু প্রবল বেগে আসিয়া ঢাকা অতিক্রম করিয় বক্রগতিতে পূর্বাভিমুখে ১৬ মাইল পর্যন্ত ধাবিত হয়। এই ১৬ মাইল পথের কোন কোন স্থানে ২০০ হাত কোথাও বা অর্ধ মাইল ব্যাপিয়া বাতাস প্রবাহিত হইয়াছিল এবং বহু ঘর ভগ্ন ও বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়াছিল। এই বাতাসের প্রকোপেও ৩৮ জন লোক হত এবং ৩৩৮ জন আহত হইয়াছিল।

জলপ্লাবন :

সময় সময় জলপ্লাবনে এ জেলার বহু অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। ১৭৮৭—৮৮ সনে এ জেলায় ভীষণ জলপ্লাবন হয়। এই জলপ্লাবনে দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই জলপ্লাবন ডাক্তার টেলার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ডাক্তার টেলার লিখিয়াছেন, "মার্চ মাসে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করে এবং জুলাইর মধ্যভাগ পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টি হয়। ফলে নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া দেশ ডুবাইয়া ফেলে। এরূপ প্লাবন আর কখনও দেখা যায় নাই। ঢাকা শহর অন্যান্য প্লাবনে জলের উপরে ভাসিতে থাকে। কিন্তু এই প্লাবন স্রোত শহরের বক্ষের উপর দিয়া চলিয়াছিল। বড় বড় বেপারি নৌকা শহরের বড় বড় রাস্তার উপর দিয়া ভাসিয়া যাইত। জেলার অধিবাসীগণ গৃহ বাড়ি ত্যাগ করিয়াছিল। কেহ কেহ বাঁশের মঞ্চ বাঁধিয়া বাস্ত-ভিটার উপর রাত্রি যাপন করিত।

এই প্লাবনে ঢাকায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে চাউল ও অন্যান্য শস্য একেবারে অভাব হইয়া পড়িল। ১০ টাকা মন দরেও চাউল পাওয়া গেল না। প্রায় ৬০ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। আট দশ হাজার লোক সাধারণের ব্যয়ে খাদ্য পাইয়াছিল।"

১৮৩৩—৩৪ সনে পুনরায় জলপ্লাবন হয়। এই প্লাবনের কোন বিবরণ সরকারি কাগজপত্রে প্রাপ্ত হওয়া গেল না।

১৮৭০ সনে প্লাবনে বিক্রমপুরের অনেক ক্ষতি হয়।

মুন্সিগঞ্জের ও মানিকগঞ্জের দক্ষিণভাগ প্রতি বৎসর পদ্মার খরপ্রবাহে ও উশৃঙ্খল প্লাবনে বিলয় হইয়া যাইতেছে। পদ্মার সন্নিকটবর্তী অধিবাসীদিগের নিকট এ দৈব ঘটনা এখন আর চিন্তনীয় বিষয়ের মধ্যে গণনীয় নহে।

অনাবৃষ্টি :

১৮৬৫ সনে এ জেলায় অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। সমস্ত বৎসরে মাত্র ২৯.০২ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছি এই অনাবৃষ্টিতে ১৮৬৬ সনে ঢাকায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

---

১. ৮ দাম ড়ি = ১ দান। ৪০ দামে = ১ সিক্কা টাকা।

২. বিক্রমপুর পরগণার একখানা মনুষ্য বিক্রয়ের দলিলের প্রতিলিপি নমুনাস্বরূপ নিম্নে প্রদত্ত হইল

ইসাদি সন্নি—
শ্রী সুধনী দাসী।
সং দুর্লোগ্যো।
সাং তস্য
ইসাদি সন্নি—
শ্রী অপূর্ব দাসী
সাং আমদাবাজ।

৭ ইয়াদিকীর্দ্দ শ্রী ইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী ওলদে জোগেশ্বর চক্রবর্তী ইবনে দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী সুচরিতেষু—

লিখিতং শ্রীমতী অপূর্বা ওলদে নারায়ণদেও জওজে চান্দ দেও ও শ্রীমতী সুধনী ওলদে চান্দ দেও জওজে উদয়রাম দেও ও আমার পুত্র সানন্দরাম দেও বএস ৪ চাইর বৎসর ও তস্য ভগ্নীর বএস ৪ চাইর মাস মনিয্য আপ্ত বিক্রয়—কবজ পত্র মিদং কার্যবন্ত আগে আমরা আপনার স্থানে দস্তবদস্ত নগদ মূল পুরও জন দহমাসী ২৫ পচিশ রূপাইয়া পাইয়া কবজ দিলাম। ইতি সন ১১৯১ একান্নবুই সন তারিখ ১৮ ফাল্গুন।" (প্রবাসী)

৩. ১৮৬৬ সনের এপ্রিল মাসে খাজে আবদুল খান বাহাদুর (পরে নবাব বাহাদুর) দরিদ্রদিগের ভরণপোষণ জন্য এই লঙ্গরখানা স্থাপন করেন। বর্তমান নবাব বাহাদুর তাহা উঠাইয়া দিয়াছেন। "পূরব দরওয়াজা মহল্লায়" এই আশ্রম স্থাপিত ছিল।

৪. "Owing to the increased and improved means of Communication a local famine in Eastern Bengal in how impossible"

৫. A famine such as that which occurred in Orissa in all but impossible in Dacca at the present day" W. W. Hunter.

৬. শ্রমজীবী ও কৃষিজীবীদিগের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির কারণ প্রদর্শন করিয়া টেলার সাহেব লিখিয়াছেন;— "The repeal of the duties on the exporation of the grains; the abolition of the Arcot Currency, which had long pressed as a heavy burden on the agricultural classes; the permanent Settlement; the rapid decline of manufactures and the introduction of indigo and Swfflower as articles of produce for foreign markets have all contributed to produce an extention of cultivation and to rise the prise of agricultural and common labour considerably above what it was in former time."

৭. Manikgunge Subdivision supplies the Eastern Districts with Khansamaha and Duftries. (G. A. Re 1875-76)

৮. The migratory tendency (of the men of Bikrampur) is the result of proverty or rather resangusta domia and dire necessity."

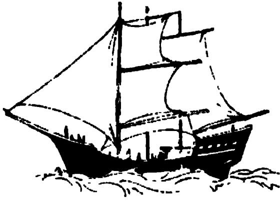
৯. Census Report Page 21. (901)

১০. ৯ জন লোকের একাধিক ব্যাধিহেতু সংখ্যা বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে মোট ৫৬১৮ জন হইবে।

১১. In Dacca it had been suggested that the diminished consumption of gunja, due to the higher price of the drugs, may also have contributed to the result. (Census Report 1901)

১২. "Dacca does not maintion its population with its own product but depends in a great meassure or Mymen Singh Sylhet, Tipparech and Bakergunge for food importation and so long as these Districts are safe there is little tear for Dacca."

১৩. ময়মনসিংহবাসী কোন ভূক্তভোগী ভদ্রলোক এই সম্বন্ধে যে গল্প বলিয়াছেন, তাহা এইরূপ;—
"আমরা ঢাকা কলেজে পড়িতাম। গ্রীষ্মের ছুটির পর ঢাকা রওয়ানা হইয়াছি। আমরা যখন জঙ্গলের ভিতর দোকানে, আশ্রয় লইয়াছি, তখন রাত অনুমান ৮টা বাজিয়াছে। আমরা ৪ জন, আমরা দোকানীকে দোকানে না পাইয়া নিজ হস্তেই আহারাত্তির যোগাড় করিয়া আহার করিলাম। ঐ দোকানে আরও দুইটি পথিক ছিল। তাহারা বলল, দোকানী এই মাত্র তাহাদের নিকট হইতে ভাড়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা শয়ন করিলাম, মশকের অত্যাচারে আমরা সুনিদ্রা হইল না। আমার সঙ্গীয় বেহারা ও ছাত্র দুটি বেশ ঘুমাইতে লাগিল। রাত্রি ১।। টা কি ২টার সময় আমাদের পূর্বাগত লোক দুটির চিৎকারে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। আমরাও চিৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া আলো জ্বালিলাম, দেখি ভয়ানক কাণ্ড। সেই লোক দুটি অপর একটি তৃতীয় ব্যক্তিকে লইয়া মাটিতে গড়াগড়ি করিতেছে। আমাদের বহু লোকের স্বর শুনিয়া আরও ২।৩ টা লোক দরজা ঠেলিয়া চম্পট দিল। আমরা লোকটাকে বাঁধিলাম, ইনিই দোকানদার। দোকানদার আমাদিগকে তর্জন গর্জন করিতে লাগিল। লোক দুটা বলিল, দোকানদার তাঁহাদের "পুটুলিটী" চুরি করিতে চেষ্টা করিলে তাহারা প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া তাহাকে ধরিয়াছে। আমারা দোকানীকে শাসাইলাম। সেই আমাদিগের প্রতি তর্জন, গর্জন করিতে লাগিল। আর ঘুম হইল না।



একাদশ অধ্যায়
বিবিধ

রেল। স্টিমার। পুলিশ ও গ্রাম্য পুলিশ। সৈন্য। জেলখানা। ডাক-ডাকঘরের-সূত্রপাত ও মাশুলের নিয়ম; ডাক ট্যাক্স; জমিদারি ডাকঘর ও গভর্নমেন্টের ডাকঘর। টেলিগ্রাফ। রাজসম্মান বা উপাধি। রাজনৈতিক সভা। রাজপ্রতিনিধির পদার্পণ।

রেল :

১৮৮৫ সনের জানুয়ারি মাস হইতে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জে রেল চলিতে আরম্ভ করে। অতঃপর ১৮৮৬ সনের আগষ্ট মাসে জয়দেবপুর পর্যন্ত রেল চলে এবং ১৮৮৬ সনের ৮ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন বঙ্গেশ্বরের ময়মনসিংহ গমন উপলক্ষে ঢাকা ময়মনসিংহ রেলপথ খোলা হয়।

নারায়ণগঞ্জ হইতে ময়মনসিংহের মধ্যে এ জেলার অধীন ১১টি স্টেশন। (১) নারায়ণগঞ্জ, (২) চাসারা, (৩) দোলাইগঞ্জ, (৪) ঢাকা, (৫) কুর্মিটোলা, (৬) টংগি, (৭) জয়দেবপুর, (৮) রাজেন্দ্রপুর, (৯) শ্রীপুর, (১০) সাত খামাইর ও (১১) কাওরাইদ।

স্টিমার :

সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে গভর্নমেন্ট ঢাকা কলিকাতা ও আসামের সহিত স্টিমার সম্বন্ধ স্থাপন করেন। ঐ সময় নিয়ম মত স্টিমার চলিত না। ইহার পর আরও কতকগুলি স্টিমার কোং এই পথে স্টিমার চালাইতে আরম্ভ করে।

১৮৬২ সনের ১৫ নভেম্বর কলিকাতা হইতে কুষ্টিয়া পর্যন্ত রেললাইন বিস্তৃত হয়। তখন ঢাকার কমিশনার মিঃ বাক্‌ল্যান্ডের যত্নে ঢাকা হইতে কুষ্টিয়া পর্যন্ত রীতিমত স্টিমার চালিত হয়। ইহার পর গোয়ালন্দ পর্যন্ত রেল লাইন বিস্তৃত হইলে স্টিমার গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জ যাতায়াত করিতে থাকে।

বর্তমান সময় জেলার দুই পার্শ্বে ২টি স্টিমার লাইন আছে। একটি পদ্মায় ও মেঘনায়, অপরটি যমুনায়। উভয় লাইনেই "রিভার স্টিম নেভিগেসন কোম্পানির" ও "ইন্ডিয়ান জেনারেল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানির" স্টিমার চলিয়া থাকে। এই লাইনের স্টিমার প্রত্যহ মাল, আরোহী ও ডাক লইয়া গোয়ালন্দ হইতে পদ্মা, মেঘনা ও শীতলক্ষ্মা দিয়া নারায়ণগঞ্জ আইসে এবং নারায়ণগঞ্জ হইতে শ্রীহট্ট, কাছাড় চাঁদপুর, বরিশাল, প্রভৃতি স্থানে যায়। এই লাইনে এ জেলার অধীন ১৯টি স্টেশন আছে। (১) কাঞ্চনপুর, (২) জালালদী, (৩) মাইনট, (৪) নরিষা, (৫) ফদিরপুর, (৬) মাউয়া, (৭) লৌহজঙ্গ (তাঁরপাসা), (৮) বহর, (৯) সাতনল, (১০) কমলাঘাট, (১১) নারায়ণগঞ্জ, (১২) বৈদ্যের বাজার, (১৩) বারদি, (১৪) শ্রীমদ্দি, (১৫) বিশনন্দী, (১৬) ভাঙ্গারচর, (১৭) নরসিংদি, (১৮) মনিপুরা ও (১৯) আমিরাবাদ বা রায়পুরা।

যমুনা লাইন সাধারণতঃ "আসাম লাইন" নামে পরিচিত। এই লাইনের স্টিমার গোয়ালন্দ হইতে এ জেলার পশ্চিম সীমা দিয়া যমুনা বাহিয়া আসাম যাতায়াত করে। এই জেলায় এই লাইনের একটি স্টেশন মাত্র তাহা—আরিচা—

ধলেশ্বরী সার্বিস স্টিমার বর্ষায় গোয়ালন্দ হইতে ধলেশ্বরী দিয়া সাভার যাতায়াত করে।

সুন্দরবন ডিসব্যাচ, সপ্তাহে একবার কলিকাতা হইতে মাল লইয়া বঙ্গোপসাগর ঘুরিয়া সুন্দরবনের পথে নারায়ণগঞ্জ আসিয়া থাকে। আসাম সুন্দরবন ডিচ্‌পাচ্‌ যমুনা বাহিয়া যায়। কুণ্ডু জমিদারদিগের জাহাজও সুন্দরবন পথে কলিকাতা হইতে মাল লইয়া নারায়ণগঞ্জ, লৌহজঙ্গ প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিয়া থাকে। গত বৎসর ঢাকায় আর একটি নতুন কোং প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পুলিশ ও গ্রাম্যপুলিশ

পুলিশ :

১৮১৭ সনের পর হইতে এ জেলায় চৌকিদারী প্রথা প্রবর্তিত হয়। ১৮৪০ সনে এ জেলায় ১৯০ জন চৌকিদার ও কনেস্টেবল ছিল। ১৮৬০ সনে কনেস্টবলের সংখ্যা ২০০তে পরিণত হয়। ১৮৬৬ সনে চৌকিদারের সংখ্যা ২৯৮১ হয়। চৌকিদারের বেতন গর্ভনমেন্ট ৩্ টাকা করিয়া নির্ধারিত করিয়া দেন কিন্তু ট্যাক্সদাতাগণ নিয়মমত ট্যাক্স প্রদান করিতেন না বলিয়া চৌকিদারের বেতনেরও ইতর বিশেষ হইয়াছিল। তাহার মাসিক চার আনা হইতে ৩্ টাকা পর্যন্ত বেতন পাইত। ১৮৭৭ সনে এ জেলায় চৌকিদারি (৬ আইন) আইন প্রবর্তিত হইলে এ জেলার চৌকিদারের অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এ জেলায় ১৮৭১ সনে ২ জন পুলিশ সুপারিনেন্টডেন্ট, ৬৮ জন ইন্‌স্পেক্টর ও সাব ইন্‌স্পেক্টর, ৩৬০ জন কনেস্টেবল, ৪ জন পুলিশ ও ৩৬৮ জন চৌকিদার ছিল।

বর্তমান সময় (১৯০৫) এ জেলায় ৫ জন ইন্‌স্পেক্টর, ৫২ জন সাব-ইনস্পেক্টর, ৩০ জন হেড কনস্টেবল ও ১৪ জন রাইটার কনেস্টেবল সহ ৬১৩ জন কনেস্টেবল, ৩৫৬ জন দফাদার ও ৪২৪৪ জন চৌকিদার আছে। এতদ্ব্যতীত ১০০ মিলিটারি পুলিশ আছে।

সৈন্য :

ঢাকার ময়দানে পূর্বে দেশিয় সৈনদল অবস্থান করিত, ঐ স্থান অস্বাস্থ্যকর বলিয়া অবধারিত হওয়ায় সেনা নিবাস লালবাগে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৮৫৭ সনে লালবাগের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া নানাদিকে চলিয়া যায় ও অনেকে ধৃত হইয়া দণ্ডিত হয়। এই দল ৭৩ সংখ্যক দেশিয় সৈন্যদল নামে অভিহিত ছিল।

এরপর ঢাকার সৈন্য রক্ষার্থে গভর্নমেন্ট দোলাই খালের তীরবর্তী 'ফলির মিল' নামক বৃহৎ আবাস ক্রয় করেন ও তাহাতে সৈন্য স্থাপন করেন। এই স্থানকে ১৮৬৭ সনে ১৪ জানুয়ারির কলিকাতা গেজেটে 'ঢাকা সেনা নিবাস' বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়। ১৮৬৬ সনে ঢাকায় কর্নেল ফিসারের (Fisher) অধীন ৫ম সংখ্যক দেশিয় পদাতিক সৈন্যদল অবস্থান করিত।

১৮৭৯ সনে ঢাকার দেশি সৈন্যদলকে ঢাকা হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। ১৮৮০ সনে পুনরায় তাহাদিগকে ঢাকায় আনা হয়।

বর্তমান সময় ইস্টারেন বেঙ্গল ভলন্টিয়ার রাইফেল সৈন্য ঢাকার সদর স্টেশনে অবস্থান করে। এই সৈন্যদল ছয় ভাগে বিভক্ত। ১৯০৩—০৪ সনে ইহাদের সংখ্যা ৩২৫ ছিল।

জেলখানা :

ঢাকা সেন্ট্রাল জেল পূর্ববঙ্গের প্রধান 'জেলখানা'। এই জেলে ১১৮৩ জন কয়েদির স্থান আছে। সেন্ট্রাল জেল ব্যতীত অপর তিন মহকুমার সদর স্টেশনে আরও তিনটি 'সাবজেলখানা' আছে। ঐ তিনটিতে ৭৫ জন কয়েদি থাকিতে পারে। নারায়ণগঞ্জ জেলে ৩৬ জন, মুন্সিগঞ্জ জেলে ১৭ জন ও মানিকগঞ্জ জেলে ২২ জন। সেন্ট্রাল জেলের কয়েদিদিগের

দ্বারা কয়েদিদিগের পরিধানের মোটা কাপড় ও বাজারে বিক্রিয়ার্থ অনেক জিনিস প্রস্তুত করান হয়। এই জেলে পূর্বে দেশি কাগজ প্রস্তুত হইত।

ডাক

ডাকঘরের সূত্রপাত ও মাশুলের নিয়ম :

জেলা স্থাপনের পূর্বেই ঢাকায় ডাকের বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হইয়াছিল। তৎকালে (অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে) কলিকাতা হইতে ৪।৫ দিনে ঢাকায় চিঠিপত্র আসিত। চিঠিপত্র গভর্নমেন্টের বরকন্দাজ দ্বারা প্রেরিত হইত। এই সময় চিঠির মাশুলের হার অধিক ছিল। ছোট ছোট চিঠি ভিন্ন বড় বড় 'পুলিন্দা' ও 'কাগজপত্র' সোমবার ও বৃহস্পতিবার ভিন্ন অন্যদিনে কলিকাতার ডাকঘরে গৃহীত হইত না। সপ্তাহের মধ্যে এই দুইবারে কলিকাতা হইতে বাঙ্গী ডাক মফঃস্বলে প্রেরিত হইত। চিঠির ডাকে ৯।।×৪ ইঞ্চি আয়তনের অপেক্ষা বড় চিঠি গৃহীত হইত না। মাশুল ২।।০ তোলা পর্যন্ত এক গুণ, ৩।।০ তোল পর্যন্ত দ্বিগুণ, ৪।।০ তোলা পর্যন্ত তিনগুন, ৫।।০ তোলা পর্যন্ত চার গুণ ছিল। স্থানের দূরত্ব অনুসারে মাশুলের হারের তারতম্য হইত। ২।।০ তোল পর্যন্ত ওজনের চিঠি কলিকাতা হইতে ব্যারাকপুর ও হুগলি পর্যন্ত মাশুল ১ আনা, বর্ধমান; মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত ২ আনা, ভগলপুর পর্যন্ত দিনাজপুর, মুঙ্গের ও ঢাকা পর্যন্ত ৪ আনা, পাটনা ৫ আনা, বক্সার পর্যন্ত ৬ আনা ইত্যাদি।

কলিকাতা হইতে ঢাকায় ডাক আসিয়া পৌঁছিলে ঢাকা হইতে পুনরায় থানায় ডাক প্রেরিত হইত। অনেক মফঃস্বলের ব্যবসায়ী সাহেবেরা ঢাকায় ডাকের প্রতীক্ষায় লোক নিযুক্ত বাখিতেন। এইরূপ বিধি ব্যবস্থায় ডাক বিলি হইত।

১৭৯১ সনের ১৫ জুলাই ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ ডাকসরবরাহের জন্য টঙ্গী ও বরদিপুর নামক স্থানদ্বয়ে দুইটি ডাকঘর স্থাপিত হয়। এইরূপে যতই লোক ডাকের আবশ্যকতা অনুভব করিতে লাগিল, ততই দিন দিন ডাক ঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া লোকের অসুবিধা দূর করিতে লাগিল।

জমিদারি ডাক :

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হইতে ম্যাজিস্টেটের যে সকল সরকারি কাগজপত্র থানা ও ফাড়ি থানায় যাইত, তাহার খরচ জমিদারদিগকে বহন করিতে হইত। ডাকবহনের জন্য পাইক বরকন্দাজও জমিদারেরা যোগাইতেন। থানাদারের অধীন থানায় থানায় জমিদারের নিযুক্তিয় পাইক বরকন্দাজ থাকিত। যে স্থানে কোন থানা ছিল না, সে স্থানে গ্রামের মাতবরদিগের মধ্যে একজন ডাকের বিলি বন্দোবস্তের কার্য করিতেন, তাহার অধীনেও জমিদারের ঐ সকল পাইক বরকন্দাজ নিযুক্ত থাকিত। জমিদারগণ এইরূপ লোকপ্রদানে ক্রুটি করিলে অথবা যে কেহ ডাকের কার্যে জ্ঞানত ক্রটি করিলে জরিমানা দিতে অথবা কয়েদ ভোগ করিতে বাধ্য হইতেন।[২]

ডাকট্যাক্স :

১৮৬২ সনে এই নিয়ম রদ হইয়া ডাক পরিচালনের ভার পুলিশের হস্তে প্রদত্ত হয়। ভূম্যধিকারিগণ ডাকের খরচ বহন করিতেন। তাহাদের জামিদারী বা তালুক হইতে ঐ খরচ গৃহীত হইত। ইহারই নাম ডাকট্যাক্স। এই কর ভূমিকরের উপর স্থাপিত হয়। যে তালুকের বা জমিদারির রাজস্ব ৫০ টাকা বা তদূর্ধে ঐ তালুকের রাজস্বের উপর শতকরা দুই টাকা হারে এই ডাকের খরচ বা ডাকট্যাক্স ধার্য হয়। বিভিন্ন সময় এই হারের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৯০৬ সনে এই ট্যাক্স একেবারে উঠিয়া গিয়াছে।

পূর্বে কালেক্টরের কাছারিতে মনিঅর্ডার করিবার নিয়ম ছিল এবং মনি অর্ডারে আগত

টাকা গ্রাহককে যাইয়া কালেক্টরী হইতে আনিতে হইত। সেভিং ব্যাঙ্কও কালেক্টরের হাতে ছিল। ১৮৮০ সনের জানুয়ারী হইতে মনি অর্ডারের কার্য ডাকঘরে উঠিয়া যায় এবং ডাকঘরে পৃথক সেভিং ব্যাঙ্ক খোলা হয়। ১৮৮৪-৮৫ সনে মনি অর্ডারের টাকা গ্রাহকের বাড়ি বাড়ি পিয়নে লইয়া যাইবার প্রথা প্রচলিত হয়। ১৮৮৬ সনের ১ এপ্রিল হইতে ডিস্ট্রিক্ট সেভিং ব্যাঙ্ক ডাকঘরের সেভিং ব্যাঙ্কের সহিত মিলিত হইয়া যায়।

জমিদারি ডাকঘর ও গভর্নমেন্ট ডাকঘর :

১৮৬৬ সনে এ জেলায় নিম্নলিখিত ১৯ স্থানে জমিদারি ডাকস্টেশন ছিল। (১) রূপগঞ্জ, (২) নরসিংদি, (৩) রায়পুরা, (৪) পলাস (মুন্সেফী কাছারি) (৫) কাপাসিয়া, (৬) টঙ্গী, (৭) রোহিতপুর, (৮) নারায়ণগঞ্জ, (৯) মুন্সিগঞ্জ, (১০) রাজাবাড়ি, (১১) শ্রীনগর, (১২) সাভার, (১৩) মানিকগঞ্জ মহকুমা, (১৪) মানিকগঞ্জ থানা, (১৫) হরিরামপুর, (১৬) জাফরগঞ্জ, (১৭) ফরিদাবাদ, (১৮) লালবাগ, (১৯) ঢাকা ম্যাজিস্ট্রেট কাছারি।

ঐ সনে নিম্নলিখিত এগারটি স্থানে গভর্নমেন্ট ডাকঘর ছিল। (১) ঢাকা, (২) নারায়ণগঞ্জ, (৩) নবাবগঞ্জ, (৪) মানিকগঞ্জ, (৫) শ্রীনগর, (৬) বহর, (৭) ধামরাই, (৮) সোনারং, (৯) রূপগঞ্জ, (১০) জাফরগঞ্জ, ও (১১) পশ্চিমদি।

তখন জৈনসার ও কাঁচদিয়া ২টি 'পরখাই' (experimental) ডাকঘর ছিল।

বর্তমান সময় এ জেলায় ২টি প্রধান ডাকঘর, ৬২টি "সাব পোস্টাফিস" ও ১৬৮টি ব্রাঞ্চ পোস্টাফিস আছে।

ডাকঘরগুলির নাম প্রদত্ত হইল। (পরিশিষ্ট 'ঠ')

টেলিগ্রাফ :

১৮৫৮ সনের ডিসেম্বর মাসে মিঃ মেকগ্রেথ ঢাকা চট্টগ্রাম টেলিগ্রাফ বসাইবার কার্য আরম্ভ করেন। পর বৎসর কার্য শেষ হয় ও ঢাকা-চট্টগ্রাম টেলিগ্রাফ চলিতে আরম্ভ করে। এরপর ঢাকা ও গোয়ালন্দ লাইন খোলা হয়। ১৮৭৭—৭৮ সনে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ পৃথক লাইন খোলা হয়।

১৮৬৩ সনের জুন মাসে ঢাকা ময়মনসিংহ টেলিগ্রাফের কার্য আরম্ভ হয়।

১৮৬৬ সনে এ জেলায় মাত্র দুইটি টেলিগ্রাফ স্টেশন ছিল। (১) ঢাকা ও (২) এলাচিপুর। এলাচিপুর অফিস অস্থায়ীভাবে পরীক্ষার জন্য হইয়াছিল।

বর্তমান সময় কোন কোন ডাকঘরে টেলিগ্রাফের কার্য হইয়া থাকে। তাহা নির্দেশ করা গেল (পরিশিষ্ট "ঠ")

টেলিফোন :

১৮৮২-৮৩ সনে ঢাকা (ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল) হইতে নারায়ণগঞ্জ ব্রেঞ্চ ব্যাঙ্কের সহিত টেলিফোন তারের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ঐ সময় ডেভিড কোং হাজিগঞ্জ হইতে শীতলক্ষ্মা পর্যন্ত আর এক লাইন খোলেন। এখন ঢাকার অনেক স্থানেই টেলিফোন আছে।

রাজসম্মান বা উপাধি :

এই জেলাবাসী নিম্মলিখিত ব্যক্তিগণ গভর্নমেন্ট উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া সম্মানলাভ করিয়াছেন।

'নবাব' মাননীয় নবাব খাজে-সলিমুল্লা বাহাদুর ১।৩।০৩ C.I.E ১।১।০৬, K. C. S. I. ১।১।০৯

ব্যক্তিগত উপাধি :

C.I.E শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু— এম. এ, ডি. এস. সি ১।৩।০৩

C.I.E রায় কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর বাহাদুর ২২।৬।৯৭ C.I.E. ১।১।০৯

নাইট শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ (স্যর) ২৯।৬।০৬
রাজা শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় (ভাগ্যকুল) ৩০।৫।৯১
মহামোহপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন ২৬।৬।০৮
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত উমাকান্ত দাস (তেওতা) ১।১।৮৯
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র শীল (ঢাকা) ১।১।৯২
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেন (সোনারং) ২০।৪।৯৬
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দত্ত (তেওটিয়া) ৩।৬।৯৯
রায় বাহাদুর মাননীয় শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায় (ভাগ্যকূল) ১।১।০৩
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন বসু (পাইকপাড়া) ১।১।০৬
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত বানার্জী (ইছাপুর) ১।১।০৬
রায়সাহেব শ্রীযুক্ত প্যারীনাথ বসু (ফুলবাড়িয়া) ৯।১১।০১
রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দাস (কার্জনা) ৯।১১।০১
রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দুর্গাকুমার বসু (তখরিয়া) ২৬।৬।০২
রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ডাক্তার পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় বি. এ. ডি,. এস. সি. (পঞ্চসার) ১।১।০৮
রায়সাহেব শ্রীযুক্ত কালীমোহন সেন (সানারং) ২৬।৬।০৮
খাঁ বাহাদুর খাজে মহম্মদ ইউসুফ (ঢাকা) ২৭।৬।০৪
খাঁ সাহেব খাজে মহম্মদ আজম (ঢাকা) ১।১।০৯

রাজনৈতিক সভাসমিতি :

প্রজা ভূম্যধিকারী আইন পাশ হইলে পর জেলায় জেলায় ভূম্যধিকারীসভা স্থাপিত হয়। ঢাকাতেও সেই সময় East Bengal Landholders Association স্থাপিত হইয়াছিল; অতঃপর কংগ্রেসের সঙ্গে জনসাধারণ সভা ও স্ট্যান্ডিং কংগ্রেস কমিটি স্থাপিত হইয়াছিল।

রাজপ্রতিনিধির পদার্পণ :

১৮৭৪ সনে আগস্ট মাসে তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক ঢাকা শহরে পদার্পণ করেন। ইতিপূর্বে বর্তমান গভর্নমেন্টের কোন রাজ প্রতিনিধিই ঢাকা পদার্পণ করে নাই।

১৮৮৮ সনের নভেম্বর মাসে রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডাফরিনের আগমন হয়। অতঃপর ভারতবর্ষীয় গভর্নমেন্ট ঢাকা জেলা আসাম গভর্নমেন্টের শাসনাধীন করিবার প্রস্তাব করিলে ১৩১০ সনের ফাল্গুন মাসে রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জন ঢাকা শহরে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

স্থানের দূরত্ব

এক থানা হইতে অন্য থানার দূরত্ব ও কি উপায়ে সেই সকল স্থানে যাওয়া যায়, তাহা প্রদত্ত হইল। এই দূরত্ব গভর্নমেন্টের "office manual of distance" হইতে গৃহীত হইল। কেবল হাটিয়া গেলে অনেক স্থানে ইহা অপেক্ষে বিশেষ সুবিধায় ও অল্প সময়ে আসা যাইতে পারে।

কোন স্থান হইতে	হরিরামপুর	কাপাসিয়া	কেরানিগঞ্জ	মানিকগঞ্জ	মুন্সিগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	নবাবগঞ্জ	রায়পুরা	রূপগঞ্জ	সাভার	সিয়াতোলা	শ্রীনগর	নিকটস্থ স্টেশন	স্টিমার বা স্টেশনের নাম
ঢাকা	রেলে	৭	—	—	১০	১০	—	১০	১০	—	—	—	—	
	রাস্তায়	৯	১¼	—	২	১	—	১	১	১৬¼	১৯	৮	১	ঢাকা
	নৌকায়	৭৫	—	৪৩	৫	—	৪৪	৬৪	১৬	—	৪০	১৮	—	
হরিরামপুর	রেলে	২৭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	রাস্তায়	৯	—	১৩	১	—	—	—	—	—	২৩	১৯	—	
	নৌকায়	৭৫	৭৬	৮	৭২	৭৪	৩১	১৩১	৯০	৬৫	—	৩১	৬	জালালদি
কাপাসিয়া	রেল	—	২৭	২৭	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	—	২৭	২৭	৩৭	—	
	রাস্তায়	—	১০¼	৯	৯	৮	৮	৮	৮	২৫	২৮	২৩	৮	রাজেন্দ্রপুর
	নৌকায়	—	—	৫	৫	—	৪৩	৬৪	৪১	—	৪০	৫	—	
কেরানীগঞ্জ	রেল	—	—	—	১০	১০	—	১০	১০	—	—	৮	—	
	রাস্তায়	—	—	—	৩¼	২¼	—	২	২	১৫	১৯	৯	৩	ঢাকা
	নৌকায়	—	—	৪২	৫	—	৪৫	৬৪	১৬	—	৩৯	১৯	—	
মানিকগঞ্জ	রেল	—	—	—	—	১০	—	—	১০	—	—	—	—	
	রাস্তায়	—	—	—	১	১	—	—	১	--	১৮	৮	—	আরিচা
	নৌকায়	—	—	—	৬২	৪৩	৫৬	১২১	৫৯	২২	—	৫৭	২১	
মুন্সিগঞ্জ	রেল	—	—	—	—	—	—	—	—	১০	—	—	—	
	রাস্তায়	—	—	—	—	১	১	১	১	১৮	২০	১৮	—	
	নৌকায়	—	—	—	—	৫	৪১	৫৯	২১	৫	৫৯	—	২½	কমলাঘাট

কোন স্থান হইতে	হরিরামপুর	কাপাসিয়া	কেরানিগঞ্জ	মানিকগঞ্জ	মুন্সিগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	নবাবগঞ্জ	রায়পুরা	রূপগঞ্জ	সাভার	সিয়ালো	শ্রীনগর	নিকটস্থ স্টেশন	স্টিমার বা স্টেশনের নাম
নারায়ণগঞ্জ	রেল	—	—	—	—	—	—	—	—	১০	১০	—	—	
	রাস্তায়	—	—	—	—	—	—	—	—	১৭	২০	১৫	০	নারায়ণগঞ্জ
	নৌকায়	—	—	—	—	—	৪৩	৬৪	১৬	—	৪০	৫	—	
নবাবগঞ্জ	রেল	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	রাস্তায়	—	—	...	—	—	—	—	—	—	১৯	১৯	—	মনিয়াট
	নৌকায়	—	—	- -	—	—	—	১০০	৫৯	৩৪	৫৩	—	৭	
রায়পুরা	রেল	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১০	—	—	
	রাস্তায়	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১৭	১৯	১৯	
	নৌকায়	—	—	—	—	—	—	—	৮০	৩৪	১১৮	৫৯	১	রায়পুরা
রূপগঞ্জ	রেল	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১০	১০	—	
	রাস্তায়	—	—	—	—	—	—	—	—	১৭	২০	১৯	১৬	নারায়ণগঞ্জ
	নৌকায়	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১৬	৫৬	২১	
সাভার	রাস্তা	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১৯	৮	১৭½	ঢাকা
	নৌকায়	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১৯	৩৭	২৩	
সিয়ালো	রাস্তায়	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	২৭	৬	আরিচা
	নৌকায়	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	৫৪	—	
শ্রীনগর	রাস্তায়	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	৭	ভাগ্যকূল

পরিশিষ্ট "ক"

প্রতি থানার এলাকায় বর্তমান অধিবাসী সংখ্যা ও পূর্ব গণনায় কত অধিবাসী ছিল এলাকার পরিমাণ ফল, গ্রামের সংখ্যা, বাড়ির সংখ্যা তাহা প্রদর্শিত হইল।

এলাকা	পরিমাণ ফল (বর্গমাইল)	গ্রামের সংখ্যা	মোট অধিবাসী	পুরুষ	স্ত্রী	প্রতিবর্গমাইলে অধিবাসী	বাড়ির সংখ্যা	পূর্ব পূর্ব ১৮৭২	আদসুমারির ১৮৮১	জনসংখ্যা ১৮৯১
সমগ্র জেলা	২৭৮২	৭২৬৫	২৬৪৯৫২২	১৩১২৪১৭	১৩৩৭১০৫	৯৫২	৪৭০২৪৩	১৮৫২৯৯৩	২১১৬৩৫০	২৩৯৫৪৩০
সদর বিভাগ	১২৬৬	২৬৮৪	৮৮১৫১৭	৪৩৮৬০৫	৪৪২৮৩২২	৬৯৬	১৬২২৮৪০	৬০৮৬৬০	৬৯৯০৯২	৭৯০৯৩৬
ঢাকা	৬	১১	৯৩৬৮২	৫১৮৪৯	৪১৮৩৩	১৫৬১৪	১৭৫০৪	২১০২৩৬	২৪৪৪৪৮	৮৩৬৩৩
কেরানিগঞ্জ	৩১০	৯২৮	২০৬৫৯১	১০১৬৯০	১০৪৯০১	৬৬৪	৩৮৭১৯			১৮৬৫৩৪
কাপাসিয়া	৪২০	৫৫৫	১৭৪৪৩৫	৯০৭৬১	৮৩৬৭৪	৪১৫	২৯৩৩১	১০৬২৩৫	১১৯৫১৫	১৪২৫৯৮
নবাবগঞ্জ	১৬০	৩০২	১৭০৮৫৫	৮০১৭৩	৯০৬৮২	১০৬৮	৩৩২২৮	১৩৮০০১	১৬০২৩৫	১৭০৬৯৭
সাভার	৩৭০	৮৫২	২৩৫৯৫৪	১১৪২১২	১২১৭৪২	৬৩৮	৪৪০৫৮	১৫৪১৮৮	১৭৪৮৩১	২০৭৪৭৪
নারায়ণগঞ্জ বিভাগ	৬৪১	২১৭৮	৬৬০৭১২	৩৪১১৫৩	৩১৯৫৫৯	১০৩১	১১০৩৩৮	৩৮৫৪১৩	৪৭০৬৫৭	৫৭৪৫১৬
নারায়ণগঞ্জ	১১৬	৭০৬	১৫৭৯৯৩	৮৪০২৭	৭৩৯৬৬	১৩৬২	২৭৭০৫	৯২৬৮২	১০৩৭৬০	১৩৮২০৫
রায়পুরা	২৯৮	৬৭১	২৭৬৮২৭	১৪২৬৪০	১৩৪১৮৭	৯২৯	৪৫১৩৩	১৫৫১০০	২০২৭৩৮	২৩৯২৫৯
রূপগঞ্জ	২২৭	৮০১	২২৫৮৯২	১১৪৪৮৬	১১১৪০৬	৯৯৫	৩৭৫০০	১৩৭২১	১৬৪১৫৯	১৯৭০৫২
মুন্সিগঞ্জ বিভাগ	৩৮৬	৯৭৮	৬৩৮৩৫১	৩০১৪৫৫	৩৩৬৮৯১	১৬৫৪	১১৪৫০৫	৪৬০৪৪৪	৫১৯৪৪৭	৫৮১০৫১
মুন্সিগঞ্জ	১৯৭	৫৪৮	৩০০৫৯২	১৪৫৮২৬	১৫৪৭৬৬	১৫২৬	৫৩৮২১	১৯৪৪৫১	২৪৩৪৬৩	২৭২৬৪৪
শ্রীনগর	১৮৯	৪৩০	৩৩৭৭৫৯	১৫৫৬২৯	১৮২১৩০	১৭৮৭	৬০৬৮৪	২৬৫৯৯৩	২৭৫৯৮৪	৩০৮৪০৭
মানিকগঞ্জ বিভাগ	৪৮৯	১৪৬১	৪৬৮৯৪২	২৩১১২৪	২৩৭৮১৮	৯৫৯	৮২৫৬০	৩৯৮৪৭৬	৪২৭২১৭	৪৪৮৯২৭
মানিকগঞ্জ	২০৮	৫৯৪	২০৭৭৭২	১০১৪৪২	১১৬৩২৩০	৯৯৯	২৯২২০	১৬৭৮৭৭	১৮৪১৯৬	২০০০৩৮
সিয়ালো আইর্চা	১৭২	৫২৭	১৫৯৯২০	৮০১৬৬	৭৯৭৫০	৯৩০	৩২৪৬৩	১৩৫২৯৩	১৪৩০১২	১৪৮৭৫৩
হরিরামপুর	১০৯	৩৪০	১০১২৫০	৪৯৫১৬	৫১৭৩৪	৯২৯	২০৮৭৭	৯৫৩০৬	১০০০০৯	১০০১৩৬

পরিশিষ্ট "খ"

প্রতি থানা ও মহকুমার এলাকার কোন ধর্মাবলম্বী লোক কত তাহা প্রদর্শিত হইল।

এলাকা	মোট হিন্দু	হিন্দু পুরুষ	হিন্দু স্ত্রী	মুসলমান	মুসলমান পুরুষ	মুসলমান স্ত্রী	খ্রিস্টিয়ান মোট	খ্রিস্টিয়ান পুরুষ	খ্রিস্টিয়ান স্ত্রী	অন্যান্য মোট
সমগ্র জেলা	৯৮৮০৭৫	৪৮৭২৭৪	৫০০৮০১	১৬৪০৬৩৯	৮১৯৫৮৭	৮৩০০৫২	১১৫৫৬	৫৪১৯	৬১৩৭	২৫২
সদর বিভাগ	৩৬৫৯৯৫	১৮৪৮৪৪	১৮১১৫১	৫০৮৭৪০	২৫০৮৪১	২৫৬৯৪৯	৬৪৯৯	২৮৭৩	৩৬২৬	২৩৩
ঢাকা	৫১২৪৭	৩০০৪৭	২১২০০	৪১৭২৮	২১৪২০	২০৩০৮	৪৮৪	২৬৪	২২০	২২৩
কেরানিগঞ্জ	৯০৫৭২	৪৫০৯৯	৪৫৪৭৩	১১৫৬২২	৫৬৩৮৪	৫৯২৩৮	৩৯৭	২০৭	১৯০	—
কাপাসিয়া	৫৩২৭৬	২৯৭৫৬	২৫৩২০	১২০১২৬	৬২৩১২	৫৭৮১৮	১০২৫	৪৮৬	৫৩৯	৮
নবাবগঞ্জ	৬৭৭৬১	৩১৭৩০	৩৬০৩১	৯৮৫৭২	৪৬৫৬২	৫২০১০	৪৫২০	১৮৭৯	১৬৪১	২
সাভার	১০৩১৬৯	৫০০১২	৫৬১২৭	১৩২৭৪২	৬৪১৬৩	৬৮৫৭৯	৭৩	৩৭	৩৬	—
নারায়ণগঞ্জ বিভাগ	১৬২১৭০	৮৫৮৫৫	৭৬৩১৫	৪৯৪২৩৩	২৫৩১০৩	২৪১১২০	৪৩১০	২১৯০	২১২০	৯
নারায়ণগঞ্জ	৫০৮৯৬	২৮৮২১	২২০৭৫	১০৬৯১৩	৫৫০৯২	৫১৮২১	১৮০	১১১	৬৯	৪
রায়পুরা	৫২৯০৮	২৭৭৩০	২৫১৭৮	২২৩৯০৪	১১৪৯০৩	১০৯০০১	১৫	৭	৮	—
রূপগঞ্জ	৫৮৩৬৬	২৯৩০৪	২৯০৬২	২২৩৯০৪	৮৩১০৮	৮৮০২৯৮	৪১১৫	২০৭২	২০৪২	৫
মুন্সিগঞ্জ বিভাগ	২৯২৪০৬	১৩৪৩৪৬৮	১৫৭৯৩৮	৩৪৫১৯৪	১৬৬৬২৯	১৭৮৫৬৫	৭৪৩	৩৫৪	৩৮৯	৮
মুন্সিগঞ্জ	১১৮১৮৩	৫০৮৫১	৬২৩৩২	১৮২৩৭০	৮৯৯৫১	৯২৪১৯	৩১	২০	১১	৮
শ্রীনগর	১৭৪২২৩	৭৮৬১৭	৯৫৬০৬	১৬২৮২৪	৭৬৬৭৮	৮৬১৪৬	৭১২	৩৩৪	৩৭৮	—
মানিকগঞ্জ বিভাগ	১৬৭৫০৪	৮২১০৭	৮৫৩৯৭	৩০১৪৩২	১৪৯০১৪	১৫২৪১৮	৪	২	২	২
মানিকগঞ্জ	৭০৯৯৩	৩৪৫৩৭	৩৬৪৫৬	১৩৬৭৭৪	৬৬৯০৩	৬৯৮৭১	৩	১	২	২
সিয়ালো আইর্চা	৫৭৯২২	২৮৯১৪	২৯০০৮	১০১৯৯৮	৫১২৫২	৫০৭৪৬	—	—	—	—
হরিরামপুর	৩৮৫৮৯	১৮৬৫৬	১৯৯৩৩	৬২৬৬০	৩০৮৫৯	৩০৮০১	১	১	—	—

পরিশিষ্ট "গ"

এই জেলায় কোন জাতীয় লোকের সংখ্যা কত তাহা প্রদত্ত হইল।

হিন্দু

	গোয়ালা		বাগদি		বৈদ্য		বৈষ্ণব		বানিয়া		বারুই		বারুয়া		ভুইমালী	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
সমগ্র জেলা	১৫৬০৩	১৬১০৭	৬১০	৫৮৭	৫০১২	৫৫০২	৩১২৫	৬১১৫	৬১৯	৬৮২	১৪৯৩১	১৫৬৬৫	২৮৮৫	২১৫৪	৬৫৮৮	৬৩৯৫
ঢাকা	১৫৬৯	১২২৬	৫	২	৮৭০	৪৪৬	২১১	৩৭২	৩৬	৩৫	৭৬	১৪	৩	—	১২৭	৭৩
কেরানিগঞ্জ	১৪১২	১৪৩২	২৮	৬	১৯৮	১৪৯	১৮৮	৩৭২	৩৭	৩৫	৩০৪	৫৭৮	—	—	৪৭৭	৩৪৫
কাপাসিয়া	৬৯৭	৬১৯	—	—	১৭২	১৯১	১৫৩	২৬৬	৫২	৫০	৭৭৭	৭১৬	—	—	৩০৯	২৭০
নবাবগঞ্জ	১১৭২	১৬৭২	—	—	৩৩	৪১	২১৬	৪৪৫	৩	৪	—	—	৬	—	৮০৬	৮৭৯
সাভার	১৪৯৯	১৫৭৬	৯৫	৪৫	২৪৮	১৯৪	১৮৯	২৪৫	১০৫	১১৪	১	—	—	—	৪৩৭	৩৫৭
নারায়ণগঞ্জ	৯৯০	৭৮৯	১১	১২	২৭৫	২৬২	১৬৫	৫৬২	১৮	২০	৯৯২	৯৫১	৩০৫	২৯৫	২৭৯	২৬২
রায়পুরা	৩৮৩	২১০	—	—	১৯৭	১৭৩	৫৭	২২৩	৩৫	৪৪	৩১৯	২৭৩	—	—	৪৮৬	৪৭৯
রূপগঞ্জ	৪৮৯	৩৮৬	—	—	৭৭৪	৬৪২	১৭২	৩৬৫	—	—	১২০৫	১১৭৩	১৪০	১৫৭	৩১৭	৪১৫
মুন্সিগঞ্জ	২১৬০	২৩৩১	—	—	১২২৪	১৯৬৩	২৯৮	৬১৭	১৪৫	১৫৫	৫৩৩৮	৫৪৮৫	১৫৪৩	১৪২১	৫৫৯	৫৩১
শ্রীনগর	৩৫৫৮	৪১৯৪	—	—	৫৪০	৭৯৭	৩১৪	৮৯৭	১৭০	২১০	৫৮৬১	৬৪৩৯	২২১	১৮৮	১৬৯০	১৬৮৬
মানিকগঞ্জ	৯৯০	১০৭৫	১৪১	১৬১	২৪৬	৩৪৫	১৮১	৩৫২	১৮	১৫	—	—	—	—	৪৪৭	৪৫৩
সিয়ালো আইর্চা	৪৪৭	৪৫২	৩৩০	৩৬১	১১৮	১১৬	৩৯৯	৭২৫	—	—	৬	৮	৬৭	৯২	৩৪২	৩৫৯
হরিরামপুর	২৩৭	১৪৫	—	—	১০২	১৬৯	২৮২	৫৮২	—	—	৫২	২৮	—	—	৩০৯	২৮৬

হিন্দু

	ব্রাহ্মণ		চামার		ধোবা		দাই		গন্ধবণিক		যুগী		কাহার		কৈবর্ত	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
সমগ্র জেলা	২৮৮৫	২১৫৪	৬৫৮৮	৬৩৯৫	৫৯৬১	৬০৭৪	৩৬০২	৩৩০৮	৩২১০	৩৬৩৩	৮৮৭৪	৯২৭৮	২৪৩৩	৬৯২	২৭৩৬৮	২৯৫৪৮
ঢাকা	৩০৮৩	১৪৭৫	৬২৮	৩৩৩	৬০১	৬২০	—	—	৪৫৫	৫২০	৭০	৭	২৩৭	১০২	৫১৭	২৫৩
কেরানিগঞ্জ	১৬৯৭	১২৫২	১০৭৯	১৩১৬	১৫৮	২১৪	—	—	২৮	—	৩৪৭	৪৩৪	২৭৩	৬৩	১৯৪১	২১৩২
কাপাসিয়া	৭৭০	৮৫৭	৪৫১	৩৩৩	৫৭৮	৫৩৭	২৭৯৩	২৫৬২	২০৯	১৭৩	১১১৫	১১০৭	৮৩	৪	৩৪১৮	২৯৪৬
নবাবগঞ্জ	১৩২২	১৬৬৫	১০৯৬	১৫০২	১৪৯	১৮৮	—	—	১৪১	১৬২	৯৪	৭০	১৩৭	৫	১৮১০	২০৪৫
সাভার	২৫৮১	১৯০২	১৯৮৮	১৮৫৬	২১৯	১৩৮	—	—	৬৬২	৬৯৮	২৮	—	১৫৩	২	১৬৯৯	১৯১৯
নারায়ণগঞ্জ	১৭২৩	১১৬৬	৪৯১	৪৩৫	২৯৫	২৭০	২১৮	১৯৩	১২৫	১০১	৫৪০	৪৪৪	৯৪	২৫	৬০৩	৪৩৮
রায়পুরা	৯৯৪	৯৫৩	৬৩১	৪১৩	৪১৫	৩৮৩	২৪৭	২০৭	২৭০	২৮১	১৭৫১	১৬৮৫	১৬৪	৭	২৬০৯	২৫৬১
রূপগঞ্জ	১৬০৫	১৪৯১	৩৪৪	৩৬০	২৪০	২৬৭	৩৯৮	৩৪৬	১৬৪	১৭১	১৪২৩	১৩১৬	৫৩	—	৩১১৬	৩১১০
মুন্সিগঞ্জ	৬১৪০	৮১৫০	২৩৯	২৯১	১৪৮৩	১৪৩৩	—	—	৫০৬	৬৮৯	১৮৩৩	২২১২	১৬৮	১৭	১৭৪১	১৬৫৬
শ্রীনগর	৮০৫৪	১০৫৬৫	৯৪৮	১২৯৫	১৩৫১	১৬১৪	—	—	২৬৮	৩৩৭	১১৬৫	১৫২৯	২৩৩	৭৪	৬০৩৩	৮১৭১
মানিকগঞ্জ	১৮৩৪	১৬৫৬	১৬৬৩	২০২১	১৫২	৮৫	—	—	১০৯	১৯১	১৩৪	৯৬	১৯০	২৩	১৪২৫	১৬৩৮
সিয়ালো আইর্চা	১৩৭৪	১৬০৭	৫৭৫	৬৩৩	১৭৪	১৮৫	—	—	১২৮	১৩৫	২৫২	২৬৫	৩২৫	১৫১	১০০১	১২৩৭
হরিরামপুর	৮৬১	৮৭০	৪৭৬	৬৩২	১৪৬	১৪০	—	—	১৪৫	১৭৫	১২২	১১৩	৩২৩	২১৯	১৪৫১	১৪৩৯

হিন্দু

	কামার		কাপালি		কায়েস্থ		কুমার		কুরমি		মালাকার		মাল্লা	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
সমগ্র জেলা	৭৭০১	৮৫৯০	১১৬০৪	১১১০১	৪০৬১৭	৪৫৩৪৬	১১৩৬৮	১১০৬৬	১৫৫২	৩৬১	১৪৯০	১১৫৭	৯৪৫	১১২
ঢাকা	৬৫৯	৬১১	১৬	১	৫৩৫৮	২৩১১	১১৩৫	১১৬১	৬৫৮	১৪৮	১১৮	৮২	২৮৭	—
কেরানিগঞ্জ	৫৯৭	৫০৫	৪১৬	২৭১	২৩৭৮	২৫৩৫	১২৮৫	৯৪০	১৪৩	২৮	১৯৪	১২৭	৩	২
কাপাসিয়া	২৮৫	২৭৬	২	—	১৫০৯	১৫৪৩	৪৪৮	৪০৩	৪১	১০	১৩	১৫	—	—
নবাবগঞ্জ	৪৬৪	৬৬১	১১৬	৫৩	১৯৭৬	২৭৫৭	১৩৭৯	১২৮৭	২১	২২	৭৫	৬০	১১	—
সাভার	৯৭৮	১১৩৯	১৭৯৫	১৬৯২	১৯৭১	২১৩৩	১৩৫০	১২৮৮	৮২	৪৬	২৪৯	২০১	২৪	৬
নারায়ণগঞ্জ	৪২৭	৩০৩	৪৪	১০	৩৭২০	৩০৪২	৮৪৫	৮১৫	১৬৪	৫১	৬১	৫২	৪০৭	১০৪
রায়পুরা	৩২৭	৩৭৮	৫৯	৫৪	২২৯৬	২২৭৬	৩৭১	৩৩০	১৫	৬	২৯	২৪	—	—
রূপগঞ্জ	৩৩৯	৪১৪	—	—	২৮১৯	৩০৮৩	২৯৯	২৯০	২১	১	৪৪	৪৪	—	—
মুন্সিগঞ্জ	১০৭২	১৪৫৮	১৪৩৫	১৪০৪	৪৫৬২	৫৪৪৮	১০৭২	১১০৮	১২৯	২	১২৫	১১৩	—	—
শ্রীনগর	৯২৬	১৪২৮	৮৬৭	৯০৩	৫৮৮৫	৮৯৮৯	২০৯১	২০৮৩	১৪৫	৫	২৬৬	২০৩	২৩	—
মানিকগঞ্জ	৬১৮	৫৩৭	৩৬২৪	৩৪৪২	১৬৬৭	১৮০৭	৪০০	৪৭১	৪৮	৩৭	১৭০	১২১	২৭	—
সিয়ালো আইর্চা	৪৪১	৫৩২	২০৪৬	২০০৩	৪৮২৩	৫৭৯৮	৩৮২	৩৯৪	৩	২	৮১	৭৯	১৬৩	—
হরিরামপুর	৫০৩	৩৪৮	১১৮৪	১২৬৮	২৬১৫	৩৪৭২	৩০২	৪৯৬	৪৬	৩	৬৩	৩৬	—	—

হিন্দু

	মালো		ময়রা		মুচি		মুণ্ডা		নমশূদ্র		নাপিত	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
সমগ্র জেলা	১৮৪১৫	১৫০৩৪	১২২৮	১১৫২	৫০০৫	৫১১৭	১০০৮	৪০৩	১১৬১৬৩	১১৯৩৭৯	১২৩৪৯	১২০৯৬
ঢাকা	২৪১	১২৮	৫০	৩০	২৩৬	২২২	৫৩	১০৬৪	৭০৭	২৭৩	৩৫৬	১৪০
কেরানিগঞ্জ	১৮২৬	১৭০৪	৩০০	৩৯০	১০৬৪	১১০৩	২১৪	৫৮	২০২৪২	২০২৯১	৭২৫	৬২১
কাপাসিয়া	১৮৫২	১৭০৭	১১	৪	৬০	৪২	—	—	৪১৫৫	৩৫৩২	৭৪৪	৭৫৪
নবাবগঞ্জ	১২৯১	১১৯৬	১০৭	৭২	—	—	—	—	১১৩৭৮	১২০০৭	৭২৪	৮২৪
সাভার	৯০৪	৯০৫	৭১	—	২৬১	২৬১	৬১৬	২৪৩	১৫১৩৩	১৭৩৫৮	৫০৯	৪১২
নারায়ণগঞ্জ	৮১৮	৫২৮	৭৩	৫৮	৩০৬	২৪৪	১৭	১৬	৬৫০০	৫৪৯৪	১০১৮	৯২৮
রায়পুরা	২৫৬৪	২৪৫০	২৭০	২১৮	৩৭৫	২৭৬	—	—	৬৩৪৩	৫৪৮৪	৮৫৩	৮২৯
রূপগঞ্জ	৮৮৮	৮২১	৯৩	৯৪	৯৫৫	৯৪২	—	—	৬১৭০	৫৭৯৩	১৬৬২	১৮০০
মুন্সিগঞ্জ	১৪০৯	১২৬৫	৬০	৮০	৩০৩	৩২৮	৪	—	৯৮২৩	৯৬৭২	২৬৮৩	২৬০৮
শ্রীনগর	৩৬৫	৩০০	৭৪	৯৭	৮৬৮	১০৭৩	—	—	১৯৫৫৪	২২৪৬৪	৭৬৫	৭৪৩
মানিকগঞ্জ	১৫১৪	১২৮৭	৭৩	৫৫	৪৩৯	৪৮১	৬২	৫৩	৭৫৮০	৮২৩৯	৮৪৩	৮৫০
সিয়ালো আইর্চা	৩৪৮০	১৭৭৭	৬	৭	১৩৬	১৪৫	১০০	৩০	৫৩৭২	৫৫০২	৬৫৬	৭৪৬
হরিরামপুর	১২৬৩	৯৬৬	৪০	৪৭	২	—	—	—	৩২০৪	৩২৭০	—	—

হিন্দু

	নুনিয়া		পাটিকর		পাটনী		রাজবংশী		রাজপুত		শাঁখারি		সুবর্ণবণিক	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
সমগ্র জেলা	১২৫৭	৫১৬	১০৪৬	১১৫৫	২৩২৫	২২৮৮	৫৭৮২	৫৫৬১	১৬৭৬	৪৭৯	১১৯৮	১৩৩৫	২৯০১	৩৩৩০
ঢাকা	৬৮	১০	৫	—	১৪	২	১০	—	৪৭৮	১৫৫	৯৮৫	১১৪৮	৯৭৭	১০০৯
কেরানিগঞ্জ	১২৭	৬৭	—	—	২৮৬	১৪০	৪৯৬	৪৭৩	২৬৪	১১৪	২৭	১	৪৪	১৭
কাপাসিয়া	৪১৩	২১৩	—	—	২১১	২৬৯	৩৩৮৩	৩৪১৩	৫৯	৮	—	—	৬০	৭১
নবাবগঞ্জ	৮০	২২	—	—	১৩০	১০২	১২	—	১৭	৭	৩৭	১৮	—	৪
সাভার	৯৫	৬৩	৫৫	৩৬	২২৬	১৮৩	১৬৯৯	১৫৬০	৪৯	১০	—	—	১১৯	১৩৯
নারায়ণগঞ্জ	৬৯	৩৬	৫৯	৩৯	২২৫	১৮২	৭	—	২৮৮	২৫	৩২	২৮	১৫২	২০৬
রায়পুরা	৮৩	১৫	—	—	৩১৬	৩১৪	৭	—	২১৬	৬৪	—	—	৯৮	১২৬
রূপগঞ্জ	২১	১১	১০২	১৬২	২৮৩	২৭৯	—	—	৫২	২	—	—	৪৫০	৪৪৮
মুন্সিগঞ্জ	১০	—	৪৬৯	৫৮২	১৬৯	১৭৮	২৩	—	৪৯	১১	৫৩	৭১	৩০৮	৩৪৪
শ্রীনগর	৪১	৯	৩৫৬	৩০৬	২১৫	১৮২	—	—	৩৫	—	৩	—	৪৯৩	৮৪১
মানিকগঞ্জ	২৫	৬	—	—	১৬১	২৪৭	৭১	৫৮	৩৯	—	২০	২১	১৪১	৭০
সিয়ালো আইর্চা	১৪৭	৫১	—	—	১০৫	১১৭	৫৬	৫৭	১৯	২	৩৬	৪৪	৫৯	৫৫
হরিরামপর	৭৮	১৩	—	—	৮৪	৯৩	১৮	—	১১১	৮১	৫	৪	—	—

হিন্দু

	শূদ্র		শুঁড়িসাহা		সূর্যবংশী		সূত্রধর		তাঁতি		তেলি		তিয়র	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
সমগ্র জেলা	১৬৪২১	২০৭৪৬	৩২৪৫৪	৩৮৫৪৮	২৮২৪	২৯৯০	৯২৯৯	৯২৬৪	৮০২৪	৬১৬২	৮৩০১	১০১৪০	১১৫৪৫	১০৮২৪
ঢাকা	৭৭৬	৩৫১	২৮৬৯	২৬১৫	২	—	৪২০	৩৫৬	৩০৫০	২৭৬৮	৭৩১	৪৮৫	১৯৭	২৯৭
কেরানিগঞ্জ	৯৯৫	১৫৫৯	১৯৪০	১৮৪০	৬৫৭	৬৭৯	৪২৩	২৪৯	২১২	১১১	৩১২	৪৩৮	১৫৩৭	১৭৫৮
কাপাসিয়া	৫২০	৫৩৪	৫৯৮	৩৫৮	৫৯২	৬০৩	৫৩০	৪৭৬	৭৪	১	৮১	১১৬	১২২	৯৬
নবাবগঞ্জ	৫৪৬	৭৬৫	৩৬০৩	৪৬৮৫	—	—	৫৭২	৬১৪	৩৮	১	১১৪	১৩৯	১৬০৫	১৮৬৫
সাভার	৭৯৫	৭৫৭	৪০০৮	৬৮১৬	১৫৭৩	১৭০৮	১৭৪৪	১৮৮৫	১২৩২	১০৬৫	৪৭৩	৫৪৫	২৮৪১	২৮৫১
নারায়ণগঞ্জ	৮০৭	৭৫৫	২৪৪১	১৯৫৮	—	—	৩৮৬	৩২১	২১৭	৬৪	৩৫৯	২৩৩	৭২৮	৫০৬
রায়পুরা	৪৪২	৪৫১	১৯১১	১৮৭৯	—	—	১১৪৫	৯৭৫	১৯৫	৮৪	৭১৫	৭১৪	—	—
রূপগঞ্জ	১২৭৪	১৫৩৯	২১৯১	২৭২৫	—	—	৬১৫	৫২৯	৩৫৭	৯৪	২৮৬	২৫৯	২৫৯	২৪৬
মুন্সিগঞ্জ	৪২৭৪	৫৭৮১	১৬৪৭	১৯১৩	—	—	৫৬৭	৫৬০	৩৬১	১৯৭	১৮৮৩	২৪২৪	৪৮৪	৫০৯
শ্রীনগর	৪৬২৯	৬৬৫৭	২৯৭৮	৪০৪০	—	—	২৮০	৩১২	৪৩৮	১২১	২৯০৫	৪২১০	১২০৮	৫৬৪
মানিকগঞ্জ	৫৫২	৫৭৩	৪১১৩	৫২০৮	—	—	১৩৯০	১৫৮৬	১৪২৫	১২৪০	১০৭	১৬৭	১৩৮২	১১৩৬
সিয়ালো আইর্চা	৪৭৬	৫৮৮	২০২১	২২১৬	—	—	৮২৪	৯৫৯	৩৭৯	৪৭২	৮১	৩৫	৬৮৪	৫০৪
হরিরামপুর	৩৩৬	৪৩৬	২১৩৪	২২৯৫	—	—	৪০৩	৪৪২	৪৬	৪৪	২২৪	৩৪৮	৪৯৮	৪৯২

মুসলমান

	বেদিয়া		বেলদার		জোলা		কুলু		নাগারচি		নিকারী		পাঠান		সৈয়দ		সেখ	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
সমগ্র জেলা	৮২৮	১০০১	৮০৫	৮২৫	২৯১৬৭	৩০২১৩	৩৬৮৫	৩৮২৬	১৫৭৫	১৫৮২	১০১৯	১১৩৫	৫২৪১	৫৫৫৬	১৮৭৫	১৮৬৭	৭৭৩৯২৭	৭৮২২৫৪
ঢাকা	৪	৩	—	—	৬	২	—	—	—	—	২৪	১৪	৫৭৬	২৯০	৪৫৭	২৯২	২০১৫৭	১৯৫৭৮
কেরানিগঞ্জ	৫	৩	—	—	৪৭৬	৫২১	৫০	৬৮	৮	৭	৭	১২	৬৬৫	৭৪৫	৪৪	৪৬	৫৫১১২	৫৭৮১৭
কাপাসিয়া	১৪	৩২	—	—	৮	—	২৯৪	৩৮৫	২৪	৩৬	—	—	১৬৯	১৮৯	৯১	৭০	৬১৬৫৮	৫৬৯৯৪
নবাবগঞ্জ	৯৭	১২০	৭২	৭৭	৬৩০০	৭০৩৭	১৪১	১৩৬	৭০	৬০	৮৬	৮৪	৮৯৬	৯০১	৫৪	৬৪	৩৮৮৪৫	৪৩৫৫৬
সাভার	১০৩	১১৯	—	—	৪০১৯	৩৪৪৭	৪৭৫	৩১৫	৭২	৬০	১৯৬	২৫০	৭৭৯	৮৪৯	২২৫	৩৮০	৫৮২৬৪	৬৩১৪৭
নারায়ণগঞ্জ	—	—	—	—	১	১৩	৩৪	৩৯	৫	১৪	৩০	৪৮	৩৮	৩১	৫১	১৩	৫৪৮৪৮	৫১৫৬৬
রায়পুরা	৪৯	৬৯	—	—	৩১	২১	৭৭৫	৭৮৮	৬১৩	৬০৬	—	—	১১৪	৮০	৩৫০	৩২২	১১২৯০৮	১০৭০৩৭
রূপগঞ্জ	১৯	৩০	৭	১১	২২	৩১	৬২০	৬৪৫	৩৪৩	৩১০	—	—	১৫৪	১৬৮	২২	২৪	৮১৯২৫	৮৮৯৪৯
মুন্সিগঞ্জ	১২১	১৬৯	৭	৬	৩৪৭	৩৭৯	৪৭৫	৬১৭	২৬৬	২৮৯	২৩৯	২৭৪	৫২	৪৮	৪৭	৯৯	৮৮২৮৬	৯০৪৪৮
শ্রীনগর	১৩৭	১৩৬	৬৩৭	৬২৬	৬০৩০	৬৩৫২	১৬	১০	১৪৬	১৬৮	৭৭	৮৩	৪৩৪	৪৮১	১০১	১০৩	৬৯০৩৫	৭৮১৪৪
মানিকগঞ্জ	৯৩	৯৫	৩৭	৬৮	৪৬০৫	৪৯২১	২৯০	২৯৫	২৭	১৬	১৩৫	১৫৩	৮১৫	১১০৭	৯২	১১০	৬০৫০৬	৬২৫৯৮
সিয়ালো আইর্চা	১৭২	২০৯	৩৬	২৪	৪৫৮৫	৪৬৩৮	১৬৪	১৮১	২৮	৪২	৮১	৭৫	২৬২	২৬৩	২১৪	২২৬	৪৫৪০৬	৪৪৮৭৩
হরিরামপুর	১৪	১৬	৯	১৩	২৭২৭	২৮৪৭	৩৪৯	৩৩৭	৪৩	৩৪	১৪৪	১৪২	২৮৭	৪০৪	৮৭	১১৮	২৬৯৭৭	২৭৬৩৭

একসহস্রের নিম্নে যাহাদিগের সংখ্যা

হিন্দু												মুসলমান		
	পুরুষ	স্ত্রী		পুরুষ	স্ত্রী		পুরুষ	স্ত্রী		পুরুষ	স্ত্রী		পুরুষ	স্ত্রী
আগরওয়ালা	৫	২	গনদ	১২	১২	ধমুল	১৮৮	—	খটিক	২	৯	আজলক	৮৮	১৪৩
বাহেলিয়া	৩৭	২	গনর	৩৮২	৮০	ডোম	২৬৭	১৫৫	খাটুই	৯	—	আমারক	২	—
বাইসবানিয়া	১৬	১৭	গনরী	২৫১	২	দোমাদ	৫৫৯	১২০	খেতুরি	১	—	বেহারা	১৭৪	১৫১
ভিটি	৩০৮	৩২৪	হাজং	১৭	২	গঙ্গাস্তুত	৯	—	কিচক	৫৭	৫৮	দফাদার	১৮৩	২৮০
বন্দুযাত	১	—	হালানকর	৮৫	৭৮	গনবর	১৮৯	১৬৯	কৈরী	৪৪৫	১৬০	দাই	২৫৪	৩০০
ভোলা	৮৭	১৩১	হালুয়াই	৮৯	৬২	গাবোরি	৪৭	২৬	কোরো	১২	১৬	দর্জি	১	—
বড়াই	১১	—	হাঁড়ি	৫৮	২৪	গারো	২৮১	২৬৬	কোষ্ঠা	৪	—	দেওয়ান	১৯	৭
বারি	৪	—	হো	১	১	প্রেতোপাসক			লালবেগী	১৬৬	৫৭	ধোপী	৯	৮
বাউরি	৩৩	১৪	জয়তিস	১	—	(গারো)	১	—	মগবৌদ্ধ	১২	৩	ধূনিয়া	১৪	১৫
বেদিয়া	১৯	—	কাচারো	২৮৮	৪১১	মার্কেন্ডি	১	—	মাহ্বলি	১	—	ফকির	১	৪
বেহারা	১৮৯	৯৩	কাচ্চি	৬	—	মৌলিক	২	১	মারোয়াড়ী	৭৪	১৮	হাজং	২৫২	২৮৩
বেলদার	২৪৬	২	কালোয়ার	৪৫	১০	মুরীয়ারি	৬৪	১৫	মেথর	৩২০	১৮৪	কাশ্মিরী	৫	—
বেদ্দালি	২	—	কান্দু	৬৩৩	১৪১	নাগর	৮	৬	মুশাহারা	৫	—	কাজি	৪	৪
বেশ্যা	১৮	৫৯৪	কাঁসারী	৪১২	২২৬	নুরী	১	—	নট	২৩১	৩১৫	খাঁ	৫৯	৬২
ভাণ্ডারি	১	—	কবন	৪	—	উড়িয়া	৬	২	ওয়াউন	৩০	৩২	খুজা	১২	১০
ভড়	৩৬৫	৯৭	করণি	৪২২	২৪০	পশি	১৯৬	১৪১	আনোয়াল	২	—	খাওয়ানদফর	—	১১
ভাট	৮	—	কাওয়ালি	১৩১	১১৮	রাজভর	১৬০	২৩	পাটুয়া	৩	৬	লালবেগী	৩০	২২
ভূঁইয়া	১৭৩	১৪৯	কেয়ত	১৭৬	৭৬	সন্ন্যাসি	৯৪	১১৫	সদগোপ্	১৬৬	২৩৫	মাহিফরাস	৮	৭
ভূমিজ	১৭৬	১৮৪	ঘণ্ডাইত	৮৯	—	সোনার	৩৯	১৩	সাঁওতাল	৫	১	মাল্লা	৯	৬
বীন্দ	৬৩২	৫৯	ঘারোয়ার	৮৮	১২৮	তাম্বুলি	৯২	৯৫	সোরাহিয়া	৩৬৭	৫	মেথর	১৬	১২
অগ্রদানী (ব্রাহ্মণ)	৪৬১	৩৫০	ব্রাহ্মজ	১১	১	টিপরা	৮৯	৮৭	তেলেন্দা	১	—	মীর	৩০	১৪
ব্রাহ্মণ	৩৮	৩৫	চেইন	১৫৬	—	টুরী	৬	—	তুরয়া	৭	—	মীরজা	৫১	৫১
বর্মি	১	—	চাইনিজ বৌদ্ধ	৩	১	খাস	১	—	বৈশ্য	৫৯	৯০	মোঘল	২২৬	২২১
												মুন্নি	৩	—

পরিশিষ্ট "ঘ"

বয়ঃক্রম অনুসারে বিবাহিত, অবিবাহিত, বিপত্নিক ও বিধবার সংখ্যা প্রদত্ত হইল।

বয়স	জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	অবিবাহিত পুরুষ	অবিবাহিত স্ত্রী	বিবাহিত পুরুষ	বিবাহিত স্ত্রী	বিপত্নিক	বিধবা
মোট—	২৬৪৯৫২২	১৩১২৪১৭	১৩৩৭১০৫	৭১০৯৩০	৪৮৭৩৮২	৫৬৫৬৬৫	৫৯৩৯৪৮	৩৫৮২২	২৫৫৭৭৫
০—৫	৪০৬৮৯৯	১৯৬৮৯৮	২১০০০১	১৯৬৩৭৬	২০৮৪৩১	৪৮৮	১৩১৪	৩৪	২৫৬
৫—১০	৪২২৫৩৪	২১০১০৪	২১২৪৩০	২০৮৪২৪	১৯৯৬০২	১৫৬৮	১২০০৬	১১২	৮২২
১০—১৫	৩২৩৫৬০	১৭৬৯৬৪	১৪৬৫৯৬	১৬৮৯২৩	৬৯২৫১	৭৮৪৩	৭৪৬১৪	১৯৮	২৭৩১
১৫—২০	২৩৭৫০৬	১১০১১৫	১২৭৩৯১	৮১৫৮০	৪৩৮১	২৮০০৫	১১৬৪৯৫	৫৩০	৬৫১৫
২০—৪০	৭৭২৮১৮	৩৭৬৯০৩০	৩৯৫৮৮৮	৫০৪৭৩	৪০৫৯	৩১৭২৫৩	৩২০৯০৭	৯২০৪	৭০৯২২
৪০—৬০	৩৫১৫২০	১৭৯০৫২	১৭২৪৬৮	৪০৬৮	১৩৪৭	১৬১৬৭২	৬২৭১০	১৩৩১৬	১০৮৪১১
৬০-এর উর্ধে	১৩৪৬৮৫	৬২৩৫৪	৭২৩৭১	১০৯০	৩১১	৪৮৮৩৬	৫৯০২	১২৪২৮	৬৬১১৮
হিন্দু	৯৮৮০৭৫	৪৮৭২৭৪	৫০০৮০১	২৫১২১৭	১৫২৬৩৯	২১৪৩০৪	২১৬৬৫২	২১৭৫৩	১৩১৫১০
০—৫	১৩২৫৩১	৬৪৬৪২	৬৭৮৮৯	৬৪৪১১	৬৭৩১২	২০৫	৪৫৯	২৬	১০৮
৫—১০	১৩৭৭৪২	৬৮৪৯৯	৬৯২৪৩	৬৭৮৮০	৬৩২৬৪	৫৫৭	৫৬০৪	৬২	৩৭৫
১০—১৫	১১৪০৮২	৬২৪৭২	৫১৬১০	৫৯৩৭৩	১৯২২০	২৯৯৫	৩১০৫৪	১০৪	১৩৩৬
১৫—২০	৯১১২৯	৪২৭৩০	৪৮৩৯৯	৩১৪২২	৯৬১	১১০৪২	৪৩৬১০	২৬৬	৩৮২৮
২০—৪০	২৯৮২৬০	১৪৫৯৩২	১৫২৩২৮	২৪৩৫৫	১৩৭৪	১১৭০৯৪	১১১০৭৯	৪৭৫৩	৩৯৮৭৫
৪০—৬০	১৫২৬৭৫	৭৫৯৯২	৭৬৬৮৩	২৯৮৯	৩৬৯	৬৪০২১	২২৬৭১	৮৯৮২	৫৩৬৪৩
৬০-এর উর্ধে	৬১৬৫৬	২৭০০৭	৩৪৬৪৯	৭৮৭	১৩৯	১৮৩৯০	২১৭৫	৭৫৬০	৩২৩৩৫
মুসলমান	১৬৪৯৬৩৯	৮১৯৫৮৭	৮৩০০৫২	৪৫৬৩০২	৩৩২১০৩	৩৪৫৩৩১	৩৭৪৬৫৪	১৩৯৫৪	১২৩২৯৩
০—৫	২৭২৫৩৯	১৩১৩৬৬	১৪১১৭৩	১৩১০৭৫	১৪০১৯০	২৮৩	৮৪৫	৮	১৩৮
৫—১০	২৮২৮৯২	১৪০৬১৪	১৪২২৭৮	১৩৯৫৫৩	১৩৫৪৩৬	১০১১	৬৩৯৭	৫০	৪৪৫
১০—১৫	২০৭৭৯৭	১১৩৬৪৯	৯৪১৪৮	১০৮৭১৯	৪৯৩৩৮	৪৮৩৬	৪৩৪১৮	৯৪	১৩৯২
১৫—২০	১৪৫৩১৩	৬৬৯০৭	৭৮৪০৬	৪৯৭৪২	৩৩৫৯	১৬৯০২	৭২৩৭৭	২৬৩	২৬৭০
২০—৪০	৪৭০৯৭৬	২২৯৩২৬	২৪১৬৫০	২৫৮৫৯	২৬৩৬	১১৯০৪৩	২০৮২১৫	৪৪২৪	৩০৭৯৯
৪০—৬০	১৯৭৪১৬	১০২৩৬৭	৯৫০৪৯	১০৫৩	৯৭২	৯৭০২০	৩৯৭১২	৪২৯৪	৪৪৩৬৫
৬০-এর উর্ধে	৭২৭০৬	৩৫৩৫৮	৩৭৩৪৮	৩০১	১৭২	৩০২৩৬	৩৬৯০	৪৮২১	৩৩৪৮৬

পরিশিষ্ট “ঙ”

ঢাকা জেলার কতিপয় গ্রাম্যশব্দ।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
		আ	
আইজান	বন্ধকরা	আইড়া	যে সহজ তর্কে হার
আইল্লী	আগুন রাখিবার মৃৎপাত্র।		মানেনা
আক্কল	কষ্ট, প্রতিশোধ।	আখা	উনান, চুল্লী
আখুট	শিশুর আবদার।	আগর	দুরুহ
আজা	মাতামহ	আজীমা	মাতামহী
আমূচর	আমসি	আলগূচে	সম্যক স্পর্শনা
আমলে	বাস্তবিক		করিয়া
		উ	
উকড়া	মূড়কি	উরুম	মুড়ি
		ঊ	
ঊনী	কম, শূন্য		
		এ	
এউক্কা, এউগা	একটা		
		ও	
ওমা	ইষদুষ্ণ		
		ক	
কদু	লাউ, অপক্ক কাঁঠাল।	কল্লা	মুখরা স্ত্রীলোক
কাঁইড়া	মাছিদের বংশ	কাইলা	মেঘমুক্ত
	নির্মিত তৈলাধার।	কারুরে	কাহাকেও
কচুক্কেরা	কুচক্রী, দুষ্ট।	কৈলাশ	কিন্তু
কোটা	আকর্ষণী	ক্ষীরাই	স্থূল ও খর্বাকার শশা
			বিশেষ।
		খ	
খাড়াকাখাড়া	তাড়াতাড়ি	খাপ	মলাট
খাবাসি	বংশোদ্ভববালাকা	খামাখা	মিছামিছি
		গ	
গলাই	নৌকার দুই	গয়া	ফড়িং, পেয়ারা
	অগ্রভাগ	গাছা	প্রদীপ রাখিবার কাষ্ঠদণ্ড
গিরু	গাঁইট		
গো	দের-বহু বচনান্ত	গোদানি	উল্কী
	ষষ্ঠী বিভক্তি।	গাছান	পায়খানায় যাওয়া
		ঘ	
ঘিলু	মস্তিক, মগজ	খুচান	খোলা
চান্দরা	দোচালা ঘরের দুই	চ্যাপ্টা	চাপা
অন্তস্থ-ত্রিভূজাকৃতি		চোকলা	চোচা
স্থান			

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
ছুচি	অশুচি	দৃঞ্চা	ঘরের চালের
ছাও	ছান, শাক।	ছাওয়ালপাল	ছেলেপিলে
ছিরাবিরা	বিশৃঙ্খল	ছোপ	নিষ্ঠীবন, থুবু
ছেব্‌লা	বহুভাষী	ছোচা	লোভী
ছোৎ করিয়া	শীঘ্র	ছ্যামায়	সামনে, কাছে
		জ	
জালা	বৃহৎ মৃন্ময় জলাধার।	জোনিপোকা	জোনাকী পোকা
		জো	তুকতাক ঔষধ দ্বারা বশীকরণ।
জুইত	সুবিধা		
জোকার	হুলুধ্বনি, উলু		
		ঝ	
ঝাইল	বেত্র পেটিকা	ঝোমান	ঘুমপাওয়া, তন্দ্রা
		ট	
টাগা	ঘুনসি	টাবলা	অনর্থক বহুভাষী
টেঙ্গুড়	একপায়ে হাঁটা	টুরি	ক্ষুদ্র ডালা।
		ঠ	
ঠাটা	বাজ, বজ্র	ঠোকর	গালে ঠোনা।
		ড	
ডকি	মৃন্ময় পাত্র, পাতিল	ডৌল	গঠন
ডোরা	গৃহের ভিত্তি	ডেমাক	অহঙ্কার।
		ত	
তড়িৎ	অনুসন্ধান	তালাজ	অনুসন্ধান
ত্যান্দর	দুষ্ট	তুলতুলা	খুব নরম।
তেঁড়িবেড়ি	বক্রভাব		
		থ	
থোড়	মোচা	থোৎসা	চিবুক।
থ্যাতা	চেপটা		
		দ	
দানী	স্ত্রীলোকের কণ্ঠাবরন, মালা।	দৈলা	পিটালিনির্মিত পিঠা
		ধ	
ধারা	মাদুর বিশেষ	ধুরু	অবিশ্বাসসূচক অব্যয়

পরিশিষ্ট "চ"

বয়ঃক্রম অনুসারে শিক্ষিত অশিক্ষিতের সংখ্যা প্রদত্ত হইল

বয়স	মোট		শিক্ষিত		অশিক্ষিত		বাংলা ভাষায় শিক্ষিত	
	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
সকল ধর্ম	১৩১২৪১৭	১৩৩৭১০৫	১৫৯৩৮৯	১৩৯৫৬	১১৫৩০২৮	১৩২৩১৪৯	১৫৩৪২৩	১৩৪২৪
০—১০	৪০৭০০২	৪২২৪৩১	৮৮৮৯	৯৭৩	৩৯৮১১৩	৪২১৪৫৮	৮৮১৫	৯২৯
১০—১৫	১৭৬৯৬৪	১৪৬৫৯৬	২৪২৯২	২২৬০	১৫২৬৭২	১৪৪৩৩৬	২৪০০৭	২১৬৮
১৫—২০	১০০১১৫	১২৭৩৯১	২০৩১১	২৪৮৭	৮৯৮০৪	১২৪৯০৪	১৯৭৬৯	২৪০৮
২০ হইতে অধিক	৬১৮৩৩৬	৬৪০৬৮৭	১০৫৮৯৭	৮২৩৬	৫১২৪৩৯	৬৩২৪৫১	১০০৮৩২	৭৯১৯
হিন্দু	৪৮৭২৭৪	৫০০৮০১	১১৮৩১৫	১২৩৩৯	৩৬৮৯৫৯	৪৮৮৪৬২	১১৬১১১	১২৩৩৩
০—১০	১৩৩১৪৭	১৩৭১৩২	৭৪১০	৭৯৫	১২৫৭৩১	১৩৬৩৩৭	৭৪০৫	৭৯৫
১০—১৫	৬২৪৭২	৫১৬১০	৪৮৬২১	১৩৭৬	৪৩৮৫১	৪৯৬৩৪	১৮৫৯৯	১৯৭৬
১৫—২০	৪২৭৩০	৪৮৩৯৯	১৫০৬৮	২২৫৮	২৭৬৬২	৪৬১৪১	১৪৯৭৮	২২৫৮
২০ হইতে অধিক	২৪৮৯৩১	২৬৩৬৬০	৭৭২১৬	৭৩১০	১৭১৭১৫	২৫৬৩৫০	৭৫১২৯	৭৩০৪
মুসলমান	৮১৯৫৮৭	৮৩০০৫২	৪০২৪৩	১১৭৫	৭৭৯৩৪৪	৮২৮৮৭৭	৩৬৭৫৯	৮১৮
০—১০	২৭১৯৮০	২৮৩৪৫১	১৪১৭	১৩৬	২৭০৫৬৩	২৮৩৩১৫	১৩৭১	১০৮
১০—১৫	১১৩৬৪৯	৯৪১৪৮	৫৫৪২	১৯০	১০৮১০৭	৯৩৯৫৮	৫২৯৬	১২৮
১৫—২০	৬৬৯০৭	৭৮৪০৬	৫১৬৭	১৬০	৬১৮৭০	৭৮২৪৬	৪৭৩২	৯৯
২০ হইতে অধিক	৩৬৭০৫১	৩৭৪০৪৭	২৮১১৭	৬৮৯	৩৩৮৯৩৪	৩৭৩৩৫৮	২৫৩৬০	৪৮৩

হিন্দি ভাষায় শিক্ষিত		ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত	
পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
২০২৩	৩৮	১৯৪৮৭	৪৩০
৪	—	৬০০	৩৩
৩২	৫	৩৭৭০	৮৪
৯২	৫	৪৬৬৪	৭২
১৮৯৫	২৮	১০৪৫৩	২৪১
১৫৫৭	৩	১৭২৮০	১৯২
৪	—	৫২০	১৪
১৫	—	৩৪৪১	৩৭
৫৫	—	৪১৬৯	৪১
১৪৮৩	৩	৯১৫০	১০০০
৪৬৪	৩৪	১৮৩১	১৯
—	—	৫৪	১
১৭	৫	২৯৩	৬
৩৭	৫	৪৬৬	১
৪১০	২৪	১০০৮	১১

পরিশিষ্ট "ছ"

প্রতি থানায় শিক্ষিত অধিবাসীর সংখ্যা

এলাকা	হিন্দু লেখাপড়া জানে		মুসলমান লেখাপড়া জানে	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
ঢাকা জেলা	১১৮৩১৫	১২৩৩৯	৪০২৪৩	১১৭৫
কতোয়ালি	১৫৬৬৭	১৮৭৩	৩৯১৮	২৭০
কেরানিগঞ্জ	৬৭৫৪	৬৪৯	২৯৬২	২৪
কাপাসিয়া	৩৩৫৪	২১০	১৮৯৯	৫১
নবাবগঞ্জ	৭১২৬	৪২৮	২২২৩	১৫৫
সাভার	৭৮৬১	৫০৫	১৯০৯	৪৩
নারায়ণগঞ্জ	৮৭৮৩	৫২৯	২৯০২	৮০
রায়পুরা	৫৭১৪	১৯১	৫২৭৫	১১০
রূপগঞ্জ	৬৬৮৬	৬৮২	৩৮০৯	৮৪
মুন্সিগঞ্জ	১৮১৯২	২৪৬৯	৬৩৩৪	১২১
শ্রীনগর	২১৪৮৪	৩৫১১	৪৭৯৭	১৭৪
মানিকগঞ্জ	৭১১২	৫২৪	১৬৯৩	৪০
সিয়ালো আইর্চা	৬২৫৪	৫১২	১৩৯২	১৫
হরিরামপুর	৪৩২৮	২৫৬	১১৩০	৮

শতকরা লেখাপড়া জানে		
হিন্দু	মুসলমান	মোট ইংরেজি লেখাপড়া জানে
১৩.২	২.৫	১৯৯১৭
৩২.৩	১০.১	৬৬৫০
৮.২	২.৬	৭৬৪
৬.৭	১.৬	২৬১
১১.১	২.৪	৪৬৬
৮.১	১.৫	৬৯৭
১৮.৩	২.৮	১৬০০
১১.২	২.৪	২৮৯
১২.৬	২.৪	৬৩৮
১৭.৫	৩.৫	৩৫৩৭
১৪.৩	৩.১	৩৩৮৩
১০.৮	১.৩	৮০৩
১১.৭	১.৪	৫৫০
১১.৯	১.৮	২৭৯

পরিশিষ্ট "জ"

এই জেলার সদর স্টেশন হইতে পার্শ্ববর্তী জেলা সমুহের সদর স্টেশনে যাওয়ার গ্রাম্যপথগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইল।

ঢাকা হইতে কুমিল্লা

মাইল	নদী	খাল	মাইল-নদী-খাল
১ ঢাকা	নারায়ণগঞ্জ	১	লক্ষ্মা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। পাকা রাস্তা।
২	বৈদ্যের বাজার ১৫ লক্ষ্মা ও প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র।		বাণিজ্যস্থান। মেঘনা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত
৩	দাউদকান্দি ৩০ মেঘনা		মেঘনার খেয়া পার হইতে হয়।
৪			নারায়ণগঞ্জ হইতে নৌকায় গেলে ঝাপটা হইয়া যাইতে হয়।
ত্রিপুরা	ইলিয়টগঞ্জ	৪১	ভাল পানীয় জলের সরবরাহ নাই
৫	বড়কামতা	৫২	৫ জল ভাল।
৬	কুমিল্লা	৬২	১ ত্রিপুরা জেলার সদর স্টেশন।

ঢাকা হইতে বগুড়া
(গোয়ালন্দ ও সিরাজগঞ্জ হইয়া)

১	কুলবাড়িয়া	১০	৩	ধলেশ্বরীর নদীর বামতীরে বর্ষায় প্লাবিত হয়।
২	মানিকগঞ্জ ঢাকা	২৬	ধলেশ্বরী	খেয়া পার হইতে হয়। মহকুমা।
৩	মহাদেবপুর	৩৭		রাস্তায় সেতু আছে।

৪	শিবালয়	৪৩			অনেকগুলি নালা পার হইতে হয়। পদ্মাতীরে।
৫	গোয়ালন্দ	৪৬			পদ্মা ১ খেয়াপার হইতে হয়। ফরিদপুর জেলার মহকুমা।
৬	বেড়া	৬৫			পদ্মা ৪ ইছামতী বড়াল ও হুরাসাগরের সঙ্গমস্থলে। বড় বাজার
৭	বেলকুচি পাবনা	৮৩			১ হুরাসাগর, ইছামতী, বড়াল নদী ও প্রাচীন হুরাসাগর পার হইতে হয়। খেয়া আছে।
৮	সিরাজগঞ্জ	৯২	হুরাসাগর		৪ বৃহৎ বাণিজ্যস্থান। যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে পাবনা জেলার মহকুমা।
৯	চাঁদাই কোনা	১০৯			ইছামতী ও করতোয়ার খেয়াপার হইতে হয়।
১০	সেরপুর বগুড়া	১২১			ফুলঝুড়ি নদীর ডান তীরে অবস্থিত। নালাগুলি বর্ষায় অতিক্রম করা কষ্টকর।
১১	বগুড়া	১৩৪	২		নালা ২ টিতে সেতু আছে। সদর মহকুমা।

ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ

১	মোরাপাড়া	১১	লক্ষীয়া	৩	বর্ষায় প্লাবিত থাকে। লক্ষীয়ায় খেয়া আছে।
২	পাঁচদোনা	২৩		১	
৩	গড়বাড়িয়া	৩৫	বানার		খেয়া আছে।
৪	সাগরদী	৪৭			
৫	টোক			৫১	বানার ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত।
৬	বাসিয়া			৫৮	ব্রহ্মপুত্র ও বানার খেয়ায় পার হইতে হয়।
৭	সালটিয়া			৬৮	ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। নালায় সেতু আছে।
	ময়মনসিংহ				
৮	খরাইদ			৭৬	ঐ
৯	কালীগঞ্জ			৮৬	ঐ
১০	ময়মনসিংহ			৯৬	সদরস্টেশন

পরিশিষ্ট "ঋ"

এই জেলার সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে কতজন চাকরি ব্যবসায়ী ও কতজন কিরূপ ব্যবসায় জীবিকা নির্বাহ করে তাহা প্রদর্শিত হইল।

তালুকদার	পুং	স্ত্রী
গভর্নমেন্ট কর্মচারী	৭৭	—
গভর্নমেন্ট কেরানি	৭৯	—
কেরানি (গর্ভমেন্টের নহে)	৬৩	—
ম্যানেজার	৫৭	—
উকিল মোক্তার	২৮	—
শস্য বিক্রেতা	১৯	২
কন্ট্রাক্টর	৩৮	—
মার্চেন্ট অথবা দোকানদার	১২৮	—
শিক্ষক	৭৭	—

তালুকদার	পুং	স্ত্রী
চিকিৎসক	১০৮	—
পুরোহিত	১১৬	৯
লগ্নিকারবার	৩০১	৩৫
বাড়িওয়ালী	১১	১
অন্যান্য	৫৬৮	৯
	১৬৮০	৫৬

প্রজাদিগের মধ্যে যাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে নিযুক্ত।

	পুং	স্ত্রী		পুং	স্ত্রী
কনস্টেবল	২৪৫	—	তাতের কার্য	১১১০	২
চৌকিদার	৭৪৬	—	দর্জির কাজ	৩৭১	১
মজুর	৬৮৫৮	১১	সূত্রধরের কাজ	১০৯৫	—
কলের মজুর	১৩৮	—	কুম্ভকারের কার্য	১৬৭	—
চাউল প্রস্তুত করে	৭২০	২৫	লোহার কার্য	২২১	—
মৎস্য ব্যবসায়ী	১৬৯০	৯	বাঁশের কার্য	৩৩৬	—
মাঝি	২১৭৯	—	চামারের কার্য	৩২৬	—
রাখাল.	৫১৩	৬	মেথর ও মালির কার্য	৪৪	—
নাপিত	২৬৫	২	শস্য বিক্রেতা	১৩৮৫	২২
ধোপা	২৪৯	—	বাদ্যকর	৬০৭	—
দোকানদার	২৭৭৮	৩৬৪	টাকা লগ্নি	৮৮৭	২৩
শিক্ষক	১৫৯	—	অন্যান্য	১২০৭৯	২৯৩
তৈলিক	৪৫৫	১			
				৩৫৫৮৮	৭৭৫

কত লোকের উপর কত লোক নির্ভর করে।

ব্যবসায়	পুং	স্ত্রী	নির্ভর
গভর্নমেন্টের কর্মচারী	৬৭	—	৪৫৩
কেরানি প্রভৃতি	৯৩৭	—	৪১৮৬
কনস্টেবল	১৭৭০	—	৬৫৩২
মিউনিসিপ্যাল ইত্যাদি	১১০	—	২০৩
গ্রাম্যকাজ	২২৭৩	—	৫৯৫৫
সৈন্য	৭২	—	৭
পশুপালন	৬৯০৪	৩১	১৬৫০
পশুচিকিৎসা	১৮৩	—	৪৯১
তালুকদারী	৯৩১৩	২০১৪	২৯২০১
রাইয়তি	৪৫৩২৩৬	১২৮৭৪	১১৩০৩৬৮
গৃহস্থী কার্য	২১৩৫৬	৪২৫	২০৬৪৪
চাপান সুপারি ইত্যাদি উৎপাদক	৩৬৯০	১৬৫	৮৮৯৮
কৃষিবিদ্যার এজেন্ট কেরানি ইত্যাদি	৫৮৭৭	—	২১৮৩৭
নাপিত ধোপা চাকর পাচক	১৯৩২৭	৪৪২৭	৩৬৩১৬

ব্যবসায়	পুং	স্ত্রী	নির্ভর
হোটেলদার প্রভৃতি	১৬৪	৩১	৩২৯
ঝাড়ুবরদার	১২৯৫	২৭০	১৬৬২
মৎস্য মাংস বিক্রেতা	৩৭৩৪০	৩৩০৫	৭৮১৭২
শস্য বিক্রেতা	১৬৬৮৬	৮৬৬৫	৪১৭০৯
পান তামাক মদ প্রভৃতি বিক্রেতা	১৪৮৮০	৩০৭	৩৮১৮৬
তৈল বিক্রেতা	১২৪	—	৮৯
কাঠ বিক্রেতা	১২৮৬	৪৪৩	২৪৭৩
গৃহনির্মাতা	১৭৬১	১২৯	২৫২৫
	৪১৩৯	৪৩	১০৩৫৩
গাড়ি পাল্কি প্রভৃতি নির্মাতা	৩৩৫১	—	৯০৯৪
কাগজের কাজ	৫১	২	১৪৪
পুস্তকের ও প্রেসের কাজ	৭০৬	—	২৬৪০
ঘড়ি প্রভৃতি কলকারখানার কার্য	৫৫	—	৬৬
খোদাই কার্য	৩	—	৬
খেলনা প্রস্তুত	৩২৮	—	১৩৮
বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত	৫৩	—	২১
চুড়ি বালা প্রস্তুত	১৩২৫	২২৫	৩১৭১
শিং এর কাজ	২	—	২
অস্ত্র প্রস্তুত	১০৬	—	২৩৭
বারুদ বন্দুক	৩৭	১	৫৫
পশমী বস্ত্র	১৪	২	১৬
রেশম	১	—	৩
কার্পাস	১৫৭৬৯	২১৩২	৩৪৪২৪
পাট প্রভৃতি	৫১২৫	১৫৩৬	৯৬১২
পোষাক	৬২৮৪	৭৮৩	১৯৫৮
সোনা রূপার কাজ	৬৪৯৯	১৩২	১৭৬৯২
তামা কাঁসা	১২৮৪	৯	৩৯৩০
টিন রাঙ প্রভৃতি	৩৭৫	—	৭৯৫
লোহা	১৪৯৮	—	২৯২২
গ্লাস চীনামাটি	১৭৬	—	৩৪৭
মৃৎশিল্প প্রভৃতি	৭৬৮৩	২৮১২	১৪৫৪০
কাঠ ও বাঁশের কাজ	৮০৯৪	৮৫	১৫৩৪৮
বেত প্রভৃতি	১৮৪৪	১১১৪	৫৭০০
মোম প্রভৃতি	—	—	৫
রঙের কাজ প্রভৃতি	১১৯	৫	১৩১
চামড়া প্রভৃতি	৬০৪৪	১০৬	১৩৭২৭
টাকা লগ্নিকারক ও গোমস্তা	৫২৪১	১১৭১	১৩৯৩১
মহাজনী কার্য	১২৮	—	৪৯৯
দোকানদারী	৬০৬৪	১৯৩	১৩৮৩৭
কন্ট্রাক্টর দালাল প্রভৃতি	৮০৩	—	২০৪৭

ব্যবসায়	পুং	স্ত্রী	নির্ভর
রেল আফিসে	৫০৪	১২	৭৬১
বেহারা গাড়ি চালক প্রভৃতি	৪৯১২	৫	২৩৯৩
জল-চাকরি-জাহাজ নৌকা প্রভৃতি	২০২৬৪	২	৩২২৭২
পোস্টাফিস	৫৯৪	—	১৫৪৭
গুদামের কাজ	৫৩৭	—	৮২৬
পৌরহিত্য প্রভৃতি	৯৭২১	১২৮৭	২২৪১৮
শিক্ষাবিভাগে চাকরি	১৯৭২	৩০	৪৭৩৮
সাহিত্য চর্চায়	২৯০	—	৫৭৮
বারিষ্টার, উকিল প্রভৃতি	১১৮২	—	৫০৬৩
ডাক্তারি প্রভৃতি	৩০৪৬	৩৩১	১০২৪০
ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি	২৮৯	—	৫৭৫
চিত্রকর	৮৭	৯	১৫১
গানবাদ্য	৩০০০	৪১	৬২৬২
খেলা	৫৯	৪৩	১৪১
মাটির কাজ	২৭৬৭	১৬১	১১৪৪
শ্রমজীবী	৩৮২২৫	১৫৫১	৭৩৪৬৮
অনির্দিষ্ট কাজ	১৩৭৭	৫৮	২২৮২
বেশ্যা প্রভৃতি	৪	২১৬৪	৪৮৩
বাড়িভাড়া ও শিক্ষা	৫১৫১	৮৯০২	৬৪৪৮
পেন্সন	১৫৩৫	৪৬	৯৫৯

পরিশিষ্ট "ঞ"

বিগত ১৮৯৩ সন হইতে ১৯০২ সন পর্যন্ত ১০ বৎসরের জন্ম মৃত্যুর হার প্রদর্শিত হইল

মিউনিসিপ্যালিটি ও থানা	রেজিষ্টারীকৃত জনসংখ্যা	জন্ম	জন্মগড়ে হাজারে	মৃত্যু	মৃত্যুগড়ে হাজারে	হাজারে মৃত্যু: ওলাউঠা	বসন্ত	জ্বর	উদরাময়	আঘাত	অন্যান্য
ঢাকা মিউনিসিপালিটি	৯৩৬৮২[২]	২৩৬৪	২৫.২৩	২৯৪৩	৩১৪১	২.৬৭	০.০২	১৪.৫৩	৪.৩০	০.৩৬	৯.৫৩
নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি	২৪৪৭২	৫৫৩৬	২২.৩১	৫৫৪	২২.৬৬	৪.৯৯	০.০২	৭.৯৯	২.৯২	০.১৮	৬.৫৩
কেরানিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি	২০৬৫৯১	৮০৮৭	৩৯.১৪	৬৫৭৪	৩২.৮২	৩.৫৮	০.০৮	২২.১৮	১.০৯	০.১৯	৫.৭০
কাপাসিয়া মিউনিসিপ্যালিটি	১৭৪৪৩৫	৬০৬২	৩৪.৭৫	৪২০২	২৪.৮০	১.৬৯	০.০৬	২০.১৮	০.১৪	০.১৪	২.৫৯
নবাবগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি	২৩৫৯৫৪	৬৬৯২	২৮.৯০	৫১৯৭	২২.০২	২.৯০	০.১৩	১৫.২৫	০.৭৩	০.২৩	২.৭৮
সাভার মিউনিসিপ্যালিটি	১৭০৮৫৫	৮৮৮২	৫১.৯৮	৭০৩১	৪১.১৫	৩.৬৪	০.০৯	৩২.৪৮	০.৪৫	০.৩৭	৪.১২
নারায়ণগঞ্জ মিনিসিপালিটি	১৩৩৫২১	৫৩৮৪	৪০.৩২	৩৫৯৭	২৬.৯৩	৩.৪১	০.০৮	১৪.৫২	০.৪৬	০.২৫	৮.২১
রায়পুরা মিউনিসিপ্যালিটি	২৭৬৮২৭	৯৮৬৭	৩৫.৫৫	৫৯৬৩	২১.১৮	২.৯৬	০.১০	১৫.৫০	০.১০	০.১০	২.৩৭
রূপগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি	২২৫৮৯২	৯০৬৭	৪০.১৩	৫৬৫৩	২৫.০২	৩.৩৮	০.০৯	১৪.৫২	০.৩৯	০.১৯	৬.৪৫
মুন্সিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি	৩০০৫৯২	১১০৯১	৩৬.৮৯	৮৬২৭	২৮.৭০	৪.১৫	০.১৮	১৪.১২	১.৮৬	০.৪৬	৭.৯৩
শ্রীনগর মিউনিসিপ্যালিটি	৩৩৭৭৫৯	১৩১৪৩	৩৮.৯৪	১০৩২৬	৩০.৫৭	৩.১৫	০.০৫	১৬.৪১	৩.১৯	০.২০	৭.৫২
মানিকগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি	২০৭৭৭২	৮২৬৩	৩৯.৭৭	৬৩৭৮	৩০.৭৯	৪.০১	০.২২	২২.৩২	০.৩১	০.২৬	৩.৬৭
সিয়ালো-আইর্চা মিউনিসিপ্যালিটি	১৫৯৯২০	৬১৬৪	৩৮.৪৩	৬২৬৫	৩৯.১৭	৬.৩১	০.০৩	২৯.৮৬	০.১১	০.৩৯	২.৪৬
হরিরামপুর মিউনিসিপ্যালিটি	১০১২৫০	৩৭৯১	৩৭.৪৪	৩৫৯৩	৩৫.৪৮	৫.২৩	০.০১	২৬.৬০	০.২১	০.২৩	৩.২০
সমগ্র জেলা মিউনিসিপ্যালিটি	২৬৪৯৫২২	৯৯২৯১	৩৩.৩২	৭৬৯২৩	২৯.০৩	৩.৯৫	০.০৫	১৫.৭৩	২.৩৫	০.২৬	৬.৬৯

পরিশিষ্ট "ট"

চার-বৎসরের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রদত্ত হইল

	১৯০৫	১৯০৬	১৯০৭	১৯০৮
জানুয়ারি	—	—	—	—
ফেব্রুয়ারি	১.১৬	২.২৫	১.০৫	০.০৫
মার্চ	৫.৩০	৩.১৩	২.৬৯	১.২৩
এপ্রিল	৯.১২	১.২৩	৪.৭২	৫.১২
মে	১১.৬৪	১০.০৭	৭.২৭	৮.৯৮
জুন	৪.৪৫	১০.৪০	৯.৮৮	১৫.১৬
জুলাই	১৯.৩৯	১১.১৫	১৫.৬০	১৬.৯১
আগস্ট	১৪.৬৩	১৭.৪৭	৮.৭৯	৭.৫৫
সেপ্টেম্বর	১৫.৭৯	১৭.৪৫	৫.৩১	
অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর				

পূর্ববঙ্গ ও আসাম গেজেট হইতে এই তালিকা উদ্ধৃত হইল। ঐ গেজেটে জানুয়ারি, অক্টোবর নভেম্বর ও ডিসেম্বরের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেওয়া হয় নাই। ঐ সময় সাধারণতই অতি সামান্য বৃষ্টি হয়।

পরিশিষ্ট "ঠ"

ডাকঘর সমূহের তালিকা

সাব অফিস	ব্রাঞ্চ অফিস

ঢাকা (প্রথম শ্রেণীর হেড অফিস)—আমাদিয়া, আটি, বংশাল, বংশীবাজার, বিরাব, ব্রাহ্মণকীর্তি, চৌধুরিবাজার, ডাঙ্গাবাজার, ডেমরা, ইসলামপুর, কলাটিয়া, কাওরাইদ, কোন্ডা, লক্ষ্মীবাজার, নবাবপুর, নিমতলী, পশ্চিমদী, পীলখানা, পোস্তা, পূর্বাইল, রাজফুলবারিয়া, রোহিতপুর, শাক্তা, শুভাড্যা, সূত্রাপুর, তেঘরিয়া, তেঁতুলঝোরা।

আগলা	ব্রাঃ আ— মাসাইল।
বাবুরবাজার	শঙ্খনিধি ব্রাঃ*।
বৈদ্যের বাজার*—	আমিনপুর বারদি, লক্ষ্মীবারদি
বায়রা*—	আটগ্রাম, বলধরা, বনখুরা হাটিপাড়া, খাবাশপুর, ভগবানগঞ্জ।
ভাগ্যকূল*—	বাঘরা, কাটিয়াপাড়া, নরীষা, চকবাজার*।
ঢাকার রেল স্টেশন।	
ধামরাই।	
ধনকোড়া—	কুশরা, কাটিগ্রাম, মানোরা, সাহা বেলিশ্বর, ফরিদাবাদ।
ঘিওর—	চকমীরপুর।
হাসারা—	কেওটখালি।
জাগীর।*	
জয়দেবপুর*—	আশুলিয়া, বলধা, বোয়ালী, গাছা কাশিমপুর।
জয়মন্টপ*—	বানিয়ারা, চন্দহর, নান্নর, রোয়াইল।
জাফরগঞ্জ—	খলসি, নয়াবাড়ি।
কালীগঞ্জ—	ভাওয়াল, ব্রাহ্মণগাঁ, ঘরশাল।
ক[illegible]পুর —	ঝিটকা, মালুচি, নবগ্রাম, রামদিয়ানালী।

কেরানিগঞ্জ।	
কুমারভোগ —	গ্রামওয়ারী।
লাখপুর—	চক্রধা, একদুয়ারিয়া।
লেহরাগঞ্জ—	লক্ষ্মীকূল, নটাঘোলা।
মদনগঞ্জ*।	
মহাদেবপুর*—	বুতনা।
মহম্মদপুর—	দেবীনগর, দোহার।
মানিকগঞ্জ—	বানিয়াজুড়ী, বেতিলা, গরপাড়া, খণ্ড, দৃণকা, তরা, তিল্লি।
মেদিনীমণ্ডল।	
মীরপুর*—	বিরুলিয়া।
নবাবগঞ্জ—	দাউদপুর, গোবিন্দপুর, হাসানাবাদ, জয়কৃষ্ণপুর।
নারায়ণগঞ্জ—	বারপাড়া, হরিহরপাড়া, নবীগঞ্জ, শীতললক্ষ্মী, টানবাজার।
নরসিংদি—	আমিরাবাদ রামনগর, রায়পুরা।
পাঁচদোনা—	গয়েশপুর, নওয়াপাড়া পারুলিয়া, সিলমদ্দি, রাজখাড়া।
রূপগঞ্জ—	আড়াইহাজার, দুপাতারা, গোপালদি, মুড়াপাড়া, পাশিবাজার, শম্ভুপুর।
সাভার*	
সাটুরিয়া—	বালিয়াটি, চৌহাট, দড়গ্রাম, দেখুলিয়া, গ্রাম- আমতা।
শেখরনগর—	বড়ইখালি, চুরাইল, রাজনগর।
শিবালয়*—	নলি, তেওতা।
সিমুলিয়া—	বালিয়াদি, কালিয়াকৈর।
সিংঙ্গাইর*।	
ষোলঘর।	
শ্রীনগর—	বেলতুলি, আটপাড়া, দোগাছি, কুকুটিয়া, মাজপাড়া, শ্যামসিদ্ধি।
শ্রীপুর—	রবিশাল, বেলাব, গোতাসিয়া, কাপাসিয়া, মনোহরদি, নরেন্দ্রপুর, উলুসারা।
মৃয়াপুর,	
টঙ্গী।	
উথলি—	বারঙ্গাইল, বারটিয়া।
ওয়ারি*	

১ হেঃ আঃ। ৪৮ সঃ আঃ। ১২৬ ব্রাঃ আঃ।

মুন্সিগঞ্জ* (দ্বিতীয় শ্রেণী)—	ফিরিঙ্গিবাজার, গজারিয়া, ঘোষের পুকুরপাড়া, কেওয়ার, মূলচর, পঞ্চসার।
বহর—	ভরাকৈর, কলমা।
বজ্রযোগিনী*।	
বারুনী।	
বিদগাঁও।	
হাসাই—	বানরী।
ইছাপুর*—	চন্দনধূল, জৈনসার, খিদিরপারা, কুচিরামোরা, পশ্চিমপাড়া, রশুনিয়া, সিরাজদিঘা, শিয়ালদি, তেজপুর তালবাসাইল, বিক্রমপুর মধ্যপাড়া।

কাটাদিয়া সিমুলিয়া—	রাউৎভোগ।
কোলা*—	বউলতলী, রোসদী।
লোহজং—	বেজগাঁ, ব্রাহ্মণগাঁও, গাউদিয়া, গাউপাড়া, হলদিয়া, কনকসার, কোরহাটি।
মালখানগর*—	কৈচাল, মালপদিয়া, পাওয়ালদিয়া, সিলিপুর।
মীরকাদিম*—	পাইকপাড়া।
রাজাবাড়ি।	
সোনারং*—	আড়িয়াল, বালিগাঁও, বেতকা, আউটসাহি, পুড়াপাড়া, টঙ্গীবাড়ি
স্বর্ণগ্রাম—	বাঘিয়া।

১হেঃ আঃ। ১৪ সঃ আঃ। ব্রাঃ আঃ ৪২।

* চিহ্নিত পোস্টাফিসগুলোতে টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত আছে।

১. কমিশনার মিঃ এবারক্রম্বি লিখিয়াছেন, (1872—73) "I heart lately of one (Choukidar) whose pay list showed that if no one defaulted he would get Re-1-4 per annum just the amount of a subscription to the MymenSing newspaper. (বিজ্ঞাপনী)" The landed proprietors and other aforesaid were held responsible for the due performance of these duties and were liable to fine and inprisonment on proof of wilful neglet— clay

২. ঢাকা মিউনিসিপলিটির বাহিরের লোকসংখ্যা ৩১৪০। ঐ সংখ্যা মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে ধৃত হওয়ায় ঢাকা থানার পৃথক হিসাব প্রদত্ত হইল না।

ঢাকা সহচর

ঢাকা সহচর

(শিক্ষা বিভাগের সিলেবাস অনুসারে ঢাকা জেলার উচ্চ ও মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় সমূহের ২য় শ্রেণীর (Class II) জন্য লিখিত।)

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার এম. আর. এ. এস্.

প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

ঢাকা—উয়ারী
ভারত-মহিলা প্রেসে
শ্রী দেবেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

প্রকাশক — শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার
ময়মনসিংহ

জেলার নৈসর্গিক অবস্থা :

এই জেলার উত্তরভাগ অরণ্যময়। এই অরণ্যভূমি ভাওয়ালের গড় নামে পরিচিত। এই গড়ে প্রচুর গজারি কাষ্ঠ হয়। এই কাঠ দ্বারা কি করে জান? লোকে ক্রয় করিয়া নিয়া নিজ নিজ ঘরে লাগায়। এই কাঠকে ভাওয়ালি কাঠ বলে। এই যে রেলের রাস্তা ঢাকা হইতে উত্তর দিকে, ময়মনসিংহ অভিমুখে গিয়াছে, ঐ রাস্তা ভাওয়ালের গড়ের ভিতর দিয়া গিয়াছে। ভাওয়ালের গড়ে বাঘ, ভল্লুক, মহিষ প্রভৃতি নানা জাতীয় হিংস্র জন্তু আছে। এই বনের ভূমি লাল ও কঙ্করময়। স্থানে স্থানে প্রাচীন দালান কোঠারও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। গড়ের ভূমি সমভূমি অপেক্ষা অনেক উচ্চ। কোন কোন স্থানে ৪০ ফুট পর্যন্ত উচ্চ।

জেলার পূর্ব ও দক্ষিণ ভাগ নিম্নভূমিতে অবস্থিত। ঐ নিম্নভাগে বিল, খাল প্রভৃতির সংখ্যা অধিক। বিল ও খাল প্রভৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা তোমরা জান কি? মাঠের নিম্নস্থানে জল জমিতে জমিতে, ক্রমে ঐ স্থান অধিকতর নিচু হইতে থাকে এবং অবশেষে বিলে পরিণত হয়। নদীর গতি পরিবর্তনেও প্রাচীন খাতের মুখ বন্ধ হইয়া ক্রমে তাহা বিলে পরিণত হয়।...

এই জেলার বিল সমূহের মধ্যে নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত আড়াইল বিল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ।

বিল হইতে জল চলাচলের যে পথ হয়, তাহাকে খাল বলে। খাল আপনা-আপনিও হয়, লোকে কাটিয়াও করিতে পারে। এই জেলায় বহু খাল আছে। খালের নাম তোমাদিগকে না বলিলেও তোমরা বোধহয় বুঝিবে। তোমাদের বাড়ির নিকট খাল আছে কি? নাম কর।

নদ উপনদী - শাখানদী :

এখন তোমাদিগকে নদনদীর কথা বলিব। তোমাদিগের বাড়ির নিকট নদী আছে কি? কি নদী? জল স্বভাবতই নিচের দিকে যায়।...

এই জেলার উত্তরভাগ উচ্চ হওয়ায়, এই জেলার নদীগুলিও উত্তর হইতে আসিয়া দক্ষিণ দিকে গিয়াছে। নদীগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত কর এবং গতি লক্ষ্য কর, বুঝিতে পারবে।

ঐ যে ঢাকা জেলার উত্তর-পূর্ব সীমা স্পর্শ করিয়া নীল রেখা পূর্বাভিমুখে চলিয়াছে, ইহা কি বলিতে পার? ইহাই ব্রহ্মপুত্র।

ব্রহ্মপুত্র নদ ময়মনসিংহ হইতে আসিয়া টোকের নিকট এই জেলার উত্তর সীমায় পড়িয়াছে। অতঃপর জেলার উত্তর পূর্ব সীমা রক্ষা করিয়া প্রায় ২৬/২৭ মাইল পূর্ব দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া আসিয়া মেঘনায় পড়িয়াছে। মানচিত্রে অঙ্গুলি চালনা কর, বুঝিতে ও মনে রাখিতে পারিবে। অঙ্গুলি জেলার উত্তর টোক চাঁদপুরে স্থাপন কর। এইবার এই নদের তীরস্থিত ও নিকটবর্তী স্থানগুলি দেখিয়া ক্রমে নদীরেখা অনুসরণ কর। স্থানগুলিও চিনিতে পারিবে, নদীর গতিও বুঝিতে পারিবে।...

এখন ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থিত ও নিকটস্থ স্থানগুলি দেখিয়া যাও—টোকচাঁদপুর, নরেন্দ্রপুর, বেলাব, মামদাবাদ। এই মামদাবাদের এক মাইল দক্ষিণে যাইয়া ব্রহ্মপুত্র মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। পুনরায় বলিতেছি টোকচাঁদপুর হইতে মামদাবাদের দক্ষিণ পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র যে ঢাকা ও ময়মনসিংহ এই দুই জেলার সীমা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, ইহা তোমরা মানচিত্র দেখিয়া মনে রাখিবে। মামদাবাদের দক্ষিণ ব্রহ্মপুত্র মেঘনার সহিত মিলিত হইয়া ক্রমে গিয়া সাগরে পড়িয়াছে।

ব্রহ্মপুত্র অতি বৃহৎ নদী। তোমাদের অনেকেই পাড়াগাঁয়ে স্কুলে পড়, অনেকে ব্রহ্মপুত্র দেখ নাই। অনেকে আবার এমন আছ যে, গ্রাম পার হইয়া বড় বেশি দূর কোথাও যাও নাই এবং ছোট ছোট খাল বিল ব্যতীত বড় নদী দেখ নাই; তাহাদিগের বড় বড় নদীর বিষয় শুনা আবশ্যক। শুধু নদী কেন, বড় বড় নগর, বড় বড় হাট, বাজার ও মেলার কথা, এক কথা ; বড় বড় স্কুল-কলেজের কথা ; রেল জাহাজের কথা ; এককথায়—সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ই জানা উচিত।

এই ব্রহ্মপুত্র কত বড়, অনুমান করিতে পার কি? ব্রহ্মপুত্র পনর শত মাইল লম্বা। এখন অনুমান কর দেখি ইহা কতখানি বড়। তোমরা হিমালয় পর্বতের নাম শুনিয়াছ কি? সেই হিমালয় পর্বতের উত্তর হইতে ব্রহ্মপুত্র বাহির হইয়া পূর্বদিক দিয়া সারা পর্বতটা ঘুরিয়া আসিয়া পূর্ববঙ্গ ও আসামের আরও দশ-এগারটি জেলা পার হইয়া এই জেলার সেই কোণায় পড়িয়াছে।

এই জেলার পশ্চিম সীমায় আর একটি নদী দেখিতেছ তাহা ব্রহ্মপুত্রের আর একটি প্রবাহ— নাম যমুনা। যমুনা ময়মনসিংহ জেলার উত্তর পশ্চিম কোণে—ব্রহ্মপুত্র হইতে উৎপন্ন হয়িা ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার পশ্চিমদিক রক্ষা করিয়া সোজা দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া পদ্মা নদীতে পড়িয়াছে। যমুনাকে এ জেলার পশ্চিম সীমা বলা যায়। যমুনা এই জেলার ৮/১০ মাইল স্থান অধিকার করিয়াছে। যমুনা ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী নহে। ইহা ব্রহ্মপুত্রের মূল প্রবাহ হইতে উৎপন্ন; সেই জন্য অনেকে যমুনাকে নূতন ব্রহ্মপুত্র বলিয়া থাকে।

অতি প্রাচীনকালে ব্রহ্মপুত্র ঢাকা জেলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া মুন্সিগঞ্জের উত্তরে আসিয়া মেঘনায় পতিত হইত। এখন ঐ প্রবাহ শুকাইয়া গিয়াছে। পঞ্চমীঘাট ও লাঙ্গলবন্ধ ঐ খাতের তীরে। ঐ খাতটি এখন প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত। লাঙ্গলবন্ধ কোথায় দেখিয়াছ কি? ঐ, নারায়ণগঞ্জের ৫ মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে।...

জেলার পূর্বদিকে ঐ যে আর একটি নদী দেখিতে পাইতেছ, সেটিও একটি প্রকাণ্ড নদী। ঐ নদীর নাম মেঘনা। মেঘনা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়া কোন দিক দিয়া এ জেলায় আসিয়া পড়িয়াছে জান কি? শুন। মেঘনা আসামের বড়াইল পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলার ভিতর দিয়া আসিয়াছে। তথায় ইহা বরাক নদী নামে পরিচিত। শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব সীমানায় পড়িয়া বরাক মেঘনা নাম গ্রহণ করিয়াছে। এরপর ক্রমে ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব সীমানা দিয়া দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া, এই জেলার উত্তর পূর্ব কোণে মামদাবাদের নিকট এই জেলায় পড়িয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। এরপর এ জেলার পূর্ব সীমানা দিয়া দক্ষিণাভিমুখে আঁকিয়া বাঁকিয়া আসিয়া জেলার দক্ষিণ পূর্ব কোণে পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া অবশেষে যাইয়া সাগরে পড়িয়াছে।

এখন মেঘনার তীরস্থ ও নিকটস্থ স্থানগুলি দেখ—আমিরাবাদ, রায়পুরা, রামনগর, বারদি, বৈদ্যের বাজার ইত্যাদি। ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলনের স্থান হইতে পদ্মার সহিত মিলন স্থান পর্যন্ত মেঘনা ৬০/৬৫ লম্বা।

জেলার দক্ষিণ সীমার যে বৃহৎ নদী দেখিতেছ তাহার নাম পদ্মা। পদ্মা ব্রহ্মপুত্রের ন্যায় বৃহৎ নদী। এই পদ্ম গঙ্গার নামান্তর মাত্র। গঙ্গাও হিমালয় পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া বহুস্থান অতিক্রম করত ঃ সিয়ালো-আর্চার পশ্চিমে আসিয়া যমুনার সহিত মিলিয়া এ জেলার পশ্চিম সীমায় পড়িয়াছে। অতঃপর জেলার দক্ষিণ সীমা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে এবং রাজাবাড়ির দক্ষিণে আসিয়া জেলার পূর্ব দক্ষিণ কোণে—মেঘনাব সহিত মিলিত হইয়াছে।

এখন পদ্মার তীরবর্তী ও নিকটবর্তী স্থানসমূহ দেখিয়া যাও, তবেই তাহার গতি বুঝিতে ও জানিতে পারিবে। প্রথমেই পদ্মা-যমুনার মিলন স্থানের প্রতি লক্ষ্য কর, এই মিলনস্থানের নাম বাইশ কোদালিয়ার মোহনা, ইহার পূর্বতীরে সিয়ালো-আর্চা, তারপর ক্রমে পূর্বাভিমুখে দেখিয়া যাও—ইলিচপুর, মালুচি, নটাখোলা, মৈনট, নারিষা, বাঘরা, ভাগ্যকুল, লৌহজং, গাউপাড়া, বহর, রাজাবাড়ি প্রভৃতি। পদ্মাও এ জেলার দক্ষিণ ভাগে ৬০/৬৫ মাইল লম্বা।

মুন্সিগঞ্জ মহকুমার দক্ষিণভাগে পদ্মা কীর্তিনাশা নামে পরিচিত। বর্ষার সময় পদ্মা অতি ভয়ানক আকার ধারণ করে। তখন তীরস্থ এই সকল গ্রামগুলি জলের উপর টলমল করিতে থাকে।

এখন—এই জেলার বৃহৎ ৪টি নদীর নাম বল দেখি?

ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, মেঘনা ও যমুনা ব্যতীত এ জেলার অন্যান্য নদীগুলি এই চারটি বৃহৎ নদীর উপনদী এবং শাখানদী মাত্র।

যে নদী, পর্বত বা বড় বড় বিল হইতে উৎপন্ন হইয়া সাগরে পড়ে তাহাকে নদী বলে। ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও গঙ্গা এই তিনটিই পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া অবশেষে যাইয়া সাগরে পড়িয়াছে।

যে নদী, পর্বত বা বড় বড় বিল হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্য একটি বড় নদীতে পড়ে তাহাকে সেই বড় নদীর উপনদী বলে। আর যে নদী কোন বড় নদী হইতে বাহির হইয়াছে, তাহাকে সেই বড় নদীর শাখানদী বলে।

শাখানদী ও উপনদী

এইবার শাখানদী ও উপনদীগুলির নাম শুন :

এই জেলায় অনেক শাখানদী আছে, তন্মধ্যে শীতললক্ষ্মী ও ধলেশ্বরীই শ্রেষ্ঠ। নারায়ণগঞ্জের পূর্বদিকে ঐ যে নদী দেখিতেছ, ইহা শীতললক্ষ্মী। শীতললক্ষ্মী টৌকচাঁদপুরের নিকট ব্রহ্মপুত্র হইতে বহির্গত হইয়া ঢাকা জেলার উত্তর সীমা দিয়া কিছুদূর পশ্চিমে আসিয়া, বানার নদীর সহিত মিলিত হইয়া আসিয়া মদনগঞ্জের নিকট ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে। এখন অবশ্যই তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ যে শীতললক্ষ্মী ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখানদী। শীতললক্ষ্মী—শীতললক্ষ্যা নামেও পরিচিত।...

ধলেশ্বরী যমুনার শাখানদী। ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে যমুনা হইতে বহির্গত হইয়া এ জেলায় প্রবেশ করিয়াছে এবং মানিকগঞ্জের পূর্বদিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়া, মুন্সিগঞ্জের পূর্বদিকে মেঘনাতে পড়িয়াছে। এখন ধলেশ্বরীর গতি মানচিত্রে দেখাইতে পার কি?— ধলেশ্বরীর তীরবর্তী ও নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রামের নাম বল দেখি? মীরপুর, ঘিওর, তিল্লি, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ, মিতরা, সাভার, রাজফুলবাড়িয়া, চান্দহর, মাসাইল, রোহিতপুর, মীরকাদিম, ফিরিঙ্গিবাজার প্রভৃতি। বুড়িগঙ্গা ধলেশ্বরীর একটি শাখা। এই বুড়িগঙ্গা নদীর তীরেই এই জেলার প্রধান নগর—পূর্ববঙ্গ ও আসামের রাজধানী স্থাপিত।

বাঁশি বা বংশাই নদী ব্রহ্মপুত্রের আর একটি শাখানদী—ধামাইর পূর্ব দিক দিয়া আসিয়া সাভারের নিকট ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।

মেঘনা বা পদ্মার কোন শাখানদী এ জেলায় নাই।

বালু নদী শীতললক্ষ্মীর উপনদী। ইহা ভাওয়ালের নিম্নভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া ডেমরার নিকট শীতললক্ষ্মায় পড়িয়াছে।

এই জেলায় ছোট ছোট আরও অনেক নদী ও খাল আছে। বর্ষার সময় ঐ সকল নদী ও খাল দ্বারা সর্বত্র যাতায়াত করা যায়।

এখন তোমরা কি লক্ষ্য করিয়াছ যে, এ জেলার সকল নদীই দক্ষিণমুখী প্রবাহিত হইতেছে? এই কারণেই পদ্মা ও মেঘনার কোন শাখানদী এ জেলায় নাই। পদ্মার শাখানদীগুলি ফরিদপুর জেলা ও মেঘনার শাখানদীগুলি ত্রিপুরা জেলা দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

জেলার প্রধান নগর :

প্রত্যেক জেলারই এক একটি প্রধান নগর থাকে, তাহা বোধহয় তোমরা জান—যদি না জান, কেন এইবার জানিয়া রাখ। জেলার শাসনকর্তা ম্যাজিস্ট্রেট যে স্থানে অবস্থানে করেন, তাহাকে সেই জেলার প্রধান নগর বা সদর স্টেশন বলে। ঢাকা জেলার প্রধান নগর ঢাকা। মানচিত্রের মধ্যস্থল লক্ষ্য কর, দেখিতে পাইবে—কিছু বড় অক্ষরে ঢাকা লিখিত রহিয়াছে। মানচিত্রে কোন গ্রাম বাহির করিতে হইলে একটি কথা অতি সাবধানে মনে রাখিও, গ্রামের

নামগুলি যে স্থানে লিখিত, সেই স্থানকে গ্রাম মনে করিও না। গ্রামের নাম লিখিয়া যে স্থানে শূন্য বা অন্য কোনরূপ চিহ্ন দিয়া গ্রাম বা নগরের স্থান বুঝান হইয়াছে, তাহাকেই গ্রাম বা নগর মনে করিও।

ঢাকা সদর স্টেশনে ঢাকা জেলার শাসনকর্তা বাস করেন এবং তথায় তাঁহার কার্যালয় আছে। ঢাকা সদর স্টেশনে যে কেবল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবেরই কার্যালয় আছে তাহা নহে। ঢাকা এখন পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী; সুতরাং এখানে পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর বা ছোটলাটের কার্যালয়, রেভিনিউ বোর্ড, পূর্ববঙ্গ ও আসাম গভর্নমেন্টের নানা বিভাগের প্রধান প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা জজ, সাবজজ, মুন্সেফ, জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সিভিল সার্জন, ডিস্ট্রিক্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার, স্কুল সমূহের ইন্সপেক্টর প্রভৃতির কার্যালয়, ডাক বিভাগের প্রধান কার্যালয় ও অন্যান্য বিভাগের কার্যালয় সমূহ স্থাপিত আছে।

এই ঢাকা জেলা অতি প্রাচীন জেলা নহে। তাই বলিয়া বারো-চৌদ্দ বৎসরের নূতন জেলাও নহে। ১২৮ বৎসরের প্রাচীন জেলা। এখন গণনা করিয়া দেখ দেখি ইংরেজি কত সনে এই জেলা স্থাপিত হইয়াছে? ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে এই জেলা স্থাপিত হইয়াছে।

মহকুমা :

জেলাটি ৪টি মহকুমায় বিভক্ত। মানচিত্রের দিকে চাহিলেই চার রঙের চারটি মহকুমা তোমাদিগের চক্ষের ওপর ভাসিয়া উঠিবে। এখন যদি তোমরা মহকুমা কাহাকে বলে তাহাই না জান, তবে অবশ্য এই লাল-নীল রঙগুলি, তোমাদিগকে পরিচয় দিতে পারিবে না।

মহকুমা জেলার একটি অংশ। জেলাটি খুব বড় হইলে এবং সদর স্টেশনে বসিয়া ম্যাজিস্ট্রেট চারিদিকের শাসন সংরক্ষণ করিতে না পারিলে জেলাকে আবশ্যক অনুসারে দুই তিন বা এর চেয়ে বেশি ভাগে বিভাগ করিয়া লওয়া হয়। এই এক এক বিভাগকে এক এক মহকুমা বলে। মহকুমার শাসনকর্তা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অথবা জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট। মহকুমার প্রধান নগরে তাঁহাদিগের কার্যালয় থাকে। মহকুমার প্রধান নগরে যে কেবল মহকুমার শাসনকর্তা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয় থাকে, তাহা নহে, মুন্সেফ প্রভৃতিরও কার্যালয় থাকে।...

ঐ যে মানচিত্রের মধ্যস্থলে উত্তরে ময়মনসিংহ জেলার সীমা হইতে দক্ষিণে পদ্মার তীর পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত সবুজবর্ণে চিত্রিত স্থান দেখিতেছ ইহা সদর মহকুমা। সদর মহকুমার প্রধান নগর বা স্টেশন ঢাকা। সদর মহকুমার পূর্বদিকে নারায়ণগঞ্জ মহকুমা। নারায়ণগঞ্জ মহকুমার প্রধান নগর নারায়ণগঞ্জ। ঢাকা সদরে স্টেশন হইতে রেললাইন অনুসরণ করিয়া পূর্ব দক্ষিণদিকে অঙ্গুলি চালনা কর, নারায়ণগঞ্জ দেখিতে পাইবে। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের দক্ষিণে মুন্সিগঞ্জ মহকুমা। মুন্সিগঞ্জ মহকুমার প্রধান নগর মুন্সিগঞ্জ—নারায়ণগঞ্জের দক্ষিণ দিকে দেখ। ঐ যে পশ্চিমদিকে কমলালেবু রঙের বিভাগ তাহা মানিকগঞ্জ মহকুমা; মানিকগঞ্জ মহকুমার প্রধান নগর মানিকগঞ্জ—মহকুমার মধ্যস্থলে অবস্থিত। তোমাদের সুবিধার জন্য মানচিত্রে মহকুমাগুলি বিভিন্ন রঙে চিত্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং মহকুমার নামগুলি বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এখন তোমরা অবশ্যই মহকুমাগুলির সীমা দেখাইতে পারিবে এবং মহকুমার প্রধান নগর চারটি বাহির করিতে পারিবে। অল্পদিন হইল জয়দেবপুরে একটি নূতন মহকুমা স্থাপিত হইয়াছে। তাহলে মহকুমা কটি হইল?

থানা :

তোমরা মহকুমাগুলি পরিচয় করিয়া নদ-নদী, হাওড়, বিল ও বনের কথা শুনিয়াছ।

এইবার থানা, চৌকি প্রভৃতি কোথায় কোথায় স্থাপিত আছে, সেই সেই স্থানগুলিও তাহাদিগের দূরত্ব দেখিয়া রাখ।

সদর মহকুমায় কয়টি থানা জান? পাঁচটি থানা। এখন এই পাঁচটি থানা কি কি ও কোথায় দেখিয়া লও। (১) ঢাকা (২) কেরাণীগঞ্জ (৩) কাপাসিয়া (৪) সাভার (৫) নবাবগঞ্জ।

নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় তিনটি থানা। (১) নারায়ণগঞ্জ সদর (২) রূপগঞ্জ (৩) রায়পুরা।

মুন্সিগঞ্জ মহকুমায় দুইটি থানা। (১) মুন্সিগঞ্জ সদর (২) শ্রীনগর

মানিকগঞ্জ মহকুমায় তিনটি থানা। (১) মানিকগঞ্জ সদর (২) ঘিওর (৩) হরিরামপুর।

এই জেলায় মোট তেরটি থানা। এই থানাগুলি দ্বারা জেলার কি উপকার সাধিত হইয়া থাকে তাহা তোমরা বলিতে পার কি? কতকগুলি থানার নাম জানিলেই শিক্ষা হইল না। থানা কি এবং তাহার দ্বারা দেশের কি কার্য হয় তাহাও জানিতে হইবে। থানার কর্মচারীদিগকে পুলিশ-কর্মচারী বলে। এই পুলিশ-কর্মচারীরা তাঁহাদের নিজ নিজ থানার শাসনাধীন স্থানসমূহের শান্তিরক্ষা করিয়া থাকে। চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি নিবারণ করাই শান্তিরক্ষা করা। থানাদার বা পুলিশ চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি দেশের যাবতীয় অশান্তি ও উৎপাত নিবারণ করে। অশান্তি নিবারণ করে বলিয়া পুলিশকে লোকে শান্তিরক্ষকও বলিয়া থাকে। থানার উচ্চকর্মচারীদিগকে দারগা বলে। কোন থানার এলাকা বা শাসনাধীন স্থান বৃহৎ হইলে ঐ থানার অধীন দুই-একটা ক্ষুদ্র থানাও থাকে। ঐ ক্ষুদ্র থানাকে অধীন থানা (বা ইংরেজিতে আউটপোস্ট বলে)। এই জেলায় এই তেরটি থানা ব্যতীত আরও পাঁচটা অধীন থানা আছে। তাহার একটি সভার থানার অধীন—কালীয়াকৈর, একটি রূপগঞ্জ থানার অধীন নরসিংদি একটি রায়পুরা থানার অধীন মনোহরদি, একটি মুন্সিগঞ্জ থানার অধীন রাজাবাড়ি ও একটি ঘিওর থানার অধীন শিবালয় বা শিয়ালো-আরিচা। এখন এই থানা ও অধীন থানাগুলির নাম বলিয়া তাহাদিগের স্থান ও সীমা দেখাইতে পারিলেই শিক্ষা হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। (কোন কোন থানা লইয়া জয়দেবপুর মহকুমা গঠিত হইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই।)

মুনসেফি :

থানাগুলি দেখিলে এবং শিখিলে—বেশ, এইবার জেলার কোন্ কোন্ স্থানে মুনসেফি কাছারিগুলি আছে—জানিয়া রাখ। এই জেলার চারিটা মহকুমায় মুনসেফের কাছারি আছে। মহকুমার নামগুলিত জানই। যাহা হউক পুনরায় বলিতেছি, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ। মুনসেফগণ দেওয়ানি বিচার করিয়া থাকেন। এইজন্য মুনসেফিকে দেওয়ানি আদালতের পার্থক্য তোমরা বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমে বুঝিতে পারিবে।

রেজেস্টারি কার্যালয় :

এই জেলায় তেরটা স্থানে রেজিস্টারের কার্যালয় আছে। তাহাদিগকে রেজিস্টরি কার্যালয় বলে। এইসকল কার্যালয়ে দলিল রেজিস্টরি হইয়া থাকে। এইবার কোন্ কোন্ স্থানে এই কার্যালয়গুলি আছে তাহা জানিয়া যে যে স্থানগুলি অপরিচিত তাহা দেখিয়া লও।

সদর মহকুমায় চারিটা কার্যালয় (১) সদর (২) কালীগঞ্জ (৩) সাভার (৪) জয়কৃষ্ণপুর। কালীগঞ্জ ও জয়কৃষ্ণপুর তোমাদের নিকট নূতন। কালীগঞ্জ, শীতললক্ষার তীরে, জয়কৃষ্ণপুর নবাবগঞ্জ থানার পশ্চিমে। নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় দুইটি কার্যালয়, (১) নারায়ণগঞ্জ (২) রায়পুরা। দুইটিই তোমাদিগের নিকট পরিচিত। মুন্সিগঞ্জ মহকুমায় চারিটি কার্যালয়। (১) মুন্সিগঞ্জ, (২) রাজাবাড়ি (৩) শ্রীনগর (৪) লৌহজঙ্গ। পদ্মার তীরে মানিকগঞ্জ মহকুমায় তিনটি কার্যালয় (১) মানিকগঞ্জ (২) ঘিওর (৩) হরিরামপুর।...

গ্রাম :

এই জেলায় মোট কত খানা গ্রাম জান? ৭২৬৫ খানা গ্রাম।

সদর বিভাগে আড়াই হাজার অপেক্ষা অধিক গ্রাম। এর ভিতরে দু-চার-দশটার কথা শুন। এবং সেগুলির নাম মনে রাখ। যেন লোকে তোমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে অমনি তাহা কোথায় বলিয়া দিতে পার। ইহাতে নিজের অভিজ্ঞতা দেখাইতে পারিবে, পরেরও উপকার হইবে। এখন শুন—

ঢাকা ঃ এই নগরটি বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত, এই জেলার প্রধান নগর। ঢাকা শুধু এ জেলার প্রধান নগর নহে; ইহা পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশেরও রাজধানী। ঢাকা অতি প্রাচীন স্থান। তোমরা অবশ্য মুসলমান নবাবদিগের কথা শুনিয়াছ। দুইশত বৎসর পূর্বে মুসলমান নবাবগণ যখন বাংলা দেশ শসান করিতেন, সেইসময় ঢাকায় বাংলার রাজধানী ছিল। তখন ঢাকার নাম ছিল, জাহাঙ্গীরনগর, জাহাঙ্গীরনগরের অনেক পুরাতন দালান কোঠা ও মসজিদের চিহ্ন এখনও স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ঢাকার মসলিন বস্ত্র অতি প্রসিদ্ধ। অতি চিক্কন সূতা হইতে মসলিন প্রস্তুত হয়। মসলিন ব্যতীত ঢাকায় অন্যান্য প্রকারের উৎকৃষ্ট বস্ত্রও প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঢাকায় অতি সুন্দর শাঁখা প্রস্তুত হয়। ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখিবার জিনিস। জন্মাষ্টমীর মিছিল ব্যতীত ঢাকায় আরও অনেক দেখিবার জিনিস আছে। তোমরা ঢাকায় গেলে তাহা দেখিয়া আসিতে পারিবে। লালকুঠি, নবাববাড়ি, নবাবসাহেবের বাগান, লোহারপুল, ছোটলাটের বাড়ি, চকবাজার, চকবাজারের কামান, লালবাগের কেল্লা, বড়কাটরা, ছোট কাটরা, হোসেনি দালান, ঢাকা কলেজ, তড়িত আলোকের কল, জলের কল, গভর্নমেন্টের নানা বিভাগের কার্যালয়, ঢাকেশ্বরীর বাড়ি প্রভৃতি দেখিবার স্থান। ঢাকার জলবায়ু ভাল।

এখানে দুটি কলেজ ও সাতটি এন্ট্রান্স স্কুল আছে। এতদ্ব্যতীত মেডিকেল স্কুল, ট্রেনিং কলেজ, সার্ভে স্কুল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যালয় আছে।

ঢাকার ১৯ মাইল উত্তরে জয়দেবপুর। জয়দেবপুরে নূতন মহকুমা স্থাপিত হইয়াছে। এখানে ভাওয়ালের রাজার বাসস্থান। সাভারের উত্তরে ধামরাই। এখানে কাশের জিনিস প্রস্তুত হয় এবং প্রতি বৎসর রথের সময় মেলা হয়। ঢাকার পাঁচ মাইল পূর্বে ডেমরা। ডেমরায় যে কাপড় প্রস্তুত হয় তাহাকে ডেমরাই কাপড় বলে। তেঘরিয়া, জয়দেবপুর, কালীগঞ্জ, বোয়াইল, নবাবগঞ্জ ও গোবিন্দপুর এন্ট্রান্স স্কুল আছে।

নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় দুই হাজারের অধিক গ্রাম। প্রধান নগর নারায়ণগঞ্জ—শীতললক্ষ্মা নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত একটি বন্দর। এখানে বহু পাটের কারবার আছে। ফরিদপুর বা কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইলে কিংবা পূর্বদিকের কোনও জেলায় যাইতে হইলে এই স্থান হইতে স্টিমারে যাইতে হয়। এই স্থানের জলবায়ু অতি উৎকৃষ্ট। এখানে একটি এন্ট্রান্স স্কুল আছে। লাঙ্গলবন্ধে ও পঞ্চমীঘাটে প্রতি বৎসর অষ্টমী স্নানের সময় বহু হিন্দুযাত্রী স্নান করিয়া থাকে। লাঙ্গলবন্দের পূর্বদিকে সুবর্ণগ্রাম। সুবর্ণগ্রামেও একসময়ে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। বেলাবর নিকট লোহার স্তূপ আছে। এইসকল লোহার স্তূপ ও লৌহকঙ্কর দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে ভাওয়ালের কোন স্থানে ভূগর্ভে লোহার খনি আছে। ঢাকা বিভাগের ভূতপূর্ব স্কুল ইন্সপেক্টর স্বর্গীয় দীননাথ সেন মহাশয়ও গভর্নমেন্টে এ বিষয়ে জানাইয়াছিলেন। গভর্নমেন্ট ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ আসিয়া ভাওয়াল ও মধুপুরের নানা স্থান পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। তাহাদিগেরও মত যে ঢাকা ও ময়মনসিংহের কোন স্থানে ভূগর্ভে লৌহ খনি আছে। নির্দিষ্ট স্থান এ পর্যন্ত কেহ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। বারদি, মাটিরপাড়া, সোনাকোন্দা, আড়াইহাজার, সোনারগাঁও, মুড়াপাড়া ও রায়পুরাতে এক একটি এন্ট্রান্স স্কুল আছে।

মুন্সিগঞ্জে মহকুমায় প্রায় এক হাজার গ্রাম। প্রধান নগর মুন্সিগঞ্জ—মেঘনার পশ্চিমদিকে অবস্থিত। এখানে মুসলমান শাসককালে ইদ্রিকপুরের দুর্গ ছিল। মহকুমার শাসনকর্তার কুঠিটি প্রাচীন দুর্গের উচ্চভূমির ওপর স্থাপিত। এই স্থানটি অতি সুন্দর, এখানে একটি এন্ট্রান্স স্কুল আছে। বারুণিঘাটে প্রসিদ্ধ কার্তিক বারুণির মেলা হয়। মুন্সিগঞ্জের পশ্চিমে রামপাল। রামপালকে কেহ কেহ বল্লালবাড়িও বলে। এই স্থানে হিন্দুরাজাদিগের সময় বাংলাদেশের রাজধানী ছিল। রামপালে একটি অতি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। রামপালের কলা প্রসিদ্ধ। ধলেশ্বরীর তীরে ফিরিঙ্গিবাজারে ফিরিঙ্গিরা বাস করে। ফিরিঙ্গি কি ও এই স্থানের নাম ফিরিঙ্গিবাজার হইল কেন জান কি? ইউরোপের পশ্চিমভাগের একজাতীয় লোক ফ্রাঙ্ক নামে পরিচিত। এই ফ্রাঙ্ক জাতীয় একদল লোক এদেশে আসিয়া চট্টগ্রামে উপনিবেশ স্থাপন করে। ইহদিগকে এ দেশে ফিরিঙ্গি বলে। ঢাকার নবাব শায়েস্তা খাঁ বহু ফিরিঙ্গি চট্টগ্রাম-হইতে আনিয়া এই স্থানে স্থাপন করেন। এই ফিরিঙ্গিদিগের বাসস্থান হইতেই এই স্থানের নাম ফিরিঙ্গিবাজার নামে অভিহিত হইয়াছে। এখন ঢাকা জেলার নানাস্থানেই ফিরিঙ্গিরা বাস করিতেছে। রাজাবাড়িতে চাঁদরায় কেদার রায়ের একটি মঠ আছে। ইহাদের বহু দালাল কোঠা, মঠ মন্দির ছিল। এই সকল প্রাচীন কীর্তি পদ্মা নাশ করিয়াছে বলিয়াই পদ্মার নাম এই স্থানে 'কীর্তিনাশা' হইয়াছে। মুন্সিগঞ্জের অধীন বিক্রমপুর পরগনা অতি প্রসিদ্ধ। এই পরগনায় বহু সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির বাস। ভাগ্যকুলের রাজা ও লৌহজঙ্গের জমিদারেরা খুব সমৃদ্ধিশালী। বজ্রযোগিনী, আবদুল্লাপুর, পাইকপাড়া, সোনারঙ, আউটসাহী, কলমা, স্বর্ণগ্রাম, কাটাদিয়া-সিমুলিয়া, রাউৎভোগ, মালখানগর, ইছাপুরা, হাসারা, বেলতলী, ভাগ্যকুল, যোলঘর, ব্রাহ্মণগাঁও, লৌহজঙ্গ, কুকুটিয়া, কাজিরপাগলা, সিদ্ধেশ্বরী, বানরী ও তেলিরবাগে এক একটি এন্ট্রান্স স্কুল আছে। একটি মহকুমায় তেইশটি এন্ট্রান্স স্কুল। এখন বুঝিতেই পার শিক্ষা সম্বন্ধে মুন্সিগঞ্জ মহকুমা কত উন্নত।

মানিকগঞ্জ মহকুমায় প্রায় দেড় হাজার গ্রাম। প্রধাননগর মানিকগঞ্জ ধলেশ্বরী নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। এখানে একটি এন্ট্রান্স স্কুল আছে। মানিকগঞ্জ মহকুমার কার্যালয়গুলি দাসরা গ্রামে অবস্থিত। দাসরা মানিকগঞ্জের দক্ষিণে। মিতরার ব্রাহ্মণ বংশ খুব সম্মানী, ধানকুড়া, বালিয়াটি, তেওতা প্রভৃতি স্থানে জমিদারদিগের বাসস্থান। তেওতায় একটি এন্ট্রান্স স্কুল আছে। মানিকগঞ্জে ম্যালেরিয়া প্রধান স্থান।

মেলা :

এ জেলার নানা স্থানে অষ্টমী স্নান, রাসযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, পৌষ সংক্রান্তি, চড়ক ও নীল পূজার সময় মেলা হইয়া থাকে। এই সকল মেলায় বহুদূরের লোকও কেনাবেচা করিতে আসে। তোমরা জেলায় থাকিয়াও হয়ত তার খবর রাখ না। এইবার কোথায় কোন মেলা জমে ও তাহা কতদিন থাকে তাহা অবগত হও।

তোমরা সকলেই জান হিন্দুরা অশোক অষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া থাকেন। সেই স্নানের দিনে নানা জেলা হইতে বহু যাত্রী ব্রহ্মপুত্র তীরে আসিয়া থাকেন। এই যাত্রীদিগের নিকট জিনিসপত্র বিক্রয় করিবার জন্য ব্রহ্মপুত্রের ঘাটে মেলা জমিয়া থাকে। ঐ সকল মেলাকে অষ্টমীর মেলা বলে। এই জেলায় লাঙ্গলবন্ধে ও পঞ্চমীঘাটে চৈত্র অষ্টমীর সময় অষ্টমীর মেলা হইয়া থাকে। অষ্টমীর মেলা একদিন মাত্র থাকে। অষ্টমীর পর রথযাত্রা। রথযাত্রার সময় সদর মহকুমার অন্তর্গত ধামরাই মাধববাড়িতে রথ হয় ও মেলা হয়। এই মেলা ১০/১৫ দিন থাকে। রথযাত্রার পর ঝুলনযাত্রা। ঝুলনের সময় উৎসব হয়। জন্মাষ্টমী ঢাকার সর্বপ্রধান উৎসব। এই অষ্টমী উপলক্ষে ঢাকায় বহু লোকের সমাগম হয়; ও বহু বেচাকেনা হইয়া থাকে, মুন্সিগঞ্জের নিকট বারুণিঘাটে কার্তিক মেলা হয়। এই মেলা প্রায় দুই মাসকাল থাকে। এই মেলা হইতে চতুঃপার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের মহাজনগণ আসিয়া তাহাদিগের

ব্যবসায়ের জিনিসপত্র ক্রয় করিয়া নেয়। এইরূপ বড় মেলা এই প্রদেশে আর নাই। পৌষ সংক্রান্তি এবং চৈত্র সংক্রান্তিতেও জেলার নানা স্থানে মেলা জমিয়া থাকে।

উৎপন্ন দ্রব্য :

এই যে তোমরা চাউল, দাইল, তরি-তরকারি আহার কর, কাপড়, চাদর, জুতা, ছাতা ব্যবহার কর এবং পুঁথিপত্র, কাগজ কলমে লেখ পড়, এই সকল জিনিস তোমরা কোথা হইতে পাও বলিতে পার কি? তোমরা যদি বল, "এ সকল জিনিস আমরা বাজার হইতে কিনিয়া লই" তবে তাহা অবশ্য মিথ্যা নহে। কিন্তু এইসকল জিনিস বাজারে কোথা হইতে আইসে তাহা জানা নিতান্ত প্রয়োজন। বাজার ও মেলাগুলিতে কোন্ স্থান হইতে কি দ্রব্য কি উপায়ে আইসে, তাহাও জানিয়া রাখ।

সর্বাগ্রে এ জেলায় কি কি দ্রব্য উৎপন্ন হয় তা শুন। এ জেলার প্রধান উৎপন্ন জিনিস ধান। ধান এ জেলায় প্রচুর হয়। ধানের পর পাট। পাটের পর সরিষা, তিল, তিসি, কলাই, ইক্ষু, তামাক, পান, নারিকেল, সুপারি, তুলা প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। তরি, তরকারি, মাছ, দুধ সর্বত্রই পাওয়া যায়। জেলার পূর্বভাগে ও দক্ষিণভাগে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। মানিকগঞ্জ মহকুমায় লোনা ইলিশ ও শুক্না মাছ পাওয়া যায়। এ জেলার উৎপন্ন এই সকল জিনিস এ জেলার বাজারসমূহে ওঠে। এতদ্ব্যতীত যুগি-তাঁতির কাপড়, গামছা এবং ছিট, ইক্ষুগুড়, চিনি ও বাতাসা, বেত, লোহা, বাঁশ ও কাঠের জিনিস, পাটি, বাংলা সাবান, শাঁখা ইত্যাদিও এ জেলায় অল্প বিস্তর উৎপন্ন হয়। এই সকল জিনিস বাজারে উঠিলে তোমরাও ক্রয় কর। ভিন্ন জেলার মহাজনেরাও ক্রয় করিয়া লইয়া যায়।

আমদানি দ্রব্য :

যে সকল দ্রব্য তোমাদের জেলায় উৎপন্ন হয় না, অথচ তোমাদের বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে আমদানি দ্রব্য বলে। এখন তোমাদের প্রয়োজনীয় যে যে দ্রব্য বিভিন্ন স্থান হইতে আমদানি হয় তাহার কতকগুলির নাম মোটামুটি জানিয়া রাখ। নানা প্রকার কাপড়, লবণ, কেরোসিন তৈল, ছাতা, চা, চিনি, কয়লা, কাগজ, কলম, সুতা, পেন্সিল, চাকু, চর্বিবাতি, তাস, নারিকেল তৈল, এসেন্স, খেলনা, লণ্ঠন, লেম্প, আয়না, চিরুণি, বোতাম, মোজা, গেঞ্জি, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি যাবতীয় জিনিস কলিকাতা হইতে আইসে। বালাম চাউল বাকরগঞ্জ হইতে এবং রেঙ্গুনি চাউল ব্রহ্মদেশ হইতে আইসে। ময়মনসিংহ হইতে তিল, সরিষা, পাট, ত্রিপুরা জেলা হইত কার্পাস, সুপারি, মরিচ, রংপুর হইতে তামাক; সুন্দরবন হইতে নারিকেল, শ্রীহট্ট হইতে কমলা ও কমলা মধু প্রভৃতি আইসে। ঢাকার শাঁখা প্রসিদ্ধ। এই শাঁখা শঙ্খ হইতে প্রস্তুত হয়, শঙ্খ কোথা হইতে আইসে জান? সমুদ্রে শঙ্খ পাওয়া যায়, সেই সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থান সমূহ হইতে শঙ্খ আমদানি হয়। যাহা তোমাদের জেলায় নাই, তাহা তো অন্য স্থান হইতে আইসেই, এতদ্ব্যতীত যাহা জেলায় আছে এমন জিনিসও আইসে। আবার তোমাদের জেলার দ্রব্য অন্য জেলার মহাজনেরা ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। যে মাল তোমাদের জেলা হইতে অন্যত্র যায় তাহাকে রপ্তানি দ্রব্য বলে।

এই সকল জিনিস কি উপায়ে কোন পথে অন্য স্থান হইতে আইসে ও কোন পথে অন্য স্থানে যায় তাহা দেখ।

জাহাজ ও রেল :

এ জেলার দক্ষিণ ও পূর্বদিকের মেঘনা ও পদ্মা নদী ও পশ্চিম দিকের যমুনা নদী দিয়া গোয়ালন্দ হইত মাল ও যাত্রীকে লইয়া জাহাজ গমনাগমন করে। গোয়ালন্দ হইতে যমুনা এবং ধলেশ্বরী দিয়াও জাহাজ আসিয়া থাকে। যমুনা দিয়া যে জাহাজ যায় তাহাকে সাধারণত "আসাম জাহাজ", ধলেশ্বরী দিয়া যে জাহায় যায় তাহাকে ধলেশ্বরী সার্বিস এবং পদ্মা,

লক্ষ্মীয়া ও মেঘনা দিয়া যে জাহাজ যায় তাহাকে "কাছাড় জাহাজ" বলে। সুতরাং জেলার পশ্চিম দিকের বাজার সমূহের মাল "আসাম জাহাজে" ও ধলেশ্বরী সার্বিস জাহাজে এবং দক্ষিণ দিকের নারায়ণগঞ্জের ও জেলার পুর্বভাগের বাজার সমূহের মাল "কাছাড় জাহাজে" আমদানি রপ্তানি হইয়া থাকে। কলিকাতা হইতে সুন্দরবন দিয়া যে জাহাজ নারায়গণগঞ্জে আইসে তাহা দ্বারাও নারায়গণগঞ্জে বহু মাল আমদানি হয়। এবং ঐ সকল জাহাজ দ্বারা নারায়ণগঞ্জ হইতেও বহু মাল ঐ সকল স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে।

নারায়ণগঞ্জ এই শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। নারায়ণগঞ্জ হইতে শীতললক্ষ্মা, ধলেশ্বরী ও মেঘনা দিয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন জেলায় মাল নীত হয়।

জাহাজ ব্যতীত নারায়ণগঞ্জ হইতে জেলার ভিতর দিয়া রেলও চলিয়াছে। এই যে কাঁটা কাঁটা লাইন নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকা হইয়া উত্তর দিকে ছুটিয়াছে তাহা রেল লাইন। এই রেল লাইন নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকা হইয়া ময়মনসিংহ গিয়াছে। রেলেও বিভিন্ন স্থান হইতে মালপত্র আসিয়া থাকে। এবং এ জেলার মালপত্র বিভিন্ন স্থানে যাইয়া থাকে।

কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ পর্যন্ত রেল আছে। গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত জাহাজে আসিয়া তৎপর নারায়ণগঞ্জ রেলে উঠিয়া ঢাকা আসিতে হয়, গোয়ালন্দ হইতে ধলেশ্বরী দিয়া জাহাজেও ঢাকা আসিতে পারা যায়। এই সকল পথে কলিকাতায় মাল ও যাত্রী আসা-যাওয়া করে। মালপত্র আমদানি রপ্তানির সুবিধা থাকায় এ জেলায় দুর্ভিক্ষের সময়ও জিনিসের অভাব হয় না।...

লোকসংখ্যা :

প্রায় সকল কথাই তোমরা শুনিলে, এখন তোমাদের এই জেলাটাতে কত লোক বাস করে জানা দরকার। এই জেলায় নানা জাতীয় লোকের বাস। তোমরা গারো দেখিয়াছ কি? ভাওয়ালের জঙ্গলে গারো আছে। ইহারা গারো পাহাড়ের অধিবাসী। গারো ব্যতীত মণিপুরী, টিপরী, কোচ, রাজবংশী, মান্দাই প্রভৃতিও এ জেলায় অনেক আছে। ফিরিঙ্গিদিগের সম্বন্ধে তো পূর্বেই বলিয়াছি। এই সকল লোক ভিন্ন স্থানের হইলেও বহু পুরুষ যাবৎ এই জেলায় বাস করিতে করিতে এই জেলার স্থায়ী অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহু অস্থায়ী অধিবাসীও জেলার নানা স্থানে বাস করিয়া থাকে। এই সকল লইয়া জেলায় কত লোক জান? এইবার তাহাও জানিয়া লও।

প্রতি দশ বৎসর পরে গভর্নমেন্ট জেলার লোকসংখ্যা গণনা করেন। ১৯০১ সনে শেষ গণনা হইয়াছে। এই গণনাকে আদমসুমারি লোকগণনা অথবা 'মাথাগন্তি' বলে। এই লোকগণনায় দেখা গিয়াছে এ জেলায় প্রায় সাড়ে ছাব্বিশ লক্ষ লোক বাস করে। এই সাড়ে ছাব্বিশ লক্ষের সাড়ে ষোল লক্ষ মুসলমান ও প্রায় দশ লক্ষ হিন্দু। বাকি খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্মালম্বী।...

টেলিগ্রাফ :

ঢাকা সদরে গভর্নমেন্টের প্রধান টেলিগ্রাফ অফিস। কোন স্থানে তাড়াতাড়ি সংবাদ প্রেরণ করিতে হইলে লোকে টেলিগ্রাম করিয়া থাকে। মফঃস্বলের কতকগুলি বড় পোস্টাফিসেও টেলিগ্রাম করা যায়। যে সকল ডাকঘরে টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত নাই, সেইসকল স্থানে ডাকের চিঠির সহিত বিলম্বে টেলিগ্রাম বিলি হয়। মজুরের পয়সা টেলিগ্রামের সঙ্গে দিলে সরকার হইতেই তৎক্ষণাৎ দূরবর্তী গ্রামেও টেলিগ্রাফ পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সংযোজন

বৃহত্তর ঢাকা জেলা

সূচীপত্র



১. বৃহত্তর ঢাকা জেলা

বাংলাদেশের প্রায় মধ্যভাগে অবস্থিত বৃহত্তর ঢাকা জেলা, দেশের বৃহত্তম জেলাগুলির অন্যতম। এই জেলার উত্তরে টাংগাইল ও ময়মনসিংহ জেলা, পূর্বে কুমিল্লা; পশ্চিমে পাবনা ও ফরিদপুর জেলা। পশ্চিমে পাবনা ও ঢাকার মধ্যে যমুনা নদী, দক্ষিণে ফরিদপুর ও ঢাকার মধ্যে পদ্মানদী এবং পূর্বদিকে কুমিল্লা ও ঢাকার মধ্যে মেঘনা নদী অবস্থিত। নদনদীসহ জেলার আয়তন ২,৯৩৪ বর্গ মাইল/৭৫৯৯ বর্গ কি.মি.। নদনদী বাদে জেলার আয়তন ২,৮৮০ বর্গ মাইল/৭৪৫৯ কি.মি.।

বৃহত্তর ঢাকা জেলার ৬টি জেলা হল— ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদি, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ এবং গাজিপুর। বৃহত্তর ঢাকায় আছে ৪৯ থানা, ৩৬৮ ইউনিয়ন, ৫,৪২৫ মৌজা এবং ৭,৬৫৩ গ্রাম। ৬ টি জেলার ৩৭টি উপজেলা ঃ

ঢাকা ঃ ধামরাই, দোহার, কেরানিগঞ্জ, নওয়াবগঞ্জ এবং সাভার।

নারায়ণগঞ্জ ঃ আড়াইহাজার, সোনারগাঁও, বন্দর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, রূপগঞ্জ এবং সিদ্ধিরগঞ্জ।

নরসিংদি ঃ বেলাবো, মনোহরদি, নরসিংদি, পলাশ, রায়পুরা এবং শিবপুর।

মুন্সিগঞ্জ ঃ গজারিয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ, সিরাজদিখান, শ্রীনগর এবং টংগিবাড়ি।

মানিকগঞ্জ ঃ দৌলতপুর, ঘিওর, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ, সাটুরিয়া, শিবালয় এবং সিংগাইর।

গাজিপুর ঃ জয়দেবপুর, কালিয়াকৈর, কালিগঞ্জ, কাপাসিয়া, শ্রীপুর এবং টংগি।

ঢাকা মহানগর এলাকা ক্রমশ আয়তন ও জনবসতি বৃদ্ধির কারণে প্রশাসনিক সংকট দেখা দেওয়ায়, সমগ্র মহানগর এলাকাকে বিভক্ত করা হয়েছে ১৩টি থানায়। থানাগুলি হল ঃ

১. মতিঝিল	২. রমনা	৩. গুলশান	৪. ক্যান্টনমেন্ট
৫. ডেমরা	৬. কোতওয়ালী	৭. লালবাগ	৮. মিরপুর
৯. মোহাম্মদপুর	১০. সূত্রাপুর	১১. সবুজবাগ	১২. তেজগাঁও
১৩. ধানমণ্ডি			

আয়তনে বৃহত্তর ঢাকায় গাজিপুর সব থেকে বড় এবং নারায়ণগঞ্জ সব থেকে ছোট জেলা।

বৃহত্তর ঢাকার ৬টি জেলার থানা ঃ

ঢাকা ঃ ধামরাই, দোহার, কেরানিগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, সাভার এবং মেট্রোপলিটান এলাকার ১৩টি থানা।

নারায়ণগঞ্জ ঃ আড়াইহাজার, সোনারগাঁ, বন্দর, ফতুল্লা, কোতওয়ালি, রূপগঞ্জ এবং সিদ্ধিরগঞ্জ

নরসিংদি ঃ মোনহরদি, সদর, কোতওয়ালি, পলাশ, রায়পুরা এবং শিবপুর।

মুন্সিগঞ্জ ঃ গজারিয়া, লৌহজং, কোতওয়ালি, সিরাজদিখান, শ্রীনগর এবং টংগিবাড়ি।

মানিকগঞ্জ ঃ দৌলতপুর, ঘিওর, হরিরামপুর, কোতওয়ালি, সাটুরিয়া, শিবালয় এবং সিংগাইর।

গাজিপুর ঃ জয়দেবপুর, কালিয়াকৈর, কালিগঞ্জ, কোতওয়ালি, কাপাসিয়া, শ্রীপুর এবং টংগি।

ঢাকা জেলার জনসংখ্যা : ১৯০১—১৯৯১

বৎসর	মোট জনসংখ্যা	মোট বৃদ্ধি/হ্রাস	দুই শুমারীর মধ্যবর্তীকালে বৃদ্ধি/হ্রাসের হার	বাৎসরিক বৃদ্ধি/হ্রাসের হার
১৯০১	২৬,১৭,৩৪০	—	—	—
১৯১১	২৯,২৯,৩৮১	৩,১২,০৪৯	১৯.৯২	১.১৯
১৯২১	৩১,৭১,৫২৪	২,৪২,১৩৫	৮.২৭	০.৮৩
১৯৩১	৩৪,৪৯,২৯৩	২,৭৭,৭৬৯	৮.৭৬	০.৮৭
১৯৪১	৪২,২৩,৫৩২	৭,৭৪,২৩৯	২২.৪৫	২.২৪
১৯৫১	৪০,৭২,৭৮১	(-)১,৫০,৭৫১	(-)৩.৫৭	(-)০.৩৬
১৯৬১	৫০,৯৫,৭৪৫	১০,২২,৯৬৪	২৫.১২	২.৫১
১৯৭৪	৭৬,১৯,৮০৭	২৫,১৬,০৬২	৪৯.৩৮	৩.৭৯
১৯৮১	১,০০,১৩,৭৩১	২৪,০১,৯২৪	৩১.৫৫	৪.৫০
১৯৯১	১,৩১,৫১,০০০	৩১,৩৭,২৬৯	৩১.৩২	৩.১৩

ঢাকা জেলার বিভিন্ন থানার জনসংখ্যা

থানার নাম	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১
ধামরাই	১,৭৭,৮৫২	২,২৮,৮৭৭	২,৬৫,১১৭
দোহার	৯৭,১৬৫	১,২৫,৪৮২	১,৪৫,২০৩
কেরানিগঞ্জ	১,৭০,৪৮৯	২,৫৮,২৭৪	৩,৪৯,৫০১
নওয়াবগঞ্জ	১,৬১,১৪৯	১,৯৮,৩৮৪	২,৪১,৭৬১
সাভার	১,৪৮,৯৩৬	২,০৪,৯০৮	২,৬০,৯৫৭
ঢাকা মহানগর	৭,০৯,৪৭১	১৭,৩৯,৯১৩	২৮,০৭,২২৬
ঢাকা (বর্তমান জেলা)	১৭,৬৫,০৬২	২৭,৫৫,৯১৮	৪০,৬৫,৭৬৫
জয়দেবপুর	৯১,৬৫১	১,৪৮,০৪১	২,৫৬,০৬৪
কালিয়াকৈর	৭৫,১৩৬	১,৩৬,০০৫	১,৬৪,৯২৮
কালিগঞ্জ	৯৯,৬৮৩	১,৩৯,৯৪০	১,৬৮,৫৮৬
কাপাসিয়া	১,৫৪,৫২৩	২,০৯,৯৩৭	২,৫০,৭২৪
শ্রীপুর	১,২৫,৫৮৭	১,৯৭,৪২১	•২,৩৭,৭৫৯
টংগি	৩৩,৩৮৯	৬৭,৪২০	৯৪,১৫৪
গাজিপুর (বর্তমান জেলা)	৫,৯৯,৯৯১	৮,৯৮,২৬৪	১১,৭৩,০১৫
দৌলতপুর	৯১,৬০৬	১,১৯,৩৮৫	১,৩৯,১৪২
ঘিওর	৭৪,৩৩২	৯৫,৩৬৪	১,০৯,১৩৭
হরিরামপুর	১,১৬,১৭৫	১,৩৭,১৬০	১,৬২,৪৮৭
মানিকগঞ্জ	১,২১,৯১৫	১,৬১,১৩৪	১,৯৪,০২২
সাটুরিয়া	৯৬,৬৭০	১,২৪,৯০৩	১,৩৬,৬১১
শিবালয়	৭২,৮৪৭	৯৯,৯৭৯	১,১৭,১৯৫
সিংগাইর	১,২৭,৮৪৮	১,৬৭,১৬৩	২,০১,০৮০
মানিকগঞ্জ (বর্তমান জেলা)	৭,০১,৩৯৩	৯,০৫,০৯১	১০,৫৯,৬৭৪
গজারিয়া	৭৩,১১৩	৯৪,৫৫২	১,১২,৯২৭

থানার নাম	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১
লৌহজং	১,১৯,০৪৭	১,২৪,২৪৪	১,৪৮,১০৮
মুন্সিগঞ্জ	১,৫৬,১৯২	২,১১,৭৭২	২,৪৫,১৮৭
সিরাজদিখান	১,৩৩,৭৪৫	১,৭০,২৭৯	১,৯৮,১৬৮
শ্রীনগর	১,৩৬,৯৫১	১,৬১,৪২৩	১,৯১,০৬৯
টংগিবাড়ি	১,১১,৩৩৯	১,৪৬,০৮৪	১,৬৯,০০৭
মুন্সিগঞ্জ (বর্তমান জেলা)	৭,৩০,৩৮৭	৯,০৮,২৮৫	১০,৬৪,৪৬৬
আড়াইহাজার	১,৫২,৬৭৩	১,৯৪,৭৬৩	২,৩২,৩৭২
বৈদ্যের বাজার	১,৩৪,২৫২	১,৭৩,৭৪৮	২,০৭,৯৩৯
বন্দর	৭০,২৪৮	৯৩,২৮৯	১,৯৮,৮৪০
ফতুল্লা	৫৮,৯৯৯	৯১,০৪৫	১,৩২,৭৬৭
নারায়ণগঞ্জ	১,৪০,৩৬২	১,২৭,৯৩৬	১,৯৬,১৩৯
রূপগঞ্জ	১,৬১,০১৪	২,২৭,০০৩	২,৯৩,১৮৭
সিদ্ধিরগঞ্জ	৫০,৪৮৩	৬৫,৩১১	৯৩,১৮২
নারায়ণগঞ্জ (বর্তমান জেলা)	৭,৬৮,০২৭	১০,৪৩,০৯৫	১৩,৫৪,৪২৬
মনোহরদি	১,৬৩,৭০৪	২,০৬,৫৯৭	২,৪৫,০২১
নরসিংদি	১,৮৫,৭৫০	২,৬৪,৪৭২	৩,২৭,২৪৪
পলাশ	৬৯,৫৭০	১,০৫,১৯৩	১,৭৯,৭০৭
রায়পুরা	২,৭৩,৮২৮	৩,৬২,০০৬	৪,৩৬,২৯৫
শিবপুর	১,৩২,০৮৩	১,৬২,৮৮৬	১,৯৪,৩৭৮
নরসিংদি (বর্তমান জেলা)	৮,৩০,৮৮৫	১১,০১,১৫৪	১৩,২৭,৬৪৫
বৃহত্তর ঢাকা জেলা	৫০,৯৫,৭৪৫	৭৬,১১,৮০৭	১,০০,৪৮,৯৯১
সমগ্র বাংলাদেশ	৫,০৮,৪০,০০০	৭,১৪,৭৯,০০০	৮,৭০,৫২,০০০
বাংলাদেশের তুলনায় ঢাকা জেলায় %	১০.০%	১০.৬%	১০.৫%

থানাভিত্তিক ঢাকা জেলার আয়তন, ইউনিয়ন ও মৌজা

থানার নাম	নদনদীসহ এলাকার পরিমাণ বর্গমাইলে/বর্গ কি.মি.	ইউনিয়ন সংখ্যা	মৌজা সংখ্যা
ধামরাই	১১৯/৩০৮	১৬	৩০৭
দোহার	৭১/১৮৪	০৮	১০৩
কেরানিগঞ্জ	৬৫/১৬৮	১১	১০৯
নওয়াবগঞ্জ	৯৫/২৪৬	১৪	১৯৬
সাভার	১০৮/২৮০	১৪	২৭৪
ঢাকা মহানগর	১৬০/৪১৪	০৯	৭১
ঢাকা (বর্তমান	৬১৮/১৬০০	৭২	১০৬০
জয়দেবপুর	১৭১/৪৪৩	০৫	১৫৪
কালিয়াকৈর	১২০/৩১১	০৯	১৮০
কালিগঞ্জ	৭৬/১৯৭	০৭	১২৭
কাপাসিয়া	১৩৬/৩৫২	১১	১৬৬

since it was mapped in 1769, has shifted its channel, and completely altered the whole appearance of the country. By a Government Notification, dated 17th June 1871, the separated tract was transferred to the neighbouring District of Bakarganj from the 1st August 1871.

"Dacca Collectorate formerly comprised the Districts of Bakarjanj and Faridpur, which were disjoined from it in 1817 and 1811 respectively, and formed into distinct Districts. The present subdivision of Manikganj, and a portion of Nowabganj, were annexed to Dacca from Faridpur about 1856. The 458 willages mentioned above which were cut off from the rest of the District by the changes in the course of the Ganges river, were transferred to Bakarganj from August 1871. The revenue and magesterial jurisdictions are the same. The Civil Judge also exercises jurisdiction over the neighbouring District of Faridpur, the civil Jurisdiction not having been suparated from Dacca in 1811, when the former District was erected into an independent Collectorate."[২]

জনবসতি :

ঢাকা শহর কবেকার, কত তার বয়স এ নিয়ে বিতর্ক তো কম হয়নি। তবে সে বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত কেউ নিতে না পারলেও, এটা সুস্পষ্ট ঢাকা শহরে জনবসতি শুরু হয়েছিল মোঘল শাসন শুরুর বহু আগেই। সামরিক দিকে থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেই ব্যবসাকেন্দ্রিক জনবসতিকে মোঘল শাসকরা তাদের প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত করে। হিন্দু আমলে ঢাকার যথার্থ স্বরূপটি উপলব্ধি অসম্ভব। ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজির গৌড় বিজয়ের অনেক আগেই মুসলমানদের আগমন ঘটেছিল এই অঞ্চলে। এবং তাদের বসতিও গড়ে ওঠে। পাঠান বা আফগান আমলে ঢাকা ছিল জনবসতিপূর্ণ। জাহাঙ্গীরের সময়ে এই শহরটাই ছিল জাহাঙ্গীরনগর। ঢাকা ক্রমশ বড় হচ্ছে। শহরের রূপ নিচ্ছে। তারপর এল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং শুরু হল ইংরেজ আমল। ঢাকা আরও বদলে গেল। তারপর পাকিস্তান আমল পেরিয়ে বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী। মজার জিনিস, প্রতিটি পর্বে শহরের প্রসার এবং জনবসতির বিকাশ যে ভাগে ঘটেছিল, তা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। *[বর্তমান সংস্করণের ৫৭১ পৃষ্ঠা দেখুন]*

ঢাকা কত পুরনো শহর কীভাবে ধীরে ধীরে শহরটির বিকাশ ঘটল, তা নিয়ে বিতর্কেরও শেষ নেই। নানা জনের নানান মত। "ঢাকা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ মত আছে। ঢাকার অধিষ্ঠাত্রীদেবী ঢাকেশ্বরী হইতে ঢাকা নাম হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন ; কিন্তু ঢাকেশ্বরী হইতে ঢাকা বা ঢাকা হইতে ঢাকেশ্বরী নাম হইয়াছে তাহা বলা শক্ত। কিংবদন্তী যে সতী-দেহ বিষ্ণুচক্রে বিচ্ছিন্ন হইলে তাঁহার কিরীটের "ডাক" এইস্থানে পতিত হয়। "ডাক" স্থানীয় শব্দ ; কারুকার্য প্রতিযোগিতা করিবার জন্য জড়োয়া গহনার নিচে "ডাক" বসান হইয়া থাকে। "ডাক" পতিত হওয়ায় স্থানটি একটি উপপীঠ বলিয়া গণ্য হয় এবং ঢাকা নাম প্রাপ্ত হয় এবং দেবী ঢাকেশ্বরী নামে পরিচিত হন। অন্য মতে ঢাকেশ্বরী দেবী "ঢাকা" বা গুপ্ত ছিলেন ; মহারাজ বল্লালসেন তাঁহাকে আবিষ্কার করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন এবং পূর্বে 'ঢাকা' ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম ঢাকেশ্বরী হয়। কেহ কেহ বলেন ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে সুবাদার ইসলাম খাঁ যখন রাজমহল হইতে এই স্থানে রাজধানী লইয়া আসেন তখন তাঁহার শিবির হইতে ঢাক বাজাইয়া যত দূর পর্যন্ত তাহা শোনা গিয়াছিল তত দূর রাজধানীর সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছিল এবং এই জন্য শহরের নাম হয় ঢাকা। কেহ বা বলেন ঢাক নামক গাছ হইতে ঢাকা নাম হইয়াছে ; আজকাল কিন্তু ঢাক গাছ ঢাকা শহরে বিশেষ দৃষ্ট হয় না।"

হাকিম হাবিবুর রহমান ঢাকার জনবসতির বিন্যাসকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। বর্তমান ঢাকার দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদী। উত্তরে রমনা পেরিয়ে ময়মনসিংহের চৌরাস্তা। পশ্চিমে বুড়িগঙ্গার প্রাচীন ধারা ও নুরপুর মহল্লা। পূর্বদিকে আলমগঞ্জ, ফরিদাবাদ, গেন্ডারিয়া পেরিয়ে সম্প্রসারিত অঞ্চল। এই চার সীমার মধ্যকার জমি কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু। যে কারণে বর্ষার জল জমে তলিয়ে যায় কখনো কখনো।

পুরনো ঢাকা প্রসঙ্গে আসে দোলাই খাল বা দোলই নদীর কথা। একসময় ঢাকার পূর্বপ্রান্ত সীমা হিসাবে চিহ্নিত হত। বর্তমান ইংলিশ রোড পর্যন্ত প্রবাহিত খালটি ছিল প্রশস্ত। তারপর কোথাও প্রশস্ত, কোথাও সংকীর্ণ হয়ে রহমতগঞ্জের পশ্চিমে বুড়িগঙ্গায় মিশেছিল। তার প্রবাহ পথে ছিল বংশাল, নাজিরাবাজার, মিরনের জুল্লা, সিক্কাটুলি, আমানাত খানের দেউড়ি, গিরদে কেল্লা আর বুড়িগঙ্গা। চাঁদখা পুলের পরে খালের গতিপথ এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। হাকিম হাবিবুর রহমান বলেছেন, বুড়িগঙ্গা এবং ঐ খালের মধ্যবর্তী অঞ্চল ছিল পাঠানদের ঢাকা। কারণ, এখানে পাঠান আমলের বহু স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। জানা যায় খিলগাঁও পর্যন্ত ছিল এই জনবসতি। মোঘল আমলে ঢাকা ক্রমশ প্রসারিত হয়েছে। পূব দিকে বাংলাবাজার মহল্লা ঐ সময়েরই নিদর্শন। শায়েস্তা খানের সময় ঢাকার আয়তন আরও বেড়ে যায়। দোলাই খাল পেরিয়ে ফরিদাবাদ এবং আলমগঞ্জ মহল্লা গড়ে ওঠে। কোম্পানি আমলে দোলাই নদীর পূর্বতীরে জনবসতি বিস্তৃত হয়ে পড়ে। নারায়ণদিয়া বা নারিন্দা, কোম্পানিগঞ্জ, ওয়াড়ি, গেণ্ডারিয়া, শান্তিনগর, সেগুনবাসিচা, স্বামীবাগ, টিকাটুলি ধীরে ধীরে বসতিকেন্দ্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

"মুসলমানদের আগমনের অথবা বসবাসের পূর্বে এই শহরের আসল বাসিন্দা ছিল সাহু, তাঁতি, বেনে এবং শাঁখারি। এরা নিজ নিজ মহল্লায় বসবাস করত। যেমন সাহুদের কেন্দ্র আজিয়ালনগর, তাঁতিদের আবাস ছিল তাঁতিবাজার, নবাবপুর এবং বনগাঁ; শাঁখারিরা সব সময়ের জন্য ওখানেই ছিল যেখানে আজও আছে। এই বাসিন্দাদের ছাড়া ধর্মীয় প্রয়োজনে কিছু ব্রাহ্মণ, অন্য প্রয়োজনে কিছু কায়েস্থ, আয়ুর্বেদীদের সামান্য সামান্য জনবসতি ছিল এবং তাদের সঙ্গে কিছু অন্যান্য পেশার লোকও বসবাস করত। কিন্তু আজ যেসব অন্যান্য বৃদ্ধি দেখা যায় তার কারণ বিক্রমপুরের আস্তে আস্তে নদীগর্ভে বিলীন হওয়া এবং অন্যান্য শহরের কিছু হিন্দু ভদ্রলোকদের ঢাকায় এসে অধিবাস গ্রহণ করা। মুর্শিদকুলি খান পর্যন্ত এই রেওয়াজ ছিল যে, আগ্রা এবং দিল্লি থেকে যখন কোন গভর্নর আসতেন তিনি নিজের সঙ্গে এক বিরাট দল এবং লস্কর নিয়ে আসতেন। কিন্তু যখন তিনি ফিরে যেতেন তখন আগত লোক লস্করের এক বিরাট অংশ বাংলার মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে এখানেই থেকে যেত। এই থেকে যাওয়াদের মধ্যে হিন্দু কম এবং মুসলমানের সংখ্যা বেশি এবং তাদের মধ্যে প্রত্যেক জাত-গোষ্ঠি এবং পেশার লোক থাকত।" ৩

ঢাকায় বিদেশি :

"মুর্শিদাবাদের ন্যায় ঢাকাও বাংলাদেশের বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং এখানেও ইংরেজ, ফরাসি, ওলন্দাজ ও পর্তুগিজ বণিকগণের কুঠি ছিল। পর্তুগীজেরা সর্বপ্রথমে ঢাকায় আসেন এবং সঙ্গতটোলায় তাঁহাদের কুঠি ছিল শুনিতে পাওয়া যায়। ওলন্দাজেরা প্রথমে দেশীয় গোমস্তা পাঠাইয়া মাল খরিদ করিতেন, কিন্তু ১৭৪২ হইতে ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে একজন ঢাকার কুঠির কর্তা হইয়া আসেন। এখন যেখানে ঢাকায় মিটফোর্ড হাসপাতাল তৈয়ারি হইয়াছে পূর্বে সেই স্থানে ওলন্দাজদিগের কুঠি ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুঠি বাদশাহ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দের পরে নির্মিত হইয়াছে। পুরাতন কুঠি তেজগ্রামে ছিল কিন্তু পরে বুড়িগঙ্গার নিকটে ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দের পর ভিক্টোরিয়া পার্কের

পশ্চিমে বর্তমান ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল যে স্থানে অবস্থিত সেই স্থানে নতুন কুঠি তৈয়ারি হয়। ঢাকায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল।

"ওলন্দাজেরা ইহা ইংরেজদের ছাড়িয়া দিয়াছিলেন ; ঢাকা নগরে যে স্থানে ফরাসিদের কুঠি ছিল সেই স্থান এখনও ফরাসডাঙা নামে পরিচিত। ফরাসিদিগের কুঠিটি ঢাকার নবাব বাহাদুরের 'আহ্‌সান মঞ্জিল' নামক বিখ্যাত প্রাসাদ মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে।"

বাংলায় ভ্রমণ। অখণ্ড সংস্করণ। পৃঃ ২৭৪-৭৫।

ঢাকায় বসবাসকারী বিদেশিদের মধ্যে একসময়ে আরমেনিয়ানরা ছিল সম্পন্ন এবং প্রতিপত্তিশালী। আর্থিক বুনিয়াদ ছিল শক্ত। এরা ছিল উৎকৃষ্ট ব্যবসায়ী ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লবনের ঠিকাদার। লবন ছাড়াও এরা পান, পাট ও কাপড়ের ব্যবসা করত। কয়েকজনের জমিদারিও ছিল। ঢাকায় বহু আরমেনিয়ান বসতি ছিল। কিন্তু বেশি দিন এদের প্রতিপত্তি স্থায়ী হয়নি। সম্পদে ও সংখ্যায় এরা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। ১৮৭১ খ্রিঃ এদের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ১০০ জন। এর মধ্যে ৬ জনের বিস্তৃত জমিদারি, ২ জন বড় ব্যবসায়ী, ৬ জনের দোকান এবং বাকিরা অন্যান্য পেশায় যুক্ত ছিল। ১৮৭২ খ্রিঃ আদমসুমারিতে এদের সংখ্যা ১২১ জন উল্লেখ আছে। ডবলু. ডবলু. হান্টার বলেছেন আরমেনিয়ানরা তাদের পুরাতন রক্ষণশীল মনোভাব ত্যাগ করে য়ুরোপীয়দের অভ্যাস ও আদবকায়দা অনুসরণ করতে থাকে। আরমানদের বসতি স্থান আরমানিটোলা নামে পরিচিত। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে এখানে তারা গির্জা নির্মাণ করে।

আরমানি গির্জায় নিয়মিত সময় জ্ঞাপক ঘণ্টাধ্বনি হত। কিন্তু আর্থিক সংকটের কারণে সেই ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর "ঢাকা প্রকাশে" ১৮৮১ খ্রিঃ ৩০ জানুয়ারি প্রকাশিত হয় : "ঢাকা নগরীর অবস্থাভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অবগত আছেন যে, প্রায় সার্দ্ধশতাব্দী হইতে আরমানি জাতীয় কতিপয় ধনশালী ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ঔপনিবেশিকরূপে এখানে বাস করিয়া আসিতেছেন। এই নগরের প্রায় মধ্যস্থলেই আরমানিদিগের একটি সুশোভন ভজনালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এই গির্জার চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানসমূহে উক্ত আরমানিরা অবস্থান করিয়া থাকেন। আরমানিদিগের অধ্যুষিত স্থান সকলই আরমানিটোলা বলিয়া প্রসিদ্ধ, আরমানি ভজনালয়ে (গির্জায়) সাধারণের সময় জ্ঞাপক একটি অতি বৃহৎ ঘণ্টা বহুকাল হইতে স্থাপিত ছিল। নিতান্ত আক্ষেপের এই যে, সংপ্রতি উহার কার্য রহিত হইয়াছে। শুনা যায়, ইদানীন্তন আরমানিদিগের দুরবস্থা নিবন্ধন তাঁহারা এতৎ সংক্রান্ত ব্যয় সংক্ষেপ করাতেই সাধারণের সুবিধাজনক এই কার্য স্থগিত হইয়াছে। এই গির্জার ঘণ্টার শব্দ নগরের প্রায় সমস্ত স্থান সমূহ হইতেই শ্রুতিগোচর হইত। এমন কি রাত্রি অধিক হইলে চারিক্রোশ দূরবর্তী স্থান হইতেও উহার শব্দ শুনা যাইত। এই গির্জায় যে একটি অত্যুৎকৃষ্ট ঘটিকাও সান্তায়েল রহিয়াছে, উল্লিখিত ঘণ্টার শব্দ তদনুসারে বলিয়া উহা অপেক্ষাকৃত ঠিকরূপে পরিগণিত হইত এবং নগরস্থ ওয়াচ ক্লক আর্দশস্থানীয় ছিল। অর্থাৎ আরমানিটোলার গির্জার ঘটিকাশব্দ শুনিয়া অধিকাংশ ঢাকাবাসীই আপন আপন ঘটিকার সময় ঠিক করে রাখিতেন। ঢাকায় অনেকস্থলে ঘটিকার সময় জ্ঞাপক কাঁসারীবাদ্য হয় সত্য, কিন্তু তাহা নিকটবর্তী লোক ভিন্ন অপরের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হয় না। অতএব পূর্বতন আরমানদিগের কীর্তিরক্ষাও ঢাকাস্থ সর্বসাধারণের সুবিধার দিকে দৃষ্টি না করিয়া অধুনাতন আরমানিগণ সামান্য ব্যয় সংক্ষেপানুরোধে যে, গির্জার ঘণ্টাবাদক কৃত্যগণকে উঠাইয়া দিতেছে, উহা কতদূর সঙ্গত হইতেছে, আমরা নির্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করি, তাহারাই একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন।

"আমরা স্বীকার করি, আরমানিদিগের ইদানীন্তনী অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়—পূর্ববৎ, জাঁকজমক ও কীর্তিকলাপ রক্ষা করিতে পারেন, অনেকেরই এখন সেরূপ সামর্থ্য নাই।

তথাপি আমরা ইহা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না যে, তাঁহারা ঐকমত্য সহকারে তাঁহাদিগকে ধর্মালয়ের এই বহুকালীয় সৎকীর্তি রক্ষায় প্রকৃত প্রস্তাবে যত্নবান হইলে অবশ্যই কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন। অন্ততঃ গির্জার অন্যান্য সংক্ষেপ করিয়াও সাধারণের সুবিধা বিধায়ক এই কার্যের ব্যয় নির্বাহ করিতে পারেন। আমরা জানি, মৃত... সাহেব তিন সহস্রমুদ্রা ব্যয় করিয়া উল্লিখিত আরমানি গির্জায় এমন একটি ঘটিকা যন্ত্র স্থাপন করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, যাহার সময় জ্ঞাপক ধ্বনি নগরের কোনও স্থানে কোনও লোকের অশ্রুত থাকার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু কাল তাঁহাকে হঠাৎ কবলিত করাতে তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ হইতে পারে নাই। তৎপুত্রগণ তাঁহার সেই অভিলাষ পূর্ণ করা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের বহুকালীয় জাতীয় কীর্তি সংরক্ষণেও মনোযোগী হইতেছেন না, ইহা অল্প আশ্চর্যের বিষয় নহে। আমরা শুনিয়াছি মাইকেল সারকিস সাহেব উক্ত আরমানি গির্জার বর্তমান ট্রাষ্টি, তাঁহারও যে এ বিষয়ে কেন মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে না বলিতে পারি না। ফলত তিনি, অথবা ডেভিড সাহেব এ বিষয়ে মনোযোগ বিধান করিলে অপরের সাহায্য গ্রহণ না করিয়াও এই কার্য সমাধান করিতে পারেন। কিংবা বিবি ডিসকুণী (ওয়াকিন সাহেবের মেম) কি টমস সাহেবের মেমও মনোযোগিনী হইলে তাঁহাদিগের পূর্ব পুরুষীয় ভজনালয়ের উল্লিখিত কীর্তিটি রক্ষা করিতে পারেন। অতএব আমরা অনুরোধ করি, ঢাকার বর্তমান আরমানি সমাজ কি আরমানি সমাজস্থ সামর্থ্যশালী কোন ব্যক্তি উল্লিখিত গির্জার চিরন্তনী ঘণ্টাবাদন রীতি বজায় রাখিয়া তাঁহাদিগের ভজনালয়ের শোভা সুবিধা অব্যাহত রাখুন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢাকাস্থ সর্ব সাধারণেরও ধন্যবাদ ভাজন হউন।"

অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন ঢাকায় বসবাসকারী আরমেনিয়ান সম্প্রদায় সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য উদ্ধার করেছেন। এই শহরে বড় বড় বাড়ি বানিয়ে কেবল তারা বসবাসই করেননি শহরটির উন্নয়নে তাদের দৃষ্টিও ছিল সজাগ। ঢাকা পুরসভার কমিশনার ছিলেন দুজন আরমেনিয়া জে. জি. এন. পোগজ এবং এন. পি পোগজ (১৮৭৪-৭৫)। উনিশ শতকের প্রথম পর্ব জুড়ে ছিল এদের রমরমা অবস্থা। জমিদার ও ব্যবসায়ী হিসাবে বিখ্যাত হয় কেউ কেউ। দক্ষিণ শাহবাজপুরে জমিদারি (ভোলা) কেনেন কোজা মাইকেল। সে সময়কার পাঁচজন আরমেনি জমিদার হলেন জে. জি. এন. পোগজ, জি. সি. পানিয়াটি, জে. স্টিফান, জে. টি. লুকাস এবং ডবলু হার্নি। এদের প্রায় সকলেরই প্রাসাদতুল্য বাড়ি ছিল ঢাকায়। "... ফরাশগঞ্জের বর্তমান রূপলাল হাউস ছিল আরাতুনের। বর্তমান আনবিক শক্তি কমিশন যেখানে, সেখানে ছিল তাঁর বাগান বাড়ি। মানুক থাকতেন সদরঘাটে। বর্তমানে 'বাফা' যে বাড়িতে, আদতে সেটি ছিল নিকি পোগজের। পরে, আর্মেনিটোলায় নির্মিত হয়েছিল 'নিকিসাহেবের কুঠি'। এ বাড়িটি তখন কিনে নিয়েছিলেন নীলকর ওয়াইজ। ঢাকার সিভিল সার্জন ডাঃ ওয়াইজও কিছুদিন ছিলেন এবাড়িতে। পরবর্তীকালে এটি ছিল ঢাকার নবাবদের চীফ ম্যানেজারের বাড়ি। আনন্দ রায় স্ট্রিটে ছিল স্টিফানের বাড়ি। তাজমহল সিনেমা যেখানে, সেখানে ছিল পানিয়াটির অট্টালিকা। কাচাতুরের বাড়ি ছিল বাবুবাজার পুলের উত্তর পশ্চিমে। আজকের কাজী আলাউদ্দিন রোডের মোড়ে যেখানে পশু হাসপাতাল সেখানে, ছিল তাঁর বাগানবাড়ি।" শাখারি বাজারে ছিল জি. এম. সিরকোর দোকান "সিরকোর অ্যান্ড সন্স্"। এখানে বিদেশি জিনিসপত্র বিক্রি হত। তাছাড়া বিক্রি করত চা। এরাই ঢাকায় আমদানি করেছিল 'ঠিকা গাড়ি'। পরবর্তীকালে যা হয়ে ওঠে ঢাকার জনপ্রিয় যান। মেসার্স আনানিয়া অ্যান্ড কোম্পানি বিক্রি করত মদ। ব্যাঙ্কিং এবং কমিশন এজেন্সির কাজও করত কেউ কেউ। পাটের ব্যবসায়ে সব থেকে বেশি বিত্তশালী হয়েছিলেন এম. ডেভিড। তাকে বলা হত "মার্চেন্ট প্রিন্স অফ ইস্টার্ন বেঙ্গল।' উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আরমেনিয়ানদের অবস্থা পড়তে

থাকে। খাজা আলিমুল্লাহর কাছে জমিদারি বিক্রি করে কলকাতা চলে যায় আরাতুনের উত্তরাধিকারীরা। লুকাসের জমিদারি কিনে নেন আনন্দচন্দ্র রায়। পোগজরাও জমিদারি বিক্রি করে ফিরে যায় লন্ডনে।

নিকি পোগজ স্থাপিত বিদ্যালয়টি এখন চলছে সগৌরবে। ঢাকা নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন আরাতুন। মৃত আরমেনিদের কবর দেওয়া হত আরমেনি গির্জার আশপাশে। এইসব কবরের ওপর স্মারকও থাকত। যার কিছু নিদর্শন অনাদরের মধ্যে আজও টিকে আছে ইতিহাসের সাক্ষী হিসাবে।[৪]

ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের অনেক আগেই পর্তুগিজরা এদেশে এসেছিল। হুগলিতে অবস্থান করে তারা ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে। কিন্তু তাদের লুণ্ঠন প্রবৃত্তি ও দুর্বিনীত স্বভাবের কারণে মোঘল শাসক এবং স্থানীয় জনগণের বিরাগভাজন হয়ে পড়ে। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মোঘল সুবাদার পতুর্গিজদের হুগলি থেকে বিতাড়িত করে। তারপর তারা উপকূল ভাগে আশ্রয় নেয়। চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপকে কেন্দ্র করে চারদিকে লুঠতরাজ চালাত। বিদেশিদের মধ্যে এই পতুর্গিজরাই প্রথম এই অঞ্চলে আসে।

১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে জন দ্য সিলভেরা চারখানি জাহাজ নিয়ে এসেছিলেন বেঙ্গলায় (ঢাকা?) ফ্যাকটরি স্থাপনের উদ্দেশ্যে। ব্যর্থ হয়ে তিনি চট্টগ্রাম যান। তারপর দেখা যায় তিনি মেঘনা নদী অববাহিকায় জলদস্যু হিসাবে কুখ্যাত হয়ে ওঠেন এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহে অংশ নিতেন। সম্রাট শাহজাহান ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে যখন নবাব ইব্রাহিম খানকে আক্রমণ করেন, তখন ইব্রাহিম খানের সেনাবাহিনীতে বেশ কিছু ভাড়াটে পতুর্গিজ সৈন্য ছিল। শায়েস্তা খাঁ ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে যখন আরাকান রাজকে আক্রমণ করেন, তখন বেশ কিছু পতুর্গিজ রাজার পক্ষ ত্যাগ করে মোঘলদের সঙ্গে ঢাকা চলে আসে। তাদের বসবাসের জন্য জমি দেওয়া হয়। তারাই মুন্সিগঞ্জের কাছে ফিরিঙ্গিবাজারে বসতি গড়ে তোলে। তখন পর্তুগিজদের ফিরিঙ্গি বলা হত। মোঘল আমলের শেষে ফিরিঙ্গিবাজার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ফিরিঙ্গি বাজার ছাড়াও, ঢাকা শহরের উত্তরে রায়পুরা এবং রূপগঞ্জে ছিল পতুর্গিজ বসতি। তাছাড়া তাদের গির্জা ছিল নাগরি বান্দুরা এবং হাসনাবাদে। কিন্তু ক্রমাগত স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের ফলে, তাদের চেহারার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু পরবর্তীকালে স্থানীয় পর্তুগীজদের মধ্যে স্বাতন্ত্র রক্ষার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ফিরিঙ্গিদের বিবাহ ব্যবস্থা একমাত্র খ্রিস্টান সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ডবলু. ডবলু. হান্টার বলেছেন নবাবগঞ্জে পর্তুগিজদের দুটি গির্জার একটি ছিল গোয়া মিশন পরিচালিত, অপরটি ছিল চার্চ অফ রোমের অধীন। ব্রাডলে বার্টের বিবরণে আছে, পতুর্গিজরা ঢাকার দোলাই খালের কাছে একটি মঠ ও গির্জার তৈরি করে। তাভার্নিয়ের গির্জাটির স্থাপত্য কলার প্রশংসা করেছিলেন। তারা আর একটি গির্জা নির্মাণ করে তেজগাঁও-এ। উত্তর ও দক্ষিণে বসবাসকারী খ্রিস্টানদের অধিকাংশই গোয়া চার্চের ধর্মাচরণ ও নির্দেশাবলী মেনে চলত। এরা ছিল দক্ষ কৃষিজীবী; কলকাতায় আয়া ও রাধুনি যেত এদের সমাজ থেকে। চট্টগ্রামের বসবাসকারী পতুর্গিজদের মূল পরিচিতি লোপ পেলেও এরা কিন্তু সর্বভাবেই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করত নামে ও আচরণে সর্বক্ষেত্রে।

পতুর্গিজদের পরেই ঢাকার সঙ্গে ব্যবসা সম্পর্কে ওলন্দাজদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকায় তাদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়েছিল ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে। ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা ফরাসি আর ইংরেজদের থেকে বেশি হলেও ঢাকায় তারা তেমন বাণিজ্যিক সুবিধা পায়নি। ওরা প্রথমে পিপলি, তারপর হুগলি হয়ে ঢাকায় এসে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। প্রথমে তেজগাঁও অঞ্চলে, পরে সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল এলাকায় কুঠি সরিয়ে নিয়ে আসে। ব্যবসায়িক সাফল্য না পাওয়ায় ওলন্দাজরা

১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে তাদের ঢাকার যাবতীয় সম্পত্তি ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দিয়ে দেয়। এই হস্তান্তর পাকাপাকি হয় ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে।

আহসান মঞ্জিলের জায়গায় ছিল ফরাসিদের বাণিজ্য কুঠি। ওরা ঢাকা এসেছিল ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম দিকে তেমন বাণিজ্যিক সাফল্য না পেলেও পরে তার বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ করে। এবং ব্যবসার যথেষ্ট প্রসারও ঘটে। ঢাকা শহরের একটি অংশ ফরাসগঞ্জ নামে পরিচিত। আসলে এটি হল ফ্রেঞ্চগঞ্জ। এখানে বহু ফরাসি বসতি করে এবং তাদের কিছু সম্পত্তিও ছিল। পলাশি যুদ্ধের পর থেকে ঢাকায় ফরাসিদের বাণিজ্যের দুর্দিনের শুরু। অবশেষে এখানে তাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায় ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে। বাণিজ্যের জন্য ফরাসিদের আগে ইংরেজরা এসেছিল ঢাকায়।

ইংরেজরা ঢাকায় বসতি স্থাপন করে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে। তাভার্নিয়ের ১৬৬৬ খ্রিঃ ঢাকার ইংরেজ বাণিজ্যকেন্দ্রে পদার্পণ করেছিলেন। সে সময়ে প্রথম ঢাকাই মসলিন ইংল্যান্ডে পরিচিত লাভ করে। কিন্তু ডঃ আবদুল করিম বলেছেন, ঢাকায় প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয় ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে। এই কুঠির বাণিজ্য পরিচালক ছিলেন জন মার্চ এবং জন স্মিথ। এই কুঠি থেকে ব্যবসা চলে ১৬৯০ খ্রিঃ পর্যন্ত। এই সময়ে মোঘল শাসকদের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানির যুদ্ধ শুরু হলে ঢাকা কুঠি বন্ধ হয়ে যায়। পরে মুর্শিকুলী খানের সময় কুঠি আবার স্থাপিত হয়। কোম্পানির এজেন্ট ১৬৭৮ খ্রিঃ সুলতান মহম্মদ আজিমকে ২০০০ পাউন্ডের বেশি মূল্যের উপঢৌকন দেয়। বিনিময়ে তারা বিনা শুল্কে বাণিজ্য অধিকার পায়। ১৬৮৬ খ্রিঃ শায়েস্তা খান কোম্পানির কুঠি দখল করে নেন এবং তিন বছর বাদে ঢাকাস্থ বাংলায় যাবতীয় কোম্পানি সম্পত্তি সম্রাট আওরঙজেবের আদেশে দখল করে নেওয়া হয়। ঢাকায় যে সব ইংরেজ ছিল তাদের বন্দি করা হয়। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় কোম্পানির কর্মী সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচ জন। কিন্তু ১৭৭৮ খ্রিঃ তাদের সংখ্যা হয় ৩৭ এবং ১৮৩৮ খ্রিঃ ৪৭। ১৮৬৭ খ্রিঃ ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট থেকে জানা যায় সরকারি ও বেসরকারি য়ুরোপীয় ইস্ট ইন্ডিয়ান এবং আরমেনিয়ানদের সংখ্যা মাত্র ৬৯। সম্ভবত এইসংখ্যাটি কেবলমাত্র শহর ভিত্তিক। কিন্তু ১৮৭২ খ্রিঃ আদমসুমারিতে জেলায় বসবাসী য়ুরোপীয় ও ইস্ট ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা ৫৮২০ জন উল্লিখিত।

ডঃ আবদুল করিম লিখেছেন ঃ "কুঠি স্থাপনের আগে দুইজন ইংরেজ ঢাকায় এসেছিলেন বলে জানা যায়। প্রথম ব্যক্তির নাম জেমস্ হার্ট্ যিনি ইংরেজদের কুঠি প্রতিষ্ঠার বহু আগেই ঢাকায় ব্যক্তিগত ব্যবসা শুরু করেছিলেন। তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি তেজগাঁওতে অবস্থিত ছিল। কিন্তু তাঁর ব্যবসা খুব বেশি লাভজনক না হওয়ার কারণে তিনি তাঁর জমি ও সম্পদ ইংরেজ কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করেন। ঢাকায় কুঠি স্থাপনকালে কোম্পানি সম্ভবত অতি সহজ শর্তে হার্টের জমি ক্রয় করা যুক্তিযুক্ত মনে করে। ঢাকায় আগত দ্বিতীয় ইংরেজ হলেন টমাস প্রাট। তাঁর সঙ্গে মানুচির সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তিনি মীরজুমলার অধীনে চাকুরি করতেন। পরবর্তীকালে ইংরেজ কোম্পানি আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকায় কুঠি স্থাপনের পূর্বে তাঁকে ঢাকার পণ্য সংগ্রহের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করেছিল।" [৫]

একসময় ঢাকায় আগত বিদেশিদের মধ্যে গ্রিকরা ছিল যথেষ্ট মর্যাদা সম্পন্ন। তারাই সম্ভবত এসেছিল সকলের শেষে। লবণ ও পাটের ব্যবসা করে বিত্তশালী হয়ে ওঠে। কয়েকজন জমিদারিও কেনে। গ্রিকদের ২১টি বসত বাড়ি ছিল (১৮২১ খ্রিঃ)। ১২টি গ্রিক পরিবারের (১৮৪০ খ্রিঃ) বসবাসের কথা জানায়। ঢাকায় ওদের একটা গির্জা নির্মিত হয় ১৮২১ খ্রিস্টব্দে। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যাল্পতার কারণে গির্জার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে গির্জাটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। পুরনো ঢাকা জেলায় পেনিওতি পরিবারের যে জমিদারি ছিল, সেটি জেলা পুর্নগঠনের পর বাকরগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত

হয়। আরমেনিয়ানদের মত ক্রমশ গ্রীকরা সম্পদে ও সংখ্যায় গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। বর্তমানে ঢাকায় গ্রীকদের স্মৃতি হিসাবে একমাত্র রয়েছে ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষণ কেন্দ্রের চত্বরে পরিত্যক্ত একটি গ্রীক স্মৃতিসৌধ।

ডঃ করিমের বিবরণে ঢাকার কয়েকজন দেশীয় ব্যাংকার এবং ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের নাম পাওয়া যায়। যারা বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। তারা হলেন ঃ

১. শেঠ মাহতাব রায়, ২. শেঠ স্বরূপচাঁদ, ৩. শিবরায় নয়নচাঁদ, ৪. জগৎ শেঠের গোমস্তা, ৫. ধনরাম, ৬. খোশালচাঁদ মতিচাঁদ, ৭. আলমচাঁদ নিমচাঁদ, ৮. অনুপচাঁদ কিষেণচাঁদ বা কৃষ্ণচন্দ্র, ৯. বিষ্কর দাস, ১০. মতিরাম সেন, ১১. শান্তিরাম, ১২. বলরাম রায়, ১৩. হরিকিষেণ বা হরিকৃষ্ণ, ১৪. আনন্দরাম

ইংরেজ কোম্পানি ব্যবসা ক্ষেত্রে দাদনি প্রথা চালু করেছিল। কয়েকজন নির্দিষ্ট ও বিশ্বস্ত লোককে টাকা দাদন দেওয়া হত। তারা পণ্য দ্রব্য সংগ্রহের পর বাকি টাকা পেতেন। ঢাকা কুঠিতে সংগৃহীত পণ্য পাঠান হত কলকাতায়। দাদন গ্রহণকারী ও কোম্পানি কর্তৃপক্ষের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হত। ১৭৩৬ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষরিত এরকম একটি চুক্তির উল্লেখ করেছেন ডঃ করিম। সেই চুক্তির উল্লিখিত ব্যক্তি ও টাকার পরিমাণ ঃ

	চুক্তিভুক্ত টাকার পরিমাণ	অগ্রিম প্রদত্ত টাকার পরিমাণ
১. রামনারায়ণ দালাল	টাকা ২১,০০৭-৪-০	টাকা ১৮,৯০৬-৮-০
২. নেটুদালাল	টাকা ৮,৭২৫-০-০	টাকা ৭,৮২৭-৮-০
৩. সোনামণি দালাল	টাকা ৮,০১০-৪-০	টাকা ৭,১৮৬-১২-০
৪. মুক্তাগোলাব পাইকার	টাকা ১৩,২৫৭-৪-০	টাকা ১১,৮৮১-৮-০
৫. হাফিজুল্লাহ পাইকার	টাকা ১,৯১৫-০-০	টাকা ১,৭৩৮-৮-০
৬. বিষ্ণুদাস পাইকার	টাকা ১,৩২৮-০-০	টাকা ১,২০২-১২-০
৭. জয়কৃষ্ণ পাইকার	টাকা ১০,০৫৭-৪-০	টাকা ৯,০২৬-৮-০
৮. চনুলনান্দেজাম	টাকা ১,৩১১-০-০	টাকা ১,১৮৪-৯-০

ওপরে উল্লিখিত দুটি নামের সারণি দেখে, একথা অনুমান অযৌক্তিক হবে না, কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসারত এইসব ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ স্থানীয় বাঙালি ব্যবসায়ী ছিলেন না। এরা সকলেই পশ্চিম থেকে আগত। বাঙালির তখন ভূমিকা ছিল উৎপাদক শ্রেণীর মাত্র।

শহরের সম্প্রসারণ :

বিক্রমপুর, সোনারগাঁ হয়ে ঢাকা-দীর্ঘকালীণ বিকাশে গড়ে ওঠা জনবসতি। নানা শ্রেণী ও ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ, বিচিত্র জীবিকার জনপদ, নানান প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে অখণ্ড ভারতের সমৃদ্ধ জনবসতিতে পরিণত হয়েছিল ; আজ স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হিসাবে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় যার স্বতন্ত্রসম্মান। পূর্ববাংলার বহু কীর্তিমান ও সমৃদ্ধশালী জমিদারদের এবং ভূস্বামীদের বসতি ছিল ঢাকা শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। উকিল বড় বড় ব্যবসায়ী, বিশিষ্ট সরকারি কর্মীরা এখানে বসতি নির্মাণ করেছিলেন। হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মানুষই বহিরাগত। যারা পরবর্তী কয়েক পুরুষ ধরেই এখানে বসবাস করছেন। তাদের নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। সে ইতিহাস বিস্তৃত ভাবে পাওয়া যাবে যতীন্দ্রমোহন রায় এবং কেদারনাথ মজুমদারের বিবরণে। ঢাকা শহরের একটি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ছিল, বিভিন্ন পেশাজীবীরা তাদের স্বতন্ত্র বসতি অঞ্চল গড়ে তুলেছিলেন প্রথম থেকেই। বিদেশি বণিক যারা ঢাকায় এসেছিল, তারাও বাস করত সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিজস্ব এলাকায়। দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন পেশার নামে পরিচিত ছিল বিভিন্ন অঞ্চল।

ডঃ আবদুল করিম ঢাকা শহরের সম্প্রসারণের বিবরণ দিয়েছেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে

পাওয়া নামগুলি তিনি একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। যার থেকে সহজেই শহরটির সম্প্রসারণের বিভিন্ন পর্ব ধরা যায়।

মির্জা নাথনের আগেকার ঢাকা এবং পূর্বদিকে পরবর্তী সম্প্রসারণ ঃ ১. কলতাবাজার, ২. বাংলাবাজার, ৩. গোবিন্দবাজার (দয়াগঞ্জ), ৪. মোহনগঞ্জ, ৫. পটুয়াটুলি, ৬. সূত্রাপুর, ৭. নারিন্দা বা নারায়ণ দিয়া, ৮. রুকনপুর, ৯. তাঁতিবাজার, ১০. ঝালুয়ানগর, ১১. বানিয়ানগর, ১২. গোয়ালনগর, ১৩. শাঁখারিবাজার, ১৪. কামারনগর, ১৫. কুমারতলী, ১৬. রায়সাহেব বাজার, ১৭. লক্ষ্মীবাজার, ১৮. ফ্রেঞ্জগঞ্জ (ফরাসগঞ্জ), ১৯. আলমগঞ্জ, ২০. পোস্তাগোলা (পোস্তাকিলা)।

ইসলামখানের রাজধানী স্থাপন এবং পশ্চিমদিকে পরবর্তী সম্প্রসারণ ঃ ১. চকবাজার, ২. মনোহর খান বাজার (মুনওয়ার খান বাজার), ৩. কেল্লিয়া বাজার (কিল্লাবাজার, লালবাগ), ৪. বংশীবাজার, ৫. বক্‌শীবাজার, ৬. দেওয়ানবাজার, ৭. বাজার মীরমুরাদ, ৮. বাজার করতলব খান (বেগমবাজার), ৯. এনায়েতগঞ্জ, ১০. সুলতানগঞ্জ, ১১. রহমতগঞ্জ, ১২. বুরানগঞ্জ (বুরহানগঞ্জ), ১৩. চাঁদনীঘাট, ১৪. সোয়ারিঘাট, ১৫. ইসলামপুর, ১৬. নবাবপুর, ১৭. নিমতলী, ১৮. ঢাকেশ্বরী, ১৯. লালবাগ, ২০. পূর্বদরওয়াজা (ইসলামখানের দুর্গের পূর্ব দিকের ফটক—এখন এখানে আধুনিক কারাগার), ২১. ফুলবাড়িয়া, ২২. ফুলমান্দি, ২৩. আজিমপুর, ২৪. পাকুড়তলী, ২৫. আমলীগোলা (আমীরগোলা বা আমীরগঞ্জ), ২৬. নবাবগঞ্জ, ২৭. নবাবাগিচা, ২৮. হাজারীবাগ, ২৯. জামরাবাদ, ৩০. আতিশখানা, ৩১. মোগলটুলি, ৩২. চৌধুরীবাজার, ৩৩. ইমামগঞ্জ, ৩৪. মালীটোলা, ৩৫. মাহুতটুলী, ৩৬. কায়েতটুলী, ৩৭. পিলখানা, ৩৮. মীরপুর।

এসব ছাড়া উল্লিখিত কয়েকটি অঞ্চল হল ঃ ১. বাজার ধনকোরা, ২. ফেঞ্চুগঞ্জ, ৩. তেজগঞ্জ (তেজগাঁও), ৪. ওলন্দাজ দেওরী, ৫. মানিকচাঁন্দ গার্ডেন, ৬. বেকুন গার্ডেন, ৭. বোস গার্ডেন, ৮. ডাচ গার্ডেন, ৯. ফ্রেঞ্চ গার্ডেন, ১০. ইংলিশ গার্ডেন, ১১. আবে আবু সাইদে, ১২. ডুরীধুণ্ডা, ১৩. মুরাদ ঝিন্দা, ১৪. লস্কর বুরদা, ১৫. আখেরি জুমা, ১৬. বাকিতুল্লাহ, ১৭. দেওরী মীর জুমলা, ১৮. আলী জুম্মাল, ১৯. গানওয়ার টুলী, ২০. এলভিন বাজার এবং ২১. ফোর্ডগঞ্জ।

উল্লিখিত স্থানগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মোঘল এবং ইংরেজ আমলে। ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের পর বাণিজ্য নতুন যুগের সূচনা ঘটে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি গড়ে উঠতে থাকে। এই সময়ে বেশ কিছু হিন্দু বসতির সৃষ্টি হয়। "খুব সম্ভবত ঢাকায় মোঘল থানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাণিজ্যিক স্বার্থে এ সকল লোক ঢাকায় আসতে শুরু করে। কিন্তু ইসলাম খান কর্তৃক ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পর বিপুল সংখ্যায় তাদের আগমন ঘটে। তাহলেও একথা বলা যায় যে ঢাকায় মোগল থানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে এই এলাকায় জনবসতি ছিল না। তবে একথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে ইসলাম খান কর্তৃক ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পরেই এখানকার জনপদগুলি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের এককরূপে গড়ে ওঠে এবং এগুলির জনসংখ্যাও সম্পদ বৃদ্ধি পায়। কারা ঢাকার আদি বাসিন্দা এবং মোঘল আমলের পূর্বে কোন স্থানের নাম কি ছিল তা সম্ভবত এখন আর জানা সম্ভব হবে না।" (মোঘল রাজধানী ঢাকা। ডঃ আবদুল করিম। পৃঃ ৩২-৩৪।)

বিভিন্ন পেশাজীবী :

পূর্ব ও পশ্চিমে সম্প্রসারিত ঢাকা নগরীতে জীবিকার সন্ধানে এসে সমবেত হয়েছিল নানা শ্রেণীর মানুষ। একদিনে নয়, ধীরে ধীরে তারা সমবেত হয়ে গড়ে তুলেছিল বসতি। অনেক পরে জেমস টেলর ঢাকায় বসবাসকারী বিভিন্ন পেশাজীবীর উল্লেখ করেছেন ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে জনগণনা থেকে। সেই তালিকায় আছে ঃ

আইনজীবী
জমিদার
স্বর্ণকার
হেকিম—মুসলমান চিকিৎসক
কবিরাজ
জহুরি—দামিপাথর বিক্রেতা
প্রতিমাশিল্পী
উকিল
কাঁসারি
খুন্দিগর—শিঙা ও গজদন্তের কারুশিল্পী
গিলটিকারী
মহাজন
ব্যবসায়ী
গোলদার
পাস্সীওয়ালা—স্বর্ণ সংগ্রহকারী
মোড়দার/ফড়িয়া-যারা খাদ্যশস্য বিক্রয় করে
মণিহারী দোকানদার
নেউলবন্ধ—যারা ঘোড়ার পায়ে নাল লাগায়
পোদ্দার—টাকা পয়সা ঋণদানকারী/ বদলকারী
পণ্ডিত
পসারী—মশলা ও ওষুধ বিক্রেতা
মোহরার/লেখক
দোমণি—মুসলমান মহিলা বাদ্যকার
ঢাকি/ঢুলি
মসিয়া গায়ক—হুসেনি দালানে শোকগীতি গায়ক
বাঁশ বিক্রেতা
আতর ও সুগন্ধি তেল বিক্রেতা
শিকলিগর—ইস্পাত পালিশকারক
রুটি প্রস্তুত কারক
খাস্তা নির্মাণকারী
তাস-পাশা প্রস্তুত কারক
মাদকদ্রব্যের ভাটি খানার মালিক ও বিক্রেতা
মুরাকষ-কাগজ ও কাপড় রঙকারী
ওস্তাগর—কাসিদা মসলিনে সূচিকর্মের তত্ত্বাবধানকারী
সুতী-পরিষ্কারকারক
জরদজী বা রেশমী—সোনা ও রূপোর সুতোয় যারা জরির কাজ করে
চেরাকষ—তামা বা কাসার বাসনে
খোদাইকারি
চীপিগর—মসলিনে সূচিকর্মের জন্য ছাপমারার কাজ করত
চিকনদাজ—মসলিন বস্ত্রে যারা বুটি তোলার কাজ করত
নর্দিয়া—যারা মসলিনের এলোমেলো সুতো ঠিক করত
ইতমামদার—খাজনা আদায়কারী
ঝাঁবরদার—যারা বিবাহের সময় পতাকা বহন করত
বাদলাওয়ালা—রূপের সুতো তৈরি করত
ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়
ভিদ্রি—হুকাপ্রস্তুত কারক
কল্লিওয়ালা—পানপাত্রওয়ালা
দস্তবন্দ—পাগড়ি নির্মাতা
দস্তফরাশ—পুরনো বস্ত্র বিক্রেতা
গোরখনা—কবর খননকারী
হাউশগীর—আতশবাজি প্রস্তুত কারক
হুক্কা বা পুঁতিদানা প্রস্তুতকারী
ইসিরিওয়ালা—যারা কাপড় চোপড় ইস্তিরি করে
কুটিখাল—খাদ্যশস্য পরিষ্কারকারক
মালাকার—যে মালা প্রস্তুত করে
কম্বল প্রস্তুতকারক
তুঁতে প্রস্তুতকারক
কালি প্রস্তুতকারক
দড়ি প্রস্তুতকারক
মোম প্রস্তুতকারক
মোমবাতি প্রস্তুতকারক
কসাই
কামার
কাঁসারি
নাপিত
ফড়িয়া
বাইজি
পালকি বাহক
ভিক্ষাজীবী
ছুতার মিস্ত্রি
মুড়ি-মুড়কি বিক্রেতা
পুস্তক-বাঁধাইকারী
জেলে

মালি
ঘাটমাঝি
বৈরাগি
ময়রা
রাখাল
ডোম
গ্লাশ-ব্লোয়ার
শূকর-রক্ষক
খোঁড়াতি বা কুন্দকার
কলু বা তেলি
ঘটক
ধাত্রী
মোল্লা
মুদি
মুরগিওয়ালা
বাদ্যকার
পাটনি—খেয়ার মাঝি
কুম্ভকার
পতিতা
রাজমিস্ত্রি
রেজ্জা বা ছাদ পিটানি
শাঁখারি
করাতি
ইংরেজির দেশীয় লেখক
খরানি মোল্লা—যারা সরকারি অফিসে শপথনামা পাঠ করায়
কের্দানি—কোমরে বাঁধবার মোটা বস্ত্রের প্রস্তুতকারক
গরু দাগানিয়া—যারা তপ্ত লৌহ শালাকা দিয়ে গরুর চিকিৎসা করে।
মুগজি—যারা কাপড়ের পাড় বা আঁচল সেলাই করে
রঙওয়ালা—টিন ও সিসার ওপর কারুকার্যকারী
নৈচাবন্ধ—সর্পাকৃতির হুকাপ্রস্তুতকারী
শালগর—শাল ধোয়া ও রিফুকারী
সাবান প্রস্তুতকারক
চশমা প্রস্তুতকারক
সাঁধুয়া—স্বর্ণকারের দোকানের পরিত্যক্ত জঞ্জাল খুঁজে যারা স্বর্ণরেণু বের করে
ফলমূল বিক্রেতা
লেবু বিক্রেতা
পান বিক্রেতা
কাঠ কারবারি
শিঙাওয়ালা—রক্ত চোষণকারী
মদ ও আফিঙ বিক্রেতা
কাগজ বিক্রেতা
ধোপা
তাঁতি
ঘাস কাটার লোক
হাতকুটি—ইট গুড়াকারী
দরজা জানালার পর্দা প্রস্তুতকারক
গাইনদার—নৌকা মেরামতকারী
রিফুগর—ছেড়াকাপড় সেলাই করে
রঙরাজ—বস্ত্র রঙকারী
রঙসাজ—বাড়িঘর, নৌকা ও পালকি রঙকারী
নীলগর—নীল কাপড় রঙকারী
নখা-চিত্র বিক্রেতা
পাটিয়াল-বিছানা/মাদুর বিক্রেতা
বরকনদাজ
পিয়ন
জুতা মেরামতকারী
সানতরানা-পাথরকাটার লোক
টুপি বিক্রেতা
কাঠ বিক্রেতা
ময়দা ও ছাতু বিক্রেতা
পানের চুন বিক্রেতা
তারকষ-যারা সূক্ষ্ম তার দিয়ে পার্থক্য নিরূপণ করে
সমাজী—নৃত্যে যোগদানকারী বাদ্যকার
সুবলওয়ালা—বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুতকারক
খাদ্যশস্য ওজনদার
ছাতা প্রস্তুতকারক
বেহালা প্রস্তুতকারক
বেতের চেয়ার প্রস্তুতকারক
ঢোল প্রস্তুত কারক
পৈতা/বালা/অলংকারের রেশমি দড়ি প্রস্তুতকারক
সেঙ্গার—ছুরি, কাঁচি, তারকারি নির্মাতা ও বিক্রেতা
জুতা বিক্রেতা

খড়কুটো বিক্রেতা
তাড়ি/দেশি মদ বিক্রেতা
তরিতরকারি বিক্রেতা
শিকারি
ঝাড়ুদার
দরজি
তালুকদার

কাঠকয়লা ও হুকার খোল বিক্রেতা
পুরোহিত
সড়ককুলি
মিসি বা দাঁতের মাজন বিক্রেতা
বাক্স-পেটরা বিক্রেতা
সাপুড়িয়া
চামড়া কারবারি

ঢাকা থেকে রপ্তানি সূতিবস্ত্র : ১৮১৭-১৮৩৫

বছর	টাকা	আনা	পাই
১৮১৭-১৮	১৫,২৪,৯৭৪	১	৮
১৮২১-২২	১২,১৬,২৫২	০	৫
১৮২৫-২৬	৬,২৯,১৮৩	১১	৩
১৮২৯-৩০	৫,০৪,৮৮২	১২	০
১৮৩১-৩২	৩,৬০,৭৪৭	৫	০
১৮৩৪-৩৫	৩,৮৭,১২২	০	০

গড়পড়তা মজুরি—বার্ষিক

	১৮০৪			১৮৩৭		
ইতিমামদার	৩১	৩	০	৪১	১০	০
মণ্ডল	১৮	১৪	০	২৬	২	০
নায়েব	৬৪	০	০	৭৬	০	০
পিয়ন	২৪	০	০	৩৬	০	০
মোহরা	৩১	০	০	৩৪	৮	০

ঢাকা-জালালপুর রাজস্বের পরিমাণ — ১৮৩৬-৩৭

		টাকা	আনা	পয়সা
ভূমিরাজস্ব	হুজুরিমহল	২৮৯১৯৫	৯	০
	জেলা তহসিল	১৪১১৫৪	৪	৫½
		৪৩০৩৪৯	১৩	৫½
আকবরী	আফিম, মদ ইত্যাদি	৪০৭৬৫	৩	১
রাজস্ব	স্ট্যাম্প ইত্যাদি	৮৩২৬৫	৮	১
		১২৪০৩০	১১	১
	মোট ঃ	৫৫৪৩৮০	৮	৬½

শ্রমমূল্য ঃ ১৮০৩/১৮৩৭

	বার্ষিক মজুরী			বার্ষিক মজুরী			বার্ষিক মজুরী	
	১৮০৩	১৮৩৭		১৮০৩	১৮৩৭		১৮০৩	১৮৩৭
কৃষিক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিক বা ঘরামি	টাকা	টাকা	মাঝিমাল্লা	টাকা	টাকা	ভাণ্ডারী বা গৃহভৃত্য	টাকা	টাকা
১ম শ্রেণী	১৮	৪৮	১ম শ্রেণী	২৪	৪৪	১ম শ্রেণী	১২	২৪
২য় শ্রেণী	১৫	৩৬	২য় শ্রেণী	২১	৩৬	২য় শ্রেণী	৯	১৮
৩য় শ্রেণী	১২	২৭	৩য় শ্রেণী	১৮	৩৩	৩য় শ্রেণী	৬	১৫
			৪র্থ শ্রেণী	১৫	২৪	৪র্থ শ্রেণী	৩	১২
কুলি			সাধারণ মাঝি			কুলি ও ভাণ্ডারীদের পারিশ্রমিকের সঙ্গে তাদের খাদ্য দেওয়া হত		
১ম শ্রেণী	১২	২৭	১ম শ্রেণী	১৫	২৭			
২য় শ্রেণী	১০	২১	২য় শ্রেণী	১২	২১			
৩য় শ্রেণী	৯	১৬	৩য় শ্রেণী	১০	১৮			
৪র্থ শ্রেণী	৬	১২	৪র্থ শ্রেণী	৬	১২			

বিভিন্নসম্প্রদায় :

জেমস টেলরের এই বিবরণের ভিত্তিতে বিভিন্ন বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষ এবং তাদের জীবিকার উল্লেখ করেছেন ডবলু. ডবলু. হান্টার। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারির পরিসংখ্যানকে ব্যবহার করে হান্টার এই তালিকা প্রস্তুত করেন।

১. ব্রাহ্মণ-সংখ্যা ৫১,৬৩২
সামাজিক পদমর্যাদায় এদের স্থান খুবই উঁচুতে। হিন্দু সমাজে পুরোহিত হিসাবে সম্মানিত এই সম্প্রদায়ের অনেকেই সরকারি উচ্চপদে, কেরানির কাজে এবং আদালতের কাজে নিযুক্ত।

২. বৈদ্য-সংখ্যা ৮৪২০
ব্রাহ্মণদের পরেই এদের স্থান। সরকারি দপ্তরের বড় বড় পদে, চিকিৎসক, ভূস্বামী হিসাবে পরিচিত। জেলার উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

৩. ক্ষত্রিয়-সংখ্যা ৬২১
বাংলার ক্ষত্রিয়দের পূর্বকালীন সামাজিক মর্যাদা নেই। এখন তারা ব্যবসায় জড়িত।

৪. রাজপুত-সংখ্যা ১৬৬৫
পুলিশ, কনস্টেবল, সংবাদদাতা, দারোয়ান প্রভৃতি কাজে যুক্ত।

৫. ঘাটওয়াল-সংখ্যা ১১
পূর্ববর্তীদের অনুরূপ কাজকর্মে জড়িত।

৬. কায়স্থ-সংখ্যা ১০২,০৮৪
শুদ্রদের সমগোত্রীয় হলেও, এরা নিজেদের উচ্চ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হিসাবে উপস্থিত করে। বড় বড় জমিদারি ও উকিল, হিসাবরক্ষক, কেরানি, কোষাধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করে।

৭. তাঁতি-সংখ্যা ৮৯০৬
একসময় সমগ্র জেলায় এরাই ছিল সব থেকে উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায়। এদের আবার দুটি ভাগ—ঝাপানিয়া এবং ছোট বাগিয়া। পরস্পরে খাওয়াদাওয়ার চল ছিল না। এমনকী বিবাহ পর্যন্ত হত না। তারা একই রাস্তায় বসবাস করে, তাদের পেশার নামেই স্থানটি পরিচিত এবং ঘরবাড়িও বেশ জমকালো।

৮. শাঁখারি-সংখ্যা ৮৫৩
অত্যন্ত পরিশ্রমী সম্প্রদায়। যথেষ্ট অবস্থাপন্ন হলেও বেশ কৃপণ স্বভাবের।

৯. কামার-সংখ্যা ১২,০৭২
কর্মকার সম্প্রদায়—সোনারূপোর কাজ করে।

১০. কাঁসারি-সংখ্যা ৪৬৪
তামা ও পিতলের নিপুণ কারিগর। ছোট ছোট বাক্স এবং হুকার সুদৃশ্য নলযুক্ত দণ্ড তৈরি করে।

১১. কুমার-সংখ্যা ১৪,৮৩৫
সাধারণত শহরতলীতে বাস করে। মাটির খেলনা ও বাসনকোসন তৈরি করে।

১২. সদ্গোপগোয়ালা
শহরে দুধ সরবরাহ করে। গ্রাম থেকে দুধ কেনে এবং সেখানে তাদের গরুও থাকে। শহরে এদের সংখ্যাও অনেক।

১৩. আহিরা গোয়ালা
অন্য শ্রেণীর গোয়ালা। এদের সংখ্যা কম। শহরে এরা আমদানি করা গো-মহিষাদি

পালন করে। বেশির ভাগ মানুষ ভাল জাতের মাখন-ঘি বিক্রি করে। এদের মধ্যে অনেকেই আবার পশুর চিকিৎসা করে।

১৪. মালাকর-২৭৫৭
বাগানে মালির কাজ করে এবং সুদৃশ্য মালা গাঁথে।

১৫. নাপিত-সংখ্যা ১৮,২০৮
এদের বেশির ভাগ ত্রিপুরা থেকে এসেছে। চুলকাটার সঙ্গে অস্ত্রোপচারের কাজও করে।

১৬. বারুই/তামলি/তাম্বুলি সংখ্যা বারুই ১৫,৯৩১, তাম্বুলি ২০০
পান উৎপাদকরা বারুই এবং তাম্বুলিরা পান বিক্রেতা। এরা একই সম্প্রদায়ভুক্ত।

১৭. গণক
দেবদেবী সাজায় এবং জ্যোতিষচর্চা করে।

১৮. অগ্রদানী ব্রাহ্মণ
ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু ব্যক্তি। এদের খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয় না।

১৯. বর্ণয়াড়া-সংখ্যা ৬৪
ভিনরাজ্যের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়।

২০. তিলি বা তেলি-সংখ্যা ১৫৫
প্রধানত এরা তৈল ব্যবসায়ী ছিল। এখন ধনী খাদ্য শস্য বিক্রেতা।

২১. সদ্‌গোপ-সংখ্যা ১০৮৫
প্রধানত কৃষিজীবী। এদের মধ্যে গোয়ালা সম্প্রদায়ের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে।

২২. গন্ধবণিক-সংখ্যা ৬৬৩৪
দোকানদার ও মসলা বিক্রেতা। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের গন্ধ বণিকরা উচ্চবর্ণের হলেও, ঢাকার গন্ধ বণিকরা নিম্নবর্ণের।

২৩. সূত্রধর-সংখ্যা ১৫৯০৭
গাছকাটা, কাঠকাটা, নৌকা ও লাঙল তৈরির কাজ করে।

২৪. সুবর্ণবণিক-সংখ্যা ৪৬৯৬
সুদের কারবার। বিদেশি দ্রব্য এবং দামি পাথরের ব্যবসায়ী।

২৫. সাহা
ধনী এবং বড় বড় সম্পত্তির অধিকারী। খাদ্যদ্রব্য, চিনি, পান, লবণ ও দেশীয় অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ করে থাকে।

২৬. কাপালি-সংখ্যা ১৭,০১৭
চটবোনা, দড়িও বানায়। কেউ কেউ গরুর গাড়ি চালায়।

২৭. পাতিয়াল-সংখ্যা ১২৪১
শীতলপাটি তৈরি করে।

২৮. পাটনি-সংখ্যা ৪৬৯৫
নৌকায় পারাপার করে, ঝুড়ি বানায়, মাছ কেনাবেচা করে।

২৯. কৈবর্ত-সংখ্যা ৩২,৩১৭
এদের দুটি ভাগ। চাষি কৈবর্ত—চাষের কাজ করে এবং জালওয়া কৈবর্ত—যারা মাছ ধরা ও বিক্রি করে।

৩০. মোদক বা ময়রা—সংখ্যা৫২১
মিষ্টি বানায়।

৩১. হালইকর-সংখ্যা ৯১
ভিনরাজ্যের মিষ্টি প্রস্তুতকারক।

৩২. গানরার-সংখ্যা ৮০৬
মুড়ি তৈরি ও বিক্রি করে।
৩৩. কুণ্ডু-সংখ্যা ৮০৫
রান্নারখাবার বানায়।
৩৪. অগুরি-সংখ্যা ৩১৩
একটি নতুন সম্প্রদায়—চাষের কাজ করে।
৩৫. দলুই-সংখ্যা ৭৪১
চাষি ও কৃষি শ্রমিক।
৩৬. কুরমি-সংখ্যা ৫০৮
ভিনরাজ্যের মানুষ—বাড়ির ভৃত্য ও শ্রমিকের কাজ করে।
৩৭. ক্ষেতিলম সংখ্যা ৫৯৯
কৃষি শ্রমিক।
৩৮. পরাশর দাস-সংখ্যা ৩৭
কৃষিজীবী ও মজুর।
৩৯. চাষা ধোপা—সংখ্যা ২৮০৯
কৃষিজীবী।
৪০. সেকরা বা স্যাকরা—সংখ্যা ২৯২
স্বর্ণকার।
৪১. বৈষ্ণব—সংখ্যা ১১,৮৮৬
হিন্দু ধর্মের একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়।
৪২. ধোবা—সংখ্যা ৯৬১৫
জামাকাপড় কাচার কাজ করে।
৪৩. ডোম—সংখ্যা ৬৪১
জেলে, শববাহক। শূকর পোষে এবং ঝুড়ি বানায়।
৪৪ যোগী-সংখ্যা ১৬৪১০। দেশীয় মোটা কাপড় বোনার কাজ করে। এরা কিন্তু শবদেহ কবর দেয়।
৪৫. চণ্ডাল—সংখ্যা ১৯১,১৬২
চাষ করা, ঘাস কাটা, বাগান তৈরি, নৌকা চালায় এবং পালকি বহনের কাজ করে। ঢাকার উত্তরাংশে এদের বসবাস বেশি।
৪৬. গরবারা—ঢাকার এক বিশেষ সম্প্রদায়—যাদের কথা স্বতন্ত্র ভাবে আদমসুমারিতে উল্লেখ করা হয়নি। এরা সাধারণত ভোঁদড়, কচ্ছপ, শুশুক এবং কুমির শিকার করে। প্রথমটি শিকার করে চামড়ার জন্যে এবং অন্যদের তেল বিক্রি করে ওষুধ তৈরির কাজে।
৪৭. চামার-সংখ্যা ২৪,০৬৩
বিবাহের শোভাযাত্রায় এদের দেখা গেলেও, সাধারণত এরা পশুর চামড়া ও জুতো তৈরি করে। ভারবাহী পশুর সাজ, ঢাক বানায়। তাছাড়া তুলো পরিষ্কার করার জন্য ধুনকে চামড়ার তার লাগায়।
৪৮. ভুইমালি—সংখ্যা ৭২৬৭
বাগানের কাজ ছাড়াও এরা শহরের রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা ও ধাঙড়ের কাজ করে।
৪৯-৫০. কোচ-সংখ্যা ১০,৯২৮ এবং রাজবংশী-সংখ্যা ৪৩৬৩
এরা জঙ্গল পরিষ্কার করা, ধান, তৈলবীজ ও তুলা চাষের কাজ করে।

৫১. কাঁচারু-সংখ্যা ৩০৫। কাঁচ তৈরি করে। ৫২. কোয়েরি—সংখ্যা ৮৩৮। কৃষিজীবী। ৫৩. হুনসি—সংখ্যা ৬৫ তাঁতি। ৫৪. সুড়ি—সংখ্যা ৬৩,৫১১। মদ বিক্রেতা। ৫৫. খাটবা-সংখ্যা ১০৩। তাঁতি। ৫৬. বেলদার—সংখ্যা ১৭২। দিনমজুর। ৫৭. চুনারি—সংখ্যা ৬০৫। চুন তৈরি করে। ৫৮. মাটিয়াল—সংখ্যা ৭৯। দিনমজুর। ৫৯. পোদ—সংখ্যা ১০১। জেলে। ৬০. তিয়র—সংখ্যা ৭৯৮৮। মাছ ধরা এবং মাঝির কাজ করে। ৬১. জেলে—সংখ্যা ৩২,২৬৯। মাছ ধরা ও মাঝির কাজ করে। ৬২. ঝাল—সংখ্যা ৯৩৮। মাছ ধরা ও মাঝির কাজ করে। ৬৩. মাল্লা—সংখ্যা ৫৫৬৭ এবং ৬৪. মাঝি—সংখ্যা ৮৭০। মাঝির কাজ করে। ৬৫. পতুর-সংখ্যা ৪৩৯। মাছ ধরা ও মাঝির কাজ করে। ৬৬. বাইতি—সংখ্যা ৭৭৯। মাদুর তৈরি করে। ৬৭. বাগদি—সংখ্যা ১৫০৫। দিনমজুর, মাছ ধরা ও কৃষি কাজ। ৬৮. দুলিয়া—সংখ্যা ১২২৬। পালকি বহন করে এবং মাছ ধরে। ৬৯. মুরিয়ারি—সংখ্যা ২১। মাছ ধরে। ৭০. নগহেরি—সংখ্যা ২। স্বর্ণলঙ্কার তৈরি করে। ৭১. রাবণি কাহার—সংখ্যা ১৪৩৬। ভিনরাজ্যের পালকি বাহক। ৭২. মাল—সংখ্যা ৪৬৬৩। সাঁপুড়ে। ৭৩. হাড়ি—সংখ্যা ১৯৫৪। শূকর পালক ও ঝাড়ুদার। ৭৪. মিতর—সংখ্যা ২৩১৬। ঝাড়ুদার। ৭৫. শিকারি—সংখ্যা ২৭। জীবজন্তু শিকার করে। ৭৬. বেদিয়া—৯। জিপসিদের মত উপজাতি। সাধারণত এরা নৌকায় থাকে। ৭৭. বাথুয়া—সংখ্যা ১৪১। ৭৮. কান—৮৩। ৭৯. নগরচি—২৪। ৮০. বাহেলিয়া—সংখ্যা ১। ৮১. বাউরি—সংখ্যা ১৪। ৮২. বিন্দ—সংখ্যা ১৫৩। ৮৩. চেইন—সংখ্যা-১। ৮৪. দোসাদ—সংখ্যা ৪৯। ৮৫. পাশি—সংখ্যা ১৯। ৮৬. পান—সংখ্যা ৫২। ৮৭. কাওরা—সংখ্যা ২৮৪। ৮৮. মনদাই—সংখ্যা ৩০৯। ৮৯. বুনা—সংখ্যা ৩৪০। ৯০. গারো—সংখ্যা ১৩। ৯১. ভর—সংখ্যা ৫৫। ৯২. ভূমিজ—সংখ্যা ১১। ৯৩. নট—সংখ্যা ৮৪৪। ৯৪. সাঁওতাল—সংখ্যা ৫৫। ৯৫. ওঁরাও—সংখ্যা ২। ৭৭-৯৫ পর্যন্ত যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারা প্রধানত মজুরের কাজ করে। ছোট-ছোট জমিতে তারা চাষও করে।

এরপর হান্টার উল্লেখ করেছেন ঃ "The only Hindu caste which has declined from its former rank or numbers are the weaving classes. They have been impoverished by Competition of the District produce with English piece goods. Most of them, however, now be take themselves to other occupations and trade, and a large number of them have received a good English education. It is only the poorer members of the caste, who have adhered to the family calling, who have seriously suffered. The Armenians and Greeks have also declined in numbers and importance of late years, and the Collector of the District considers their decay to be chiefly owing to the spread of English education among the natives. Formerly the Greeks and Armenians but more particularly the latter, were the middlemen in all dealings between the English and natives, but this has now entirely ceased, and when the necessity for such an occupation no longer existed, those who practised it naturally declined in numbers, rank and importance. With the exception of the Bediyas there is no predatory clan or caste in the District, and it is doubtful whether the term can be rightly applied to this people. In the town of Dacca however, there are about sixty *Kichaks*, the children of a gang of professional Jessore thieves who were all convicted. They are chiefly employed by the Municipality and are mentioned as being the descendants of a predatory class.[৬]

প্রাকৃতিক বিপর্যয়

"টোপোগ্রাফি অফ ঢাকায়" জেমস টেলর লিখেছেন, ব্যাপক প্লাবন এবং মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে অত্যাধিক বৃষ্টিপাতের ফলে অপ্রাচুর্য বা অভাবের সৃষ্টি হয়। অতিবৃষ্টি আউশ ধানের বীজ ও ছোট ছোট চারাগাছের ক্ষতি করে। জেলার দক্ষিণে বাকরগঞ্জ এলাকায় (তখন ঢাকার অন্তর্গত ছিল) কাঁকড়া ধানের বোটা বা ডগা কেটে ফসলের ক্ষতি করে। ১৭৯৯ খ্রিঃ এই ক্ষতির পরিমাণ বোজরগ উমেদপুরসহ সাতটি জমিদারি এলাকায় এত ব্যাপক ছিল যে সরকার ৪২,২৬৪ টাকার রাজস্ব আদায় সাময়িকভাবে বন্ধ রাখে। মাঝে মাঝে স্বতন্ত্র আগাছা ও জলজ উদ্ভিদ ব্যাপকভাবে মাঠে ভাসে এবং এদের উৎপাতে ফসলের বেশির ভাগ জলের নিচে ডুবে থাকে। ফলে ফসলের ক্ষতি হয়। কখনও কখনও জলের ওপর একরকম আগাছা ও জলজ উদ্ভিদ ভেসে আসে। তাছাড়া পানা ও হিংচাশাকও থাকে। মাঠ জুড়ে ভেসে থাকা এইসব আগাছার নিচে থেকে ফসল মরে যায়। গোব্‌রা, মাজরা ও বিছাপোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষার জন্য রায়তদের খেত পাহারার ব্যবস্থা করতে হয়। বর্ষার সময় শিলাবৃষ্টিতেও ফসলের ক্ষতি হয়। অনাবৃষ্টি দীর্ঘস্থায়ী না হলে, অতিবৃষ্টির থেকে কম ক্ষতিকারক।

বঙ্গোপসাগরের ১০০ মাইলের মধ্যে অবস্থিত অঞ্চলটি স্মরণাতীত কাল থেকে নানান প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, ঘূর্ণিঝড়, শস্যহানি, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্পে বার বার সঙ্কট ডেকে এনেছে। সমগ্র জেলা নদীনালা বেষ্টিত। যার ফলে সহজেই বন্যাজনিত কারণে ক্ষতিও হত অস্বাভাবিক। প্রাণহানি, গবাদিপশু ও ফসলের বিনষ্টি বার বার বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।

প্রথমদিকে ঢাকা জেলার দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ছিল সব থেকে বেশি।

দুর্ভিক্ষ ১৬৬২ : মিরজুমলার আক্রমণের আগে ঢাকায় যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তা স্থায়ী ছিল প্রায় দুবছর। খাদ্যের অভাব ছিল প্রকট। বহু নরনারীর প্রাণহানি ঘটে।

দুর্ভিক্ষ ১৭৬৯-৭০ : বন্যার অস্বাভাবিক প্রকোপে ১৭৬৯ খ্রিঃ শস্যাদি যেমন নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি ১৭৭০ খ্রিঃ দেখা দেয় অস্বাভাবিক খরা। খালবিল, নদীনালা, পুকুর, গাছপালা শুকিয়ে যায়। মানুষ অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছে। শুকনো গাছপালায় পারস্পরিক ঘর্ষণে আগুন ধরে আর এক চরম বিপর্যয় ডেকে এনেছিল।

দুর্ভিক্ষ ১৭৮১ : এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে এবং নানান রোগে বহু মানুষ মারা যায়।

দুর্ভিক্ষ ১৭৮৪ : "বন্যা ও বিবিধ প্রাকৃতিক কারণে কয়েক বছর ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাসহ বাংলাদেশে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়। খাদ্যদ্রব্যের দাম আকাশচুম্বি হয়েছিল। এসময় প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে গিয়েছিল। ...ক্রমাগত বন্যা খরা ইত্যাদিতে ফসলহানি হওয়ায় খাদ্যদ্রব্যের দাম দ্রুত অনেক উপরে উঠে যায়। সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার সীমানা অতিক্রম করে যায়। যার ফলে খাদ্যাভাবে অনাহারে মৃতপ্রায় অনেক বাপ-মা জান বাঁচানোর তাগিদে তাদের শিশুসন্তান পর্যন্ত বিক্রয় করে দেয়। পর্তুগিজরা এসময় অনেক শিশু ক্রয় করে কলকাতা নিয়ে যায়।

"দুর্ভিক্ষের পূর্বে যেখানে টাকায় ১৬০ সের/১৪৯ কেজি চাউল বিক্রয় হত দুর্ভিক্ষের সময় সে চালের দর বেড়ে টাকায় মাত্র ১৭ সের/১৫.৮৬ কেজি বিক্রয় হত। তাও দোকানদারগণ মধ্যরাতে দোকান খুলত। একজনের কাছে এক সেরের বেশি বিক্রয় করত না। এসময় মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট হয়েছে এবং এর জের পরের বছর অর্থাৎ ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত বজায় ছিল। ১৭৮৫ সালের মার্চ মাস সম্পর্কে তৎকালীন ইংরেজ কালেক্টর সাহেব বলেছেন যদিও চালের দর টাকায় ২৫ সের পর্যন্ত নেমেছিল কিন্তু মানুষের ক্রয় ক্ষমতা

একেবারেই ছিল না। তারা নদীর পাড়ে অর্ধমৃত অবস্থায় ছিল। অনেকের হামাগুড়ি দেওয়ার ক্ষমতাও ছিল না। সাহায্য নেবার জন্য তাদের চলার শক্তি পর্যন্ত লোপ পেয়েছিল। কালেক্টর সাহেব এদের বাঁচানোর জন্য যথাসাধ্য করেছিলেন। এসময় লঙ্গরখানায় পাক করা খাবার সরবরাহ কার হয়েছিল।" (ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯৩। পৃঃ ৫১)

দুর্ভিক্ষ ১৭৮৭-৮৮ : পূর্ববর্তী অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারের দুর্ভিক্ষ ছিল অনেক ভয়াবহ এবং মানুষের দুর্ভোগ ছিল দূরপ্রসারী। এই দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ ছিল বর্ষা। মার্চ মাস থেকে ধারাবাহিক বৃষ্টিপাতে শহর ও গ্রামাঞ্চল জলে ভেসে যায়। যাবতীয় ফসল বিনষ্ট হয়। শহরের রাস্তায় নৌকা চলত। গ্রামে মানুষ বাস করতে থাকে নৌকা ও ভেলায়। তারা চলে আসতে থাকে শহরে। শহরের লঙ্গরখানায় দৈনিক ১০ হাজার আশ্রয়গ্রহণকারীকে খাবার দেওয়া হলেও, অনেকে অনাহারে মারা পড়ে। রোগে মৃতের সংখ্যা কম ছিল না। গবাদি পশু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। গ্রাম জীবন ভিত্তিক শিল্প ধ্বংস হয় ব্যাপকভাবে। বিশেষ করে তাঁতি-কামার-কুমোরের মৃতের হার ছিল বেশি। শিল্প বাণিজ্যের জন্য সুপরিচিত ঢাকা পরিণত হয় নিষ্প্রাণ নগরীতে। জানা যায় দুর্ভিক্ষে ৬০ হাজার লোক মারা গিয়েছিল।

জেমস টেলরের "টপোগ্রাফি অফ ঢাকার" বিবরণ থেকে ডবলু. ডবলু. হান্টার 'স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গলে" সংক্ষেপে উদ্ধৃত করেছেন ঃ "The rains set in early in the month of March and continued incessantly up to the middle of July, when the rivers rose to an unprecendented height, and inundated the whole of the country to an extent never remembered before. The streets of Dacca, which in ordinary seasons of inundation are several feet above the highest level of the rivers, were submerged to a depth sufficient to admit of boats sailing along them, while through out the country the inhabitants were obliged to quit their huts and betake themselves to rafts or raised stages of bamboos. In July the supplies of grain in the city became scanty, and the ruin of the early crops, with the unfavourable prospects of the winter harvest, had the effect of raising the price of provisions from three to four hundred per cent. Higher than that of ordinary seasons. The famine reached its height in April 1788, when in many parts of the District there was scarcely any rice procurable, even at the price of three pence a pound. Between nine and ten thousand persons were fed daily by public contribution, but numbers died of starvation. It is estimated that sixty thousand persons perished during the inundation and subsequent famine. The loss of property occasioned by this calamity was very great. The landlords were unable to pay their revenues, and subsequntly, from the loss of cultivators and cattle, their lands remained untilled for a considerable time. Several Fiscal Divisions were deprived of three-fourths of their inhabitants, who either died or emigrated, and the lands were in consequence soon over run with jungle and infested with wild beasts. Again, in 1833 or 1834, the people say there was a great flood in the District, and that it swept away a large number of animals and destroyed the crops. No account of this inundation, however, is to be found in the District Records. In 1870, also, the water rose very high, and caused considerable destruction to the low-lying lands ; but owing to the influences of trade, the good crop in

parts which were not reached by the flood. and the abundant cold weather harvest which followed, there was not much distress among the people. No embankments exist in the District, and the Collector does not think there is any necessity for the consturction of such protective works. A regular inundation occurs in cousequence of the low character of the deltas of the Ganges, the Jamuna and the Meghna, of which this District is a portion."[৭]

দুর্ভিক্ষ ১৯০৬ ঃ এবারও বন্যার প্রকোপ মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। খেতের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। খাদ্যের অনটন ব্যাপক হয়ে ওঠে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের চোরাকারবারির ফলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। ৫ টাকা মণ চালের দর হয়ে যায় ১০ টাকা মণ। প্রশাসনিক তৎপরতায় দুর্ভিক্ষে প্রাণহানির সংখ্যা ছিল খুবই কম। সরকার রেঙ্গুন থেকে স্বল্প মূল্যের চাল এনে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের মধ্যে বিতরণ করে।

দুর্ভিক্ষ ১৯৪৩ ঃ একে বলা হয় মনুষ্য সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানীরা অগ্রসর হয়ে ভারত সীমান্তে উপস্থিত হয়। সেই সঙ্গে ছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজ। ভারত সরকার সেনাবাহিনীর জন্য খোলাবাজার থেকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য শস্য সংগ্রহ করায় ব্যাপক খাদ্যসংকট দেখা দেয়। আগের বছর আমন চাষও ভাল হয়নি। এ বছর বন্যা বা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল না। খাদ্যশস্যের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। ৬ টাকা মণ চালের দাম হয় ৬০ টাকা মণ। জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা ছিল না। একমাত্র বিত্তশালীরা খাদ্য মজুত করে আত্মরক্ষা করেছিল। গোটা অবিভক্ত বাংলার দৃশ্য ছিল একই। ঢাকা জেলা তার থেকে বাদ পড়েনি। গ্রাম থেকে মানুষ শহরে আসতে থাকে। "যদিও তদনীন্তন সরকার লঙ্গরখানা খুলেছিলেন। কিন্তু সেখানেও খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ যথাযথ ও পর্যাপ্ত ছিল না। এ সময় খাদ্যাভাবে বহু বালক-বালিকা তাদের পিতা-মাতা হারিয়ে এতেম হয়ে যায়। শহর থেকে দূরে বহু দূরের গ্রীমাঞ্চল হতে মানুষ ঢাকা নগরীতে চলে আসে দু'মুঠা ভাতের জন্য। তারা নগরীর রাস্তায় রাস্তায় দ্বারে দ্বারে ঘুরতে থাকে বেঁচে থাকার আশায়। কেউ কেউ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ উপলক্ষে অগণিত সৈনিকদের ক্যাম্পগুলিতেও ধর্ণা দেয় যদি কিছু পাওয়া যায়। কঙ্কালসার মানুষকে নর্দমা ও ডাষ্টবিন হতে খাদ্য সংগ্রহের জন্য কুকুর বিড়ালের সাথে লড়াই করতেও দেখা যায়।"[৮]

টর্নেডো ১৮৮৮ : বিধ্বংসী ঝড়ে শহরাঞ্চলের বহু ঘরবাড়ি এবং বেশ কিছু গ্রাম ধ্বংস হয়ে যায়। ঢাকা নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে শুরু হয়ে প্রচণ্ড গতিতে অগ্রসর হয় দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। যাওয়ার পথের ঘর-বাড়ি ও গাছপালা চুরমার করে দেয়। লালবাগ অঞ্চলে ঝড়ের দাপট ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। শাঁখারিবাজার ও আহসান মঞ্জিলের ওপর আঘাত হেনে মুন্সিগঞ্জ এলাকার ছয়-সাতটি গ্রাম ধ্বংস করে। ঢাকা নগরীর ক্ষতির পরিমাণ ছিল সব থেকে বেশি। এখানে মরা যায় ১১৮ জন, আহত হয় ১২০০ জন। ১২টি নৌকা ডুবে যায়। ৯টি দালান বাড়ি ভেঙে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ১৪৮টি। ৩৫৮১টি সাধারণ বাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। সে সময়ের হিসাবে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ টাকা। মুন্সিগঞ্জ অঞ্চলে মৃতের সংখ্যা ছিল ৬০ থেকে ৮০ জন।

টর্নেডো ১৯০২ : বুড়িগঙ্গা নদীর দক্ষিণ থেকে উৎপন্ন এই ঝড় ১০০ গজ থেকে ৪০০ গজ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে বেশ কিছু পাটের গুদাম, ধোলাইগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন ধ্বংস করে। ২০০০ ঘরবড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। মারা যায় ১০০ জন এবং আহতের সংখ্যা ছিল ২৩৮ জন।

টর্নেডো ১৯১৯ : ২৪ সেপ্টেম্বর এই ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল।

টর্নেডো ১৯৯১ : ৯ মে কেবল ঢাকা নয় অন্যান্য ৬টি জেলারও ব্যাপক ক্ষতি হয়। ঢাকার সর্বত্র বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। রাস্তার ওপর গাছপালা ভেঙে পড়ে। বহু বস্তি উড়ে যায়। ঝড়ের সঙ্গে ছিল প্রচণ্ড বর্ষণ। বহু এলাকা জলবদ্ধ হয়ে যায়। মুহূর্তে ঢাকা পরিণত হয় অন্ধকার নগরীতে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ব্যাপক।

ঘূর্ণিঝড় ১৯৬১ : ঢাকা মহানগরীসহ মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। প্রবল ও ভয়ঙ্কর এই ঘূর্ণিঝড়ে বহু কাঁচাবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। ফসলের ক্ষতির পরিমাণ ছিল সব থেকে বেশি। লৌহজং-এ বেশ কিছু নৌকা ডুবে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বিস্তার ছিল ৩৮৮৫ বর্গ কি.মি.। সরকারি ক্ষতির পরিমাণ ছিল ব্যাপক। টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়। ঘূর্ণিঝড় শুরু হয়েছিল ৯ মে।

ঘূর্ণিঝড় ১৯৬৫ : ঘূর্ণিঝড় শুরু হয় ১১মে বিকেলে। রাত ১টা নাগাদ তা ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। বায়ুর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৭৫ থেকে ৮০ মাইল। সর্বাধিক ৯০ মাইল। সকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। "জনসাধারণ ঐ ঝড়ের রাতটি দুঃস্বপ্নের মত ভীত সন্ত্রস্তভাবে কাটিয়েছে। ঢাকা নগরীতে সে রাতে বিদ্যুৎ ছিল না। বৈদ্যুতিক থামগুলি ভেঙে যায়। শতকরা ৯০টি কাঁচা ঘর-বাড়ি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিছু পাকা বাড়িও ধ্বংস হয়। এছাড়া জেলার হাজার হাজার বাড়িঘর কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জেলার নদীগুলিতে বহু লঞ্চ, মালবাহী স্টিমার ও নৌকা ডুবে যায়। প্রায় এক লক্ষ লোক গৃহহারা হয়। ৪১জনের প্রাণহানি হয়। ঢাকা মহানগরী ও নারায়ণগঞ্জে বিদ্যুৎ ও পাণি সরবরাহ ব্যবস্থা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঢাকা মহানগরীর সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা হল কমলাপুর, খিলগাঁও, মিরপুর, লালমাটিয়া, রায়েরবাজার, তেজগাঁও শিল্প এলাকা। নারায়ণগঞ্জ শহরের ৭০% সাধারণ ঘরবাড়ি বিনষ্ট হয়। নদীবন্দরটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। Tegra flat-টি সহ আরো কিছু নৌকাও ডুবে যায়।" (ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯৩। পৃঃ ৫৪)। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বহু বিদেশি রাষ্ট্রও সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল।

ভূমিকম্প :

ঢাকা জেলায় একাধিকবার ভূকম্পন অনুভূতি হয়েছে। সব সময় যে তা ব্যাপক আকার নিয়ে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেছে তা কিন্তু নয়। ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে নদনদীতে ব্যাপক জলস্ফীতি ঘটে। নিম্নাঞ্চলে বেশ কিছু বাড়িঘর ধ্বংস হয় এবং প্রায় ৫০০ জন মারা যায়। ১৭৭৫ খ্রিঃ, ১৮১২ খ্রিঃ, ১৮৭৬ খ্রিঃ এবং ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে ক্ষতির পরিমাণ তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। কিন্তু ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্প ছিল প্রবল এবং বহু ঘরবাড়ির ক্ষতি হয়। সে সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি মেরামতে খরচ হয়েছিল ১,৫০,০০০ টাকা।

বন্যা :

বন্যা ১৯৫৪ : সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে অবিরাম বর্ষণে এবারের বন্যা ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল। সমগ্র ঢাকা জেলা জলপ্লাবিত হয়ে যায়। ঢাকা শহরের রাস্তায় নৌকা চলাচল করত।

বন্যা ১৯৫৫ : এবার ঢাকা জেলাসহ বাংলাদেশের অন্যান্য কয়েকটি জেলায় প্রবল বন্যা হয়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল বিপুল।

বন্যা ১৯৬২ : এবারের বন্যার প্রকোপ ছিল ব্যাপক। বন্যা হয় দুবার—জুলাই এবং অগাস্ট-সেপ্টেম্বরে। রাস্তাঘাট নষ্ট হওয়ায় মানুষের দুর্গতির সীমা ছিল না।

বন্যা ১৯৬৬ : ১৫ সেপ্টেম্বর বন্যার অন্যতম কারণ ছিল অবিরাম বৃষ্টিপাত। ৫২ ঘণ্টায় ১৪ ইঞ্চি ৩৫.৫ সে. মি. বৃষ্টিতে জেলার সর্বত্র জল জমে যায়। কোথাও কোথাও ৬ ফিট বা ১৮৩ সে. মি. জল উঠেছিল। ৬১০০ নরনারীর স্থান হয়েছিল ১৩০টি আশ্রয় শিবিরে। ৫০০ কাঁচাপাকা বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

বন্যা ১৯৮৭ : এবারের বন্যায় বৃহত্তর ঢাকার ১৫ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ঢাকাসহ ৪৬টি জেলার ২৭৪টি থানার ১২ হাজার বর্গ মাইল এলাকায় বন্যার তাণ্ডব ছিল ভয়ঙ্কর। হরিরামপুর সংলগ্ন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এবং ওয়াপদা অগ্রণী সেচ প্রকল্পের বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় জনগণ বিপন্ন হয়ে পড়ে। ঢাকা শহরসহ দোহার, নবাবগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদি, রায়পুরা, মিরপুর সর্বত্র জলবন্দি হয়ে পড়ে মানুষ। নারায়ণগঞ্জে ৮০ ভাগ জলমগ্ন হওয়ায় লক্ষাধিক মানুষ হয় আশ্রয়হীন। মানিকগঞ্জে মারা যায় ৫১ জন। মুন্সিগঞ্জ পুর এলাকা সম্পূর্ণ জলমগ্ন হওয়ায় লোকজন আশ্রয় নেয় উঁচু স্থানে।

বন্যা ১৯৮৮ : স্মরণাতীত কালের সব থেকে ভয়াবহ এই বন্যা বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত জেলাকেই ক্ষতবিক্ষত করে গিয়েছিল। ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার-১৯৯৩ থেকে জানা যায় বন্যা কবলিত হয় ৩০ হাজার বর্গমাইল এলাকা। ৬৪টি জেলার ৪৭টি, ৪৬৮টি-থানার ২৯৩টি থানা প্লাবিত হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ২কোটি ১০ লক্ষ মানুষ। ৮০ লক্ষ ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা ছিল এক কোটি। ২০ লক্ষ একর জমির ফসল পুরোপুরি এবং ১৫ লক্ষ একর জমির ফসল আংশিক নষ্ট হয়ে যায়। সরকারি হিসাবে বিনষ্ট খাদ্যশস্যের পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ টন। সমগ্র দেশের ৬০০০ কি.মি. মহাসড়কের ১১৭০ কি. মি. ; উপজেলার ৫০০০ কি. মি. সড়কের ১০০০ কি.মি. ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিধ্বস্ত সেতু ও কালভার্ট ছিল ২৪৬টি। বন্যার জলে ভেসে গিয়েছিল প্রায় আড়াই হাজার ফুট রেলপথ। হাজার হাজার গবাদি পশু মারা গিয়েছিল। সরকারি হিসাবে মোট ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৫০০০ কোটি টাকা।

বন্যায় অবরুদ্ধ ঢাকা মহানগরীর সঙ্গে দেশের অবশিষ্টাংশের কোন সংযোগ ছিল না। রেলপথ ও সড়ক যোগাযোগ এবং জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সবই অচল হয়ে যায়। শহরের ৮০ শতাংশই ছিল জলের নিচে। প্রায় ৪০০ ত্রাণ শিবিরে আশ্রিতের সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ। বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করা হয় নিরাপত্তার কারণে। পাণীয় জলের অভাব প্রকট হয়ে ওঠে। বেশির ভাগ বাড়ি সরকারি ভবন, হাসপাতালের রিজার্ভার চলে যায় জলের নিচে। টেলিফোন সংযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

একমাত্র নারায়ণগঞ্জে বন্যা ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ। প্লাবিত অঞ্চলের কোথাও কবর দেওয়ার মত জায়গা ছিল না। সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যায়। বহু মানুষ ছাদের ওপর আশ্রয় নিয়েছিল। বন্দর, সোনারগাঁ ও রূপগঞ্জের কয়েক হাজার মানুষ এসে আশ্রয় নিয়েছিল নরসিংদি-মদনগঞ্জ রেললাইনের ওপর। নরসিংদির ১০ হাজার লোক গৃহহীন হয়ে পড়ে এবং জিয়াপুর গ্রাম মেঘনা বক্ষে বিলীন হয়ে যায়। নরসিংদি শহরের ৮০ ভাগ প্লাবিত হয়েছিল।

মানিকগঞ্জ জেলা সদর সম্পূর্ণ জলের নিচে চলে যায়। কমপক্ষে এক লক্ষ লোক আশ্রয় নেয় ঘরের চাল ও মাচানে। হাজার হাজার গৃহাদিপশু মারা যায়। ৬টি উপজেলায় ৩ লক্ষ লোক ছিল জলবন্দি।

গাজিপুরের ৪৩টি ইউনিয়নের ৩৮টি বন্যা কবলিত হয়। এক লক্ষলোক আশ্রয় নিয়েছিল ৭৫টি আশ্রয় শিবিরে।

মুন্সিগঞ্জ জেলার ৬৯টি ইউনিয়ন ছিল সম্পূর্ণ বন্যা কবলিত। ৬টি উপজেলায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ১০ লক্ষ মানুষ। ১১০টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছিল।

মৎস্য সম্পদ

'মাছে ভাতে বাঙালি'—এই প্রবাদ এখনও মিথ্যা হয়ে যায়নি। দু পার বাংলার মানুষের প্রিয় খাদ্যবস্তু আজও। নদনদী, খালবিল, পুকুর, নালা, জলাশয়, হাওড়, বর্ষার ধানখেত কোথায় না মাছ পাওয়া যায়। কিন্তু মৎস সবরবাহের পরিমাণ ক্রমশ যেন হ্রাস পেয়ে চলেছে। তাছাড়া

মূল্যবৃদ্ধিও মাত্রাহীন। মাছ সবরবাহে ঘাটতির অন্যতম কারণ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক জমিতে ব্যবহার করায়, সেই জমির মাটি বর্ষার জলে ধুয়ে পুকুর, নদী বা অন্য জলাশয়ে নামছে। যা ক্ষতি করছে মাছ উৎপাদনে। মাছ উৎপাদনে বৃহত্তর ঢাকা জেলার অসংখ্য নদনদীর ও বৃহৎজলাশয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যেসব মাছ পাওয়া যায়, তার মধ্যে আছে :

১. ইলিশ Hilsa ilisa
২. চাপিলা Gadusia chapra
৩. রিটা Rita rita
৪. ঘাউরা/গারুয়া Clupisoma garua
৫. ফ্যাসা Septipinna phasa
৬. চিতল Notopterus chitala
৭. বাতাসি Clupisoma atherinoides
৮. কাজলি Ailichthys punetata (day)
৯. ফলি Notopterus Notopterus
১০. রুই Labeo rohita
১১. বাচা Eutropichthys vocha
১২. সিলোন/শিলং Silonia silondia
১৩. কালবাউস Labeo Calbasu
১৪. ঘনিয়া Labeo gonius
১৫. পাংগাস Pangasius pangasius
১৬. শিংগি Heteropneustes fossicelis (Block)
১৭. নন্দাইল/নাইন্দল Labeo nandina
১৮. মৃগেল/মিরকা Cirrhina mrigala
১৯. মাগুর Clarius batrachus (Linnaeus)
২০. কাইর্কলা Xenentodon cancila
২১. টাট্‌কেনি/বাটা Cirrhina reba
২২. কার্পিত
২৩. খল্লা Mugil corsula
২৪. গজার Channa marulius
২৫. সিলভার
২৬. কাতল Catla catla
২৭. শোল C. striatus
২৮. চ্যাংগ C. gachua
২৯. সরপুঁটি Barbus sarana
৩০. জাতিপুঁটি B. (puntius) Sophore
৩১. তিঁত পুঁটি B. (puntius) ticto
৩২. টাকি/ল্যাটা C.punctatus.
৩৩. চান্দা (নামা) Chanda nama
৩৪. লালচান্দা C. ranga
৩৫. কাঁটা চান্দা C. baculis
৩৬. টাকা চান্দা Leciognathus equnlus (Forskal)
৩৭. মলা Amblypharyngodon mola
৩৮. এলাং Rosbora elanga
৩৯. ঢেলা/মওয়া Rohtee cotio
৪০. পোয়া Sciaenoides pama
৪১. মেনি/ভেদা Nandus nandus
৪২. চেলা Chela bacalia
৪৩. ফুলচেলা Chela phulo
৪৪. কই Anabas testusincus
৪৫. খলিসা/খয়রা Colisa fasciata
৪৬. বটি Botia dario
৪৭. বোয়াল Wallago attu
৪৮. পাবদা Ompak pabda
৪৯. বাইলা/বেলে Glossogobius giuris
৫০. গুটিবাইম Mastacembalus pancalus
৫১. কানি পাবদা Ompak bimaculatus
৫২. বড়বাইম Mastacembalus armatus
৫৩. তারাবাইম Macrognathus aculeatus
৫৪. গুজি আইড় Mystus aor
৫৫. তল্লা আইড় M. Seenghala
৫৬. বাজারি (টেংরা) M. tengra
৫৭. টেংরা M. Vitattus
৫৮. কাবাসিটেংরা M. cavasius
৫৯. পটকা Tetrodon patoca
৬০. টেপা Tetrodon cutcutia
৬১. গলদা চিংড়ি Macrobrachium rosenbergii
৬২. গুঁড়া ইচা Leander styliferus

এইসব মাছ ছাড়াও কৃত্রিম প্রজনন ও শংকরায়নের মাধ্যমে বহু দেশি বিদেশি মাছের চাষ হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে ধরা মাছ আনা হয় কেন্দ্রীয় মৎস্য সমাগীম কেন্দ্রে সেখানে মাছ হিমায়িত ও থলিবদ্ধ করা হয়। মাছের অন্যতম কয়েকটি পাইকারি বাজার হল : নরসিংদি, লৌহজং, নারায়ণগঞ্জ, রাজাঘাট, সোয়ারিঘাট, ..শাপুর, পাগলা, আরিচা, মৌখিকান্দা, কাঞ্চনপুর, কাদিরপুর, মুন্সিগঞ্জ, ভাগ্যকুল, মাইলট, রেকারি বাজার, গজারিয়া, জালালদি, ঘোড়াশাল এবং কাউরাইদ। মাছ ধরার ব্যবস্থায় আধুনিক যুগের প্রভাব পড়লেও, আজও বিভিন্ন ধরনের জাল,

ফাঁদ, হোঁচা, পলো, বানা, খেচনা, ধাক, দোয়াইড়, চাওরা, ঝটকা, জাড়কা প্রভৃতিও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। জাল ও মাছ ধরার অন্যান্য উপকরণ তৈরি শিল্পেও বহু মানুষের জীবিকা নির্ভর করে। মাছ ধরায় যথেচ্ছাচার বন্ধ করতে "বাংলাদেশ মৎস্য সংরক্ষণ আইন-১৯৫০" বলবৎ করা হয়েছে।

বৃহত্তর ঢাকা জেলায় বিভিন্ন উৎস থেকে ধরা মাছের পরিমাণ

মেট্রিক টন হিসাবে

বৎসর	নদী	বিল	জলমগ্ন ভূমি	পুকুর	মোট
১৯৮৩-৮৪	১৪,০৬৬	২,২১৩	২৪,১২৭	৪,০৪৪	৪৪,৪৫০
১৯৮৪-৮৫	১৩,৬৩৩	১,১৯৯	২৪,১২৭	৩,৭২২	৪২,৬৭৩
১৯৮৫-৮৬	১৩,১৩৪	১,৫০০	১৯,৫৯৪	৩,৬২৭	৩৭,৮৫৫
১৯৮৬-৮৭	১৮,০১৮	১,৪১০	১৯,৮৮৭	৫,৮৭৩	৪৫,১৮৮
১৯৮৭-৮৮	১৪,৯৪৮৪	১,১৬৪	২০,৫৮৭	৬,৪৫৯	৪৩,১৯৪
১৯৮৮-৮৯	৯,৬৬৮	১,১০৩	২১,৩০০	৬,৪৬২	৩৮,৫৩৩

বিল ও বিভিন্ন প্রকার পুকুরের আয়তন ও উৎপাদন

বৎসর		বিল	আবাদী পুকুর	আবাদযোগ্য পুকুর	পরিত্যক্ত পুকুর	মোট পুকুর
১৯৮৩-৮৪	আয়তন	৪,৯১৮ হেক্টর	৬,০৯১একর	৬,৮৭৬ একর	৩,৯৯০ একর	১৬,৯৫৭ একর
	উৎপাদন	২,২১৩ মে টন	২,৮৩৬ টন	৯৪২ টন	২৩৯ টন	৪,০৪৪ টন
১৯৮৪-৮৫	আয়তন	৪,৯১৮ হেক্টর	৬,০৯১একর	৬,৮৭৬ একর	৩,৯৯০ একর	১৬,৯৫৭ একর
	উৎপাদন	১,১৯১ মে টন	২,৭০৪ টন	৮৩১ টন	১৮৩ টন	৩,৭২২ টন
১৯৮৫-৮৬	আয়তন	৪,৯১৮ হেক্টর	৬,০৯১একর	৬,৮৭৬ একর	৩,৯৯০ একর	১৬,৯৫৭ একর
	উৎপাদন	১,৫০০ মে. টন	৩,০৭০ টন	১৬৩ টন	৩৯৪ টন	৩,৬২৭ টন
১৯৮৬-৮৭	আয়তন	৪,৯১৮ হেক্টর	৬,০৯১একর	৬,৮৭৬ একর	৩,৯৯০ একর	১৬,৯৫৭ একর
	উৎপাদন	১,৪১০ মে. টন	৩,৭৪৭ টন	১,৫১৩ টন	৬১৩ টন	৫,৮৭৩ টন
১৯৮৭-৮৮	আয়তন	৪,৯১৮ হেক্টর	৬,০৯১একর	৬,৮৭৬ একর	৩,৯৯০ একর	১৬,৯৫৭ একর
	উৎপাদন	১,১৬৪ মে. টন	৪,২০০ টন	১,৪৮৩ টন	৭৭৬ টন	৬,৪৫৯ টন
১৯৮৮-৮৯	আয়তন	৪,৯১৮ হেক্টর	৬,০৯১একর	৬,৮৭৬ একর	৩,৯৯০ একর	১৬,৯৫৭ একর
	উৎপাদন	১,১০৩ মে. টন	৪,৩৩৭ টন	১,২৮৬ টন	৮৩৯ টন	৬,৪৬২ টন

ডবলু. ডবলু. হান্টারের বিবরণে ঢাকা জেলার মাছ সম্পর্কে উল্লেখ আছে : "The rivers and tanks abound with fish. The ray and common shark are found in the Meghna and Ganges, frequently at a considerable distance from the sea. The saw-fish is also common in the large rivers during the spring months. The shark and ray are more dreaded by fishermen than even the crocodile. The *anwari*, or mullet is found in shoal along the shallow margins of rivers and *chars* and is caught and brought to market in the cold season. The *Tapsi machh*, or mango-fish, is plentiful in April and May. The *hilsa* in this District is said to be superior in size and flavour to that of any other part of the country. The *chital, rui, mirgal* and *katla* are all common. Two kinds of fish, the *Kai* and the *Khalisa* are in the habit of migrating in shoals from one pond to another. Their progress is effected by fixing the sharp *notched* edges of the *operculum* in the ground, and propelling the body by a sudden jerk or

contraction of the candal muscles. A number of them are devoped by birds while thus migrating. Crabs, crayfish, and prawus are plentiful in the District.[৮]

বনজ সম্পদ

ভূপ্রকৃতি অনুসারে বৃহত্তর ঢাকা জেলা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার গঠিত সমভূমিতে বিস্তৃত। জেলার বনভূমি অঞ্চল উত্তরাংশে অবস্থিত। এই বনভূমির পূর্বদিকে বানার এবং পশ্চিমদিকে বংশী নদী প্রবাহিত। বনভূমির মোট আয়তন ২৬৩ বর্গ কি. মি.। মোট জেলার আয়তনের মাত্র ৩.৫৩%। সমগ্র বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ১৯,৩০৫ বর্গ কি. মি.। যা বাংলা দেশের মোট আয়তনের মাত্র ১৫%। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে এই পরিমাণ খুব সামান্য। ঢাকা জেলার বনভূমি থেকে এক সময়ে যথেষ্ট ভাবে গাছ কাটা হয়েছে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহারে, আসবাবপত্র তৈরির কাজে, ঘরবাড়ি নির্মাণে, বৈদ্যুতিক খুঁটি হিসাবে ব্যবহারের জন্য এবং অন্যান্য কাজে। এর ফলে বনভূমির আয়তন ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বনভূমি সংরক্ষণ ও বৃক্ষসৃজনের নানা পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে। জনগণও সচেতন হয়ে উঠছে। তাছাড়া তিতাস গ্যাস সংস্থার সরবরাহ করা গ্যাস রান্নার কাজে ও ইট পোড়াতে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে জ্বালানি কাঠের চাহিদা কিছুটা কমেছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বনভূমির পরিমাণ . ১৯৮৫-৮৬

বৃহত্তর জেলা	একর	বর্গমাইল	বর্গ কি.মি.
১. পার্বত্য চট্টগ্রাম	১৭,১৭,৯৯৩	২,৬৮৩	৬,৯৪৯
২. খুলনা	১৪,২৫,৯০০	২,২২৮	৫,৭৭০
৩. চট্টগ্রাম	৮,৩০,৬৪৩	`১,২৯৮	৩,৩৬২
৪. নোয়াখালি	২,২৬,৯৬০	৩৫৫	৯১৮
৫. সিলেট	১,৮৭, ২৯০	২৯৩	৭৫৮
৬. ময়মনসিংহ	১,১২,৬৭৪	১৭৬	৪৫৬
৭. টাংগাইল	৮০,৮৪৪	১২৬	৩২৭
৮. ঢাকা	৬,৫০০	১০২	২৬৩
৯. বরিশাল	৪৫,০৩৫	৭৫	১৯৪
১০. পটুয়াখালি	৩৮,৮৪৪	৫১	১৫৭
১১. দিনাজপুর	২৩,৯৭৮	৩৮	৯৭
১২. রাজসাহি	৬,৭০০	১০	২৭
১৩. রংপুর	৪,৭৯০	০৭	২৭
১৪. ফরিদপুর	২৪	—	—
১৫. কুষ্টিয়া	২১	—	—
১৬. যশোহর	২০	—	—
১৭. বগুড়া	১৭	—	—
১৮. পাবনা	১৫	—	—
১৯. কুমিল্লা	১,৮৭৭	০৩	০৮
	মোট	৭,৪৫৪	১৯,৩০৫

বৃহত্তর ঢাকা জেলার বনভূমিবণ্টন

বনভূমি শ্রেণী	আয়তন (একর)	শতকরা হার
১. সংরক্ষিত বনভূমি	৬৭৭.০৮	১.০২%
২. প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনভূমি	৬৫,৩৮৭.৯০	৯৮.৯৮%

বৃহত্তর ঢাকা জেলার ৬টি জেলার বনভূমির পরিমাণ

বর্তমান জেলার নাম	বনভূমির পরিমাণ (একর)	শতকরা হার
১. ঢাকা	১,১২০.২১	১.৭%
২. গাজিপুর	৬৪,৬৮৭.০৩	৯.৮%
৩. মানিকগঞ্জ		
৪. মুন্সিগঞ্জ		
৫. নারায়ণগঞ্জ		
৬. নরসিংদি		
মোট	৬৫,৮০৭.২৪	১০০%

রেঞ্জ অনুসারে চারভাগে বিভক্ত বনভূমি

রেঞ্জের নাম	আয়তন (একরে)
১. রাজেন্দ্রপুর	১,৯২৯.৪৩
২. শ্রীপুর	২৪,০৫৬.৯৩
৩. কালিয়াকৈর	১২,৮০২.৭৩
৪. কাচিঘাটা	৯,৬৪৯.৩৫
মোট	৬৫,৮০৬.৪৪

বৃহত্তর ঢাকা জেলা বনবিভাগের সদর দপ্তর ঢাকা শহরের মহাখালিতে। এখান থেকেই দপ্তরের যাবতীয় কার্য পরিচালিত হলেও, সুষ্ঠু পরিচালনার পক্ষে নানান পরিকাঠামোগত অসুবিধা রয়েছে। বর্তমানে কাজের সুবিধার জন্য ৪টি রেঞ্জ অফিস এবং ৩৩টি অস্থায়ী বিট ও সাববিট অফিস স্থাপিত হয়েছে। ঢাকা শহরে কর্মসূত্রে আসা মানুষের চাপ বাড়ছে বনভূমির ওপর। ঢাকার নিকটবর্তী জঙ্গলে এলাকায় গাছ কেটে চাষবাস ও বসতি নির্মাণের কারণে বনভূমির আয়তন সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। জেলার বনাঞ্চলের আয়তন ৬৫০০০ একর হলেও, সংরক্ষিত অরণ্য মাত্র ৬৭৭ একর। অরণ্যরক্ষীদের পক্ষে সংরক্ষিত অরণ্য এলাকার বাইরের বেআইনি দখলদারদের উচ্ছেদ করা আইনগত দিক থেকে সম্ভব নয়।

বিভিন্ন রেঞ্জ ও বিটের তালিকা

রেঞ্জের নাম	বিটের নাম	আয়তন (একরে)
১. রাজেন্দ্রপুর	রাজেন্দ্রপুর	২৩১৮.১৯
আয়তন - ৯২৯.৪৩ একর	সূর্যনারায়ণপুর	২,৩৫৯.২৩
	চানপুর সাব-বিট	১১১.৯৯
	রাজেন্দ্রপুর পশ্চিম	১,১৩৮.১০
	মনিপুর	১,৩৬০.৭৬
	সালনা	২,৭০৫.৬১
	রানিগঞ্জ	৪৫.৫৯
	ভাওয়াল জাতীয় পার্ক	৯,২৫৭.৯৬

২. শ্রীপুর আয়তন - ২৪,০৫৬.৯৩ একর	শ্রীপুর সদর	৫,৫১৬.১৬
	সীমলাপাড়া	৩,৮৯০.৯৬
	রাথুরা	৫,৪৪১.৫৭
	সাথ-ঘামাইর	৩,৭৮৯.৭৪
	ভিটিপাড়া (সাব-বিট)	৪১১.৬৪
	গোসিংগা	৩,৯৫২.৯৮
	কাওরাইদ	১,০৪৫.৮৮
৩. কালিয়াকৈর	মৌচাক	২,০৯৬.৫৫
	বোয়ালি	৩,৭৬৮.৫৮
	চন্দ্রা	২,৮৯২.০৮
	বারইপাড়া	১,৩৪৯.৩৯
	কাশিমপুর	৮৪০.৮৪
	মির্জাপুর	১৮৯১.২৯
৪. কাচিঘাটা সদর আয়তন ৯,২৫৭.৯৬ একর	কাচিঘাটা	৯৬৫৭.৯৬
	মোট	৬৫,৮০৭.২৪ একর

বৃহত্তর ঢাকা জেলার বনভূমির প্রধান প্রধান বৃক্ষ ও উদ্ভিদ

কাঠ জাতীয় গাছ :

শিমুল, হিজল, বট, পামর, কাঞ্চন, গজারি, কড়ই, আমলকি, ময়না, নিম, কাঁঠাল, যোগিনীচক্র, বহেরা, বাহনা, সেগুন, কদম, কুটেশ্বর, জারুল, চম্বল ইত্যাদি।

জ্বালানি জাতীয় গাছ :

শিরিশ, হিজল, পাকুড়, বট, গেওয়া, গোলাপ জাম, তিতাজাম, পলাশ, গাব ইত্যাদি।

তৃণ বা গুল্ম জাতীয় গাছ :

ধুতরা, ছন, কচু, কুমারীলতা, বেত, বাঁশ ইত্যাদি।

লতা জাতীয় গাছ :

লজ্জাবতী, মাধবলতা, চামেলী, স্বর্ণলতা, গোয়ালিয়ালতা ইত্যাদি।

ফল উৎপাদন জাতীয় গাছ :

খেজুর, বেল, পেয়ারা, নারিকেল, জাম, আম, হরিতকি, আমলকি, ডুমুর, সাজনা, চালতা, আমবুট, তেঁতুল, কুল, কাঁঠাল, আনারস ইত্যাদি।

বনভূমির কোন কোন অংশে চাষ আবাদ হচ্ছে। বিশেষ করে যেসব অঞ্চলের মাটি উর্বর এবং চাষের উপযোগী। এইসব অঞ্চলের কৃষিজ দ্রব্যগুলি হল :

১. শস্যজাতীয় ফসল— ধান, গম, কাউন, ভুট্টা, যব, ছোলা, মটর, মুসুর, মুগ, খেসারি, সরিষা, তিষি, তিল, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম ইত্যাদি।
২. তন্তুজাতীয় ফসল— পাট, মেসতা ও তুলা।

৩. **ফলজাতীয় ফসল**— আম, কাঁঠাল, আনারস, নারিকেল, বাদাম, কলা পেয়ারা, জামরুল, পাতিলেবু, জাম, বেল, পেঁপে, সুপারি, জাম্বুরা ইত্যাদি।
৪. **মসলাজাতীয় ফসল**— হলুদ, মরিচ, আদা, রসুন, ধনিয়া, তেজপাতা ইত্যাদি।
৫. **তরিতরকারি**— আলু, পিঁয়াজ, করলা, বরবটি, কপি, ঢেড়োস, ডাটাশাক, লালশাক, সীম, কাকরোল, ওলকচু, বেগুন, পুঁইশাক, কুঁমড়া, মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি।

ঢাকা বনাঞ্চলের চরম ক্ষতি সাধন করেছিল এইসব অঞ্চলের জমিদাররা। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে জমিদারি সরকারি অধিগ্রহণের আগেই মূল্যবান গাছপালা কেটে জমিদাররা প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিল। বনভূমি এলাকার বেআইনি বসতি এবং বনভূমি পরস্পর সংলগ্ন হয়ে আছে। বসতির লোকজন জঙ্গলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করছে বছরের পর বছর। জেলার বনভূমির মধ্য দিয়ে গেছে ঢাকা মনমনসিংহ রেল সড়ক। এই সড়কপথে কাঠ পাচার হয় নিয়মিত। যা প্রতিহত করার মত উপযুক্ত পরিকাঠামো এখনও গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। কালবৈশাখি, টর্নেডো বা ঘুর্ণিঝড়ে প্রতিবৎসর গাছপালার ক্ষতি হয়। পশুচারণের কারণেও জঙ্গলের ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে।

বনদপ্তর বনাঞ্চল থেকে ৪০ বৎসর বয়স্ক গাছ কাটার অনুমতি দেয়। গাছগুলিকে চিহ্নিত করা হয় একবছর আগে। তারপর বিক্রি হয় নিলামে। বেশির ভাগ গজারি গাছই কাটা হয়। গাছ কাটার পর সেইসব কাঠ সড়ক বা নদীপথে নির্দিষ্ট ডিপোতে নেওয়া হয়। সেখানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ক্রেতারা কাঠ কিনে নিয়ে যায়। যে পরিমাণ গাছ কাটা হয়, সেই পরিমাণ গাছ পুনঃরোপনের ব্যবস্থা করা হয় তৎপরতার সঙ্গে।

বনবিভাগের আয় ব্যয়ের হিসাব

বৎসর	আয় (টাকা)	ব্যয় (টাকা)
১৯৫০-৫১	৩,৭০,১২৩.০০	২,৪৯,৪৪৪.০০
১৯৫৫-৫৬	১২,৪৪,৮৫৩.০০	৯৩,২৭৫.০০
১৯৫৯-৬০	১২,০৭,৪৭৮.০০	১,৯৬,২৮৪.০০
১৯৬১-৬২	১৫,০২,৪৮২.০০	২,০৫,৪৫৪.০০
১৯৭৯-৮০	৭,৯২,০৬১.০০	২২,৭৫,২৪৫.০০
১৯৮০-৮১	৬,৮৬,৩৬৩.০০	১৭,৫২,৫০৩.০০
১৯৮৩-৮৪	২৩,৪৬,৫৫৮.০০	৬৩,১৪,৮০৭.০০
১৯৮৫-৮৬	১৮,৭০,২৬৯.০০	৪৭,৯৩,৭৩৫.০০
১৯৮৮-৮৯	২১,৭৪,৪৪৮.০০	৫১,৫৬,৮৪৫.০০
১৯৯০-৯১	১৯,১৮,২৯৯.০০	৫৮,৪১,৬৩৮.০০

[illegible] মহাসড়ক, কাপাসিয়া-মির্জাপুর রোড, কাপাসিয়া-চাদপুর রোড এবং আরো কয়েকটি নতুন সড়ক নির্মিত হওয়ায় অরণ্য সম্পদ রপ্তানি সহজ সাধ্য হয়েছে।

কেবলমাত্র কাঠ রপ্তানিই নয়, বন বিভাগ পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য বহু মনোরঞ্জক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যার থেকে বছরে আয়ের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকারও বেশি।

বৃহত্তর ঢাকা জেলার বনাঞ্চলের প্রধান প্রধান উদ্ভিদ ও তার ব্যবহার

গাছের স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গাছের ব্যবহার
১. কুচ	Abrus Precatorius	ওষুধ তৈরিতে লাগে। বীজ দিয়ে সোনা ওজন হয়।
২. বেল	Aegle markles	ফল খায়। মারমেলি তৈল তৈরি হয়।
৩. শিরিশ	Alizia marinata	জ্বালানি, কাঠ, কয়লা ও ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
৪. কড়ুই	Albizzia precera	কাঠ বেশ শক্ত। নৌকার দাঁড়, আসবাবপত্র এবং কৃষি সরঞ্জাম তৈরিতে লাগে।
৫. কদম	Anthecephalus indica	হালকা কাঠ। দেশলাই বাক্স, চায়ের পেটি ও হালকা কাঠ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
৬. চম্বল	Artecarpus chap asha	শক্ত কাঠ। নৌকা তৈরিতে প্রধানত ব্যবহৃত হলেও, আসবাবপত্র, পাট কলের ববিনের হাতল ছাড়াও কাঠ খোদাই-এ লাগে।
৭. নিম	Azaderachta indica	ওষুধ, আসবাবপত্র তৈরি হয়।
৮. হিজল	Barringtenia acutangula	নৌকা, ঘরবাড়ি নির্মাণ ও ধানের মথুল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
৯. শিমুল	Bembax eciba	দিয়াশলাই ও বাক্স তৈরি হয়।
১০. পলাশ	Buttea mensspermna	বারুদ, কাঠকয়লা তৈরিতে লাগে। গাছের আঠা থেকে চামড়া পাকা করার রং তৈরি হয়।
১১. বেত	Calamas tenuis	আসবাবপত্র তৈরিতে লাগে।
১২. স্বর্ণলতা	Cuseatayces lemer	পরগাছা। ওষুধ তৈরিতে লাগে।
১৩. ধুতরা	Datura metel	পাতা ও ফল ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।
১৪. চালতা	Dillenia indica	ফল খাওয়া হয়। গাছ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
১৫. জাম	Syzgium canini	কাঠ থেকে আসবাবপত্র বানান হয়। ফল সুস্বাদু ও উপকারী। বীজ থেকে ওষুধ তৈরি হয়।
১৬. বট	Ficus bangalensis	জ্বালানির কাজে লাগে। জল সেচের দোন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
১৭. ডুমুর	Ficus glemerats	বাকল ও ফল থেকে ওষুধ তৈরি হয়।
১৮. ময়না	Garuga pinnate	আসবাবপত্র তৈরি ছাড়াও ঘরের খুঁটি হিসাবে বেশ মজবুত।
১৯. গমর	Garuga pinnata	একমাত্র আসবাব তৈরিতে লাগে।
২০. কুটেশ্বর	Helannhena	বাকল ও বীজ থেকে ওষুধ তৈরি হয়।
২১. জারুল	Lagerstraami speciad	কাঠ হিসাবে উৎকৃষ্ট।
২২. আম	Mongifer indica	জনপ্রিয় সুস্বাদু ফল। কাঠ নিম্নমানের। জ্বালানি ও প্লাইউড হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
২৩. লজ্জাবতী	Miness Pudice	

গাছের স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গাছের ব্যবহার
২৪.সাজনা	Meringols farns	ফল খাদ্য। গাছ ও পাতা ওষুধে ব্যবহার করা হয়।
২৫. আমলকি	Phyllnthus	ফল সর্ব রোগের ঔষধ। মহাউপকারি। ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বাকলও ওষুধ তৈরিতে লাগে। ডাল দিয়ে কাঠকয়লা তৈরি হয়। চুলের কলপ তৈরির কাজে লাগে।
২৬. কুসুম	Schlcichiss tnijuma Syn. Olcosa	বীজ থেকে তেল তৈরি হয়। কাঠকয়লা তৈরি হয়ে থাকে।
২৭. হরিতকি	Tanmegll b	ওষুধ তৈরিতে লাগে। কাপড়, উল ও চামড়া রঙের কাজে লাগে।
২৮. যোগিনিচক্র	Gmalas	—
২৯. শাল/গজারি	Sloncur	খুব শক্ত কাঠ। ঘরের খুঁটি, পাইলিং এর খুঁটি, বৈদ্যুৎতিক খুঁটি ছাড়াও আসবাবপত্র তৈরি হয়। *

জীবজন্তু

ঢাকা জেলার বনাঞ্চলে এক সময়ে চিতাবাঘ, ভল্লুক, বিভিন্ন জাতের হরিণ ও হাতি দেখা যেত। সে সব এখন বিলুপ্ত। সরীসৃপদের মধ্যে অজগর, বিভিন্ন রকম সাপ ও গুইসাপ এখনও দেখা যায়। পাখির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— চিল, বাজ, ধনেশ, কাক, শালিক, কোকিল, শকুন, টিয়া, ঘুঘু, পেঁচা, দোয়েল, হরিতল, বাবুই, চড়াই, বনমুরগি। বন্যপ্রাণীর মধ্যে ভোদড়, শজারু, বানর, হনুমান, বনবিড়াল, উদবিড়াল, খরগোস, বেজি, কাঠ বিড়াল এখনও দেখা যায়।

"টোপোগ্রাফি অফ ঢাকা"-য় জেমস টেলর জেলার জীবজন্তু সম্পর্কে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সেই বিবরণে বহু পশুপাখি ও সরীসৃপের উল্লেখ করেন যার বেশিরভাগই হারিয়ে গেছে। তবুও ইতিহাস অনুসন্ধিৎসুর কাছে যার মূল্য অপরিসীম।

টেলর লিখেছিলেন, গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলের অন্যান্য অংশের মতই এখানকার জীবজন্তু। জেলার উত্তর ও দক্ষিণাংশের প্রাকৃতিক গঠনে স্বাভাবিক বৈসাদৃশ্যের কারণে গাছপালা ও জীবজন্তুর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্তমান। উত্তরাংশে শিকারপ্রাণী ও বিভিন্ন ধরনের চতুষ্পদ জীবজন্তুর বসবাস বেশি। যা দক্ষিণাংশে একেবারেই কম। দক্ষিণাংশে জলচর পাখি, সরীসৃপ ও বিভিন্ন প্রকার মাছ দেখা যায়। এইসব এলাকায় চোখে পড়ে বানর, বাদুড়, উড়ন্ত শেয়াল, ভাট, ম্যাগাডারমা ও ভেসপারটিলিও পেকটাস। শেষ দুটি দুরকমের বাদুড়। তাছাড়া এখানে কস্তুরী ইঁদুর, বেজি, গন্ধগোকুল বা খাটাস দেখা যায়।

সে সময়ে উত্তরের জঙ্গলে বাঘ ও চিতাবাঘ শিকারে সরকার পুরস্কার ঘোষণা করত। এরা জনবসতি এলাকায়, গ্রামাঞ্চলে মাঝে মাঝে হানা দিত। মোঘল আমলে বাঘ শিকারের জন্য জায়গির দেওয়া হত। সরকার বাঘ শিকারের অনুমতি দেয় ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে। ২৭০টি

*সম্পূর্ণ তথ্য ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯৩ থেকে নেওয়া।

বাঘের চামড়া শহরে আনা হয় ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে সরকারি পুরস্কারের আশায়। বাঘ শিকারিরা সাধারণত বিষ মাখানো তীর ব্যবহার করত। প্রচুর বুনোশুয়োর ছিল, যারা ক্ষতি করত ফসলের। উত্তরে আটিয়ার পরগনার জঙ্গলে ছিল হাতির বাসভূমি। হাতি ছিল এই জঙ্গলের আদি বাসিন্দা। এরাও গ্রামে ঢুকে গাছপালা ও ফসলের ক্ষতি করত। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে খেদা তৈরি করে কাশিমপুরে ২১টি হাতি ধরা হয়। চট্টগ্রামের জঙ্গল থেকে বছরে ৮০টি হাতি ধরা হত। তাদেরও নিয়ে আসা হত কাশিমপুরের হাতি রাখার আস্তানায়। বেশ কয়েকরকম হরিণ, শিয়াল, খেঁকশিয়াল, খরগোস, কালো খরগোস বা শশক, মেঠো ইঁদুর, শজারু, ভোঁদড় বা উদ্‌বিড়াল, নদীতে শুশুক দেখা যায়। চারটি প্রজাতির হরিণই চোখে পড়ে সব থেকে বেশি।

১. Gous deer | ২. Cervus hippelaphus
৩. Sumbu | ৪. Cervus aristotelis
৫. Cervus axis | ৬. Cervus Muntjack
৭. Black Russa of Bengali | ৮. Barking Deer

টেলর আরও বলেছেন—এই সব হরিণ সর্ষে ও তিলের চাষে ক্ষতি করত। ভাওয়াল অঞ্চলে কুকুর দিয়ে হরিণ শিকারের প্রথা চালু ছিল। জলাভূমির আশপাশে বুনোশুয়োর আর শহরের আশপাশের জঙ্গলে দেখা যায় শিয়াল ও খেঁকশিয়াল। কালো খরগোস বা শশক য়ুরোপীয়রা শিকার করে। মেঠো ইঁদুর মাটির নিচে সুড়ঙ্গ করে ঘর বানায় এবং তার মধ্যে ধান সঞ্চয় করে। গ্রামের মানুষ এইসব গর্ত খুঁড়ে ১/২ মণ ধান পায়। বাগান আর গ্রামের আশপাশের উঁচু ঢিবিতে বাস করে শজারু। এরাও ফসলের ক্ষতি করে। হিন্দুরা শজারুর মাংস খায়। শজারুর গর্তের মুখে ধোঁয়া দিয়ে তাদের বের করে আনা হয়। শজারুর কাঁটায় চিরুণি ও গয়না তৈরি হয়ে থাকে। উত্তরের পাহাড়িয়া অঞ্চলে বাস করে ভাল্লুক। নদীতে আছে ভোঁদড়। ফরিদপুর, ময়মনসিংহ এবং শ্রীহট্টের নদীতে সব থেকে বেশি দেখা যায়। ভোঁদড়ের চামড়ার জন্য তাদের শিকার করা হয়। ভোঁদড় শিকারের সময় পোষা ভোঁদড়কে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। চামড়া রপ্তানি হয় চীন এবং ভুটানে। ভোঁদড়ের মত শুশুকও নদী থেকে শিকার করা হয়। বিশেষ করে শীতকালে। শুশুকের মাংস খায়। তেল জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে। আবার গ্রামের ডাক্তাররা কিনে নেয়। কারণ, শুশুকের তেলে বাতরোগের ওষুধ।

টেলর যেসব পাখির উল্লেখ করেছেন : শকুন, কাক, চিল, ঈগল, পেঁচা, দোয়েল, নানান প্রজাতির মাছরাঙা, দুর্গাটুনটুনি, বাবুই, তোতা, মানিকজোড়, বক, হাড়গিলা, কলিমপাখি, গেলিনুল কোড়া, কাদাখোঁচা, ময়ূর, কোয়েল, চকোর, জলমোরগ, পেলিক্যান, নানারকম হাঁস দেখা যায় প্রচুর। এইসব পাখির মধ্যে আছে নানা প্রজাতি। বেশ কিছু পরিযায়ী পাখিও দেখা যায়। নীল ও লালরঙের মাছরাঙা শিকার হয় চামড়ার জন্য। এই অঞ্চলে বাকরগঞ্জ ও ময়মনসিংহের মগরা এসে মাছরাঙা ধরে। সেই পাখির চামড়া পরিশোধন করে রপ্তানি হয় চীনে। এই চামড়ায় সেখানে রাজকর্মচারীদের পোশাক তৈরি হয়।

নানা জাতের কচ্ছপ, কুমির, ঘড়িয়াল, সাপ ও ব্যাঙের বিবরণ দিয়েছেন টেলর। তাছাড়া 'পার্শ্ববর্তী' জেলা সমূহ থেকে আগত জীবজন্তুর উল্লেখ করেছেন। ত্রিপুরা জেলার গয়াল আর প্যাঙ্গোলিন, শ্রীহট্টের ছুঁচো, বানর আর শজারু এখানে দেখা যায়। তাছাড়া ময়ূরও আসে। এই অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস গারোপাহাড়ে ওরাংওটাং আছে। এদের বলা হয় বনমানুষ। কিন্তু এরা উল্লুক নয়। গারোপাহাড়বাসীরা উল্লুক বা জিবন ধরতে পটু। তারা ভালভাবেই এই পশু চেনে। তাদের ওরাংওটাং চিনতে ভুল হবার কথা নয়। এ ব্যাপারে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে কারুথারস অনুসন্ধানে জানতে পারেন, ওরাংওটাং এখানে দেখা গেলেও, তা খুবই বিরল। অনেক আগে এরকম একটা প্রাণী ধরাও হয়েছিল। আবুল ফজলকে এরকম একটা প্রাণী

বাংলা থেকে পাঠান হয়। তিনি এদের বানর জাতীয় প্রাণী বলেছেন। বানরের মুখের সঙ্গে এদের মিল রয়েছে। কিন্তু এদের লেজ নেই। সোজা হাঁটে। গায়ে কালো লোম।

ডবলু. ডবলু. হান্টারের বিবরণে আছে : "Alligators are found in most of the large rivers, and deaths by these animals are not unfrequent. The *Gharial,* or fish-eating crocodile often attains a large size. Several species of turtles are found ; they are speared by fishermen and brought to market, but are only eaten by low-caste Hindus. Among snakes, the cobra (*Naja*) is not very common. The *sanda, girgit, bhamani,* and monitor (*gosap*) are all found in the District, but principally in the northern jungles. The *Python molurus* is not uncommon in the jungles near the town, and Dr. Taylor mentions one measuring twenty feet. The *Typhlops* is usually found in alluvial soil, and is sometimes mistaken, for an earth-worm. Among other species are comprised tree and water snakes, of which the latter are said to be very venomous. The frog, toad, and tree-frog are common. Among asticulata the principal are the scorpion and ceptipede but many other sorts and found, too numerous to mention.[১০]

নদনদী

ঢাকা জেলার নদনদী সম্পর্কে যতীন্দ্রমোহন বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনায় ব্রহ্মপুত্র, লৌহিত্য, মেঘনাদ, পদ্মা, কীর্তিনাশা, ধলেশ্বরী, বানার, লাখ্যা, বুড়িগঙ্গা, যমুনা, তুরাগ, বংশী, বালু, ইছামতী, এলামজানি, মীরপুরের নদী, আলম নদী, ভুবনেশ্বর, গাজিখালি, হীরানদী, কালীগঙ্গা নদীর উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া এইসব খাল তিনি উল্লেখ করেছেন : দোলাই খাল, মেন্দিখাল, তাতিবাড়ির খাল, আকালের খাল, যাত্রাবাড়ির খাল, পাইনার খাল, আড়ালিয়ার খাল, ত্রিবেণীর খাল, জোলাখালি, করিমখালি, শ্রীনগরের খাল, গোয়ালখালির খাল ও কুচিয়ামোড়ার খাল, মৈনটের খাল, মীরকাদিমের খাল, ইলিসামারীর খাল, ব্রাহ্মণখালির খাল, ঘিয়রের খাল, শিববাড়ির খাল, তেতুলঝোড়ার খাল, হরিণাকুলের খাল, চুড়াইনের খাল, গালিমপুর-গোবিন্দপুরের খাল, কিরঞ্জির খাল, ভাসনদের খাল এবং ভুরাখালি। তাছাড়া বিল ও ঝিল প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন যতীন্দ্রমোহন। তার বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। তার আগে তিনি লেখার কাজ শেষ করেন। ধরা যেতে পারে, যতীন্দ্রমোহন ১৯০০ খ্রিঃ পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বইটি রচনা করেন। এইসব নদী ও খাল সারা বছর পরিবহনযোগ্য এবং যাতায়াত উপযোগী ছিল না। তাছাড়া ভারি ওজনের নৌযান চলাচলের উপযোগী ছিল না সব জলপথ।

যতীন্দ্রমোহনের আগে ১৮৭৭ খ্রিঃ প্রকাশিত "স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গলের" ঢাকা খণ্ডে ডবলু. ডবলু. হান্টার উল্লিখিত নদীগুলি হল ১. মেঘনা, ২. গঙ্গা বা পদ্মা, ৩. যমুনা, ৪. আড়িয়াল খাঁ, ৫. কীর্তিনাশা, ৬. ধলেশ্বরী, ৭. বুড়িগঙ্গা, ৮. লাখ্যা, ৯. মেন্দিখাল, ১০. গাজিখালি, ১১. হিলসামারি, ১২. বংশী, ১৩. তুরগ, ১৪. তুঙ্গি, ১৫. বালু এবং ১৬. পুরনো ব্রহ্মপুত্র।

জেমস টেলর ১৮৯৩ খ্রিঃ "টোপোগ্রাফি অফ ঢাকায়" যেসব নদীর কথা বলেছেন, তার মধ্যে আছে : ১. ব্রহ্মপুত্র, ২. মেঘনা, ৩. ঝিনাই বা যমুনা, ৪. ধলেশ্বরী, ৫. বুড়িগঙ্গা, ৬. বংশী, ৭. বানার, ৮. শীতলাখ্যা এবং ৯. ইছামতী।

'ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার' ১৯৯৩-এ আমরা নদী সম্পর্কে জানতে পারি : ১. পদ্মা, ২. পুরনো ব্রহ্মপুত্র, ৩. বংশী, ৪. তুরাগ, ৫. বেনার, ৬. লাখ্যা, ৭. বালু, ৮. যমুনা, ৯. ধলেশ্বরী, ১০. বুড়ি এবং ১১. মেঘনা। "বৃহত্তর ঢাকা জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত প্রধান চারটি নদী হচ্ছে ঃ পদ্মা, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, যমুনা (নতুন ব্রহ্মপুত্র) ও মেঘনা। এই সকল নদীর উপ-নদী ও শাখানদী বৃহত্তর ঢাকা জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বর্তমান জল নির্গমণ প্রণালীর (Drainage pattern) সৃষ্টি করেছে। পূর্বে এই এলাকা দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলি বর্তমানের মত ছিল না। বিভিন্ন সময়ে নদীগুলি বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। পূর্বে বৃহত্তর ঢাকা জেলার উপর দিয়ে আত্রাই-ঘুর নদী এবং এর উপ ও শাখা নদী প্রবাহিত হত। বর্তমানে এই নদীর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ধারা অব্যাহত না থাকলেও এর অস্তিত্ব বৃহত্তর ঢাকা জেলায় এখনও বর্তমান। ১৮০০ শতাব্দী পর্যন্ত এই নদী নারায়ণগঞ্জের নিকট মেঘনায় মিলিত হত।" (পৃঃ ১২-১৩)

জেমস টেলর লিখেছিলেন অসংখ্য নদীনালা ছড়িয়ে আছে দেশের ভিতরে। রেনেলের ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের জরিপ থেকে জানা যায় জেলার দক্ষিণের বেশ কিছু বড় নদীর গতিপথের ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে ছোটখাট নদীনালার। পলি জমে তৈরি হয়েছে বিস্তৃত ভূমিখণ্ড। রেনেলের ম্যাপে যে নদীকে কালিগঙ্গা বলা হয়েছে, সেই নদী বর্তমানে কীর্তিনাশা ও শ্রীপুর নদী হিসাবে পরিচিত। মলফৎগঞ্জ ও রাজনগরের সামান্য উত্তরে প্রবাহিত কীর্তিনাশা। ৩/৪ মাইল প্রশস্ত। এই কীর্তিনাশাই হল গঙ্গার প্রধান শাখা। রাজনগর খালের মোহনা এবং অপর তীরবর্তী শ্রীপুরের মধ্যবর্তী অংশে নদী এমন খরস্রোতা, যে বর্ষাকালে এই স্থানে ছোট ছোট নৌকা চলাচল খুবই বিপজ্জনক। কীর্তিনাশা মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে কার্তিকপুরের উত্তরে। রেনেলের ম্যাপে উল্লিখিত জয়রামপুর, কৃষ্টনাপুর ও পোমোমরা দ্বীপাঞ্চলই বর্তমানে বালিশিরা নামে পরিচিত। গঙ্গার অপর বড় শাখাটি হল নয়াভাঙানি। এই নদী ঢাকার কোল ঘেষে বাকরগঞ্জে প্রবেশ করেছে। নদীটি আবার মাছুয়াখালির নিম্নভাগ হয়ে সাদেকপুর গ্রামের সামান্য দক্ষিণে মেঘনায় মিশেছে। মাঝামাঝি স্থানে নদীটি দুটি বৃহৎ ধারায় প্রবাহিত। বিস্তৃত সমতলভূমি পেরিয়ে দাদপুরের কাছে মিলিত হয়েছে লাইতু নদীতে। নয়াভাঙানি এবং কীর্তিনাশার দৈর্ঘ্য প্রায় সমান। রেনেলের ম্যাপে প্রদর্শিত গঙ্গার মূল শাখা গৌরনদী থেকে বরিশাল স্টেশনের কাছ পর্যন্ত শুকিয়ে প্রায় ভরাট হয়ে গেছে। অবশ্য এর মাঝামাঝি যেসব অগভীর জলধারা এবং খালনালা ইত্যাদি আছে, তা দিয়ে চলাচল করে ছোট ছোট নৌকা।

মেঘনা : *[বর্তমান সংস্করণের ৬১৩ পৃষ্ঠা দেখুন]*

The MEGHNA, which forms the eastern boundary of the District, is continually changing its course, although not to any great extent. Its banks are shelving and cultivated and the bed generally sandy. The Meghna forms no important islands within the District, but has many alluvial formations (*Chars*) in its course. It nowhere expands into lakes. It is subject to the influence of the tides during eight months of the year, but in the rainy season the tide loses its power. The *bore*, which is very considerable at the mouth of the river, does not reach as high up as this District. The river is nowhere fordable at any period of the year. Its principal tributary is the Dhaleswari a large river which enters the District in the north-west near the junction of the Jamuna and Ganges rivers and flows generally in a south westerly direction till it empties itself into the

Meghna at Munshiganj. The other important tributary of the Meghna on its west bank is the old Brahmaputra, which flows along the north-eastern boundary of the District, and runs into the Meghna at Bhairab-bazar. The portion of the river which lies within Dacca District is a comparatively insignificant stream, navigable by large boats only during the rainy season. A branch of this river called the Brahmputra creek, flows in a south-westerly direction though the District till it falls into the Dhaleswari at a place called Kalagachha, near the junction of that river with the Meghna. It is a small and unimportant stream, and only noted for a fair held on its banks at Nangalband. In the hot season before the rains, the river exhibits only a dried-up bed with a muddy a sandy bottom. It is for double nearly throughout its whole course during six months of the year. A navigable arm of the Meghna, known as the Mendi-Khali, communicate with the Brahmaputra at Kakiar Tek.[১২]

"যমুনা নদীমালার (Jamuna System) পূর্বাংশের বিভিন্ন নদী ভারতের আসাম এবং সংলগ্ন রাজ্য হতে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। অতঃপর মেঘনা ধারার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মেঘনা নদী চাঁদপুরের নিকট পদ্মা ও যমুনার সম্মিলিত ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু রেনেলের মানচিত্র হতে জানা যায় যে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার সংগমস্থল বাজিতপুরের সামান্য দক্ষিণে ছিল এবং গঙ্গা ও মেঘনা চাঁদপুরের নিকট মিলিত না হয়ে স্বতন্ত্র ধারারূপে বঙ্গোপসাগরে পড়ত। মেঘনা নদী ভৈরব বাজারের নিকট হতে ঢাকা ও কুমিল্লা জেলা সীমানা বরাবর প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরের নিকট পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মেঘনা নদীর এই অংশকে মধ্য মেঘনা নদী বলা হয়। ভৈরব বাজারের নিকট পুরাতন ব্রহ্মপুত্র এবং মুন্সিগঞ্জের নিকট ধলেশ্বরী নদী মেঘনা নদীতে পড়েছে। মেঘনা একটি চরাযুক্ত সর্পিল নদী। এই ধরনের নদীকে এনাস্টোমোজিং (Anastomosing) নদী বলা হয়। কারণ এই নদীর বাঁক ও চরগুলি স্থায়ী। গত ১৫০-২০০ বছরে মেঘনা নদী কিছুটা পূর্বে সরে গিয়েছে। বিশেষ করে, রায়পুর, নরসিংদি ও নারায়ণগঞ্জ এলাকার পূর্বাংশে। মেঘনা নদী পদ্মা ও যমুনা অপেক্ষা কম পলি বহন করে থাকে। এই নদী দিয়ে মে হতে অক্টোবর পর্যন্ত প্রবাহের পরিমাণ ২৫০,০০০ কিউসেক। এই নদী সব সময়ের জন্য নৌ-চলাচলের উপযোগী এবং ঢাকা জেলার গুরুত্বপূর্ণ শহর নরসিংদি এই নদীর তীরে অবস্থিত।"[১৩]

গঙ্গা বা পদ্মা : *[বর্তমান সংস্করণের ৬১৩ পৃষ্ঠা দেখুন]*

The GANGES or PADMA River forms the western and south-western boundary of the District, and separates it from Faridpur and Bakarganj. Instead of following its course as laid down by Rennel in 1780, which joined the Meghna at Mendiganj, it now discharges the great body of its water though two channels considerably to the north of that place. The first of these is the Kirtinasa, which runs a little to the north of Rajnagar, and is now considered the principal branch of the Ganges. It is from three to four miles in width, and has a very strong current at its most contracted part, rendering navigation difficult during the rains. The Kirtinasa joins the Meghna to the north of Kartikpur. The second channel of the Ganges is the Naya Bagni, further south, and within the Bakarganj District. The original channel of the

Ganges is now almost dry in the hot months, the whole of its bed being filled up with alluvial accretions, divided by broad shallows ; a few channels are navigable, but only by small boats. The course of the Ganges within the District is very variable, and is said to alter as much as four, five, or six miles in a single year, cutting away its north and south banks with equal impartiality. About the middle of its course it forms the island known as Char Mukundia. The river has a sandy, muddy bottom, its banks in the dry season being generally shelving, and in the rains usually abrupt. The Ganges throws off two branches within the district, the Hilsamari and the Arial-Khan. The first named river is only navigable by boats of two tons burden, but if it were not for a bar across its entrance, it would be navigable the whole year by boats of any size. This river connects the Ganges with the Dhaleswari.[১৪]

"...বাংলাদেশের ভিতর গঙ্গা/পদ্মা সোজা দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরের নিকট মেঘনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, গড়াই প্রভৃতি শাখানদী পদ্মা হতে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ—দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে। গত ৪ শত বছরের মধ্যে পদ্মার গতিপথের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও পদ্মার নিম্ন অববাহিকা ছিল বর্তমান গতিপথের অনেক দক্ষিণে। পদ্মা সে সময়ে ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বর্তমান চাঁদপুরের প্রায় ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে সাহবাজপুর (দক্ষিণ) দ্বীপের উত্তরে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হত। পদ্মা নদী আরিচার কিছুটা উত্তরে শিবালয় উপজেলায় বৃহত্তর ঢাকা জেলায় প্রবেশ করে বৃহত্তর ঢাকা-ফরিদপুর সীমানা বরাবর প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরের নিকট মেঘনায় মিলিত হয়েছে। ইছামতী হচ্ছে ঢাকা জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত পদ্মার প্রধান শাখানদী। পূর্বে বুড়িগঙ্গা ও কালিগঙ্গা পদ্মার শাখা ছিল। কিন্তু ২০০ বছর পূর্বে যমুনার গতিপথ পরিবর্তন হওয়ার জন্য এখন এই নদীগুলি আর পদ্মার শাখা নদী নাই। বিভিন্নভাবে পদ্মার প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য বর্তমানে এর বুকে অসংখ্য চর জেগেছে। পূর্বে এটা একটি সর্পিল নদী বলে পরিচিত হলেও বর্তমানে ধীরে ধীরে এটা চরাযুক্ত (Braided) নদীতে পরিণত হচ্ছে। গঙ্গা-পদ্মা নদীর দৈর্ঘ্য ২৫৯২ কি.মি. এবং জল নির্গমন এলাকা ৬৮১২০০ কি.মি.। এর গড় প্রবাহ শুকনা মৌসুমে প্রায় ৮০,০০০ কিউসেক এবং বর্ষার সময় ৭০০,০০০ কিউসেক। এই নদীর তীরে ঢাকা জেলার শিবালয়, হরিরামপুর, দোহারের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অবস্থিত।"[১৫]

ইছামতী : *[বর্তমান সংস্করণের ৫৮ ও ৬০ পৃষ্ঠা দেখুন]*

গঙ্গার একটি শাখানদী ইছামতীর গতিপথ ২০০ বছরেও অপরিবর্তিত থেকে গেছে। গঙ্গার একটি শাখা বয়াখোলার কাছে ধলেশ্বরী নদীতে এবং অপর শাখা লৌহজং থানার দিগহলির কাছে মিলিত হয়েছে পদ্মার সঙ্গে। জেমস টেলরের বিবরণে আছে গঙ্গা ও ধলেশ্বরীর মধ্যবর্তী নিম্নাঞ্চল দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে চড়ন খাল মোহনার বিপরীতে ইছামতীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর সম্মিলিত স্রোত আবার বিভক্ত হয়েছে দুটি শাখায়। রেনেলের ম্যাপে এর একটি শাখাকে ছোট নদীর মত দেখান হয়েছে—যার নাম তুলসিগঙ্গা। বর্তমানে এটিই ইলশামারির প্রধান শাখা। অপর শাখাটি ইছামতী নামেই পাটেরগোটার কাছে ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিশেছে। ইছামতী হল বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী ও পাটেরগোটার মিলিত ধারা, যা পাটেরগোটার কয়েকমাইল পূর্বে ফিরিঙ্গিবাজারে মিশেছে মেঘনার সঙ্গে।

লাখ্যা : *[বর্তমান সংস্করণের ৬১৫ পৃষ্ঠা দেখুন]*

The LAKHMIA River leaves Brahmaputra at a place Colled Tok, at the northern boundary of the District, and flows in a southern direction till it empties itself into the Dhaleswari, about four miles from the junction of that river with Meghna. The Magistrate of the District states that the Lakhmia is one of the most beautiful rivers in Eastern Bengal. Its banks are generally high and well wooded and it never overflows them. It runs for about fifty miles through the red formation, and is remarkable for the purity and coolness of its water. The tide affects the river during five months of the year, but does not reach far up. It is not fordable at any time of the year except at one point, Ekdala. Owing to the silting up of the Brahamputra near the point where it enters the District, the volume of water in the Lakhmia is now on the decrease. It must, however always remain a large tidal stream, supplied from the Dhaleswari even if its northern outlet were entirely closed.[১৬]

"তিনটি নদীর মিলিত ধারা, যা চর লকপুরের নিচ হতে লক্ষ্যা নামে সর্পিলভাবে কালিগঞ্জ নারায়ণগঞ্জের উপর দিয়ে মদনগঞ্জের কিছুটা দক্ষিণে ধলেশ্বরী নদীতে মিলিত হয়েছে। তিনটি নদীর মধ্যে বেনার নামের দুইটি নদী যা আবারও বেনার নামে মিলিতভাবে বড় কাইকা নামক স্থানে একটি ধারায় দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। তৃতীয়টি পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সব চাইতে পুরাতন ধারা যা আরালিয়া (Aralia) নামক স্থানে বর্তমান পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের ধারা হতে পৃথকভাবে দক্ষিণ-পশ্চিমে সর্পিলভবে প্রবাহিত হয়ে লকপুরের উপর বেনার নদীতে মিলিত হয়েছে। এই তিনটি মিলিতধারা চর লকপুরের নিচ হতে লক্ষ্যা নামে সর্পিলভাবে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে মদনগঞ্জের দক্ষিণে ধলেশ্বরীতে মিলিত হয়েছে। তৃতীয় ধারা অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদীর পুরাতনতম ধারাকে পুরাতন লক্ষ্যা নদীর ধারা এবং চর লকপুরের ধারাকে নূতন লক্ষ্যা নদীও বলা হয়। এই নদী তেমন পলি বহন করে না এবং জোয়ারভাঁটা পরিলক্ষিত হয়। বালু নদী এর প্রধান উপ-শাখা, যা ডেমরা নামক স্থানে লাখ্যা নদীতে মিলিত হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকার মধ্যে বড় বড় নৌযান এই নদী দিয়ে চলাচল করে।"[১৭]

বর্ষা বা বন্যার সময় বালু নদী দিয়ে প্রবাহিত হয় তুরাগ ও লক্ষ্যা মধ্যবর্তী এলাকার অতিরিক্ত জলরাশি। বালু নদী কাপাসিয়ার কাছে সুতি নদীর দ্বারা লক্ষ্যা নদীর সঙ্গে যুক্ত এবং দক্ষিণ দিকে টঙ্গী নদী বালুকে যুক্ত করেছে তুরাগ নদীর সঙ্গে। নদীটি বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ।

বানার :

The BANAR River enters the District from the north, westward of the Lakhmia, and after flowing first in a southerly and afterwards in a westerly course, joins that river at Ekdala. The BALU is another tributary of the Lakhmia, and joins it on the west bank of Demra, a small stream, and which merely forms an outlet for marsh water. The BANSI River also flows into the district from the north, and drains the western side of the Madhupur jungles. It also empties itself into the Dhaleswari, but it is a small stream, and the traffic on it is almost entirely confined to the rainy season. The BURIGANGA River, on the northern bank of which the city of Dacca is situated, is a mere branch of the Dhaleswari, about twenty-six miles in length,

separating from it a short distance below Sabhar and rejoining the main stream at Fatulla, on the Narainganj road. The tide rises and falls to the extent of two feet at the town of Dacca. The tract between the Buriganga and Dhalaswari forms a large island known as Paschimdi. The Dolai creek connects the Balu river with the Buriganga, which it joins within the city limits. Attempts have been made to render it navigable throughout the year, but without permanent success. It is reported that the creek will always be liable to silt up in the middle, as each end of it is affected by the tide. [১৮]

যমুনা/ধলেশ্বরী : *[বর্তমান সংস্করণের ৬১৪ পৃষ্ঠা দেখুন]*

গোয়ালন্দর কাছে পদ্মার সঙ্গে মিশেছে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী যমুনা। ব্রহ্মপুত্র নদী চীন ও আসাম হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে যমুনা নামে পরিচিত। আঠার শতকের আগে যমুনা নদীর অস্তিত্ব ছিল না। তখন এই রেখা বরাবর ছিল জিনাই নামে একটি ছোট নদী। আঠার শতকের পর পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান পথে যমুনা নামে প্রবাহিত হচ্ছে। "যমুনা নদী চর কাতারি নামক স্থানের উপর দিয়ে বৃহত্তর ঢাকা ও পাবনা জেলার সীমানা বরাবর প্রবাহিত হয়ে শিবালয়ের পশ্চিমে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বর্তমানে আরিচার কাছে প্রতিবছর প্রচুর এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে। ধলেশ্বরী ঢাকার উপর দিয়ে প্রবাহিত যমুনার একটি প্রধান শাখানদী।" (ঢাকা জেলার গেজেটিয়ার ১৯৯৩। পৃঃ ১৬) এই গেজেটিয়ারে উল্লেখ করা হয়েছে— ধলেশ্বরী আগে ছিল আত্রাই-নদীমালারই বিশেষ শাখা। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র গতিপথ পরিবর্তনের ফলে যমুনার শাখানদীতে পরিণত হয়েছে। ধলেশ্বরীর উৎপত্তিস্থল হল ময়মনসিংহ জেলার পোড়াবাড়ির কাছে যমুনা। তারপর দক্ষিণপূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে মুন্সিগঞ্জের কাছে মেঘনায় মিশেছে। বংশীনদী ধলেশ্বরীতে মিশেছে মুন্সিগঞ্জের উত্তরে লাক্ষ্যা ও সাভারের সন্নিকটে। দৌলতপুর উপজেলায় একটি মৃতপ্রায় নদীকে বলা হয় পুরাতন ধলেশ্বরী। সম্ভবত এটি ছিল ধলেশ্বরীর পুরনো গতিপথ। যমুনা নদীর পলি ধলেশ্বরী দিয়ে এসে পড়ে মেঘনায়। ধলেশ্বরীর অন্যতম শাখানদী বুড়ি গঙ্গার উৎপত্তি হয়েছে সাভারের দক্ষিণে। কিছুদূর প্রবাহিত হওয়ার পর বেতচর নামক স্থানে আবার মিশেছে ধলেশ্বরীতে। আত্রাই-ঘুর নদীমালার অন্যতম বুড়িগঙ্গা নদী পরবর্তীকালে ধলেশ্বরীর শাখানদীতে পরিণত হয়েছে। উৎপত্তিস্থল শুকিয়ে গেলেও দক্ষিণাংশে নৌচলাচল করে। বুড়িগঙ্গা তীরেই ঢাকা জেলা সদর। মিরপুরের দক্ষিণে বুড়িগঙ্গায় মিলিত হয়েছে তুরগ নদী।

হ্রদ, বিল, কৃত্রিম খাল :

Throughout the whole of the District, and especially in the portion of the country adjoining the large rivers, numerous marshes have been formed by the changes in their course. These old beds are covered with rank vegetation, and do not deserve the name of lakes. The artificial water courses are as follow : (1) The Taltala *Khal*, said to have been dug by Raja Rajballabh to facilitate communication between Rajnagar and Dacca. This watercourse extends from Bahar on the Padma to Taltala on the Dhaleswari, but has now been allowed to silt up, so that it is only open during four months of the year for large boats. It effects a saving of about twenty or twenty-five miles on the outer route between Barisal and Dacca, besides avoiding the somewhat perilous navigation of the large rivers. The Collector is of opinion that this

canal would pay well if it were re-dug, tolls being levied to meet the cost. (2) The Dolai *Khal* is a short cutting of about four miles, and unites the waters of the Balu and Buriganga rivers. It shortens the commnication between Maimansinh by about twenty two miles, but is only open for nine months in the year. Government has spent about £2500 on this work, and the yearly net profit is now said to amount to about £400. If it could be kept open all the year, the profits of course would be much larger. There are no rivers or non-navigable streams with any descents or rapids sufficient to render them available for the purpose of turning machinery. None of the rivers or streams. contain rapids or other obstructions to navigation. Irrigation is not used, except to a very small extent, in the northern parts of the District and the river water is nowhere artificially diverted for this purpose. The annual loss of life from drowning is stated to be about four hundred, chiefly children, who, during the rains, are allowed to run about close to dangerous holes, from which earth has been taken for the purpose of forming a mound (*bhiti*) upon which the houses are built.[১৯]

যোগাযোগ ব্যবস্থা : *[বর্তমান সংস্করণের ৬৪৭-৬৪৮ এবং ৬৬৫ পৃঃ দেখুন]*

ঢাকার সেই দিন আর নেই। প্রথমযুগে নদীপথে যাতায়াত ছাড়া যোগাযোগ রক্ষার অন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। শুকার সময় মানুষকে মাইলের পর মাইল হেঁটে ব্যবসা বাণিজ্য, আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে হত। দূর দূরান্তে বিদ্যাশিক্ষার জন্য যেতে হত। এছাড়া কোন উপায়ও ছিল না। বর্ষাকালে যেমন মানুষের দুর্গতির সীমা থাকত না। তেমনি অনেকেই অপেক্ষায় থাকত বর্ষার। "বর্ষার প্রারম্ভে শুষ্ক খাল ও ডোবাগুলি নূতন জোয়ারে জলপূর্ণ হইয়া যাইত। জোয়ারের প্রথম জল যখন সাপের মতন আঁকিয়া বাঁকিয়া নিম্নভূমি খুঁজিয়া চলিতে আরম্ভ করিত, সেই সুন্দর দৃশ্য দেখিবার জন্য তাহার সহিত আমরা—বালক বালিকারা দৌড়াইতে কত বৃথা চেষ্টা করিতাম। পূর্বে যে স্থান একেবারেই শুষ্ক ছিল, অনায়াসে চলাফেরা করিতাম, সেস্থান এখন জলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। নৌকা ভিন্ন যাতায়াত করা চলিবে না। খাল ও খানাগুলির দুইধারে যে সকল গুল্ম ও বৃক্ষরাজি ছিল তাহাদের ছায়া জলে আসিয়া পড়িয়াছে। ক্রমশঃ শস্যক্ষেত্রগুলি জলপূর্ণ হইয়া গেল। ধানের ক্ষেতের উপর দিয়া ছোট ছোট নৌকাগুলি শন শন শব্দ করিয়া পাল তুলিয়া চলিতে শুরু করিয়াছে। সেই ছোট নৌকাগুলি হইতে আরোহীরা সাপ্‌লা (কুমুদ) তুলিয়া লইতেছে। তাহাদের নালগুলিতে মালা গাঁথিয়া বালক বালিকারা গলায় পরিতেছে। তাহাদের আর সুখ ধরিতেছে না; আনন্দ-মেলায় আজ হাসির দোকানখানি বুঝি লুট হইয়া যায়। পল্লীগ্রামে বর্ষার সময়ই নৌকাযোগে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাতায়াতের সুবিধা বলিয়া এই সময়ের জন্য অনেকে অপেক্ষা করিয়া থাকেন। বালিকা বধূরা শ্বশ্রুমাতা অথবা অভিভাবকদের অনুমতি লইয়া বর্ষাকালে ছোট নৌকাযোগে প্রিয় পিত্রালয়ে আসিয়া পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনদিগকে দেখিয়া ও কিছুদিনের জন্য মুক্ত বাতাসে বেড়াইতে পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। বালিকাসুলভ খেলাধূলা করা যাহাদের স্বভাব, তাহারা শ্বশুরগৃহে অবরুদ্ধ হইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির ন্যায় ছট্‌ফট্ করিয়া থাকে। সকল ঘটনাগুলিই আজ মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছে।[২০]

নদী নির্ভর সেই জনজীবনের ছবি আজ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। রাজধানী ঢাকার সঙ্গে

অধিকাংশ জেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া আছে লঞ্চ, স্টিমার, দেশি নৌকা এবং অন্যবিধ যানবাহন। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যম হল : ১. সড়ক পরিবহন, ২. রেল পরিবহন, ৩. নৌ-পরিবহন, ৪. বিমান পরিবহন, ৫. সংবাদপত্র-ডাক-তার-রেডিও-টেলিভিশন এবং অন্যান্য।

মোঘল আমলের আগে পালকি, নৌকা আর ঘোড়াই ছিল যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। জেলা গেজেটিয়ার থেকে জানা যায়, মোঘল শাসক ইসলাম খান একটি খাল খনন করান। সেই খালটি বাবুবাজার থেকে জিন্দাবাহারের উত্তর দিয়ে তাঁতিবাজারের পাশ দিয়ে গোয়ালনগর হয়ে নবাবপুর ও নরিন্দা রোডের সামনে দিয়ে জালুয়া নগর ঘুরে ফরাসগঞ্জের লোহার পুলের নিচ দিয়ে বুড়িগঙ্গায় মিলিত হয়েছিল। আর একটি কাটাখাল তাঁতিবাজার ও মালিটোলার সংযোগস্থল থেকে বংশাল রোড পেরিয়ে সুরিটোলার পশ্চিম হয়ে নাজিরাবাজার ও দেওয়ানবাজারের মধ্য দিয়ে নিমতলী হয়ে শাহবাগ ও রমনা গ্রীন বা বাগই বাদশাহী হয়ে সেগুনবাগিচা, পুরানাপল্টন ও মতিঝিল পেরিয়ে চলে যায়। দুটি খালই পরিবহন ব্যবস্থাকে অনেকটা জটিলতা মুক্ত করে এবং শহরের ময়লা জল নিষ্কাশনের পথও সুগম হয়। কিন্তু বিশ শতকের ষাটের দশকে খাল দুটিকে ভরাট করে তৈরি হয়েছে সড়ক।

ঢাকা থেকে তেজগাঁও পর্যন্ত একটি সড়ক নির্মাণ করেছিলেন নায়েব নাজিম রেজা খান। সামরিক প্রয়োজনে একটি রাস্তা নির্মিত হয়েছিল বেগুনবাড়ি পিয়ারপুর শেরপুর হয়ে ঢাকা থেকে কাপাসিয়া অঞ্চলের টোক পর্যন্ত। রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ছিল ৫২ মাইল। আর একটি রাস্তা ঢাকা থেকে বিক্রমপুর হয়ে ইছামতী পেরিয়ে ফরিদপুর পর্যন্ত এবং ঢাকা থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত অপর একটি রাস্তা তৈরি হয়েছিল। সে সময়কার উল্লেখযোগ্য সড়কগুলি হল : ঢাকা-ধামরাই সড়ক, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রক্ষাকারী সড়ক এবং আরিচা বা গোয়ালন্দ সড়ক। শেষোক্ত সড়কটি ধলেশ্বরী নদীর পশ্চিম দিকে ৩৬ মাইল বা ৫৮ কি. মি বিস্তৃত। এই পথ নির্ভর করে উনিশ শতকের প্রায় শেষ পর্বে পৌঁছে যায় ঢাকা। ১৮৮৭-৯২ খ্রিঃ মধ্যে ঢাকার সঙ্গে দেশের বৃহত্তর অংশের রেল যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

বর্তমানে ঢাকা জেলার সড়কগুলি নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে সড়ক ও জলপথ পরিবহন দপ্তর এবং ঢাকা জেলা পরিষদ। জনপথ পরিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে যে ৫১১ কি. মি. রাস্তা আছে তার মধ্যে শহর এলাকার ৭৭.৭২ কি. মি. এবং মফস্বল এলাকায় ৩৩৬.১৪ কি. মি.। এর মধ্যে বিটুমিন ও সিমেন্টে তৈরি রাস্তা ৩৩৭.৭৪ কি. মি. এবং কাঁচা রাস্তা ১৭৩.৪৮ কি.মি.।

সড়ক ও জনপথ দপ্তরের রক্ষণাবেক্ষণা যেসব পাকা সড়ক আছে : *

সড়কের নাম	সর্বমোট দৈর্ঘ্য কি.মি.	পাকার পরিমাণ
ঢাকা-আরিচা	৯০.১৩ কি. মি.	৮৮.৫২ কি. মি.
ঢাকা-জয়দেবপুর-মির্জাপুর	৬২.৯৯ কি. মি.	৫৫.৬৯ কি. মি.
ঢাকা-ডেমরা	১৪.৪৯ কি. মি.	১৪.৪৯ কি. মি.
ডেমরা-মাধবদী-নরসিংদি	৩৮.৬২ কি. মি.	৩৮.৬২ কি. মি.
ডেমরা-দাউদকান্দি	২৮.৯৭ কি. মি.	২৮.৯২ কি. মি.
ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ	১৬.১০ কি. মি.	১৬.১০ কি. মি.
ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ (বিকল্প সড়ক)	৪.০০ কি. মি.	৪.০০ কি. মি.
ডেমরা-নারায়ণগঞ্জ-আদমজী জুট মিল	১০.৪৭ কি. মি.	১০.৪৭ কি. মি.

অন্যান্য পাকা সড়ক : *	দৈর্ঘ্য
১. কাওরানবাজার-এয়ারপোর্ট সড়ক	৩ কি. মি.
২. কাওরানবাজার-মিন্টো রোড	৯.৬৬ কি. মি.
৩. জয়দেবপুর রেলপথের কাছের সড়ক	৪.৪৩ কি. মি.
৪. ঢাকা-ডেমরা সড়ক	১৪.৪৯ কি. মি.
৫. ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সড়ক	১৬.১০ কি. মি.
৬. মিরপুর সড়ক	৭ কি. মি.
৭. মিরপুর দরগা সড়ক	১.৬০ কি. মি.
৮. টংগি-জয়দেবপুর সড়ক	১৬ কি. মি.

উল্লেখযোগ্য কাঁচা সড়ক : *	দৈর্ঘ্য
১. ধামরাই-সাটুরিয়া সড়ক	২১ কি. মি.
২. শিমুলিয়া-ধানতারা সড়ক	৮ কি. মি.
৩. ধামরাই-কালিয়াকৈর সড়ক	১৯.৩১ কি. মি.
৪. বালিয়া-বালেশ্বর সড়ক	১১.২৬ কি. মি.
৫. ধলা-চৌহাট সড়ক	৬.৪৩ কি. মি.
৬. মুন্সিগঞ্জ-ভাগ্যকুল সড়ক	৫১.৫০ কি. মি.
৭. লৌহজং-জিনজিরা সড়ক	৩৮.৬৩ কি. মি.
৮. নয়ারহাট-কালিয়াকৈর সড়ক	১৫.৭০ কি. মি.

জাতীয় মহাসড়ক : *	দৈর্ঘ্য
১. বনানী রেলক্রসিং—টংগি স্টেশন	১১.৬৮ কি. মি.
২. জয়দেবপুর—ভালুকা—ত্রিশাল সড়ক (আন্তঃ জেলা সড়ক)	৭৩.২৭ কি. মি.
৩. ঢাকা—নারায়ণগঞ্জ সড়ক	১২.৮৭ কি. মি.
৪. মাস্টার বাড়ি—মির্জাপুর সড়ক (সংযোগ সড়ক)	৫.৬০ কি. মি.
৫. ঢাকা—আরিচা মহাসড়ক (ঢাকা-নারয়ণগঞ্জ অংশ)	২৮.৯৬ কি. মি.
৬. আরিচা—দামকান্দ্রি সংযোগ সড়ক	৮ কি. মি.
৭. মানিকগঞ্জ—সিংগাইর সংযোগ সড়ক	১৯ কি. মি.
৮. ডেমরা—নরসিংদি সড়ক	৩৮.৬২ কি. মি.
৯. নরসিংদি—সরাইল—সিলেট	১০৮.৬১ কি. মি.
১০. পোস্তা সড়ক	৮.৩২ কি. মি.
১১. পাঁচদোনা—মঠখোলা—কটিয়াদি	৪৭.৬২ কি. মি.
১২. শিবপুর—শেখেরবাজার	৯.৬ কি. মি.
১৩. পাঁচদোনা—ভাংগা সড়ক	১৪.৪৬ কি. মি.
১৪. নরসিংদি—মদনগঞ্জ সড়ক	৪৮ কি. মি.
১৫. ঢাকা—খুলনা বিকল্প সড়ক (ঢাকা-মাওয়া অংশ ২২ মাইল)	৬৪.৩৬ কি. মি.

ঢাকা জেলাপরিষদের নিয়ন্ত্রিত সড়ক (পাকা/কাঁচা) : *

১. জিঞ্জিরা-রুহিতপুর-সোনাকান্দা ২. মরিচা-আগলা-নবাবগঞ্জ—জয়পাড়া ৩. খোলামোড়া-কালাতিয়া-হযরতপুর ৪. কুর্মিটোলা-পাতিয়া ৫. মাদারটেক-ত্রিমোহিনী-বেরাইদ ৬. কালিগঞ্জ-চুনকুটিয়া ৭. নয়াঝড়ি-পানামগঞ্জ-জয়পাড়া-মুকসুদপুর ৮. কালামপুর-বহিসাসি-বালিয়া, ৯. ধামরাই-কালামপুর ১০. সাভার-কর্ণপাড়া ১১. সাভার-আগুরিয়া-কাশিমপুর-কোনাবাড়ি

১২. সাভার-বিরুলিয়া ১৩. সাভার থানা ১৪. হেমায়েতপুর-ধল্লা ১৫. সাভার-সুত্রাপুর-নন্না ১৬. ধামরাই-কালিয়াকৈর (অংশ) ১৭. গুলশান—বাড্ডা এবং ১৮. কসাইবাড়ি-কাঁচকুরা। মোট দৈর্ঘ্য ২১১.৮৫ কি. মি. পাকা রাস্তা ৭২.৪৫ কি.মি. এবং কাঁচা রাস্তা ১২৯.৬০ কি.মি.।

মুন্সিগঞ্জ জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রিত সড়ক (পাকা/কাঁচা) : *

১. টঙ্গিবাড়ি-ভাগ্যকুল বাঘরা ২. মুন্সিগঞ্জ-টংঙ্গিবাড়ি-বালিগাঁও-ঘোড়াদৌড়-কনকসার রোড ৩. মুন্সিগঞ্জ-মুন্সিরহাট-শিলই-মূলচর রোড ৪. মটুকপুর-দরজি পঞ্চগাঁও-হাসাইল রোড ৫. সিরাজদি খাঁন-যোলঘর রোড ৬. হাসারা-রোসদিয়া রোড এবং ৭. আডিটশাহী-ধনকুরিয়া রোড। মোট দৈর্ঘ্য ১২৯.৪৪ কি. মি. পাকারাস্তা ৪৬.৩১ কি.মি. এবং কাঁচা রাস্তা ৭৯.৯৪ কি. মি.

গাজিপুর জেলাপরিষদের নিয়ন্ত্রিত সড়ক (পাকা/কাঁচা) : *

১. মাস্টার বাড়ি-মির্জাপুর ২. টংগি-কালীগঞ্জ ৩. কাডডা-কাশিমপুর-শিমুলিয়া ৪. চন্না-ঝাঁঝর-ধীরাশ্রম ৫. জয়দেবপুর-বিলাসপুর ৬. জয়দেবপুর-ভিতারকুল ৭. বাসনসড়ক ৮. টংগি-তাদাগ ৯. গাছা-নালাবন ১০. মহিষপুর-টংগি রেল স্টেশন ১১. হোতাপাড়া-পিরুজালী ১২. পোড়াবাড়ি-কারখানাবাজার ১৩. রাজেন্দ্রপুর-বিপকে বাড়ি ১৪. জয়দেবপুর-নীলেরপাড়া-পুবাইল ১৫. কাপাসিয়া-টোক ১৬. রাজেন্দ্রপুর-কাপাসিয়া-রানিগঞ্জ ১৭. লাখপুর-আড়ালবাজার-বারিশাব-আড়ালিয়াবাজার, ১৮. টোক-আড়ালিয়া-চালাকচর-বরচাপাড়া-পাইসান ১৯. টোকনগর-ওজালি ২০. পোসিংপা-বারিশাব ২১. রাজেন্দ্রপুর-বাসুদেবপুর ২২. কাপাসিয়া-চানপুর ২৩. কাপাসিয়া-ওজালি ২৪. কাপাসিয়া-বাসন ২৫. চানপুর-নলজানি ২৬. কাপাসিয়া-খোদাদিয়া ২৭. কালীগঞ্জ-জামালপুর-কলাপাট্টা দোলনবাজার-কাপাসিয়া ২৮. তুমুলিয়া-ব্রাহ্মণগাঁও ২৯. কালীগঞ্জ-চৈরা-জামালপুর ৩০. বাড়িয়া-রেওলা ৩১. বলধা-কেশরতা ৩২. ফুলবাড়িয়া-শ্রীপুর-গসিংগা-কাপাসিয়া ৩৩. মোলাইদ-সাতখামাইর-বর্মী ৩৪. পোসিংগা-বর্মী ৩৫. কাওরাইদ রেলস্টেশন-কাওরাইদ ৩৬. সিংরাতলী-বাঘেরবাজার-ইন্দ্রপুর ৩৭. শ্রীপুর-বর্মী ৩৮. কালিয়াকৈর-ধামরাই ৩৯. বাড়ইবাড়ি-বাজাইল এবং ৪০. নাওল-বালিয়াদি।

মানিকগঞ্জ জেলাপরিষদের নিয়ন্ত্রিত (পাকা/কাঁচা) সড়ক : *

১. মানিকগঞ্জ-বাংলাদেশ-ছনকা ২. মানিকগঞ্জ-ঝিটকা-হরিরামপুর ৩. মানিকগঞ্জ-ললিতগঞ্জ-গোলড়া-সাটুরিয়া ৪. মানিকগঞ্জ-ঘিওর-দৌলতপুর ৫. মানিকগঞ্জ-সিংগাইর-ধল্লা ৬. মানিকগঞ্জ-জয়রা-সাটুরিয়া ৭. সিংগাইর-চান্দর ৮. উথলী-ঘিওর ৯. ঘিওর-বাচামারা ১০. বানিয়াজুরি-জাবরা-ঘিওর ১১. পুথুরিয়া-ঘিওর ১২. বানিয়াজুরি-দুশুরিয়া ১৩. ঝিটকা-বাদুরপুর ১৪. বোয়ালি-রাজখরা ১৫. ঝিটকা-দোবাইল ১৬. বোলতা-নালি ১৭. আরিচা-নালি-কাঞ্চনপুর ১৮. টেপড়া-মাচাইন ১৯. করজানা-জাফরগঞ্জ ২০. শিবালয়-বাচামারা-দৌলতপুর ২১. উথলী-তারাগঞ্জ ২২. বায়রা-সিংগাইর ২৩. মাটিকাটা-সরাইল ২৪. করজনা-জাফরগঞ্জ ২৫. হিজলিয়া-শ্যামগঞ্জ, ২৬. ঘিওর-ছনকা, ২৭. শিমুলিয়া-গাঙ্গার, ২৮. দৌলতপুর-কলিয়া, ২৯. মহাদেবপুর-ঝিটকা, ৩০. কেওরজানি-আউটপাড়া এবং ৩১. বেউথা-বারইল-হরিরামপুর। মোট দৈর্ঘ্য ৫০৭.৭৪ কি. মি. পাকারাস্তা ১১০.৪৪ কি.মি এবং কাঁচারাস্তা ৪৬১.৬৭ কি. মি.।

নরসিংদি জেলাপরিষদ নিয়ন্ত্রিত (পাকা/কাঁচা) সড়ক : *

১. নরসিংদি-শিবপুর-চালাকচর-চরমানদালিয়া ২. পাঁচদোনা ডাংগা ৩. ডাংগা-ঘোড়াশাল ৪. পাঁচদোনা-চরসিন্দুর ৫. চালাকচর-পরদিয়া-বেলাব-নারায়ণপুর-দৌলতকান্দি-ভৈরব ৬. বেলাব-বাড়িচা-রায়পুরা ৭. মনোহরদী-বেলাব ৮. হাতিরদিয়া-শিমুলিয়া-লাক্পুর ৯. চালাকর-টোক, ১০. শিবপুর-জাললারা-বেলাব ১১. শিবপুর-চৈতান্য-রায়পুর ১২. সি অ্যান্ড বি থেকে সুমরাদি-চরসিন্দুর ১৩. পুটিয়া-নোয়াদিয়া-কুটিরহাট-যশোর ১৪. নরসিংদি-পরানপাড়া-আমিরগঞ্জ-হাইরমারা-চরসুবুদ্ধি-রায়পুরা ১৫. রায়পুরা পি টি আই থেকে শ্রীনগর-

পাড়াতলী - বাশগারি ১৬. রায়পুরা - চান্দেরকান্দি - বাহেরচর - নারায়ণপুর - কালকাপ্রসাদ ১৭. নারায়ণপুর-মাহমুদাবাদ-মির্জাপুর-শাপমারা-বাহননগর ১৮. নারায়ণপুর-পিরিচকান্দি-বাহেরচর-মৌলভিবাজার-রায়পুরা ১৯. মাধবাদী-গোপালদী ২০. নরসিংদি-নবীপুর-দিলারপুর-নজরপুর ২১. নরসিংদী-বুধিয়ামারা-করিমপুর-শ্রীনগর-পঞ্চবটি ২২. সংগীতা-গাবতলী ২৩. চরসিন্দুর-পলাশ-ভেলানগর-পুরানপারা ২৪. নরসিংদি সড়ক ও জনপথ থেকে স্টিমার ঘাট ২৫. চিরসিন্দুর-দুলালপুর-হাতিরদিয়া ২৬. মেথিকান্দা রেল স্টেশন থেকে মহেশপুর-দৌলতকান্দি ভৈরব ২৭. মণিপুরা-চরসুবুদ্দি-খানাবাড়ি-রাধাগঞ্জ-ইসলমপুর।

ঢাকা জেলার রাস্তার একটি হিসাবে (১৯৯০ খ্রিঃ) আছে ঃ *

পাকারাস্তা	৯৬৬.৩৫ কি. মি.
সেমিপাকারাস্তা	৩৭০.০০ কি. মি.
কাঁচা রাস্তা	৩২৪.৫৩ কি. মি.

এই হিসাব ১৯৭৪ খ্রিঃ ছিল এরকম ঃ *

পাকারাস্তা	৬৬৭.৮৭ কি. মি.
কংক্রিট রাস্তা	২৭১.৯৮ কি. মি.
আধা পাকা ও কাঁচা রাস্তা	৪১৮.৪২ কি. মি.

এই হিসাব ১৯৮৩ খ্রিঃ ছিল এরকম ঃ *

পাকা রাস্তা	১২৯৮.৭৩ কি. মি.
সেমিপাকা	২৩৬.৫৭ কি. মি.
কাঁচা ও ইট বিছানো রাস্তা	৭০১১.৮৯ কি. মি.

রেলপথ :

সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার সঙ্গে রাজধানী ঢাকার সড়ক ও রেল যোগাযোগ গড়ে উঠেছে। পাকিস্থান আমলে সংযোগ ব্যবস্থার যে উন্নতি ঘটেছিল, স্বাধীন বাংলাদেশের সূচনাকাল থেকে তা অনেক বহুমুখী ও ব্যাপক রূপ পেয়েছে।

কলকাতা কুষ্টিয়া-র মধ্যে রেলগাড়ি চলাচল শুরু হয় ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর। নদীপথে স্টিমার চলাচলের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপিত হয় নারায়ণগঞ্জের সঙ্গে। কুষ্টিয়া থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত সংযোগ স্থাপিত হয় ১৮৭১ খ্রিঃ ১ জানুয়ারি। ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি এই সমস্ত কর্মের দায়িত্বে ছিল। ১৮৮৪ খ্রিঃ ১ জুলাই থেকে নাম হয় ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে। ঢাকা স্টেট রেলওয়ে ১৮৮৫ খ্রিঃ সরকার কর্তৃক গঠিত হয়। এদের অধীন ছিল ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ময়মনসিংহ সংযোগকারী রেলপথ। ১৯১৫ খ্রিঃ ঢাকা স্টেট রেলওয়ে এবং ইস্টার্ণ বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে সংযুক্ত করে নতুন নাম হয় ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে।

টংগি ও আসামের আখাউড়া হয়ে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় ১৯১০ খ্রিঃ থেকে ১৯১৪ খ্রিঃ-এর মধ্যে। এই অংশ নির্মাণ করে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে। আশুগঞ্জ ও ভৈরববাজারের মধ্যে মেঘনার ওপর তখন কোন সেতু ছিল না। ১৯৩৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ওয়াগন ফেরির মাধ্যমে চলাচল করা হত। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে সরকার অধিগ্রহণ করে ১৯৪২ খ্রিঃ ১৮ জানুয়ারি। নতুন নাম বেঙ্গল আসাম রেলওয়ে হলেও, তাকে সংযুক্ত করা হয় ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের সঙ্গে। ১৯৪৭ খ্রিঃ ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে এবং ১৯৬১ খ্রিঃ ১ ফেব্রুয়ারি নামকরণ হয় পাকিস্তান ইস্টার্ণ রেলওয়ে। ঢাকার মিটারগেজ লাইনের দৈর্ঘ্য ১৪৪.৮৪ কি.মি। নারায়ণগঞ্জ থেকে কাওরাইদা পর্যন্ত ৮৩.৬৮ কি. মি. এবং টংগি স্টেশন থেকে দৌলতকান্দি পর্যন্ত ৬১.১৫ কি.মি.।

পূর্ববাংলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের মধ্যে রেল সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা যতটা না ছিল যাত্রী চলাচলের জন্য, তার থেকেও গভীর প্রয়োজন পড়েছিল বাণিজ্যিক কারণে। সেসময়েই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ঃ

রেলওয়ে অভাবে পূর্ববাংলার বাণিজ্য আদ্যপি নিতান্ত নিকৃষ্টাবস্থায় রহিয়াছে। পূর্ব বাংলায় রেলওয়ে হইলে বাণিজ্যের কত উন্নতি হইবে বলা যায় না। পূর্ববাংলা যে কিরূপ স্থান, গবর্ণমেন্ট অদ্য পর্যন্ত তাহা চিনিতে পারেন নাই। ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রাম এই তিন স্থানে আপাততঃ রেলওয়ে করা নিতান্ত কর্তব্য। কেবল রেলওয়ের অভাবে এই তিন স্থানের বাণিজ্য এত হীনাবস্থায় রহিয়াছে। তথাপি সপ্তাহে সপ্তাহে নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা হইতে রেলওয়ে স্টিমারে কত মাল প্রেরিত হয়, রেওয়ে কোম্পানি অবশ্যই অবগত আছেন। স্টিমার এবং তৎসঙ্গীয় ৪/৫ খানা ফ্রেটে মাল ধরে না। রেলওয়ে হইলে জিনিসের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাইবে। নানা প্রকার অসুবিধা নিবন্ধন এখন মাল অনেক কম যাইতেছে। যাহা হউক এতৎসম্বন্ধে আমরা অদ্য অধিক কিছু বলিতে চাই না। এইমাত্র বক্তব্য, নগরের উপরিস্থ রেলওয়ের বিষয় আগে চিন্তা না করিয়া পূর্ববাংলা রেলওয়ে যাহাতে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে অতি শীঘ্র বিস্তৃত হইতে পারে, তাহাতে মনোযোগ দেওয়া হউক। রেলওয়ে করিলে, পরে চিনা যাইবে পূর্ববাংলা কিরূপ স্থান।[২১]

পূর্ব বাংলা রেলওয়ে স্টিমার :

প্রায় প্রতিবর্ষেই এইদিনে এই স্টিমারের যাতায়াত সম্বন্ধে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। যে যে দিবস যে যে স্থানে উপস্থিত হইবার এবং সেই সেই স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার সাধারণ নিয়ম আছে, এদিনে প্রায়ই তাহার ব্যাত্যয় হইয়া থাকে। কি জন্য এরূপ ঘটনা হয়? আমরা যতদূর জানি, তাহাতে ইহার দুইটি কারণ অনুমান করিতে পারি। এক, এদিনে সহজে যাওয়ার নিমিত্ত অপ্রশস্ত ও চড়াবিশিষ্ট গজঘাটার মোহনা দিয়ে যাতায়াত করিতে মধ্যে মধ্যে স্টিমার ঠেকিয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ এদিনে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ হইতে বহুতর কোষ্টা রপ্তানি হয় বলিয়া প্রায়ই তিনখানি অতিরিক্ত 'ফ্রেট', স্টিমারের সহিত যোজিত হইয়া থাকে, তদ্বশতঃ কেবল মন্দগতিতে স্টিমার চলিয়া থাকে এমন নয়, মধ্যে মধ্যে নদীর অপ্রশস্ততা ও স্বল্পতোয়তা নিবন্ধন স্থানে স্থানে ঠেকিয়াও যায়, সুতরাং স্টিমার যাতায়াতে অনেক কালগৌণ ও বিশৃঙ্খলা ঘটে।...

সম্প্রতি পূর্ব বাংলা রেলওয়ে স্টিমার কর্তৃপক্ষ কোষ্টার রপ্তানির মাশুল সম্বন্ধে একটি অসঙ্গত নিয়ম করিয়াছেন। প্রতি মণে ৯ আনা মাশুল নির্ধারণ করা হইয়াছে। ইতঃপূর্বে মণ করা ৬ আনা মাশুল ছিল, এবার হঠাৎ একবারে ৯ আনা করা হইয়াছে। কোষ্টার অধিকতর আমদানি দর্শনে প্রলোভী হইয়া হউক, অথবা বহুল পরিমাণে কোষ্টার আমদানি হওয়াতেই এদিনে স্টিমার যাতায়াতে গোলযোগ ঘটে, মাশুল বাড়াইয়া দিলে অনেকে বিরক্ত হইয়া নৌকাযোগে কোষ্টা প্রেরণ আরম্ভ করিবে, সুতরাং অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ কোষ্টা লইয়া যথানিয়মে স্টিমার যাতায়াতে বড় গোলযোগ ঘটিবে না, এই ভাবিয়াই হউক, স্টিমারের অধ্যক্ষগণ নিয়ম করিয়া থাকিবেন। যাহা মনে করিয়াই এরূপ করা হইয়া থাকুক, আমাদিগের বিবেচনায় এতদঞ্চলীয় মহাজনদিগের পক্ষে এই নিয়মটা নিতান্ত অনিষ্টজনক হইয়াছে। একতঃ যে ওজনে স্টিমারে মাল গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তাহা মহাজনদিগের কারবারে প্রচলিত ওজন অপেক্ষা মণকরা অনেক কম, তাহাতে আবার মাশুলও অত্যধিক পরিমাণের বৃদ্ধি করা হইল। মহাজনেরা কলিকাতায় কোষ্টা পাঠাইয়া এমন কতই লাভ করেন? মনে কর এখানে যে পাট ৩ টাকা দরে ক্রয় করা হয়, কলিকাতায় সাধারণতঃ সাড়ে ৩ টাকা কি ৩ টাকা ১২ আনা দরে তাহা বিক্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু এক মণ পাট এখানে ক্রয় করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করিতে ব্যয় কি অল্প হয়? আদি ক্রেতার দালালী, মফস্বল হইতে ঢাকায় আনার

নৌকাভাড়া, গাঁইট বাধাই, গুদামভাড়া, স্টিমারঘাটে নৌকাভাড়া বা মজুরি, এবং স্টিমারে উত্তোলনের মজুরিতে মণকরা প্রায় ৯ আনা ব্যয় হইয়া যায়; ইহার পরও যদি স্টিমার ও রেলওয়ের মাশুল বেশি করিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে লাভ কি হইতে পারে?

শুনিলাম পূর্ববাংলা রেলওয়ে স্টিমারের কোষ্টার মাশুল বৃদ্ধির কথা অবগত হইয়া, দুই একজন পরান্নভোগী ব্যবসায়ীভিন্ন, এতদঞ্চলীয় অধিকাংশ মহাজন স্টিমারের প্রতি নিতান্ত বীতরাগ হইয়াছেন। অনেকে এরূপ বাসনা করিয়াছেন, অতঃপর রেলওয়ে স্টিমারে মাল না দিয়া একবারে দেশীয় নৌকাযোগেই তাহারা কলিকাতায় মাল প্রেরণ কবিবেন। নৌকাযোগে কলিকাতায় কোষ্টা প্রেরণ করা হইলে অপেক্ষাকৃত অনেক কাল বিলম্ব হইবে সত্য, কিন্তু ব্যয় অনেক অল্প লাগিবে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক একথা আমরা অবশ্যই স্বীকার করিব, নৌকা অপেক্ষা স্টিমারে মাল প্রেরণ নিঃসংশয়তা অধিক এবং দ্রুতগামিতা নিবন্ধন কারবারের অনেক সুবিধাও হয়। কিন্তু সেই নিঃসংশয়তা ও সুবিধা ভোগ করিতে যদি এত অধিক ব্যয় স্বীকার করিতে হয় যে তদ্রূপ ব্যয় করিয়া ব্যবসায় করিলে লাভ কিছু থাকে না, তাহা হইলে ব্যবসায়ী মহাজনদিগের প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন? অতএব আমরা বাসনা করি, পূর্ববাংলা রেলওয়ে স্টিমারের অব্যক্ষগণ অবিলম্বে কোষ্টার বর্ধিত মাশুল কমাইয়া দিউন। অন্যথা ভবিষ্যতে তাঁহারা সাধারণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হউন, কিন্তু বড় লাভবানও হইবেন না। পূর্বে সাধারণ ডাকের চিঠির এক আনা মাশুল থাকাতে গভর্নমেন্টের যে লাভ হইত, সেই স্থলে আধ আনা মাশূল করাতে কি তদপেক্ষা অনেকগুণে অধিক লাভ হইতেছে না? আমরা বুঝিতে পারি না, রেলওয়ে কোম্পানির অধ্যক্ষগণ ইত্যাকার দৃষ্টান্তের অনুসারী হইয়া কার্য পরিচালন করেন না কেন? তাঁহারা যদি অতি সত্বর আমাদিগের উল্লিখিত বিষয়ে মনোযোগবান না হন, তবে সাধারণের অধিকতর সুবিধাজনক স্টিমার নিয়োজন দ্বারা অন্য কোন কোম্পানির সমধিক লাভবান হওয়া বড় আশ্চর্যের হইবে না।[২২]

ঢাকা স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি :

... সম্প্রতি ঢাকায় কয়েকজন ভদ্রলোক দ্বারা একটি নাবিক কোম্পানি সংস্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারা একখানি ছোট স্টিমার আনয়ন করিয়াছেন, অদ্য হইতে উহা ঢাকা এবং মানিকগঞ্জে যাতায়াত করিবে। গহনা নৌকায় লোকের যে পরিমাণ ব্যয় লাগে এই জাহাজে তদপেক্ষা কিঞ্চিদধিক ব্যয় পড়িবে, কিন্তু কোম্পানির বিজ্ঞাপনে যেরূপ দৃষ্ট হইল, তাহাতে বোধ হয় প্রাতঃকালে ঢাকা ছাড়িয়া ১২টার সময় মানিকগঞ্জে আর ২টার সময় মানিকগঞ্জ ছাড়িয়া ৬টার সময় ঢাকা আসা যাইবে। গমনাগমন সময়ে মধ্যবর্তী কয়েকটি স্থানেও আরোহী লওয়া কিংবা উঠাইয়া দেওয়ার জন্য জাহাজ লাগান হইবে। যদি কোম্পানির কার্য উত্তমরূপে চলিতে পারে, তাহা হইলে লাভ হইবে না, বলা যায় না। কোম্পানি এই কার্যে লাভ পাইলে, ঢাকা হইতে তালতলা ও নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের নিমিত্ত আরও ২/১ খানি স্টিমার আনয়ন করিবেন। আমরা কোম্পানির শুভ সঙ্কল্প সুসিদ্ধির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু অনেক দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মনে নানা আশঙ্কারও উদয় হইতেছে। কোম্পানি যদি ধৈর্য এবং সাবধানতা অবলম্বনপূর্বক কর্তব্যসাধন করিতে পারেন, তাহা হইলে বাঙালিদিগের কলঙ্ক অপনীত হইবে। অন্যবিধ দৃষ্টান্ত দর্শনে সম্যক আশা করা যায় না বটে, কিন্তু বাঙালির কোন কার্যে উন্নতিলাভের কি একটি সদুদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না? আরোহীদিগের কোনরূপ অসুবিধা বা কষ্ট না হয়, কোম্পানির সে বিষয়েও বিশেষ মনোযোগ রাখা কর্তব্য।...[২৩]

পূর্ববাংলা রেলওয়ে কোম্পানি ও মহাজনগণ :

পূর্ববাংলা রেলওয়ে কোম্পানি ঢাকা ও সিরাজগঞ্জ দ্বারাই হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ রহিয়াছেন। এই

দুই স্থান হইতে রেলওয়ে কোম্পানির বিস্তর আয়। প্রতি সপ্তাহে বহুতর বাণিজ্য দ্রব্য, এই দুই স্থান হইতে আমদানি রপ্তানি হইয়া থাকে। আরোহীদের যাতায়াতও প্রচুর পরিমাণে হয়। প্রতি সপ্তাহে প্রিনসেস এলিস নামক একখানা বড় স্টিমার ও দুইখানা টাগ স্টিমার ঢাকা ও গোয়ালন্দে গমনাগমন করে। এতদ্‌ব্যতীত সময়ে সময়ে আবশ্যকমত অতিরিক্ত স্টিমারও পরিচালিত হয়। কিন্তু এই রেলওয়ে কোম্পানির অস্থির নিয়মে সময়ে সময়ে আরোহী ও মহাজনদের বিস্তৃত ক্ষতি ঘটিয়া থাকে। অধ্যক্ষগণ হঠাৎ স্টিমার গমনাগমনের সময় পরিবর্তিত করিয়া ফেলেন। তাঁহারা অবগত নহেন যে, এক মুহূর্তে মহাজনদের কত ক্ষতি জন্মিতে পারে। অনেক মহাজনের ও ব্যাঙ্কের টাকা এই স্টিমারে আসিয়া থাকে। যদি নিয়মিত সময়ে স্টিমার উপস্থিত না হইতে পারে সেই সময়ে অনেক মহাজন কি ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া যাইতে পারেন। আমরা জানি অনুরোধবশতঃ অনেক তুচ্ছ কারণেও পূর্ব বাংলা রেলওয়ে কোম্পানি নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া থাকেন। এ স্থলে তাহার একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। প্রতি শুক্রবার গোয়ালন্দ হইতে ঢাকা অভিমুখে বড় স্টিমারের যাত্রা করিবার নিয়ম। এ সপ্তাহে ঘোড়াদৌড়ের ঘোড়া আসিবে বলিয়া স্টিমারের নিয়মিত সময়ে যাত্রা না করিয়া রবিবার যাত্রা করিবে। এই কারণে অনেক মহাজনের মাল স্টিমারে দীর্ঘকাল থাকিবে। সুতরাং তাহাতে তাঁহাদের সবিশেষ ক্ষতি হইবে। আমরা বোধ করি, আইনতঃ রেলওয়ে কোম্পানি, মহাজনদের এই ক্ষতি দিতে বাধ্য হইতে পারেন। এই সঙ্গে আরোহীদেরও অত্যন্ত কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। গোয়ালন্দ আসিয়া স্টিমার না পাইলে আরোহীদিগের যে কিরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয়, যাঁহারা সেই অবস্থায় পড়িয়াছেন, তাহারাই জানেন। যাঁহারা রিটার্ন টিকেট করিয়া আসেন, তাহাদিগের তো কথাই নাই। আমরা গত সপ্তাহের বিষয় জানি, অনেকানেক আরোহীকে এই কারণে অর্থের ক্ষতি স্বীকার ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। রেলওয়ে কোম্পানির ঢাকা ষ্টেশনে মহাজনেরা মাল শীঘ্র প্রাপ্ত হয় না। শুনিতে পাই, রবিবার দিন রেলওয়ে কোম্পানির কর্মচারিগণ মহাজনদিগকে মাল প্রদান করেন না। আমরা সবিশেষ অবগত আছি, রেলওয়ে কোম্পানির অফিস রবিবার বন্ধ থাকিবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। তবে কেন ঢাকার ষ্টেশন এই নিয়ম হয়, বলা যায় না। বোধ হয় কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধান কি দৃষ্টি না থাকায় কর্মচারিগণের অতিরিক্ত স্বাধীনতায় এই কার্য ঘটিয়া থাকে।

প্রিন্সেস এলিস নামক যে বড় স্টিমারটি যাতায়াত করে, তাহাতে তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদের বিস্তর অসুবিধা রহিয়াছে ঃ পায়খানার বন্দোবস্ত ভাল নয়। এমনকি নাই বলিলেও ক্ষতি নাই। খালাসীদের ব্যবহার্য পায়খানাই আরোহীদের মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে হয়। যে স্থানে তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীগণ অবস্থান করে, সেই স্থলে আহারযোগ্য পশু পক্ষ্যাদি রাখায় তাহাদের কর্কশ রবে ও চীৎকারে এবং মলমূত্রের দুর্গন্ধে আরোহীদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহিয়াছে।

তৃতীয় শ্রেণীস্থ স্ত্রীলোকদের জন্য বিশেষ কোন বন্দোবস্ত নাই। বড় স্টিমারে আর একটি নিয়ম প্রতিপালিত না হওয়ায় হিন্দু ও স্ত্রীলোক আরোহীদের বিস্তর কষ্ট হইয়া থাকে। বাজার হাট কি প্রসিদ্ধ গ্রাম দেখিয়া প্রায়ই স্টিমার রাখা হয় না। এই কারণে অনেক লোকের প্রায় দুইদিন অনাহারে থাকিতে হয়। অথচ আমরা জানি, রেলওয়ে কোম্পানির নিয়মে আরোহীদের সুবিধাজনক স্থানে স্টিমার রাখিবার আদেশ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তথাপি কাপ্তানের দোষে সেই নিয়ম প্রতিপালিত হয় না।

আমরা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া পূর্ব বাংলা রেলওয়ে কোম্পানি সম্বন্ধে এই কতিপয় কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম। বোধ হয় অতঃপর পূর্ব বাংলা রেলওয়ে কোম্পানির কর্তৃপক্ষগণ, এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া তাহার প্রতীকার করিবেন।[২৪]

ঢাকা-গোয়ালন্দ (শিবালয়) ট্রামওয়ে :

রেলওয়ের বিস্তৃতিতে আমাদের অহিতকর বিলাতি বাণিজ্য সংবর্ধিত হয়, তাহা আমরা খুব সত্য বলিয়া জানি, এবং তজ্জন্যই রেলওয়ের তত পক্ষপাতী আমরা নহি। কিন্তু ঢাকা-শিবালয় রেল ট্রামওয়ের জন্য আমরা যে এত জেদ করিতেছি, তাহার কারণ স্বতন্ত্র। আমরা যে সকল হিসাবপত্র সংগ্রহ করিয়াছি, তদ্দৃষ্টে দেখা যায় যে, এই পথের রেল কি ট্রামওয়েটি এরূপ লাভ জনক হইবে, যাহার তুলনা সম্ভব না। কোথায় দেখিয়াছেন যে, ট্রামওয়ের ব্যয়িত মূলধন ২/৩ বৎসর মধ্যে উঠিয়া লাভ দাঁড়ায়? কিন্তু এপথটিতে বস্তুতই তাহা হইবে। পাছে এইরূপ লাভের প্রলোভন বিদেশিয় কোম্পানি দ্বারা এই পথটি অধিকৃত হয়, সেই আশঙ্কাতেই আমরা দেশীয় লোককে পূর্বাহ্ণেই ... হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়াছি। কিন্তু আমরা জানি দেশীয় লোক এরূপ বিষয়ক যৌথ কারবারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বা ভয়ার্ত সুতরাং স্থানীয় লোকদ্বারা কোম্পানি গঠিত হইয়া একার্য হইবার কিছুমাত্র আশা নাই। যাঁহারা আশা করেন, তাঁহারা দেশের অবস্থায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কলিকাতায় বসিয়া দৈনিকের ন্যায় বিচক্ষণ সহযোগিরা এ পরামর্শ দিতে পারেন। যেহেতু কলিকাতায় যৌথকারবার অনেকটা চলিতেছে। কিন্তু যাঁহারা ঢাকায় বসিয়া এরূপ কথা বলিতে পারেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ছেঁড়াচটে শুইয়া লাখ টাকার স্বপ্ন দেখেন। এমন অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে আর কি বলিব? বলিতে পারি, যদি তাঁহারা কোম্পানি গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখেন, তবে তাহার চেষ্টা দ্বারা কৃতিত্ব প্রদর্শন না করেন কেন? তাহা না করিয়া শুধু বাচালতা প্রদর্শন করা কখনই সঙ্গত নহে। যিনি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে বসিয়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অনধিকার চর্চাকরতঃ বোর্ডের সমস্ত সভ্যদ্বারা উপহাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন, তাঁহার দুর্দশা দেখিয়াও কি জ্ঞানলাভ করা কর্তব্য নহে? আমরা জানি, শুভকার্যে বিঘ্ন জন্মাইবার ক্ষমতা অনেকের আছে, কিন্তু সেরূপ বিঘ্নকারীরা দেশের শত্রুরই মিত্র বলিয়া কখনও গণ্য নহে।

দেশীয় লোকের যৌথ কারবার দ্বারা এরূপ কার্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ঢাকার নবাব সাহেব ভিন্ন আট লাখ টাকা নিজে দিয়া এই ট্রামওয়ে করিতে পারেন, তেমন ধনী ঢাকা নগরে কেহ নাই। কাহারও কাহারও লগ্নী কারবারে উর্ধে সংখ্যা ৪/৫ লাখ টাকা খাটিলে তাহারা সুদের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে এবং সেই অতি কষ্টে উপার্জিত ধন সৎব্যবসায়ে প্রয়োগ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। ভাগ্যকুলের যে ভাগ্যবান কুণ্ডবাবুরা শ্রাদ্ধ শান্তিতে বৎসরে লক্ষাধিক টাকা অকাতরে ব্যয় করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে এই রেলওয়ে নিজেরাই করিতে পারেন, এবং এমন কাজে তাহাদের প্রবৃত্তিও আছে, কিন্তু কার্যটি সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত বলিয়া এই মহতী কীর্তিবিষয়ক ব্যাপারে তাঁহারা উদাসীন আছেন। বোধ হয় কোন কার্যক্ষম ব্যক্তির মন্ত্রণা পাইলে তাঁহারা একার্যে প্রবৃত্ত হইলেও পারেন। এবিষয়ে আমরাও তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি, যদি লাভ, কীর্তি ও যশঃ একযোগে সঞ্চয় করিতে হয় তবে এমন প্রশস্ত উপায় আর নাই। কীর্তি যশের কথা তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে না। লাভালাভ কি তাহা তাঁহারা ঢাকা প্রকাশেই দেখিতেছেন। এখন কেবল উদ্যোগ আবশ্যক। কিন্তু উদ্যোগ হইবে কিনা তাহা আমরা জানিনা বলিয়াই এই কার্যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের হস্তক্ষেপ আমাদের নিতান্ত বাঞ্ছনীয় মনে হইয়াছে।"[২১]

ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের সদর দফতর স্থাপিত হয়েছিল ঢাকায়, ঢাকা-মৈমনসিংহ শাখা উদ্বোধনের পর। ঢাকাতে রেলগাড়ির কামরা ও মালগাড়িও তৈরি হত দেশভাগের সময় পর্যন্ত। পরে তাকে ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় চট্টগ্রাম। অনেক রেলদপ্তরও ঢাকা থেকে ওখানে চলে গেছে। ইংরেজ আমলে ঢাকায় রেল হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছিল। ঢাকা থেকে সরাসরি রেলপথে বহুস্থানে যাতায়াত করা যায়। শ্রীহট্ট চট্টগ্রাম যাওয়া যায় নারায়ণগঞ্জ

থেকে কুমিল্লা হয়ে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যাওয়া যায় জগন্নাথগঞ্জ-সিরাজগঞ্জ এবং বাহাদুরাবাদ তিস্তামুখ ঘাট দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে।

১৯৫৮ খ্রিঃ-এ দেশে সামরিক আইন জারির পর ফুলবাড়িয়ার ঢাকা রেলস্টেশনকে কমলাপুর সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। নতুন রেল স্টেশনের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৬০ খ্রিঃ-এ শেষ হয় ১৯৬৫-তে। এই বছরই নতুন রেল স্টেশনের উদ্বোধন হয়েছিল। বর্তমানে দেশের মধ্যে ৪৪ টি আন্তঃনগর ট্রেন চলাচল করে। এই ব্যবস্থা কম ব্যয় সাপেক্ষ এবং নিরাপদে দ্রুত চলাচল সম্ভব। ঢাকা-চট্টগ্রামের মধ্যে বিরতিহীন আন্তনগর ট্রেন চলাচল শুরু হয় ১৯৮৫ খ্রিঃ। এখন আছে দু জোড়া ট্রেন 'প্রভাতী' ও 'পূরবী'। ঢাকা-সিলেটের মধ্যে বিরতিহীন আন্তঃ নগর ট্রেন 'পারাবত' চলাচল খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। তাছাড়া আছে বিরতিসহ আন্তঃ নগর ট্রেন। বাংলা দেশ পরিবহনে উল্লেখযোগ্য সংযোজন রেলওয়ে কনটেইনার সার্ভিস।

পরিবহনে ট্রেন চলাচল যতই যুগান্তর আনুক না কেন, জলপথ এখনও অপরিহার্য এবং গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকার দক্ষিণ ও পূর্বদিকের নদীপথে স্বচ্ছন্দে নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার যাতায়াত করে। চাঁদপুর, মাদারিপুর, ফরিদপুর ও মানিকগঞ্জে যাওয়ার সহজ উপায় হল স্টিমার ও লঞ্চ। আজও বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মতই নৌকা ঢাকা জেলার অন্যতম পরিবহন। বিভিন্ন আকার ও গঠন প্রকৃতির বহুসংখ্যক নৌকা ঢাকার প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। বর্ষার মরশুমে নিম্নাঞ্চল এলাকায় ছোট আকৃতির নৌকাই হচ্ছে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাতায়াতের একমাত্র বাহন। হাটবাজারের দিনগুলোয় নদীতে এবং নদীর আশেপাশে প্রচুর নৌকা কেনাবেচার জন্য ভিড়ানো অবস্থায় দেখা যেত এবং নৌকার জমজমাট জমে উঠত। ছোট ছোট ছেলেদের ক্ষুদ্রাকৃতির নৌকায় অথবা মাঝে মাঝে তালগাছের ডোঙায় বৈঠা বেয়ে স্কুলে যেতে দেখা যেত। বড় নদী দিয়ে বৃহদাকারের মালবাহী নৌকা নারায়ণগঞ্জ ও মীরকাদিমের মত ব্যস্ত ব্যবসা কেন্দ্রসমূহে যাতায়াত করত। এছাড়া বৃহদাকারের নৌকাসমূহ কাঁচাপাট প্রচুর পরিমাণ ধান, ভারী মালপত্র এবং পণ্য সামগ্রী পরিবহনে ব্যবহৃত হত। যাত্রী পরিবহণের মাধ্যম হিসেবে মটর লঞ্চসমূহ ক্রমবর্ধমান হারে নৌকার স্থান দখল করছে। এগুলির সংখ্যা ক্রমশ বেড়েছে এবং বিগত দশকে এদের কার্যক্রম দূর দুরান্তে সম্প্রসারিত হয়েছে।

"ঢাকা জেলার যাতায়াত ব্যবস্থায় একটি নতুন পর্যায়ের শুরু হয় দেশ বিভাগের পর। ব্যক্তি উদ্যোগে লঞ্চ সার্ভিস চলাচলের মধ্য দিয়ে ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জ থেকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে নিয়মিত লঞ্চ যাতায়াত করত। এই লঞ্চগুলো ব্যক্তি মালিকানাধীন ছিল। ব্যক্তি মালিকানাধীন লঞ্চের মধ্যে কয়েকটি সিন্ডিকেট ও কর্পোরেশন আছে এবং এ সমস্ত লঞ্চ মালিকগণ বহুসংখ্যক লঞ্চের মালিক। এই ব্যবসাটি অত্যন্ত লাভজনক হয়েছে। ঢাকার সদরঘাট এবং নারায়ণগঞ্জ লঞ্চঘাটের কার্যক্রম অবলোকন করা কৌতুকপ্রদ। এই দু'টি লঞ্চঘাটে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী লঞ্চ কোম্পানিগুলোর প্রতিযোগিতা যেমন কঠিন তেমন কোলাহল মুখর।" [২৬]

ঢাকা থেকে মোটর লঞ্চে সরাসরি যাতায়াত করা যায় : আগলা, তালতলা, নাগেরহাট, হাসহারা, গোয়ালিমেন্ডো, ভানছরা, ভাগ্যকুল, ভেদেরগঞ্জ হলদিয়া, এলাসিন, সিরাজদিখান, জয়পাড়া, নাগরপাড়া, দিঘিরপাড়, ঝিটকা, ঘিওর, মানিকগঞ্জ, খুলনা হয়ে বরিশাল, বাগেরহাট বরিশালের স্বরূপকাঠি, বরিশাল, পটুয়াখালি, হুলারহাট, বরগুণা, তরকি, তোলাবাজার ও এলাসিন, ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর, গোয়ালন্দ, টেপাখোলা হয়ে কলাকোপা, নারেরটেক, সুরেশ্বর এবং আকোট, কুমিল্লা জেলার নবীনগর, রামচন্দ্রপুর, জীবনগঞ্জবাজার, বাটাকান্দি, চাঁদপুর, মতলব এবং ভেড়ামারা, পাবনা জেলার শাহজাদপুর (বড়ালব্রীজ), ময়মনসিংহ জেলার জগন্নাথগঞ্জ হয়ে সিরাজগঞ্জ ও পাবনা।

নারায়ণগঞ্জ থেকে মোটর লঞ্চে সরাসরি যাতায়াত করা যায় ঃ কুমিল্লার চাঁদপুর, বাটাকান্দি, মতলব, রামচন্দ্রপুর, দাউদকান্দি, বাকরগঞ্জ জেলার বরিশাল এবং ফরিদপুর জেলার সুরেশ্বর।

নরসিংদি থেকে মোটর লঞ্চে সরাসরি যাতায়াত করা যায় ঃ ময়মনসিংহের কাটিয়াদি, ঢাকা জেলার শিবপুর এবং কুমিল্লা জেলার গোকনেঘাট।

ঢাকা জেলার কাশীগঞ্জ এবং কাওরাইদের মধ্যে লঞ্চ যাতায়াত করে।

বর্তমানে ঢাকা জেলার অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন রুটের ২৩টিতে স্টিমার চলাচল করে। বাস চলাচলও জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ সাধন করেছে।

বিমান পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে দেশভাগের পর। তার আগে তেজগাঁও এর ছোট বিমানবন্দর ব্যবহার করত রাজকীয় বিমান বহিনী (R.A.F)। দেশভাগের পর ইস্পাহানি গ্রুপের বিমান চলাচল শুরু করে ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-কলিকাতা, ঢাকা-করাচি এবং ঢাকা-লাহোরের মধ্যে। এই বিমান সংস্থার নাম ছিল ওরিয়েন্ট এয়ার লাইন্স। কিন্তু এদের উড়ান ব্যবস্থা সাফল্য লাভ করতে না পারায়, সেই দায়িত্ব গ্রহণ করে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স (P.I.A.)। আকাশ পথে আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক সংযোগব্যবস্থায় সৃষ্টি হয় যুগান্তর। বাংলাদেশের দুর্গম ও দ্বীপাঞ্চলের মধ্যে সংযোগ সাধন করে P.I.A., হেলিকপ্টার পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে।

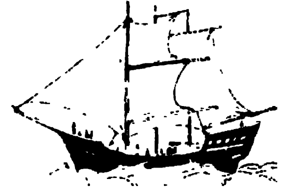
হেলিকপ্টার সার্ভিস সে সময়ে চালু ছিল ঃ ১. ঢাকা-খুলনা, ২. ঢাকা-বরিশাল, ৩. ঢাকা-ফরিদপুর, ৪. ঢাকা-বেগমগঞ্জ, ৫. ঢাকা-হাতিয়া, ৬. ঢাকা-সন্দ্বীপ, ৭. ঢাকা-চট্টগ্রাম, ৮. ঢাকা-বগুড়া, ৯. ঢাকা-সিরাজগঞ্জ, ১০. ঢাকা-রংপুর, ১১. ঢাকা-কুষ্টিয়া, ১২. ঢাকা-ভোলা, ১৩. ঢাকা-দিনাজপুর এবং ১৪. ঢাকা-চাঁদপুর।

'বাংলাদেশ বিমান' যাত্রা শুরু করে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। বর্তমানে এই বিমানবহর ২২টি আন্তর্জাতিক রুটে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন করে থাকে। তাছাড়া রয়েছে বিদেশি বিমানের ঢাকা হয়ে নিয়মিত যাতায়াত। তেজগাঁও-এর পুরনো বিমান বন্দর এখন আর ব্যবহার করা হয় না। কুর্মিটোলায় নবনির্মিত জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে চলাচল শুরু হয় ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর।

১. ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯৩। পৃঃ ৭
২. Statistical Account of Bengal. Vol V. Dacca. Page 18
৩. ঢাকা ঃ পঞ্চাশ বছর আগে—হাকিম হাবিবুর রহমান। পৃঃ ৩-৪
৪. ঢাকা ঃ স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী—মুনতাসীর মামুন। পৃঃ ২৭—৩২
৫. মোঘল রাজধানী ঢাকা—ডঃ আবদুল করিম। পৃঃ ৫৯
৬. Statistical Account of Bengal. Dacca District. Vol V p. 51-52
৭. Statistical Account of Bengal, Vol. V Page 103-104
৮. ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার—১৯৯৩, পৃঃ ৫৩
৯. Statistical Account of Bengal. Vol V. Dacca, p. 30
১০. Statistical Account of Bengal. Dacca. Vol V. P. 31
১১. ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯৩। পৃঃ ১২-১৩
১২. Statistical Account of Bengal, Vol. V, Dacca, p. 20
১৩. ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯৩। পৃঃ ১৬-১৭
১৪. Statistical Account of Bengal, Vol V, Dacca, p. 21
১৫. ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯৩। পৃঃ ১৩
১৬. Statistical Account of Bengal, Vol V, Dacca, p. 21-22

১৭. ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯৩। পৃঃ ১৫
১৮. Statistical Account of Bengal, Vol V, Dacca, p. 22
১৯. Statistical Account of Bengal, Vol V, Dacca, p. 22-23
২০. জীবনস্মৃতি-সুদক্ষিণা সেন। পৃঃ ১০০
২১. ঢাকা প্রকাশ, ১৯ জুন ১৮৭০
২২. ঢাকা প্রকাশ, ১৪ আগষ্ট ১৮৭০
২৩. ঢাকা প্রকাশ, ১০ আগস্ট ১৮৭৯
২৪. ঢাকা প্রকাশ, ৯ জানুয়ারি ১৮৮১
২৫. ঢাকা প্রকাশ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯০
২৬. ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯৩। পৃঃ ৩২৪

* ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯৯



২. বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ

বিশ শতক অবিভক্ত বাংলার ইতিহাসে নানা ঘটনায় সমাকীর্ণ। যার সূচনা বলা যেতে পারে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব থেকে। শাসক ইংরেজ রাজশক্তি সঙঘবদ্ধ বাঙালি মানসিকতাকে দ্বিধাবিভক্ত করার যে উদ্যোগ নিয়েছিল, তাতে সফল হয়েছিল তারা। প্রস্তাবের সমর্থনে এবং বিপক্ষে হিন্দু-মুসলমান দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছেদ এমন তীব্রভাবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, পরবর্তীকালে যা দেশ বিভাগের মধ্য দিয়েই পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। যেখানে বাঙালি হিন্দু আর বাঙালি মুসলমান দুটি ভিন্ন ধর্মালম্বী, দুটি স্বতন্ত্র দেশের নাগরিক হয়ে গেল। বঙ্গভঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়েছে বিস্তর। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কার্যকর এবং অবশেষে প্রত্যাহার সবকিছুর পিছনে ছিল সাম্রাজ্যবাদী সরকারের গূঢ় অভিসন্ধি। প্রশাসনিক কারণে এই প্রস্তাব পেশের কথা ইংরেজ সরকার ঘোষণা করলেও, একতাবদ্ধ বাঙালি হিন্দু-মুসলমান বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসায়িক সম্প্রদায়কে দ্বিখণ্ডিত করাই ছিল তাদের গোপন অভিপ্রায়। বঙ্গভঙ্গ প্রথম ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন, যার পক্ষে বিপক্ষে জনমত প্রবলভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। ১৯০৩ খ্রিঃ থেকে ১৯০৫ খ্রিঃ জুড়ে পূর্ববঙ্গের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ছিল আন্দোলনের ব্যাপকতা। প্রথমদিকে আন্দোলনের বিরোধিতা ছিল প্রবল, পরে দেখা দেয় স্বপক্ষে আন্দোলন। স্পষ্টত বাংলা জনমত দুভাগ হয়ে গিয়েছিল সেদিন। বহু সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ঢাকা তখন পূর্ববাংলার প্রাণকেন্দ্র। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিপক্ষে এই শহরে গঠিত হয়েছিল জনসাধারণসভা (পিপলস অ্যাসোসিয়েশন)। যার নেতৃত্বে ছিলেন আইনজীবী ও জমিদার আনন্দচন্দ্র রায়। এই আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল মফস্বলের জমিদার, তালুকদার, চাকুরিজীবী, কিছু ব্যবসায়ী, স্কুলশিক্ষক, প্রভাবশালী ব্যক্তির নেতৃত্বে। ঢাকা এবং ময়মনসিংহ ব্যতীত অন্যত্র আন্দোলন তেমন তীব্র ছিল না। এদের এই প্রয়াস যে সাফল্য লাভ করেনি, তার অন্যতম কারণ, সাধারণ মানুষের এই আন্দোলনে কোন আগ্রহ ছিল না। তাদেরকে নেতৃবৃন্দ যেমন কাছে টেনে নিতে পারেননি, তেমনি তারা দেখেছিল এই আন্দোলন তাদের কোনরকম স্বার্থসিদ্ধি করবে না।

ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিম্নবর্ণের মানুষ বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন এর পিছনে সাম্প্রদায়িক কারণই ছিল মুখ্য। এমন যুক্তি অনেকেই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায় সুদীর্ঘকাল বৈষম্য ও অবহেলার শিকার হয়েছে, বঙ্গভঙ্গর মধ্য দিয়ে তার নিরসন ঘটতে পারে, এমন একটা সম্ভাবনা সক্রিয় ছিল তাদের মধ্যে। তাছাড়া ঢাকার নবাব ছিলেন সকল শ্রেণীর মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধেয়। ঐ সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই তার মতামতকে মান্য করতেন। তখন অবশ্য বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেনি। তা ঘটলে, নবাবের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ ঘটত না। কারণ, এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কারণেই ঢাকার নবাব পরিবারের কর্তৃত্বের অবসান ঘটে পরবর্তীকালে।

অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বলেছেন, "...এটা স্বীকার্য যে ১৯০৫ পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলনগুলির মধ্যে বঙ্গভঙ্গই একমাত্র আন্দোলন যার ব্যাপকতা ছিল। আন্দোলনের পক্ষে-

বিপক্ষে অংশগ্রহণকারী মানুষের সংখ্যাও ছিল বেশি। পরবর্তীকালে আরো ব্যাপক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা স্বদেশী বা স্বরাজ আন্দোলনের ভিত্তি ছিল বঙ্গভঙ্গের আবেগজাত উপাদানবলী যা ঔপনিবেশিক সরকার বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের ফলে কিন্তু আবার আবির্ভাব হয়েছিল এক নতুন শ্রেণীর নেতাদের যারা আবার চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে। অন্যদিকে মুসলমানরাও সম্প্রদায় হিসেবে আরো সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। এ আন্দোলনের ফলে যার পরিণতি ঘটেছিল মুসলমান লিগে ও অন্যান্য ঘটনাবলীতে। শহরে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পর্কে অনেকাংশে ফাটল ধরিয়েছিল বঙ্গভঙ্গ।" (উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র। অষ্টমখণ্ড। পৃঃ ২০৮-২১২)।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'ঢাকা প্রকাশ' এবং 'দি বেঙ্গল টাইমস' দুটি সংবাদপত্র ছিল সে সময়কার গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ মাধ্যম। 'ঢাকা প্রকাশ' ছিল হিন্দুদের মুখপত্র এবং "বেঙ্গল টাইমস" ইংরেজদের। এই দুটি পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্গভঙ্গ বিষয়ক প্রস্তাব, সংবাদ এবং সমীক্ষা সংকলিত হয়েছে অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের 'উনিশ শতকের বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র' সংকলনের ৪র্থ ও ৮ম খণ্ডে। বঙ্গবিভাগের প্রস্তাবের সূচনা থেকেই এর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার সুরু হয়ে যায়। আন্দোলন ক্রমশ ব্যাপক রূপ নিতে থাকে। সে সময়ে প্রকাশিত সংবাদপত্রের প্রতিবেদন এখানে উদ্ধৃত করা হল অধ্যাপক মামুনের সংকলন থেকে।

পূর্ববঙ্গের বিসর্জন :

অশুভক্ষণে হোম সেক্রেটারী রিজলী সাহেবের চিত্তাকাশে বঙ্গে অঙ্গচ্ছেদরূপ কালোমেঘ সমুদিত হইয়াছিল। অশুভক্ষণে সেই মেঘের বিজলী বিকাশ রাজকীয় ঘোষণাপত্র সমাশ্রয়ে লোক নয়নে নিপতিত হইয়া ভাবী বজ্রপাতের সূচনা করিয়াছিল। তদবধি এ অঞ্চলের অধিবাসীগণ কি যে অশান্তিতে কালাতিপাত করিতেছে, ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরকে তাহা বুঝাইয়া বলা কঠিন। শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, এই শোচনীয় সমাচার যাহার কর্ণগোচর হইয়াছে, সেই আসন্ন আপদের আশঙ্কায় আতঙ্কান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। কৃষক তনয় হইতে জমিদার কুমার সকলেই স্বদেশের গৌরব রক্ষণে বদ্ধপরিকর হইয়া সম্ভ্রমের সহিত গভর্নমেন্টের এই অন্যায় প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। এই নিমিত্ত শহরে ও মফস্বলে বহুসংখ্যক সভাসমিতির অনুষ্ঠান হইতেছে। এ পর্যন্ত যে কয়টি সভার সংবাদ আমাদের হস্তগত হইয়াছিল, স্থানান্তরে তাহা বিবৃত হইল। গভর্নমেন্ট যদি অধিবাসীবৃন্দের আর্তনাদে কর্ণপাত না করিতে কৃতসংকল্প হইয়া থাকেন, তবে অবশ্যই স্বতন্ত্র কথা, নচেৎ, যেরূপ অনুষ্ঠান দেশবাসী আবালবৃদ্ধবনিতার অনভিপ্রেত, কোন সুশাসক তাদৃশ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিতে সম্মত হইবেন, ঢাকা ও ময়মনসিংহের পরিবর্তন প্রস্তাব পূর্ববঙ্গবাসীর নিকট এমনই বিসদৃশ বলিয়া অনুমিত হইতেছে যে এই বিপ্লবকর ব্যাপারকে সাধারণের চক্ষে অনুমোদনযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত গভর্নমেন্ট যে সকল আশ্বাসবাক্য প্রদান করিতেছেন, তৎসমস্তই অধিবাসীবৃন্দের নিকট উপেক্ষা যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে কর্তৃপক্ষ অবশ্যই বুঝিতে পারিতেন, স্বর্গে থাকিয়া দাসত্ব করাও শ্রেয়; নরকের রাজত্ব লাভও বাঞ্ছনীয় নহে। বড়ই পরিতাপের বিষয়, লর্ড কার্জনের ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তিও জাতীয়ত্ব বিসর্জনে অধিবাসীবৃন্দের আর্তনাদ কাল্পনিক বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন।

আসামের অন্তর্ভুক্ত হইলে ঢাকা ও ময়মনসিংহবাসীদের যে সকল সুবিধা হইবে; তাহা ক্রমান্বয়ে লিপিবদ্ধ করিতে গেলে ঢাকা প্রকাশের ক্ষুদ্র কলেবরে কুলাইয়া উঠে না। সমাজ, শিক্ষা, শাসন প্রভৃতি যে কোন বিষয় লইয়া এই পরিবর্তন প্রস্তাব চিন্তা করিয়া দেখা যায়, তাহাই নিতান্ত বিভীষিকাময় বলিয়া অনুমিত হয়। কাজেই, এই প্রলয়কর প্রস্তাবের সম্পূর্ণ

প্রত্যাখ্যান ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। যাহার সর্বাঙ্গে ক্ষত কোন অঙ্গে তাহার অধিকবেদনা তাহা জিজ্ঞাসা করা যেমন নিরর্থক, ঢাকা ও ময়মনসিংহ আসামভুক্ত হইলে কি কি অসুবিধা হইবে তাহা বিবৃত করিতে অগ্রসর হওয়াও তেমনি অপ্রয়োজনীয়। এজন্যই আমরা এই ন্যায়বিগর্হিত ব্যাপার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য প্রথমাবধিই গর্ভনমেন্টকে অনুরোধ করিয়া আসিতেছি। বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের বিস্তীর্ণ রাজ্যে যাহাদের আশা ও ভরসা পরিসমাপ্তি লাভে অভ্যস্ত; সে গভর্নমেন্টের অধীন থাকিয়া বাঙালি সন্তান একদিন বিভাগীয় কমিশনারের পদলাভে সমর্থ হইতে পারে, তাহারা সানন্দে আসামের ন্যায় সংকীর্ণ শাসননীতির অধীন হইবে, ইহা কল্পনা করাও কি প্রমত্ততার পরিচায়ক নহে।

পূর্বাবধিই আমরা বলিয়া আসিতেছি, বঙ্গসন্তান 'বাঙালি' আখ্যা পরিত্যাগ করিতে প্রাণান্তেও প্রস্তুত নহে। জন্মভূমি ভাষা এবং ধর্ম সম্পর্কে সমগ্র বাঙালি জাতি এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। গভর্নমেন্ট যদি এই পবিত্র বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে যত্নবান হন, তবে সমগ্র বাঙালিজাতির প্রাণে ঘোর অশান্তি অনল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে। বঙ্গের শাসনভার যদি নিতান্তই গুরুতর হইয়া থাকে, তবে একজিকিউটিভ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হইলেই সকল গোল মিটিয়া যাইতে পারে। আর শাসন সৌকার্যার্থ যদি একান্তই বঙ্গের পুনর্গঠন প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে, তবে আমরা বলি, খাস বঙ্গদেশ এবং আসাম, বঙ্গেশ্বরের শাসনাধীন করা হউক, অপরদিকে বিহার, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশের জন্য আর একজন লেপ্টেনেন্ট গভর্নর নিযুক্ত হউক। এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা শাসনকার্যও সুশৃঙ্খল ভাবে চলিতে পারে, অথচ গভর্নমেন্টকেও ব্যয়াধিক্য বহন করিতে হয় না। কারণ, দুই জন চিফ কমিশনারের পরিবর্তে একজন লেপ্টেনেন্ট গভর্নর নিযুক্ত হইলে বেতনভার অবশ্যই হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। তারপর, খাস বঙ্গ ও আসামের লোকসংখ্যা সর্বসমেত ৪৭৩৮৬২৩ জন। এতগুলি লোকের উপর একজন লেপ্টেনেন্ট গভর্নর নিযুক্ত হইলে তাহা কখনও অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

ভাই ঢাকাবাসীগণ। সোদর প্রতিম ময়মনসিংহ সন্তান। প্রাণপণ করিয়া মাতৃভূমির গৌরব রক্ষণে বদ্ধপরিকর হও। তোমাদের আন্দোলন নিষ্ফল হয় নাই। সহৃদয় বঙ্গেশ্বর বাহাদুর বুঝিতে পারিয়াছেন, এই ব্যাপারে বাঙালির প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিবে, তাই তিনি জনসাধারণের মতামত জানিতে চাহিয়াছেন। শুনিতেছি, জনসাধারণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া এই বিষয়ে রিপোর্ট করিবার নিমিত্ত নাকি বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুর এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটদিগকে অনুরোধও করা হইয়াছে। ইহা সুসমাচার, সন্দেহ নাই। ঢাকা ও ময়মনসিংহের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দ যদি এই সময়ে জনসাধারণের মনের ভাব কমিশনার বাহাদুরের গোচরে আনিতে পারেন, তবে বোধ হয়, তাহা নিতান্ত নিরর্থক হইবে না। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়দিগকেও এ বিষয় বিশদরূপে বুঝাইয়া বলিতে হইবে। তাঁহারা যদি জনসাধারণের মানসিক অবস্থার কথা যথাযথ রিপোর্ট করেন, তবে বঙ্গেশ্বর বাহাদুর কখনও তাহা উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। এ সময়ে মিঃ র‍্যানকিনের ন্যায় মহাপুরুষের হস্তে ঢাকার শাসনভার ন্যস্ত আছে, ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নহে। র‍্যানকিন সাহেবের ন্যায় সুশাসকের দেবহৃদয় নিশ্চয়ই প্রজার ক্রন্দনে ব্যথিত হইবে। ভরসা করি, ঢাকাবাসীর আর্তনাদ তিনি কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করিয়া অভাগা অধিবাসীবৃন্দের আন্তরিক শ্রদ্ধা লাভে সমর্থ হইবেন। দেশের হিসাবে যাহারা, বঙ্গসন্তান, ভাষার হিসাবে যাহারা বাঙালি, সে জাতিকে যেন বিভিন্ন শাসনের অধীন করা না হয়, ইহাই আমাদের একমাত্র অনুরোধ। কলিকাতা বর্তমান সময়ে বঙ্গ সাহিত্যের কেন্দ্রস্থল, সুতরাং বাংলা যাহাদের ভাষা, কলিকাতার সম্বন্ধ পরিত্যাগ তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বঙ্গদেশ হইতে বিচ্যুত হইলে, বাংলাভাষাও অচিরেই তাহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে। প্রকৃতির ঈদৃশ বিকৃতি কিরূপ ভয়াবহ তাহা কল্পনারও অগোচর।[১]

(২)

কে জানে, পূর্ববঙ্গবাসীর ভাগ্যপট বিধাতা কিরূপভাবে চিত্রিত করিয়াছেন? নচেৎ এত আলোচনা আন্দোলনের ফলেও গভর্নমেন্ট স্বকীয় ভ্রম বুঝিতে সমর্থ হইতেছেন না কেন। নিতান্ত নিমীলিত নয়নে নিদ্রা না গেলে, এই যে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছে তাহা উপেক্ষায় উড়াইয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে। কুম্ভকর্ণ হইলেও তাহার নিদ্রাভঙ্গ করা সাধ্যায়ত্ত ; কিন্তু কেহ যদি প্রকৃত নিদ্রিত না হইয়া নিদ্রার ভান করে, তবে তাহাকে উদ্বোধিত করে কাহার সাধ্য। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবে দেশে কিরূপ অশান্তি আনয়ন করিয়াছে তাহা বোধ হয়, ভারতে এখন আর কাহারও জানিতে বাকি নাই। সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে, রিজলী সাহেবের প্রস্তাবের ফলে সুদূর পল্লীর প্রান্তভাগ পর্যন্ত সমস্ত অধিবাসীবৃন্দ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রজাবর্গের প্রাণে উদ্বেগ ও অশান্তি জন্মাইয়া দিয়া গভর্নমেন্ট সুখানুভব করিবেন এরূপ কল্পনা করাও যদি অসঙ্গত; কি উদ্দেশ্যে তবে এত আলোচনা আন্দোলনের পরেও গভর্নমেন্ট এই প্রলয়কর প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতেছেন না, সহজ বুদ্ধিতে সে তত্ত্ব নির্ণয় করা একান্তই অসম্ভব। ভাল; এই যে, অনর্থপাতের আশঙ্কায় দরিদ্র দেশবাসীগণ উদ্বিগ্নচিত্তে শোণিতসম অর্থে টেলিগ্রাফ ইত্যাদির ব্যয় করিতে বসিয়াছে, এজন দায়ী হইবে কে? গভর্নমেন্ট ভ্রূভঙ্গিতে আমাদিগকে চিরদিনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবেন, আর প্রপীড়িত প্রজাগণ মুখ ফুটিয়া মর্মবেদনাও জ্ঞাপন করিতে পারিবে না। অন্যকালে একথা অসম্ভব না হইলেও বিংশ শতাব্দীতে এরূপ কল্পনা করাও বাতুলতাজ্ঞাপক। কার্যেই জনসাধারণের মতামত না জানিয়া যখন গভর্নমেন্ট এই প্রলয়কর প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তখন অবথা অর্থব্যয়ের জন্য ন্যায়তঃ ও ধর্মতঃ ভারত গভর্নমেন্টকেই দায়ী হইতে হইবে। যে দেশের লোক পেটের জ্বালায় পুড়িয়া মরে তাহাদিগের একটি কপর্দকও যদি এরূপ ভাবে ব্যয়িত হয় তবে তদপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে।

ঢাকা ও ময়মনসিংহ আসামের অন্তর্ভূক্ত হইলে এই অঞ্চলবাসীকে যে অশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। শিক্ষা, সমাজ এবং শাসন প্রভৃতি সর্ববিষয়ে যে প্রদেশ ভারতে সর্বনিম্নস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহার সহিত শ্রেষ্ঠতম প্রদেশের অংশবিশেষ যুক্ত হইলে এই বিচ্ছিন্ন বিভাগের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। বিভিন্ন ভাষাবলম্বীর মধ্যে ইহা কাহারও পক্ষে সুবিধাজনক হইতে পারে না। প্রজার সুখ শান্তি বিধান যদি গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য হয়। তবে এই অসুবিধার আপত্তি কখন উপেক্ষাযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কিন্তু, এই অসুবিধার কথাই আমাদের আপত্তি নহে। এই বিপ্লবকর ব্যাপারে আমাদের প্রথম ও প্রধান আপত্তি জাতীয়ত্ব। বঙ্গের আমরা আদিম অধিবাসী। প্রাচীনকালে পূর্ববঙ্গই একমাত্র বঙ্গদেশ বলিয়া কীর্তিত হইত। সুতরাং পূর্ববঙ্গবাসীর বাঙালি আখ্যা চিরন্তন। আবহমানকাল হইতে আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে যে জাতি বলিয়া পরিগণিত, সে সাধের স্মৃতি বিনা বাক্যব্যয়ে বিসর্জন করিয়া, হোম সেক্রেটারীর পরিবর্তন পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে হইবে, পূর্ববঙ্গ ব্যতীত ভারতের কুত্রাপি গভর্নমেন্ট এইরূপ বিসদৃশ ব্যবস্থাবিধানে অগ্রসর হইতেন কিনা সন্দেহ। জাতীয় তেজে যাহারা অনুপ্রাণিত, জাতীয়ত্বের মাহাত্ম্য যাহারা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এতদপেক্ষা ভীষণ ব্যাপার আর কিছু হইতে পারে কিনা, জানি না। বড়ই পরিতাপের বিষয়। স্বকীয় জাতীয়ত্বের অনুমান সঙ্কোচ দর্শনে যে জাতি ভুজঙ্গশিশুর ন্যায় গর্জন করিয়া উঠে, তাহাদেরই প্রতিনিধি আজ একটি প্রাচীন জাতির অস্তিত্ব অপনয়নে অগ্রসর।

প্রথমাবধিই আমরা বলিয়া আসিতেছি, সমগ্র বাঙালিজাতিকে এক শাসনের অধীন না রাখিলে জাতীয় উন্নতির পথে বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইবে। সমগ্র বাঙালি সমাজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত।

এই বিভিন্ন ভাবাবলম্বী ব্যক্তিবৃন্দকে যদি কখনও একতাসূত্রে সম্বন্ধ করা সম্ভবপর হয়, তবে বাংলা ভাষাই তাহার একমাত্র উপাদান। জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে, বাংলা ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইবে। ঢাকা ও ময়মনসিংহ যদি আসামের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে আসামী সংস্পর্শে এ অঞ্চলের বাংলা ভাষা অচিরেই রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। বর্তমান সময়ে যাঁহারা মনে করিতেছেন, শাসন কার্যার্থ ঢাকা ময়মনসিংহ যদি বঙ্গদেশ হইতে বিচ্যুতও হয়, তবে ঢাকা ময়মনসিংহবাসীর বাঙালিত্ব ঘুচিবে কিসে, তাঁহারা যদি ভাষার দিক দিয়া চাহিয়া দেখিতেন তাহা হইলেই সহজেই বুঝিতে পারিতেন যে, ঢাকা ময়মনসিংহের ভাষা রূপান্তরিত হইলে তখন আর ইহাদিগকে বাঙালি বলিয়া চিনিবার কিছুই থাকিবে না। ঈশ্বর না করুন, যদি সত্য সত্যই গবর্নমেন্ট এই অপ্রিয় প্রস্তাব পরিবর্তন না করেন, তবে এই ভাষাগত পার্থক্যই বাঙালির সর্বনাশের কারণ হইবে।

সহৃদয় বড়লাট বাহাদুর। বাঙালির জাতির অকল্যাণ কামনা হৃদয়ে লইয়া ..., তুমি কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছ, এমন কথা আমরা ভ্রমেও মনে স্থান দিতে পারি না। কিন্তু প্রভো! তুমি সত্যসত্যই মহাভ্রমে নিপতিত হইয়াছ। বঙ্গের শাসনভাব যদি একান্তই গুরুতর হইয়া থাকে, তবে, সমগ্র উড়িষ্যা প্রদেশ শাসনান্তরের অধীন করিয়া দাও, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না। কিন্তু দেব! বাঙালি জাতির মধ্যে বিভাগ বণ্টন ব্যাপার আনয়ন করিয়া এই দুর্বল জাতিকে আরও হীনবল করিও না। বাঙালির সন্তান আমরা, মাতৃভূমির সহিত সম্বন্ধত্যাগ করিব, একথা মনে করিতেও বুক ফাটিয়া যায়। যদি কোন বাঙালি সন্তান তোমাকে অন্য ভাবে বুঝাইয়া থাকে, নিশ্চয় জানিও প্রভো, সে ব্যক্তি স্বদেশের পরম শত্রু, স্বজাতির উচ্ছেদ সাধক। এই সমস্ত তথাকথিত প্রতিনিধির কথায় প্রত্যয় করিয়া যদি সমস্ত বাঙালির আবেদন অগ্রাহ্য কর, তবে স্পষ্টই বুঝিব বাঙালির সর্বনাশ সাধন ব্যতীত এ ব্যাপারে তোমার অপর কোন উদ্দেশ্য নাই। হিন্দুসন্তান আমরা, স্বদেশে থাকিয়া ভিক্ষা করিয়া মরিতেও প্রস্তুত আছি। তথাপি পরের দেশে যাইয়া সুখ সমৃদ্ধি বা রাজসম্মান লাভে কৃতার্থ হইতে চাহি না। আসামে যদি আমাদের জন্য সহস্র প্রকার সুবিধা ও সুযোগের ব্যবস্থা কর, তথাপি দেব, আমরা তাহা তৃণবৎ উপেক্ষা করিব। পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতিকে বিভাগ বণ্টন রূপ প্রহসনের আঘাতে হীনবল করিও না। তোমার চরণে দেব, সওয়া চারি কোটি বাঙালির ইহার প্রার্থনা।[২]

হিন্দুর অন্তিম আশা

... ভাই হিন্দু সন্তান। এস সবে আজ সেই জগজ্জননীর চরণে শরণ লইয়া উপস্থিত আপদে অব্যাহতি প্রার্থনা করি। মায়ের কৃপা না হইলে এ দুর্দিনে আত্মরক্ষার উপায়ন্তর দেখিতেছি না। **এ জন্যেই বলিতেছিলাম, হিন্দু সন্তানগণের এখন আর আত্মক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কর্তব্য নহে। এস ভাই। আজ এ বিপদের সময় আমরা সকলে মিলিয়া মা ঢাকেশ্বরীর কৃপা প্রার্থনা করি। ... মা মঙ্গলময়ী। এ বিষম বিপদবহ্নি হইতে অভাগা সন্তানগণকে উদ্ধার কর। ঢাকাবাসী চিরদিনই তোমার কৃপাপাত্র। তুমি কৃপা না করিলে আমরা দাঁড়াইব কোথায় মা।**[৩]

বড়লাটের বাগ বিস্তার

বাক্য-বিলাসী বড়লাট বাহাদুর নানা ছন্দে বাগজাল বিস্তার করিয়া ঢাকা ময়মনসিংহ ও চট্টলবাসীর কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিয়া গিয়াছেন, এখন, বোধহয় সে কথা আলোচনা করিবার সময় হইয়াছে। জ্যোতিপিণ্ডের প্রচণ্ড প্রভা অকস্মাৎ নয়নপথে নিপতিত হইলে কিয়ৎকাল যেমন অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়, বচনরচনা নিপুণ, বড়লাট বাহাদুরের মুখস্থিত রচনা প্রবাহের তরঙ্গ-ভঙ্গে পড়িয়া পূর্ববঙ্গবাসীগণ তেমনই কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্তম্ভিত ও বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন ; ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক দাতা কর্ণের নিকট গলদশ্রুনয়নে ও করজোড়ে অন্নভিক্ষা করিয়া যদি ভস্মমুষ্টি প্রাপ্ত হয়, তবে যেমন অভাগা ভিখারি অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া

থাকে, জগতপূজ্য সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে ভারতের বর্তমান ভাগ্যবিধাতার নিকট পোড়া পূর্ববঙ্গবাসী কাতর ক্রন্দনের ফলে বিভীষিকাপূর্ণ ভৎর্সনা বাক্য লাভ করিয়া তেমনই বীতশ্রদ্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাঁহার মুখে আশ্বাস বাণী শুনিবে বলিয়া পূর্ববঙ্গের অধিবাসীবৃন্দ বড় আশায় বুক বাধিয়া ছিল, প্রকৃতির বিকৃত, কালআকাঙ্খিত আশ্বাসবাণী হুঙ্কারে পরিণত হইয়া বিষম বিভীষিকার বিস্তার করিয়াছে—ইহা বলিতে ঘৃণা ও লজ্জায় মরমে মরিয়া যাইতে হয়, পূর্ববঙ্গে রাজপ্রতিনিধির বাগ বিস্তার সত্য সত্যই, এমনিই হলাহল করিয়া সভ্যতার শিরে দুরপনেয় কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছে।

যিনি অদ্বিতীয় বাক্যবাগীশ বলিয়া সর্বত্র সুপরিচিত, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি তাঁহার বাক্যাবলীর সমালোচনা করিতে প্রয়াস পাইবে, ইহা 'উদ্বাহুরব বামন'বৎ প্রতীয়মান হইলেও কর্তব্যের দায়ে এ সম্বন্ধ দুই চারিটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। সম্রাট প্রতিনিধির অত্যুচ্চ আসনে যিনি প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার মুখারবিন্দ হইতে যে রচনারাজি নিঃসৃত হয়, তন্মধ্যে যদি অসম্বন্ধতা, অপ্রাসঙ্গিকতা অযৌক্তিকতার লেশমাত্র বিদ্যমান থাকে, তবে তদপেক্ষা পরিতাপের আর কি হইতে পারে। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় চট্টগ্রাম, ঢাকা বা ময়মনসিংহের প্রদত্ত বক্তৃতাত্রয়ের মধ্যে অনুসন্ধিৎসু পাঠক এমন দুটি কথাও খুঁজিয়া পাইতেছেন না, যুক্তি বা প্রত্যক্ষ পদার্থের সহিত মিলাইয়া দেখিলে যাহা কথঞ্চিৎ মাত্রাও সারবত্তা উপলব্ধি হইতে পারে। একদিন যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ট ব্যক্তি হইবার আশা রাখেন বলিয়া সম্মুখে অম্লানবদনে এইরূপ অসার যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া পূর্ববঙ্গের দেড় কোটি অধিবাসীর মনে বিভীষিকার সঞ্চারে যত্নবান হইবেন; একথা কল্পনা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। কিন্তু কালের ক্রীড়া এমনই অদ্ভুত একদিন কল্পনারও যাহা অগোচর ছিল, তাহা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান।

এই সুদীর্ঘ বক্তৃতাত্রয়ের মধ্যে অন্য কোন ভাবের বিকাশ সহজ দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত না হইলেও প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বিদ্রূপাত্মক উগ্রতার রুদ্র মূর্তি পাঠকের প্রাণে যুগপৎ আতঙ্ক ও নৈরাশ্যের সঞ্চার করিয়া থাকে। আগাগোড়া সেই তর্জনী সঞ্চালিত ভৈরব গর্জন, মুখবন্ধ হইতে উপসংহার পর্যন্ত নিরীহ দেশবাসীর প্রতি প্রচণ্ড প্রভাব-প্রচ্ছাদিত উপহাসবর্ষণ ; উপেক্ষা প্রদর্শন। চট্টগ্রামে যাহার পূর্বভাষ, ঢাকায় তাহার ঈষৎ-বিকাশ এবং ময়মনসিংহে তাহা পূর্ণপ্রভায় পরিস্ফুট। এ জন্যই বুঝি বড়লাট বাহাদুর বলিয়াছেন, 'এই তিন স্থানের বক্তৃতা একত্র করিয়া পাঠ না করিলে প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন না।' যাহা হউক, যাহা হইবার হইয়াছে, পূর্ববঙ্গবাসীর পোড়া অদৃষ্ট পটের নিয়োগানুসারে অমিয়ার আধার হইতে হলাহল প্রবাহ উদ্‌গীরিত হইয়া অভাগা অধিবাসীর জীবনীশক্তির সংহারে অগ্রসর হইয়াছে, এজন্য আক্ষেপ করিয়া লাভ কি। লাভ কিছু নাই তাহা বুঝি, কিন্তু কথা এই যৌক্তিকতার মর্যাদা রক্ষণই যে জাতির প্রধান ব্রত তাঁহাদের প্রতিভূরূপে বড়লাট বাহাদুর এই অঞ্চলবাসীর প্রতিনিধিবর্গের ন্যায্য আবেদন উপেক্ষা ও অবজ্ঞার চক্ষে অবলোকন করিবে এ কেমন ব্যাপার। যদি সত্য সত্যই আমাদের আবেদন উপেক্ষিত হইল, তবে আমরা আমাদের পরমপূজনীয় সম্রাটের কৃপা প্রার্থী হইতে পারি না কি? আমাদের মনে হয়, বড়লাট বোধ হয় ভুল বুঝিয়াছেন। ভীতি প্রদর্শনে কার্যোদ্ধারের দিন এখন আর নাই। পঞ্চমবর্ষীয় শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেরই নিকট ন্যায়ের রাজ্য সুপরিচিত। কাজেই ন্যায়ের পবিত্র পতাকা উড্ডীন না হইলে, সহস্র গর্জনেও মানব মণ্ডলী মস্তক অবনমিত হইবে না।

পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ বক্তৃতায় ত্রিবিধ দোষ পরিলক্ষিত হইতেছে : অসম্বন্ধতা ; অপ্রাসঙ্গিকতা এবং অযৌক্তিকতা। অসমৃদ্ধতায় নিদর্শনস্থলে চট্টগ্রামের বক্তৃতায় কটন সাহেবের উক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বড়লাটই বলিয়াছেন ... Unquestionalily and inevitably wrote as a Bengal Officer "অর্থাৎ

কটন সাহেব বঙ্গদেশের সিবিলিয়ানের ন্যায় লিখিয়াছেন।" ভাল, জিজ্ঞাসা এই বঙ্গবিভাগ ব্যাপার বঙ্গদেশীয় সিভিলিয়ানের চক্ষে অবলোকন করাটা দোষবহ বিবেচিত হইতে পারে কি? বঙ্গের অংশ বিশেষ চট্টগ্রাম বিভাগ আসাম ভুক্ত করার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ কালে বঙ্গীয় সিভিলিয়ান বলিয়া, যদি কটন সাহেবের ন্যায় প্রধান পুরুষের মত উপেক্ষিত হইল, তবে বিভাগ ব্যাপারে স্যর জন উডবারন এবং মিঃ বোর্ডিলন প্রভৃতির মত প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইল কেন? তাহারাও তো বঙ্গীয় সিভিলিয়ান। তারপরে বড়লাটের কথা মতে স্যর জন্য উডবারন প্রভৃতি সিভিলিয়ানগণ, বঙ্গবিভাগে মত প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগ ব্যাপার কিরূপে সম্পন্ন হইবে তৎসম্বন্ধে তাহারা কোন মত প্রদান করিয়াছেন কিনা, বড়লাট বাহাদুর তো তৎসম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। বঙ্গের অংশ বিশেষ আসামভুক্ত করা সম্বন্ধে তাহারা সম্মত ছিলেন কিনা এ কথা কে বলিবে? বঙ্গের অংশ বিশেষ আসামভুক্ত করা অথবা ঐ অংশ বিশেষ ও আসাম লইয়া নতুন প্রদেশ গঠন করা ব্যতীতও তো অন্যরূপে এই বঙ্গ বিভাগ সম্পন্ন হইতে পারে। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা লইয়া বাংলা প্রেসিডেন্সি গঠিত। ইহার মধ্যে উড়িষ্যা ও বিহার ছাড়িয়া প্রকৃত বঙ্গদেশ ও আসাম লইয়া একটি নূতন প্রদেশ হইলে দোষ কি? তবে বঙ্গের অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করা কেন? স্যর জন উডবারণ প্রমুখ ব্যক্তি যদি বাংলা প্রেসিডেন্সির বিভাগ করিতে সম্মত হইয়াই থাকেন, তবে, তাঁহার বর্তমান আশ্বাস অনুযায়ী বিভাগের পক্ষপাতী কিনা এ প্রশ্ন সাধারণের মনে উঠিতে পারে নাকি? কটন সাহেব বঙ্গের অংশ বিশেষ আসামভুক্ত করার সম্বন্ধেই আপত্তি করিয়াছিলেন। হয়ত বড়লাট যাহাদিগের নাম প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহারাও এরূপ প্রস্তাবের পক্ষে নহেন। আর যদি তাঁহারা এ প্রস্তাবের পক্ষপাতীই হন, তবে বঙ্গীয় সিভিলিয়ান বলিয়া কটন সাহেবের মত পরিত্যক্ত হইবে, আর ঠিক সেই কারণে স্যর ডন উডবারণের মত গৃহীত হইবে, জনসাধারণ কিন্তু এহেন অদ্ভুত যুক্তির সারবত্তা অবধারণে একান্তই অক্ষম। এরূপ উক্তিও যদি অসম্বন্ধদোষ দুষ্ট না হয়, জানি না তবে, অসম্বন্ধ উক্তি কাহাকে বলে। স্থির চিত্তে পাঠ করিলে বক্তৃতাত্রয়ের মধ্যে এরূপ নিদর্শনের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হইবে। ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়, যে সকল ব্যক্তি বড়লাটের মতাবলম্বী, জগতে তাহারাই একমাত্র ধীমান, আর সকলেই তদ্বিপরীত। বড়লাটের ন্যায় প্রধান পুরুষের মুখ এরূপ কথা শুনিলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি বোধ হয় হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। সুপ্রসিদ্ধ ইংলিসম্যান যথার্থই বলিয়াছেন, "But the viceroy can afford to be illogical."[৪]

শিখিলাম কি? :

সমগ্র ভারত সন্তানের প্রবল প্রতিবাদ উপেক্ষায় উড়াইয়া দিয়া পরাক্রান্ত প্রভুর অলঙ্ঘ্য আদেশে চক্ষের নিমিষে দেশে যে মহাপ্রলয়ের সূত্রপাত করিল, শিক্ষিত ভারত সন্তান হইতে কি শিক্ষা লাভ করিলেন, বর্তমান সময়ে চিন্তাশীলের চিত্তে স্বতঃ এ প্রশ্ন উদিত হইয়া থাকিবে। যে আশায় বুক বাঁধিয়া অভাগা ভারতবাসী অমানিশার আঁধার রাশি দুহাতে সরাইতেছিল, বিধাতার ব্যবস্থায় রাতুলের ব্যর্থ বাসনার ন্যায়, আজি তাহার অযোগ্যতা প্রতিপাদিত হইয়া, পরমুখাপেক্ষী ভারত তনয়কে জগৎবাসীর উপহাস বা উপেক্ষায় উপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছে। আথো বিধিবিড়ম্বনা।

চক্ষু থাকিতে যাহারা তাহার ব্যবহারে অনভিজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান হইয়াও যাহারা অজ্ঞান তিমির উচ্ছেদে অসমর্থ, আবহমানকাল ভরিয়া তাহার মোহ মদিরায় মুগ্ধ থাকিবে ইহা কখনই বিচিত্র নহে। কিন্তু অভাব অভিযোগের প্রবল পীড়নে বিমর্দিত হইয়া আপন অবস্থার কথা যাহারা ভাবিতে শিখিয়াছে, এবার তাহারা অবশ্য বুঝিতে পারিবে একালে নয়নজলে বুক ভাসাইয়া পরাক্রান্ত প্রভুর অনুগ্রহ ভিক্ষা সম্পূর্ণ নিরর্থক। আফিসিয়াল সিক্রেট বিল বা শিক্ষাসম্বন্ধীয় আইন, এ সকলের ইতিহাস পাঠ করিয়াও যদি ভারত সন্তানের চৈতন্যোদ্রেক না হইয়া থাকে,

তবে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে হিতাহিত বুদ্ধিও ভারতসন্তানের নিকট হইতে চিরদিনের তরে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, উল্লিখিত আইন দুইটি বিধিবদ্ধ করিবার সময় রাজপ্রতিনিধির আইন সভায় যে অদ্ভুত ব্যাপার পরিলক্ষিত হইয়াছে, ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, জানি না, তাহার সাদৃশ্য মিলিবে কিনা। আসন্ন আপদের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন সমগ্র ভারত কতই না বাদ প্রতিবাদে আলোচনা আন্দোলন উত্থাপন করিল, দীনদরিদ্র দেশবাসী, পিতৃমাতৃহীন শিশুর ন্যায় প্রভুর পদপ্রান্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কাতর কণ্ঠে কতই না কৃপা ভিক্ষা করিল। কিন্তু লক্ষ লক্ষের অনুনয় বিনয় এবং কোটি কণ্ঠের কাতর ক্রন্দনের ফলে ভারতের ভাগ্যবিধাতার প্রবল পিপাসা মুহূর্তের তরেও প্রশমিত হইল কি? বিজেতা বিজিত সম্বন্ধের এরূপ বিসদৃশ বিকাশ সভ্য জগতে আর কখনও পরিলক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আজ দেড় শতাধিক বৎসর যাবত ভারত তনয় বৃটিশরাজের পদমূলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই দেড়শত বৎসরের মধ্যেও এমন একটি দৃষ্টান্ত সংঘটিত হয় নাই যেখানে সমগ্র ভারতীয় সম্প্রদায় এরূপে উপেক্ষিত, এরূপভাবে অবমানিত এবং এইরূপে তিরস্কৃত হইয়াছে। এত দেখিয়া শুনিয়াও যদি ভারত সন্তান আপনার অবস্থা বুঝিয়া চলিতে শিক্ষা না করে, তবে বুঝিতে হইবে সবুট পদপ্রথায়ই ভারতের সন্তানের জন্য সুসঙ্গত ব্যবস্থা।

পাঠক মনে করিবেন না আমরা বর্তমান গভর্নমেন্টের ব্যবহারে দোষারূপ করিতেছি। আমরা বলি, ভারত সন্তানের অযোগ্যতাই এইরূপে উপেক্ষায় একমাত্র কারণ। অধিকার গেল বা অধিকার পাইলাম এ সকল বিষয় লইয়া চিৎকার করা আমরা বিজিত জাতির অধিকার বহির্ভূত বলিয়া মনে করি। গভর্নমেন্টের ব্যবহারেও একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। গভর্নমেন্টের কার্য লইয়া আলোচনা না করিয়া, যদি ভারতের বর্তমান অবস্থা ভারতবাসীর দুর্দশার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে আমাদের আলোচনা বা আন্দোলন পর্যবসিত হইত তবে বোধ হয়, ভিখারির বেশে আমাদিগকে আর কাঁদিতে হইত না। গভর্নমেন্ট যে সকল বিধানাদি প্রবর্তিত করিলেন, কেহ কি বলিতে পারে যে উহার ফলে ভারত সন্তানের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে। ভারতবাসী পূর্বেও যেমন ছিল পরেও তেমন থাকিবে। সাগরে যাহার শয্যা, শিশিরে আর তাহার কত ভয়। তাই বলিতেছিলাম, ভাই ভারতবাসী এবারের ব্যাপার দেখিয়া বুঝিয়া লও গভর্নমেন্টে কার্য লইয়া বাকবিতণ্ডা করা অপেক্ষা যাহাতে জাতির প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে তজ্জন্য যত্ন করাই একমাত্র কর্তব্য। দেশ দিন দিন ধনশূন্য হইয়া প্রকৃতই অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে। অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে দরিদ্র দেশবাসী দিন দিনই কঙ্কালসার হইয়া পড়িতেছে। শিক্ষা ও বাণিজ্যের বিস্তারে যদি দেশে অর্থাগমের উপায় উন্মুক্ত না হয়, তবে অচিরেই যে আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র ও সন্দেহ নাই। ভিক্ষা দ্বারা পূর্বসমৃদ্ধি লাভে সমর্থ হইবে এত দিন এই অলীক ধারণার বশবর্তী হইয়া ভারতসন্তান কি ফল লাভ করিয়াছে? তাই বলিতেছিলাম, ভাই ভারতসন্তান। এখনও বুঝিয়া চলিতে শিখিলে দেশের দুর্দশা তিরোহিত হইতে পারে।[৫]

কোনরকম প্রতিবাদ জনরোষ সরকারকে নিরস্ত করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত ঢাকা, রাজসাহী, চট্টগ্রাম ও আসাম প্রদেশকে সংযুক্ত করে গঠিত হল নতুন প্রদেশ। জনগণ বিনা প্রতিবাদে এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি।

"বঙ্গের সর্বনাশ হইয়াছে। আট কোটি, বঙ্গবাসীর বক্ষস্থল পদপ্রহারে বিদীর্ণ করিয়া, কৃতান্তরূপী কার্জন বাহাদুর বঙ্গের ক্ষীণ অঙ্গযষ্টি দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিয়াছেন। সপ্তশতবৎসরব্যাপী বৈদেশিক শাসনে নিগৃহীত হইয়াও দীনদুর্বল বাঙালি সন্তান জাতীয়ত্বের যে অমূল্য রত্ন সযত্নে হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, প্রবল পরাক্রমে প্রদীপ্ত হইয়া ব্রিটিশ প্রতিনিধি বাঙালির বক্ষাভ্যন্তর হইতে আজ সে রত্ন কাড়িয়া লইতেছেন। হায় হায়! বিরূপ বিধাতার এরূপ বিষম ব্যাভিচার কত কাল আর বাঙালি সন্তানকে নির্জীবের ন্যায়

সহিয়া লইতে হইবে। কোটি কোটি অধিবাসীবৃন্দের আন্দোলন ও আর্তনাদ গর্ববেগে উড়াইয়া দিয়া, দম্ভদৃপ্ত বড়লাট, বঙ্গবিভাগের ঘোষণাপত্র প্রচারদ্বারা, ব্রিটিশসিংহের পবিত্র নামে যে দুরপনের কলঙ্ক অর্পণ করিলেন, সভ্যতার শুভ্র জ্যোতিঃ যতদিন এ মরজগৎকে উদ্ভাসিত করিবে ততকাল এ কলঙ্ক অপগত হইবার নহে।

ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাজসাহী বিভাগের সহিত আসামপ্রদেশ সম্মিলিত করিয়া "পূর্ববঙ্গ ও আসাম" নামে এক নতুন প্রদেশ গঠনের ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সম্মিলিত বঙ্গের সমস্ত আশা ভরসা এতদিনে চিরতরে বিলুপ্ত হইল। আসামের চিফ কমিশনার মাননীয় মি জে বি ফুলার এই নতুন প্রদেশের লেপটেন্যান্ট গভর্নর নিযুক্ত হইলেন। শুনিতেছি ফুলার মহোদয় ছোটলাটরূপে শীঘ্রই ঢাকা নগরীতে আগমন করিতেছেন। তাহার আগমনোপলক্ষে নাকি নানারূপ বন্দোবস্ত হইতেছে।

যাহা হইবার হইয়া গেল! এখন এ ভীষণ দুর্দিনে বাঙালির কর্তব্য কি তাহাই একমাত্র ভাবিবার বিষয়। আমরা বলি, ভারত গভর্নমেন্টের মীমাংসার উপর নির্ভর করিয়া নিরাশ হওয়া কর্তব্য নহে ঃ দুই বৎসরের চেষ্টায় যে দেশব্যাপী আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, উত্তরোত্তর যাহাতে তাহা বর্ধিত হয় তন্নিমিত্ত যত্ন করাই এখন আমাদের একমাত্র কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। বিশেষত এ অমঙ্গলের অভ্যন্তর হইতে যে অশেষ কল্যাণকর 'স্বদেশী আন্দোলন' আবির্ভূত হইয়াছে, সেই আন্দোলন কেবল কথায় পর্যবসিত না হইয়া একমাত্র কর্তব্য। বঙ্গবিভাগ হয় হউক ; এই স্বদেশী আন্দোলন যদি আমরা অক্ষুন্ন রাখিতে পারি, তবে সময়ে আমরা নিশ্চয়ই জননী জন্মভূমির মলিনমুখ সুপ্রসন্ন দেখিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব।[৬]

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ঢাকায় যে বৃহৎ জন সমাবেশ ঘটেছিল, সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। সে সম্পর্কে স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত সুদীর্ঘ বিবরণ ঃ

"১১ ভাদ্র, রবিবার, ঢাকার ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় দিনরূপে কীর্তিত হইবে। সেদিন যে অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, ঢাকায় আর কখনও তাহা দৃষ্টিগোচর হয় নাই। "বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ এবং স্বদেশীয় দ্রব্যের প্রচলনার্থ আন্দোলন" এই সংকল্প লইয়া, ঢাকা জনসাধারণসভার সেক্রেটারী মহোদয় ঢাকাবাসীকে এক বিরাট সভায় সম্মিলিত হইবার নিমিত্ত আহ্বান করেন। স্থানীয় জগন্নাথ কলেজের বিশাল প্রাঙ্গণে সভার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল, এবং স্থানীয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বালক, যুবক, বৃদ্ধ প্রভৃতিতে অন্যূন দশ সহস্র লোক সাগ্রহে সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। জনসাধারণ সভার আমন্ত্রণে, কলিকাতা হইতে বঙ্গমাতার মুখোজ্জলকারীসন্তান বাবুসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জে চৌধুরী, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এবং শ্রীযুক্ত আবদুল হালিম গজনভি এ নগরে শুভাগমন করিয়া শহরবাসীকে উৎসাহিত করিয়াছেন। অগণিত জনমণ্ডলী যখন কলেজের প্রকাণ্ড প্রাঙ্গনে সমবেত হইতে লাগিলেন, তখন তাহাদের উৎসাহ ও উৎকণ্ঠা যে দেখিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে। সেই বিশাল সম্মিলনীর দিকে চাহিলে মনে হয়, সম্মুখে যেন এক সুবিস্তৃত জনসমুদ্র বিদ্যমান রহিয়াছে। জমিদার, মহাজন, অধ্যাপক, অধ্যয়নার্থী, উকিল, চিকিৎসক প্রভৃতি সর্বসম্প্রদায়ের লোক দ্বারাই যে সম্মিলনী গঠিত হইয়াছিল। সেদিনকার সভায় ছাত্রগণ যেরূপ শিষ্টাচার, প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা বস্তুতই প্রশংসার্হ। এতবড় সভার কার্য, যে এমন শৃঙ্খলা ও সৌষ্ঠবের সহিত সম্পন্ন হইতে পারে, অনেকেই তদ্বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু ছাত্রগণের সুব্যবস্থায় এই ১০/১২ হাজার লোকের মধ্যে এমন শৃঙ্খলা রক্ষিত হইয়াছিল যে, সভাক্ষেত্রে জন-মানবহীন প্রান্তরের নির্জনতা অনুভূত হইয়াছে। বিদ্যার্থীবর্গের মধ্যে সেদিন যেরূপ উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গিয়াছিল, ভগবৎ কৃপায় যদি তাহা স্থায়ী হয়, তবে দেশের পক্ষে বিশেষ কল্যাণের কারণ হইবে।

প্রারম্ভে স্থানীয় দুইটি যুবক কর্তৃক একটি উদ্দীপনাপূর্ণ সঙ্গীত হয়। সঙ্গীত এইরূপ :

"বন্দে মাতরং"।

নমো বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী
যুগে যুগে জননী লোকপালিনী।
সুদূর নীলাম্বর প্রান্ত সঙ্গে
নীলিমা তব মিশিতেছে রঙ্গে,
চুমি পদধূলি বহে নদীগুলি,
রূপসী শ্রেয়সী হিতকারিণী।
তাল তমালদল নীরবে বন্দে,
বিহঙ্গ স্তুতি করে ললিত সুছন্দে,
আনন্দ জাগ অয়ি কাঙ্গালিনী!
কিসের দুঃখ মাগো, কেন এ দৈন্য,
শূন্য শিল্প তব বিচূর্ণ পণ্য,
হা অন্ন, হা অন্ন, কাঁদে পুত্রগণ?
ডাক মেঘ মন্দ্রে সুষুপ্ত সবে,
চাহ দেখি সেবা জননী—গরবে,
জাগিবে শক্তি, উঠিবে ভক্তি
জাননা আপনার সন্তানশালিনী!

সর্বসম্মতি ক্রমে ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল বাবু আনন্দচন্দ্র রায় সভাপতি নির্বাচিত হইয়া সভার কার্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ছয়টি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে।

কথা ছিল, ভাওয়ালের জ্যেষ্ঠ কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ হইয়া পড়াতে, তাঁহারই অভিপ্রায়ানুসারে, তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। বাবু গোবিন্দপ্রসাদ দাস এবং বাবু দীনবন্ধু মজুমদারের সমর্থন মতে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয়। প্রস্তাবটি এইরূপ :

বঙ্গবিভাগ প্রশ্ন সম্বন্ধে বঙ্গবাসীর অভিমত এবং স্বার্থসম্বন্ধ সমর্থন করাতে এই সভা পার্লিয়ামেন্টের সভ্য মিঃ হারবার্ট রবার্টসের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি মিঃ রবার্টস মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করিবার নিমিত্ত এই সভা সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ করিতেছেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন স্থানীয় প্রসিদ্ধ উকিলবাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু এম এ বি এল। প্রস্তাব উত্থাপনকালে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া জনসাধারণের তৃপ্তিবিধান করিয়াছিলেন। বাবু রাজেন্দ্রকুমার বসু ও বাবু বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদন মতে প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রস্তাব, এইরূপ ঃ

মিঃ ব্রডরিক যখন অতিরিক্ত সংবাদ প্রদানের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন, এবং যত শীঘ্র সম্ভব তিনি ভারত গভর্নমেন্টকে পত্রাদি লিখিয়া, এ সম্বন্ধীয় অন্যান্য কাগজাদি মহাসভার সম্মুখে উপস্থিত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, মহাসভা যখন কোন পক্ষেরই কারণাদি অবগত নহেন বলিয়া স্যর হেনরী ফাউলার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, বিভাগের বৃহত্তম প্রস্তাব যাহা এখন অনুমোদিত হইয়াছে, ঐ প্রস্তাব আলোচনার্থ যখন জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় নাই; অতএব এই সভা অনুরোধ করিতেছেন যে, ভারত সচিব যদি বঙ্গবিভাগ আদেশ প্রত্যাহার না করেন, তবে অনুগ্রহপূর্বক বঙ্গবিভাগ অনুমোদনকল্পে তাঁহার আদেশ, হাউস অব কমন্সে এ বিষয়ের আন্দোলন পর্যন্ত, স্থগিত রাখুন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব সমর্থন কালে, ময়মনসিংহের সুসন্তান মিঃ আবদুল হালিম গজনভি

ওজস্বিনী ভাষায় যে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত, নিম্নে উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম বিবৃত হইল। মিঃ আবদুল হালিম গজনভির বক্তৃতা :

"ভাই হিন্দু মুসলমানগণ, এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছ যে সত্য সত্যই আমাদের বিষম দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে। যদি যথার্থই উহা বুঝিয়া থাক, তবে এখনও নিরাশ হইও না, কারণ এ দুর্দিনে এখনও সন্ধ্যা সমুপস্থিত হয় নাই। ভ্রাতৃগণ, অদম্য উৎসাহের সহিত কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও। হৃদয়ের সহিত কার্য করিতে পারিলে কখনও উহা বিফল হইবে না। ছয় বৎসর পূর্বে বড়লাট কার্জন যখন ভারতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি আমাদিগকে কত আশার কথাই না শুনাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ভারতবাসীকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসেন। ভাল, এখন আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, প্রভো। তোমার ভালবাসা কি এইরূপ? সোনার বাংলাকে আমাদিগের জননী জন্মভূমির দেহযষ্টিকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া কি "প্রভো! তুমি তোমার সে ভালবাসা প্রদর্শন করিতে বসিয়াছ?" একথা শুনিয়া সেদিন মাননীয় যোগেশ বাবু ছোটলাটকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বল, ছোট প্রভো! কে কে তোমাকে বাংলা ভাগ করিতে বলিয়াছে?" ছোটলাট সে কথার কোন স্পষ্ট উত্তর দিলেন না, কেবল বলিলেন, তিনি কাহারও নাম প্রকাশ করিতে পারেন না। মাননীয় অম্বিকাবাবু ছোটলাটকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এই বাংলাদেশ শাসন করা একজন ছোটলাটের পক্ষে সম্ভবপর নহে?" ছোটলাট সে কথারও কোনও উত্তর দেন নাই। আমরা বলি, ইতিপূর্বে যখন কেহই এমন কথা বলেন নাই, তখন বর্তমান ছোটলাট যদি এ দেশ শাসন করিতে একান্তই অসমর্থ হইয়া থাকেন, তবে তিনি কার্যত্যাগ করিলেই পারেন। যে বোঝা তিনি বহিতে পারেন না, সে বোঝা তিনি মাথায় লইয়াছেন কেন? যে কার্যের ভার যাহার উপর প্রদত্ত হয়, সে যদি উহার সম্পাদন করিতে না পারে, তবে তাহারই অকর্মণ্যতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। তখন সেই কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত কার্যক্ষম লোকই নিযুক্ত করা হয়। কার্যটি কিছু কাটিয়া ছাটিয়া ছোট করা হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের দেশের জমিদারি শাসনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোন জমিদারের নায়েব যদি তাহার এলাকাধীন স্থান সুশাসনে রাখিতে সমর্থ না হয়, তবে জমিদার কি ঐ এলাকা কাটিয়া ছাটিয়া ছোট করিয়া দেন, না ঐ কর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত নূতন নায়েব নিযুক্ত করেন? ছোটলাট যদি বঙ্গদেশ শাসনে অসমর্থ হইয়া থাকেন, তবে তাহার স্থানে নূতন ছোটলাট নিযুক্ত করিলেই তো গোল মিটিয়া যাইতে পারে। ভাই! তোমাদিগের এত লোককে সমবেত দেখিয়া আজ আমি আনন্দে বিহ্বল হইয়াছি। কেহ কেহ বলেন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে শত্রুতা আছে। যাহারা এরূপ বলেন, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তাহারা মিথ্যা বলিয়া থাকেন। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কখনও শত্রুতা হইতে পারে না; কারণ হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েই এক বঙ্গজননীর সন্তান। ভাই ভাই শত্রুতা হইবে কিরূপে? হিন্দু মুসলমানের জন্মভূমি বাংলাদেশ, ইংরেজের তো জন্মভূমি বাংলা নহে? তাই আজ আমরা হিন্দু মুসলমান সকলে বলি, তোমরা ভাগ করিতে হয় কর, আমরা কিন্তু ভাগ করিতে দিব না। ইংরেজেরা পয়সাটিকে বেশ চেনেন। ততদূর থেকে ইংরেজ এসেছেন পয়সা নিতে; সে পয়সা যদি বন্ধ করা যায়, তবে নিশ্চয়ই ভাল লাভ হইতে পারে। ভ্রাতৃগণ! এবার ইংরেজদের পকেটে হাত দিতে হইবে। মিটিং তো অনেক করা হইল; কিন্তু কিছুতেই যখন রাজপুরুষেরা শুনিতেছেন না, তখন এ ব্যবস্থাই প্রশস্ত। বলি, আমরা আমাদের ভাল বুঝি, না তোমরা আমাদের ভাল বুঝ? এখন হইতে আমরা স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব। শতবৎসর পূর্ব কি দেশের কাপড়ে দেশের অভাব পূর্ণ হইত না? "ছেড়া কাপড় পরিব, তথাপি বিদেশি কাপড় পরিব না," সকলে এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হউন। যদি এই প্রতিজ্ঞা স্থির রাখিতে না পারেন, তবে রাজনৈতিক আন্দোলন এইখানেই শেষ হইল জানিবেন। এবার দুর্গোৎসবে বা ঈদে কোন প্রকার আমোদের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য নহে। অতএব ভ্রাতৃবৃন্দ। সকলে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হউন, এই বিপদ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত, আর

কেহই কোন উৎসব বা আনন্দে যোগদান করিবেন না। আজ ৩০ বৎসর হইল, আমাদের সম্মুখস্থ এই মহাপুরুষ দেশে যে পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন, দেখিও ভ্রাতৃবৃন্দ তোমরা যেন তাহা তেমনই গৌরবের সহিত উড্ডীন রাখিতে সমর্থ হও। তোমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে এ পতাকা চিরদিনই উড্ডীন থাকিবে।

বেঙ্গল টাইমস পত্রিকায় সম্পাদক মিঃ ক্যাম্প তৃতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। সংক্ষেপে নানাবিধ যুক্তি দ্বারা মিঃ ক্যাম্প প্রথমে সভ্যগণকে এরূপ প্রস্তাবের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়াছেন। বক্তৃতাকালে একস্থলে মিঃ ক্যাম্প বলিয়াছিলেন, "ঢাকার ন্যায় একটি সামান্য শহরে এই ব্যাপার উপলক্ষে যদি দশ সহস্র লোক প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত অদ্য উপস্থিত হইয়াছে, তবে এই ব্যাপারে দেশে না জানি কি ভীষণ আন্দোলন সৃষ্ট হইয়া থাকিবে।" বাবু সাধুচরণ রায়, ডাক্তার শিবচন্দ্র বসু এবং বাবু মুকুন্দবিহারী চক্রবর্তীর অনুমোদন মতে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয়। তৃতীয় প্রস্তাবের মর্ম এইরূপ :—

১৯০৪ সনের ১৮ মার্চ তারিখে কলিকাতা টাউনহলে সভায় জনসাধারণের যে আবেদনপত্র গৃহীত হইয়াছিল, ঐ আবেদনপত্রে জনসাধারণ প্রার্থনা করিয়াছিল যে, বঙ্গের শাসনকর্তার কার্যভার যদি কমাইতে হয়, তবে বঙ্গদেশকে প্রেসিডেন্সি গভর্নমেন্টে উন্নতি করিয়া, তাহার শাসনের নিমিত্ত একজিকিউটিভ কাউন্সিলসহ জনৈক বিলাতবাসী রাজনীতিবেত্তাকে গভর্নররূপে নিযুক্ত করাই ঐরূপ কার্য লাঘবের প্রকৃষ্ট উপায়। ঐরূপ ব্যবস্থা, প্রস্তাবিত বঙ্গবিভাগ অপেক্ষা বহু পরিমাণে অল্পব্যয়সাপেক্ষ। কারণ প্রস্তাবিত বঙ্গবিভাগে রেভিনিউ বোর্ড, সেক্রেটেরিয়েট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় আফিসাদিসহ লেপ্টেন্যান্ট গভর্নর সৃষ্টি করিতে, প্রথমতঃ এবং প্রতি বৎসরের নিমিত্ত গুরুতর ব্যয়ভার বহনের আবশ্যক হইবে। এই সভা জনসাধারণের উল্লিখিত প্রার্থনার পুনরুক্তি করিতেছেন।

তৃতীয় প্রস্তাবের সমর্থনকল্পে বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র যে বক্তৃতা করিতেছিলেন নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম প্রদত্ত হইল।

বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের বক্তৃতা :

তৃতীয় প্রস্তাবের সমর্থনকালে কলিকাতা সিটি কলেজের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র যে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এইরূপ ঃ

"সমবেত সভ্য মহোদয়গণ, ঘটনাচক্রে আজ আমার কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু ভগ্নকণ্ঠ হইলেও এই জাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে আমি ভগ্নপ্রাণ নহি। এই সর্বব্যাপী আন্দোলনে যে আমার গভীর অনুরাগ আছে, তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আজ আমি এইরূপ রুদ্ধকণ্ঠস্বর লইয়াও আপনাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছি। এই প্রস্তাব উপলক্ষে আমার দুই একটি কথা বলিবার আছে। অনেকেই সম্যক অবগত নহেন যে, সকৌন্সিল গভর্নর এবং লেপ্টেন্যান্ট গভর্নরের প্রভেদ কি? লেপ্টেন্যান্ট গভর্নরের শাসনকার্য এক ব্যক্তি কর্তৃকই পরিচালিত হইয়া থাকে। লেপ্টেন্যান্ট গভর্নর একাকী যাহা সঙ্গত বা অসঙ্গত মনে করেন, তদনুসারেই শাসনকার্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু সকৌন্সিল শাসন পদ্ধতিতে একাকী কাহারও কিছু করিবার অধিকার নাই। কৌন্সিলের অধিকাংশ সদস্য এবং গভর্নর একমত না হইলে কোন কার্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। কার্যেই একজন কর্তৃক পরিচালিত শাসন ব্যাপার যে সকল ভ্রম প্রমাদাদিদোষ-দুষ্ট হইতে পারে, সকৌন্সিল গভর্নরের শাসনে তদ্রূপ প্রমাদের সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে একটি কথার উল্লেখ করিতেছি। সকলেই জানেন, বর্তমান বড়লাট বঙ্গ-বিভাগ কার্য সত্বর সম্পাদনের নিমিত্ত কিরূপ ব্যগ্র। কিন্তু এই কাউন্সিল থাকাতে বড়লাটের প্রতিবাদের কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই। বিশ্বস্তভাবে শুনিয়াছি, এইরূপ সার্বজনিক প্রতিবাদের সম্মুখে সহসা এরূপ কার্য সম্পন্ন করা সঙ্গত নহে বলিয়া কাউন্সিলের কোন সদস্য অভিমত প্রকাশ করাতে, গত বৎসর বঙ্গবিভাগ ব্যাপার সম্পন্ন হয় নাই। ইহা হইতেই দেখা

যাইতেছে লেপ্টেন্যান্ট গভর্নরের শাসন এবং কাউন্সিলস্থ সদস্যগণের সুপরামর্শ দ্বারা পরিচালিত গভর্নরের শাসনে পার্থক্য কত। কাজেই গভর্নর হইলে বহু বিপদ হইতে আমরা উদ্ধার পাইতে পারিব। ভাল, যে জন্য আমরা এত অনুরোধ করিতেছি, কেন আমরা সেই গভর্নর পাইতে পারিব না? বোম্বাই ও মাদ্রাজ যদি গভর্নর পাইতে পারিয়াছে, তবে বঙ্গের জন্য গভর্নরের ব্যবস্থা হইবে না কেন? শিক্ষায় বা সভ্যতায় বঙ্গদেশ তো অপর কোন দেশ অপেক্ষা হেয় নহে। লেপ্টেন্যান্ট গভর্নর তো ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের অন্তর্গত সিভিল সার্ভিসের লোক হইয়া তিনি সেই সিভিল সার্ভিসস্থ অধীন রাজপুরুষগণের বিচার করিয়া থাকেন। সুতরাং এক্ষেত্রে কিরূপ ন্যায় বিচার হয় তাহা সহজেই বোধগম্য। তিলকের মোকর্দমার বিবরণ বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর লরেন্স জেঙ্কিন্স তিলককে মুক্তিদান কালে গভর্নমেন্টের কার্যে তীব্র ভাষায় দোষারোপ করিয়া যেরূপ ন্যায়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, মাননীয় জেঙ্কিস মহোদয় সিভিল সার্ভিসের লোক হইলে তিনি তদ্রূপ করিতে পারিতেন কি? এসকল বিবেচনা করিলে সহজে বুঝা যাইবে শাসনকর্তার পদে সিভিল-সার্ভিসাতিরিক্ত লোকের নিযুক্তি কিরূপ মঙ্গলজনক। তৃতীয়তঃ ব্যয়ের কথা প্রস্তাবানুরূপ নূতন প্রদেশ গঠন যেরূপ বহুব্যয়সাপেক্ষ তত ব্যয় স্বীকার সমীচীন কি না। যে দেশে জলকষ্টে লোকের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়, ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রকোপে নিত্য যে দেশ উৎসন্ন হইতেছে, সেই দারিদ্র পীড়িত, অনশনক্লিষ্ট দেশের টাকা এরূপভাবে ব্যয় করা সাজে কি? অভাগা অধিবাসীবৃন্দের অভাবাদি দূরীকরণকালে যখন আমরা টাকা চাহিয়া থাকি তখন রাজকোষে অর্থের অভাব হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ অন্যায় ও সম্পূর্ণ অনাবশ্যকীয় কার্য সম্পাদনের জন্য গভর্নমেন্টের অর্থের অভাব হয় না। নূতন প্রদেশ সৃষ্টি না করিয়া বঙ্গের জন্য সকৌন্সিল গভর্নরের ব্যবস্থা করিলে তো এত ব্যয় বহনের কোনই প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়ত যিনি গভর্নর হইবেন তিনি সিভিল সার্ভিসের লোক নহেন। তিনি একজন ইংলিশ স্টেটস্‌ম্যান। ভারতের দূষিত বায়ু সংস্পর্শে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি মলিনতা প্রাপ্ত হয় নাই। স্বাধীন জাতির স্বাধীন সাম্রাজ্যের পবিত্রতা পুষ্ট প্রশান্ত প্রাণ এবং উদার হৃদয় লইয়া তিনি এ দেশে আসিবেন। সুতরাং তাঁহার নিকট সর্বপ্রকারেই সুশাসনের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। এই বঙ্গদেশের জন্য গভর্নর নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া প্রথমত ১৮৩৩ সালে এবং ১৮৫৩ সালে পার্লামেন্ট মহাসভা প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন। আজ প্রায় শত বৎসর পরে এখন বলা হইতেছে, তোমরা গভর্নর পাইবার উপযুক্ত নও। ১৮৩৩ বা ১৮৫৩ সনে যদি আমরা গভর্নর পাইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছিলাম, তবে এখন আমরা অনুপযুক্ত হইলাম কিরূপে? একথা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের এরূপ অযোগ্যতার জন্য তোমরাই তো একমাত্র দায়ী। তোমাদের সুশাসনগুণে আমাদের তবে এই হইয়াছে যে, পূর্বে যদিও আমরা গভর্নর পাইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইতাম, এখন তন্নিমিত্ত অযোগ্য বিবেচিত হইতেছি! ইহাতে তোমাদের শাসন মাহাত্ম্য কীর্তিত হইতেছে না কি।

যাক এসব কথা। এখন মূল কথা হইতেছে কোন সভা সমিতি করিয়া আমরা আমাদের আবেদন গ্রহণ করাইতে পারিব না। আমরা যদি আপনার পায়ে দাঁড়াইতে সমর্থ হই তবেই আমরা সম্মানিত হইব। তাই বলিতেছি, ভ্রাতৃগণ, এস আজ এ শুভমুহূর্তে সকলে বিধাতার দিকে চাহিয়া প্রতিজ্ঞা করি, "আমরা আপনার পায়েই দাঁড়াইতে শিখিব।" এখন হইতে আমরা একমাত্র স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্যজাতই ব্যবহার করিব। সকলে যদি আমরা এ পবিত্র প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারি, তবে নিশ্চয়ই শুভফল লাভ হইবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যাইতেছি, কলিকাতা যাইয়াই নিজের পরিধানার্থ দেশী মিলের মোটা মার্কিন কাপড় ক্রয় করিব। অনেকে বলেন আপাতত দেশী কাপড় তেমন প্রচুর পরিমাণে মিলিবে কোথায়? একথা সত্য হইলেও ছয় মাসের মধ্যেই আমাদের প্রয়োজনানুরূপ দেশীয় কলাদির আমদানি হইতে পারিবে এই সামান্য

ছয়টা মাস কি আমরা কোন প্রকারে কাটাইয়া দিতে পারিব না? ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়াও তো এই ছয়টা মাস কাটাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিধাতার কৃপায় আজ সমগ্র বঙ্গে যে এক প্রাণতা পরিলক্ষিত হইতেছে ইতিপূর্বে আর কখনও তদ্রূপ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আজি এ দুঃখের দিনে এই একপ্রাণতাই আমাদের একমাত্র সম্বল। ভাই বঙ্গ সন্তান। যদি স্বদেশের ও স্বজাতির কল্যাণ সাধন করিতে চাও, তবে প্রাণপনে তোমাদের এই একপ্রাণতা রক্ষা কর। এই একপ্রাণতার ভাব দেশে স্থায়ী হইলে নিশ্চয়ই জন্মভূমির মলিন মুখে হাসির রেখা দেখা দিবে।

চতুর্থ প্রস্তাব উত্থাপন করেন, জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়। বাবু যোগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ও বাবু সুরেন্দ্রনাথ সেন এবং শ্রীযুক্ত মৌলবী হেদায়েত বক্স এবং শ্রীযুক্ত জে. চৌধুরী বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। আমরা উহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। চতুর্থ প্রস্তাব এইরূপ ঃ

বঙ্গবিভাগ প্রস্তাব প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত বিলাতি দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে বিরত থাকার নিমিত্ত টাউনহলের সভায় যে প্রস্তাব নির্ধারিত হইয়াছে, ঐ প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত এ সভা স্থানীয় কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে লইয়া একটি ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করিতেছেন। উহারা ডিস্ট্রিক্ট, সাব-ডিভিনসন্যাল এবং ভিলেজ কমিটি গঠন করিয়া ও জিলার বহুজনপূর্ণস্থ স্থানসমূহের দেশীয় দ্রব্যাদি উপযুক্তরূপে সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা :

সর্বশেষে বঙ্গমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান, উদ্যোগ ও উৎসাহের জীবন্ত-বিগ্রহ বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জলদগম্ভীরনাদে সভাস্থল বিকম্পিত করিয়া যেরূপ উদ্দীপণাপূর্ণ বাক্যে সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা সম্ভবপর নহে। পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে আমরা তাঁহার বক্তৃতায় অতি সংক্ষিপ্ত মর্মানুবাদ প্রদান করিতেছি মাত্র। সহস্র সহস্র হস্তে নিনাদিত করতালির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সুরেন্দ্রবাবু বলিতে লাগিলেন ঃ

আমার সম্মুখে এই বিরাট জনসমুদ্র দেখিয়া আমি একান্তই উৎফুল্ল হইয়াছি। ঢাকার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দ এরূপ বিরাট সভায় সমবেত হইয়া লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছে এ দৃশ্য বস্তুতই আশাপ্রদ। এই বিশাল জনমণ্ডলীকে দেখিয়া আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে, এ সময় কেহ লর্ড কার্জনের পক্ষ হইতে এখানে উপস্থিত থাকিয়া ঢাকাবাসীর মানসিক অবস্থার বিষয় জানিয়া যাইতেন, তাহা হইলে বড়লাট বুঝিতে পারিতেন, ঢাকার জনসাধারণ তাঁহার প্রস্তাব কিভাবে গ্রহণ করিয়াছে। ঢাকাবাসিগণ, আপনারা বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন, এবং ঢাকানগরীকে রাজধানী করা রূপ যে প্রলোভন আপনাদিগকে দেখান হইয়াছে, তাহাতে আপনারা মুগ্ধ হন নাই দেখিয়া আমি একান্ত আনন্দিত হইয়াছি। আপনারা কখনও মনে করিবেন না যে, ঢাকাতে নূতন প্রদেশের স্থায়ী রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রকৃতির অবস্থার দিকে চাহিলেও এরূপ ব্যাপার সম্ভবপর মনে হয় না। কারণ আপনাদের নদী দিন দিনই শুকাইয়া যাইতেছে। নদী না থাকিলে কখনই বাণিজ্যের সুবিধা হইতে পারে না। যদি ঢাকার সম্মুখস্থ নদীর এরূপ অবস্থা, তখন এক অতিমাত্রায় বাণিজ্যপ্রবণ জাতি এখানে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিবেন ইহাও কি কখন সম্ভব? শিলং পাহাড়েই নূতন প্রদেশের প্রকৃত রাজধানী স্থাপিত হইবে এবং বাণিজ্যের জন্য চাটগাঁওতে রাজধানী থাকিবে। সুতরাং ঢাকাতে রাজধানী স্থাপনের যে প্রলোভন দেখান হইয়াছে, ঢাকাবাসীকে আন্দোলন হইতে নিরস্ত করাই তাহার উদ্দেশ্য।

যদি বা ঢাকায় রাজধানী হয় তাহা হইলেই বা আপনাদের কি সুবিধে হইবে? পরন্ত

আসামের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে আপনাদিগকে বহু প্রকারের অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। আপনারা জানেন, আসাম ডিপুটি কমিশনারের দেশ। সেখানকার ডিস্ট্রিক্ট অফিসারগণ আসামীকে সাত বৎসরের তরে জেলে পাঠাইতে পারেন। সংক্ষেপেত আসামকে যথেচ্ছচারতন্ত্রের অধীন বলা যাইতে পারে। এমন প্রদেশের সহিত সম্মিলিত হইয়া লেপ্টেন্যান্ট গভর্নর পাইলেও আপনাদের কোনও সুবিধা হইবে না। বর্তমান সময়ে বঙ্গের এত উন্নতি হইয়াছে কিরূপে, জানেন কি? বঙ্গবাসীর সমৃদ্ধি বা শিক্ষা এই উন্নতির কারণ নহে, সংবাদপত্রের সৃষ্টিই এই উন্নতির মূলীভূত। বহু চেষ্টার পর বঙ্গের সংবাদপত্র দেশের এক বিশেষ শক্তিরূপে এখন দণ্ডায়মান হইয়াছে ; ইহারই প্রভাবে এখন বঙ্গসন্তান আপনার স্বার্থ সুবিধা প্রভৃতি সম্যক উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া তৎসমূহের রক্ষণার্থ সমুচিত যত্ন করিতে শিক্ষা পাইয়াছে। শত বৎসরের চেষ্টায় আমরা এই সংবাদপত্রকে দেশের এক প্রবল শক্তিরূপে পরিণত করিয়াছি। এই সংবাদপত্রের অভ্যুদয় ও উন্নতির সহিত স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণদাস পালের নাম চিরদিন কীর্তিত হইবে। আমাদের শত বৎসরের চেষ্টায় বঙ্গে যদি এই সংবাদপত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তবে নূতন প্রদেশে আপনারাও শত বৎসরের পরে এইরূপ সংবাদপত্রের সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। কিন্তু এইরূপে সংবাদপত্রকে দেশের শক্তিরূপে পরিণত করিবার পূর্বে, আপনাদের প্রতি যে সকল অত্যাচার ও অবিচার হইবে, তাহার প্রতিকারার্থ আপনারা কি করিতে পারিবেন? সুতরাং এই হিসাবে বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আপনাদের গুরুতর ক্ষতি হইবে।

এই বঙ্গবিভাগ ব্যাপার গভর্নমেন্টের "Divide and rule" নীতি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। গভর্নমেন্ট বলিতেছেন বর্তমান ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুপ্রদেশ এবং পূর্ববঙ্গে মুসলমান প্রদেশ গঠিত হইল। এইরূপ বিভাগনীতি কখনই প্রশংসনীয় নহে, হিন্দু ও মুসলমান সকলেই বাঙালি, সুতরাং এক বঙ্গজননীর সন্তান হইয়া তাঁহারা এইরূপে বিচ্ছিন্নভাবে থাকিতে চাহিবে, এ কথা কখনই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। অতএব একথা নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইতে পারে, যে হিন্দু ও মুসলমান কেহই এই বঙ্গবিভাগের পক্ষপাতী নহেন। তবে কাহার ইচ্ছায় এ বঙ্গবিভাগ হইতেছে? দেশের লোক ইহা চাহে না, সম্ভবত রাজকর্মচারিরাও ইহা চাহেন না। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, কিন্তু ছোটলাট সে প্রশ্নের কোন উত্তর দেন নাই। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া কি মনে হয় না, এক মাত্র লর্ড কার্জনের ইচ্ছাতেই এই বঙ্গবিভাগ ব্যাপার সম্পন্ন হইতে চলিয়াছে? গভর্নমেন্ট বলিতেছেন, বঙ্গে ছোটলাটের কার্যভার অত্যধিক, পূর্বে যাঁহারা বঙ্গের শাসন কার্য পরিচালন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবনের দিকে চাহিয়া দেখিলে গভর্নমেন্টের এই উক্তি নিতান্তই অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। বিগত বৎসর বঙ্গের জনৈক ভূতপূর্ব ছোটলাটের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯০ বৎসর ছিল। ভূতপূর্ব ছোটলাটদিগের মধ্যে এখনও যাঁহারা জীবিত আছেন, তাঁহাদের বয়সও ৭০ বৎসরের উপরে উঠিয়াছে। এ সকল শুনিয়া কি মনে হয়, কার্যভারে ছোটলাট একান্তই পীড়িত? আমাদের বর্তমান ছোটলাট স্যর এন্ড্রু ফ্রেজার সভাসমিতিতে উপস্থিত হইয়া পুরস্কার বিতরণ করিতে পারেন, অট্টালিকাদির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিতে পারেন, রমনীয় জলযানে বসিয়া শীকরশিক্ত শীতল সমীরণ সেবনার্থ নদীবক্ষে বেড়াইতে অবসর পান। বঙ্গের শাসনকর্তা এইরূপে কাল কাটাইবার অবসর পাইলেও একাকী বঙ্গের শাসনকার্য নাকি তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। স্যর এন্ড্রুর এত অবসর থাকিলেও যদি তিনি বঙ্গের শাসনকার্য চালাইতে না পারেন, তবে তিনি এ কার্য হইতে একেবারে অবসর লইলেই পারেন? তাঁহার অপেক্ষা সর্বাংশে প্রসিদ্ধ বড়লাটই যদি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার পদত্যাগেও লোকের নিরানন্দের কোন কারণ হইবে না।

ভারতের বিষম বান্ধব স্যর মাঞ্চারজি ভবনাগরী বলিয়াছেন, "বঙ্গের গভর্নর নিয়োগ করিতে হইলে খরচ বেশি পড়িবে।" দুঃখের বিষয় ভবনাগরী বোধ হয় এসম্বন্ধে এক মুহূর্তও

প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। যাঁহার প্রতি তাহারা এরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে, তাঁহার মহজ্জীবনী আদর্শ স্বরূপে রক্ষা করিয়া যদি বালকগণ আপনাদের জীবন গঠনে যত্নবান হয়, তবে এরূপ সম্মান প্রদর্শন বহু কল্যাণের কারণ হইবে।[৭]

বাংলাকে ভাঙবার ব্রিটিশ চক্রান্ত শতাব্দী সূচনার নতুন কোন উদ্যোগ নয়। "বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত একটি বিরাট প্রদেশ প্রশাসনিক দিক থেকে অসুবিধাজনক মনে করে ১৮৫৩ সাল থেকে বহুবার এ প্রদেশটিকে খণ্ডিত করার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত এ ধরনের কোন প্রস্তাবই কার্যকর হয়নি। লর্ড কার্জন পূর্বেকার প্রস্তাব সমূহ বিবেচনা করে পূর্ব ও উত্তর বাংলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে এক নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করেন। ঢাকাকে এর রাজধানী করে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর-এ নতুন কার্যকর হয়। সার ব্যামফিল্ড ফুলারকে (Sir Bamfylde Fuller) প্রদেশের প্রথম লেঃ গভর্নর নিয়োগ করা হয়। নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ঢাকার মুসলমানগণ এ নতুন ব্যবস্থার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। হিন্দু সমাজের মধ্যে এ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। হিন্দু ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি, জমিদার, আইনজীবী সম্প্রদায় তাদের স্বার্থহানির আশঙ্কায় 'নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস'-এর নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গ রোধ ও রদ করতে ব্যাপক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি শুরু থেকেই এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তার সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পাল এদের দলে যোগদান করেন।...[৮]

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ক্রমশ ব্যাপকরূপ পেতে থাকে। ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জনের আহ্বান জানান হলে, তার সমর্থনে এগিয়ে আসে বহু মানুষ। ব্রিটিশ দ্রব্য আমদানি হ্রাস পায় ৬০ শতাংশ। বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ব্যাপক সংখ্যায় জড়িয়ে পড়ে আন্দোলনে। সমগ্র ঢাকা জেলায় আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর একটি সরকার বিরোধী জনসভায় ঢাকা নবাব পরিবারের একজন যোগদানও করেছিলেন। ৩০ ডিসেম্বর (১৯০৬) ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় মুসলিম কনফারেন্স। সলিমুল্লাহের এই সম্মেলনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। সম্মেলনে মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছিল। সবথেকে বড় কথা এই সম্মেলনে জন্ম নেয় সর্বভারতীয় মুসলিম লিগ সংগঠন।

এইসময়ে ঢাকায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের তীব্রতাও বৃদ্ধি পায়। পুলিনবিহারী দাস ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় অনুশীলন সমিতির যে কেন্দ্রটি স্থাপন করেন, তা অতি দ্রুত পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অংশে শাখা বিস্তার করে। লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, তরবারি খেলা, ঘোড়ায় চড়া নানারকম শারীরিক কসরত রপ্ত করতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। এসব ছাড়াও গোটা ঢাকা জেলায় তখন ন্যাশনাল স্কুলের প্রভাব বেড়ে যায়। প্রথাগত ইংরেজি বিদ্যালয় ত্যাগ করে ছাত্ররা এখানে এসে শিক্ষালাভ করত এবং দেশপ্রেম মন্ত্রে দীক্ষা নিত। গোটা ঢাকা জেলা জুড়ে এবং পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এমন তীব্র হয়ে ওঠে, যা ইংরেজ সরকারকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে।

অবশেষে ইংলন্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ দিল্লির দরবারে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর ঘোষণা করেন নতুন প্রদেশ গঠন আদেশ বাতিল করা হল। অর্থাৎ সমগ্র বাংলা একটি প্রদেশ হিসাবে একজন গভর্নর শাসন করবেন। অসন্তুষ্ট ক্ষুব্ধ মুসলমান সমাজকে তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে ইংরেজ সরকার ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে। আর এই বিশ্ববিদ্যালয় হবে আবাসিক। এইবছর ১ এপ্রিল থেকে রাজধানী শহর ঢাকা, আবার জেলা শহর পরিণত হলে। কিন্তু মুসলমান জনগণের ইংরেজ বিরোধী মনোভাব আরো কঠোর হয়ে উঠতে থাকে।

ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ পুলিনবিহারী দাসের জন্ম ফরিদপুর জেলার লোনসিং গ্রামে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি। পিতা নবকুমার দাস ছিলেন মাদারিপুরের নামজাদা উকিল। পুলিনবিহারী ঢাকা কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ঐ কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। পুলিনবিহারী ছাত্রজীবন থেকে বিপ্লবী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হন। তিনি ব্যায়াম চর্চায় উৎসাহী হয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। ছাত্রদের নিয়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

"এই সময় তিনি কিছুকাল বিখ্যাত তুর্কি অসি-সঞ্চালক মার্তাজার নিকট হইতে অসি ও ছোরা খেলার ক্রীড়াকৌলিন শিক্ষা করিয়া উহাতে অনন্য সাধারণ পারদর্শিতা লাভ করেন। উহার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য লাঠি খেলাও শিক্ষা করেন। তিনি অসি, ছোরা ও লাঠি খেলার বিভিন্ন দিকে এত পারদর্শিতা লাভ করেন যে, লাঠি চালনা ও অসি ও ছোরা খেলায় তাঁহার কৌশল ও বুৎপত্তি বাংলা দেশে একটা প্রবাদ হইয়া দাঁড়াইল।

১৯০৫ সালে পুলিন দাস কলিকাতার বিপ্লবী সংস্থা অনুশীলন সমিতির ডিরেক্টর ও ব্যারিস্টর প্রমথনাথ মিত্রের নিকট হইতে বিপ্লবমন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেন। ঢাকাতেই তাঁহার দীক্ষা হয়। ঐ সময় পি. মিত্র এবং বিপিনচন্দ্র পাল ঢাকায় গিয়াছিলেন! অতঃপর ১৯০৬ সালে পুলিন দাসের উপরে সমগ্র পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে সমিতি গঠন করিয়া তুলিবার ভার অর্পিত হয়। ইহার পর হইতে তাঁহার সুযোগ্য নেতৃত্বে ও সংগঠন শক্তির বলে অতি শীঘ্রই পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অনুশীলন সমিতির বৈপ্লবিক শাখা সমূহের প্রসার লাভ ঘটে। ১৯০৮ সালে যখন পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে অনুশীলন সমিতিসহ বিভিন্ন সমিতি বেআইনি ঘোষিত হয় তখন বিভিন্ন স্থানে পুলিনবাবুর নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতির প্রায় ৬০০ শাখা সমিতি বিদ্যমান ছিল।" [৯]

ইংরেজ সরকার ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে পুলিনবিহারীকে নির্বাসিত করেন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিলাভের পর ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার করে আন্দামানে নির্বাসিত করা হয়। মুক্তি লাভের পর ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার বাদুড়বাগানে বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর সারাজীবন শক্তিসাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। দেশভাগের পর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ আগস্ট পুলিনবিহারী জীবনাবসান ঘটে।

ঢাকার নবাব পরিবার নিয়ে কিংবদন্তীর শেষ নেই। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খাজা আলিমুল্লাহ (মৃত্যু ১৮৫৪ খ্রিঃ)। তাঁর পুত্র নবাব আবদুল গনি ছিলেন দীর্ঘজীবী (১৮১৩-৯৬ খ্রিঃ)। তিনিই ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। সরকার তাদের নবাব উপাধি দেয়! জনদরদী হলেও, সিপাহী বিদ্রোহের সময় সরকারকে সমর্থন করায় তাঁর দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে। খাজা আবদুল গনি প্রথমে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, তারপর ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য, আইন পরিষদের সদস্য (১৮৬৭ খ্রিঃ), সি. এস. আই. (১৮৭১ খ্রিঃ), নবাব (১৮৭৫ খ্রিঃ), কে. সি. এস. আই. (১৮৮৬ খ্রিঃ)—এইসব সম্মান ও উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। নবাব আবদুল গনির পুত্র নবাব খাজা আহসানউল্লাহ (১৮৪৬-০১ খ্রিঃ) প্রথমে ছিলেন ঢাকা পুরসভার কমিশনার এবং অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। খান বাহাদুর (১৮৭১ খ্রিঃ), নবাব (১৮৭৭ খ্রিঃ), সি. আই. ই. (১৮৯১ খ্রিঃ), কে. সি. আই. (১৮৯৭ খ্রিঃ) উপাধি পান। এই দুই নবাব কংগ্রেস রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। কিন্তু ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে নবাব আহসানউল্লাহের মৃত্যুর পর নবাব পরিবার প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত বাতিলের পর তা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। নবাব সলিমুল্লাহ এই সিদ্ধান্তকে প্রতিশ্রুতিভঙ্গ বললেও, প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে কোনরকম সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেননি। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে মারা যান সলিমুল্লাহ। তারপর ব্রিটিশ সমর্থনে এগিয়ে আসেন সলিমুল্লাহের ভাই খাজা আতিমুল্লাহ, পুত্র হাবিবুল্লাহ এবং আত্মীয় খাজা ইউছুপজান।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে লখনৌ চুক্তির পর ঢাকার রাজনৈতিক চিত্রের রূপান্তর ঘটে। আহসান মঞ্জিল রাজনীতি চর্চার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯২০-২১ খ্রিস্টাব্দে এখানে অনুষ্ঠিত হয় খিলাফত সম্মেলন। ধীরে ধীরে ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতিতে নবাব পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। খিলাফত আন্দোলনের দুই নেতা মওলানা মুহম্মদ আলি ও মওলানা শওকত আলি, আবুল কালাম আজাদ, মোহনলাল করমচাঁদ গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাস বিভিন্ন সময়ে আহসান মঞ্জিলে অবস্থান করে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত করেছেন। নবাব পরিবারের হাবিবুল্লাহ (মৃত্যু ১৯৫৮ খ্রিঃ), খাজা আতিকুল্লাহ, খাজা সোলায়মান কাদের, খাজা মওদুদ, খাজা আবদুল করিম, খাজা আবদুল রহিম, খাজা হাসান আসকারি (১৯২১-৮৪ খ্রিঃ), খাজা খয়রুদ্দিন, খাজা আবদুল গফুর, খাজা নাজিমুদ্দিন (১৮৯৪-১৯৬৪ খ্রিঃ), খাজা শাহাবুদ্দিন (১৮৯৯-১৯৭৭) এবং খাজা নসরুল্লাহ (মৃত্যু ১৯৫১ খ্রিঃ)—মুসলিম রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় এঁদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন খাজা হাবিবুল্লাহ, খাজা নাজিমুদ্দিন এবং খাজা শাহাবুদ্দিন। খাজা নাজিমুদ্দিন প্রথমে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী (১৯৪৭ খ্রিঃ) এবং পরে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল এবং মন্ত্রী (১৯৪৮ খ্রিঃ) হন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন খাজা শাহাবুদ্দিন।

এই যে দীর্ঘকাল ব্যাপী রাজনৈতিক ঘটনাবর্ত তা কেবলমাত্র ঢাকা নয়, সমগ্র পূর্ব বাংলার মুসলিম জনমানসে গভীর রেখাপাত করে যায়। কেবলমাত্র কংগ্রেস বা হিন্দু নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা নয়, ইংরেজ বিদ্বেষ তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮ খ্রিঃ) এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫ খ্রিঃ) সনাতন সমাজ ব্যবস্থা, জীবনধারা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রবহমান ধারায় গভীর কুঠারাঘাত করে। মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণ ছিল এই সময়ের স্বাভাবিক পরিণতি। ১৯৩৭ খ্রিঃ এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভা এমন কিছু আইন প্রণয়ন করে যা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ছিল নতুন সম্ভাবনার ঈঙ্গিতপূর্ণ।

হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ১৯২৬ খ্রিঃ থেকে বাড়ছিল। দুটি সম্প্রদায়ের পারস্পরিক বিশ্বাসের অস্তিত্ব লোপ পেতে থাকে। ১৯৪০ খ্রিঃ নিখিল ভারত মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি গৃহীত হয়। এই দাবির অন্যতম সমর্থক ছিলেন জেলার অন্যতম লিগ নেতা খাজা নাজিমুদ্দিন, খাজা হাবিবুল্লাহ, ফজলুল রহমান, ফকির আবদুল মান্নান প্রমুখ। পাকিস্তান প্রস্তাবের পক্ষে জেলার বিভিন্ন অংশে প্রচার চালান হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি এবং আবুল হাসিম। পাকিস্তান দাবির ভিত্তিতে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের সবকটি মুসলিম আসনে লিগের প্রার্থী জয়ী হয়। সুস্পষ্ট হয়ে যায় জেলার জনগণ পাকিস্তান দাবির পক্ষে। ব্রিটেনও ছিল সুযোগের অপেক্ষায়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট তারা ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি করল সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে। যার বিষাক্ত পরিণতি এখনও দুই রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষকে ভোগ করতে হচ্ছে।

চল্লিশ দশক সম্পর্কে দেখুন "প্রাসঙ্গিক সংযোজন খ"

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হন স্যার ফ্রেডরিক বোর্ন এবং মুখ্যমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দিন। ঢাকা শহর আবার রাজধানীর মর্যাদা ফিরে পেল। পাকিস্তান গঠনের পর পূর্ব বাংলা আইন পরিষদে গৃহীত হয় জমিদারি প্রথা বিলোপ আইন। এর ফলে পূর্ব বাংলা জুড়ে হিন্দুদের যে বিশাল জমিদারি ছিল তার অবসান ঘটে (১৯৫১ খ্রিঃ)। অবশ্য তার আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই দাঙ্গা শুরু হয় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি। আর গভর্নর স্যার ফ্রেডরিক বোর্ন পদত্যাগ করেন ১৯৫০ খ্রিঃ ৫ এপ্রিল। ফিরোজ খান নুন গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনিও পদত্যাগ করেন (১৯৫৩ এপ্রিল)। তারপর গভর্নর হন চৌধুরী খালি কুজ্জামান।

এই সময়কালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে সবথেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভাষা আন্দোলন। এর সূচনা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই। করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে (১৯৪৮ খ্রিঃ ২৩ ফেব্রুয়ারি) গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় অধিবেশনের কার্যক্রম রেকর্ড করা হবে ইংরেজির সঙ্গে উর্দুতে। গণপরিষদে কুমিল্লার প্রতিনিধি এই গৃহীত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বলেন, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলাতেও কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করতে হবে। কিন্তু সরকার পক্ষের বিরোধিতায় তা গৃহীত হয়নি। এই সংবাদ ঢাকায় পৌঁছবার পর ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। ধর্মঘট পালিত হয় ২৬ ফেব্রুয়ারি। গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। এই পরিষদ এবং মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের মধ্যে একটি চুক্তি হয় (১৫ মার্চ) পাকিস্তান আইন পরিষদের অধিবেশনে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে। উত্তেজনাকে আগুনের গোলকে পরিণত করলেন স্বয়ং মোহম্মদ আলি জিন্নাহ। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে তিনি ঘোষণা করলেন (১৯৪৮ খ্রিঃ ২১ মার্চ) উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।

তারপরই প্রতিবাদে, বিক্ষোভে সমগ্র পূর্ব বাংলা উত্তাল হয়ে উঠল। কিন্তু সব কিছু অগ্রাহ্য করে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান (১৯৫০) এবং প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন (১৯৫২) উর্দুর পক্ষে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। প্রতিবাদে ঢাকায় ব্যাপক ছাত্র ধর্মঘট হল ৩০ জানুয়ারি। সেইসঙ্গে গঠিত হল সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ঢাকায় তখন নুরুল আমীন সরকার। সরকার মিছিল ও সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু সংগ্রাম পরিষদের মিছিল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে অধিবেশনরত প্রাদেশিক পরিষদের দিকে অগ্রসর হয়। ছাত্র-জনতা-পুলিশ সংঘর্ষ শুরু হলে পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে ঘটনাস্থলেই নিহত হয় সালাম, বরকত, রফিক ও জব্বার। গোটা পূর্ববাংলা জুড়ে যেন আগুন জ্বলে ওঠে। অবশেষে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকার করে (১৯৫৬ খ্রিঃ)। জনগণের এই জয় পূর্ববাংলার গণচেতনাকে এক ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করল। পরবর্তীকালে আরো কঠিনতর সংগ্রামের পথ পেরিয়ে জন্ম হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের।

তারই প্রাথমিক পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনে। আওয়ামি লিগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নিজামে-ইসলাম ও গণতন্ত্রী দল মিলে গঠন করে যুক্তফ্রন্ট। নেতৃত্বে ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানি, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এবং হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি। যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা দাবির অন্যতম ছিল পূর্ব বাংলার সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার স্বীকৃতি। পাকিস্তান সৃষ্টির দাবিদার মুসলিম লিগকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে ২৩৭টি আসনের ২২৩টিতে জয়লাভ করে যুক্তফ্রন্ট। মুসলিম লিগ পায় মাত্র ৯টি আসন। ৪টি আসন পায় নির্দল প্রার্থীরা এবং একটি আসন পায় খেলাফতে রাব্বানি পার্টি।

গভর্নরের আমন্ত্রণে এ. কে. ফজলুল হক ১৪ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা (১৯৫৪ খ্রিঃ ৩ এপ্রিল) গঠন করার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার শুরু করে নানারকম ষড়যন্ত্র। বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা ব্যাপক আকার নিতে থাকে। আদমজি জুট মিলে এক হাজারেরও বেশি শ্রমিক মারা যায়। অবশেষে ষড়যন্ত্রকারী কেন্দ্রীয় সরকার আইনশৃঙ্খলা অবনতির অজুহাতে হক মন্ত্রিসভাকে খারিজ করে (১৯৫৪ খ্রিঃ ২১ মে)। অর্থাৎ হক মন্ত্রিসভার পরমায়ু দু'মাসও পূর্ণ ছিল না। জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা গভর্নর হয়ে আসেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে একমাত্র অস্ত্র ছিল দমন-পীড়ন। ১৯৫৫ সালের মধ্যে একাধিক গভর্নর ও একাধিক মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ

করেও কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলার ক্ষুব্ধ জনমানসকে স্তব্ধ করতে পারেনি। এই বছরের শেষে (২১ নভেম্বর) পুলিশ বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা হয়েছিল।

গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন ১৯৫৪ খ্রিঃ ১৪ অক্টোবর। সার্বভৌম গণপরিষদ ভেঙে দেওয়া হয়। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে নবনির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে নতুন গণপরিষদ গঠিত হল। রচিত হয় পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান। এখন থেকে পূর্ব বাংলা হয় পূর্ব পাকিস্তান। জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা হলেন পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট। পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রিসভায় নানা ওলোট-পালোট ঘটতে থাকে। অবশেষে ১৯৫৮ খ্রিঃ ৭ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জা দেশে সামরিক আইন জারি করেন। ২০ দিন বাদে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে প্রেসিডেন্ট পদে বসেন জেনারেল আইয়ুব খান। আইয়ুব খান থেকে জেনারেল ইয়াহিয়া খান (১৯৬৯ খ্রিঃ) পর্যন্ত পাকিস্তান নানান ঘটনায় পূর্ণ। এরমধ্যে ঘটে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৬৪ খ্রিঃ) এবং ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ (১৯৬৫)।

শেখ মুজিবর রহমানসহ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অপরাধী হিসেবে বিচার শুরু করা হলেও গণ আন্দোলনের চাপে এই মামলা অবশেষে প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শেষের তাসখন্দ চুক্তি পাকিস্তানের জনগণ মেনে নিতে পারেনি। বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিরোধী দলগুলির লাহোর সম্মেলনে (১৯৬৬ খ্রিঃ ১৬ ফেব্রুয়ারি) শেখ মুজিবর রহমান ৬ দফা দাবি পেশ করে গণ আন্দোলনে তীব্র গতি সঞ্চার করলেন। ঐতিহাসিক গুরুত্ব, বিশেষ করে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের পটভূমি রচনার কারণে দাবিটি সম্পূর্ণ এখানে উদ্ধৃত হল।

আমাদের বাঁচার দাবি
৬ দফা কর্মসূচি

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই-বোনেরা,

আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবিরূপে ৬ দফা কর্মসূচি দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমি স্বার্থীদের দালালরা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশমনদের এই চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিত। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবি যখনই উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈ হৈ করিয়া উঠিয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি, পূর্ব পাক জনগণের মুক্তি-সনদ একুশ দফা দাবি, যুক্ত নির্বাচন-প্রথার দাবি, ছাত্র তরুণদের সহজ ও স্বল্প ব্যয় শিক্ষালাভের দাবি, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবি ইত্যাদি সকল প্রকার দাবির মধ্যেই এই শোষকের দল ও তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমার প্রস্তাবিত ৬ দফা দাবিতেও এঁরা তেমনিভাবে পাকিস্তান দুই টুকরা করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তাবিত ৬ দফা দাবিতে যে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি শোষিত বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে তাতে আমার কোনও সন্দেহ নাই। খবরের কাগজের লেখায়, সংবাদে ও সভা সমিতির বিবরণে, সকল শ্রেণীর সুধীজনের বিবৃতিতে আমি গোটা দেশবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি। তাতে আমার প্রাণে সাহস ও বুকে বল আসিয়াছে। সর্বোপরি, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামি লিগ আমার ৬ দফা দাবি অনুমোদন করিয়াছেন। ফলে ৬ দফা

দাবি আজ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় দাবিতে পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় কায়েমি স্বার্থী শোষকদের প্রচারনায় জনগণ বিভ্রান্ত হইবেন না, সে বিশ্বাস আমার আছে।

কিন্তু এও আমি জানি, জনগণের দুশমনদের ক্ষমতা অসীম, তাঁদের বিত্ত প্রচুর, হাতিয়ার এঁদের অফুরন্ত, মুখ এঁদের দশটা, গলার সুর এঁদের শতাধিক। এঁরা বহুরূপী। ঈমান, ঐক্য ও সংহতির নামে এঁরা আছেন সরকারি দলে। আবার ইসলাম ও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া এঁরা আছেন অপজিশন দলে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুশ্‌মনির বেলায় এঁরা সকলেই একজোট। এঁরা নানা ছলাকলায় জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। সে চেষ্টা শুরুও হইয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিষ্কাম সেবার জন্য এঁরা ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এদের হাজার চেষ্টাতেও আমার অধিকার-সচেতন দেশবাসী বিভ্রান্ত হইবেন না তাতেও আমার কোনও সন্দেহ নাই। তথাপি ৬ দফা দাবির তাৎপর্য ও উহার অপরিহার্যতা জনগণের মধ্যে প্রচার করা সমস্ত গণতন্ত্রী বিশেষত আওয়ামি লিগ কর্মিদের অবশ্য কর্তব্য। আশা করি, তাঁরা সকলে অবিলম্বে ৬ দফার ব্যাখ্যায় দেশময় ছড়াইয়া পড়িবেন। কর্মী ভাইদের সুবিধার জন্য ও দেশবাসী জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে আমি ৬ দফার প্রতিটি দফার দফাওয়ারি সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ এই পুস্তিকা প্রচার করিলাম। আওয়ামি লিগের তরফ হইতেও এ বিষয়ে আরও পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করা হইবে। আশা করি সাধারণভাবে সকল গণতন্ত্রী বিশেষভাবে আওয়ামি লিগের কর্মিগণ ছাড়াও শিক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানি মাত্রেই এইসব পুস্তিকার সদ্ব্যবহার করিবেন।

১ নং দফা :

ঐতিহাসিক লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশন রূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

ইহাতে আপত্তি কি আছে? লাহোর-প্রস্তাব পাকিস্তানের জনগণের নিকট কায়েদে-আজমসহ সকল নেতার দেওয়া নির্বাচনী ওয়াদা। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই হইয়াছিল। মুসলিম বাংলার জনগণ একবাক্যে পাকিস্তানের বাক্সে ভোট দিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দরুণই। ১৯৫৪ সনের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মুসলিম আসনের শতকরা সাড়ে ৯৭টি যে একুশ দফার পক্ষে আসিয়াছিল, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবি ছিল তার অন্যতম প্রধান দাবি। মুসলিম লিগ তখন কেন্দ্রের ও প্রদেশের সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সরকারি সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা লইয়া তাঁরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে ইসলাম বিপন্ন ও পাকিস্তান ধ্বংস হইবে, এসব যুক্তি তখনও দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি পূর্ব বাংলার ভোটাররা এই প্রস্তাবসহ একুশ দফার পক্ষে ভোট দিয়াছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষের কথা বলিতে গেলে এই প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসিত হইয়াই গিয়াছে। কাজেই আজ লাহোর-প্রস্তাব ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার দাবি করিয়া আমি কোনও নতুন দাবি তুলি নাই; পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পুরান দাবিরই পুনরুল্লেখ করিয়াছি মাত্র। তথাপি লাহোর প্রস্তাবের নাম শুনিলেই যাঁরা আঁৎকিয়া উঠেন, তাঁরা হয় পাকিস্তান সংগ্রামে শরিক ছিলেন না, অথবা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি-দাওয়ার বিরোধিতা ও কায়েমি স্বার্থীদের দালালি করিয়া পাকিস্তানের অনিষ্ট সাধন করিতে চান।

এই দফায় পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার, সার্বজনীন ভোটে সরাসরি নির্বাচন ও আইন সভার সার্বভৌমত্বের যে দাবি করা হইয়াছে তাতে আপত্তির কারণ কি? আমার প্রস্তাবই ভাল, না প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার ও পরোক্ষ নির্বাচন এবং ক্ষমতাসীন আইন সভাই

ভাল, এ বিচারভার জনগণের ওপর ছাড়িয়া দেওয়াই কি উচিত নয়? তবে পাকিস্তানের ঐক্য সংহতির এই তরফদারেরা এই সব প্রশ্নে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব না দিয়া আমার বিরুদ্ধে গালাগালি বর্ষণ করিতেছেন কেন? তাঁরা যদি নিজেদের মতে এতই আস্থাবান, তবে আসুন এই প্রশ্নের ওপরই গণভোট হইয়া যাক।

২নং দফা :

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেট সমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

এই প্রস্তাবের দরুণই কায়েমি স্বার্থের দালালরা আমার ওপর সর্বাপেক্ষা বেশি চটিয়াছেন। আমি নাকি পাকিস্তানকে দুই টুকরা করতঃ ধ্বংস করিবার প্রস্তাব দিয়াছি। সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ইহাদের এতই অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে, ইঁহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, বৃটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালে যে 'প্ল্যান' দিয়াছিলেন এবং যে 'প্ল্যান' কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এই তিনটি মাত্র বিষয় ছিল এবং বাকি সব বিষয়ই প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে এটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বৃটিশ সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ সকলের মত এই যে, এই তিনটি মাত্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকিলেই কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে পারে। অন্য কারণে কংগ্রেস চুক্তিভঙ্গ করায় ক্যাবিনেট প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়। তা না হইলে এই তিন বিষয় লইয়াই আজও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে থাকিত। আমি আমার প্রস্তাবে ক্যাবিনেট প্ল্যানেরই অনুসরণ করিয়াছি। যোগাযোগ ব্যবস্থা আমি বাদ দিয়াছি সত্য কিন্তু তার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। অখণ্ড ভারতের বেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থারও অখণ্ডতা ছিল। ফেডারেশন গঠনের রাষ্ট্র-বৈজ্ঞানিক মূলনীতি এই যে, যে যে বিষয়ে ফেডারেটিং স্টেটসমূহের স্বার্থ এক ও অবিভাজ্য, কেবল সেই সেই বিষয়েই ফেডারেশনের এক্তিয়ারে দেওয়া হয়। এই মূলনীতি অনুসারে অখণ্ড ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ছিল। পেশাওয়ার হইতে চাটগাঁ পর্যন্ত একই রেল চলিতে পারিত। কিন্তু পাকিস্তানে তা নয়। দুই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য তো নয়ই, বরঞ্চ সম্পূর্ণ পৃথক। রেলওয়েকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ট্রান্সফার করিয়া বর্তমান সরকারও তা স্বীকার করিয়াছেন। টেলিফোন-টেলিগ্রাম পোস্টঅফিসের ব্যাপারেও এ সত্য স্বীকার করিতেই হইবে।

আরেকটা ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। আমার প্রস্তাবে ফেডারেটিং ইউনিটকে 'প্রদেশ' না বলিয়া 'স্টেট' বলিয়াছি। ইহাতে কায়েমি স্বার্থী শোষকরা জনগণকে এই বলিয়া ধোকা দিতে পারে এবং দিতেও শুরু করিয়াছে যে, 'স্টেট' অর্থে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট বা স্বাধীন রাষ্ট্র বুঝিয়াছি। কিন্তু তা সত্য নয়। ফেডারেটিং ইউনিটকে দুনিয়ার সর্বত্র সব বড় বড় ফেডারেশনেই 'প্রদেশ' বা 'প্রভিন্স' না বলিয়া 'স্টেটস্' বলা হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে ফেডারেশন অথবা ইউনিয়ন বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফেডারেল জার্মানি, এমনকি আমাদের প্রতিবেশি ভারত রাষ্ট্র সকলেই তাদের প্রদেশসমূহকে 'স্টেট্' ও কেন্দ্রকে ইউনিয়ন বা ফেডারেশন বলিয়া থাকে। আমাদের পার্শ্ববর্তী আসাম ও পশ্চিমবাংলা 'প্রদেশ' নয় 'স্টেট্'। এরা যদি ভারত ইউনিয়নের প্রদেশ হইয়া 'স্টেট্' হওয়ার সম্মান পাইতে পারে তবে পূর্ব পাকিস্তানকে এইটুকু নামের মর্যাদা দিতেই বা কর্তারা এত এলার্জিক কেন?

৩নং দফা :

এই দফায় আমি মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প বা অল্টারনেটিভ প্রস্তাব দিয়াছি। এই দুইটি প্রস্তাবের যে কোনও একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে :

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সি কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাঙ্ক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন একই কারেন্সি থাকিবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে; দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে।

এই দুইটি বিকল্প প্রস্তাব হইতে দেখা যাইবে যে, মুদ্রাকে সরাসরি কেন্দ্রের হাত হইতে প্রদেশের হাতে আনিবার প্রস্তাব আমি করি নাই। যদি আমার দ্বিতীয় অল্টারনেটিভ গৃহীত হয়, তবে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতেই থাকিয়া যাইবে। ওই অবস্থায় আমি একুশ দফা প্রস্তাবের খেলাফে কোনও সুপারিশ করিয়াছি, একথা বলা চলে না।

যদি পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইরা আমার এই প্রস্তাবে রাজি না হন, তবে শুধু প্রথম বিকল্প অর্থাৎ কেন্দ্রের হাত হইতে মুদ্রাকে প্রদেশের হাতে আনিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভুল বুঝাবুঝির অবসান হইলে আমাদের এবং উভয় অঞ্চলের সুবিধার খাতিরে পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইরা এই প্রস্তাবে রাজি হইবেন। আমরা তাঁদের খাতিরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ত্যাগ করিয়া সংখ্যা সাম্য মানিয়া লইয়াছি, তাঁরা কি আমাদের খাতিরে এইটুকু করিবেন না?

আর যদি অবস্থা গতিকে মুদ্রাকে প্রদেশের এলাকায় আনিতেও হয়, তবু তাতে কেন্দ্র দুর্বল হইবে না; পাকিস্তানের কোনও অনিষ্ট হইবে না। ক্যাবিনেট প্ল্যানে নিখিল ভারতীয় কেন্দ্রের যে প্রস্তাব ছিল, তাতে মুদ্রা কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না। ঐ প্রস্তাব পেশ করিয়া বৃটিশ সরকার এবং ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মুদ্রাকে কেন্দ্রীয় বিষয় না করিয়াও কেন্দ্র চলিতে পারে। কথাটা সত্য। রাষ্ট্রীয় অর্থ বিজ্ঞানে এই ব্যবস্থার স্বীকৃতি আছে। কেন্দ্রের বদলে প্রদেশের হাতে অর্থনীতি রাখা এবং একই দেশে পৃথক পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকার নজির দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রেও আছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চলে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে পৃথক পৃথক স্টেট ব্যাঙ্কের দ্বারা। এতে যুক্তরাষ্ট্র ধ্বংস হয় নাই; তাদের আর্থিক বুনিয়াদও ভাঙিয়া পড়ে নাই। অত যে শক্তিশালী দোর্দণ্ডপ্রতাপ সোভিয়েত ইউনিয়ন, তাদেরও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও অর্থমন্ত্রী বা অর্থদপ্তর নাই। শুধু প্রাদেশিক সরকারের অর্থাৎ স্টেট রিপাবলিক সমূহেই অর্থমন্ত্রী ও অর্থদপ্তর আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক প্রয়োজন ওইসব প্রাদেশিক মন্ত্রী ও মন্ত্রী-দপ্তর দিয়াই মিটিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার মত দেশেও আঞ্চলিক সুবিধার খাতিরে দুইটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বহুদিন আগে হইতেই চালু আছে।

আমার প্রস্তাবের মর্ম এই যে, উপরোক্ত দুই বিকল্পের দ্বিতীয়টি গৃহীত হইলে মুদ্রা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। সে অবস্থায় উভয় অঞ্চলের একই নক্শার মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে তেমনি থাকিবে। পার্থক্য শুধু এই হইবে যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পূর্ব পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'ঢাকা' লেখা থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পশ্চিম পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'লাহোর' লেখা থাকিবে। পক্ষান্তরে, আমার প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিকল্প না হইয়া যদি প্রথম বিকল্পও গৃহীত হয়, সে অবস্থাতেও উভয় অঞ্চলের মুদ্রা সহজে বিনিময়যোগ্য থাকিবে এবং পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতীক ও নিদর্শনস্বরূপ উভয় আঞ্চলিক সরকারের সহযোগিতায় একই নক্শার মুদ্রা প্রচলন করা যাইবে।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই দুই ব্যবস্থার একটি গ্রহণ করা ছাড়া

পূর্ব পাকিস্তানকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করার অন্য কোনও উপায় নাই। সারা পাকিস্তানের জন্য একই মুদ্রা হওয়ায় ও দুই অঞ্চলের মুদ্রার মধ্যে কোনও পৃথক চিহ্ন না থাকায় আঞ্চলিক কারেন্সি সার্কুলেশনে কোনও বিধি-নিষেধ ও নির্ভুল হিসাব নাই। মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারে থাকায় অতি সহজেই পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, ইনসিওরেন্স ও বৈদেশিক মিশন সমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় প্রতি মিনিটে এই পাচারের কাজ অবিরাম গতিতে চলিতেছে। সকলেই জানেন সরকারি স্টেট ব্যাঙ্ক ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্কসহ সমস্ত ব্যাঙ্কের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে। এই সেদিনমাত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট দু-একখানি ব্যাঙ্ক ইহার সাম্প্রতিক ব্যতিক্রম মাত্র। এইসব ব্যাঙ্কের ডিপোজিটের টাকা, শেয়ারমানি, সিকিউরিটি মানি, শিল্প-বাণিজ্যের আয়, মুনাফা ও শেয়ার মানি, এক কথায় পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সমস্ত আর্থিক লেনদেনের টাকা বালুচরে ঢালা পানির মত একটানে তলদেশে হেড অফিসে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে, পূর্ব পাকিস্তান শুক্না বালুচর হইয়া থাকিতেছে। বালুচরে পানির দরকার হইলে টিউবওয়েল খুদিয়া তলদেশ হইতে পানি তুলিতে হয়। অবশিষ্ট পানি তলদেশে জমা থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থও তেমনি চেকের টিউবওয়েলের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আনিতে হয়। উদ্বৃত্ত আর্থিক সেভিং তলদেশেই অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানেই জমা থাকে। এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানে ক্যাপিটেল ফর্মেশন হইতে পারে নাই। সব ক্যাপিটেল ফর্মেশন পশ্চিমে হইয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে কোনওদিন পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গঠন হইবেও না। কারণ সেভিং মানেই ক্যাপিটেল ফর্মেশন।

শুধু ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বা মুদ্রা পাচারই নয়, মুদ্রাস্ফীতি হেতু পূর্ব পাকিস্তানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দুর্মূল্যতা, জনগণের বিশেষত পাটচাষীদের দুর্দশা, সমস্তের জন্য দায়ী এই মুদ্রা ব্যবস্থা ও অর্থনীতি। আমি ৫নং দফার ব্যাখ্যায় এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, এই ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বন্ধ করিতে না পারিলে পূর্ব পাকিস্তানিরা নিজেরা শিল্প-বাণিজ্যে এক পাও অগ্রসর হইতে পারিবে না। কারণ এ অবস্থায় মূলধন গড়িয়া উঠিতে পারে না।

৪নং দফা :

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউয়ের নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহের ওপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

আমার এই প্রস্তাবেই কায়েমি স্বার্থের কালাবাজারি ও মুনাফাখোর শোষকরা সবচেয়ে বেশি চমকিয়া উঠিয়াছে। তারা বলিতেছে, ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের না থাকিলে সে সরকার চলিবে কিরূপে? কেন্দ্রীয় সরকার তাতে যে একেবারে খয়রাতি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। খয়রাতের উপর নির্ভর করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার দেশরক্ষা করিবেন কেমনে? পররাষ্ট্র নীতিই বা চালাইবেন কি দিয়া? প্রয়োজনের সময় চাঁদা না দিলে কেন্দ্রীয় সরকার তো অনাহারে মারা যাইবেন। অতএব এটা নিশ্চয়ই পাকিস্তান ধ্বংসেরই ষড়যন্ত্র।

কায়েমি স্বার্থীরা এই ধরনের কত কথাই না বলিতেছেন। অথচ এর একটা আশঙ্কাও সত্য নয়। সত্য যে নয় সেটা বুঝিবার মত বিদ্যা-বুদ্ধি তাঁদের নিশ্চয়ই আছে। তবু যে তাঁরা এসব কথা বলিতেছেন, তার একমাত্র কারণ তাঁদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ। সে স্বার্থ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে অবাধে শোষণ ও লুণ্ঠন করার অধিকার। তাঁরা জানেন যে, আমার

এই প্রস্তাবে কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের দায়িত্ব দেওয়া না হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিঘ্নে চলার মত যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সে ব্যবস্থা নিখুঁত করিবার শাসনতান্ত্রিক বিধান রচনার সুপারিশ করা হইয়াছে। এটাই সরকারি তহবিলের সবচেয়ে অমোঘ, অব্যর্থ ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ উপায়। তাঁরা এটাও জানেন যে, কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা না দিয়াও ফেডারেশন চলার বিধান রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বীকৃত। তাঁরা এ খবরও রাখেন যে, ক্যাবিনেট মিশনের যে প্ল্যান বৃটিশ সরকার রচনা করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতেও সমস্ত ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল; কেন্দ্রকে সে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ৩নং দফার ব্যাখ্যায় আমি দেখাইয়াছি যে, অর্থমন্ত্রী ও অর্থ দপ্তর ছাড়াও দুনিয়ার অনেক ফেডারেশন চলিতেছে। তার মধ্যে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ফেডারেশন সোভিয়েত ইউনিয়নের কথাও আমি বলিয়াছি। তথায় কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী বা অর্থ দপ্তর বলিয়া কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নাই। তাতে কি অর্থাভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে? তার দেশরক্ষা বাহিনী পররাষ্ট্র দপ্তর কি সে জন্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে? পড়ে নাই। আমার প্রস্তাব কার্যকরী হইলেও তেমনি পাকিস্তানের দেশরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হইবে না। কারণ আমার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় তহবিলের নিরাপত্তার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে। সে অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন এমন বিধান থাকিবে যে আঞ্চলিক সরকার যেখানে যখন যে খাতেই যে টাকা ট্যাক্স ধার্য ও আদায় করুন না কেন, শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত সে টাকার হারের অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হইয়া যাইবে। সে টাকায় আঞ্চলিক সরকারের কোনও হাত থাকিবে না। এই ব্যবস্থায় অনেক সুবিধা হইবে। প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় সরকারকে ট্যাক্স আদায়ের ঝামেলা পোহাইতে হইবে না। দ্বিতীয়তঃ ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের জন্য কোনও দপ্তর বা অফিসার বাহিনী রাখিতে হইবে না। তৃতীয়তঃ অঞ্চলে ও কেন্দ্রের জন্য ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের মধ্যে ডুপ্লিকেশন হইবে না। তাতে আদায়ী খরচায় অপব্যয় ও অপচয় বন্ধ হইবে। ঐভাবে সঞ্চিত টাকার দ্বারা গঠন ও উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করা যাইবে। অফিসার বাহিনীকেও উন্নততর সৎ কাজে নিয়োজিত করা যাইবে। চতুর্থতঃ ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের একীকরণ সহজতর হইবে। সকলেই জানেন অর্থ-বিজ্ঞানীরা এখন ক্রমেই সিঙ্গল ট্যাক্সেশনের নীতিকে সকলেই অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও ফলপ্রসূ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। ট্যাক্সেশনকে ফেডারেশনের এলাকা হইতে অঞ্চলের এক্তিয়ারভুক্ত করা এই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ আর্থিক নীতি গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে।

৫নং দফা :

এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছি ঃ

(১) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে,

(২) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এক্তিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এক্তিয়ারে থাকিবে,

(৩) ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশি মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমান ভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে,

(৪) দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি চলিবে,

(৫) ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশনের স্থাপনের এবং আমদানি-রপ্তানি করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা ৩নং

দফার মতই অত্যাবশ্যক। পাকিস্তানের আঠার বছরের আর্থিক ইতিহাসের দিকে একটু নজর বুলালেই দেখা যাইবে যে ঃ

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশি মুদ্রা দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের অর্জিত বিদেশি মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশি মুদ্রা বলা হইতেছে।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়িয়া না উঠায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশি মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের নাই এই অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিদেশি আয় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হইতেছে। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িত হইতে পারিতেছে না।

(গ) পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণে আয় করে সেই পরিমাণ রপ্তানি করে, আমদানি করে সাধারণত তার অর্ধেকেরও কম। ফলে অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম অনুসারেই পূর্ব পাকিস্তানে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি ম্যালেরিয়া জ্বরের মত লাগিয়াই আছে। তার ফলে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম এত বেশি। বিদেশ হইতে আমদানি করা একই জিনিসের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানি দামের তুলনা করিলেই এটা বুঝা যাইবে। বিদেশি মুদ্রা বণ্টনে দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ার থাকার ফলেই আমাদের এই দুর্দশা।

(ঘ) পাকিস্তানের বিদেশি মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগেই অর্জিত হয় পাট হইতে। অথচ পাটচাষীকে পাটের ন্যায্য মূল তো দূরের কথা আবাদি খরচটাও দেওয়া হয় না। ফলে পাটচাষীদের ভাগ্য আজ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন; কিন্তু চাষীকে পাটের ন্যায্য দাম দিতে পারেন না। এমন অদ্ভুত অর্থনীতি দুনিয়ার আর কোন দেশে নাই। যত দিন পাট থাকে চাষীর ঘরে, ততদিন পাটের দাম থাকে পনর-বিশ টাকা। ব্যবসায়ীর গুদামে চলিয়া যাওয়ার সাথে সাথে তার দাম হয় পঞ্চাশ। এ খেলা গরিব পাটচাষী চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। পাট ব্যবসায় জাতীয়করণ করিয়া পাট রপ্তানিকে সরকারি আয়ত্তে আনা ছাড়া এর কোনও প্রতিকার নাই, এ কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। এ উদ্দেশ্যে আমরা আওয়ামি লিগ মন্ত্রিসভার আমলে জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন গঠন করিয়াছিলাম। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পুঁজিপতিরা আমাদের সে আরব্ধ কাজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

(ঙ) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশি মুদ্রাই যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইতেছে তা নয়, আমাদের অর্জিত বিদেশি মুদ্রার জোরে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশি লোন ও এইড আসিতেছে, তাও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইতেছে। কিন্তু সে লোনের সুদ বহন করিতে হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানকেই। ঐ অবস্থায় প্রতিকার করিয়া পাটচাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য দিতে হইলে, আমদানি-রপ্তানি সমান করিয়া জনসাধারণকে সস্তা দামে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া তাদের জীবন সুখময় করিতে হইলে এবং সর্বোপরি আমাদের অর্জিত বিদেশি মুদ্রা দিয়া পূর্ব পাকিস্তানের হাতে পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিতে হইলে আমার প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

৬নং দফা :

এই দফায় আমি পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি। এ দাবি অন্যায়ও নয়, নতুনও নয়। একুশ দফার দাবিতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবি করিয়াছিলাম। তা তো করা হয়ই নাই, বরঞ্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ ই পি আর বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে নেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করতঃ এ অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবি একুশ দফার দাবি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বারো বছরেও আমাদের একটি দাবিও পূরণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ

পাকিস্তানির বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দাবি করিতে হইবে কেন? সরকার নিজে হইতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? পশ্চিম পাকিস্তান আগে বাঁচাইয়া সময় ও সুযোগ থাকিলে পরে পূর্ব পাকিস্তান বাঁচান হইবে, ইহাই কি কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেই রহিয়াছে এমন সাংঘাতিক কথা শাসনকর্তারা বলেন কোন্ মুখে? মাত্র সতের দিনের পাক-ভারত যুদ্ধই কি প্রমাণ করে নাই আমরা কত নিরুপায়? শত্রুর দয়া ও মর্জির ওপর তো আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা নীতি কার্যত আমাদের তাই করিয়া রাখিয়াছে।

তবু আমরা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির খাতিরে দেশরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে এও চাই যে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আত্মনির্ভর করিবার জন্য এখানে উপযুক্ত পরিমাণ দেশরক্ষা বাহিনী গঠন করুন। অস্ত্র কারখানা স্থাপন করুন। নৌবাহিনীর দপ্তর এখানে নিয়া আসুন। এসব কাজ সরকার কবে করিবেন জানি না। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা অল্প খরচে ছোটখাট অস্ত্রশস্ত্র দিয়া আধা সামরিক বাহিনী গঠন করিতেও পশ্চিমা ভাইদের অত আপত্তি কেন? পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র যুদ্ধ তহবিলে চাঁদা উঠিলে তাও কেন্দ্রীয় রক্ষা তহবিলে নিয়া যাওয়া হয় কেন? ঐ সব প্রশ্নের উত্তর নাই। তবু কেন্দ্রীয় ব্যাপারে অঞ্চলের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরাও চাই না। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান যেমন করিয়া পারে গরিবী হালেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবে, এমন দাবি কি অন্যায়? এই দাবি করিলেই সেটা হইবে দেশদ্রোহিতা?

এ প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানি ভাই-বোনদের খেদমতে আমার কয়েকটি আরজ আছে ঃ

এক, তাঁরা মনে করিবেন না আমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানিদের অধিকার দাবি করিতেছি। আমার ৬ দফা কর্মসূচিতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের দাবিও সমভাবেই রহিয়াছে। এ দাবি স্বীকৃত হইলে পশ্চিম পাকিস্তানিরাও সমভাবে উপকৃত হইবেন।

দুই, আমি যখন বলি, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার ও স্তূপীকৃত হইতেছে, তখন আমি আঞ্চলিক বৈষম্যের কথাই বলি, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা বলি না। আমি জানি, এ বৈষম্য সৃষ্টির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানিরা দায়ী নয়। আমি এও জানি যে, আমাদের মত দরিদ্র পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেক আছেন। যত দিন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান না হইবে, ততদিন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই অসাম্য দূর হইবে না। কিন্তু তার আগে আঞ্চলিক শোষণও বন্ধ করিতে হইবে। এই আঞ্চলিক শোষণের জন্যে দায়ী আমাদের ভৌগলিক অবস্থান এবং সে অবস্থানকে অগ্রাহ্য করিয়া যে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে সেই ব্যবস্থা। ধরুন, যদি পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া পূর্ব পাকিস্তানে হইত, পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি দপ্তরই যদি পূর্ব পাকিস্তানে হইত, তবে কার কি অসুবিধা-সুবিধা হইত, একটু বিচার করুন। পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা ৬২ টাকা খরচ হয় দেশরক্ষা বাহিনীতে এবং শতকরা বত্রিশ টাকা খরচ হয় কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায়। এই একুন শতকরা চুরানব্বই টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া তখন খরচ হইত পূর্ব পাকিস্তানে। আপনারা জানেন অর্থ বিজ্ঞানের কথা ঃ সরকারি আয় জনগণের ব্যয় এবং সরকারি ব্যয় জনগণের আয়। এই নিয়মে বর্তমান ব্যবস্থায় সরকারের গোটা আয়ের অর্ধেক পূর্ব পাকিস্তানের ব্যয় ঠিকই, কিন্তু সরকারি ব্যয়ের সবটুকুই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় সরকারি, আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিদেশি মিশনসমূহ তাদের সমস্ত ব্যয় পশ্চিম পাকিস্তানেই করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই ব্যয়ের সাকুল্যই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। ফলে প্রতিবছর পশ্চিম পাকিস্তানের আয় ঐ অনুপাতে বাড়িতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তান তার মোকাবিলায় ঐ পরিমাণ গরিব হইতেছে। যদি

পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের রাজধানী হইত তবে এই সব খরচ পূর্ব পাকিস্তানে হইত। আমরা পূর্ব পাকিস্তানিরা এই পরিমাণে ধনী হইতাম। আপনারা পশ্চিম পাকিস্তানিরা ঐ পরিমাণে গরিব হইতেন। তখন আপনারা কি করিতেন? যে সব দাবি করার জন্য আমাকে প্রাদেশিক সংকীর্ণতার তহ্মত দিতেছেন সেই সব দাবি আপনারা নিজেরাই করিতেন। আমাদের চেয়ে জোরেই করিতেন। অনেক আগেই করিতেন। আমাদের মত আঠার বছর বসিয়া থাকিতেন না। সেটা করা আপনাদের অন্যায়ও হইত না।

তিন, আপনারা ঐ সব দাবি করিলে আমরা পূর্ব পাকিস্তানিরা কি করিতাম, জানেন? আপনাদের সব দাবি মানিয়া লইতাম। আপনাদিগকে প্রাদেশিকতাবাদী বলিয়া গাল দিতাম না। কারণ আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, ও সব আপনাদের হক্ পাওনা। নিজের হক্ পাওনা দাবি করা অন্যায় নয়, কর্তব্য। এ বিশ্বাস আমাদের এতই আন্তরিক যে, সে অবস্থা হইলে আপনাদের দাবি করিতে হইত না। আপনাদের দাবি করার আগেই আপনাদের হক্ আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম। আমরা নিজেদের হক্ দাবি করিতেছি বলিয়া আমাদের স্বার্থপর বলিতেছেন। কিন্তু আপনারা যে নিজেদের হকের সাথে সাথে আমাদের হকটাও খাইয়া ফেলিতেছেন, আপনাদের লোকে কি বলিবে? আমরা শুধু নিজেদের হক্টাই চাই। আপনাদের হক্টা আত্মসাৎ করিতে চাই না। আমাদের দিবার আওকাৎ থাকিলে বরঞ্চ পরকে কিছু দিয়াও দেই। দৃষ্টান্ত চান? শুনুন তবে ঃ

(১) প্রথম গণপরিষদে আমাদের মেম্বর সংখ্যা ছিল ৪৪; আর আপনাদের ছিল ২৮। আমরা ইচ্ছা করিলে গণতান্ত্রিক শক্তিতে ভোটের জোরে রাজধানী ও দেশরক্ষার সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে আনিতে পারিতাম। তা করি নাই।

(২) পশ্চিম পাকিস্তানিদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া ভাইয়ের দরদ লইয়া আমাদের ৪৪টা আসনের মধ্যে ৬টাতে পূর্ব পাকিস্তানির ভোটে পশ্চিম পাকিস্তানি মেম্বর নির্বাচন করিয়াছিলাম।

(৩) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে শুধু বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে পারিতাম। তা না করিয়া বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষার দাবি করিয়াছিলাম।

(৪) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে পূর্ব পাকিস্তানের সুবিধাজনক শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিতাম।

(৫) আপনাদের মন হইতে মেজরিটি ভয় দূর করিয়া সে স্থলে ভ্রাতৃত্ব ও সমতাবোধ সৃষ্টির জন্য উভয় অঞ্চলে সকল বিষয়ে সমতা বিধানের আশ্বাসে আমরা সংখ্যা গুরুত্ব ত্যাগ করিয়া সংখ্যা সাম্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

চার, সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানি ভাই সাহেবান, আপনারা দেখিতেছেন, যেখানে যেখানে আমাদের দান করিবার আওকাৎ ছিল, আমরা দান করিয়াছি। আর কিছুই নাই দান করিবার। থাকিলে নিশ্চয় দিতাম। যদি পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইত তবে আপনাদের দাবি করিবার আগেই আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে সত্য সত্যই দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিতাম। দ্বিতীয় রাজধানীর নামে ধোকা দিতাম না। সে অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রকার ব্যয় যাতে উভয় অঞ্চলে সমান হয়, তার নিখুঁত ব্যবস্থা করিতাম। সকল ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানকে সামগ্রিকভাবে এবং প্রদেশসমূহকে পৃথক পৃথকভাবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতাম। আমরা দেখাইতাম পূর্ব পাকিস্তানিরা মেজরিটি বলিয়াই পাকিস্তান শুধু পূর্ব পাকিস্তানিদের নয়, ছোট-বড় নির্বিশেষে তা সকল পাকিস্তানির। পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইলে তার সুযোগ লইয়া আমরা পূর্ব পাকিস্তানিরা সব অধিকার ও চাকুরি গ্রাস করিতাম না। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনভার পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতেই দিতাম। আপনাদের কটন বোর্ডে আমরা চেয়ারম্যান হইতে যাইতাম না। আপনাদের প্রদেশের আমরা গভর্নর হইতেও চাহিতাম না। আপনাদের

পি, আই ডি সি, আপনাদের ওয়াপদা, আপনাদের ডি আই টি, আপনাদের পোর্ট ট্রাস্ট, আপনাদের রেলওয়ে ইত্যাদির চেয়ারম্যানি আমরা দখল করিতাম না। আপনাদেরই করিতে দিতাম। সমস্ত অল পাকিস্তানি প্রতিষ্ঠানকে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করিতাম না। ফলতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনীতিতে মোটা ও পশ্চিম পাকিস্তানকে সরু করিতাম না। দুই অঞ্চলের মধ্যে এই মারাত্মক ডিসপ্যারিটি সৃষ্টি হইতে দিতাম না।

এমনি উদারতা, এমন নিরপেক্ষতা, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে এমন ইন্‌সাফ-বোধই পাকিস্তানি দেশপ্রেমের বুনিয়াদ। এটা যার মধ্যে আছে কেবল তিনি দেশপ্রেমিক। যে নেতার মধ্যে এই প্রেম আছে, কেবল তিনি পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের ওপর নেতৃত্বের যোগ্য। যে নেতা বিশ্বাস করেন, দুইটি অঞ্চল আসলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দেহের দুই চোখ, দুই কান, দুই নাসিকা, দুই পাটি দাঁত, দুই হাত, পা; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিতে হইলে এই সব জোড়ার দুইটিকেই সমান সুস্থ ও শক্তিশালী করিতে হইবে; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানের এক অঙ্গ দুর্বল হইলে গোটা পাকিস্তানই দুর্বল হইয়া পড়ে; যে নেতা বিশ্বাস করেন ইচ্ছা করিয়া বা জানিয়া শুনিয়া যারা পাকিস্তানের এক অঙ্গকে দুর্বল করিতে চায় তারা পাকিস্তানের দুশমন; যে নেতা দৃঢ় ও সবল হস্তে সেই দুশমনদের শায়েস্তা করিতে প্রস্তুত আছেন, কেবল তিনিই পাকিস্তানের জাতীয় নেতা হইবার অধিকারী। কেবল তাঁরই নেতৃত্বে পাকিস্তানের ঐক্য অটুট ও শক্তি অপরাজেয় হইবে। পাকিস্তানের মত বিশাল ও অসাধারণ রাষ্ট্রের নায়ক হইতে হইলে নায়কের অন্তরও হইতে হইবে বিশাল ও অসাধারণ। আশা করি আমার পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইরা এই মাপকাঠিতে আমার ছয় দফা কর্মসূচির বিচার করিবেন। তা যদি তাঁরা করেন তবে দেখিতে পাইবেন, আমার এই ছয় দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি নয়, গোটা পাকিস্তানেরই বাঁচার দাবি।

আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা, আপনারা দেখিতেছেন যে, আমার ৬ দফা দাবিতে একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী বা পাকিস্তান ধ্বংসকারী প্রস্তাব করি নাই। বরঞ্চ আমি যুক্তি তর্ক সহকারে দেখাইলাম, আমার সুপারিশ গ্রহণ করিলে পাকিস্তান আরো অনেক বেশি শক্তিশালী হইবে। তথাপি কায়েমি স্বার্থের মুখপাত্ররা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এলজাম লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নয়, বিস্ময়ের কথাও নয়। পূর্ব পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমার বাপ-দাদার মত মুরুব্বিরাই এদের কাছে গাল খাইয়াছেন, এদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, আর আমি কোন ছার? দেশবাসীর মনে আছে, আমাদের নয়নমণি শেরে-বাংলা ফজলুল হক্‌কে এরা দেশদ্রোহী বলিয়াছিলেন। দেশবাসী এও দেখিয়াছেন যে, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহিদ সুহ্‌রাওয়ার্দিকেও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এদেরই হাতে। অতএব দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবির কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল-জুলুম ভুগিবার তক্‌দির আমার হইয়াছে। মুরুব্বিদের দোওয়ায়, সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সে সব সহ্য করিবার মত মনের বল আল্লাহ্ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানির ভালবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এ কাজে যে কোনও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই বা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার দাবির জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম জনাব শহিদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাঁর পায়ের তলে বসিয়াই এতকাল দেশবাসীর খেদমত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আজ যৌবনের কোঠা বহু পিছনে ফেলিয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছি। আমার দেশের প্রিয় ভাই-বোনেরা

আল্লাহ্‌র দরগায় শুধু এই দোওয়া করিবেন, বাকি জীবনটুকু আমি যেন তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি।

৪ঠা চৈত্র, ১৩৭২ আপনাদের স্নেহধন্য খাদেম
শেখ মুজিবুর রহমান

এরপরই শুরু হয়েছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা।

পূর্ব পাকিস্তানে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে ১৯৭০ খ্রিঃ। এই বছরেই হয় সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে (মোট আসন ৩০০) ১৬৭টি আসন পায় আওয়ামি লিগ। ফলে আওয়ামি লিগ সমগ্র পাকিস্তানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হয়। আওয়ামি লিগ পশ্চিম পাকিস্তানে একটি আসনও পায়নি। সেখানে জুলফিকার আলি ভুট্টোর পিপলস পার্টি একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করলেও, পূর্ব পাকিস্তানে তারা একটি আসনও পায়নি।

মন্ত্রিসভা গঠন, জাতীয় পরিষদের গঠন নিয়ে ইয়াহিয়া খান টালবাহানা করতে থাকেন। তিনি ঢাকার সামরিক প্রশাসক ইয়াকুব খানকে সরিয়ে লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে গভর্নর ও সামরিক প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন।

কেন্দ্রিয় শাসকবর্গের আচরণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ক্রমশ উত্তপ্ত করে তুলতে থাকে। চারদিকে ধূমায়িত অগ্নি। এদিকে, ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দি ময়দান) এক সুবিশাল জনসমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন।—(১৯৭১ খ্রিঃ ৭ মার্চ) “এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।”—অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতার লড়াই। আবার জননেতা মাওলানা ভাসানি পল্টন ময়দানে বিশাল জন সমাবেশে (১৯৭১ খ্রিঃ ৯ মার্চ) পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন, “অনেক হইয়াছে আর নয়। পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লও।”

শেখ মুজিবুরের সেই ঐতিহাসিক ভাষণের গুরুত্ব বাংলাদেশের আবির্ভাবের অন্যতম পদক্ষেপ ঃ

“...তেইশ বছরের ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। তেইশ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। উনিশ শ বাহান্ন সালে রক্ত দিয়েছি। উনিশ শ চুয়ান্ন সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। উনিশ শ আটান্ন সালে আয়ুব খাঁ মার্শাল ল জারি করে দশ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রাখে, উনিশ শ চৌষট্টি সালে আন্দোলনে আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তারপর আয়ুব খানের পতন হবার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশের শাসনতন্ত্র দেবেন গণতন্ত্র দেবেন। আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেছে।

আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাঁকে অনুরোধ করলাম, আপনি পনরই ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকুন। তিনি আমার কথা রাখলেন না। তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে, আমরা এ্যাসেমব্লিতে বসবো। এ্যাসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করবো। এমনকি এও পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা বেশি হলেও, একজনও যদি হয়, তার ন্যায্য কথা মেনে নেবো।

জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন। আলোচনা করলেন। বলে গেলেন আলোচনার দরজা বন্ধ নয়। আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্য দলের সঙ্গেও আলাপ করলাম।— আপনারা আসুন, বসুন—আমরা শাসনতন্ত্র রচনা করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের

মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এ্যাসেমব্লি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেয়া হবে। যদি কেউ অ্যাসেমব্লিতে আসে তবে, তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত তাকে জোর করে বন্দি করা হবে।

আমি বললাম, এ্যাসেমব্লি চলবে। তারপর হঠাৎ এক তারিখে এ্যাসেমব্লি বন্ধ করে দেওয়া হল। তারপর আমরা ঢাকায় আলোচনায় বসেছিলাম। তাও বন্ধ হল।

আমি বললাম, আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করেন। আপনারা কল-কারখানা সব বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্যে কৃতসম্পন্ন হলো। কী পেলাম আমরা। ... পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে। আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের মধ্যে। তার বুকের পরে হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু। আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এরপর আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি দেখে যান, কাঙাল গরিবের ওপর, আমার বাংলার মানুষের ওপর কেমন করে গুলি করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।

ভায়েরা আমার, ২৫ তারিখে এ্যাসেমব্লি কল করা হয়েছে—রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমিও বলে দিয়েছি, শহিদের রক্তের ওপর পাড়া দিয়ে আর কিছুতেই মুজিবুর অ্যাসেমব্লিতে যোগ দিতে পারে না।

অ্যাসেমব্লি কল করেছে। আমার দাবি মানতে হবে প্রথম। সামরিক আইন, মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে। যেভাবে হত্যা করেছে, তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখব, আমরা এ্যাসেমব্লিতে বসতে পারব কি পারব না। এরপূর্বে আমরা অ্যাসেমব্লিতে বসতে পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। রাস্তাঘাট যা যা আছে, সমস্ত কিছু—আমি যদি হুকুম দিবার না পারি—তোমরা বন্ধ করে দেবে। ... আমরা ভাতে মারবো —আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই—তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের পর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাড়ে সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না। মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে নিজেদের মধ্যে। আত্ম-কলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে এই বাংলায়। সাড়ে সাত কোটি মানুষকে—হিন্দু-মুসলমান বাঙালি অবাঙালি যারা আছে, তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের ওপর। আমাদের যেন বদনাম না হয়। আমার দেশবাসী প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামি লিগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো।

পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সা চালান হতে পারবে না। টেলিফোন টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে ... কিন্তু যদি এদেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়— বাঙালি বুঝে-সুঝে কাজ করবে। আমাদের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম।

জয় বাংলা।"

এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানি নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন ইয়াহিয়া খান (১৯৭১ খ্রিঃ ১৫ মার্চ)। তার আগেই পাকিস্তান সেনা বিভাগের প্রধানরা বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে গোপন আলোচনায় মিলিত হতে থাকেন। বাঙালি সেনা অফিসারদের অন্যত্র বা পশ্চিম পাকিস্তানে সরিয়ে দেওয়া হয়। বেঙ্গল রেজিমেন্টের সমস্ত সৈন্যকে সীমান্তে পাঠিয়ে দেওয়া হল। চট্টগ্রাম পরিণত হয় সামরিক গুদামে।

তারপর গোটা ঢাকা শহর জুড়ে শুরু হয় এক নজিরবিহীন নরমেধ যজ্ঞ। তার আগেই (২৫ মার্চ) ইয়াহিয়া খান, জুলফিকার আলি ভুট্টোকে নিয়ে ঢাকা ত্যাগ করেছেন। শেখ মুজিবুর রহমানকেও গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। টিক্কা খানের নির্দেশে ঢাকাকে পরিণত করা হয়েছিল মৃত্যুপুরীতে। কেবল ঢাকা নয়, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজশাহী, যশোহর, সেনা তাণ্ডব সর্বত্র ছিল অব্যাহত। সামরিক-অসামরিক জনতা, ছাত্র-যুব সমাজ সেদিন সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। গঠিত হয় মুক্তিবাহিনী। নৃশংস অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ আশ্রয় নেয় ভারতে। এদিকে, স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল। রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবর রহমান। সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি। তাজউদ্দিন আহমদ — প্রধানমন্ত্রী। ৬ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রিসভা ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলায় এক আমবাগানে শপথ গ্রহণ করে।

ইয়াহিয়া বাহিনীর হত্যাভিযান ছিল অব্যাহত। ৩ ডিসেম্বর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় ভারতীয় বাহিনীর সহযোগিতায় মুক্তি বাহিনীর বিজয় অভিযান দুর্বার গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। ৬ ডিসেম্বর ভারত সরকার স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি জানায়।

ঢাকার পতন যখন আসন্ন চারিদিক থেকে ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী এগিয়ে আসছে। নগরী প্রায় অবরুদ্ধ, আকাশপথ সম্পূর্ণ ভারতীয় বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে, সেইসময়ে টিক্কা খানের ঘাতক বাহিনী শতাব্দীর সব থেকে কলঙ্কজনক হত্যাভিযান সমাধা করল। সুপরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয় ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর রাতে।

কিন্তু ইয়াহিয়া খান, টিক্কা খান শেষ রক্ষা করতে পারল না। ১৬ ডিসেম্বর ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার এ. এ. কে. নিয়াজি আত্মসমর্পণ করেন। যৌথ কমান্ডের পক্ষে আত্মসমর্পণপত্র গ্রহণ করেন লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা।

জন্ম হল স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। যার রাজধানী বাঙালির প্রিয় শহর ঢাকা।

১. ঢাকা প্রকাশ, ৩ জানুয়ারি ১৯০৪
২. ঢাকা প্রকাশ, ১০ জানুয়ারি, ১৯০৪
৩. ঢাকা প্রকাশ, ২৪ জানুয়ারি ১৯০৪
৪. ঢাকা প্রকাশ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪
৫. ঢাকা প্রকাশ, ২৭ মার্চ ১৯০৪
৬. ঢাকা প্রকাশ, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৫
৭. ঢাকা প্রকাশ, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৫
৮. ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯৩, পৃঃ ৯০
৯. অনুশীলন সমিতির ইতিহাস—জীবনতারা হালদার। পৃঃ ৪৩-৪৪



৩. ঢাকায় ব্রাহ্ম আন্দোলন

[বর্তমান সংস্করণ পৃঃ ৫৮৪ দেখুন]

হিন্দুধর্মের সংস্কার এবং ব্রাহ্ম আন্দোলনের ঝড় থেকে পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলা বাদ যায়নি। তার মধ্যে অন্যতম হল ঢাকা শহর। শহরের শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়, উকিল, শিক্ষক, চিকিৎসক, শিক্ষিত পরিবারের মধ্যে এই ধর্মীয় সামাজিক সংস্কার আন্দোলন সব থেকে ব্যাপক রূপ নিয়েছিল। উনিশ শতকের সূচনায় (১৮১৫ খ্রিঃ) রামমোহন রায়ের আত্মীয়সভা প্রতিষ্ঠা থেকে বিশ শতকের প্রথমপর্ব পর্যন্ত ব্রাহ্ম আন্দোলনের নানান ধারা সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখে যায়। রামমোহনের তিরোধানের পর ব্রাহ্ম আন্দোলনের ধারাকে অব্যাহত রাখেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তত্ত্ববোধনী সভা। যার মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধনী পত্রিকা। ক্রমশ বাংলার নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। খ্রিস্ট ধর্মের প্রচার বোধ এবং শিক্ষিত বাঙালি ছেলেদের স্বদেশ সচেতন করে তোলা সম্ভব হয়েছিল ব্রাহ্মধর্মের মাধ্যমে। কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম আন্দোলনে যোগদেন ১৮৫৭ খ্রিঃ। ১৮৬২ খ্রিঃ তিনি ব্রাহ্মধর্মের আচার্যপদে অভিষিক্ত হলেও অচিরে তাঁর সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের মত পার্থক্য দেখা দেয়। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন হিন্দুধর্মের দৃষ্টিকোণ অনুসারী। আর কেশবচন্দ্র খ্রিস্টধর্মের দৃষ্টি কোন থেকে অগ্রসর হয়েছিলেন। ব্রাহ্ম আন্দোলন দুভাগ হয়ে গেল। কেশব সেনের ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ এবং দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজ। ১৮৭৮ খ্রিঃ শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ গঠন করেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মসমাজ তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়ে গেল। কিন্তু সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনটি শাখাই সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছে।

কলকাতার বাইরে সর্বপ্রথম ব্রাহ্মসমাজের শাখা স্থাপিত হয় ঢাকায় ১৮৪৬ খ্রিঃ। ঢাকায় ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রধান পুরুষ ব্রজসুন্দর মিত্র অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাঠ করে। ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পরে কলকাতা সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে ওঠে। ১৮৭০ খ্রিঃ মধ্যে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন বড় বড় শহরে ব্রাহ্মসমাজের শাখা স্থাপিত হয়। কলকাতা থেকে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কালীনারায়ণ গুপ্ত, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ এবং ঢাকার ব্রাহ্ম আন্দোলনের কর্তা ব্যক্তিরা পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন শহরে যেতেন সমাজের কাজে। পৌত্তলিকতা দূরীকরণ বিষয়ে প্রচার, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সামাজিক শিক্ষা, নারীজাগরণ, নানা বিষয়ে তাদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ববঙ্গে ঢাকা, বরিশাল এবং মৈমনসিংহেই ছিল ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব সব থেকে বেশি। ব্রাহ্ম নেতাদের আকর্ষণে তাদের পাশে সমবেত মানুষের সংখ্যা কম ছিল না। কিন্তু সভ্য সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত। শাখা সংখ্যাও তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় স্থাপিত শাখার সংখ্যা ছিল মাত্র ২০ (১৮৭৭ খ্রিঃ) এবং ৪২ (১৮৯২ খ্রিঃ)। উনিশ শতকের শেষে সমাজের প্রভাব একেবারেই হ্রাস পেয়ে যায়।

ঢাকায় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার আদিপুরুষ ব্রজসুন্দর মিত্র ছিলেন আবগারি বিভাগের সহকারি সুপারিনটেনডেন্ট। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৬। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর শাঁখারিবাজারে ব্রজসুন্দরের বাড়িতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে

উপস্থিত ছিলেন যাদবচন্দ্র বসু, রামকুমার বসু, গোবিন্দ্রচন্দ্র বসু, বিশ্বম্ভর দাস এবং নরোত্তম মল্লিক। এই দিনটিই হল ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা দিবস। সমাজের প্রথম প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৩ ডিসেম্বর ব্রজসুন্দরের বাড়িতে। তাঁর আমন্ত্রণে প্রার্থনাসভায় বহু ব্যক্তি সেদিন উপস্থিত হয়েছিলেন। সাধারণে জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত এইসভা কিন্তু প্রথম থেকেই রক্ষণশীল হিন্দুদের আক্রমণের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে ওঠে। সেকারণে গোপনে প্রথম তিন মাস উপাসনা হয় যাদবচন্দ্র বসুর বাড়িতে। এই বাড়িতেই ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ ব্রজসুন্দর মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র বসু, রামকুমার বসু, বিশ্বম্ভর দাস এবং ডালবাজারের রাইমোহন রায় ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হন। প্রকাশ্য ভাবে ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের কাজ শুরু হয় ১৮৪৭ খ্রিঃ মার্চ ১৩। বাংলাবাজারের শ্রীশচন্দ্র দাসের বাড়িতে অনুষ্ঠিত সভায় সমাজের নিয়মাবলী ও চাঁদা স্থির হয়। সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য একজন গায়ক নিযুক্ত হন। প্রথম উপাচার্য পণ্ডিত রামকুমার বেদপঞ্চানন এবং সম্পাদক ব্রজসুন্দর মিত্র। ব্রজসুন্দর ঢাকা থেকে কুমিল্লায় (১৮৫০-৫১ খ্রিঃ) বদলি হওয়ায় সমাজের কাজে একটা শৈথিল্য দেখা দেয়। কিন্তু ১৮৫৫ খ্রিঃ ব্রজসুন্দর ঢাকায় ফিরে আসার পর মিটফোর্ড হাসপাতালের কাছে, তাঁর বাড়িতে সমাজের কাজ পুর্ণোদ্যমে শুরু হয়ে যায়। একটা নতুন গতিবেগও পায়। গুরুপ্রসাদ সেন, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, দীনবন্ধু মৌলিক, দীননাথ সেন এসে যোগ দেন সমাজে। ব্রজসুন্দর আরমানিটোলায় নিজের বসবাসের জন্য একটি বাড়ি কেনেন ১৮৫৭ খ্রিঃ এবং ঐ বাড়ির একাংশে ব্রাহ্ম সমাজের কাজ শুরু হয়। এই সময় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঢাকায় ব্রাহ্ম সমাজের কার্যাবলী পরিদর্শনে আসেন এবং দয়াল শিরোমণিকে উপাচার্য নিযুক্ত করেন যান। ছাত্রদের জন্য শাখা ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হয় ১৮৬১ খ্রিঃ ১৬ জুন। প্রধান উদ্যোগী ছিলেন দীননাথ সেন, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এবং গোবিন্দপ্রসাদ রায়। ব্রাহ্ম ছাত্রদের শিক্ষার জন্য এরা উদ্যোগী হন এবং ১৮৬৩ খ্রিঃ-এ একটি বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয় ব্রজসুন্দরের বাড়ির একতলায়। তাছাড়া ব্রজসুন্দর মাসে ৩০ টাকা সাহায্য দিতেন। এই বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য কলকাতা থেকে এসে যোগদেন সাধু অঘোরনাথ। তাছাড়া এই সময় ঢাকায় এসেছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। বিজয়কৃষ্ণ ঢাকার ব্রাহ্ম ও উৎসাহী হিন্দুদের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। অনেকেই সনাতন হিন্দু ধর্মের বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসে। সংস্কারমুক্ত নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ১৮৬৫ এবং ১৮৬৯ খ্রিঃ কেশবচন্দ্রের পূর্ববঙ্গ সফর ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতার অনুকরণে ঢাকায় কেশবচন্দ্র সঙ্গতসভা স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে ঢাকার ব্রাহ্ম আন্দোলনে অন্যতম পুরোধা। বঙ্গচন্দ্র রায়, ভুবনমোহন সেন, কালীনারায়ণ গুপ্ত, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়-এরা সকলেই ছিলেন সঙ্গত সভার সভ্য। প্রতি শনিবার অধিবেশন হত। এর আগে ঢাকায় ব্রাহ্ম যুবকদের 'ভ্রাতৃসমাজ' স্থাপিত হয় ব্রাহ্ম যুবকদের মধ্যে জাতিভেদ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে। এই ভ্রাতৃসমাজ স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন বরিশাল থেকে আগত দুই ব্রাহ্মকর্মী দুর্গামোহন দাস ও কালীমোহন দাস। বরিশালের আর একজন ব্রাহ্মকর্মী কালীপ্রসন্ন ঘোষ ঢাকায় ব্রাহ্ম আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। তিনি ছিলেন সুবক্তা।

বেশ বোঝা যাচ্ছে, পূর্ববাংলার ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল ঢাকা। সে সময়ে উপাসনালয় ছিল ঢাকার লালবাগ, বাংলাবাজার এবং আরমানিটোলায়। কিন্তু সমাজের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় উপাসনা কেন্দ্রে স্থানাভাব দেখা দেয়। একটি স্বতন্ত্র বৃহৎ মন্দিরের প্রয়োজন পড়ে। সর্বসাধারণের চাদায় একটি সুন্দর ব্রাহ্ম মন্দির নির্মিত হয় জগন্নাথ কলেজের পাশে। এবং উদ্বোধন হয় ১৮৬৯ খ্রিঃ ৫ ডিসেম্বর। যাঁরা চাঁদা দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন : ব্রজসুন্দর মিত্র ৬০০ টাঃ, অভয়কুমার দত্ত ৬০০ টাঃ, রামশংকর সেন ৪০০ টাঃ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫০০ টাঃ, ভগবানচন্দ্র বসু ৪০০ টাঃ। মন্দির উদ্বোধনের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। এই সময়ে ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজ পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ নামে

পরিচিত ছিল। ১৮৭৯ খ্রিঃ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের কাজের গতি ছিল অব্যাহত এবং বিস্তৃত। এই সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের কর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ভুবনমোহন সেন এবং বঙ্গচন্দ্র রায়।

ব্রাহ্ম সমাজ ভেঙে তিন টুকরো হয়ে গেলেও ঢাকার ব্রাহ্মরা নিজেদের কাজ করে যান আন্তরিকতার সঙ্গে। যদিও কলকাতার বিরোধের প্রভাব থেকে ঢাকাও মুক্ত ছিল না। ১৮৭৮ খ্রিঃ কোচবিহার রাজপরিবারে কেশবচন্দ্র সেনের মেয়ের বিয়ে নিয়ে যে বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়, তার প্রতিক্রিয়ায় ঢাকা সমাজের উপাচার্য বঙ্গচন্দ্র রায়কে সদলে পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। নববিধান ব্রাহ্মসমাজ পরে আরমানিটোলায় নিজেদের স্বতন্ত্র উপাসনালয় নির্মাণ করে।

ঢাকা ব্রাহ্ম আন্দোলনের গতিধারা ১৮৮০ খ্রিঃ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তারপর থেকে এর কর্মধারা অনেক স্তিমিত হয়ে আসে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ ও পূর্ববঙ্গব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা, কর্মোদ্যোগ, এবং আভ্যন্তরীণ মনোমালিণ্যের ছবিটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দ্রুত ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। যে কারণে উপাসনাস্থানে স্থান সংকুলান কষ্টকর হয়ে ওঠে। অনেকেই উপাসনায় যোগদান করতে পারত না। চরম বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ঈশ্বর ইচ্ছায় ক্রমেই ব্রাহ্মসমাজে লোকের সংখ্যা বাড়িতেছে। প্রথম কয়েকমাস গৃহাভ্যন্তরে কষ্টসৃষ্টে লোকের সমাবেশ হইত, কিন্তু এখন গৃহমধ্যস্থিত বেঞ্চ ও চৌকিতে ও বারেণ্ডার উপবেশনযোগ্য স্থানে স্থান না পাইয়া অনেককে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইতেছে। সমাজ আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত অনাবৃত শিশির রাতে দণ্ডায়মান থাকা সামান্য ক্লেশকর নয়। বিশেষতঃ ততদূর ক্লেশ স্বীকার করিয়াও অনেকে উপাসনা শ্রবণ করিতে পারে না। উপাচার্যের বেদি হইতে তাঁহাদিগকে অনেক দূরে অবস্থান করিতে হয়। উপাসনা করিতে যাইতে নৈরাশ সঙ্কুলিতচিত্তে ফিরিয়া আসা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়। যাঁহাদিগকে দূর হইতে ক্লেশ স্বীকার করিয়া সমাজে উপস্থিত হইতে হয়, তাঁহাদিগকেই দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রায়শ এইরূপ বিফলচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হয়। নিয়ত এই সামাজিক উপাসনার ব্যাঘাত জন্মিতে থাকিলে, ইহার পরিণাম নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিবে। সমাজগৃহে শান্তি ভাব নিয়ত বিদ্যমান রাখা কর্তব্য। উপবেশনের অসুবিধা বাহ্যিক গণ্ডগোল ও আর আর বিশৃঙ্খল ভাব যতদূর অপনীত হইতে পারে সাধ্যানুসারে তাহার উপায়বিধান করা বিধেয়। নতুবা উপাসনার শান্তি লাভ করার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে যেরূপ উপস্থিতের সংখ্যা হইতেছে স্থানের সঙ্কীর্ণতা নিবন্ধন উপরোক্ত কয়েকটি অসুবিধা ততই ভোগ করিতে হইতেছে। আমরা ভয় করিতেছি পাছে বা ঈশ্বরের প্রেমাকাংখী তরুণ-বয়স্ক ব্যক্তিদিগের এরূপ সংস্কার জন্মে যে, সমাজগৃহে উপাসনা হয় না, ইশ্বরে মনস্থির করা যায় না, ব্রাহ্মসমাজ শান্তিনিকেতন নয়।

আমরা সমাজের অধ্যক্ষগণকে অনুরোধ করি তাহারা যেন সমাজের এই অসুবিধার প্রতি অবহেলা না করেন, কালবিলম্ব না করিয়া ইহার প্রতিবিধান করা উচিত। এই সময়ে তাঁহাদের স্বতন্ত্র সমাজগৃহ নির্মাণের পুনরুদ্যোগ করা বিধেয়।...[১]

ব্রাহ্মসমাজের কার্য নির্বাহক সভ্যদের এক অধিবেশনে সভার কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়েছিল ঃ

(১) সম্পাদকেরা তিন তিন মাস অন্তে এক একবার সভা আহবান করিবেন। এবং ত্রৈমাসিক সভায় সম্পাদকগণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করিয়া, এক একটি রিপোর্ট পাঠ করিবেন। বিগত ৩ মাসের আয় ব্যয়ের হিসাব, সভার কার্য সম্বন্ধে কোন পরিবর্তন হইয়াছে কিনা, সভার সাধারণ অবস্থা, সভার উন্নতি ও ধর্মপ্রচার বিষয়ে নতুন প্রস্তাব। এই রিপোর্ট

অবগত হইয়া সভার অধিকাংশ সভ্যেরা ভাবী আয় ব্যয়, সভার নিয়মিত কার্য এবং সভার উন্নতি সাধন ও ধর্মপ্রচার বিষয়ে যাহা যাহা অবধারণ করিবেন, ভবিষ্যতে পুনর্বার ত্রৈমাসিক সভা হওয়া পর্যন্ত সম্পাদকেরা তদনুরূপ কার্য করিবেন।

(২) কার্য নির্বাহক সভ্যের সংখ্যা যখন যাহা থাকিবে তাহার তৃতীয়াংশ উপস্থিত থাকিলেই সভার অধিবেশন হইতে পারিবেক। তৎপর উপাসনা সভার নিয়মিত কার্যবিষয়ে নিচের লিখিত ২টি প্রস্তাব অবধারিত হয়।

(১) যাহার প্রতি উপাচার্যের ভার থাকিবেক, তিনি আপন ইচ্ছামতে যেরূপ উত্তম বিবেচনা করেন, সেইরূপে উপাসনা সভার কার্য নির্বাহ করিবেন। ইচ্ছা হইলে তিনি ঐ কার্যে অন্যের সহায়তা লইতে পারিবেন। আর কেহ সমাজে কোন প্রবন্ধ পাঠ অথবা বক্তৃতা করিতে চাহিলে তাঁহাকে অনুমতি দেওয়ার ভার উপাচার্যের প্রতি থাকিবে। যে দিবস উপাচার্য উপস্থিত হইতে অসমর্থ হইবেন, সেই দিবস তিনি অথবা সম্পাদক অন্যের উপর কার্য নির্বাহের ভার অর্পণ করিবেন।

(২) উপাসনা সমাজে গান করিবার নিমিত্ত সম্পাদক পূর্বেই কয়েক ব্যক্তিকে অনুরোধ করিবেন, তাহাদিগের মধ্যে একজন উচ্চৈঃস্বরে আর অন্য সকলে তাহার সঙ্গে মৃদুস্বরে গান করিবেন। অনুরুদ্ধ না হইলে কেহ উপাসনা সভায় গান করিতে পারিবেন না। তৎপর নিম্নলিখিত বিষয়ের আলোচনা হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। ৫ই অগ্রহায়ণের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে সভার উপাচার্যের ভার দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি এখানে না থাকাতে সেই কার্য এতদিন শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ সেন মহাশয় সম্পাদন করিয়াছেন। এইক্ষণে তাঁহাকে নিয়মিতরূপে উপাচার্যের পদে নিযুক্ত করা গেল।

এই সকল নিয়ম ও প্রস্তাব অবধারিত হওয়ার পর সভ্যদিগের বসিবার সুবিধার নিমিত্ত সমাজগৃহের সংলগ্ন বারাণ্ডার উপর চাল দেওয়া অথবা অন্য উপায় অবলম্বন করা এবং উপাসনা সভাতে অনেকে বিশৃঙ্খলভাবে উপাচার্যের সহিত যে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া থাকেন এবং অন্য প্রকারে কার্য ব্যাঘাত জন্মান, তাহা নিবারণ করিবার কোন সদুপায় অবলম্বন করা ইত্যাদি বিষয়ের অনেক আন্দোলন হইল, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন প্রস্তাব অবধারিত হইল না।

শ্রী দীননাথ সেন
সম্পাদক [২]

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক কার্যের বিবরণ সম্পর্কে জানা যায় ঃ "কেবল একমাত্র বাক্য মনের অগোচর পরব্রহ্মের উপাসনা এই অন্ধকারাবৃত দেশে প্রচার নিমিত্তে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন বিষয় উল্লেখ করিতে হইলেই শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বসু, রামকুমার বসু, বিশ্বম্ভর দাস, গোবিন্দচন্দ্র বসু প্রভৃতি মহাশয়গণকে অতি আহ্লাদিতান্তঃকরণে স্মরণ করিতে হয়। এই সমাজ স্থাপনোদ্দেশে ১৭৬৮ শকের ২২ অগ্রহায়ণ রবিবাসরে আমার বাটীতে যে এক বিশেষ বৈঠক হয় তাহাতে পূর্বোক্ত মহাশয়গণ অতিশয় উৎসাহপূর্বক উপস্থিত হইয়া প্রকাশ্য রূপে সভা স্থাপন বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হয়েন। এইমাসের এই উনত্রিংশদ্দিবসে আমার বাটীতেই উক্ত শকে উপাসনা সভা আরম্ভ হয় এবং তাহাতে অনেক শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি প্রফুল্লচিত্তে উপস্থিত হইয়া সভার কার্য সম্পন্ন করেন। ঐ দিবস এরূপ সমারোহপূর্বক সভা হইয়াছিল যে নগরস্থ অনেক ব্যক্তি যাঁহারা সমাজ দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারা কেহ সমাজগৃহে আসনাভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন, এবং কেহবা দণ্ডায়মান হইবার স্থান না পাইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন।

এই সমাজ স্থাপনের মূল অভিপ্রায় এই যে এদেশস্থ প্রায় সকল লোকেই অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অবিশ্রান্তরূপে নানা কুকর্মে রত আছেন, তাঁহারা জ্ঞান আলোচনা ও শমদমাদি সাধন দ্বারা

সদাচারী ও ধর্মনিষ্ঠ হয়েন এবং অপরাপর শ্রেণীর লোকেরা যে স্থানে বিধর্মের জাল বিস্তার করেন তাহাতে কেহ জড়িত না হইয়া স্বধর্মাক্রান্ত থাকেন, কিন্তু ব্যক্ত করিতে প্রচুর ক্ষোভ হয় যে এই নগরস্থ ধনী ও মানীরূপে খ্যাত লোকেরা জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত এই পরম তাৎপর্যের কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিতে না পারিয়া সমাজের উন্নতি পক্ষে যত্ন করা দূরে থাকুক, যে কতিপয় ব্যক্তি সভা ও সন্দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারাও তাঁহারদিগের প্রচারিত মিথ্যা অপবাদে বিশ্বাস করিয়া সভার অনিষ্টসাধনে কায়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সভ্যগণ প্রচলিত পৌত্তলিক মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের দ্বারা অত্যাচারিত হইয়াছিলেন, স্বীয় স্বীয় পিতামাতা ভ্রাতার দ্বারা তাড়িত হইয়াছিলেন এবং এই নগরস্থ স্ব স্ব জাতীয় সমাজে প্রায় অব্যবহার্য হইয়াছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী সভাধ্যক্ষ মহাশয়গণকে ধন্যবাদ করিতে হয় যে এই সভায় এরূপ অবস্থা সময়ে ইহার উন্নতি পক্ষে তাঁহারা সভার উপকারী নানা পুস্তক ও পত্রিকাদি সময়ে সময়ে প্রেরণ করিয়াছেন এবং অদ্যাপি প্রদান করিতেছেন, এবং শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বিশেষ ধন্যবাদ যে তিনি এতন্নগরে আগমন করিয়া এখানকার ঘোরান্ধকারাবৃত লোককে নানা প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা ও সমাজ স্থাপন হওয়ার সদভিপ্রায় অবগত করাইবাতে এসভায় তাহারদিগের দৌরাত্ম্যাচরণের কিছু খর্বতা হয়।

সভ্যগণ নানা যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও ক্লিষ্ট না হইয়া স্বীয় স্বীয় কার্যসাধনে দৃঢ়রূপে তৎপর ছিলেন। ধর্মবিপক্ষগণের ভয়ে তাঁহারা প্রকাশ্যরূপে কিয়দ্দিবস সভা আহবান করণে অশক্ত হইয়া প্রতি শনিবাসরে শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বসুর গৃহে গোপনে ব্রাহ্মসমাজ করণে প্রবৃত্ত ছিলেন, এবং সন্ধ্যাকালাবধি রাত্রি নয় ঘণ্টা পর্যন্ত পরমব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। এইকালে সভার পরম হিতৈষী শ্রীযুক্ত উদয়চন্দ্র আঢ্য মহাশয় সভাভুক্ত হইয়া সভ্যগণকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। এবং কর্মতঃ ব্রাহ্মগণের সদাচরণ লোকের চাক্ষুষ হওয়াতে তৎবিপক্ষ লোকের ক্রোধ ক্রমে খর্বতা হওয়া প্রযুক্ত সভ্যগণেরও পুনর্বার উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ৩০শ ফাল্গুনের পর প্রকাশ্যরূপে সভা আহ্বান করণে তাঁহারা সক্ষম হইলেন এবং প্রথম ঐরূপ করিলে যে বিপদ ঘটনার সম্ভাবনা ছিল, তাহা হয় নাই। এইরূপ অবস্থায় এই দুর্ভাগ্যগ্রস্ত ধর্মজ্ঞানবিহীন দেশের প্রতি মহা মহিমান্বিত জাগদ্বিভুর মহান অনুগ্রহের চিহ্ন অতি স্থূল জ্ঞানিরও অবধারণীয় বটে।

১৭৬৮ শকের চৈত্র মাস উপস্থিত হইলে সভার আরও উন্নতির লক্ষণ দৃষ্ট হইল। ব্রাহ্ম ও সভ্যগণ পূর্বোক্ত মতে নির্ভয় হইয়া ১চৈত্রাবধি প্রকাশ্যরূপে সভা আরম্ভ করিলেন, সমাজের কার্য সুনির্বাহ জন্য নূতন নিয়ম সকল স্থাপন হইল এবং সভায় ব্যয় নির্বাহার্থ প্রায় সমুদয় সভ্যগণই মাসিক দানকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সভাতে ব্রহ্মসঙ্গীত হইবার জন্য গায়ক নিযুক্ত হইল, কিন্তু উপাসনার দিন শনিবার সন্ধ্যা কালাবধি রাত্রি নয় ঘণ্টা পর্যন্ত স্থিরতর থাকিল। এই সময়ে সমাজের এরূপ উত্তমাবস্থায় একজন আচার্যের অত্যন্ত প্রয়োজন হওয়াতে অথচ তাদৃশ উত্তম গুণজ্ঞ সদাচারী ও ব্রহ্মপরায়ণ শাস্ত্রবেত্তা এতদ্দেশে প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট প্রযুক্ত সভ্যগণ ক্ষুব্ধ ছিলেন, এমত কালে তাহারা রামকুমার বেদপঞ্চানন নামক বেদবেত্তা পণ্ডিতকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে উপাচার্যের পদাভিষিক্ত করেন এবং তিনি ১ চৈত্রে নিযুক্ত হইয়া ২১ চৈত্রাবধি স্বীয় কর্মারম্ভ করিলেন। বেদপঞ্চানন যদ্যপি ভারগ্রস্ত কর্মনির্বাহের উপযুক্ত পণ্ডিত ছিলেন ও তাদ্বারা বেদ উপনিষৎ ইত্যাদি নানা গ্রন্থপাঠ ও তত্তদ্ব্যাখ্যা হইতেছিল তত্রাপি উপাচার্য বাহ্যে যেমত মত সভ্যগণকে দর্শাইতেন তদ্রূপ তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস ছিল না, তাঁহার কতিপয় কর্ম দ্বারা ইহা দৃঢ়রূপ বোধ হওয়াতে ও ক্রমে সভার কার্যে তাঁহার তাচ্ছিল্য দৃষ্টে সভ্যগণ কিয়ৎকাল অতি দুঃখিতান্তঃকরণে কাল যাপন করিয়া পরিশেষে বেদপঞ্চাননকে ভাদ্রমাসের প্রথম দিবসাবধি সভার কার্য হইতে রহিতকরণে বাধ্য হইলেন। পশ্চাৎ তৎপরিবর্তে

একজন ব্রহ্মপরায়ণ এবং কায়মনোবাক্যে যত্নযুক্ত উপাচার্য প্রেরণের নিমিত্তে তত্ত্ববোধিনী সভাধ্যক্ষগণকে অনুরোধ করাতে বর্তমান উপাচার্য স্ত্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল গোস্বামী তাঁহারদিগের দ্বারা তৎপদাভিষিক্ত হইয়াছেন, তাঁহার দ্বারা ১ কার্তিক অবধি সভার কার্য উত্তমরূপে নির্বাহ হইবার চিহ্ন বোধ হইয়াছে।

১৭৬৮ শকের পৌষমাসাবধি ৩০ ফাল্গুন পর্যন্ত সভার ব্যয় নির্বাহ জন্য সভ্যগণ যে মাসিক দাতব্য প্রদান করেন তাহাতে ১০ টাকা ৬ আনা আয় হয় এবং তন্মধ্যে ৫ টাকা ৭ আনা ৩ পয়সা ব্যয় হইয়া ৪ টাকা ৬ আনা গচ্ছিত থাকে। এইকাল মধ্যে সভাতে উপাচার্যের পদ শূন্য ছিল এবং গায়কগণও নিযুক্ত হয় নাই। সভ্যগণ দ্বারাই সমুদয় কর্ম নির্বাহ হইত। ১৭৬৮ শকের ১ চৈত্রাবধি ১৭৬৯ শকের ৩০ কার্তিক পর্যন্ত সভ্যগণের মাসিক ও এককালীন দাতব্যে ১৯৭ টাকা ১২ আনা আয় হয় তন্মধ্যে উপাচার্যের ও গায়কদিগের বেতনে ও বাটী ভাড়া ইত্যাদিতে ১৬৯ টাকা ৯ আনা ২ পয়সা ব্যয় হইয়া ৩৩ টাকা ৩ পয়সা গচ্ছিত আছে।

কৃতজ্ঞতাপূর্বক বক্তব্য যে শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই সমাজে বিংশতি মুদ্রা দান করাতে সভার উপযোগী কতিপয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর দাস মহাশয় সভার উপকারী কতিপয় দ্রব্যাদি দান করিয়াছেন, এস্থলে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

এইক্ষণে এই নগরে ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা দৃষ্টে বিশেষত অদ্য এই সমাজ সন্দর্শনে চিত্ত কি আনন্দে পুলকিত হইতেছে। পূর্বে এই নগরে ব্রহ্ম বিদ্যার উল্লেখমাত্র ছিল না, এইক্ষণে স্থানে স্থানে এই বিষয়ের বিশেষ আন্দোলন হইতেছে, পূর্বে এই নগরে একজন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর ছিল এবং ব্রহ্মজ্ঞানের নাম শ্রবণে সকলে কর্মে হস্ত প্রদান করিতেন, এইক্ষণে জগদীশ্বরের কৃপাবশতঃ অনেক শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি পরব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই সমাজ প্রতিষ্ঠা সময়ে অনেকব্যক্তি সমাজস্থ সভ্যগণের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কালবশে তাঁহারদিগের মধ্যেই কেহ কেহ অবিরোধী হইয়া কালযাপন করিতেছেন। কেহ সভ্যগণকে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন এবং কেহবা স্বয়ং সমাজস্থ হইতে উন্মুখ হইয়াছেন; ইহা হইতে আর অধিক আনন্দের বিষয় কি আছে? হে পরমাত্মণ! এই ব্রাহ্মসমাজ চিরস্থায়ী কর এবং আগামী সাম্বৎসরিক সমাজগৃহ ব্রহ্মদ্বারা পরিপূর্ণ কর।

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ। শ্রীব্রজসুন্দর মিত্র
১৭৬৯ শক। সম্পাদক [৩]
২৯ অগ্রহায়ণ

১৮৭৩ সালের মাঘোৎসব প্রসঙ্গে একটি জানা যায় ঃ "..... ১০ মাঘ অপরাহ্ন ৬ষ্ঠ ঘটিকার পর উপাসক ব্রাহ্মমণ্ডলী নগরে নগরে ব্রাহ্ম নাম—দয়াময়উদ্‌ঘোষিত করিবার জন্য আগামী পবিত্র দিবসে দয়াময়ের উৎসবানন্দ ভোগে নগরবাদীদিগকে প্রস্তুত হইতে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য বন্ধুবান্ধবসহ সমবেত হইয়া বাংলাবাজার, একরামপুর নবাবপুর, তাঁতিবাজার ও পাটুয়াটুলীর মধ্য দিয়া মৃদঙ্গ করতাল সহকারে নাম সংকীর্তন করিতে করিতে পূর্ববাংলা ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশপূর্বক সংযত হৃদয়ে সেই পরমপিতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সেদিনের রজনী অবস্যানের সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র ১১ই মাঘের উদয় সংবাদ বিজ্ঞাপন করিবার জন্যই যেন নহবৎখানা হইতে টম্‌টম রব উত্থিত হইতে লাগিল, ব্রাহ্মগণ সেই শ্রুতি সুখকর রবে জাগরিত ও আহুত হইয়া প্রাভাতিক উপাসনায় ধ্যান নিবিষ্টইত্তত উৎসব ভোগ করিতে লাগিলেন। এবং অপরাহ্নে ধর্মোপদেশ গর্ভগ্রন্থ পাঠ ও ব্রাহ্মধর্মের গভীর সত্যের সমালোচিনান্তে নগরবাসী অন্ধ আতুর ও দরিদ্রদিগকে তণ্ডুল ও পয়সা বিতরণ করিয়া উৎসবের বিমলানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। দানান্তে ব্রাহ্ম মন্দিরের পশ্চাৎ ও সম্মুখভাগে মৃদঙ্গ ও করতাল সহকারে

নাম সংকীর্তন আরম্ভ হইল; এই সঙ্কীর্তনে উপস্থিত সমুদায় ব্রাহ্মের হৃদয়ই বিগলিত হইয়াছিল, ছয় ঘটিকার পর "ব্রাহ্ম সমাজ কিরূপে ও কোন সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল, ইহার বর্তমান গতিই বা কিরূপ এবং ভবিষ্যতে ইহা কি পরিণামের অধীন হইবে এতদ্বিষয়ের একটি দীর্ঘ ও সারগর্ভ বক্তৃতান্তে সায়ংকালীন উপাসনা আরম্ভ হইল। এই উৎসবে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণ পুত্রকন্যা বন্ধুবান্ধবগণের সহিত যোগদান করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে একদিনের জন্য স্বর্গীয়ভূমি করিয়া তুলিয়াছিলেন। কোমল হৃদয়া ব্রাহ্মিকাগণ সরল হৃদয়ে সময়োচিত একটি সুমধুর গান করিয়া সমুদায় ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণকে আনন্দসাগরে নিমগ্ন করিলেন। এখানকার ব্রাহ্মগণের ব্রাহ্মোৎসব কেবল ১১ মাঘই পর্যবসিত হয় নাই। ১২ মাঘ প্রাতে উপাসনা ও রাত্রিতে "প্রকৃত ব্রাহ্মজীবন" সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল। গতকাল্য শনিবারও সঙ্গতে এবং সমাজমন্দিরে উপাসনা ও নামকীর্তন হইয়া অদ্য সমুদায় দিন ১১ মাঘের ন্যায় উৎসব ঘটা তরঙ্গে ব্রাহ্মগণ ভাসমান হইতেছেন। যতদিন ব্রাহ্ম সমাজ থাকিবে ততদিন ভারতবর্ষ ১১ মাঘ তারিখে পবিত্র ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইবে।" [৪]

সমাজের কাজে কেশবচন্দ্র সেন ঢাকা যান। তাঁর ভাষণে মুগ্ধ হয়েছিল ঢাকার মানুষ। "বিগত শুক্রবার সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্তবাবু কেশবচন্দ্র সেন বাঙ্গালা ভাষায় একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। 'ধর্মসাধন' বক্তৃতার বিষয় ছিল। পাপবোধ, জ্ঞান, বিশ্বাস, ভক্তি প্রভৃতি ধর্মের সাধনসমূহ কখন কীভাবে উদিত হইয়া আধ্যাত্মিক জগতে কিরূপ কার্য করে কেবল জ্ঞানে ধর্মের শুষ্কতা বোধ করিয়া লোকে কি প্রকার নিরাশ হয়, বিশ্বাস কেমন অটল অচল হিমালয়ের ন্যায় লোককে ধর্মের পথে স্থিরতর রাখে, ভয়ানক ঝঞ্ঝাবাতেও বিচলিত করিতে পারে না, ভক্তি ধর্মরাজ্যে লোককে কেমন মাধুর্য প্রদান করে, গভীর অতলস্পর্শ সাগরের ন্যায় হইয়া অমৃত বারি প্রদানপূর্বক তাপিত মনুষ্যহৃদয়কে কেমন শীতল করে, এসকল তিনি অতি সুন্দররূপে লোকের হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছিলেন। প্রায় সকলেই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মোহিত ও পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। বক্তৃতার উৎকৃষ্টতার বিষয় লেখা দ্বারা কোনমতেই ব্যক্ত করা যায় না। সংক্ষেপে এই বলিতে পারি বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে অনেকবার আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছিল ইহাতে প্রায় ৫শত লোক উপস্থিত ছিল। [৫]

কেশবচন্দ্র ঢাকায় ছিলেন ২৩ দিন। এই সময়ে নানা অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেন। সে সম্পর্কে জানা যায় ঃ "বিগত মঙ্গলবার রাত্রিতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহোদয় এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে শান্তিপুরে যাইবেন তথায় কয়েকদিন অবস্থান করিয়া পরে কলিকাতায় গমন করিবেন। এবার তিনি ঢাকায় ২৩ দিন অবস্থিতি করিয়া গেলেন। এই কয়েকদিনের মধ্যে যে সকল কার্য করিয়াছেন, তাহার অনেকগুলি আমরা প্রকাশ করিয়াছি। এখন আবার ক্রমে সমুদায় কার্য বিবরণ পাঠকবর্গের গোচর করা কর্তব্য বোধ হইতেছে।

২৬শে ফাল্গুন সোমবার উপস্থিত হইয়া রাত্রিতে সঙ্গীত ও সংকীর্তন করেন।
২৭শে " মঙ্গলবার ঈশ্বর সম্পর্কে সাধারণ ও বিশেষ আলোচনা করা হয়।
২৮শে " ঈশ্বরের পবিত্রতার আলোচনা হয়।
২৯শে " প্রকৃত শান্তি লাভের বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়।
৩০শে " ধর্মসংক্রান্ত অভাবের আলোচনা করা হয়।
১লা চৈত্র সঙ্গত সভায় নানা প্রকার উপদেশ দান করা হয়।
২রা " অহঙ্কার বিষয়ক আলোচনা হয়।
৩রা " ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চরিত্র ও কর্তব্য বিষয়ক উপদেশ দেওয়া হয়।
৪ঠা " ঈশ্বরের বিশেষ করুণার বিষয়ে আলোচনা হয়।
৫ই " ঈশ্বরোপাসনার প্রণালী নির্ধারণ বিষয়ক আলোচনা করা হয়।

৬ই " 'মিশন অব দি ব্রাহ্মসমাজ' বিষয়ে ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা করা হয়।
৮ই " আগামীদিনের ব্রহ্মোৎসবের নিমিত্ত প্রস্তুত হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়।
৯ই " ব্রহ্মোৎসব হয়।
১০ই " রমনার মাঠে যাইয়া কোন ব্যক্তির পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে উপদেশাদি প্রদান করা হয়।
১১ই " সামাজিক একতার আবশ্যকতা বিষয়ক কথোপকথন হয়।
১৩ই " পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহসংক্রান্ত সভায় উৎস সম্বন্ধীয় আলোচনা হয়।
১৪ই " ব্রহ্মসাধন বিষয়ক বাঙ্গলা বক্তৃতা করা হয়।
১৫ই " নবাবপুর ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করা ও উপদেশ দেওয়া হয়।
১৬ই " কোন সম্রান্ত লোকের পরিবারের দুইজন স্ত্রীলোকের প্রতি উপদেশ প্রদান এবং বিকালে সমাজে উপাসনা ও উপদেশ দেন।
১৭ই " ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে এবং ৫টার সময়ে নর্মাল স্কুলে ছাত্রদিগের চরিত্র বিষয়ক উপদেশ প্রদান, তৎপর রাত্রিতে অত্রত্য কোন ব্রাহ্মের গৃহে উপাসনা হয়।
১৮ই " নর্মাল বিদ্যালয় এবং কলেজ দর্শন করিয়া রাত্রি ২টার সময় জাহাজে আরোহন করিয়াছেন।

কেশববাবুর আগমনে অত্রত্য বৃদ্ধ, প্রবীণ, যুবক, বালক প্রভৃতি চুতর্বিধ ব্রাহ্মই অত্যন্ত আহ্লাদিত ও উৎসাহান্বিত হইয়াছিলেন। তিনিও পূর্ববার অপেক্ষা এবার ব্রাহ্মদিগের অধিক উৎসাহে দর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এমন কি কোন প্রকাশ্য বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, ইংলন্ড, স্কটল্যান্ড ও ওয়েলসের মধ্যে যেমন স্কটল্যান্ড ধর্মবিষয়ে প্রধান সেইরূপ সময়ে পূর্ববাংলার ঢাকা ধর্মবিষয়ে প্রাধান্য যে এত দিন নানা আন্দোলন এবং অপবাদ উদ্ঘষিত হইতেছিল, তদ্বিষয়ে ঢাকার সর্বসাধারণের হৃদয়েই পরিষ্কৃত হইয়াছে। লোকে তাহার চরণে লুণ্ঠিত হউক তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্বীকার করুক এই সকল বিষয় যে তিনি অনুমোদ করেন না, ইহাতে অত্রত্য সকলেই বিগত সংশয় হইয়াছেন। যাহা হউক আমরা ঢাকাস্থ ব্রাহ্মদিগকে এই বলিতেছি, কেশববাবু নিকট হইতে নানা প্রকার সত্য ও উপদেশ যিনি যতদূর গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা যেন রক্ষা করিতে সযত্ন হন, নতুবা তাঁহাদের আনন্দ ও উৎসাহ প্রভৃতি ক্ষণকাল মধ্যে ধূম্রবৎ উড়িয়া যাইবে। আবার সেই নিরানন্দ সেই নিরুৎসাহ হইয়া জীবণকর্তন করিতে হইবে।[৮]

পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব ভবন উদ্বোধন উপলক্ষে ঢাকার ব্রাহ্মদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। জনসাধারণের চাঁদায় নির্মিত হয়েছিল এই ভবন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় : "অদ্য পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইবে। পূর্ব বাংলার অধিকাংশ ব্রাহ্ম এবং আরো কতিপয় সদাশয় ব্যক্তি এই গৃহ নির্মাণে অর্থ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। প্রথম কল্পনা ছিল চাঁদা দ্বারা ১০০০০ দশ সহস্র টাকা সংগৃহীত হইলে তদ্দারাই গৃহ নির্মাণ, তাহার যথোপযুক্ত উপকরণ এবং পুস্তক সংগ্রহের ব্যয় নির্বাহিত হইতে পারিবে। কিন্তু কার্যকালে সে কল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে। এ পর্যন্ত ভূমিক্রয় এবং গৃহ নির্মাণেই অনধিক ৯০০০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। কিন্তু এখনো গৃহেরই অনেক কার্য অবশিষ্ট রহিয়াছে। অতএব বোধ হইতেছে শুদ্ধ কেবল গৃহ নির্মাণেই প্রায় ৯৫০ টাকা ব্যয়িত হইবে। অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং পুস্তকাদির জন্য আরো ১৫০০ টাকা লাগিবার সম্ভাবনা। গৃহ-নির্মাণ কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সেন মহাশয় গত ১৬ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার রাত্রিতে চাঁদাদায়ীদিগের বিশেষ সভাধিবেশনে যে আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় উপরিউক্ত গৃহনির্মাণাদি বিষয়ে ১২০৩৬ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। কিন্তু স্বাক্ষরকারীদিগের মধ্যে

কাহারো কাহারো মৃত্যু এবং কাহারো কর্মচ্যুতি নিবন্ধন ২৭৮ টাকা আর আদায় হওয়ার সম্ভাবনা নাই, ১১৭৫৮ টাকা আদায় হইতে পারে। কিন্তু এতন্মধ্যে এ পর্যন্ত ৫৭০ টাকা মাত্র উসুল হইয়াছে, অবশিষ্ট ৪১৮৮ টাকা স্বাক্ষরকারীদিগের হস্তগত রহিয়াছে। যাহা হউক উক্ত আদায়ীভূত ৭৫৭০ টাকা এবং সমাজগৃহ সংক্রান্ত কিয়দংশ ভূমির রাজস্ব ১০০ টাকা, ইষ্টক বিক্রয়ে ৩৫ টাকা এবং শ্রীযুক্ত বাবু অভয়চন্দ্র দাস ও বাবু দীননাথ সেন ভাবী চাঁদা আদায়ের প্রত্যাশায় ঋণ করিয়া দিয়াছেন ১৭৫০ টাকা, মোট ৯৪৫৫ টাকা গৃহ নির্মাণ কমিটির হস্তে আসিয়াছে। ইহা হইতে ভূমির সেলামী ৯৭৬ টাকা, কন্ট্রাক্টরকে ৮০৭২ এবং ভূমির কর মিউনিসিপল টেক্স, মুদ্রাঙ্কণ, স্টাম্প ও ডাকের খরচ এবং গাড়ি ভাড়া ইত্যাদি ২৮৮ টাকা ৪ আনা ৯ পাই এ পর্যন্ত ব্যয়িত হইয়াছে। অবশিষ্ট ১৩ টাকা ৮ আনা ৩ পাই মাত্র তহবিলে আছে। যাহা হউক এক্ষণ এই সমাজ গৃহ সম্বন্ধীয় অবশিষ্ট অন্যান্য কার্য এবং স্বাক্ষরকারীরা টাকা দিবে এই প্রত্যাশায়, যে ঋণ করা হইয়াছে তৎপরিশোধার্থ টাকায় নিতান্তই প্রয়োজন। ভরসা করি, স্বাক্ষরকারীদিগের মধ্যে এ পর্যন্ত যাঁহারা দাতব্য পরিশোধ করেন নাই, তাঁহারা অনতিবিলম্বে তাঁহাদিগের চাঁদার টাকা প্রদান করিয়া উক্ত প্রয়োজন সুনির্বাহিত করিবেন, অকুলানের নিমিত্ত কমিটিকে আর ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে না।

সমাজ গৃহ নির্মাণের চাঁদা দায়ীদিগের গত মঙ্গলবাসরীয় বিশেষ সভাধিবেশনে গৃহের ব্যবহার সম্বন্ধে সম্বন্ধে কতিপয় নিয়মও নির্ধারিত হইয়াছে। উক্ত সমাজ গৃহে শুদ্ধ কেবল উপাসনা হইবে না ব্রাহ্মণধর্মানুমোদিত সাধারণ কার্যাদি সম্বন্ধেও সভা এবং বক্তৃতাদি হইবে। গুরুতর বিষয়টি লইয়া সভ্যদিগের মধ্যে ঘোরতর তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। অবশেষে অধিকাংশের সম্মতিক্রমে তদ্বিষয়ে একপ্রকার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশ সভ্য যে সকল নিয়মে অনুমোদিত করিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :

পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

গৃহের উদ্দেশ্য এবং ব্যবহার বিষয়ক নিয়ম।

১. একমাত্র অদ্বিতীয় পরিপূর্ণস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনার নিমিত্ত এই পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইল।
২. এই পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মধর্মানুমোদিত সামাজিক উপাসনার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইবে।
৩. উক্ত উপাসনাকালে সকল জাতীয় ও সকল ধর্মাবলম্বী লোকের উপস্থিত হইবার সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে।
৪. এই গৃহে প্রতি সপ্তাহে, অন্তত একবার সামাজিক উপাসনা হইবে। তদ্ব্যতীত ১২ মাঘ অর্থাৎ যে দিবসে বঙ্গদেশে প্রধান ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয় এবং ২২ অগ্রহায়ণ অর্থাৎ যে দিবসে ঢাকা নগরে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন নিবন্ধন পূর্ববাংলা প্রদেশে ব্রাহ্মধর্মের অভ্যুদয় হয় এবং পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহও যে দিবসেই প্রতিষ্ঠিত হয় আর বঙ্গীয় নববর্ষের প্রথম দিবস, এই তিন দিবসে সামাজিক উপাসনা এবং উপলক্ষ সমুচিত বক্তৃতাদি হইবে।
৫. এই গৃহে পূর্বোক্তরূপে সামাজিক উপাসনা ব্যতীত ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি ও প্রচার এবং ব্রাহ্মধর্ম যাহা প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন তদর্থসভা ও বক্তৃতা হইতে পারিবে।
৬. অন্যান্য স্থানের লোক ঢাকায় উপস্থিত হইতে পারেন, এমন কোন সময়ে এ গৃহে প্রতি বৎসর অন্যূন একবার একটি সভা হইবে। তাহাতে পূর্ব বাংলা প্রদেশবাসী সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ আহূত হইবেন এবং তাহাতে সামাজিক উপাসনা এবং ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি ও প্রচার এবং বাহ্মধর্ম যাহা প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন, তদর্থ বক্তৃতা ও প্রবন্ধপাঠ এবং আলোচনা হইবে।

৭. এই গৃহের অন্তর্গত পার্শ্বস্থ দ্বিতল গৃহে যে গ্রন্থাধান সংস্থাপিত হইবে, তাহাতে ধর্ম, নীতি ও জ্ঞান শিক্ষার উপযোগী পুস্তক ও সংবাদপত্রাদি থাকিবে। এই গৃহের ব্যবহার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নিরূপিত নিয়মানুসারে ঐ গ্রন্থ সর্বসাধারণে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

৮. এই গৃহের অভ্যন্তরে কিংবা বাহিরে কোথাও পূর্বোক্ত কার্য ব্যতীত কোন সৃষ্টবস্তু বা মনুষ্য অথবা কল্পিত দেব-দেবীর উপাসনা, বন্দনা, পূজা কিংবা পদধারণ প্রভৃতি কোন প্রকার পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপ এবং উপাসনা স্থলের গৌরব বিনাশক অন্য প্রকারের কার্য হইতে পারিবে না।

৯. এই গৃহ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ সংগ্রহে কোন প্রকার কুনীতি প্রবর্তক পুস্তকাদি থাকিতে পারিবে না।

এই সকল ভিন্ন গত বৃহস্পতিবারে কার্য নির্বাহক সভ্য এবং ট্রাস্টদিগের সম্বন্ধে কতিপয় নিয়ম নির্ধারিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার সকলগুলি সম্পূর্ণরূপে অনুমোদিত না হওয়াতে আগামী মঙ্গলবার দিবস তদর্থ পুনরায় এক বিশেষ সভা হইবার কথা আছে। সেই সভায় যে সকল নিয়ম অবধারিত হইবে, তাহা প্রকাশ করিতে আমাদিগের বাসনা রহিল।[৭]

"গত ২১ ও ২২ অগ্রহায়ণ দিবসে উক্ত সমাজ গৃহের প্রতিষ্ঠাকার্য অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। ২১ অগ্রহায়ণ রবিবার অতি প্রত্যুষে ব্রাহ্মগণ আরমানিটোলাস্থিত পুরাতন ব্রাহ্মসমাজ গৃহে সমবেত হইলে সেখানে কিয়ৎক্ষণ উপাসনা ও সংকীর্তন হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তৎকালে যেরূপ হৃদ্যরূপে একটি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সকলেরই তাহা সবিশেষ মনোহারিণী হইয়াছিল সন্দেহ নাই। অনেকেই তৎশ্রবণে বিগলিত চিত্ত এবং সাশ্রু নয়ন হইয়াছিলেন। আরমানিটোলাস্থিত সমাজ বাটির চত্বরে সংক্ষিপ্তরূপে উপাসনা করিয়া সকলে ব্রাহ্মকীর্তন করিতে করিতে রাস্তায় বহির্গত হইলেন। ব্রাহ্মেরা নগরকীর্তন করিতে নূতন বাহির হইয়াছেন, এই বলিয়া হউক, অথবা অন্য যে কারণেই হউক, নানা শ্রেণীর বহু সংখ্যক ব্যক্তি এই সঙ্কীর্তন শ্রবণ করিতে রাস্তার উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। অনেকে কীর্তনকারীদের সহিত সম্মিলিত হইয়া শ্রবণ করিতে করিতে নূতন সমাজ গৃহ গমন করিয়াছিলেন। কি হিন্দু কি মুসলমান এবং খ্রিস্টিয়ান, সকল সম্প্রদায়েরই প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা এই ব্রহ্ম সঙ্কীর্তনে আকৃষ্টমনা হইয়া অতি সুগম্ভীরচিত্তে উহার পদ মাধুরী শ্রবণ করিয়াছিলেন। ফলত জল বিহারী যাদোগণ যেমন জাল দ্বারা সমাকৃষ্ট হইয়া একত্র সংবদ্ধ হয়, ব্রাহ্ম নগর সঙ্কীর্তনে এই নগরবাসি জনগণও সেইরূপ আকৃষ্ট হইয়া পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজগৃহে একত্র সম্মিলিত হইয়াছিলেন। যখন সঙ্কীর্তনকারীদের পশ্চাৎ ভুরি ভুরি লোক নূতন সমাজ গৃহের বহিস্তোরণে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং গৃহের সম্মুখভাগে বহুসংখ্যক প্রবীণ প্রবীণ ব্যক্তি তাহাদিগকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তৎকালে এক চমৎকার দৃশ্য হইয়াছিল। যাঁহারা সেই পবিত্রদৃশ্য অবলোকন করিয়াছেন, তাহারা ভিন্ন অন্যের সেই দৃশ্যের গম্ভীরতা অনুভব করা সুকঠিন। এই ভাবে ব্রহ্মসঙ্কীর্তন করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিলে যথাযোগ্য আসন পরিগ্রহ করিলেন। গৃহপ্রবেশ সময়ে এত লোকের সমাগম হইয়াছিল যে, বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আসনাভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে হইয়াছিল। ঢাকার সকল সম্প্রদায়েরই প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এই সময়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মান্যবর শ্রীযুক্ত খাজে আবদুল গনি ও খাজে আসানুল্লা প্রভৃতি অতি সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ, জোয়াকিন পোগস ও ডেবিড প্রভৃতি খ্রিস্টিয় সম্প্রদায়ের সম্মানশালী আর্মেনিয়ানগণ এবং বাবু বরদাকিঙ্কর রায়, বাবু ত্রিলোচন চক্রবর্তী, মুন্সি লক্ষ্মীকান্ত দাস ও কৃষ্ণকুমার বসু প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান উকিল এবং আমলাগণ অকুণ্ঠিত চিত্তে এই দিবস সভায় গমন করিয়াছিলেন।

এই দিবস সকলে সভাধিবিষ্ট হইলে প্রথমত গৃহনির্মাণ কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু অভয়চন্দ্র দাস মহাশয় সমাজগৃহের ব্যবহারাদি সম্বন্ধে চাঁদাদায়ীদিগের সভায় যে সকল নিয়ম অবধারিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলেন। তৎপরে বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় সমাজের বেদীতে উপবিষ্ট হইয়া প্রথমত কি উদ্দেশ্যে পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইল, ইহাতে কি কি কার্য অনুষ্ঠিত হইবে না, পূর্ববাংলা ব্রাহ্ম সমাজগৃহ নিয়মাবলীর অনুযায়ী করিয়া তাঁহার কতিপয় নিয়ম পাঠ করিলেন। অনন্তর উপলক্ষ সমুচিত উপাসনা আরম্ভ হইল। কিয়ৎক্ষণ উপাসনা ও সঙ্গীত হইলে, বাবু কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্মের উদারতা সম্বন্ধে একটি অত্যুৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিলেন। তাহাতে সর্ব সম্প্রদায়ি লোকেরই অন্তঃকরণ এরূপ আবর্জিত ও হৃদয় এরূপ আদ্রীভূত হইয়াছিল যে, বক্তৃতাটির শীঘ্র শেষ হইল বলিয়া সকলেই শেষে শুশ্রূষাসহকৃত আন্তরিক আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন। বক্তৃতার পর সংক্ষিপ্ত রূপে প্রার্থনা ও সঙ্কীর্তন হইলে বেলা ১০টার সময়ে সভা ভঙ্গ হইল।

প্রাতঃকালেই ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল, ১১টার সময়ে পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে অন্ধআতুর প্রভৃতি দীন দুঃখীগণকে কিছু কিছু করিয়া দান করা হইবে। ১২টা পর্যন্ত কাঙ্গালদিগের প্রতীক্ষা করিয়া দানারম্ভ করা হইল। পূর্বে ঢেঁড়া দেওয়াতে সহস্রাধিক দীন দুঃখী উপস্থিত হইয়াছিল। প্রাপ্তবয়স্ক সাধারণ দীন দুঃখীদিগকে এক এক আনা, ক্ষুদ্র বালক, বালিকাদিগকে এক এক পয়সা, এবং অন্ধ আতুর প্রভৃতি নিতান্ত অক্ষমদিগকে এক একখানি বস্ত্র দান করা হইয়াছে। ঈশ্বরোপসনার গৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সর্বাদিসম্মত এইরূপ দান করাতে পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ সকলেরই ধন্যবাদাস্পদ হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

অপরাহ্ন আড়াইটার সময়ে পুনরায় উপাসক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর সভাধিবেশন হয়। তখন শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ঈশ্বরের বিশেষ করুণা সম্বন্ধে আর একটি মনোহর বক্তৃতা করেন। অনন্তর কতিপয় সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইলে রাত্রি ৯/১০ টার সময়ে সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করেন। রবিবার প্রায় সমস্ত দিবসই ব্রাহ্মেরা পরমোৎসাহ সহকারে ঈশ্বরোদ্দেশে সময় ক্ষেপন করিয়া বিমলানন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

২২শে অগ্রহায়ণ সোমবার প্রাতঃকালে পুনরায় সকলে সমাজ গৃহে সমবেত হন। এদিবসও পূর্বদিনের ন্যায় উপাসনাদি হয়। এই দিবস ধর্ম এবং সংসার বিষয়ে সকলের হৃদয়াদ্রকাহিনী আর একটি বক্তৃতা করা হইলে বেলা ১০টার সময়ে সভা ভঙ্গ হয়।

এই দিবস অপরাহ্নে অত্রত্য ইউরোপিয়ান এবং আর্মেনিয়ামগণ বিশেষরূপে নিমন্ত্রিত হন। রাত্রি ৭টায় সময়ে বাবু কেশবচন্দ্র সেন 'মনুষ্যের প্রকৃত জীবন' বিষয়ে ইংরেজি ভাষায় একটি চমৎকার বক্তৃতা করেন। কেশববাবু কিরূপ বক্তা, তাহার বাক্যগুলি কিরূপ ধর্মভাব পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহা এক প্রকার অবিসংবাদিতরূপেই সাধারণ্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমাদিগের অধিক বাক্য ব্যয় করা বাহুল্যমাত্র। সংক্ষেপে বলিতে হইলে এইমাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত হয়, মনোযোগ পূর্বক কেশববাবুর বক্তৃতা শ্রবণ করিলে এমন পাষাণ হৃদয় নাই যিনি আর্দ্রীভূত না হন এবং প্রেমাশ্রু সংবরণ করিতে পারেন।

পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাকার্য সর্বাংশেই অতি সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মবিদ্বেষী কোন কোন ব্যক্তি হুজুক তুলিয়াছিলেন, 'পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহ দিবসে ঢাকাস্থ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা সর্বপ্রকার কপটতা পরিত্যাগ করিবার উদ্দেশ্য এক প্রতিজ্ঞাপত্রের পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিতেছেন। ঐ দিবস অনেকে প্রকাশ্যরূপে জাতিচ্যুত হইবেন এবং অনেকে যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিবেন। সমাজের প্রতিষ্ঠা আর কিছুই নহে, কয়েকজন প্রকাশ্যরূপে জাতিত্যাগ করিবেন। ইহাই তাহার অর্থ। এই হুজুক সর্বত্র প্রচারিত হওয়াতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদিগের অনেকে সাতিশয় ভীত হইয়াছিলেন। এবং ভয়ে কেহ কেহ (যাঁহার আত্মীয়স্বজনগণ ব্রাহ্মসমাজ সংসৃষ্ট আছেন) গ্রাম হইতে নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু

বাস্তবিক উক্ত দিবস ঐরূপ কিছুই হয় নাই। আমরা যতদূর জানি তাহাতে একপ্রকার নিশ্চিতরূপেই বলিতে পারি গৃহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ঐরূপ কার্য করাইবে, এরূপ মনস্থও কাহারো ছিল না। উহা বিদ্বেষীদিগের স্বকপোলকল্পনা মাত্র। যাহা হউক কার্যকালে উল্লিখিতরূপ কোন ঘটনা সংঘটিত না হওয়াতে গোঁড়া হিন্দুদিগেরও কোন বিদ্বেষের মুখে আমরা ইহাই শুনিয়াছি, ব্রাহ্মেরা এই রূপ একাগ্রচিত্তে ঈশ্বর নাম গান করেন, ইহা কাহারো অনভিমত নহে।[৮]

অন্যান্য অঞ্চলের মত ঢাকার ব্রাহ্মদের মধ্য দলাদলির সৃষ্টি। এই দলাদলি সম্পর্কে লেখা হয়েছিল : "আধুনিক ব্রাহ্মমণ্ডলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যেমন সন্তোষের উদয় হয়, তেমন আবার কোন কোন বিষয়ে অসন্তোষেরও উদ্রেক হয়। সম্প্রতি ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বড়ই অসন্তোষকর একটি ঘটনা দৃষ্ট হইতেছে। কলিকাতা, ঢাকা, বর্ধমান ও অন্যান্য অনেক স্থানেই ব্রাহ্মগণ দলাদলিরূপ দুর্বিপাকে আক্রান্ত হইতেছেন। যেখানে ২০/২৫ জন ব্রাহ্মের সংখ্যা দৃষ্টিগোচর হয়, সেখানেই দলাদলির আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেখানে ব্রাহ্মের সংখ্যা অধিক সেখানে দলাদলির উদ্ভব হয় তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। এবং দলাদলি লোকের প্রকৃতিকে কোন দিকে লইয়া যায়, তাহাও কাহারই অবিদিত নাই। কিন্তু বাহ্মগণের বর্তমান ভাবভঙ্গি দর্শন করিয়া সে বিষয়ে নিরাশ হইতে হয়। ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে এখন নানা প্রকার অব্রাহ্মিক ব্যবহার মিশ্রিত করিয়া লইয়া চলিতেছেন। ব্রাহ্মধর্মকে প্রক্ষালন করিয়া লইতে হইবে। ব্রাহ্মধর্মও যদি নানা প্রকার নিচভাবে কলুষিত হয়, তবে কি প্রকারে ভারতবর্ষে দণ্ডায়মান হইয়া সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবীতে জ্যোতি প্রদান করিতে পারিবে? অতএব ব্রাহ্মদিগের মধ্য হইতে যাহাতে এই দলাদলি অপসারিত হয় তাহারই পন্থা দেখা কর্তব্য।

যাহা হউক, কি সূত্র অবলম্বন করিয়া দলাদলির সৃষ্টি হয়, একবার আলোচনা করিয়া দেখা মন্দ হইতেছে না। তদ্বিষয়ে মধ্যস্থ হইয়া অদ্য কয়েকটি কথা বলিতে আমাদের অভিলাষ। কিন্তু কতদূর মধ্যস্থতা রক্ষা করিতে পারি, পাঠকও ঠিক মধ্যস্থ না হইলে বুঝিতে পারিবেন না। কয়েকটি বিষয়ে লইয়াই দলাদলির সূত্রপাত হয়। ইহার মধ্যে প্রধান হেতু হিন্দুসমাজ সংসৃষ্টতা। এক পক্ষ বলেন, ব্রাহ্মদিগের হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করা উচিত নয়। হিন্দু সমাজে অবস্থান করিয়া নিজেরও উন্নতি করিতে হইবে, সমাজকে পরিশোধিত করিতে হইবে। পক্ষান্তর বলেন, হিন্দু সমাজে থাকিয়া ব্রাহ্মসমাজ রক্ষা করা যায় না, সমাজের উন্নতি দূরে থাকুক নিজের উন্নতিও হারাইতে হয়, অতএব হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করা ব্রাহ্মদিগের কর্তব্য। আমাদের মতে ইহার কোন পক্ষকেই সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমরা বলি, হিন্দুসমাজে থাকিতেই হইবে, অথবা হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করিতেই হইবে, এই উভয় মতই ঠিক অথচ ঠিক নয়। সাধারণ ব্রাহ্মের প্রতি ইহার কোন কথাই প্রযোজিত হইতে পারে না। অথচ ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে উভয় কথাই সঙ্গত হইতে পারে। হিন্দুসমাজে থাকিয়া নিজের উন্নতি ও সমাজের উন্নতি করা, সকল ব্রাহ্মের পক্ষে সাধ্যায়ত্ব ও মঙ্গলকর নয়। কারণ এক্ষণ হিন্দুসমাজের অবস্থা একরূপ নয়; নানাস্থানে নানা প্রকার। হিন্দু সমাজ কোন স্থানে শিথিল। যে স্থানে হিন্দুসমাজ শিথিল সে স্থানে থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রতিপালন সহজ এবং যেস্থানে দৃঢ় সেস্থানে থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার। মনে কর, তুমি ব্রাহ্ম হইলে, উপসনাসমাজ করিলে, বিবাহ শ্রাদ্ধাদি ব্রাহ্মধর্ম মতে করিলে, পৌত্তলিক পূজা আহ্নিক পরিত্যাগ করিলে, হিন্দুমতে বিবাহ শ্রাদ্ধাদি করিলে না, পুত্তলিকা প্রণাম করিলে না, ইহাতে তোমার হিন্দু সমাজের বন্ধন শিথিল বলিয়া তোমাকে কিছুই বলিল না, তোমাকে নিয়া আহার ব্যবহার করিল, আর একজন ব্রাহ্ম হইল, ব্রহ্মোপসনা করিতে লাগিল, পৌত্তলিক পূজা, আহ্নিক পরিত্যাগ করিল, বিবাহ শ্রাদ্ধাদি ব্রাহ্ম মতে করিতে উদ্যোগ করিল, হিন্দু সমাজ একেবারে খড়গহস্ত হইয়া তাহাকে সমাজবহিষ্কৃত করিয়া দিল। এস্থলে কি কর্তব্য? ধর্মত্যাগ

কর্তব্য না সমাজত্যাগ কর্তব্য? বোধহয় ধর্মত্যাগ করিতে কেহই উপদেশ দিবেন না। সুতরাং বাধ্য হইয়া সমাজ ত্যাগ করিতে হইল। আর যদিও কষ্ট সহ্য করিয়া থাকা হয় তথাপি ক্রমে অনেক ধর্মবল হারাইতে হয়। অতএব আমরা বলি এ বিষয়ে কোন নিয়ম বান্ধিয়া চলা যাইবে না। হিন্দু সমাজে থাকিয়া যদি তোমার ধর্মসাধনে ব্যাঘাত না জম্মে থাকে, ইহা সর্বোত্তম কথা। আর যদি ব্যাঘাত হয়, তবে কখনো থাকা বিহিত হয় না। যাহারা সমাজে থাকিয়া ধর্মসাধন করিতে পারিলেও সমাজ পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে অবশ্যই অকৃতজ্ঞ, স্বার্থপর ইত্যাদি বলি। মধ্যে মধ্যে এরূপও দৃষ্ট হয় ধর্ম সাধনের সঙ্গে উপাসনার সঙ্গে সংস্রব নাই সমাজ পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছেন। ইহা বড় বিড়ম্বনার বিষয়।

দলাদলির আর এক কারণ বাইবেল কোরান ও বেদ। এক পক্ষ বাইবেল্ কোরান হইতে ব্রাহ্মধর্মের সত্যগ্রহণ করিতে চান, পক্ষান্তর নিষেধ করেন। তাহারা বলেন, কেবল বেদই অবলম্বনীয়। কিন্তু একথা যুক্তিসঙ্গত নয়। সত্য যেখানেই থাকুক, তাহা ব্রাহ্মধর্মেরই এরূপ না হইলে ব্রাহ্মধর্ম সাম্প্রদায়িক ও অপ্রশস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু যাহারা বেদাদি পরিত্যাগ করিয়া যান তাহারা অবশ্যই অন্যায় করেন। প্রাচীন শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যান এমন ব্রাহ্ম দেখা যায় না।

জ্ঞান ও ভক্তি দলাদলির অন্য কারণ। কেহ বলেন জ্ঞানই প্রধান ধর্ম সাধন, কেহ বলেন ভক্তিই প্রধান ধর্মসাধন। দেখিতে গেলে প্রকৃত জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধী নয়। ভক্তিও জ্ঞানের প্রতিরোধিনী নয়। উভয়ের সম্মিলন অতি চমৎকার। ইহার একটিও নাড়িয়া ধর্ম লাভে সম্যক সমর্থ হওয়া যায় না? ইহার একটির অভাবেও ধর্ম নির্মল ও ভ্রান্তি শূন্য হয় না। এবং ভক্তি অভাবেও ধর্ম মধুময় শান্তিপ্রদ হইতে পারে না; কিন্তু জ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া ভক্তিমান হইলেও কথঞ্চিৎ ধর্ম পালন হইতে পারে কিন্তু ইহারই কোনটাই পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কর্তব্য নয়।

গতানুগতিক ও স্বাধীনগতি, দলাদলির চতুর্থ হেতু। কেহ কেহ বলেন তরুণ বয়স্ক যুবক ও বালকদিগের মধ্যে অনেকে ধর্ম বিষয়ে স্বাধীনভাবে চালিত না হইয়া কেবল দেখাদেখি সমুদয় কার্য করেন। একথা সকল যুবক বা বালকের প্রতি আরোপিত হইতে পারে না; কাহারো কাহারো প্রতি হইতে পারে। অনেক অল্প বয়স্ক বাস্তবিকই পরের মতানুসারে পরিচালিত হয়। নিজের স্বাধীন মতের ব্যবহার কিছুই করে না। এইরূপ বালকেরা যতদিন সৎসংসর্গে থাকিবে ততদিনই ভাল থাকিতে পারিবে। পরে যখন সৎসংসর্গের অভাব হইবে, তখন তাহাদের যে ধর্ম ভাব থাকিবে কি না সন্দেহ। প্রবীণ ব্যক্তিদিগের মধ্যে আবার স্থল বিশেষ ইহার বিপরীত দোষ লক্ষিত হয়। তাঁহারা কখনো কখনো স্বাধীন ইচ্ছার এরূপ অপব্যবহার করেন, যে অন্যের মতানুযায়ী হইবে বলিয়া যাহা ভাল তাহাও চান না। সুতরাং ইহাও ভয়ানক দোষ।

এই কয়েকটি মতভেদ দলাদলির প্রধান কারণ। আনুষঙ্গিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক কারণ আছে, উল্লেখ করিতে গেলে প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া উঠে। যাহা হউক সহস্র প্রকার মতভেদ থাকুক, কিন্তু ব্রাহ্মদিগের পরস্পর সম্মিলন কর্তব্য। এক পরিবারস্থ লোকের সঙ্গেও আমাদের সাংসারিক অনেক মতভেদ হয় কিন্তু তা বলিয়া কখনো পরিবার পরিত্যাগ করিতে পারি না। সেইরূপ ব্রাহ্ম পরিবার মধ্যেও যেন মতভেদ থাকা সত্ত্বেও ছাড়াছাড়ি না হয়। যদি সামান্য মতভেদ বা অন্য কোন কারণে দলাদলি করিয়া ব্রাহ্মদের মধ্যে একটি ছাড়াছাড়ির সামান্য ভাব হইয়া যায়, তবে আমাদের নিজের অহিত নিজেই করিলাম। উভয় দলেরই সহস্র প্রকার দোষ থাকুক, তাহা নিজের হিতের জন্য অবশ্যই পরস্পর ক্ষমা করা যাইতে পারে। সকলেরই লক্ষ্য এক ঈশ্বর সাধন।[৯]

(২)

ঢাকার ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ভয়ানক মতভেদ উপস্থিত। এই মতভেদ অবলম্বন করিয়া ঢাকার প্রায় সমস্ত বাহ্ম দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতেছেন। কেবল দুই চারিজন মাত্র উভয়দলের মধ্যবর্তী। এইরূপ মতভেদ শীঘ্রই দুইটি উপাসনা সমাজ হওয়ার উপক্রম দেখা যাইতেছে। পরিমাণ কি হইবে ঈশ্বর জানেন।

মতভেদ নিয়া দলাদলি হইলে উভয় দিক হইতে উভয় দিকেব প্রতি নানা প্রকার বিকৃত কথা উত্থিত হইতে থাকে। ঐসকল কথার অনেক সত্যও হয়, অনেক মিথ্যাও হয়। অনেক কথা আবার আকাশ হইতেও সমুদ্ভুত হইয়া থাকে। কিন্তু যে ভাবেই হউক, ঐসকল কথা নিয়া ক্রমেই মনোভঙ্গ ঘটিয়া উঠে। দলাদলির প্রকৃতিই এই। ঢাকাস্থ ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও সে সকল লক্ষিত হইতেছে।

মতভেদ যত দিন কেবল মুখে ও অন্তরে থাকে, ততদিন হাস্য কৌতুক প্রভৃতিতেই তাহার ফলাফল নিবদ্ধ থাকে। কিন্তু যখন ঐ মতভেদ সংসৃষ্ট কোন কার্য আরম্ভ হয়, তখনই বিষম গোল বাজিয়া উঠে। তখন উভয় পক্ষই স্বকীয়মত দৃঢ়তর রাখিয়া কার্য করিতে চান। ইহাতে যদি কোন পক্ষ আপনাদের মত কিছু ছাড়িয়া দিতে সমর্থন হন, তবেই সমুদয় মিটিয়া যায়, দলাদলি করিয়া আর বিচ্ছিন্ন হইতে হয় না। কিন্তু যেস্থলে উভয় পক্ষই কোন সাধারণ কার্য আপনাদের মতানুসারে করিতে দৃঢ়সংকল্প হন, তথায় আর সম্মিলনের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। সেখান প্রবল দলাদলি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। আমাদের ঢাকার ব্রাহ্মগণের সেই দলাদলির মুখে পতিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। পূর্বে তাঁহাদের মতভেদ কেবল মুখে ও অন্তরেই নিবদ্ধ ছিল। পরে নানাকার্যের সংস্রবে তাহা ক্রমে প্রবলবেগ ধারণ করিতেছে। অদ্য আমরা সংক্ষেপে তদ্বিষয়ে কয়েকটি কথা বলিতে অভিলাষ করি।

এইরূপ মতভেদ নিয়া সামাজিক উপাসনা প্রভৃতি সাধারণ কার্যে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া কর্তব্য নয়। বিচ্ছিন্ন হইলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে। তাহাতে দলাদলি ও বিদ্বেষ প্রভৃতির প্রকোপ আরো বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কেউ কেউ বিবেচনা করেন, মতভেদ লইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া পরম উপকারের বিষয়, তাহাতে মনোভঙ্গেরও অবসান হয়। কিন্তু ইহা ভ্রমমূলক কথা। ইহাতে মনোভঙ্গের নিরসন হয় না। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এইরূপ মতভেদ নিয়া কোন স্থলের ব্রাহ্মগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যান। পরে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে বিবাহাদি কার্যে নিমন্ত্রণ ও যোগ জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করেন না। ইহা দ্বারা অনুমিত হয়, মতভেদ লইয়া বিচ্ছিন্ন হইলেও নানা প্রকার মন্দভাব অন্তঃকরণ হইতে চলিয়া যায় না। প্রায় সমুদয় কার্যেই এইরূপ হইয়া থাকে।

দলাদলি সম্বন্ধে আর একটি অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। হয়ত এইরূপ বাহিরের বিষয় লইয়া বিবাদ বিসংবাদাদি করিতে করিতে অনেক ব্রাহ্মের অন্তর্দৃষ্টি বিস্মৃতিজলে নিক্ষিপ্ত হইয়া যাইতে পারে। মতভেদের সময় আত্মমত রক্ষণ ও সমর্থন করিতে অন্ধদৃঢ়তা জন্মে। সুতরাং নিজ মতের দোষ দেখিয়া উঠা সুকঠিন হয়। কেবল এইমাত্র নয়, শুষ্কতা ও সত্যস্খলন ইত্যাদি নানা অনিষ্টেরই আশঙ্কা আছে।

বিচ্ছিন্নতার আর এক দোষ এই, ইহাতে উভয় পক্ষেরই ত্রুটি রহিয়া যাওয়ার বিশেষ সুযোগ হয়। যে পক্ষের ভ্রম থাকে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে তাহা বিদূরিত হওয়ার সম্ভাবনা অতি কম। সম্মিলিত হইয়া থাকিতে পারিলে বরং উভয়দলের ত্রুটি বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা। পরস্পর যোগ থাকিলে অলীকমত অবশ্য একদিন অপনীত হইয়া সম্মিলন হইতে পারিবে। এস্থলে অনেকে বলিতে পারেন, নানা প্রকার মতভেদ লইয়া থাকিতে গেলে অনেক বিশ্বাস বিরুদ্ধ কার্যে যোগ দিতে হয়, এবং স্বাধীন ইচ্ছার অনুগামী হইয়া অনেক কাজ করা যাইতে পারে না। সুতরাং নিজের ও সমাজের অনিষ্ট স্বীকার করিতে হয়, অতএব নিজের ও সমাজের

অনিষ্ট করিয়া সম্মিলিত হইয়া থাকা উচিত নয়। এই কথার উপরে আর বিশেষ কিছু বলা যাইতে পারে না। কিন্তু, যাঁহারা মতভেদ নিয়া বিচ্ছিন্ন হইতে চান, তাহাদের গূঢ়রূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখা কর্তব্য, সম্মিলিত হইয়া থাকার জন্য নিজের কোন মত ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে কিনা? আমাদের বিবেচনায় বোধহয় বিচ্ছিন্ন হওয়ার হেতুভূত এমনও অনেক বিষয় আছে, তাহা ছাড়িলে কাহারও বিশেষ অনিষ্ট হয় না। তথাপি সেগুলি নিয়া বৃথা বৃথা টানাটানি করা হয়। সম্মিলিত হইয়া থাকাও যে একটি হিতের বিষয়, ইহাও দেখা কর্তব্য। অতএব আমরা বলি যে সকল বিষয় পরিত্যাগ করিলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা অনর্থক সে সকল নিয়া দলাদলি করা কর্তব্য নয়। আমরা দেখিয়াছি যৎসামান্য বিষয় নিয়াও অনেক সময় বিচ্ছেদের সেতুবন্ধন করা হয়। ব্রাহ্মগণ চিন্তা করিয়া দেখুন, কেবল প্রাধান্য ও নিজের মতরক্ষার অভিপ্রায় কখন কখন দলাদলির কারণ স্বরূপ হয় কিনা? যদি হয় তবে তাহা পরিত্যাগ করা উচিত কিনা? [১০]

(৩)

এই সমাজ সম্বন্ধীয় নির্ধারিত নিয়মানুসারে গত পূর্ব বুধবার রাত্রিতে সভ্যদিগের সাংবৎসরিক সভাধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভায় গত বর্ষের আয় ব্যয়ের হিসাব পঠিত, নূতন কার্য নির্বাহক সভা গঠিত, এবং অভিনব সভাপতি ও সম্পাদক নিয়োজিত হইলে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, 'এক্ষণ কার্যনির্বাহক সভার হস্তে সমাজের উপাচার্য নিযুক্ত করার যে ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহার পরিবর্তন করিয়া পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভা অথবা উপাসকমণ্ডলীর হস্তে ঐ ক্ষমতা দেওয়া হউক।' অর্থাৎ অধিকাংশ সভ্য যাহাকে উপাচার্য করিতে বলিবেন, তাঁহাকেই উপাচার্য করিতে হইবে, এই নিয়ম নির্ধারিত হউক। এই প্রস্তাব শ্রবণ মাত্রেই কেহ কেহ এই বলিয়া আপত্তি করিলেন, "যখন উপাচার্য নিযুক্তির ক্ষমতা কার্যনির্বাহক সভার হস্তে থাকার নিয়ম সর্বসম্মতিক্রমে অবধারিত হইয়া গিয়াছে, তখন আর তাহা পরিবর্তিত হইতে পারে না, এতদুত্তরে পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের মুদ্রিত নিয়মাবলী পুস্তকের ত্রয়বিংশ নিয়ম প্রদর্শিত হইল।" তাহাতে লিখিত আছে, 'পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ অধিবেশনে অধিকাংশের মত হইলে এবং ট্রাস্টিগণের অধিকাংশ সম্মত হইলে, এই চতুর্থ ভাগের লিখিত পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কীয় সমুদায় নিয়ম পরিবর্তিত হইতে পারিবে।' এতৎশ্রবণে উল্লিখিত প্রস্তাবটা উপেক্ষণীয় নয় বলিয়া সকলের প্রতীত হইল। প্রস্তাব সম্বন্ধে উপস্থিত সভ্যদিগের মত জিজ্ঞাসা করা হইলে অধিকাংশ সভ্যের সম্মতিতে ইহাই অবধারিত হইল 'উপাচার্য নিযুক্তির ক্ষমতা কার্যনির্বাহক সভায় সভ্যদিগের হস্তে থাকাই উচিত।' ইহার পর উপাচার্য শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় সর্বসমক্ষে বলিলেন, কোন বিশেষ কারণে আমি উপাচার্য পদ পরিত্যাগ করিলাম। তৎপরেই শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়কে উপাচার্য করিবার নিমিত্ত আহ্বান করার প্রস্তাব এবং ইতঃপূর্বে যাঁহারা পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে স্বতন্ত্ররূপে উপাসনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাদিগকে পুনরাহ্বান করার প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। অধিকাংশের সম্মতিক্রমে এতদুভয় প্রস্তাব অবধারিতও হইল। তৎপরে এই প্রস্তাব হইল, 'উপাচার্য যিনিই থাকুক না কেন, এক নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে তাঁহাকে সামাজিক উপাসনা কার্য সম্পাদনা করিতে হইবে।' অধিকাংশ সভ্য এই প্রস্তাবে অনুমোদন না করাতে ইহা পরিত্যক্ত হইলে রাত্রি প্রায় ১১টার সময়ে সভা ভঙ্গ হইল।

পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের... নিয়ম প্রণয়নে ত্রুটি করেন না। একখানি পুস্তক নিয়মাবলী দ্বারাই পরিপূর্ণ হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই সকল নিয়মাবলীর মধ্যে এরূপ একটি নিয়ম নাই যে, নিয়মিত উপাস্য দিবসে উপাচার্য অনুপস্থিত থাকিলে উপস্থিত উপাসকেরা তাঁহাদিগের মধ্যে কোন এক ব্যক্তিকে উপাচার্য নিযুক্ত করিয়া তদ্দিবসীয়

উপাসনাকার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন। ... গত রবিবার দিবসে নিয়মিত উপাসনা কার্যের বিষয় বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। এই দিবস উপাচার্য উপস্থিত ছিলেন না। নিয়ম না থাকাতে উপস্থিত সভ্যের মধ্যেও কেহ উপাচার্যের বেদীতে আরোহন করিতে সাহস পাইলেন না। সুতরাং তাহাদিগকে উপাসনা কার্যস্থগিত রাখিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল।

এইরূপ বিশৃঙ্খলার সংবাদ অবগত হইয়া হউক, পূর্বোক্ত সাধারণ সভায় অধিকাংশের মত হইয়াছে বলিয়া হউক, অথবা কারণান্তর প্রযুক্তই বা হউক, বর্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় পূর্ববিচ্ছিন্ন বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় প্রভৃতিকে পুনরায় পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে আসিয়া উপাসনা করিবার নিমিত্ত রীতিমত আহ্বান করিয়াছেন। তদনুসারে তাঁহারা সকলেই এই সমাজে পুনঃ সমাগত হইয়া গত ২২ অগ্রহায়ণ দিবসীয় ব্রহ্মোৎসব কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। ঐ দিবস অপরাহ্নে রাস্তায় রাস্তায় ব্রাহ্ম নগর সংকীর্তন হইয়াছে। ২২ অগ্রহায়ণ ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের জন্ম দিন। প্রতি বৎসর এই দিবস বিশেষ সমাজ হইয়া উপাসনা ও উপলক্ষ সমুচিত বক্তৃতাদি হইবে, নিয়ম পুস্তকে এরূপ নিয়ম আছে। কিন্তু জানি না বঙ্গবাবু প্রভৃতিকে আহ্বান করা না হইলে এবার এই নিয়ম রক্ষা পাইত কিনা। যাহা হউক এই হইতে ঢাকার ব্রাহ্মদিগের দলাদলীর ভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া উদ্দিষ্ট কার্য সংসাধনে অকপট হৃদয়ে পরস্পরের সহায়তা করেন, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। [১১]

বিজ্ঞাপন :

পূর্ববাংলা ব্রাহ্ম সমাজের কার্য নির্বাহক সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় প্রস্তাব করেন, যে পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রহ্মোৎসব হইতে দেওয়া উচিত নহে। কারণ উপাসকগণ কার্য নির্বাহক সভ্যদিগের মত না লইয়া উৎসবের বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। কিন্তু যদিও উৎসব হইতে দেওয়া হয়, তথাপি ব্রাহ্ম সংকীর্তন করিতে দেওয়া কখনই উচিত নহে।

অধিকাংশ কার্য নির্বাহক সভ্যদিগের মতে প্রস্তাব স্থিরীকৃত হওয়াতে আমরা বাধ্য হইয়া বর্তমান পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র ব্রহ্মোৎসব ও নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দয়াময় পিতা দুর্বল কাঙ্গালদিগের সহায় হউন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। উপাচার্য
বঙ্গচন্দ্র রায়, গোবিন্দচন্দ্র দাস, ভুবনমোহন সেন প্রভৃতি।
ঢাকা প্রকাশ ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭০

পূর্ব বাংলা ব্রাহ্ম সমাজের নিয়মাবলী পুস্তকের তৃতীয় ভাগের ১৫০ নিয়মানুসারে নিম্নলিখিত বিষয়াদি পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের কার্য নির্বাহক সভার গোচরার্থে বিজ্ঞাপিত হইল। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ প্রভৃতি ৬০ জন ব্রাহ্ম পূর্ববাংলা ব্রাহ্ম সমাজসম্বন্ধে একখানি আবেদন পত্র পাঠান। তাহার দ্বিতীয় প্রার্থনা এই 'আমাদিগকে আমাদের প্রণালী মতে ভিন্ন একদিন সামাজিক উপাসনা কার্য সম্পাদন করিতে দিয়া সেই নির্দিষ্ট দিবসে সমাজগৃহে অন্যকার্য নিয়ম দ্বারা রহিত করা হয়।'

এই প্রার্থনার প্রতিকূলে কোন ট্রাস্টিই আপত্তি উপস্থাপন করেন নাই। শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার বসু ও শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ (ষোলঘর নিবাসী) মৌন দ্বারা সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন, কেননা তাহাদিগের নিকট আমি দ্বিতীয়বার যে পত্র লিখি তাহাতে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছিল, যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তর না পাইলে তাঁহাদের মৌন সম্পূর্ণ রূপে সম্মতিরূপে গৃহীত হইবে। শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র এ বিষয়ে কোন মতই প্রকাশ করেন নাই। অপরাপর ট্রাস্টিগণের মত নিম্নে প্রকাশিত হইল।

'তাহারা, (রজনীবাবু প্রভৃতি আবেদনকারী) 'পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়া সামাজিক উপাসনাতে যোগ দিলে, অবশ্যই অন্য দিনে সমাজের ব্যবহার পাইতে পারে না।'

শ্রীকৈলাশচন্দ্র ঘোষ
শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ
শ্রীদীননাথ সেন।

'রজনীকান্ত বাবু প্রভৃতি দ্বিতীয় প্রার্থনা সম্বন্ধে আমার অভিমত এই যে তাঁহারা সাধারণ উপাসনার দিবস পূর্ব বা ব্রাহ্মসমাজের উপস্থিত উপাসনায় যোগ দিলে, ভিন্ন প্রণালী মতে তাঁহাদিগকে সপ্তাহের অন্য দিবসে সমাজগৃহে উপাসনা করিতে দেওয়া সর্বথা কর্তব্য।'

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দাস

'উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে তত্রস্থ ব্রাহ্মসমাজের নিরূপিত পদ্ধতি অনুসারে যতদিন ইচ্ছা হয়, ততদিন উপাসনা করিতে পারেন।'

শ্রীঅভয়চন্দ্র দাশ।

'শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ প্রভৃতি তাহাদের প্রণালী মতে দ্বিতীয় দিবসে যে পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনা করার প্রার্থনা করিয়াছেন তাহাতে আমার সম্পূর্ণ অভিমত আছে।'

শ্রীপার্বতীচরণ রায়।

'আবেদনকারীদিগের অপর প্রার্থনা গ্রাহ্য করা কর্তব্য।'

শ্রীভগবানচন্দ্র বসু।

'আবেদন স্বাক্ষরিত ব্রাহ্মগণের দ্বিতীয় প্রস্তাবে আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।'

শ্রীরাধিকামোহন রায়

আমার অভিমত যে সম্পূর্ণরূপে এই প্রার্থনার অনুকূলে, ইহা বলা বাহুল্য।

উল্লিখিত মত সংগ্রহ হইতে দৃষ্ট হইবে যে, অধিকাংশ ট্রাস্টিগণের মতানুসারে আবেদনকারীদিগের পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে সপ্তাহের অন্যতর দিবসে উপাসনা করিবার অধিকার সাব্যস্ত হইয়াছে। অতএব এই বিজ্ঞাপন দ্বারা পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক সভাতে প্রার্থনা করা যাইতেছে যে, তাহারা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ প্রভৃতিকে উক্ত অধিকার প্রদান করা।

২১ রসা পাগলা স্ট্রিট — শ্রীদুর্গামোহন দাস
ভবানীপুর, কলিকাতা — পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের জনৈক ট্রাস্টি [১২]
১৪ই জুন।
১৮৭২ সন।

(৪)

আমরা ক্রমাগত কয়েকদিন এই সমাজে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনা সমাজে যাঁহারা উপস্থিত হইয়া থাকেন, তাহাদিগের মধ্যে অল্প বয়স্ক যুবকই অধিক। অধিক বয়স্ক পক্কমতি বিবেচনাশীল ব্যক্তির সংখ্যা অল্পই। এই অবস্থার কারণানুসন্ধিৎসু হইয়া যাহা অনুমান করিলাম, এস্থলে তাহা ব্যক্ত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। আমাদিগের দৃঢ় প্রতীতি এই, উপাচার্যের অনুচিতরকমের বক্তৃতায়—এমন কি উপাসনায়ও বিরক্ত হইয়া অনেকে সমাজে যাতায়াত বন্ধ করিয়াছেন। স্পষ্ট নিষেধ আছে, উপাচার্য ধর্ম বিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের নিন্দাসূচক বক্তৃতা করিতে পারিবেন না। অথচ প্রায় সর্বদাই এই নিষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া বিশেষ বিশেষ ধর্মের এবং বিশেষ বিশেষ শ্রেণীস্থ ব্যক্তির নিন্দা করা হইয়া থাকে। উপাসনা সমাজে নিন্দা শুনিতে কাহার প্রবৃত্তি জন্মে? আমরা সকল দিবসের সকল কথা স্মরণ করিয়া রাখি নাই, সুতরাং দৃষ্টান্তস্বরূপে কোন কথা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না ;

কিন্তু যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তিনি যদি প্রকৃত অবস্থাজ্ঞ বিবেচনাশীল ও নিরপেক্ষ হন, অবশ্যই আমাদিগের উক্তির পোষকতায় সাক্ষ্য দান করিবেন। গত রবিবার যাঁহারা উপসনাসমাজে উপস্থিত ছিলেন, তাহাদিগের প্রায় সকলেই কি যারপর নাই বিরক্ত হইয়া আসেন নাই? আমরা বিশ্বাস করি, বর্তমান উপাচার্য একজন বিলক্ষণ সাধক, ধর্ম বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ অনুরাগ ও আলোচনা আছে, তাহার সচ্চরিত্রতায়ও কাহারও সংশয় নাই। কিন্তু তিনি যেভাবে উপাসনা ও বক্তৃতা করিয়া থাকেন, সাধারণ সমাজের পক্ষে তাহা অনুমোদনীয় নহে। উপাসক সাধারণের মন যাহাতে ধর্মভাবে বিগলিত, আকৃষ্ট এবং অনুরক্ত হইতে পারে, উপাচার্যের উচিত, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সাধারণ সমাজ উপাসনা ও বক্তৃতাদি করেন। কিন্তু ক্ষোভ এই আমাদিগের বর্তমান উপাচার্যের সে দিকে দৃষ্টি অতি অল্প। সেদিন প্রার্থনারত এরূপভাবের কথার উল্লেখ করা হইয়াছিল যে "ঈশ্বর অধিক বয়স্ক ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে বিশেষ ধর্মভাব প্রেরণ করুন।" ইহার কি ইহাই মর্ম উপলব্ধি হইতেছে না যে অল্পবয়স্ক উপাসকেরা আপনা হইতেই ধর্মভাবপূর্ণ, সুতরাং তাহাদিগের জন্য ধর্মভাব, প্রেরণের নিমিত্ত ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনার প্রয়োজন নাই? পক্ষান্তরে অধিক বয়স্ক ব্রাহ্মেরা সংসারাসক্তিনিবন্ধন ধর্ম বিষয়ে অনুৎসাহী-বিবিধ পাপাসক্ত, অতএব তাহাদিগকেই ধর্মপথে প্রত্যানয়ন করিবার নিমিত্ত উপাচার্যের ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনার প্রয়োজন বোধ হইয়াছে? মধ্যে মধ্যে সাধারণ সমাজে এরূপ ভাবেও বক্তৃতা করা হয় যে, "হে উপস্থিত সভ্যগণ! তোমরা পাপী, জঘন্য, দুশ্চরিত্র ও ঈশ্বরবিদ্রোহী। তোমাদিগের উচিত নিজ নিজ স্বভাব সংশোধন করিয়া ধর্ম ও ঈশ্বরপরায়ণ হও।" এতচ্ছবলে কাহার না বিরক্তি উপস্থিত হয়? যদিও উপাচার্য মহাশয়ের নিজেকে নিষ্পাপ ও ধার্মিকাগ্রগণ্য বলিয়া বিশ্বাস না থাকুক, তথাপি অন্যকে পাপী বলিয়া সম্বোধনপূর্বক উক্তরূপ বক্তৃতা দান করিলে লোকের এরূপ অর্থ গ্রহণ করা আশ্চর্যের বিষয় নয়, আমাদিগের উপাচার্য মহাশয় তাঁহার নিজের আত্মাভিন্ন সমাজাধিষ্ঠিত যাবতীয় ব্যক্তির আত্মাকেই পাপ দূষিত মনে করিয়া থাকেন। উপাচার্য মহাশয় যদি ঐ ভাবে বক্তৃতা না করিয়া "আমরা সকলেই পাপী, আমরা সকলেই অধার্মিক, অতএব আমাদিগের সকলেরই নিষ্পাপ ও ধার্মিক হওয়া কর্তব্য, এইভাবে বক্তৃতা দান করেন, তাহা হইলে আর কোন কথা হইতে পারে না। অধিকতর দুঃখের বিষয় এই, এই বিষয়টির পুনঃ পুনঃ আন্দোলন হওয়াতেও এমন কি কার্যনির্বাহক সভাকর্তৃক এতৎপ্রতিষেধক নিয়মবিধান হওয়াতেও উপাচার্য মহাশয়ের এ বিষয়ে চেতনা হইতেছে না। অনেক সময় তিনি অনেক ঘরোয়া কথাও সাধারণ সমাজে ব্যক্ত করিয়া ফেলেন। তাহা যে, অনেকের অসন্তোষকর মনে হয়, ইহা বলাবাহুল্য। পরন্তু তৎকৃত উপাসনা ও বক্তৃতাদিতে অনেক সময়ে এরূপ দ্বিরুক্তি ও বাহুল্যোক্তি থাকে এবং উহা এত দীর্ঘ হইয়া উঠে যে, সাধারণ সভ্যগণ তচ্ছ্রবণে ধৈর্যাবলম্বন করিতে পারেন না। সাধারণ সমাজ সাধারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই উপাসনা ও বক্তৃতাদি করা কর্তব্য। উপাচার্য মহাশয় এই বিষয়টি স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দোষ সংশোধন করেন, এই আমাদিগের বাসনা। উল্লিখিত ত্রুটিতে যদি ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ সভ্য বীতরাগ হইয়া উঠেন, সমাজের অকল্যাণ ভিন্ন কখনই কল্যাণ হইবে না।[১৩]

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের চতুস্ত্রিংশ সাংবাৎসরিক উৎসব :

আজি চৌত্রিশ বৎসর গত হইল ঢাকা নগরে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। যে সকল মহাত্মার প্রযত্নে ও কষ্টাতিশয্যে এই সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছিল, বিখ্যাত ডেপুটি কালেক্টর মৃত মহাত্মা বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র তাঁহাদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান। আমরা জানি, যে সময়ে ঢাকায় প্রায় সমস্ত ব্যক্তিই "ব্রহ্মসভার" ঘোরতর বিরোধী ছিলেন,—ঐ সভায় গতায়াত করিলে জাতিচ্যুত হয় বলিয়া বিশ্বাস সেই সময়ে ব্রজসুন্দর মিত্র অনেক সুখ সুবিধায় ত্যাগ স্বীকার করিয়া এবং সামাজিক জনগণের অনেক নিগ্রহ সহ্য করিয়া ঐ সভা প্রতিষ্ঠিত ও বিবিধ বিষয়ে

ব্যয় স্বীকারপূর্বক উহা জীবিত রাখিয়াছিলেন। তখন সভার নিমিত্ত স্বতন্ত্র বাটী ছিল না। নিজ আবাস ভবনের কিয়দংশও অদর্থ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। হায়! যে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপন ও পালনাদি সম্বন্ধে বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র এত করিয়া গিয়াছেন, তাহারই চতুস্ত্রিংশ সাংবাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে অধুনাতন ব্রাহ্মগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া, প্রায় সপ্তাহকাল ব্যাপিয়া বিবিধরূপে উৎসব সম্ভোগ করিয়াও সেই মহাত্মার নাম পর্যন্ত স্মরণ করেন নাই। ধর্ম সম্বন্ধীয় উৎসবে লৌকিকী প্রশংসা যদিও আমরা প্রয়োজনীয় বোধ করি না, প্রত্যুত বর্জনীয় বলিয়াই মনে করিয়া থাকি, তথাপি ধর্মসভা সংস্থাপন সম্বন্ধীয় ইতিহাস বর্ণন সময়ে যাঁহার যে প্রশংসা অবশ্য প্রাপ্য, তাহা তাঁহাকে প্রদান না করা নিতান্তই প্রত্যবায় জ্ঞান করি। বস্তুতঃ ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের উপলক্ষে তৎসংস্থাপয়িতা বাবু ব্রজসুন্দর মিত্রের কি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত বর্ণণে বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নাম পর্যন্ত উল্লেখ না করা কখনই সঙ্গত কার্য নহে। লোকে ইহাকে ঘোরতর অকৃতজ্ঞতা ভিন্ন আর কি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন? যদি বিস্মৃতি প্রযুক্তই এ দোষ সংঘটিত হইয়া থাকে, তথাপি আমরা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না যে, এরূপ বিস্মৃতিও মার্জনীয় নহে।

গতবর্ষে আমরা পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের এই উৎসবে যেরূপ জ্বলন্ত উৎসাহ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, এবার সেরূপ লক্ষিত হয় নাই। অনেকে ইহার দুইটি কারণ অনুমান করিতেছেন। এক কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংগঠনজনিত নূতন দলাদলীর নবোৎসাহ, দ্বিতীয় তখন পর্যন্ত ব্রহ্মপরায়ণ প্রকৃত উৎসাহশীল সভ্যগণের সমসংশ্রব। সময় স্রোতে এখন সেই উৎসাহ অনেকাংশে ভাসিয়া গিয়াছে ;—প্রকৃত উৎসাহশীল আগ্রহবান ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও অনেকে স্বতন্ত্র হইয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। তৎপ্রযুক্তই এখন উহার পূর্ববৎ উৎসাহ প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে না। এবার যেন উহার সভ্যদিগের প্রায় কোন বিষয়ে সেরূপ উদ্যম, উৎসাহ ও জীবন্তভাব নাই। অনেক বিষয়েই অনেকের মৃতভাব অনুমিত হইয়াছে ; পক্ষান্তরে ভারবর্ষীয়শাখা ব্রাহ্মসমাজ, (ইতঃপূর্বে যাহা উপাসকমণ্ডলী সভা নামে অভিহিত হইত) সংখ্যায় অল্পতর, অর্থ, পদ, ও ক্ষমতাদি পার্থিব বলে হীনকল্প এবং অধিকাংশ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত নিপীড়িত ও নিগৃহীত হইয়াও এই উৎসব উপলক্ষে অধিকতর উদ্যম, উৎসাহ, যত্ন ও চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা তিনদিন, কিন্তু ইহারা সাতদিন ভরিয়া এই উৎসবে উপাসনা, বক্তৃতা, সংকীর্তণ ও আলোচনাদি করিয়াছেন। ইহারাই এবার উপাসনালয়টি সুন্দরতর রূপে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন, শুদ্ধ ইহারাই বাহিরে প্রকাশ্যস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা দান, নগরসঙ্কীর্ত্তনে বহির্গমন এবং ভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারার্থ বারুনী মেলায় গমন করিয়া গীতি ও বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্মধর্মের মর্মবিস্তার করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহাদিগের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে যেমন ধর্মার্থে জীবনসমপর্ণকারীর সংখ্যাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়, অপর দলে তদ্রূপ লোকের তত আধিক্যদৃষ্টিগোচর হয় না।... বোধ হয় ধমসম্বন্ধীয় প্রায় যাবতীয় কার্যেই প্রকৃত উৎসাহের সবিশেষ তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। সংসার ও ধর্ম উভয়েই সমান মনোযোগ সহকারে সম্পাদন করা যাইতে পারে ; একদিকে ঝুঁকিলে অপরদিগে ত্রুটি সংঘটিত হয় না, আমাদিগের এরূপ বিশ্বাস নাই। অতএব আমার পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের পরিচালকগণকে নির্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করি, যাহাতে তাঁহাদিগের সমাজে প্রকৃত ধর্মার্থীর সংখ্যা বর্ধিত হইতে পারে, দৃষ্টান্ত দেখিয়া যথার্থ ধর্মসাধনা শিক্ষা করা যাইতে পারে, সর্বাগ্রে তাহারই যত্ন করুন। আমাদিগের দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, উপদেষ্টা উপাচার্য প্রভৃতিকে কুণ্ডলী মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, স্বাধীনভাবে সীমার বাহিরে বিচরণ করিতে না দিলে কখনই তাঁহারা যথার্থ কার্যসাধক ব্যক্তির সদ্ভাব দেখিতে পাইবেন না। এবং তাদৃক লোকসদ্ভাব না হইলে সমাজের প্রকৃত উন্নতি দর্শনও সুদূরপরাহত থাকিবে।[১৪]

পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণ :

২৬শে, ১২৯১ সন।

উপস্থিত সভ্যগনের নাম।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার সেন, হারাণচন্দ্র সরকার, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, রামসুন্দর বসাক, দ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীনারায়ণ গুপ্ত, উমাপ্রসাদ বিশ্বাস, শিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সতীশচন্দ্র ঘোষ, শ্যামাকান্ত নাগ, অযোধ্যানাথ চৌধুরী, সারদাচরণ ঘোষ, হরিচরণ চক্রবর্তী, মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রনাথ রায়, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, অমরচাঁদ লাহা, শ্যামাচরণ বক্সি, ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়।

যে সকল সভ্য প্রতিনিধি অথবা পত্রদ্বারা মতপ্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদিগের নাম—বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ শীল, জগদ্বন্ধু লাহা, রোহিনীকুমার বসাক, শরৎচন্দ্র গুপ্ত, কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, গোবিন্দপ্রসাদ দাস, শ্রীযুক্তা মাতঙ্গী মজুমদার, গোলাপসুন্দরী বক্সী, ভুবনমোহিনী ঘোষ।

১. বাবু অক্ষয়কুমার সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।
   ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় প্রস্তাবক, বাবু অযোধ্যানাথ চৌধুরী পোষক।
২. সভার কার্যারম্ভের পূর্বে বাবু রজনীকান্ত ঘোষ ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করেন।
৩. সভাপতির অনুরোধক্রমে সম্পাদক ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় গত বর্ষের কার্যবিবরণ ও আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব পাঠ করেন।
৪. বাবু চন্দ্রনাথ রায় প্রস্তাব করেন যে সম্পাদক কর্তৃক পঠিত কার্যবিবরণ পরিগৃহীত হউক।

(ক) বাবু হরিচরণ চক্রবর্তী প্রকাশ করেন যে, গত বর্ষের আয় ব্যয় হিসাবের সহিত ১২৮৯ সনের হিসাবও থাকা আবশ্যক। কেননা তদ্বারা উভয় সনের আয় ব্যয় তুলনা করা যাইতে পারে। অতএব তিনি প্রস্তাব করেন যে, কার্য বিবরণ মধ্যে ১২৮৯ সনের আয় ব্যয় হিসাবও সন্নিবেশিত করা হউক। সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব পরিগৃহীত হইল।

(খ) বাবু হরিচরণ চক্রবর্তী আরও প্রস্তাব করেন যে, উৎসব সমূহের বিবরণ ও তাহাতে যে বক্তৃতা ও উপদেশ হইবে তাহার সারমর্ম বর্তমান সনের কার্যবিবরণ মধ্যে সন্নিবেশিত থাকিবে। এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইল।

(গ) সম্পাদক প্রকাশ করেন যে, ১৮৭২ সনের ৩ আইন অর্থাৎ বিবাহ বিধির কোনরূপ পরিবর্তন করা আবশ্যক কিনা তাহা স্থির করিবার জন্য পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রাহ্মসাধারণের একটা সভা আহূত হয়। ঐ সভার কার্যবিবরণ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় নাই। সভার অনুমতি হইলে তাহা উক্ত রিপোর্ট মধ্যে সন্নিবেশিত করা যায়। সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদকের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(ঘ) গত বার্ষিক সাধারণ সভাব গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে বাবু অভয়চন্দ্র দাস ও রাধিকামোহন রায়ের নামে যে, সমাজ ভূমিব পাট্টা আছে তাহা পরিবর্তন করিয়া সমাজের ট্রাষ্টিগণেব নামে লিখিয়া লওয়া সম্বন্ধে কার্যনির্বাহক সভা কি করিয়াছেন তাহা সম্পাদক কার্যবিবরণে উল্লেখ করিবেন। তৎপরে কার্যবিবরণ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৫. বাবু উমাপ্রসাদ বিশ্বাসের প্রস্তাবক্রমে সভা নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন—পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের পরমহিতৈষী অন্যতম সভ্য ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক বাবু গোবিন্দপ্রসাদ রায় লোকান্তর গমন করিয়াছেন। তাঁহার জন্য পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ শোক প্রকাশ করিতেছেন।

৬. বাবু কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য বাবু কেশবচন্দ্র সেন গত বৎসর পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার জন্য পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার

নিকট হইতে ব্রাহ্মসমাজ যে উপকার লাভ করিয়াছেন, তজ্জন্য হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

৭. নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবক্রমে ও বাবু শ্যামাকান্ত নাগের পোষকতায় এই স্থিরীকৃত হইল যে, পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাধানে যে সমুদয় পুস্তক আছে তাঁহার একখণ্ড তালিকা মুদ্রিত করিয়া /০ আনা মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

৮. বাবু রজনীকান্ত ঘোষ, প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার যে, সমাজের উপাসনাকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

৯. ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়, বাবু কেদারনাথ রায়, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, গুরুপ্রসাদ ভৌমিক ও কৃষ্ণকুমার মিত্র পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ গ্রন্থাধানে পুস্তক উপহার প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

১০. কার্যনির্বাহক সভ্যগণ যে, গত বৎসর উৎসাহের সহিত কার্য করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

১১. গত বৎসরের কার্যনির্বাহক সভ্যগণ রীত্যানুসারে স্বকীয় পদ পরিত্যাগ করেন। তদনন্তর অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বর্তমান বৎসরের জন্য কার্যনির্বাহক সভ্য মনোনীত হন—

ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়, বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, জগদ্বন্ধু লাহা, অক্ষয়কুমার সেন, রজনীকান্ত ঘোষ, কালীনারায়ণ গুপ্ত, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়। [১৫]

ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক সভ্যগণের অবিচার :

পাঠকগণ অবগত আছেন বাবু কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা বিবাহোপলক্ষে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়া ২টি দল হয়। গ্রাম্যদলাদলির প্রতি শিক্ষিত সমাজ ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের কার্য পর্যালোচনা করিলে গ্রাম্য লোকদিগকে কোন মতেই অনুযোগ করা যাইতে পারে না। ব্রাহ্মদিগের প্রথমত মত লইয়া বিরোধ ছিল, এখন দেখা যায় যে, কোন মতে বিরুদ্ধপক্ষকে অপমানিত ও উৎপীড়িত করাই উদ্দেশ্য ; এতদ্বারা পবিত্র ব্রাহ্মধর্মের উদ্দেশ্য বিফলীকৃত দেখিয়া সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই ব্যথিত হইয়া থাকেন। সম্প্রতি পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক সভার ব্যবহার দর্শন করিয়া আমরা বিস্মিত এবং তদবধি দুঃখিত হইয়াছি। মতবৈষম্য নিবন্ধন বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় প্রভৃতি প্রায় ৬০ জন ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনার যোগদান না করিয়া স্বতন্ত্র সময়ে ঈশ্বরোপসনা করিবার জন্য ১২৭৯ সন সমাজের ট্রাস্টিদিগের নিকট এক আবেদন করেন। ট্রাস্টিদিগের মধ্যে যে ৯ জন মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই আবেদন করেন নাই, তবে কিনা সমাজের সভা হওয়া, সামাজিক উপাসনায় যোগ দেওয়া প্রভৃতি কয়েকটি নিয়ম পালনের জন্য কেহ কেহ অনুরোধ করেন। অপর ৩ জন ট্রাস্টি প্রথমত কোন মতামত প্রকাশ না করাতে অন্যতর একজন ট্রাস্টি বাবু দুর্গামোহন দাস, এক পত্রদ্বারা তাঁহাদিগকে জানান যে, ১৫ দিনের মধ্যে মতামত প্রকাশ না করিলে, তাঁহাদের মৌন সম্মতি বলিয়া পরিগৃহীত হইবে। নির্দিষ্ট কাল মধ্যে মত না পাওয়াতে, তাহাতে মৌন সম্মতিরূপে গ্রহণ করিয়া দুর্গামোহন বাবু ঢাকা প্রকাশে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। ইহার পর ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক সভাও উক্ত বিজ্ঞাপন প্রচারের প্রয়োজন ছিল না বলিয়া আক্ষেপ করেন। কারণ বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় প্রভৃতিকে অন্য সময়ে উপাসনার অধিকার দিতে তাঁহাদের অনভিমতি ছিল না। ট্রাস্টিদিগের সেই অনুমতি দ্বারা বঙ্গবাবু প্রভৃতি আজি বৎসর যাবৎ রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনা করিয়া আসিতেছিলেন।

বলা বাহুল্য যে, বঙ্গবাবু প্রভৃতি কয়েকজন ব্রাহ্ম কেশববাবুর পক্ষপাতী বলিয়াই অপর সাধারণ ব্রাহ্মদিগের বিদ্বেষভাজন হন। সেই বিদ্বেষ হইতে ক্রমে যেন প্রকাশ্য অত্যাচার আরম্ভ

হইয়াছে। কার্য নির্বাহক সভা নির্দয়ের ন্যায় অথচ অতি কৌশলে উল্লিখিত নিরীহ ব্রাহ্মদিগকে অধিকারে বঞ্চিত ও দূরীভূত করিয়াছেন। আমরা এতৎসম্বন্ধীয় পত্রই প্রাপ্ত হইয়াছি। পাঠকগণের বিচার করিবার সুবিধার জন্য ঐ পত্রগুলি প্রকাশার্থ দেওয়া হইল। নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই কার্য নির্বাহক সভার অনুচিত ব্যবহার স্পষ্ট দেখিয়া অশ্রুবিসর্জন করিবেন। দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা (নবকান্তবাবু, রজনীবাবু প্রভৃতি) পূর্বে উক্তরূপ অধিকার লাভের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার বিরুদ্ধ দলভুক্ত ও সবিশেষ যত্নবান হইয়া অসহায় ব্রাহ্মদিগকে দূরীকৃত করিয়াছেন। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যাঁহারা ব্যবহার শাস্ত্রের কুটজালচ্ছিন্ন করিয়া এবং মামলাকারিগণের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া সত্য উদ্ধার করেন, তাহারাও (গঙ্গাচরণবাবু ও অভয়বাবু প্রভৃতি) এই অবিচারে সম্মতি দান করিয়াছেন। বঙ্গবাবু প্রভৃতি ব্রাহ্মগণ ঈশ্বরের উপাসনাব্যতীত অন্য কোন কার্য করেন নাই, কার্যনির্বাহক সভা ব্রাহ্ম সমাজ হইতে সেই পরব্রহ্মের উপাসনা উঠাইয়া দিয়া কিরূপ সুখী হইয়াছেন, বলিতে পারি না। কার্যনির্বাহক সভার অন্যতম সভ্য ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় প্রভৃতি শিক্ষিত ব্যক্তিরা...।

পাঠকগণ! প্রকাশিত পত্রগুলি একটু কষ্ট স্বীকারপূর্বক পাঠ করিয়া দেখিবেন, তাহা হইলে এরূপ উৎপীড়নের কারণানুভব করিতে সমর্থ হইবেন। একমাত্র বিদ্বেষভিন্ন এই অসহায় সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যাচার করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। আমরা ব্রাহ্মসমাজে এরূপ গর্হিতাচরণের আশা করি নাই। ব্রহ্মের উপাসনার্থই যখন সাধারণের অর্থে মন্দির নির্মিত হইয়াছ, তখন কার্যনির্বাহক সভা কোন প্রাণে কতকগুলি উপাসককে তাড়াইয়া দিলেন? এই নিরীহ সম্প্রদায়কে আমরা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিতেছি না, তাহারাও তাহা করিবেন না; কিন্তু করিলে কার্যনির্বাহক সভাই যে অবৈধরূপে সংগঠিত হইয়াছে, আর তাঁহাদের সমস্ত কার্যাদিই যে প্রায় অবৈধরূপে চলিতেছে, তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে। বঙ্গবাবু প্রভৃতি উপাসকমণ্ডলী শেষপত্রে লিখিয়াছেন যে,

'আপনারা আমাদিগকে পূঃ বাঃ ব্রাহ্মসমাজের কার্যের বিরোধী মনে করেন। আমরা আপনাদের উপাসনা প্রণালীতে ধ্যান ও আরাধনার প্রতি অবজ্ঞার ভাব এবং সাধুনিন্দায় বলবতী স্পৃহা দেখিয়াই যোগ দিতে পারি নাই।' ফলে বঙ্গবাবু প্রভৃতি পূঃ বাঃ ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী বলিয়া তাড়িত হন নাই, কার্যনির্বাহক সভার স্বার্থের পথে কণ্টক বলিয়াই যেন তাড়িত হইয়াছেন। বঙ্গবাবু প্রভৃতির বিদায় পত্রের শেষাংশ পাঠ করিলে বোধ হয় ঈশ্বরবাদী মাত্রের হৃদয়েই আঘাত লাগিবে। অসহায় ব্রাহ্মসম্প্রদায় আন্তরিক ব্যাকুলতা এবং উদারতার সহিত পরিশেষে লিখিয়াছেন যে 'আপনারা যখন আমাদিগকে সমাজগৃহের ব্যবহার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য দৃঢ়রূপে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন—যখন সময়ে সময়ে আমাদিগকে অক্ষুব্ধচিত্তে এই অধিকার ভোগ সম্বন্ধে নানারূপ উৎপীড়িত করিয়াছেন, অবশেষে যখন উপাসনায় উপদ্রব ঘটাইতেও কুণ্ঠিত হন নাই, তখন স্বত্ব রক্ষার জন্য আপনাদের সহিত বিবাদ করা অসঙ্গত মনে করি। এজন্য পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ ব্যবহারে ক্ষান্ত রহিলাম : পরিতাপের বিষয় এই যে যাঁহারা আমাদের সঙ্গের সঙ্গী ছিলেন, যাঁহাদের মুখে মধুর দয়াল নামের ধ্বনি শুনিয়া হৃদয় আশায় পরিপূর্ণ হইত, সেই সকল ভ্রাতারাই আজি ধর্মভয় ও রাজনিয়মের ভয় অতিক্রম করিয়া আমাদের একটি স্বত্বলোপ করিলেন। আমাদের বিশ্বাস এবং দয়াল প্রভুর কৃপার উপর নির্ভর থাকিলে, গাছের তলেই হউক কি ঘরের ভিতরেই হউক একস্থানে তাঁহার নাম করিতে পারিব। দশজনের অনুগ্রহে নির্মিত একটা ঘরে সপ্তাহের মধ্যে একদিন কিছুকালের জন্য যে উপাসনা করিয়া কয়েকটি লোক একটু নিশ্চিন্ত ছিলেন, সেই সুবিধায় বিঘ্ন জন্মাইয়া বাস্তবিকই আপনারা কি আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন? সত্যই কি বিশ্বাস করেন যে কখনই এজন্য বিবেকদ্বারা তিরস্কৃত হইবেন না?

আমরা যতদূর বুঝিতেছি, তাহাতে যেন কার্যনির্বাহক সভার সভ্যগণের অবিচারে কতিপয় ব্যক্তি স্বত্বাধিকারে বঞ্চিত হইয়াছেন। ইহাকে আমরা পূঃ বাঃ ব্রাহ্ম সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ মনে করি। বিশ্বাসী ব্রহ্মের পক্ষে ইহা নিতান্তই অকর্তব্য।[১৬]

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহাশয়গণ সমীপেষু

মহাশয়গণ! পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টিগণের নিম্নলিখিত নিয়মের অধীন হইয়া কার্যনির্বাহক সভা পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় 'সভ্যকে' রবিবার দিবস প্রাতঃকালে ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনা করিবার অধিকার প্রদান করিয়া আসিতেছেন; ট্রাস্টিগণের নিয়ম মত কার্য চলিতেছে কিনা তাহা কার্যনির্বাহক সভার দেখা কর্তব্য।

প্রথম নিয়মের মর্ম এই—যাঁহারা পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের রবিবার দিবসের বৈকালিক উপাসনাতে যোগদান করিবেন তাঁহাদিগকে ভিন্ন সময়ে সমাজগৃহে উপাসনা করিবার অধিকার প্রদান করা যাইবে।

দ্বিতীয় নিয়মের মর্ম এই—যাঁহারা পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের নিয়মিত উপাসনা পদ্ধতি অনুসারে তাঁহাদের সামাজিক উপাসনা সম্পন্ন করিবেন তাঁহাদিগকে অন্য সময়ে সমাজ মন্দিরে অধিকার প্রদান করা যাইবে।

কার্যনির্বাহক সভা জানিতে পারিয়াছেন যে আপনারা এই ক্ষণ উক্ত নিয়ম পালন করিতেছেন না। বিষয়টি বিশেষরূপে অবগত হওয়া কর্তব্য। অতএব এতৎ-সম্বন্ধে আপনাদের যাহা বক্তব্য থাকে তাহা অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে শীঘ্র জানাইবেন।

ইতি
নিঃ
শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক
পূর্ব বাঃ ব্রাহ্মসমাজ

ঢাকা
পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ
কার্যালয়
১২৮৬/২৬ ফাল্গুন।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় পূঃ বাঃ ব্রাহ্মসমাজের কার্য নির্বাহক সভার সম্পাদক মহাশয় মান্যবরেষু।

মহাশয়! আপনার ২৬-এ ফাল্গুনের পত্র পাঠে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। আপনিই জানেন পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে রবিবার সন্ধ্যা সময় ব্যতীত অন্য কোন সময় আমাদের প্রণালী মতে সামাজিক উপাসনার অধিকার পাইবার জন্য... আমাদের দলের কোন ব্যক্তিকে পূঃ বাঃ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য শ্রেণীযুক্ত হইতে অনুরোধ করেন, তদনুসারে আমাদের চারিজন (তন্মধ্যে আপনিও একজন) এক পত্র দ্বারা ১৮৭২ ইং সালের সেপ্টেম্বর মাসে সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন। তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে তখনকার কার্যনির্বাহক অনুরোধ রক্ষার জন্য আমাদের জন কয়েক মাত্র সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজগৃহে রবিবার প্রাতে সামাজিক উপাসনা করিবার অধিকার গ্রহণ করেন। তদবধি দীর্ঘকাল যাবৎ আমরা রবিবার প্রাতঃকালে আমাদের প্রণালী মতে উপাসনা করিয়া আসিতেছি। বস্তুত ১২৭৭ সনের ১লা কার্তিক দিবসীয় অস্বাক্ষরিত কার্যবিবরণ মধ্যে যাহাই লেখা থাকুক না কেন, তাহা অবলম্বন

করিয়া 'ট্রাস্টিগণের নিয়ম মতে কার্য চলিতেছে কি না', এই প্রশ্ন এখন উত্থাপন করা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হয়।

ইতি
নিঃ
শ্রীকৈলাশচন্দ্র নন্দী
সম্পাদক

ঢাকা
উপাসকমণ্ডলী সভা
তারিখ ৯ চৈত্র, ১২৮৬ সন

মান্যবর শ্রীযুক্তবাবু বঙ্গচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহাশয়গণ সমীপেষু

বাবু কৈলাশচন্দ্র নন্দী আপনাদের পক্ষ হইয়া ৯ চৈত্র তারিখে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক সভার নিকট উপস্থিত করিয়াছিলাম। 'উপাসকমণ্ডলী' নামক কোন সভাকে কার্যনির্বাহক সভা স্বীকার (recognise) করেন না, অতএব উক্ত সভার সম্পাদক দ্বারা আমার পত্রের উত্তর প্রদান করা ঠিক হয় নাই। বিশেষত ট্রাস্টিগণ কিংবা কার্যনির্বাহক সভা 'উপাসকমণ্ডলী' নামক কোন সভাকে রবিবার প্রাতঃকালে ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনা করিবার অধিকার প্রদান করেন নাই। উক্ত অধিকার মাত্র কয়েকজন কয়েকটি নিয়মের অধীন করিয়া প্রদত্ত হইয়াছে।

'অস্বাক্ষরিত' কার্যবিবরণে ট্রাস্টিগণের নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া যে আপনারা তাহা মান্য করিতে বাধ্য নহেন এমত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সঙ্গত হয় নাই, কারণ উক্ত কার্যবিবরণও বস্তুত স্বাক্ষরিত। ভুলক্রমে নাম স্বাক্ষর করিবার স্থানের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইয়াছে। আপনারা কার্যবিবরণ পুস্তক পুনর্বার দর্শন করিলে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পারিবেন। যখন ১২৭৭ সনের ১ কার্তিকের কার্যনির্বাহক সভাতে বাবু অভয়চন্দ্র দাস, বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র, বাবু রূপলাল দাস, বাবু পার্বতীচরণ রায়, বাবু দীননাথ সেন, বাবু রামপ্রসাদ সেন উপস্থিত থাকিয়া ট্রাস্টিগণের নিয়ম সমুদায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তখন উক্ত বিবরণ অবিশ্বাস করার বিন্দুমাত্র কারণ দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক বিশেষ অনুসন্ধান করাতে ভিন্ন সময়ে সমাজগৃহে উপাসনা করা সম্বন্ধে ট্রাস্টিগণ যে যে নিয়ম করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের নিজ নিজ স্বাক্ষরিত কাগজে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আবশ্যক হইলে তাহাও আমার নিকট দর্শন করিতে পারেন।

ট্রাস্টিগণের নিয়ম মতে গৃহের ব্যবহার হইতেছে কিনা কার্যনির্বাহক সভা তাহা দেখিতে বাধ্য। আপনাদের পত্রে দৃষ্ট হইল যে আপনারা ট্রাস্টিগণের নিয়ম পালন করিতেছেন না, এমনত অবস্থাতে কার্য নির্বাহক সভা ট্রাস্টিগণের মত কার্য করিতে বাধ্য। যদি আপনাদের আরও কিছু বক্তব্য থাকে অতি শীঘ্র তাহা জানাইয়া বাধিত করিবেন।

নিঃ
শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক
পূর্ব বাঃ ব্রাহ্মসমাজ

ঢাকা
পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ
১২৮৬। ১৪ই চৈত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় পূঃ বাঃ ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক সভার সম্পাদক মহাশয় সমীপে।

মহাশয়

'শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় প্রভৃতি' নামীয় আপনার ১৪ চৈত্রের চিঠি প্রাপ্ত হইলাম। আপনারা

অবগত আছেন যে 'বঙ্গবাবু প্রভৃতি' আমরা কতগুলি ব্রাহ্ম পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া চিরকাল আমাদের বিশ্বাসানুসারে ব্রাহ্মধর্ম পালন করিয়া আসিতেছি। এবং আপনারা ইহাও জানেন যে, পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগকে আমাদের প্রণালী মতে ব্রাহ্মোৎসব করিতে না দেওয়ায় একবার আমরা পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। ফলে আমরা সর্বদাই স্বাধীনভাবে কার্য করিতেছি। এবং পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজও 'উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ' নাম দিয়া আমাদের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়াছেন। ফলে আমাদের কার্যের সুবিধার জন্য বহুদিন হইতে 'শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহাশয়গণকে' স্বীকার করিয়া 'উপাসকমণ্ডলী সভা' অস্বীকার করার কোন অর্থ নাই। বস্তুত এক স্বাধীন সভার পক্ষে অন্য স্বাধীন সভাকে এরূপ অস্বীকার করা সঙ্গত হয় নাই। যাহা হউক আপনারা সাধারণ রীতির প্রতি দৃষ্টি না রাখা কর্তব্য বোধ করিলেও উপাসকমণ্ডলী সভা তাহাদের বৈধরূপে নিয়োজিত সম্পাদকের নামে আপনার নিকট চিঠি না পাঠাইয়া পারে না।

যে কার্যবিবরণ অস্বাক্ষরিত লক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না বলাতে কখনও এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না যে, সে কার্য বিবরণ মধ্যে যাঁহাদের নাম উল্লিখিত আছে, তাঁহারা বিশ্বাসযোগ্য নহেন। যথাস্থানে নাম স্বাক্ষরিত নাই বলিয়া আপনি যে লিখেন তাহাও একটি সামান্য ত্রুটি নহে।...

'পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী পুস্তকের তৃতীয়ভাগের ১৫ গোচরার্থ বিজ্ঞাপিত হইল।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ প্রভৃতি ৬০ জন ব্রাহ্ম পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে একখানি আবেদনপত্র পাঠান। তাঁহার দ্বিতীয় প্রার্থনা এই —

'আমাদিগকে আমাদের প্রণালী মতে ভিন্ন একদিন সামাজিক উপাসনা কার্য সম্পাদন করিতে দিয়া, সেই নির্দিষ্ট দিবসে সমাজগৃহে অন্য কার্য নিয়মদ্বারা রহিত করা হয়।'

এই প্রার্থনার প্রতিকূলে কোন ট্রাস্টি আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। শ্রীযুক্ত বাবু রামশঙ্কর সেন, শ্রীযুক্ত রামকুমার বসু, শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ (ঘোষঘর নিবাসী) মৌনদ্বারা সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন, কেননা তাঁহাদিগের নিকট আমি দ্বিতীয়বার যে পত্র লিখি, তাহাতে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছিল যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তর না পাইলে তাঁহাদের মৌন সম্পূর্ণ সম্মতিরূপে গৃহীত হইবে। শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র এ বিষয়ে কোন মতই প্রকাশ করেন নাই। অপরাপর ট্রাস্টিগণের মত নিম্নে প্রকাশিত হইল।

'তাঁহারা' (রজনীবাবু প্রভৃতি আবেদনকারীরা) 'পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়া সামাজিক উপাসনাতে যোগ দিলে, অবশ্যই অন্য দিনের সমাজ ব্যবহার পাইতে পারিবেন।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।
শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।
শ্রীদীননাথ সেন।

'রজনীকান্ত বাবু প্রভৃতির দ্বিতীয় প্রার্থনা সম্বন্ধে আমার অভিমত এই যে তাঁহারা সাধারণ উপাসনার দিবস পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া উপাসনায় যোগ দিলে ভিন্ন প্রণালী মতে তাহাদিগকে সপ্তাহের অন্য দিবসে সমাজগৃহে উপাসনা করিতে দেওয়া সর্বথা কর্তব্য।'

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন

'উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের নিরূপিত পদ্ধতি অনুসারে যতদিন ইচ্ছা হয়, ততদিন উপাসনা করতে পারিবেন।'

শ্রীঅভয়চন্দ্র দাস।

'শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ প্রভৃতি তাহাদের প্রণালী মতে দ্বিতীয় দিবসে যে পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনা করার প্রার্থনা করিয়াছেন তাহাতে আমার সম্পূর্ণ অভিমত আছে।'

শ্রীপার্বতীচরণ রায়।

'আবেদনকারীদিগের অপর প্রার্থনা গ্রাহ্য করা কর্তব্য।'

শ্রীভগবানচন্দ্র বসু।

'আবেদন স্বাক্ষরিত ব্রাহ্মগণের দ্বিতীয় প্রস্তাবে আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।'

শ্রীরাধিকামোহন রায়।

আমার অভিমত যে সম্পূর্ণরূপে এই প্রার্থনার অনুকূল ইহা বলা বাহুল্য। উল্লিখিত মত সংগ্রহ হইতে দৃষ্ট হইবে অধিকাংশ ট্রাস্টিগণের মতানুসারে আবেদনকারীদিগের পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজগৃহে সপ্তাহের অন্যতর দিবসে উপাসনা করিবার অধিকার সাব্যস্ত হইয়াছে। অতএব এই বিজ্ঞাপন দ্বারা পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক সভাতে প্রার্থনা করা যাইতেছে যে, তাঁহারা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ প্রভৃতিকে উক্ত অধিকার প্রদান করেন।

২১ রসাপাগলা স্ট্রিট শ্রীদুর্গামোহন দাস
ভবানীপুর, কলিকাতা পূর্ববাংলা
১৪ই জুন, ১৮৭২ সন। ব্রাহ্মসমাজের জনৈক ট্রাস্টি।'

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গচন্দ্র রায়, কৈলাসচন্দ্র নন্দী, দুর্গাদাস রায় মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়গণ! আপনাদের ২৬শে চৈত্র তারিখের পত্র, পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক সভার সভ্য অভয়চন্দ্র দাস, বাবু গঙ্গাচরণ সরকার, বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বসু, ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়, বাবু রজনীকান্ত ঘোষ মহাশয়গণের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলাম, ট্রাস্টিগণ 'উপাসকমণ্ডলী' নামক সভাকে ভিন্ন দিবস পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজগৃহে উপাসনা করিবার অধিকার প্রদান করেন নাই। অতএব তাহাদের কোন আবেদন কার্যনির্বাহক সভা শুনিতে বাধ্য নহেন। ট্রাস্টিগণ পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের অতি অল্প কয়েকজন সভ্যকে ভিন্ন দিবস উপাসনা করিবার অধিকার প্রদান করেন, উক্ত অধিকার প্রাপ্ত সভ্যগণকে অধিকাংশ এইক্ষণ রবিবারের প্রাতঃকালীন উপাসনার সহিত কোন প্রকার যোগ রক্ষা করেন না। এক্ষণ কেবলমাত্র আপনারা ৩/৪ জন ব্যক্তি (পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের সভ্য) রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনা করিয়া থাকেন। অতএব আপনারা কয়েক ব্যক্তি ট্রাস্টিগণের নিয়ম পালন করিয়া ভিন্ন সময়ে উপাসনাকার্য করিতেছেন কিনা তাহাই কার্যনির্বাহক সভা দেখিতে বাধ্য। ট্রাস্টিগণ ১২৭৭ সনে যে নিয়ম করেন তাহা যে বঙ্গবাবু প্রভৃতির জন্য হইয়াছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ আছে।

যাহা হউক আপনারা জনৈক ট্রাস্টি বাবু দুর্গামোহন দাসের বিজ্ঞাপন দ্বারা ট্রাস্টিগণের মত সংগ্রহ হইতে যে সমুদায় মত দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, আপনাদিগকে 'স্বাধীনভাবে' ট্রাস্টিগণ ভিন্ন সময়ে সমাজগৃহে উপাসনা করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তাহা নিয়মাবলী পুস্তকের ১৫ নিয়ম অনুসারে ঠিক হয় নাই। কারণ উক্ত ১৫ নিয়মে স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে ট্রাস্টিগণ তাঁহাদিগের অধিকাংশের স্বাক্ষরিত পত্র স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক সভাকে স্বকীয় অভিমত জানাইবেন, একমাত্র দুর্গামোহন বাবুর বিজ্ঞাপন দ্বারা সংগৃহীত মত অনুসারে কার্যনির্বাহক সভা কার্য করিতে বাধ্য নহেন। বিশেষত ৪ জন ট্রাস্টি কোন মতামতই প্রকাশ করেন নাই, তাঁহারা একমাত্র দুর্গামোহন বাবুর বিজ্ঞাপনে কোন মত প্রকাশ করিতে বাধ্যও ছিলেন না। ...তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের রবিবার সন্ধ্যাকালীন সামাজিক উপাসনাতে যোগপ্রদান করেন, এমত সভ্যদিগকে ভিন্ন সময়ে উপাসনা করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের কার্যের বিরোধী কিংবা সভ্য নহেন এমত ব্যক্তিদিগকে উক্ত অধিকার প্রদান করা হয় নাই।

দেখা যাইতেছে যে আপনারা পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের রবিবার সন্ধ্যাকালীন সামাজিক উপাসনাতে যোগপ্রদান করেন না কিংবা যোগ দেওয়া পাপ মনে করেন। অতএব কার্যনির্বাহক

সভা ট্রাস্টিগণের নিয়মে বাধ্য হইয়া আপনাদিগকে আগামী রবিবার হইতে প্রাতঃকালে সমাজ গৃহে উপাসনা করিতে নিষেধ করিতেছেন। আপনারা কার্যনির্বাহক সভার আদেশ মতে সমাজ মন্দির ব্যবহার করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন এই আমাদিগের প্রার্থনা।

ঢাকা	নিং
৮ই বৈশাখ	শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায়
সোমবার	সম্পাদক
১২৮৭	পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় পূঃ বঃ ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্ব্বাহক সভার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়! আপনার ৮ বৈশাখের পত্র আমরা পাইলাম। ইহাতে যে সকল কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহার অনেকগুলি ঘটনার বিপরীত বলিয়া, তৎসম্বন্ধে আমরা কয়েকটি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

প্রথমত আপনারা জানিয়া শুনিয়া এবং কাগজপত্র সম্মুখে রাখিয়া কিরূপে যে ১২৭৭ সনের নিয়মমত আমাদিগকে ভিন্ন দিবস উপাসনা করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যদি বাস্তবিক আপনাদের, ব্যাখ্যানুযায়ী ঘটনা হইত, তাহা হইলে ১২৭৯ সনে ট্রাস্টিদিগের নিকট রজনীবাবু প্রভৃতি ২০ জনর আবেদন করিবার কি প্রয়োজন ছিল? ফলে ঘটনা, অন্যরূপ। দুর্গামোহনবাবুর বিজ্ঞাপন ইং ১৮৭২ সনের ২৩ জুনের ঢাকা প্রকাশে প্রকাশিত হইলে তদানীন্তন কার্যনির্বাহক সভা, সমাজ 'বিচ্ছিন্ন' হইয়া যাইবার ভয়ে বঙ্গবাবু প্রভৃতিকে সভ্য না হইলে অধিকার দিতে গোল করেন। পরে অধিকার প্রাপ্ত ৬০ জনের মধ্যে চারিজন মাত্র তাঁহাদের 'অনুরোধ' রক্ষার জন্য সভ্য হইলে তাঁহারা ঐ সনের ২০ সেপ্টেম্বর সেই অধিকার প্রদান করেন।

দ্বিতীয়ত যদিও বিশ্বাসের স্বল্পতা এবং চিত্তের চাঞ্চল্যবশত উক্ত অধিকার প্রাপ্ত ৬০ জনের অধিকাংশ বঙ্গবাবু প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তত্রাচ এই দলের অগ্রণীগণ অধিকার প্রাপ্তিকাল হইতে এ পর্যন্ত অবাধে রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনা করিয়া আসিতেছেন। এমতাবস্থাতে "সভ্যগণের অধিকাংশ" উপাসনাতে যোগদান করেন না বলিয়া আমাদের অধিকার লোপ করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

তৃতীয়ত দুর্গামোহনবাবুর বিজ্ঞাপনকে এমন অবৈধ বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে কি হইবে? ১২৭৯ সনের ১৭ আষাঢ় তারিখে কার্যনির্বাহক সভা ঐ বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে কি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে দৃষ্ট হইবে। 'পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া অর্থাৎ সমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া সমাজের নিয়ম পদ্ধতি অনুসারে রবিবার ব্যতীত অন্য দিবসে উপাসনা করিবার অধিকার দিতে আমরা পূর্বাবধিই সম্মত আছি বরং তদ্বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় প্রভৃতিকে বারংবার অনুরোধ করিয়াছি; অতএব সেই অধিকারের জন্য বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রকাশ করার কি প্রয়োজন ছিল।' ইহাতে স্পষ্ট দেখা যায় তৎকালীন কার্যনির্বাহক সভা সেই বিজ্ঞাপন মান্য করিয়াছিলেন।

চতুর্থত ১৫ সংখ্যক নিয়মের অনুযায়ী হয় নাই বলিয়া আপনারা দুর্গামোহনবাবুর বিজ্ঞাপনকে অম্লানবদনে উপেক্ষা করেন, কিন্তু ঐ নিয়মে ট্রাস্টিগণের 'অধিকাংশের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপনের' কথা উল্লিখিত নাই। বস্তুত এসম্বন্ধে বিজ্ঞাপন প্রচারের কোন প্রয়োজনই ছিল না। কেননা ট্রাস্টিগণ প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন না দিয়াও আবেদনকারীদিগকে অধিকার দিতে সক্ষম ছিলেন। কার্যনির্বাহক সভার প্রার্থনা অনুসারে যখন ১২৭৭ সনে ট্রাস্টিগণ বিজ্ঞাপন না দিয়া নিয়ম করিতে পারিলেন, তখন জনৈক ট্রাস্টির অনুরোধে ১২৭৯ সনে কেন যে তদ্রূপ করিতে

পারিবেন না তাহা সহজে বোধগম্য নহে। প্রত্যুত আপনাদের পক্ষে দুর্গামোহনবাবুর বিজ্ঞাপনকে অবৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা বড়ই আশ্চর্যজনক।

পঞ্চমত আপনারা যেভাবে দুর্গামোহনবাবুর মত সংগ্রহে অধিকাংশের মত আপনাদের পক্ষে আছে বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন তাহা ঠিক হয় না। কতকজন ভদ্রলোক ট্রাস্টিদের নিকট একটি গুরুতর বিষয়ের জন্য আবেদন করিলেন, সহযোগী একজন ট্রাস্টি অপর ট্রাস্টির নিকট তাহা পাঠাইয়া মত চাহিলেন, তাঁহাদের কয়েকজন যে নির্দিষ্ট কাল মধ্যে মত প্রকাশ না করিলে তাহাদের মৌন সম্পূর্ণ সম্মতি বলিয়া পরিগৃহীত হইবে। তাহাতেও তাঁহারা বাগ্নিস্পত্তি করিলেন না। তৎপর তাঁহাদের মৌন সম্মতি বলিয়া একখানি সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইল। তাহাতেও তাঁহারা কোন আপত্তি করিলেন না। ৮ বৎসর তাঁহাদের মৌন সম্মতিরূপে পরিগৃহীত হইয়া তদনুযায়ী কার্য চলিয়া আসিল, তথাপি কেহ (বিশেষতঃ কার্যনির্বাহক সভা) তাহার প্রতিবাদ করিলেন না। কিন্তু আজ কার্যনির্বাহক সভার বিশেষ প্রয়োজন পড়িয়াছে বলিয়া সেই মৌনের কোন অর্থই থাকিবে না।

ষষ্ঠত আপনারা যে, আমাদিগকে 'পূঃ বাঃ ব্রাহ্মসমাজের কার্যের বিরোধী' মনে করেন বলিয়া ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কতদূর বাস্তবিক তাহা আপনাদিগকে অবশেষে জ্ঞাপন করা কর্তব্য। আমরা চিরকাল সত্যের পক্ষপাতী এবং অসত্যের পরম শত্রু। তাহাতেই পৌত্তলিকতা অবিশ্বাস এবং অভক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া পূঃ বাঃ ব্রাহ্ম সমাজের সহিত মাঝে মাঝে আমাদিগকে বিরোধ করিতে হইয়াছে। আমরা আপনাদের সামাজিক উপাসনাতে যোগ দেওয়া পাপ মনে করি বলিয়া যে, আপনারা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত এই, আমাদের অনেকে অনেকদিন পর্যন্ত আপনাদের উপাসনায় যোগ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু আপনাদের বর্তমান প্রণালীতে উপাসনার... যখন সময়ে সময়ে আমাদিগকে অক্ষুব্ধচিত্তে এই অধিকার ভোগ সম্বন্ধে নানারূপে উৎপীড়িত করিয়াছেন এবং অবশেষে যখন আপনাদের কেহ গোলমাল করিয়া আমাদের উপাসনার উপদ্রব ঘটাইতেও কুণ্ঠিত হন নাই, তখন আর আমাদের স্বত্ব রক্ষার জন্য আপনাদের সহিত বিবাদ করা অসঙ্গত মনে করিতেছি। অতএব আপনার প্রার্থনানুসারে আমরা পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজগৃহ ব্যবহার করিতে ক্ষান্ত রহিলান।

মহাশয়। এখন আবার আমরা পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজগৃহ হইতে তাড়িত হইলাম। ১২৭৭ সনের ভাদ্রমাসের ঘটনাবলী এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে তাহা আমরা স্বপ্নেও জানিতাম না। তখন সমাজগৃহে আমাদের কোন স্বত্ব জন্মে নাই তখন ব্রাহ্ম নামে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, সমাজগৃহ ব্যবহারের ভারপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে এমত লোকের সংখ্যা অতি অল্পই ছিলেন। সেই তমসাচ্ছন্ন সময়ে আমাদের ন্যায় পার্থিব-সামর্থ্যরহিত ক্ষুদ্র একটি দলের সমাজে তিষ্ঠিতে না পারা বিস্ময়কর নহে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, যাঁহারা তখন আমাদের সঙ্গের সঙ্গী ছিলেন, যাঁহাদের মুখে মধুর দয়াল নামের ধ্বনি শুনিয়া আমাদের নিরাশহৃদয় আশায় পরিপূর্ণ হইত, সেই সকল ভ্রাতারাই আজি ধর্মের ভয়-রাজ নিয়মের ভয় অতিক্রম করিয়া আমাদের প্রকৃত একটা স্বত্ব লোপ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। আমাদের বিশ্বাস থাকিলে গাছের তলে হউক কি ঘরের-ভিতরে হউক একস্থানে না একস্থানে তাঁহার নাম করিতে পারিব। হয়ত গতবারের ন্যায় এবারও আবার এই গৃহেই ব্রহ্মনামের জয় ডঙ্কা বাজাইয়া সত্যের পতাকা উড্ডীন করিব। কিন্তু ধনবান ক্ষমতাধীন প্রভুর নামের ভিখারি এই কয়েকটি লোক যে, দশজনের অনুগ্রহে নির্মিত একটি ঘরে সপ্তাহের মধ্যে একদিন কিছু কালের তরে নিজেদের ভাবানুসারে উপাসনা করিবার সুযোগ পাইয়া একটুকু নিশ্চিত ছিলেন, সেই সুবিধায় বিঘ্ন জন্মাইয়া বাস্তবিকই কি আপনারা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন?

সত্য সত্যই কি আপনারা বিশ্বাস করেন, এজন্য আপনারা আপনাদের বিবেকদ্বারা কখনই তিরস্কৃত হইবেন না?

নিবেদক

উপাসকমণ্ডলীর সভ্য।
১৩ বৈশাখ। শ্রীকৈলাসচন্দ্র নন্দী
১২৮৭ সন। ঢাকা সম্পাদক

পুনশ্চ নিবেদন আপনি একস্থলে ইহাই লিখিয়াছেন, ১২৭৭ সনের নিয়ম যে বঙ্গবাবুদের জন্যই করা হইয়াছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ আছে। তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, তখন বঙ্গবাবুও কার্যনির্বাহক সভার সভ্য ছিলেন, সুতরাং বঙ্গবাবু প্রভৃতি ঐ নিয়মাধীন হইয়া পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজগৃহে স্বাধীনভাবে উপাসনা করিবার অধিকার লাভের জন্যই যে, ১২৭৯ সনে ট্রাস্টিগণের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।[১৭]

মান্যবর শ্রীযুক্ত ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়! আপনার ১৪ বৈশাখের পত্রিকায় 'জনৈক উপাসক' নাম উল্লেখে যে এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রতিবাদ করা আবশ্যকবোধে আপনার নিকট পত্র পাঠাইতেছি। অনুগ্রহপূর্বক আপনার পত্রিকা পার্শ্বে স্থানদানে বাধিত করিবেন।

যে দিবসের উপাসনা সম্বন্ধে 'জনৈক উপাসক' ডাক্তার রায়কে আক্রমণ করিয়াছেন, সেই দিবস পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহের পার্শ্বস্থ দ্বিতলগৃহে ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক সভার অধিবেশন হইবার কাল ৯ ঘটিকার সময় করিয়াছিলেন। সপ্তাহের অন্যান্য দিবসের সুবিধা না হওয়াতে উক্ত দিবস নির্দিষ্ট হইয়াছিল এবং প্রাতঃকালে বঙ্গবাবু প্রভৃতি মন্দিরে উপাসনা করিয়া কার্য শেষ হইবার সম্ভাবনা সেই সময়েই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। যখন ডাক্তার রায় মহাশয় সমাজমন্দিরের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করেন তখন আমিও তথায় উপস্থিত হই, কিন্তু সময় ৯॥. ঘটিকা। বঙ্গবাবু প্রভৃতি যখন ৬॥ কি ৭ ঘটিকার সময় উপাসনা কার্য আরম্ভ করেন তখন সেই সময় যে উপাসনা কার্য শেষ হইয়াছে ইহা অনুমান করা অন্যায় নহে। বস্তুত ডাক্তার রায় তাহাই করিয়াছিলেন। ডাক্তার রায় প্রাঙ্গন মধ্যে প্রবেশ করিয়া তথাকার মালির সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সোপান শ্রেণীর নিকট উপস্থিত হন। আমিও তৎসঙ্গে তথায় উপস্থিত হইলাম। আসিয়া টের পাইলাম বঙ্গবাবুদিগের উপাসনা শেষ হয় নাই অতএব ডাক্তার রায়কে স্বর খর্ব করিতে বলিলাম। তিনিও মৃদু স্বরে কথা বলিতে লাগিলেন। তৎপর আমি সমাজ মন্দিরের পূর্বদিগের দ্বিতলগৃহে চলিয়া গেলাম। কিন্তু পত্রপ্রেরক যে লিখিয়াছেন 'ডাক্তার রায় মহাশয় বারাণ্ডায় বেদীর পশ্চাতে চর্মপাদুকা সহকারে সগর্ব পাদবিক্ষেপ এবং এমন উচ্চৈঃস্বরে কথা বলেন যে তাহাতে উপাসনার ব্যাঘাত এবং তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শিত হয়', তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে ডাক্তার রায় মহাশয় কিরূপ গর্বিত লোক এবং উপাসনার প্রতি তাহার কিরূপ ভাব তাহা ডাক্তার রায়কে যাঁহারা জানেন তাঁহারাই অবগত আছেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিয়া অথবা গর্ব প্রকাশ করিয়া উপাসনার ব্যাঘাত করিবেন ইহা সম্ভব নহে। বিশেষত তথায় গর্বিতভাবে পদবিক্ষেপ করার যে কি প্রয়োজন তাহা কল্পনাতীত। বস্তুত আমি ডাক্তার রায় মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে প্রাঙ্গন হইতে পূর্বপার্শ্বস্থ দ্বিতলগৃহে উঠিবার পূর্বে প্রয়োজনবশত ডাক্তার রায় উত্তরের বারাণ্ডায় গমন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তদ্দারা যে বঙ্গবাবু প্রভৃতির উপাসনার ব্যাঘাত হইয়া থাকে তবে তজ্জন্য তিনি দুঃখিত আছেন।

ডাক্তার রায় মহাশয় কি কার্যনির্বাহক সভার অপর সভ্যগণ বঙ্গবাবু প্রভৃতির উপাসনার

ব্যাঘাত জন্মাইবার জন্য সমাজগৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন না। পত্রপ্রেরকের তাহাদের প্রতি এইরূপ নিচভাবে আরোপ করা বাতুলতা মাত্র।

শ্রীরজনীকান্ত ঘোষ [১৮]

ঢাকা
১৯এ বৈশাখ, ১২৮৭।

উপাসকমণ্ডলীর ও পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক সভার পত্র
মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহাশয়গণ সমীপেষু—

মহাশয়গণ!

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাশচন্দ্র নন্দী সাক্ষরিত আপনাদিগের ১৩ বৈশাখের পত্র পাইলাম। আপনাদের প্রতি আমরা অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি এবং আমাদিগের দ্বারা আপনারা তাড়িত হইয়াছেন বলিয়া যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। আপনাদিগকে তাড়ানে আমাদিগের ইচ্ছা নাই এবং কার্যত তাহা করা হয় নাই।

আপনারা পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজে বৈকালিক উপাসনাতে যোগদান করিয়া উক্ত সমাজের পদ্ধতি অনুসারে, ট্রাস্টিদিগের ১২৭৯ সনের নিয়মানুসারে, ভিন্ন দিবস মন্দিরে উপাসনা করিতে প্রাপ্ত হন। আপনাদের ১২৭৯ সনের আবেদনে দৃষ্ট হয় যে আপনারা নিজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করিবার জন্য ট্রাস্টিদিগের নিকট প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনা সম্বন্ধে নয়জন ট্রাস্টির মত দুর্গামোহনবাবু প্রকাশ করেন। অবশিষ্ট ৪ জন কোন মতামত প্রকাশ করেন না। অতএব মৌনাবলম্বী ট্রাস্টিদিগের পূর্বমত অব্যাহত রহিল। সুতরাং ১২৭৭ সনে স্থিরীকৃত ট্রাস্টিদিগের উভয় নিয়মই বলবৎ রহিয়াছে। আপনারা এই দুইটি নিয়ম পালন করিয়া রবিবার প্রাতঃকালে ব্রাহ্মমন্দিরে স্বচ্ছন্দে উপাসনা কার্য সম্পন্ন করিবেন।

১২৮৭। ২৬ বৈশাখ।
বশংবদ - শ্রীঅভয়চন্দ্র দাশ সভাপতি।
শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক
পূর্বঃ বাঃ ব্রাহ্মসমাজ

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু অভয়চন্দ্র দাস পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়গণ!

আপনাদের ২৬ বৈশাখের পত্র পাইলাম। তাহাতে লিখিত হইয়াছে, 'আপনাদিগকে তাড়ানে আমাদের ইচ্ছা নাই এবং কার্যত তাহা করা হয় নাই।' কি আপনাদের ৮ বৈশাখের পত্রে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে 'কার্যনির্বাহক সভা আপনাদিগকে আগামী রবিবার হইতে প্রাতঃকালে সমাজগৃহে উপাসনা করিতে নিষেধ করিতেছেন। আপনারা কার্যনির্বাহক সভার আদেশমতে সমাজ মন্দির ব্যবহার করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন ...।' এই দুই কথার কিরূপ সামঞ্জস্য আছে তাহা দেখিবেন। অন্যায়রূপে আমাদিগকে তাড়াইয়াছেন বলাতে যে আপনারা 'দুঃখিত' হইয়াছেন, লিখেন, ইহারও অর্থ আমরা কিছু বুঝিতেছি না। কেননা আপনারা কি অস্বীকার করিতে পারেন যে, কার্যনির্বাহক সভা আমাদিগের প্রতি নিম্নলিখিত অন্যায় ব্যবহার করেন নাই?

১. আমাদের উপাসকমণ্ডলীর সভাকে অস্বীকারপূর্বক সম্পাদকের নামে চিঠি না লিখা।
২. ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া আমাদিগকে নির্যাতন করা।

৩. সময়ে সময়ে আমাদিগের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া, রবিবার প্রাতঃকালে সমাজগৃহ ব্যবহারপূর্বক আমাদের নিয়মিত উপাসনার ব্যাঘাত করা।

৪. ইদানীং পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজগৃহে আমাদিগকে বক্তৃতাদি করিতে অবৈধরূপে নিষেধ করা এবং বক্তৃতাদি প্রদান করিতে অনুমতি দিলেও কি বিষয়ের বক্তৃতা হইবে পূর্বেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার তত্ত্ব লওয়া এবং আলোকাদির ব্যয় গ্রহণ করা, অথচ আমাদের নিন্দাসূচক বক্তৃতা অবাধে হইতে দেওয়া।

৫. ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষপাতী বলিয়া, সূতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের ছিদ্রান্বেষণ করা অথচ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষপাতী লোকদিগকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে দেওয়া।

৬. পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজগৃহ ব্যবহার সম্বন্ধে গুরুতর নিয়ম সকল ভঙ্গ, এমন কি ব্রাহ্মধর্মের মূল বিশ্বাসকে আঘাত করিয়া, আমাদের রবিবার প্রাতঃকালের উপাসনা নিয়ম মতে হইতেছে না বলিয়া আমাদিগকে তাড়ানোর উপায় উদ্ভাবন করা।

৭. আমাদের চিঠিগুলিতে যে সকল গুরুতর কথার উল্লেখ হইয়াছে তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করা।

৮. পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের 'নির্ধারিত উপাসনা পদ্ধতির' কথা উল্লেখ করিয়া আমাদের উপাসনার উপর বৃথা দোষারোপ করা, অথবা পূর্ববাংলা, ব্রাহ্ম সমাজের সামাজিক উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে করিতে দেওয়া।

৯. রবিবার প্রাতঃকালে কার্যনির্বাহক সভা আহ্বান এবং নানারূপ গোলযোগ করিয়া আমাদের উপাসনার ব্যাঘাত জন্মান।

১০. অবশেষে অনর্থক আমাদিগকে পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের শত্রু... করতঃ আমাদের স্বত্ব লোপ করা।

১১. কার্যনির্বাহক সভাই আমাদের প্রতি এরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন এমন নহে, ব্যক্তিগতভাবে সভার... সভ্য আমাদের প্রতি আরও কত গুরুতর অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, এস্থলে তাহা উল্লেখ করিতে চাই না। সে সকল আপনারা অনবগত নহেন।

১২. আপনারা পূর্বপত্রে শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের সংগৃহীত ট্রাস্টিদিগের মত নিয়ম সঙ্গত বলিয়াই গ্রহণ করিতে চান নাই। অথচ শেষ পত্রে ট্রাস্টিদিগের নিকট আমাদের প্রার্থনার উল্লেখপূর্বক ৪ জন ট্রাস্টি কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই বলিয়া তাঁহাদিগের পূর্বমত অব্যাহত রাখিয়া আমাদিগকে পুনরায় ১২৭৬ সনের স্থিরকৃত নিয়মের অধীন হইয়া স্বচ্ছন্দে উপাসনাকার্য সম্পন্ন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইহাও আমাদের প্রতি অন্যায় আচরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেননা আমরা আমাদের পূর্ব পত্রে যথোচিতরূপে আপনাদের এই যুক্তি খণ্ডন করিয়াছি। আমরা পুনরায় বলিতেছি শ্রীযুক্ত দুর্গামোহনবাবু যে নয়জন ট্রাস্টির লিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই আমাদের পক্ষে। কারণ ৩ জন আমাদিগকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া রবিবার বৈকালিক উপাসনাতে যোগদান করিতে, একজন ট্রাস্টি কেবল উপাসনায় যোগদান করিতে এবং আর একজন মাত্র পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করিতে আদেশ করিয়া প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন এবং পাঁচজন ট্রাস্টি কোন নিয়মাধীন না করিয়া আমাদিগকে অধিকার প্রদান করেন। ৩ জন ট্রাস্টি মত প্রকাশ করেন না বটে কিন্তু দুর্গামোহনবাবু তাঁহাদের মৌন সম্পূর্ণ সম্মতিরূপে গৃহীত হইবে বলিয়া তাঁহাদের নিকট চিঠি লিখিতে এবং তাহাদের মৌনকে সম্পূর্ণ সম্মতি বলিয়া গ্রহণ পূর্বক ঢাকা প্রকাশে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করাতেও তাঁহারা তৎসম্বন্ধে কোন অমত প্রকাশ করেন নাই। এমতাবস্থায় মৌনাবলম্বী ট্রাস্টিদিগের পূর্ব মত আমাদের সম্বন্ধে কিরূপে খাটিতে পারে?

অবশেষে বক্তব্য এই যে কার্য নির্বাহক সভা অত্যন্ত অবৈধরূপে পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজকে

কার্যত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধীন করিয়া তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং ইহার পূর্বঘোষিত নিরপেক্ষভাবে লোপ করিয়াছেন।

উপসংহারকালে আপনাদের নিকট আমাদের এই বিনীত নিবেদন, আপনারা তো নিয়মের নাম লইয়া আমাদের সহিত এত পীড়াপীড়ি করিলেন, এইক্ষণ প্রকৃত পক্ষে নিয়ম পালনের দিকে দৃষ্টি করিয়া যাহাতে সমাজে পৌত্তলিকতা, সংশয় ও নাস্তিকতার প্রভুত্ব না থাকিতে পারে, তৎপ্রতি একটুকু মনোযোগ বিধান করুন।

শ্রী কৈলাসচন্দ্র নন্দী
উপাসকমণ্ডলী সভার সম্পাদক [১৯]

ঢাকাস্থ উপাসকমণ্ডলী সভার প্রতি পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজের অনুচিত ব্যবহার :

পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক সভা এবং উপাসকমণ্ডলী সভার মধ্যে যেসকল পত্র পরিচালনা হয়, তাহার কতকগুলি আমরা ২১ বৈশাখের ও ২১ আষাঢ়ের ঢাকা প্রকাশে প্রকাশ করিয়াছি। তর্কিত বিষয়টির বিবেচনায়ই আমরা তজ্জন্য ঢাকা প্রকাশের অনেকটা স্থান ব্যয় করিতে অসম্মত হই নাই। উভয়পক্ষের পত্রগুলি পাঠ করিয়া অনেকেই বোধহয় এই বিবাদের যথার্থ মর্ম অবগত হইতে পারিয়াছেন। সুতরাং এতৎ সম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশ করা অকর্তব্য নহে।

বিগত ১২৭৯ সন হইতে শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় প্রভৃতি কয়েকটি বিশ্বাসী ব্রাহ্ম (যাঁহারা ইদানীং উপাসকমণ্ডলী সভা নামে সাধারণের নিকট পরিচিত) ট্রাস্টিগণের... রবিবার প্রাতঃকালে... পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনা করিয়া আসিতেছিলেন। বর্তমান কার্যনির্বাহক সভা ১২৭৭ সনের এক নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তর্ক এই, কার্যনির্বাহক সভার মতে উপাসকমণ্ডলী যখন ১২৭৭ সনের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া সামাজিক উপাসনায় যোগদান ও সমাজের উপাসনা পদ্ধতির অনুসরণ করেন না, তখন তাঁহারা ভিন্ন দিবসে উপাসনা করিবার অধিকার পাইতে পারেন না। উপাসকমণ্ডলীর মত এই, তাহারা যখন ৭৯ সনে ট্রাস্টিগণ হইতে স্বাধীনভাবে উপাসনা করিবার অধিকার পাইয়াছেন, তখন আর ৭৭ সনের নিয়মে আবদ্ধ হইতে পারেন না। এই দুই মতের কোনটি ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত, তাহা অবধারণ করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য।

কার্যনির্বাহক সভা যদি ৭৯ সনের নিয়মটি স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে এ বিষয়ের মীমাংসা করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইত। কিন্তু নিম্নলিখিত তিনটি কারণে তাঁহারা তাহা অগ্রাহ্য করেন।

১ম, বাবু দুর্গামোহন দাসের বিজ্ঞাপন ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী পুস্তকের ১৫ সংখ্যক নিয়মের অনুযায়ী হয় নাই বলিয়া।

২য়, দুর্গামোহন বাবুর মত সংগ্রহে অধিকাংশের মত আবেদনকারীদের বিপক্ষে দৃষ্ট হয় বলিয়া।

৩য়, মত সংগ্রহে অধিকাংশের মত উপাসকমণ্ডলীর পক্ষে আছে বলিয়া স্বীকার করিলেও, তাহাতে যখন উপাসনায় যোগ দেওয়া রহিত না করিয়া একমাত্র পদ্ধতি পরিবর্তনের অনুমতি রহিয়াছে তখন উপাসনায় যোগ না দিলে উপাসকমণ্ডলী কখনও ৭৯ সনের প্রদত্ত অধিকার পাইতে পারেন না বলিয়া।

এই তিনটি আপত্তির মধ্যে উপরিউল্লিখিত দুইটির কোন সারবত্তা আছে বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না। এতৎসম্বন্ধে উপাসকমণ্ডলীর সম্পাদক, তাঁহার দ্বিতীয় পত্রে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই আমাদের বাক্য সপ্রমাণ হইবে। ফলে ১৫ দফার উল্লিখিত বিজ্ঞাপন বাস্তবিকই স্বতন্ত্র বিষয়ের জন্য কোন নূতন নিয়ম বিষয়ে

নহে। মত সংগ্রহে মৌনাবলম্বী তিনজন ট্রাস্টিকে বাদ দিয়া কার্যনির্বাহক সভা তাঁহাদের পক্ষে অধিকাংশের মত আছে বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা সফল হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ ইহা কে না স্বীকার করিবেন যে দুর্গামোহনবাবুর দ্বিতীয়পত্র ও ঢাকা প্রকাশের বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে আপত্তি না করাতে আইন ও ধর্মবিচারে ট্রাস্টিদের মৌন সম্মতিরূপেই পরিগৃহীত। আমাদের বিবেচনায় তৃতীয় আপত্তিটিরও কোন মূল্য নাই। কিন্তু ইহার অসারতাপ্রদর্শন করিবার জন্য একটুকু প্রয়াস স্বীকার করিতে হইবে। কার্যনির্বাহক সভার পক্ষে আপত্তি এই ৭৭ সনের নিয়মে (১) সাধারণ উপাসনায় যোগ না দিলে এবং (২) সমাজের পদ্ধতির অনুসরণ না করিলে ভিন্ন সময়ে কাহাকেও গৃহে উপাসনা করিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া লিখিত হইয়াছে; আর ৭৯ সনের নিয়ম দ্বারা কেবল একটি শর্ত (পদ্ধতি অনুসরণ শর্ত) মাত্র রহিত হইয়াছে। সুতরাং উপাসকমণ্ডলী সাধারণ উপাসনায় যোগ না দিলে (অর্থাৎ দ্বিতীয় শর্তটি পালন না করিলে) কিরূপে স্বতন্ত্র সময়ে উপাসনা করিবার অধিকার পাইতে পারেন?

কার্যনির্বাহকসভা ১২৭৯ সনের নিয়মের কথা অনবগত ছিলেন, সে পর্যন্ত তাঁহারা ৭৭ সনের নিয়মের দ্বারা স্বতন্ত্র দিনে উপাসনা করিবার 'অধিকার মাত্র কয়েকজন সভ্যকে কয়েকটি নিয়মের অধীন করিয়া প্রদত্ত হইয়াছে' এই কথা বিশেষ জোরের সহিত...। কিন্তু যেই ৭৯ সনের নিয়ম দেখা হইল, অমনি তাহারা বলিলেন, 'ট্রাস্টিগণ ১২৭৭ সনে যে নিয়ম করেন, তাহা যে বঙ্গবাবু প্রভৃতির জন্য হইয়াছিল তাহার বিশেষ প্রমাণ আছে।' কারণ এরূপ বলিলে উপাসকমণ্ডলী সভার কেহ যদি ভিন্ন সময়ে সমাজগৃহে উপাসনা করিতে চান, তন্নিমিত্ত সাধারণ 'উপাসনায় যোগ দেওয়া' ও 'পদ্ধতি অনুসরণ করার' আপত্তির সহিত 'সভ্য হওয়ার' আর একটি আপত্তিও হইল। সুতরাং বঙ্গবাবু প্রভৃতির সমাজে স্থান পাওয়ার বিষয়টি অপেক্ষাকৃত অধিক কঠিন হইয়া পড়িল। ৭৯ সনের নিয়ম দেখাইলে পর ৭৭ সনের নিয়ম উপাসকমণ্ডলীর জন্য বলার উদ্দেশ্য এই যে, তাহা হইলে উপাসকমণ্ডলীকে 'উপাসনায় যোগ' দেওয়ার নিয়মে বাধ্য করা যায়। কারণ উপরে দেখান গিয়াছে যে, ৭৯ সনের নিয়ম দ্বারা কেবল 'পদ্ধতি' রহিত হইয়াছে। উপাসনায় যোগ দেওয়ার কথা রহিত হয় নাই। এই আপত্তিটি কৌশলপূর্ণ হইলেও ইহা ঘটনা এবং যুক্তিমূলক নহে। ৭৭ সনের নিয়মে যে উপাসকমণ্ডলীর জন্য নয়, তাহা সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র নন্দী তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রে বিলক্ষণরূপে দেখাইয়াছেন। তৎপাঠে যাঁহাদের সংশয়াপনোদিত হয় নাই তাঁহাদের জন্য আর একটি প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতেছে —

ট্রাস্টিগণ ১২৭৭ সনে যে কয়েকটি নিয়ম করেন ১ম ও ৫ম নিয়ম এই :—

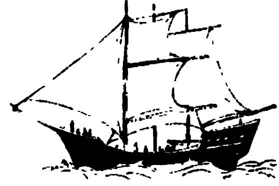
'১ম। পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনা রবিবার সন্ধ্যার সময় হইয়া থাকে। যদি কতকলোক সেই উপাসনাতে যোগ দিযা তদন্তর অন্য সময় ঐ গৃহে নিয়মিত পদ্ধতি অনুসারে সামাজিক উপাসনা করিতে চান, তবে তাহারা তাহা করিতে পারিবেন।'

'৫ম। ঢাকায় যে, সঙ্গতসভাতে কয়েকটি যুবক ব্রাহ্ম ধর্ম-বিষয়ক আলোচনা ও উপাসনা সংকীর্তনাদি করিয়া থাকেন, তাহা সমাজগৃহে হইতে পারিবে না।

এই 'সঙ্গতসভা' যে বঙ্গবাবুর দলস্থ লোকের সভা, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। সুতরাং ৫ম নিয়ম দ্বারা যখন স্পষ্টাক্ষরে বঙ্গবাবু প্রভৃতিকে সমাজগৃহের উপাসনাদি করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, তখন ১ম নিয়মটি যে তাঁহাদের জন্য হয় নাই, তাঁহাতেও আর বিন্দুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। ফলেও যাঁহারা পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, ১২৭৭ সন পর্যন্ত সমাজের কর্মকর্তৃগণ বঙ্গবাবু প্রভৃতিকে সমাজে কোন প্রকার অধিকার প্রদান করেন নাই। অনেক চেষ্টার পর ৭৯ সনে তাঁহারা রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনা করিবার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হন। বলপূর্বক এক্ষণ এই অধিকারটুকু কাড়িয়া লওয়া

কার্যনির্বাহক সভার পক্ষে কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই তাহা বুঝিতে পারিবেন। কার্যনির্বাহক সভা এজন্য অনুতপ্ত হইয়াছেন কিনা বলিতে পারি না। যে গৃহ ঈশ্বরের উপাসনার নিমিত্তই নির্মিত হইয়াছে, সে গৃহে কতিপয় ব্যক্তিকে সেই ঈশ্বরের উপাসনা করিতে দিলে কি ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল এবং তাহা রহিত করিয়াই বা কি গৌরব লাভ হইয়াছে তাহাও আমরা বুদ্ধিস্থ করিতে সক্ষম নহি। আমাদিগের বিবেচনায় কার্যনির্বাহক সভার এক্ষণ নির্বেদ সহকারে স্বদোষ স্বীকার করিয়া সমাজগৃহে উপাসকমণ্ডলীকে পূর্ববৎ উপাসনা করিতে স্থান দেওয়াই কর্তব্য।[২০]

১. ঢাকা প্রকাশ ৮ এপ্রিল ১৮৬৬
২. ঢাকা প্রকাশ ১৯ আগষ্ট ১৮৬৬
৩. সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত। পৃঃ ৫০৪-৫০৭
৪. ঢাকা প্রকাশ ২৩ জানুয়ারি ১৮৭৩
৫. ঢাকা প্রকাশ ২৮ মার্চ ১৮৬৯
৬. ঢাকা প্রকাশ ৪ এপ্রিল ১৮৬৯
৭. ঢাকা প্রকাশ ৫ ডিসেম্বর ১৮৬৯
৮. ঢাকা প্রকাশ ১২ ডিসেম্বর ১৮৬৯
৯. ঢাকা প্রকাশ ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭০
১০. ঢাকা প্রকাশ ৭ মে ১৮৭০
১১. ঢাকা প্রকাশ ১১ ডিসেম্বর ১৮৭০
১২. ঢাকা প্রকাশ ২৩ জুন ১৮৭২
১৩. ঢাকা প্রকাশ ১৫ আগস্ট ১৮৭৫
১৪. ঢাকা প্রকাশ ১২ ডিসেম্বর ১৮৮০
১৫. ঢাকা প্রকাশ ৩১ আগস্ট ১৮৮৪
১৬. ঢাকা প্রকাশ ২ মে ১৮৮০
১৭. ঢাকা প্রকাশ ২ মে ১৮৮০
১৮. ঢাকা প্রকাশ ৯ মে ১৮৮০
১৯. ঢাকা প্রকাশ ৪ জুলাই ১৯৮০
২০. ঢাকা প্রকাশ ১১ জুলাই ১৮৮০



৪. শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য

[বর্তমান সংস্করণ ৬২২-৬২৯ পৃঃ দেখুন]

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার শিল্পবিকাশ সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা অস্পষ্ট। একদা 'মসলিনে'র জন্য বিখ্যাত এই জেলা আজ পরিণত হয়েছে এক আধুনিক শিল্পনগরীতে। তাঁতবস্ত্র সাধারণ এবং সূক্ষ্ম তো আছেই, তাছাড়া আধুনিক শিল্প বিকাশ ঘটছে ব্যাপকভাবে। ঢাকা নদী নির্ভর আজও। যে কারণে প্রাচীনকাল থেকেই নৌকা তৈরির ধারা রয়েছে অব্যাহত। বড় শিল্পগুলির মধ্যে আছে টেক্সটাইল ও হোসিয়ারি মিল, পাটকল, টেনারি, জুতার কারখানা, ম্যাচ ফ্যাক্টরি, গ্লাস ফ্যাক্টরি, তেলকল, স্টিল, রি-রোলিং মিল, পেপার মিল, চিংড়ি-মাছ-ফল-সব্জি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, পানীয়, বেকারি, চিনিকল, চা, সিরামিক—এরকম বহু শিল্প বিকশিত হয়েছে দেশভাগ ও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে। কিছু শিল্পদ্রব্য হারিয়েও গেছে, যা আঞ্চলিক স্বাতন্ত্রে চিহ্নিত ছিল। সুগন্ধি দ্রব্য, শঙ্খ শিল্প, শিং শিল্প, স্বর্ণালঙ্কার তৈরি ক্ষেত্রে ঢাকার কারিগর ও শিল্পীদের সুনাম ছিল।

"ঢাকার আতর ব্যবসায়ী বা আতর ফেরাশানরা আতর তৈরির কাজে নিয়োজিত ছিল। বিশেষ করে আগার নাগেশ্বর ও কেওড়া তৈরিতে এরা সিদ্ধহস্ত ছিল। ঢাকার বংশীবাজার রাস্তার দুইপাশে তাদের আবাসস্থল ছিল। ঢাকা শহরের যত্রতত্র বহু রাজকীয় বাগান ছড়িয়ে ছিল এবং সে বাগানে রং-বেরং-এর অসংখ্য ফুল পাওয়া যেত। সম্রাট শাজাহানের ২০তম শাসনবর্ষে ঢাকায় তৈরি এক বোতল আগরবাতি সুগন্ধি তুরস্কের সুলতানের জন্য পাঠান হয়েছিল। মোগলদের পতনের পর বাগানের সংখ্যা কমতে লাগল এবং ফুলেরও অভাব দেখা দিল। তখন আমদানীকৃত ইউরোপীয় সুগন্ধির বহুল ব্যবহার শুরু হল। ফলে এ দেশীয় আতর শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হল এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তা আর গড়ে ওঠেনি। কিন্তু, সুগন্ধি আগরবাতি ও সুগন্ধি কেশ তেল এখনো তৈরি হয়।"[১]

এরকম আর একটি ছিল শিং শিল্প। আমলিগোলা, নবাবগঞ্জ অঞ্চলের মুসলমান শিল্পীরা পারিবারিকভাবে জড়িত ছিল এই শিল্পে। চিরুনি, বোতাম এবং বিবিধ শিল্পদ্রব্য তারা তৈরি করত। সুলভমূল্যের দ্রব্যাদি বাজার দখল করায়, এইসব শিল্পী পেশাচ্যুত হয়ে পড়ে। ঢাকার শাঁখারিদের খ্যাতি ছিল অবিভক্ত ভারতের সর্বত্র। দেশভাগের পর ব্যাপক সংখ্যাক হিন্দু দেশ ত্যাগ করায় প্রথমদিকে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলেও, বর্তমানে আবার সজীবতা লাভ করেছে। একসময়ে ঢাকার শাখারিপট্টিতেই ছিল তাদের বসবাস। কেবল শাঁখা নয়, শঙ্খ এবং শঙ্খের দ্রব্যাদি তারা তৈরি করত। বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয় শাঁখা ও শঙ্খ আজও রপ্তানি হয় এখান থেকে। ঢাকার স্বর্ণালঙ্কারের সুনাম ছিল। ঢাকা গেজেটিয়ারে উল্লেখ আছে বসাক সম্প্রদায়ে যে সব হিন্দু মসলিন তৈরিতে সুদক্ষ ছিল, তারা বাস করত তাঁতিবাজার ও নবাবপুরে। মসলিনের বাজার পড়ে যাওয়ার পর এই বসাকরাই পেশা হিসেবে সোনা ও রূপোর কাজ শুরু করে। তাদের নিখুঁত ও নিপুণ শিল্পজ্ঞান অলঙ্কার শিল্পকে মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলে। দেশভাগের পর এই শিল্পটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, এই শিল্পের জড়িতরা অনেকেই ভারতে চলে যায়। কিন্তু যারা থেকে যায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তারাই ব্যবসা ধরে রাখে। পরে অনেক কারিগর ভারত থেকে ফিরে এসে, পূর্ব পেশাতেই যোগ দেয়।

ঢাকায় রূপার তারের কাজ (ফিলিগ্রি), শঙ্খ-শিল্প ও ঝিনুকের বোতাম, মাথার ফুল, ঘড়ির চেন প্রভৃতির খ্যাতি আছে। শাঁখের কাজের জন্য মাদ্রাজ, বোম্বাই, সিংহল, মলয়দ্বীপ থেকে বিপুল পরিমাণে সামুদ্রিক শঙ্খ আনতে হয় ; তিনকৌড়ী, পটি, জাহাজী, ধলা, বাড়বাকি, সুরতি ও আলাটিলা এই কয় প্রকার শঙ্খ উৎকৃষ্ট। প্রতি বৎসর প্রায় লক্ষ টাকার শঙ্খ আমদানি হয় ও পাঁচ লক্ষ টাকার কারুকার্যখচিত শাখা, চুড়ি, বালা, মালা, কানের ফুল, আংটি, বোতাম, ঘড়ির চেন প্রভৃতি ভারতের নানা স্থানে রপ্তানি হয়ে থাকে।

ঢাকার অমৃতি, মালাই, পনীর ও নারানখাদা ও বাকরখানি রুটির খ্যাতি এখনও অম্লান।

নদীবহুল হওয়ায়, ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলে নানাপ্রকারের নৌকা দেখা যায়। যেমন—কোষা, বজরা, ভাওয়ালী, ছান্দী, ছিপ, নাওধুবী, সারেঙ্গা, কুমারিয়া, পলওয়ার ডিঙ্গী, পানসী প্রভৃতি।

শিল্প কেন্দ্র হিসাবে ঢাকার খ্যাতি সুপ্রাচীন। বিশেষ করে বস্ত্রশিল্প। 'মসলিন' একদা ছিল জেলার অন্যতম সম্পদ। মোঘল রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় মসলিনের খ্যাতি ছড়িয়ে যায় ভারতের বাইরেও। বর্তমানে সংকলনে যতীন্দ্রমোহন রায় এবং কেদারনাথ মজুমদারের বিবরণে মসলিনের বিস্তৃত আলোচনা আছে। তাছাড়া স্বরূপচন্দ্র রায়ের সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত "সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস" (দে'জ পাবলিশিং প্রকাশিত) গ্রন্থেও মসলিন সম্পর্কে বহু তথ্য সংযোজিত হয়েছে। সে কারণে স্বতন্ত্রভাবে মসলিনের উল্লেখ এখানে করা হল না। "ঢাকার বস্ত্রশিল্প অতি পুরাতন। প্লিনির লেখা হইতে জানা যায় প্রাচীন রোমের মেয়েরা ঢাকার সূক্ষ্ম মসলিনের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এরিয়ানের 'পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ন সী' নামক গ্রন্থেও মসলিনের উল্লেখ আছে। ঢাকা, সোনারগাঁও, ডেমরা, তিতর্দি প্রভৃতি স্থানে সূক্ষ্মতম মসলিন প্রস্তুত হইত। বর্ষাকালই মসলিন বুনিবার প্রশস্ত সময় ছিল। মসলিন নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত হয় যে, মাদ্রাজ প্রদেশের মসলিপত্তন বন্দর হইতে ইউরোপীয় বণিকগণ এই বস্ত্র কিনিয়া লইয়া যাইতেন এবং মসলিপত্তন হইতে মসলিন নামের উৎপত্তি। অপর মতে তুরস্ক প্রভৃতি দেশে প্রাচীন কাল হইতে এই বস্ত্র রপ্তানি হইত। কিন্তু পরে পর্তুগিজ জলদস্যুগণের অত্যাচারে বা এরূপ কোনও কারণে এই ব্যবসায় প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। তখন তুরস্কের মোসল্ নগরীতে এই বস্ত্র প্রস্তুতের চেষ্টা হয় এবং তথাকার সূক্ষ্ম বস্ত্র মসলিন নামে পরিচিত হয়।

"ঢাকার বস্ত্রশিল্প এক সময়ের জগদ্বিখ্যাত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঢাকার সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র ইউরোপের সর্বত্র রপ্তানি হইত। ভ্রমণকারী ট্রাভার্নিয়ার লিখিয়াছেন —ইরানের দূত মহম্মদ আলি বেগ ভারতবর্ষ হইতে প্রতিগমনকালে শাহকে উপহার দিবার জন্য ৬০ হাত দীর্ঘ একখানা মসলিন একটি অতিক্ষুদ্র নারিকেল খোলের ভিতর করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এক গজ প্রস্থ ২০ হাত লম্বা একখানা জড়াইয়া একটি অঙ্গুরীয়কের ছিদ্র দ্বারা এদিকে-ওদিকে নেওয়া যাইত। এইরূপ ৩০ হাত দীর্ঘ ২ হাত প্রস্থ একখণ্ড মসলিন ওজনে ৪/৫ তোলা হইত এবং তাহা ৪০০-৫০০ টাকায় বিক্রয় হইত। কথিত আছে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের এক কন্যা সাত ফের দিয়া আবরোয়ান মসলিন পরিধান করিয়া পিতৃসমক্ষে উপস্থিত হইলে নির্লজ্জা বলিয়া ভৎর্সিতা হন। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দেও মসলিন প্রস্তুতের এক পাউন্ড ওজনের এক ফেটি সূতা মাপিয়া লম্বায় ২৫০ মাইল হইয়াছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা পত্নী নূরজাহান বেগম ঢাকাই মসলিনের প্রভূত আদর করিতেন। সম্রাট শাহজাহান এবং আওরঙ্গজেব ঢাকাই মসলিন দিল্লির অন্তঃপুরে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করেন এবং যাহাতে মসলিন ভারতবর্ষ হইতে বাহিরে যাইতে না পারে, সে জন্য রাজকীয় আদেশও প্রদান করিয়াছিলেন। ঢাকার মসলিনের নানা নাম ছিল, যথা ঝুনা (হিন্দি শব্দ, অর্থ—সূক্ষ্ম—ইহা মাকড়শার জালের মত ছিল), শবনম্ (ইরানীয় শব্দ, অর্থ সান্ধ্য শিশির—সিক্ত করিয়া ঘাসের উপর বিছাইয়া দিলে ইহার অস্তিত্বই বুঝা যাইত না, শিশির বলিয়া ভ্রম হইত), আবরোয়ান (ইরানীয় শব্দ, অর্থ জল-স্রোত, জলের মধ্যে একেবারে মিলাইয়া যাইত), সঙ্গতি,

সরবতি, রং, সরকার আলি আলবাল্লে, তনজের তরন্দাম, নয়নসুক, সরবন্দ, কুমসী, বদনখাস, মলমলখাস, খাসা (সর্বশ্রেষ্ঠ খাসা নাম জঙ্গলখাসা) ইত্যাদি। নানা প্রকার ডুরে কাপড় ছিল ; তাহাদের নাম রাজকোট, কাগজাহি, পাদশাহীদার, কলাপাত প্রভৃতি। বিভিন্ন রঙের মসলিন চারখানা নামে অভিহিত হইত ; ইহাও নানারূপ ছিল, যথা নন্দনশাহী, আনারদানা, সাকুতা, কবুতরখোপা, পাছাদার প্রভৃতি। বুটা ও ফুলতোলা মসলিন কসিদা নামে অভিহিত, ইহাও নানা প্রকারের, যথা কাটা-উরমী, নৌবর্তি, আজিজুল্লা, দোছাক প্রভৃতি। বিচিত্র কারুকার্য-খরিচ মসলিন বা জামদানীও নানা প্রকারের, যথা তোরাদার, কারেলা, বুটিদার, তেরছা, জলবার, পান্নাহাজার, মেল, দুবলীজাল, ছড়িয়াল, সাবুরগা ইত্যাদি। মসলিন ছাড়া বাফতা নামে একপ্রকার সুন্দর মোটা গাত্র-বস্ত্রও নানা প্রকারের হইয়া থাকে, যথা হাম্মাম, ডিমটি, শাল, জঙ্গলখাসা, গলাবন্ধ প্রভৃতি, ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে নানা দেশের জন্য ঢাকায় ২৮,৫০,০০০ টাকার মসলিন প্রভৃতি বস্ত্র বিক্রীত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। এখনও বাংলার সর্বত্র ঢাকাই শাড়ী ও ধুতির বিশেষ আদর আছে।

"মসলিনের জন্য প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের আগে সূক্ষ্ম সূতা কাটার রীতি ছিল। চরকার দ্বারা অপেক্ষাকৃত মোটা সূতা ও ডলনকাঠি বা টাকুর সাহায্যের সূক্ষ্ম সূতা কাটা হইত। খাদি আন্দোলনের পর হইতে আমাদের আদিম কালের টাকু বা টেকো তক্‌লি নামে পরিচিত হইতেছে। ইহা সত্যই দুঃখের কথা।

"মসলিন ও অন্যান্য সূক্ষ্ম বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য ঢাকার এখনও নাম আছে। সূক্ষ্ম বস্ত্র ধুইলে সূত্রগুলি স্থানচ্যুত হইলে 'কাঁটা করিয়া' ইহাদিগকে স্থাপিত করিতে হয়। ঢাকা ভিন্ন অন্য কোথাও এই পদ্ধতি চলিত নাই বলিয়া আজও অনেকে ঢাকাই শাড়ী ঢাকায় ধুইতে পাঠান। ঢাকার কুমদীগরগণ শঙ্খ দ্বারা বস্ত্রাদি মার্জনা করিয়া উজ্জ্বল ও মসৃণ করিতে সুদক্ষ ; ঢাকাই শঙ্খ-করা বস্ত্রের খ্যাতি আছে। ঢাকার রিফুগরদিগেরও সূক্ষ্মকার্যের জন্য নাম আছে। ঢাকায় মসলিন প্রভৃতি বস্ত্রে রেশম ও জরির কাজ অতি সুন্দর হইয়া থাকে ; এই কাজ জরদজী নামে খ্যাত।[২]

কিন্তু ঢাকার এই বিশিষ্ট শিল্প সামগ্রীর বাজার কীভাবে বিনষ্ট হল, সে বিষয়ে নানামত পাওয়া যায়।

অনেকেরই জানা আছে ১৭৮৭-৮৮ খ্রিস্টাব্দের মন্বন্তরে ঢাকার জনজীবন বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এফ. বি. ব্রাডলে বার্ট লিখেছেন, এই মন্বন্তরের প্রতিক্রিয়া ছিল সুদূরপ্রসারী। ইংরেজ কোম্পানির হাতে দেশের শাসনক্ষমতা যাওয়ার পর থেকেই সমগ্র ঢাকা অঞ্চল কৃষিপ্রধান এলাকায় পরিণত হতে থাকে। আবার শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঢাকার সূতা উৎপাদন ও বস্ত্র বয়ন ছিল অব্যাহত। এই শিল্প নগরীতে বহু মানুষ এসে বসবাস শুরু করে এবং তারা শিল্পকর্মে জড়িত হয়ে পড়ে। দ্রুত ঢাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়, শহরের আয়তনও বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেখা গেল, শহরের বাইরের বহু কৃষিজমি ক্রমশ অনাবাদী হয়ে গেল। বিশেষ করে সোনারগাঁয়ের অবস্থা ছিল শোচনীয়। সোনারগাঁ ও কাপাসিয়ার সুদক্ষ কারিগররা এসে ঢাকায় সমবেত হয়। এই দুটি স্থান মসলিন ও অন্যান্য সূক্ষ্ম বস্ত্র উৎপাদনে প্রসিদ্ধ ছিল, তার দ্রুত পতন ঘটল। মানুষের গ্রাম ত্যাগের অন্যতম দুটি কারণ হল জমিদারদের অত্যাচার এবং দস্যু তস্করদের উপদ্রব।

আঠার শতকের শেষে (১৭৮৭-৮৮) মহামন্বন্তরে গ্রাম অঞ্চল জনশূন্য হয়ে পড়ে। জমিদার এবং অন্যান্য ভূম্যাধিকারীরা বিপুল পরিমাণ জমি করায়ত্ত করলেও, সেসব জমি-আবাদ করার মত লোকজনের ছিল অভাব। জমির মালিকরা নানারকম সুযোগ-সুবিধা দিয়ে কৃষকদের প্রলুব্ধ করতে থাকে। এইসময়ে শুরু হয় নীল চাষ। তারপর আসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। কৃষক সমাজ কিছুটা নিরাপত্তা বোধ করে এবং কৃষি কাজ থেকে উপার্জনের স্বপ্ন দেখে। কয়েক বছরের মধ্যে চাষবাসে ব্যাপক উন্নতি ঘটে। বহু মানুষ গ্রামে ফিরে যায়। এই সময়ে ঢাকার জনসংখ্যা ১০ লক্ষ

থেকে নেমে যায় ৫০ হাজারে। কৃষি বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্যের অধঃপতন একটি বিস্ময়কর ঘটনা। এর অন্যতম কারণ, ইংল্যান্ডে সূতী বস্ত্রের ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধি। ইংল্যান্ডে উৎপাদিত মসলিন গুণগতমানে ঢাকার মসলিনের তুলনায় ন্যূন ছিল। তাছাড়া ঢাকার উৎপাদিত উন্নতিমানের মসলিনের ক্রেতাও হ্রাস পেয়ে যায়। দামি বস্ত্রের বাজার যেমন নষ্ট হল, তেমনি বিলেতিকলের তৈরি সস্তা বস্ত্রে বাজার ছেয়ে গেল। দেশীয় বস্ত্রশিল্পের ধ্বংসে অনিবার্য হয়ে উঠল।

ব্রাডলে বার্ট আরো লিখেছেন, ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ইংলন্ডে ৩০ লক্ষ টাকার মসলিন রপ্তানি হয়েছিল। কিন্তু, ইংল্যান্ডে তখন শিল্পবিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে ৮ লক্ষ টাকার এবং ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে সাড়ে ৩ লক্ষ টাকার মসলিন রপ্তানি হয়েছিল। কিন্তু রপ্তানির পরিমাণ আরও কমে যাওয়ায় ঢাকার বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর উঠিয়ে দেওয়া হয় ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে। মসলিনের মৃত্যু ঘটল। সেইসঙ্গে মৃত্যু ঘটল ঢাকার বুটিদার কাসিদা বস্ত্রের। এই বস্ত্রের বেশিরভাগ রপ্তানি হত তুরস্কে। সেখানে সৈন্যদের পাগড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হত। কিন্তু সুলতান সেনাবাহিনীর পোশাক পরিবর্তন করায় কাসিদার চাহিদা একেবারে হ্রাস পায়।

ঢাকার অন্যতম একটি শিল্পকর্ম ছিল বয়নশিল্প। জেমস টেলরের বিবরণ থেকে জানা যায়, এদের বেশিরভাগই ছিল মুসলমান। অসামান্য দক্ষতাসম্পন্ন এই মানুষ বংশপরম্পরায় এই কাজ করে এসেছে। সূঁচ-সুতো নিয়ে কাজ করত। ছিঁড়ে যাওয়া মসলিন বস্ত্রকে নৈপুণ্যের সঙ্গে রিফু করত; নতুন মসলিনে ফুল তুলত সূঁচ দিয়ে। এদের বলা হত 'চিকনদাজী'। আর যারা পশমী শাল, মসলিন ও রুমালে এবং অন্যান্য বস্ত্রে সোনা-রূপো-রেশমী সুতো দিয়ে কাজ করত, তাদের বলা হত 'জরদজী'। জরদজীদের কাজ ইউরোপে ছিল সমাদৃত। শাল, গলাবন্ধ বস্ত্র কলকাতা থেকে এখানে এনে বুটি তোলা হত। মুগা ও তসর সিল্কের সুতা দিয়ে বিভিন্ন কাপড়ে ফুল ও বুটি তোলা হত। বিলেতি সুতায় তৈরি এমন বস্ত্রকে বলা হত কাসিদা। এই কাজ করার আগে লাল রঙ নিয়ে কাপড়ের ওপর নকশা করে দেওয়া হত। যারা নক্‌শা এঁকে দিত তাদের বলা হত 'চীপিগর'। ওদের ছাপমারা বস্ত্র ওস্তাগার ও ওস্তাগারনীরা সংগ্রহ করে সূচিশিল্পীদের হাতে তুলে দিত। বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা ও সিল্ক সুতো নিয়ে সূচিশিল্পীদের দাদন দেওয়া হত। গরিব মুসলমান পরিবারের মেয়েরা কাসিদার কাজ করত। ধোপাশ্রেণীর রমণীরাও অবসর সময়ে এই কাজ করে বাড়তি উপার্জন করত। এসময় সম্পন্ন পরিবারের মেয়েরাও এই কাজ করত। ঢাকায় তৈরি ২০ হাজার খণ্ড মসলিন কাসিদা পাঠান হয় তুরস্কে, পারস্যে ও মিশরে। আগেই বলা হয়েছে সেখানে এই কাসিদা ব্যবহৃত হত সেনাবাহিনীর পাগড়ি হিসেবে।

জেমস টেলর ঢাকার কাপড় ধৌতকরণ পদ্ধতির বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ব্রহ্মপুত্রের নির্মল জল এই কাজের বিশেষ উপযোগী। এখানকার কাঁকর মেশান কাদামাটি খুঁড়ে তৈরি জলাশয়ের জলে রয়েছে অদ্ভুত স্বাতন্ত্র। এখানে বস্ত্র ধৌত করার বিশেষ পদ্ধতি আছে। একটি জলভর্তি পাত্রে সাবানগোলা জলে বস্ত্রাদি ভালভাবে চুবিয়ে নিংড়ে নিয়ে ঘাসের ওপর মেলে দেওয়া হয় টান টান করে! এবার একটি পাত্রের পরিষ্কার জলে সেই শুকনো কাপড়কে সিদ্ধ করা হয় খুব সতর্কভাবে। সারা রাত সেই সিদ্ধ কাপড়কে ঐ পাত্রে ফেলে রেখে পরদিন ধোপার পাটে আছড়ে নিয়ে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়। এরকম করা হয় চার-পাঁচবার। শেষবার শুকোবার আগে জলের সঙ্গে মেশান হয় লেবুর রস। মসলিন কাপড় ধোয়া হয় এই ভাবে। ওখানে বড় বড় লেবুর বাগান ছিল। বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে সূতীবস্ত্র ঢাকায় পাঠান হত কাঁচতে। মসলিন কাপড় ধোয়ার পর সুতো এলোমেলো হয়ে গেলে তাকে ঠিক করতে ব্যবহৃত হয় নাগফণির পাঁজরের হাড়ে তৈরি সূক্ষ্ম ব্রাশ। এই কাজ করে "নর্দিয়া" শ্রেণীর মুসলমানরা। এরা বস্ত্র ভাঁজ ও গাঁট বাঁধার কাজও করে। কাঁচবার পর মসলিন সমান করতে মসৃণ ও বড় আকারের শঙ্খ যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি আবার মোটা ধরনের বস্ত্র ঘষার কাজে ব্যবহৃত হয় কাঠের ছোট ছোট হাতুড়ি।

একদিন ঢাকার ঐতিহ্যময় বস্ত্রশিল্পের পতন ঘটল। কিন্তু, সেই পতন এবং বিপর্যয় পর্ব কাটিয়ে পুনর্জীবন ঘটতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়নি। "অন্যান্য জেলায় তাঁত শিল্প নিম্নগামী হলেও ঢাকা জেলায় তাঁতীদের ঐতিহ্য এখনো বিনষ্ট হয়নি। ঢাকার তাঁতিরা ধুতি, শাড়ি ও অন্যান্য কাপড় তৈরির মাধ্যমে তাদের উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে যাচ্ছিলেন। এইসব কাপড় গরিব জনগণের ব্যবহার উপযোগী ছিল। কেননা উন্নত আমদানীকৃত বিলাসবহুল কাপড় ব্যবহার করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। ১৯০৬ থেকে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলন তাঁত শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে এবং খদ্দর কাপড়ের চাহিদাও ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। উন্নত ও সূক্ষ্ম তাঁতের কাপড় দক্ষ ও অভিজ্ঞ তাঁতি দ্বারা তখনো তৈরি হত। তবে মূল্য অধিক থাকায় এর বাজার সীমিত ছিল। ১৯০৬-১৯০৭ সালের দিকে ঢাকা বিভাগে ইউরোপীয় পণ্য আমদানি হঠাৎ হ্রাস পায়। ১৯০৫-১৯০৬ সালে ১,২০,৫৭৩ মণ ইউরোপীয় পণ্য আমদানি করা হয়, কিন্তু ১৯০৬-১৯০৭ সালে তা ৯৪,৭১৮ মণে নেমে আসে। পরবর্তী বছরগুলোতে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ) চলাকালীন জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। ফলে অবস্থার অবনতি ঘটে। ১৯১৯ সালের স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বিদেশি মালামাল ও সুতো আমদানিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। দেশীয় চাহিদাপূরণের উপযোগী বোম্বের মিলগুলোতে প্রচুর কাপড় ও সুতো মজুত ছিল। ১৯২২ সালে ঢাকায় শীতলখ্যা নদীর তীরে "ঢাকেশ্বরী বস্ত্র মিল" স্থাপিত হয়। এর পরপরই ১৯২৯ সালে 'চিত্তরঞ্জন বস্ত্রমিল', ১৯৩২ সালে "লক্ষ্মী নারায়ণ বস্ত্র মিল', ১৯৩৬ সালে 'বান্ধব চিনি ও বস্ত্র মিল' এবং ১৯৩৮ সালে 'ঢাকা বস্ত্র মিল' স্থাপিত হয়। ঢাকেশ্বরী তার দ্বিতীয় মিল চালু করে ১৯৩৭ সালে।...[৩]

দেশীয় বস্ত্র উৎপাদন ও ব্যবসাকে বিনষ্ট করে, বিলেতি বস্ত্র আমদানি ও পসার বৃদ্ধিতে ঢাকার নাগরিকদের মনে ক্ষোভ ক্রমশ দানা বাঁধতে থাকে। ঢাকার নাগরিকদের আহ্বান করে ব্রাহ্ম নেতা দীননাথ সেন পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যবসায়ীরা এই উদ্যোগে এগিয়ে এসেছিলেন সক্রিয়ভাবে। 'ঢাকা প্রকাশে' ৫ মার্চ ১৮৭৬ খ্রিঃ প্রকাশিত হয় ঃ

"গত ৩ আশ্বিন অত্রত্য সুশিক্ষিত ভদ্রব্যক্তিরা একসভা করিয়া বিলাতি কাপড়ের পরিবর্তে এদেশীয় তাঁতি, যুগী, জোলাদিগের প্রস্তুত বস্ত্র ব্যবহারকরণার্থ ১০ হাজার টাকা মূলধন দ্বারা একটি "লিমিটেড লায়েবিলিটি কোম্পানি" স্থাপন করার প্রস্তাব করেন। ঐ দিবস দেশীয় কারিগরদিগের প্রস্তুত কাপড় প্রদর্শিত না হইলেও সকলে স্বীকার করেন যে, অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিতধিক মূল্যবান হইলেও দেশীয় কাপড়, বিলাতি কাপড় হইতে এত অধিক দিন টিকিবে যে সাকুল্যে ধরিয়া দেখিলে ইহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি মাত্র হইবে না উপযুক্তরূপ বস্ত্র পাওয়া যাইবে কি না এই আশঙ্কায় দেশীয় কারিগরেরা কিরূপ বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে, সাধারণে তাহা দেখিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। বাবু দীননাথ সেন তদবধি কাপড় সংগ্রহার্থ যত্ন করিয়া কতক উৎকৃষ্ট কাপড় প্রস্তুত করিতে পারে, বলিয়া বিস্মিত হন। আমরা ঐ সকল বস্ত্র সম্বন্ধে এই বলিতে পারি, উহার মূল্য কিছু অধিক হইলেও উহা বিলাতি কাপড় হইতে প্রায় দ্বিগুণকাল টিকিবে। সুতরাং এইসকল কাপড় ব্যবহার করিলে লাভ ভিন্ন ক্ষতি হইবে না। "ভাল কাপড় পাওয়া যাইবে না" পূর্বে অনেকে এই আশঙ্কা করিতেন, কিন্তু সংপ্রতি বাবু দীননাথ সেনের সংগৃহীত উৎকৃষ্ট বস্ত্র দেখিয়া তাঁহাদের সেই আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছে। সভা নিম্নলিখিতরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন।

১ম প্রস্তাব। গত ৩ আশ্বিন তারিখে একটি সাধারণ সভা হইয়া এরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে ফরমাইশ দিয়া ব্যবহারোপযুক্ত দেশিকাপড় প্রস্তুত করাইয়া বিক্রয় করার জন্য একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি স্থাপন করা আবশ্যক। এক্ষণ সেই কোম্পানির অংশিগণের নাম ও তাঁহাদিগের

অংশের টাকা সংগ্রহ, আইনমতে কোম্পানির রেজিস্টরী এবং ডিরেক্টর প্রভৃতি কর্মচারি নিয়োগ করণার্থ অংশিগণের সভা আহ্বান ইত্যাদি কোম্পানির স্থাপন সম্বন্ধীয় সমুদায় কার্য করিবার জন্য একটি উপযুক্ত কমিটি নিয়োগ করা হউক।

২য় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের সম্মতিমতে উক্ত কমিটির মেম্বাররূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকামোহন রায়	সভাপতি
শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	সহকারি সভাপতি
শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকিঙ্কর রায়	
শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকামোহন বসাক	
শ্রীযুক্ত বাবু নন্দকুমার গুহ	
শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন বসাক	
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার বসু	
শ্রীযুক্ত বাবু গোপীমোহন বসাক	
শ্রীযুক্ত বাবু রূপলাল দাস	
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ রায়	কোষাধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বসাক	সম্পাদক
শ্রীযুক্ত বাবু অনাথবন্ধু মৌলিক	সহকারী সম্পাদক

৩য়। উক্ত কমিটির কর্তব্য যে শীঘ্রই একটি বিজ্ঞাপন লিখিয়া সাধারণ্যে প্রচার এবং যাহাতে অতিশীঘ্র কোম্পানির কার্যারম্ভ হইতে পারে তদর্থ যত্ন করেন।

৪র্থ। শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সেন নবাবগঞ্জ, পাবনা প্রভৃতি স্থান হইতে ফরমাইশ দিয়া যে সমস্ত কাপড় প্রস্তুত করিয়া সভায় উপস্থিত করিলেন, তৎসমুদায় অত্যন্ত উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ঐ সমস্ত কাপড় কমিটি আদর্শ স্বরূপ রাখিবেন এবং দোকান স্থাপিত করাইয়া বিক্রয় করিবেন। এই সমুদায় বস্ত্র সংগ্রহার্থ বাবু দীননাথ সেনকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

"আমরা ভরসা করি, অত্রত্য দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার বিষয়ক সভার প্রস্তাবিত কোম্পানির কার্য সত্বরেই আরব্ধ হইবে। এক টাকার জয়েন্ট স্টক কোম্পানি দ্বারা দেশীয় সমস্ত আবশ্যকীয় বস্ত্রের প্রয়োজন নির্বাহিত হইবে না সত্য ঢাকার জয়েন্ট স্টক কোম্পানির অনুকরণে যদি বঙ্গদেশের সর্বস্থানীয় লোকে, দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার্য যত্নপর হন দেশীয় কারিগরদিগের নিরন্নতা দূরীভূত হইবে সন্দেহ নাই। অন্যান্য স্থানের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় দেশীয় বস্ত্র বয়নকারীদিগের ইদানীন্তনী শোচনীয় দুর্গতি প্রত্যক্ষ করিয়া যদি দেশীয় বস্ত্রের বহুল প্রচারে যত্নবান হন, তাহা হইলে কখনই অস্মদ্দেশীয় একটি প্রধান ব্যবসায় একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারে না।"

ঢাকায় কাপড়ের কল স্থাপন সম্পর্কে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে ছিল ঃ

"বোম্বাই প্রদেশে বস্ত্র বয়ন ও কার্পাস সূত্র প্রস্তুত করিবার কল স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা বঙ্গ দেশে এ পর্যন্ত তৎসম্বন্ধে কিছুই করি নাই। অর্থাভাব নিবন্ধন যে, বঙ্গদেশে উহার অনুষ্ঠান হয় নাই, তাহা নহে। বোধহয় কোন ব্যক্তি অগ্রণী হইয়া উদ্যোগ না করাতেই এ পর্যন্ত বস্ত্রের কল প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আমি কয়েক বৎসর যাবৎ বোম্বাই ও অন্যান্য স্থানে এইরূপ কল চালনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছিলাম এক্ষণ বঙ্গদেশে তদ্রূপ একটি কল স্থাপনের চেষ্টা করিবার সংকল্প করিয়াছি। আমি একাকী এই কার্যে প্রবৃত্ত হইব না; ইচ্ছা আছে, একটি জয়েন্ট কোম্পানি করিয়া উহাতে হস্তক্ষেপ করিব। আমার বিবেচনায় প্রস্তাবিত কোম্পানির ১০ লক্ষ টাকা মূলধন (১০০ টাকা মূল্যের ১০০০ অংশ) লইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। যাঁহারা অংশ ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা অবিলম্বে নাম, ধাম ও কত অংশ লইবেন, তাহা স্পষ্টরূপে লিখিয়া জানাইবেন। উপযুক্ত পরিমাণ অংশগ্রহণেচ্ছুর নাম প্রাপ্ত হইলে, তাহাদিগকে আহ্বানপূর্বক

কলিকাতায় এক প্রকাশ্যসভা করিয়া ডাইরেক্টর নিয়োজন, কল স্থাপনের স্থান নির্ণয় ও অন্যান্য কার্যের ব্যবস্থা করা যাইবে। এতদ্বিষয়ে সাধারণের মনোগতভাব কি তাহা জানিবার নিমিত্ত এই বিজ্ঞাপন করিলাম; যদিও অংশের সমুদায় টাকা সংগৃহীত না হয়, তথাপি সাধারণের সহযোগিতা প্রাপ্ত হইলেই আমি এই কার্যে প্রবৃত্ত হইব। সংপ্রতি নানাকারণে বোম্বাইয়ের কতকগুলি উৎকৃষ্ট তুলার কল সুলভমূল্যে বিক্রীত হইবে, এই নিমিত্ত বাসনা ও ভরসাকরি যে, অংশগ্রহণেচ্ছুগণ অতি সত্বর অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবেন।

১৮৭১ সন শ্রীধনপৎ সিংহ বাহাদুর
১৫ মার্চ আজিমগঞ্জ

এসম্পর্কে সংবাদপত্রে মন্তব্য করা হয় ঃ "রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুর যে সৎ প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা কার্যে পরিণত হইলে, বঙ্গদেশে এক অতি গুরুতর অভাব বিদূরিত হইবে, —বঙ্গবাসীগণের কাপুরুষতা অপনীত হইবে। আজিকালি বিলাতি বস্ত্রের যেরূপ বহুল প্রচার হইয়াছে, তাহাতে এ দেশীয় তন্তুবায়গণের সহস্র চেষ্টাও একান্ত ব্যর্থ হইয়াছে। দেশ হিতৈষি ব্যক্তিগণ তাহাদিগের ব্যবসায় বজায় রাখিবার চেষ্টা পাইতেছেন, দেশীয়বস্ত্র ব্যবসায়ি কোম্পানি স্থাপনাদি করিতেন বটে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। নিরন্ন দেশীয়গণ অত্যল্প মূল্যে ম্যাঞ্চেস্টারের বস্ত্র (রূপান্তরিত পাট বলিলেও চলে) পাইতে অধিক মূল্য দিয়া দেশীয় বস্ত্র ক্রয় করিতে প্রকৃত প্রস্তাবে লাভ না থাকিলেও নির্দ্ধাতা প্রযুক্ত এদেশীয়দিগকে তৎক্রয়েই বাধ্য হইয়াছে। সুতরাং এদেশে বহুল পরিমাণে বস্ত্রের কল প্রতিষ্ঠা করিয়া অল্প মূল্যে উৎকৃষ্টতর বস্ত্র যোগাইতে না পারিলে, মাঞ্চেস্টারের সহিত কোন প্রকারেই প্রতিযোগিতা রক্ষা করিবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ একমাত্র ভূমি সংক্রান্ত কার্যে এক্ষণ আর লোকের দিনপাত হইতেছে না, নানাবিধ শিল্পকার্যে প্রবৃত্ত হইয়া কতিপয় শ্রেণীর গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করা আবশ্যক হইতেছে। ইত্যাকার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াও যে, বঙ্গবাসীগণ এতদিন পর্যন্ত বোম্বাইয়ের অনুকরণ করেন নাই ইহাই আশ্চর্য। যাহা হউক, এক্ষণ দেশীয় সমৃদ্ধিমান ব্যক্তিগণ নিশ্চেষ্ট না থাকেন, রায়ধনপৎ সিংহ বাহাদুরের প্রস্তাবিত কার্যে যোগদান করেন, একান্ত বাঞ্ছনীয় হইতেছে। আমাদের ভরসা, এই সমগ্র বঙ্গদেশ হইতে ১০ লক্ষ টাকা অবিলম্বেই সংগৃহীত হইবে। উক্ত রায় বাহাদুর যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এরূপও প্রতীতি হয় যে, সাধারণের সহযোগিতা প্রাপ্ত হইলে, অংশের সমস্ত টাকা সংগৃহীত হউক আর না হউক, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কার্যারম্ভ করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। সুতরাং সুদৃঢ়বিশ্বাস্ হইতেছে, অচিরকালমধ্যেই বঙ্গদেশের একটি বস্ত্রের কল স্থাপিত হইবে। এতদুপলক্ষে অনেকে এই প্রশ্নও করিতেছেন—বঙ্গদেশের কোন্ অঞ্চলে বস্ত্রের কল স্থাপন করা কর্তব্য। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি উহার এই উত্তরে উপনীত হইয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গের কোনও স্থানেই কাপড়ের কল স্থাপন করা বিধেয়। কারণ পূর্ববঙ্গে কার্পাস যেরূপ সুলভ, শ্রমজীবীগণের পারিশ্রমিক যেরূপ অল্প, শিল্পী শ্রেণীর যেরূপ বাহুল্য, রাজধানীতে বা পশ্চিমবঙ্গের কোনও স্থানে সেরূপ নহে। বাজধানীতে কল স্থাপন করিতে কার্পাস মূল্য ও শ্রমজীবীগণের শ্রমমূল্যের আধিক্যবশতঃ এত ব্যয় বাহুল্য ঘটিবে যে, সামান্য সুবিধায় কখনই তৎপুরণ হইবে না। একেই ত এদেশের বস্ত্রের কল স্থাপন করিতে নানারূপ ব্যয় বাহুল্য ঘটে, তাহার উপর আবার উচ্চমূল্যে কার্পাস ক্রয় ও অত্যধিক হারে শ্রমজীবী নিয়োগাদিতে ব্যয়বৃদ্ধি হইলে পরিশেষে নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। ব্যয়বাহুল্য নিবন্ধনই বোম্বাইয়ের কয়েকটি কলের অবস্থা ... হইয়া পড়িয়াছে। তদধ্যক্ষগণ মাঞ্চেস্টারের সহিত প্রতিযোগিতা রক্ষা করিতে না পারিয়া দেউলিয়া হইতেছেন। বঙ্গদেশে যে একটিমাত্র কল স্থাপনের প্রস্তাব হইতেছে, নানারূপ ব্যয়বাহুল্য স্কন্ধে লইয়া কার্যারম্ভ করিলে তাহারাও এরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিবে, বিচিত্র কি? এই নিমিত্তই ভবিষ্যদ্দর্শিব্যক্তিগণের অভিপ্রায় যে পূর্ববঙ্গই নারায়ণগঞ্জে বা সিরাজগঞ্জে প্রস্তাবিত কল স্থাপন করিয়া অল্পব্যয়ে উহার কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা

করা হয়। আমরা অবগত হইলাম, ঢাকার এক ব্যক্তি ১০টি অংশ ক্রয়েচ্ছু হইয়া উপরুপ অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন।[৪]...

ঢাকায় কাপড়ের কল স্থাপন সম্পর্কে প্রকাশিত অপর একটি সংবাদ : "... ঢাকার প্রতাপবাবু একটি কাপড়ের কল স্থাপন করিলেন, ইহাতে তখনই তাহার নাম সমগ্র ভারত ব্যাপ্ত হইয়া ইউরোপ আমেরিকা পর্যন্ত বিখ্যাত হইল। তিনি নিতান্ত যদি দরিদ্র হইয়াও পড়েন, তথাপি তাহার কলটি উড়িয়া যাইবে না, দেশেরই একজন না একজন চালাইবে এবং লোকে উহা প্রতাপবাবুর কল বলিয়াই ঘোষণা করিবে। উহা নগদ টাকা নয় সুতরাং উত্তরাধিকারী নগদ টাকার ন্যায় উহা ভাঙিয়া দুষ্কার্য করিতে পারিবে না। কর্জ দাদনে টাকা পরকে দিতে হয়, উহা... পড়িবার সম্ভাবনা খুব থাকে। কিন্তু ইহা নিজে তত্ত্বধান করিয়া রাখিলে সে সম্ভাবনা বড় নাই। পাঁচ লক্ষ টাকা হইলে একটি কাপড়ের কলের কারবার চলিতে পারে। এই টাকা কর্জ দাদন করিতে গেলে অন্যূন অর্ধেক টাকা ঘুরিয়া ঘুরিয়া গৃহে থাকে, সুতরাং উহার সুদ পাওয়া যায় না, কিন্তু ঐ টাকা উক্ত কলে খাটিলে সকলগুলি টাকারই লভ্য আসিবে। ইত্যাদি নানারূপে ইহার যে উপকার, তাহা ঘৃণিত কর্জদাদনে কখনও পাওয়া ঘটে না। আমরা তাই ধনীবৃন্দকে অনুবোধ করি, তাঁহার কর্জদাদনের প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া ঐরূপকার্যে ধনের সৎব্যবহার করুন।"[৫]

"বিলাতি বস্ত্রে দেশের যে সর্বনাশ করিতেছে, তাহা দূরীকরণ জন্য আমরা চেষ্টা করিয়াও এ পর্যন্ত কৃতকার্য হইতে পারি নাই। এস্থানের যে সকল তন্তুবায় পূর্বপুরুষদিগের অনুগ্রহে শিক্ষিত হইয়াছেন—বাবু হইয়াছেন, তাঁহারাই যেন দেশীয় বস্ত্র চালানের বিরোধী বোধ হয়। তাঁহাদের ইহা যেন ইঙ্গিত নহে যে, তাহাদের জাতিভায়ারা আর তাঁত বুনে। তাঁহাদের কেহ কেহ বিলাতি বস্ত্রের দোকানদার হইয়াছেন। বিলাতি বস্ত্র না বিকাইলে তাঁহাদের সর্বনাশ হইবে, এ আশঙ্কা তাহাদের বড়ই প্রবল। আমরা তদ্রূপ একজন দোকানদারকে বলিয়া যে কর্কশ উত্তর পাইয়াছি, তাহাতে আর তাহার ... উপকার জন্য কাহারও চেষ্টা হইতে পারে না। কিন্তু আমরা তথাপি সংকল্প ছাড়িতে পারি নাই। আমরা প্রায় সাড়ে সাত বৎসর যাবৎ বিলাতি বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু এতদ্বারা অনেকটা ক্ষতি ও অসুবিধা ভোগ করিতেছি। ঢাকার তাঁতিরা ফিনফিনে ধুতি ভিন্ন সর্বদা ব্যবহার্য টেকসই ধুতি বানায় না। আমাদের সুতরাং গ্রাম্য জোলাদের নিকট ফরমাইস দিয়া ধুতি প্রস্তুত করাইতে হয়। কিন্তু ধুতির দাম অনেক বেশি পড়ে ও সকল সময় পাওয়া যায় না। দোকানদারেরা ইচ্ছা করিলে তাঁতি দ্বারা সেইরূপ ধুতি প্রচুর পরিমাণে বয়ন করাইয়া বেচিতে পারেন। যদি এইরূপে দেশীয় ধুতি মিলে তবেই বিলাতি বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দেশীয় ধুতি পরিধানে লোককে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা যাইতে পারে। ও রূপ প্রতিজ্ঞা করিতে অনেকেরই ইচ্ছা আছে, কিন্তু দেশীয় বস্ত্রের অভাববশত তাহা হইতেছে না। এরূপ স্থলে তন্তুবায় দোকানদারগণ ও ঋণদানের উদ্যোগ ব্যতিরেকে আমাদের কৃতকার্য হওয়া অসম্ভব।"[৬]

আগেই বলা হয়েছে, ঢাকায় ঢাকেশ্বরী বস্ত্রশিল্প (১/২ নারায়ণগঞ্জ), চিত্তরঞ্জন বস্ত্র মিল, লক্ষ্মীনারায়ণ বস্ত্র মিল (নারায়ণগঞ্জ), ঢাকা বস্ত্র মিল (পোস্তাগোলা) স্থাপিত হয়েছিল। এইসব মিল স্থাপিত হয় বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে। এই সময়ের অন্য কয়েকটি বস্ত্র কল হল চট্টগ্রাম বস্ত্র মিলস (নারায়ণগঞ্জ), বান্ধব সুগার এবং বস্ত্র মিলস (চরসিন্দুর) এবং লক্ষ্মী স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং (নারায়ণগঞ্জ)। এই সমস্ত মিলের মালিক ছিল অধিকাংশই হিন্দু। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দেদেশভাগের পর তাদের বেশিরভাগই ভারতে চলে যাওয়ায়, মিলগুলি সংকট সম্মুখীন হয়। নতুন সরকার এগিয়ে এসে সেই সংকট সমাধান করে। আরও ১৩টি নতুন মিল স্থাপিত হলে মোট মিলের সংখ্যা হয় ২০টি। বর্তমানে ঢাকা জেলার ৩৩টি বস্ত্র মিল হল :

১)	মুন্নু টেক্সটাইল	ঢাকা
২)	আফসার কটন মিলস	"
৩)	দি চিটাগাং টেক্সটাইল মিলস্	"

৪)	ঢাকা কটন মিলস্	”
৫)	কোহিনুর স্পিনিং	”
৬)	মেঘনা টেক্সটাইল	”
৭)	খান কটন মিলস্ লিঃ	”
৮)	কানকন স্পিনিং মিলস্ লিঃ	”
৯)	রাজ টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	
১০)	কাশেম কটন মিলস লিঃ	
১১)	মসলিন কটন মিলস লিঃ	
১২)	জবা টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	
১৩)	হাবিবুর রহমান টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	
১৪)	হালিমা টেক্সটাইল লিঃ	
১৫)	গোয়ালন্দ টেক্সটাইল লিঃ	
১৬)	পাওছিয়া কটন মিলস্	
১৭)	চান্দ টেক্সটাইলস মিলস্ লিঃ	
১৮)	সোহাগপুর টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	
১৯)	সিরাজগঞ্জ স্পিনিং অ্যান্ড কটন মিলস্ লিঃ	
২০)	বাংলাদেশ টেক্সটাইল	নারায়ণগঞ্জ
২১)	চিত্তরঞ্জন কটন মিলস্	”
২২)	লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলস	”
২৩)	শারমিন টেক্সটাইল	গাজিপুর (টংগি)
২৪)	ফাইন কটন	”
২৫)	অলিম্পিয়া টেক্সটাইল	”
২৬)	ওরিয়েন্ট টেক্সটাইল	”
২৭)	কাদেরিয়া টেক্সটাইল	”
২৮)	সাতরং টেক্সটাইল	”
২৯)	জিনাত টেক্সটাইল	”
৩০)	আলহাজ টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	”
৩১)	আশরাফ টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	ডেমরা
৩২)	আহমদ বাওয়ানি টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	
৩৩)	আসফ কটন স্পিনিং কোং লিঃ	নরসিংদি

একসময়ে ঢাকায় বেনারসি ও সিল্ক তৈরি হত। বেনারসি ও সিল্ক প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি ছিল : ১. বানারসী সিল্ক ইন্ডাস্ট্রিজ, ১৩ রজনী বোস লেন, ঢাকা ২. ঢাকা উইভিং ফ্যাক্টরি, ১৩, রজনী বোস লেন, ঢাকা, ৩. ইস্টার্ন টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ, নরসিংদি, ৪. জালালাবাদ ইন্ডাস্ট্রিজ, ২৯৩, নবাবপুর রোড, ঢাকা, ৫. ন্যাশনাল সিল্ক ইন্ডাস্ট্রিজ কো-অপারেশন, ৭/৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, ঢাকা, ৬. পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিজ কো-অপারেশন, ১৪৮, মিটফোর্ড রোড, ঢাকা এবং ৭. সানরাইজ কটন ইন্ডাস্ট্রিজ, ২৪০ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা। উল্লিখিত ৩৩টি মিলের কোন কোনটিতে কাপড় এবং কোন কোনটিতে কাপড়ের প্রয়োজনীয় সুতা উৎপাদিত হয়। এছাড়াও আছে ২৮টি স্পেলাইজড টেক্সটাইল মিলস। এইসব মিলে উৎপাদিত হয় বেডসিট, বেডকভার, চাদর, ক্যানভাস, গ্রে কাপড়, ছাতার কাপড়, তোয়ালে, ব্লাউজ, ফ্রক, শাড়ি, সুটিং, শার্টিং, ড্রেস ফেব্রিক্স, সুতির ও সিনথেটিক কাপড়, স্যানিটারি ন্যাপ, টেরিহাওয়েল এবং নানারকম

প্রয়োজনীয় সম্ভার। এইসব মিলের তৈরি দ্রব্যাদি আন্তর্জাতিক বাজার পেয়েছে। মিলের অন্যতম কয়েকটি হল :

১)	ম্যাকসওয়েন টেক্সটাইল মিলস্	ঢাকা
২)	রিমায়েলস টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	,,
৩)	ফয়েলাইস টেক্সটাইলস মিলস্ লিঃ	,,
৪)	ফাইন টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	,,
৫)	হোসাইন ফেব্রিক্স লিঃ	,,
৬)	দীনা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	,,
৭)	এগালুকো হাইজেনিক প্রোডাক্টস্	,,
৮)	শাহজাহান লিঃ	,,
৯)	ক্যানওস ম্যানুফ্যাকচারিং কোং	,,
১০)	পরিধান টেক্সটাইলস লিঃ	,,
১১)	ইস্টার্ন ফেব্রিক লিঃ	,,
১২)	ওকে টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	,,
১৩)	এস. এ. ইন্ডাস্ট্রিজ	,,
১৪)	কসমোপলিটান টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	,,
১৫)	এস. টি. এম. লিঃ	,,
১৬)	অরচিত্ত ফেব্রিকস অ্যান্ড টেক্সটাইলস ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	,,
১৭)	মনোয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিঃ	,,
১৮)	কাজি টেক্সটাইল লিঃ	,,
১৯)	ম্যাটেকা কটন মিলস্ লিঃ	,,
২০)	বাংলাদেশ হাওয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ	,,
২১)	মেটেক্স কটন লিঃ	নারায়ণগঞ্জ
২২)	ডায়মন্ড টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	,,
২৩)	এনায়েতনগর ফার্ম লিঃ	,,
২৪)	ড্রিগলক্স লিঃ	,,
২৫)	নাজনীন ফ্রেবিক্স লিঃ	,,
২৬)	সানফ্লাওয়ার ফ্রেবিকস লিঃ	,,
২৭)	আলাউদ্দিন অ্যান্ড অইগুয়া টেক্সটাইলস মিলস্ লিঃ	
২৮)	সোয়ান টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	গাজিপুর

ঢাকার তাঁতের কাপড়ের মত হোসিয়ারি দ্রব্যেরও ছিল বড় বাজার দেশভাগের আগে। বাংলা এবং আসামের সর্বত্র ভাল বাজার পেয়েছিল। দেশভাগের পর বাজার সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। গেঞ্জি, মোজা, লুঙ্গি তৈরি হত যা প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাত। দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে পটুয়াটুলিতে গুপ্তা অ্যান্ড কোম্পানি সর্বপ্রথম হোসিয়ারি দ্রব্য উৎপাদন শুরু করে সে সময়ের অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হল ফরাসগঞ্জ দাস ব্রাদার্স, দে সরকার অ্যান্ড কোম্পানি (ওয়াড়ি), বেঙ্গল হোসিয়ারি ও সাপ্লাই কোম্পানি, দে অ্যান্ড কোম্পানি, স্বদেশী শিল্পালয়, গাঙ্গুলি অ্যান্ড কোম্পানি এবং বাসু রায়চৌধুরী অ্যান্ড কোম্পানি (পটুয়াটুলি)—এসব কারখানায় উৎপাদিত হোসিয়ারি দ্রব্যের একসময় বেশ বড় বাজার ছিল। কিন্তু বিদেশ থেকে আমদানি করা গেঞ্জি মোজা ছিল দামে সস্তা। ফলে ঢাকার বিভিন্ন মিলে উৎপাদিত দ্রব্য ক্রমশ মার খেতে থাকে।

তারপর পাবনা ও কলকাতা থেকে আমদানি করা হোসিয়ারি দ্রব্য বাজার দখল করে নেয়। ফলে ঢাকার হোসিয়ারি দ্রব্য উৎপাদন ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়ে। দেশ ভাগের পর নারায়ণগঞ্জকে কেন্দ্র করে আবার হোসিয়ারি শিল্পের প্রসার ঘটেছে। দেশের প্রয়োজনীয় চাহিদা সহজেই মেটে এইসব মিলের উৎপাদনে। নারায়ণগঞ্জে বাবুরহাটকে একসময়ে বলা হত পূর্বদেশের ম্যানচেস্টার। কারণ, এখানেই ছিল তাঁতের কাপড়ের বড় বাজার। সপ্তাহে দুদিন হাট। হাজার হাজার ব্যবসায়ীর আগমনে বাবুরহাট জমজমাট হয়ে উঠত। শুধু কাপড় নয়, সুতোও কেনাকাটা হত। ছোট হাট ছিল নোয়াপাড়া, ডেমরা, জয়পাড়া, ভুলতা এবং মুরাপাড়ায়। এইসব হাটেও তাঁতের কাপড় কেনাবেচা হত। এখনও ঢাকাই জামদানি ও সাধারণ ঢাকাই শাড়ির চাহিদা কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি। প্রচুর সূক্ষ্ম ঢাকাই বস্ত্রসম্ভার রপ্তানি হয় ভারতে।

তাঁত বস্ত্র শিল্পের পর অন্যতম শিল্প হল পাট। দেশভাগের আগে নারায়ণগঞ্জ ছিল অন্যতম পাটের বাজার। এখানে ২০টি সংস্থা পাট কিনে রপ্তানি করত কলকাতায়। দেশভাগের পর থেকে নানা জটিলতায় সংকট সৃষ্টি হয়। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে নারায়ণগঞ্জে আদমজী জুট মিল স্থাপনের পর, শুরু হয় নতুন যুগের। বর্তমানে ঢাকা জেলার নারায়গঞ্জ, নরসিংদি, ঢাকা, গাজিপুর এবং অন্যান্য স্থানে আছে ৪২টি পাটকল। এর মধ্যে আদমজী জুট মিলই সর্ববৃহৎ।

ঢাকা জেলায় টেনারি শিল্পের বিকাশ ঘটে বিশ শতকের সূচনাপর্বে। শচীন্দ্রনাথ ঘোষ মাদ্রাজ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে, ৫০ হাজার টাকা মূলধনে টেনারি স্থাপন করেন। কিন্তু এই কারখানা বেশিদিন চলেনি। সেসময়ে ঢাকার লক্ষ্মীবাজার, মালিটোলা ও নবাবপুরে বসবাসকারী জুতা প্রস্তুতকারীরা নতুন জুতো তৈরি ও মেরামত করত। পাঁচটা চামড়ার দোকান ছিল এই অঞ্চলে। সেখানে শচীন্দ্রনাথ ঘোষের চামড়ার কারখানার চামড়া বিক্রি হত। ঢাকা অঞ্চলে এখন টেনারির সংখ্যা প্রায় ১০০। তাছাড়া আছে ৬টি বড় জুতা তৈরির কারখানা এবং ৬টি চামড়ার বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনকারী সংস্থা। ম্যাচ ফ্যাক্টরি—৮, গ্লাস ফ্যাক্টরি—৩০, তেলকল—১৩, স্টিল রি-রোলিং, মিল—৪৯, কাগজ সম্পর্কিত শিল্প—১৮, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ—৫, ফল ও সবজি প্রক্রিয়াকরণ—৪, অ-মাদক পানীয়—২, বেকারি—১৪, দুগ্ধ খামার ও দুগ্ধজাত দ্রব্য—৭, চিনিকল—১, পেপার মিল—১, পাটের গালিচা—১, সিগারেট কারখানা—৮, ভেজিটেবল অয়েল কারখানা—৪, স্টার্চ ও গ্লুকোজ—১, ময়দা কল—১৫, প্যাকিং বোর্ড কারখানা—৩, হিমাগার—৬২।

ঢাকায় সাবান শিল্পের বিকাশ ঘটে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়, ১৯০৫ সালে। গোলাকার কাপড় কাচার সাবানের খ্যাতি ছিল সবথেকে বেশি। ঢাকা জেলার ফরিদাবাদ ও ফরাসগঞ্জ এলাকায় সাবান শিল্পের বিকাশ ঘটে কুটির শিল্প হিসাবে। অধিকাংশ কারিগরই ছিল মুসলমান। এই অঞ্চলে তাদের প্রায় ১০০টি কারখানা ছিল। দীর্ঘকাল এদের ব্যবসা ছিল অপ্রতিহত। ঢাকায় গায়ে মাখার সাবান তৈরি করত গেন্ডারিয়ার বুলবুল সাবান কারখানা। এই কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র সাহা, সত্যমোহন দাস এবং অক্ষয়কুমার দাস। এরা ১৯০৬-০৭ ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার লাভ করেছিল। এই কারখানা সঙ্গে জড়িত ছিলেন জাপানী সাবান প্রস্তুতকারী এম. ডবলিউ তাকিতা। তিনি পরে নিমতলায় একটি কারখানা করেন।

ঢাকার সাবান শিল্প এখন অনেক উন্নত এবং আন্তর্জাতিক মানের। ভারতের পূর্ব সীমান্তের অধিকাংশ রাজ্যে বাংলাদেশের সুগন্ধি সাবানের জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই ঢাকার সাবানের কদর। ঢাকার সাবান নির্মাতা অন্যতম ৪টি সংস্থা হল :

১) কমান্ডার সোপ কোম্পানি, ওয়াটার ওয়েজ রোড, ঢাকা।

২) কোহিনুর কেমিক্যালস, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।

৩) সিরকো সোপ কেমিক্যাল, ইমামগঞ্জ, ঢাকা।

৪. লিভার ব্রাদার্স (বাংলাদেশ লিমিটেড)।

ঢাকার ব্যাংক

অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বলেছেন ঢাকার প্রথম বাণিজ্যিক ব্যাংক 'ঢাকা ব্যাংক' স্থাপিত হয় ১৮৪৬ খ্রিঃ। কিন্তু ঢাকা নিউজে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যাচ্ছে ব্যাংকটি স্থাপিত হয় ১৮৪৮ খ্রিঃ। ব্যাংক স্থাপনে উদ্যোগী ছিলেন সার্জন ল্যাম্ব, এইচ. এম. নেশন, জমিদার খাজা অলিউল্লাহ, উকিল নন্দলাল দত্ত, কমিশনার জন ডানবার, ঢাকার সিভিল সার্জন টি. ওয়াইজ এবং খাজা আব্দুল গনি। ব্যাংকের প্রথম ট্রাস্টি সেক্রেটারি ছিলেন আলেকজান্ডার ফরবেস। এই ফরবেস আগে চাকরি করতেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের কোম্পানিতে। পরে 'ঢাকা নিউজ' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। প্রস্তাবিত ব্যাংকের মূলধন ছিল ৫ লক্ষ টাকা। প্রতিটি শেয়ার ছিল এক হাজার টাকা দামে। অধ্যাপক মামুন বলেছেন, ব্যাংকের বিনিয়োগকৃত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা হলেও, তা সম্ভবত ছিল ৪ লক্ষ টাকা। দশ বছর পরে শেয়ার হোল্ডাররা তাদের শেয়ার বিক্রি করে দিতে আগ্রহী হলে, ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। ১৮৫৬ সালে ব্যাংকের নতুন পরিচালকরা ছিলেন—খাজা আবদুল গনি, জে. পি. ওয়াইজ, আর. জি. কার্নেগী, জে. জি. এন. পোগজ, মৃত্যুঞ্জয় দত্ত, দীননাথ ঘোষ, উইলিয়ম ফলি এবং মধুসূদন দাস। প্রথম সেক্রেটারি আলেকজান্ডার ফরবেস, পরে জি. এম. বেইলি। পরে বেঙ্গল ব্যাংক কিনে নেয় ঢাকা ব্যাংককে। পরিবর্তে ২,৯০,৯৯৯ টাকার শেয়ার দেওয়া হয় ঢাকা ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডারদের।[৭]

At a meeting of the Directors of the Dacca Bank, held on the 26th April 1856; Kajeh Abdool Gunny was requested to take the chair.

The secretary said before the meeting a statement showing the wishes of the present share holders of the bank with regard to the question of extending the deed of partnership expiring by effluxion of time on the 30th of June next, as provided for in the 4th clause of the Deed of settlement of the Bank.

From this statement it would appear that there in favour of

Extending the term	21	share holders	83 votes
Closing the Bank	11	Do	47 do
Who have not replied	4	Do	20 do

It was therefore resolved that the Bank be wound up : and the share holders paid off as soon as possible.

It was further proposed and unaniously agreed, that as New Bank be established, and that the option of pruchasing the new stock be offered first to the share holders of the old Bank, before being offered to the public.

The Directors are of opinion that from the increasing trade of Eastern Bengal, an enlarged Capital can be safely and profitably employed, and therefore propose to continue the Capital as present of 1000 shares of Rs. 500 each, of which as 300 are to be paid up, in order that they may have the power, if required, of increasing the capital by calling up further instalments. After a vote of thank to the chairmen the meeting separated.

(Signed) K. Abdool Gunny
Chairman[৮]

The Dacca Bank instituted in 1848, has just been wound up, in consequence of

the expiry of the deed of partnership, and the wish of the many share holder residing at a distance, and unacquanted with Dacca, to realise their shares. The share holders residing at Dacca determined to open a New Bank, which has been done. Almost all shares have been already taken by inhabitants of Dacca. It has always been our opinion that the Director of Bank puffed the institution too little. No one knew anything about it and the share were unsalable except in Dacca. The following is result of the useful operations of the Bank during the last ten years. In June 1847 the first half yearly dividend at the rate of 6 percent per annum was declared. Ever since that date the half yearly dividend was at the rate of 8 percent per annum, except in December 1853 when 8½ percent January 1856, 12 percent July 1856, 13¼ percent were the rates per annum at which the half yearly dividends calculated and paid to the share holders. During the ten years a fund of Rs 23,235. 11.11–the whole paid up capital being only Rs. 2,92,800 was accumulated. On the closing of the Bank Rs. 96. 12 percent in addition to the half yearly dividend at the rate of 13¼ percent perannum was declared to be immdiately payable to retiring share holders of the balance Rs. 29,152. 12.7 the Directors hope shortly to realise nearly the whole. The case of delay in the imperfect commercial law signing in the Mofussil. The Bank has been as a speculation, to trade it has been of incalculable benifit as those engaged in trade will acknowledge. We wish the New Bank all success.[৯]

ঢাকা লোন অফিস :

ইতঃপূর্বে ঢাকাস্থ জনগণের টাকা ধার করিবার বা টাকা আমানত রাখিবার নিমিত্ত এক বেঙ্ক ও জোদ্দার ভিন্ন আর কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু বেঙ্ক হইতে টাকা ঋণ করিতে সকলের সুবিধা হয় না। তথায় টাকা আমানত রাখিলেও কোন সুদ পাওয়া যায় না। আমানত টাকা বেঙ্ক হইতে বাহির করিয়া লইতেও বিলক্ষণ কালবিলম্ব হয়। পোদ্দার দোকানে যে সে ব্যক্তি টাকা ধার লইতে পারে বটে, কিন্তু তথায় সুদের হার নিতান্তই উচ্চ। বিষয় ও ব্যক্তি বিবেচনায় সাধারণ মহাজন ও পোদ্দাররা এত উচ্চ হারে টাকা ধার দিয়া থাকে যে, তাহাই অনেকের অচিরে সর্বনাশের কারণ হইয়া উঠে। পোদ্দার দোকানে সুদের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই, যাহারা নির্বোধ ও ঋণগ্রহণে অতিব্যগ্র, তাহাদিগের নিকট হইতে শতকরা ২, ৩, ৪, ৫ এমন কি ১০ টাকা হারেও সুদ লইতে অনেকে কুণ্ঠিত হয় না। কেহ কেহ সুযোগ পাইলে অল্প টাকা দিয়া অধিক টাকার খতও লেখাইয়া লয়। অপরিণামদর্শী বিলাসপ্রিয় ব্যসনপরায়ণ বড় মানুষ সন্তান পাইলে ত কোন কোন পোদ্দারের পোয়াবারই উপস্থিত হয়, যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ করারই তাহাদিগ হইতে খত লেখাইয়া লইয়া ক্রমে কিছু অর্থ ধার দেয় এবং পরে প্রচুর টাকার দাওয়া করিয়া বসে। অনেক সময়ে অনেক আমানতকারীকে অনেক পোদ্দার প্রবঞ্চিত করিয়া থাকে। হয়ত এক ব্যক্তি কোন পোদ্দার দোকানে কতক টাকা আমানত রাখিয়া পরলোকগমন করিল, তদুত্তরাধিকারী আসিয়া ঐ টাকা চাহিলে পোদ্দার দোকানদার বলিয়া উঠিল, "মৃত্যুর বহুদিবস পূর্বেই আমানতকারী স্বয়ং টাকা লইয়া গিয়াছে। আমানতী লিখন খোওয়া গিয়াছিল তখন উহা ফেরত দেওয়া হয় নাই।" কোন ব্যক্তি কোন এক পোদ্দার দোকানে কতক টাকা আমানত রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ করিল, হয়ত তাহার পুত্র আসিয়া ঐ দোকানের খোঁজই করিতে পারিল না। ইত্যাকার ঘটনা ঢাকায় সচরাচর সংঘটিত হয় দেখিয়াই ডাক্তারবাবু কালীকুমার দাস প্রমুখ কতিপয় কার্যদক্ষ উদ্যোগশীল ব্যক্তি লোকের অসুখ অসুবিধা নিরাকরণ মানসে কতিপয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে এখানে

একটি লোন আফিস সংস্থাপন করিয়াছেন। ১২৮৬ সনের ১লা চৈত্র তারিখে প্রথমত ১০০০০ দশ হাজার টাকা মূলধন স্থির করিয়া এই আফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ মূলধন সংগ্রহার্থ ১০/১০ টাকার এক অংশ অবধারণ করিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইলে ঐ চৈত্র মাসে উহার ৯০ অংশ বিক্রীত হয়। তৎপর ১২৮৭ সনে পূর্বাবিক্রীত অংশসহ ৯৭৩ অংশ বিক্রয় হইলে ৯৭৩০ টাকা মূলধন হয়। এই দুই বৎসর কাল হইতে উহার ডিবিডেন্ড শতকরা মাসিক ২ টাকা হিসাবে প্রতি তিন তিনমাসে অংশিগণকে প্রদত্ত হইলে বহুসংখ্যক লোকের আগ্রহ বর্ধিত হয়। তদ্বশতই তখন মূলধন ৫০ পঞ্চাশ হাজার টাকা করিতে অংশীদারদিগের ইচ্ছা হইয়া উঠে। ১৮৮৮ সনে পূর্ব বিক্রীত অংশ সমেত ৪০৬০ অংশ বিক্রীত হয়। সুতরাং তাহাতে ৪০৬০০ টাকা মূলধন হইয়া উঠে। তদনন্তর ডিরেক্টরগণ সবিশেষ বিবেচনা করিয়া আয় ও অংশবৃদ্ধির প্রয়োজন অনুভব করিলে, উহার মূলধন লক্ষ টাকা নিরূপণ করা হয়। তদনুসারে বর্তমান অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ই তারিখ পর্যন্ত ৭৩৬৬ অংশ বিক্রীত হইয়াছে। সুতরাং উহাতে ৭৩৬৬০ টাকা মূলধন সংগৃহীত হইয়াছে। সব আসিস্টান্ট সার্জন কালীকুমার দাস এই লোন অফিসের প্রতিষ্ঠাতা ও সর্ববিষয়ক তত্ত্বাবধায়ক। তাঁহারই প্রযত্নে এত শীঘ্র এই লোন আফিসের এতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণ ভরসা করা যাইতে পারে, ঢাকা লোন অফিস সত্বরই ফরিদপুরের প্রসিদ্ধ পুরাতন লোন অফিসের তুল্যকক্ষ হইয়া উঠিবে। ইদানীং ঢাকা লোন অফিসটি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষকবাবু বৈকুণ্ঠনাথ রায় প্রভৃতি সুযোগ্য ও সুদক্ষ ১৬ জন ডিরেক্টরের তত্ত্বাবধানাধীন আছে। গত ত্রৈমাসিক ডিভিডেন্ড শতকরা ২ টাকা হিসাবে প্রদান করিয়াও সুদের প্রায় সহস্রাধিক টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। এতদ্বারাই এই লোন আফিসের উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রতিপালিত হইতেছে।

এই লোন অফিসে যে সে ব্যক্তি নিঃশঙ্কচিত্তে টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারেন এবং যখন ইচ্ছা তখনই টাকা ফেরত লইতে পারেন। স্থির আমানতকারীরা মাসিক শতকরা বার আনা হিসাবে এবং অস্থির আমানতকারীরা দু আনা হারে সুদ প্রাপ্ত হন। প্রতি তিন মাস অন্তে অংশিগণের ডিবিডেন্ড বণ্টনও স্থির না হইতেই আমানতকারীরা সুদ পাইতে পারেন।

ঢাকা লোন আফিসের অধিকাংশ টাকাই হুণ্ডিদ্বারা কর্জ লাগান হয়। ২ টাকার অধিক হারে ইহাতে সুদ গৃহীত হয় না। যাহার অংশীদিগের সবিশেষ পরিচিত ও বিশ্বাসী তাহারা এক টাকা হার সুদেও টাকা ধার পাইতে পারেন। এই লোন আফিসটি রেজিষ্টরীকৃত ও সুবিজ্ঞ সাধুজন দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং ইহাতে কোনও বিষয়ে কোনওরূপ সন্দেহের কারণ নাই। বোধহয় এই কারণেই এত শীঘ্র ইহার এত উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। ইহাতে কর্জ দানকারী, ঋণগ্রহীতা ও আমানতকারী, সকলেরই সবিশেষ সুবিধা। অতএব এই ত্রিবিধ লোকেরই এই লোন আফিসের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকে, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়।[১০]

এই পত্রিকায় ১৮৮৫ সালের ৯ আগস্ট প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় : "সকলেই অবগত আছেন, কি অভিপ্রায়ে ঢাকা লোন আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং কিরূপে অল্পদিন মধ্যে সামান্যাবস্থা হইতে এক বৃহৎ ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন রূপে দাঁড়াইয়াছিল। যদিও এই লোন আফিস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সকল সিদ্ধ হইতে পারে নাই—কেবল টাকা কর্জ দেওয়া ও আমানত রাখা ভিন্ন অন্যান্য ব্যবসায়াবলম্বনরূপ উদ্দেশ্যসাধনে হস্তক্ষেপ হয় নাই, তথাপি দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় যে, ক্রমে যৌথ কারবারে যোগদান করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, এটি তাহার এক দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছিল। এ কার্যে যে, কতকটা সফলতাও ঘটিয়াছিল, উক্ত আফিসের ১২৯১ সনের পূর্ববর্তী ৪/৫ বৎসরের হিসাব ও ডিভিডেন্ডের হার দেখিলেই তাহা উপলব্ধি হইতে পারে। আর কিছু না হউক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও নানা শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোক যে, এই আফিসের প্রসাদে অনেক সময় লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন তাহাতে সংশয় নাই। সুতরাং সংক্ষেপে ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই কর্পোরেশন সাধারণের হিতসাধন করিয়া অংশীদারদের লাভের হেতুভূত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বড়ই ..., দেশীয়দের অন্যান্য যৌথ কারবারে ... ঘটিয়া যেরূপ লাঞ্ছনা হইয়া

থাকে, ঢাকা লোন আফিসও কিয়দ্দিন মধ্যে নানা কারণে তদ্রূপ লাঞ্ছনাভোগে বাধ্য হইয়া পড়িল। এক এক হুজুগে এক এক কারবারে যে অধোগতি হইতে আরম্ভ হয়, এই আফিস সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়া উঠিল। স্থানীয় কয়েকজন কারবারকারীর আকস্মিক অধপাতদর্শনে হউক, ঋণদাতৃ বিশেষের স্বার্থসিদ্ধিমূলক দুশ্চেষ্টায় হউক, লোন আফিসের অনেক টাকা মারা পড়িয়াছে, এই কথায়ই হউক অথবা কারণান্তর প্রযুক্তই হউক, দেশময় রব উঠিয়া গেল, এরূপ কারবারে বিশ্বাস স্থাপন বুদ্ধিমানের কার্য নহে। যাঁহারা ইহার অংশীদার তাঁহাদের ক্ষতিগ্রস্ত হইবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এই হুজুগে জনরবে আমানতকারীরা দলে দলে আফিসদ্বারে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। দূরতর স্থানবাসীরা পত্রদ্বারা আমানতী টাকা উঠাইয়া লইবার নোটিশ দিতে থাকিলেন। সমস্ত আমানতকারী একসঙ্গে টাকা উঠাইয়া লইতে চাহিলে টিকিয়া থাকিতে পারে, এমন কোন 'ব্যাঙ্কিং-বডি' বা ব্যবসায়ী আছে কিনা জানিনা। আমাদের ত এরূপ বোধ হয় না যে, ঐ অবস্থায় কোন কারবারই অঙ্গহীন না হইয়া তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে। ইংরাজ গবর্নমেন্ট যে পরিমাণ কারেন্সী নোটবাহির করিয়াছেন, তাহার চারিভাগের একভাগও কোন ব্যাঙ্কে একসময় ভাঙাইতে গেলে সকল টাকা পাওয়া যায় না। তখন গবর্নমেন্টকেও ফেইল পড়িতে হয়। সুতরাং আমানতকারীদের ন্যস্ত অর্থ উঠাইয়া লইবার হুজুগে ঢাকা লোন আফিসের দৃশ্য কিরূপ হইল, পাঠক সহজেই তাহা বুঝিতে পারেন। বলিতে কি, আফিসটি "যায় যায়" এমন অবস্থায়ই দাঁড়াইল। কিন্তু ডিরেক্টরগণ বুদ্ধিমানের ন্যায় ঘরে কষ্ট পাইয়াও বাহিরে মান বজায় রাখিবার চেষ্টা পাইলেন—প্রথমত ডিভিডেন্ট প্রদান বন্ধ করিলেন। পরে অংশীদিগের নিকট টাকা জমা চাহিলেন। এইরূপ প্রাণে বাঁচিয়া ১২৯১ সনের চোট কোনরূপে সামলাইয়া রহিলেন বটে, কিন্তু শত্রুর দুশ্চেষ্টায়ই হউক অথবা "সেক্রেটারি ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন, ডিরেক্টরগণ কর্পরেশনের হিতের দিকে না চাহিয়া নিজ নিজ স্বার্থের প্রতিই দৃষ্টি রাখিয়াছেন" এই কথা উত্থাপিত হওয়াতেই হউক, লোন আফিস আবার টলটলায়মান হইয়া উঠিল। অংশীদারদের অনেকেই লোন আফিসের অবস্থা বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, অধিকন্তু এক বৎসর যাবৎ কেবল আফিসটির নিন্দাবাদই শুনিয়া আসিতেছি .... কতকদিন হইতে ডিভিডেন্ড কিছুই ...., সুতরাং তাঁহারা সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন। ১২৯২ সনে নূতন ডিরেক্টর নিয়োজিত হইলেও তাঁহাদের আশঙ্কা দূরীভূত হইল না। পক্ষান্তরে হৃৎকম্প উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকিল এবং তাঁহারাও স্ব স্ব আমানতী টাকা উঠাইয়া লইবার নোটিস দিলেন। সেক্রেটারি কার্য পরিত্যাগে উদ্যত হইলেন। আফিসটি মারা পড়িবার পথে দাঁড়াইল। ডিরেক্টরগণ এই অবস্থাদর্শনে ব্যথিত হইলেন এবং লোন আফিসের প্রকৃত অবস্থা ও জনরব সম্মুস্থদোষক্রটির মূলতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য এক সাব কমিটি গঠিত করিলেন। কর্তব্যনিষ্ঠ, বিচক্ষণ তিনজন সম্ভ্রান্ত লোক এই কার্যে ব্রতী হইয়া সেক্রেটারির সাহায্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত অবস্থা দর্শনপূর্বক যে রিপোর্ট করিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগত্যর্থ নিম্নে তাহা প্রকটন করা হইল—

"আমরা বিশেষ অনুসন্ধান ও হিসাবাদি পরীক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত অবস্থা জানিতে পারিয়াছি এবং বিশ্বাস করি, ইহাই লোন আফিসের প্রকৃত অবস্থা।

১. বর্তমান সময়ে এই আফিসের মোট ২১৮৩৯৩ ॥ আনা লগ্নীতে আছে। তন্মধ্যে ৮০১২৬ টাকার জন্য স্থাবরসম্পত্তি রেহাণে আবদ্ধ রহিয়াছে। সোনা-রূপাদি বন্ধক রাখিয়া ৩৪ ৫/৯ চোদ্দ আনা দশ পয়সা লগ্নি করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ১৩৪৮০৭ নয় আনা দশ পয়সা বিনা রেহাণে লগ্নি আছে।

২. এই মোট লগ্নি টাকার মধ্যে ১৭৫০৩৭ টাকা ছয় আনা পনেরো পয়সা আদায়ের উপযুক্ত বাকি ৪৩৩৫৬ দু আনা পাঁচ পয়সা আদায় সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে। আদায়ের উপযুক্ত ১৭৫০৩৭ টাকা ছয় আনা পনের পয়সার যে সুদ বাকি রহিয়াছে তাহার পরিমাণ ৫০৫১৩ টাকা নয় আনা ১৫ পয়সা।

৩. এতদ্ভিন্ন লোন আফিসের নিম্নলিখিত মূল্যের নিম্নলিখিত সম্পত্তি রহিয়াছে —

বৈষ্ণবচরণ বসাকের বাড়ি	— ৩০০০ টাকা
রূপকুমারীর বাড়ির ৪ আনা অংশ	— ২৩৩ টাকা ৪ আনা ৫ পয়সা
কৃষ্ণচন্দ্র বসাকের ২৫৫৬ নং তালুক	— ২০৮০ টাকা
রামকৃষ্ণ সিংহের বসতবাড়ির ৮ আনা অংশ	— ২১২ টাকা ৪ আনা ৫ পয়সা
অন্নপূর্ণা দাস্যায় ৩ খণ্ড পত্তনী তালুক	— ১৩৭৫ টাকা।

৪. এই আফিসে স্থির ও অস্থির সর্বশুদ্ধ ৭৮৩৫২ টাকা ৩ আনা ৫ পয়সা আমানত আছে, তন্মধ্যে ৭০৬৭৯ টাকা ৬ আনা ১৫ পয়সা স্থির ৬৯২২ টাকা ১ আনা ১০ পয়সা অস্থির এবং অবশিষ্ট ৭৫০ টাকা ১৩ আনা ১০ পয়সা বিনা সুদে আমানত আছে।

৫. ঐ আমানতী টাকার মধ্যে স্থির আমানতের ৩৮৫২১ টাকা ৬ আনা ১০ পয়সা উঠাইয়া লইবার জন্য নোটিস জারি হইয়াছে।

৬. আমানতী ৭৮৩৫২ টাকা ৩ আনা ১৫ পয়সার মধ্যে ১১৭০৩ টাকা ৯ আনা ১৫ পয়সা লোন আফিসের নিজ আমানত।

৭. লোন আফিসের মূলধন ১৪৭০৩ অংশে ১৪৭০৩০ টাকা ও আমানত ৭৮৩৫২ টাকা ৩ আনা ১৫ পয়সা মোট দেনা ২২৫৩৮২ টাকা ৩ আনা ১৫ পয়সা। তন্মধ্যে নিজ আফিসের আমানতী ১১৭০৩ টাকা ১১ আনা ১৫ পয়সা বাদে প্রকৃত দেনা ২১৩৬৭৮ টাকা ৮ আনা মাত্র। সম্পত্তি মধ্যে লগ্নীতে উসুলের উপযুক্ত আসল ১৭৫০৩৭ টাকা ৬ আনা ১৫ পয়সা ও তাহার আদায়োপযুক্ত সুদ ৫০৫১৩ টাকা ৬ আনা ১৫ পয়সা, মোট ২২৫৫৫১ টাকা ১ আনা ১০ পয়সা এবং স্থাবর সম্পত্তির মূল্য ৬৯০০ টাকা ৯ আনা ১০ পয়সা, একুনে ২৩২৪৫১ টাকা ১০ আনা। এই মোট আদায়োপযুক্ত ২২৫৫৫১ টাকা ১ আনা ১০ পয়সা ও সম্পত্তির মূল্য ৬৯০০ টাকা ৪ আনা ১০ পয়সা হইতে ভিন্ন ... আমানতী ৬৬৬৪৮ টাকা ৮ আনা বাদ দিলে মোট .... সম্পত্তি ও আদায়ের উপযুক্ত লগ্নী ...।

৮. এই লোন আফিস ১২৮৭ সনের প্রথম ভাগে স্থাপিত হইয়াছে তদবধি ১২৯০ সনের পৌষ পর্যন্ত অংশিগণকে শতকরা মাসিক ২ টাকা হারে ও তৎপর ঐ সনের চৈত্র মাস পর্যন্ত মাসিক ১ টাকা হারে ডিভেডেন্ড (সুদ) দেওয়া হইয়াছে।

৯. পূর্বোল্লিখিত কারণ ও অবস্থাদর্শনে আমরা ইহা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, আমানতকারীদের টাকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। ঐ টাকা আদায় হইয়া যে টাকা বাকি থাকিবে, তদ্দ্বারা অংশিগণের সম্পূর্ণ টাকা আদায় হইয়া আরও লাভ হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। তবে লগ্নী টাকা আদায় হইতে কালগৌণ হইবার কথা।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ রায়। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দাস। শ্রীব্রজবিহারী রায়। শ্রীকালীকুমার দাস।

এই রিপোর্টের ভিত্তিতে মন্তব্য করা হয় ঃ

সাব কমিটি রিপোর্ট আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হয়, এখনও এমন অবস্থা দাঁড়ায় নাই যে, লোন আফিস ফেইল হইবে এবং আমানতকারী ও অংশীদারগণের টাকা মারা যাইবে। সেক্রেটারি বা ডিরেক্টরগণের ত্রুটিতে হউক অথবা কারবারের প্রকৃতি দোষেই হউক, ৪২৩৫৬ টাকা ১ আনা ৫ পয়সা যে অনাদায়ের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে, উহার আশা ছাড়িয়া দিলেও লোন আফিস বেশ চলিতে পারে। তবে হুজুগবশে আমানতকারীরা যে একযোগে টাকা উঠাইয়া লইবার জন্য অধীর হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের কিছু ধৈর্যধারণের প্রয়োজন। ইহারা ধৈর্য ধরিলে, সেক্রেটারি পদে কার্যদক্ষ অভিজ্ঞ লোক নিয়োজিত হইলে (ভূতপূর্ব সেক্রেটারি বাবু কালীকুমার দাস কার্য পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া) এবং ডিরেক্টরগণ মনোযোগপূর্বক, কার্য পরিদর্শন করিলে, ঢাকা লোন আফিস অচিরকালমধ্যেই গোলযোগের হস্ত হইতে নির্মুক্ত হইয়া

পুনরায় অংশিগণকে লাভের টাকা প্রদান করিতে সমর্থ হইবে। আমানতকারীরা অনুগ্রহবান হইলে, বৃথা সন্দেহের বশীভূত হইয়া একযোগে টাকা উঠাইয়া না লইলে এখন হইতেই অংশিগণকে সুদ দেওয়া যাইতে না পারে এমন নয়। একটি যৌথ কারবারের এরূপ অবস্থা সত্বে তাহার... ঢাকা লোন অফিসটি বজায় থাকিয়া আমানতারী ও অংশীদারগণের ক্ষতির পরিবর্তে লাভ হইতে পারে বিধবাদের কষ্টসঞ্চিত লোন আফিস গচ্ছিত টাকাগুলি যাহাতে মারা না পড়ে, সর্বসাধারণেরেই সে চেষ্টা করা কর্তব্য। সুতরাং আমানতকারীদিগকে আমাদের ন্যায় সকলেই এইকথা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে—"অধীরতা অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের কোনও লাভ নাই ...। তাঁহাদের চাপে লোন আফিস যদি উঠিয়া যায়, তাহা হইলে উহার স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি রিসিবরের হস্তে যাইয়া অংশানুক্রমে পাইতে বহুকাল বিলম্ব ও অনেক অযথা ব্যয়জনিত ক্ষতি অবশ্যই ঘটিবে। কিন্তু তাহারা স্থৈর্যাবলম্বন করিলে কিয়ৎকাল মধ্যে গচ্ছিত টাকা উঠাইয়া লইতে পারিবেন; অথচ তাঁহাদের ও অংশিগণের কাহারও ক্ষতি না হইয়া লাভই দাঁড়াইবে।" কিঞ্চিৎকাল ধৈর্য ধরিয়া থাকিলে যখন এরূপ অবস্থা হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা, তখন কি একেবারে অধীর হইয়া পড়া উচিত? কখনই নহে।

গত ১৭ শ্রাবণ ডিরেক্টরগণের আহ্বানানুসারে অংশীদারদের যে সাধারণ সভা হইয়াছিল, তাহাতে ঢাকা আফিসের পূর্বোল্লিখিত অবস্থা বিবৃত হইয়াছে; যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি উক্ত আফিসে যাইয়া হিসাবাদি দেখিতে পারেন, ইহাও বলিতে ত্রুটি হয় নাই। আমরা উপসংহারকালে; আমানতকারীদিগকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি; তাঁহারা হিসাবাদি দর্শনপূর্বক জনরবসঞ্জাত সংস্কার দূরীভূত করুন এবং একযোগে টাকা উঠাইয়া লইবার ক্ষতিকর অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া একটি সাধারণহিতকর যৌথ কারবারের অস্তিত্ব রক্ষার মনোযোগী হউন।"

যেকোন শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে আজ ব্যাঙ্কের ভূমিকা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। দেশভাগের পর সমস্ত ভারতীয় ব্যাঙ্কের লেনদেন বন্ধ হয়ে যায় পূর্ব পাকিস্তানে। অর্থনৈতিক বিপর্যয় রোধ করতে প্রথমে 'সিটি ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তান' এবং তারপর 'ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তান' স্থাপিত হয়। পরবর্তী সময়ে আরো বেশ কয়েকটি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা কম নয়। অধিকাংশ ব্যাঙ্কের প্রধান কেন্দ্র ঢাকা শহরে এবং সব ব্যাঙ্কেরই একাধিক শাখা রয়েছে। এখানে ব্যাঙ্কের একটি তালিকা দেওয়া হল ঃ

ব্যাংকের নাম	স্থান	শাখা সংখ্যা
১. বাংলাদেশ ব্যাংক	ঢাকা শহর	১
২. অগ্রণী ব্যাংক	ঢাকা শহর	৮৪
"	গাজিপুর	১৩
"	মানিকগঞ্জ	১০
"	মুন্সিগঞ্জ	১৩
"	নারায়ণগঞ্জ	১৫
"	নরসিংদি	৯
৩. জনতা ব্যাংক	ঢাকা শহর	৯২
"	গাজিপুর	১৩
"	মানিকগঞ্জ	১০
"	মুন্সিগঞ্জ	১৩
"	নারায়ণগঞ্জ	১৫
"	নরসিংদি	৯

ব্যাংকের নাম	স্থান	শাখা সংখ্যা
৪. রূপালী ব্যাংক	ঢাকা শহর	৬৬
”	গাজিপুর	২
”	মানিকগঞ্জ	৫
”	মুন্সিগঞ্জ	৪
”	নারায়গণগঞ্জ	৮
”	নরসিংদি	২
৫. সোনালী ব্যাংক	ঢাকা শহর	১২৩
”	গাজিপুর	১৯
”	মানিকগঞ্জ	১০
”	মুন্সিগঞ্জ	১৬
”	নারায়গণগঞ্জ	২০
”	নরসিংদি	১৯
৬. আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক	ঢাকা শহর	১
৭. গ্রীনলেজ ব্যাংক	ঢাকা শহর	৩
”	নারায়ণগঞ্জ	১
৮. স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	ঢাকা শহর	১
৯. সিটি ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া	ঢাকা শহর	১
১০. হাবিব ব্যাংক লিঃ	ঢাকা শহর	১
১১. ব্যাংক ইন্দো সুইজ	ঢাকা শহর	১
১২. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	ঢাকা শহর	২১
”	মানিকগঞ্জ	১২
”	নারায়ণগঞ্জ	১২
”	নরসিংদি	১৩
”	মুন্সিগঞ্জ	১৫
১৩. বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক	ঢাকা শহর	১
১৪. আরব বাংলাদেশ ব্যাংক	ঢাকা শহর	৫
”	নারায়ণগঞ্জ	১
১৫. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	ঢাকা শহর	৫
”	নারায়ণগঞ্জ	১
”	নরসিংদি	১
১৬. ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ	ঢাকা শহর	৭
”	নারায়ণগঞ্জ	১
”	নরসিংদি	১
১৭. সিটি ব্যাংক লিঃ	ঢাকা শহর	৮
”	নারায়ণগঞ্জ	১
১৮. আই. এফ. আই সি ব্যাংক লিঃ	ঢাকা শহর	৭
”	নারায়ণগঞ্জ	১
১৯. ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ	ঢাকা শহর	৯
”	নারায়ণগঞ্জ	১
”	নরসিংদি	১

ব্যাংকের নাম	স্থান	শাখা সংখ্যা
২০. পুবালী ব্যাংক লিঃ	ঢাকা শহর	৫৪
”	গাজিপুর	৪
”	মানিকগঞ্জ	৩
”	মুন্সিগঞ্জ	৮
”	নারায়ণগঞ্জ	৫
”	নরসিংদি	৫
২১. উত্তরা ব্যাংক লিঃ	ঢাকা শহর	৫০
”	গাজিপুর	২
”	মানিকগঞ্জ	৪
”	মুন্সিগঞ্জ	২
”	নারায়ণগঞ্জ	৫
”	নরসিংদি	৪
২২. আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	ঢাকা শহর	১

—অর্থাৎ কর্মরত ২২টি ব্যাংক কেবলমাত্র বৃহত্তর ঢাকা জেলায় ৭৭০টি শাখার মাধ্যমে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করছে। এইসব ব্যাংক ছাড়াও ২২টি ইনসিওরেন্স কোম্পানি পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরে কর্মরত।

হাট

[বর্তমান সংস্করণ ৬২১ পৃঃ দেখুন]

দুই বাংলার জনজীবনে হাটের গুরুত্ব আজও অপরিসীম। সপ্তাহে একদিন বা দুদিন এই হাট বসে। মানুষ তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেমন হাট থেকে কেনে, তেমন প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত দ্রব্যাদি কিনে নিয়ে ব্যবসায়ীরা রপ্তানি করে। আমদানি হয় বেশ কিছু দ্রব্যাদি, যা মানুষের প্রয়োজন মেটায়। ঢাকা জেলার বিভিন্ন জেলায় হাটগুলি এবং সেইসব হাটে যে দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যায় তার একটি তালিকা দেওয়া হল ঃ

শ্রীপুর থানা

১. শ্রীপুর	আমন ধান, আউস ধান, জাঠ, সরষে, পাট ও গবাদিপশু
২. বর্মি	”
৩. কাওরাইদ	”
৪. রাজবাড়ি	”
৫. মাওনা	”

জয়দেবপুর হাট থানা

৬. মির্জাপুর হাট	”
৭. জয়দেবপুর	”
৮. টঙ্গি	”

জয়পুর হাট থানা

৯. সাভার	শস্য, বার্লি, পাট
১০. রানিগঞ্জ	”
১১. বাগদুনিয়া	”

ধামরাই থানা

১২. ধামরাই	শস্য, বার্লি, পাট
১৩. শাদুল্লাপুর	”
১৪. ধানতারা	”
১৫. ফুলবাড়ি	”
১৬. আশুলিয়া	”
১৭. কাশিমপুর	”

কালীগঞ্জ থানা

১৮. পুবাইল	শস্য, সরষে, পাট
১৯. কাটারগঞ্জ	”
২০. ঘোড়াশাল	”
২১. চরসিন্দুর	”

কালিয়াকৈর

২২. কালিয়াকৈর	আউস, আমন, বার্লি, সরষে
২৩. ফুলবাড়িয়া	”

সাভারথানা		
২৪.	জোন্তা	আউস, আমন, বার্লি, সরষে
কাপাসিয়া থানা		
২৫.	কাপাসিয়া	সরষে, শস্য, পাট, আখ, মশলা
২৬.	দামুয়া নারায়গঞ্জ	,,
২৭.	বাইতহাট	,,
২৮.	নয়ারবাজার	,,
নওয়ারগঞ্জ থানা		শস্য, বার্লি
২৯.	নওয়াবগঞ্জ	,,
৩০.	কামারগঞ্জ হাট	,,
৩১.	কলাকোঁপাবাজার	,,
৩২.	বাগমারাবাজার	,,
৩৩.	আগলাবাজার	,,
৩৪.	বায়খালি হাট	,,
৩৫.	বান্দুরা বাজার	,,
দোহার থানা		
৩৬.	মেফুলাবাজার	,,
৩৭.	দেবীনগর হাট	,,
কেরানিগঞ্জ থানা		
৩৮.	আটিহাট	শষ্য, পেঁয়াজ, রসুন, বার্লি, গবাদি পশু
৩৯.	কলাতিয়া হাট	,,
৪০.	বোহিতপুর	,,
৪১.	খাগাইল হাট	,,
৪২.	বরিসুর	,,
৪৩.	কাইনার হাট	,,
৪৪.	বিবিরবাজার	,,
৪৫.	জিনজিরা	,,
তেজগাঁও থানা		
৪৬.	তেজগাঁও	,,
৪৭.	সুলতানগঞ্জ	,,
৪৮.	মিরপুর	,,
৪৯.	বারিদ	,,
৫০.	কোয়েলপাড়া	,,
৫১.	কাওরানবাজার	,,
৫২.	মেরাদিয়া হাট	,,
মানিকগঞ্জ থানা		
৫৩.	মানিকগঞ্জ হাট	আমন
৫৪.	আটিগ্রাম হাট	,,
৫৫.	বালিরটেক হাট	,,
৫৬.	বাচ্চামারাই হাট	,,
৫৭.	জাবরা হাট	,,
ঘিওর থানা		
৫৮.	ঘিওর	পাট, আমন, বার্লি
৫৯.	সাটুরিয়াহাট	,,
৬০.	উমানদাপুরহাট	,,
হরিরামপুর থানা		
৬১.	কান্তাপাড়া	,,
৬২.	লিছরাগঞ্জ হাট	,,
৬৩.	ঝিটকা	,,
৬৪.	ধোলামুরা	,,
শিবালয় থানা		চাল, শস্য,
৬৫.	উখালি হাট	পাট, ডাল, দুধ
৬৬.	জাফরগঞ্জ হাট	,,
৬৭.	নবী	,,
৬৮.	মালুচি হাট	,,
সিংগাইর থানা		
৬৯.	বান্দার হাট	চাল, শস্য, পাট, ডাল ও তরিতরকারি
৭০.	সিরুমিয়া হাট	শস্য, তরিতরকারি, পাট, মুরগি, ডাল, মাছ
৭১.	চারিগ্রাম	চাল, শস্য, ডাল, পাট, মাছ, তরিতরকারি, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য
৭২.	বৈরাহাট	চাল, শস্য, পাট, মুরগি, মাছ এবং ডিম
৭৩.	জয়মন্দহা	শস্য, পাট, মাছ, দুধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য, মুরগি, তরিতরকারি
৭৪.	সিংগাইরহাট	,,
৭৫.	শ্রীনগর হাট	পাট, মাছ, চাল দুধ ও তরকারি

মুন্সিগঞ্জ থানা

৭৬. মুনসির হাট	কলা, পাট, আখ, আলু, তামাক, তরি-তরকারি ও গরু
৭৭. মিরকাদিম	”
৭৮. মাফুহাতি	”
৭৯. রেকাবিবাজার	”
৮০. চায়তালিয়াহাট	”

টঙ্গিবাড়ি থানা

৮১. দিঘিরপার হাট	”
৮২. বাখিয়া হাট ও বাজার	চাল, মাছ এবং তরিতরকারি
৮৩. পুরনোহাট এবং বাজার	”
৮৪. আড়িয়াল হাট	চাল, মাছ, ডাল, তরকারি
৮৫. কালিগাও হাট	পাট, শস্য ও ডিম
৮৬. সিদ্ধেশ্বরী বাজার	পাট, তেলবীজ ও তরকারি
৮৭. বেতনা হাট	চাল, মাছ ও তরকারি

লৌহজঙ থানা

৮৮. দিঘালীবাজার	পাট, মাছ, দুধ ও তরকারি
৮৯. জনকসারবাজার	”
৯০. শিমালিয়াবাজার	”
৯১. জোসালদিয়াবাজার	”
৯২. নোয়াপাড়া হাট	”

গজারিয়া থানা

৯৩. হোসাইনাদি হাট	”
৯৪. রসুলপুর হাট	শস্য, চাল, পাট ও গবাদি পশু

সিরাজদিখান থানা

৯৫. তালতলা হাট	মাছ, নৌকা, পাট, চাল, শস্য এবং তরিতরকারি
৯৬. ইছাপুরা বাজার	চাল, মাছ, দুধ ও তরকারি
৯৭. গিরিগঞ্জ হাট	শস্য, চাল, গবাদিপশু ইত্যাদি
৯৮. ইমামগঞ্জ হাট	”
৯৯. রাজানগরবাজার	গবাদি পশু
১০০. সৈয়দহাট	”
১০১. মোহনগঞ্জবাজার	”

শ্রীনগর থানা

১০২. দেউলভোগবাজার	পাট, মাছ, চাল, দুধ ও তরকারি
১০৩. বাগরাহাট	”
১০৪. ভাগ্যকুলহাট	”
১০৫. কোলাপাড়া	”
১০৬. সোলাঘর	”
১০৭. বিরতারা	”
১০৮. শিবরামপুর	”

সিরাজদিখান থানা

১০৯. বিহারঘাটা	আমন, মসুর, পাট

বৈদ্যেরবাজার থানা

১১০. বৈদ্যেরবাজার	মাছ, তরকারি, গুড়, গরু ও ছাগল
১১১. কাবাদি হাট	
১১২. উদ্ধাবগঞ্জ	তরকারি, মাছ, পাট, শস্য, চাল, ডাল, সরষে, দুধ, মাছ, মুরগি ও নারকেল

আড়াইবাজার খানা

১১৩. কলাগাছিয়া হাট	আমন, মসুর ও পাট

মনোহরদি থানা

১১৪. মনোহরদি হাট	আমন, পাট, আখ ও পাট

নারায়ণগঞ্জ থানা

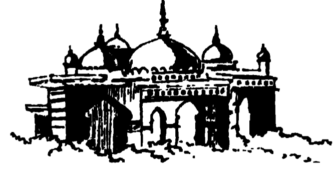
১১৬. নারায়ণগঞ্জ	আউশ, আমন, আখ ও পাট

ফতুল্লা থানা

১১৭. সিদ্ধিরগঞ্জ	মুরগি, মাছ, ডিম, তরকারি, মশলা ও ডাল
১১৮. হাটারদিয়া	তরকারি, মশলা, মুরগি ডিম, চাল, শস্য. গরু ও চামড়া

নরসিংদি থানা		১২২. মুরাপাড়া	বাঁশ ও কাঠ
১১৯. নরসিংদিবাজার	পাট, কলা, আমন, মসুর, আখ, তামাক, শিমুল তুলা ও তাঁতের কাপড়	১২৩. পাঁচদোনা	তরকারি, মুরগি, শস্য, দুধ, মাছ ও চাল
		রায়পুরা থানা	
১২০. মাধবদি	পাট, তাঁতের কাপড় চাল, শস্য, মুরগি, ডিম, গরু, ছাগল, তরকারি, বাঁশ ও কাঠ	১২৪. রায়পুরা	আউশ, আমন, আলু, পিয়াজ, রসুন, কলা, পাট ও তাঁতবস্ত্র
		১২৫. মেথিকান্দা	
রূপগঞ্জ থানা		শিবপুর থানা	
১২১. জংগা	আমন, মসুর, পাট, মাছ, তরিতরকারি ও মশলা	১২৬. লাখপুর	তরকারি, পাট, চাল শস্য, ডিম, সরষে গরু, মুরগি ও ছাগল

১. ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯৩। পৃঃ ৩৭৫-৭৬
২. বাংলায় ভ্রমণ। অখণ্ড সংস্করণ। পৃঃ ২৭৫-৭৬
৩. ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯৩। পৃঃ ৩৬৬
৪. ঢাকা প্রকাশ ১৩ এপ্রিল ১৮৭৯
৫. ঢাকা প্রকাশ ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮
৫. ঢাকা প্রকাশ ২৯ মার্চ ১৮৯৬
৭. উনিশ শতকের বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র। ৬ষ্ঠ খণ্ড। পৃঃ ২৬৮
৮. Dacca News 3 May. 1856.
৯. Dacca News 26 July 1856.
১০. ঢাকা প্রকাশ ৩ ডিসেম্বর, ১৮৮২



৫. কৃষি ও পশু সম্পদ

উত্তরের ভাওয়াল অঞ্চলের উচ্চভূমি বাদে, বৃহত্তর ঢাকার অধিকাংশই সমতল। এখনও জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। মোট আবাদি জমির পরিমাণ ৫,০৭,০৯৭ হেক্টর বা ১২,৫৩,০৬৩ একর। আবাদি জমির ৬২% শতাংশে ধান, ৯% শতাংশে পাট, ১১% শতাংশ জমিতে ডাল, ৫% শতাংশ জমিতে তৈলবীজ, ৩% শতাংশ জমিতে গম এবং ১% জমিতে আখের চাষ হয়। আবাদি জমির ১৪% শতাংশ সেচের অধীন। ধান, পাট, তৈলবীজ, নানাবিধ অর্থকারী ফসল, তরকারি-সবজি, বিবিধ ফল উৎপন্ন হয়।

ঢাকার উৎপন্ন ফল-ফলাদির মধ্যে কলার খ্যাতি দীর্ঘকালের। মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদি ও গাজিপুরে কলার ফলন বেশি। রামপালের অমৃতসাগর কলা বিখ্যাত। অন্যান্য কলার মধ্যে আছে অগ্নিশ্বর, অমৃতভোগ, মর্তমান, চিনিচাম্পা, কবরি, সবরি, কানাই বাঁশি, গেবাসুন্দর প্রভৃতি। ৪,৫৯০ একর জমিতে ৩৪,০৮০ মেট্রিক টন কলা উৎপন্ন হয়েছিল ১৯৮৭-৮৮ খ্রিস্টাব্দে। গাজিপুর, নরসিংদি ও সাভার অঞ্চলে প্রচুর কাঁঠাল জন্মায়। ১৯৮৭-৮৮ সালে কাঁঠাল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৮,৯৭০ মেট্রিক টন। বাংলাদেশের চিরপরিচিত ফলফলাদিতে সমৃদ্ধ জেলা ঢাকা। তুলা চাষ থেকে সমৃদ্ধির সূচনা ঘটেছিল। আজ সেই দুর্মূল্য উৎপাদন সর্ব নিম্নপর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কৃষি ক্ষেত্রে এসে গেছে আধুনিক প্রযুক্তি। সনাতন কুটির শিল্প ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে।

বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ ঃ ১৯৮৩-৮৪

ফসল	জমির আয়তন (একর হিসাবে)
১. খাদ্যশস্য (মোট)	১২,৬৫,৪৪৮
(ক) ধান	১১,৭০,৩৬২
(খ) গম	৭৫,৬২৫
(গ) অন্যান্য খাদ্যশস্য	১৯,৪৬১
২. ডাল	১,২৬,০৭২
৩. তৈলবীজ	১,৪১,১২৮
৪. অর্থকরী ফসল	১,৮০,০৩৭
(ক) পাট	১,৪০,৮২৬
(খ) আখ	২৫,৮৩৭
(গ) তামাক	৫,৫৮২
(ঘ) অন্যান্য	৭,৭৯২
৫. মশলা	৫৫,৫৫২
৬. শাক-সবজি (আলু ও মিষ্টি আলুসহ)	১,১৭,৭০৪
৭. গবাদিপশুর শুষ্ক খাদ্য	৩,৩৩০
৮. জ্বালানি	১,২৬৮

জেমস টেলরের বিবরণ থেকে জানা যায়, আঠার শতকে ঢাকার অন্যতম ফসল ছিল জাফরান। এর উৎকৃষ্ট চাষ হত গঙ্গা ও ধলেশ্বরীর মাঝামাঝি অঞ্চলে। সব থেকে উৎকৃষ্ট ফুল

পাওয়া যেত ধলেশ্বরী তীরে। বেলিসপুরেও উৎকৃষ্ট জাফরানের চাষ হত। এক বিঘা জমিতে ৬ সের বীজের চাষ হত। উর্বর মাটি ও অনুকূল আবহাওয়া হলে, ফুল পাওয়া যেত ১০/১১ সের।

জাফরান বোনার সময় অক্টোবর-নভেম্বর। পাপড়ির রঙ যখন পুরোপুরি কমলা হয় যেত, অর্থাৎ মার্চ-মে মাসের মধ্যে সংগ্রহ করা হত ফুল। ফুল দিনের বেলায় সংগ্রহ করে, রাতে তা জলে ভেজান হত। সাদা জল না বেরোন পর্যন্ত চার পাঁচদিন ধরে তা মাড়ান হত। তারপর সেই ময়লা মুক্ত পিণ্ডকে ছোট ছোট চ্যাপ্টা পিঠার মত বানিয়ে শুকোন হত রোদে। চাষ করতে খরচ পড়ত সাত টাকা। এক বিঘা জমি থেকে লাভ পাওয়া যেত সাড়ে ৩ টাকা। সে সময়ে বাজার দর ছিল ২৫ টাকা মন। জাফরানের বীজ থেকে তৈরি তেল জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হত। সর্ষের অর্ধেকদামে বিক্রি হত এই তেল। কৃষকরা জাফরানের বীজ দুধ চিনি মিশিয়ে খেত। জাফরানে প্রচুর পরিমাণে পটাশ থাকায়, পাতা ও কাণ্ড পুড়িয়ে খার বানিয়ে সাবানের মত ব্যবহার করা হত। ঢাকা নগরীতে বস্ত্ররঙকারীরা ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে উৎপন্ন সমস্ত জাফরান কিনে নিয়েছিল রঙ করার জন্য। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে রপ্তানির পরিমাণ ছিল বেশি। ১৮১০ খ্রিঃ উৎপন্ন হয়েছিল ২ হাজার মন। সবথেকে বেশি জাফরান রপ্তানি হয়েছিল ১৮২৪-২৫ খ্রিস্টাব্দে—৮,৪৪৮ মন। এই জাফরানের তিনভাগের দুভাগ ঢাকা সংলগ্ন এলাকায় উৎপন্ন হয়েছিল। এই জাফরানের দাম ছিল ২,৯০,৬৫৫ টাকা ৮ আনা ৬ পয়সা। জাফরানে অনুরূপ রঙের ভেজাল মেশাত স্থানীয় লোকেরা। ভেজাল মেশান জাফরানে পোকা ধরে যেত এবং নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাবার আগেই তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ত। ভেজাল মেশালেও ঢাকার জাফরান অন্যান্য অঞ্চলে উৎপন্ন জাফরান থেকে ভাল এবং ইংলন্ডের বাজারে চীনা জাফরানের পরেই ঢাকার স্থান ছিল। জাফরান থেকে দু ধরনের রঙ পাওয়া যায় হলুদ এবং লাল। প্রথমটি ঠাণ্ডা জলে গুলে যায় এবং বারবার ধুয়ে ওঠানো সম্ভব। পটাশিয়াম কার্বোনেট মেশালে লাল রঙ পাওয়া যায়। ফরাসিরা অভ্রর গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে রুজ হিসাবে ব্যবহার করত।

ধান :

বর্তমানে বৃহত্তর ঢাকা জেলায় ধানের উৎপাদন সবথেকে বেশি। প্রায় সর্বত্রই ধান চাষের উপযোগী জমি। ধানের খড় গবাদিপশুর খাদ্য, জ্বালানি, জমির সার এবং গরিব মানুষের ঘরের চাল তৈরিতে আজও ব্যবহৃত হয়। গ্রীষ্মকালে আউশ, শীতকালে আমন এবং বসন্তকালে বোরো চাষ হয়ে আসছে দীর্ঘকাল। এই সঙ্গে সংযোজিত হয়ে উফলী (উচ্চফলনশীল) আইশ, আমন ও বোরো ধানের চাষ হচ্ছে।

জেলার বিভিন্ন রকম আউশ ধানের মধ্যে আছে ঃ

আপছায়া	জলি আউশ	মাহিশ লাং
বালাম	জামির খোল	মানিকরাজ
বোয়ালজুরি	কই ওকরা	মতিচাক
চাকাল দাম	কইজুরি	পঙ্খিরাজ
চিংরি গুসি	কালা মানিক	পরাঙ্গি
চিনি টেংরি	কালিচাপল	পুখি
চিতা পাকরা	কাঞ্চামুড়ি	সাইট্টা
গারফা	খিজুর বাড়ি	সরিষা ফুলহার
হারাইমুখী	কুচ বালাম	সূর্যমুখী
হাসাকমরী	লারকোচ	উল্কা

—এই সব আউশ ধানের বেশ কয়েকটির চাষ এখন আর হয় না। উফলীর চাষ বাড়ছে। আউশের পরিবর্তে চাষ হচ্ছে ঃ গাজি, পূর্বাচী, নিজামী, সুফলা, ব্রি-বালাম, আশা ময়না, বিপ্লব, আই আর—৮, মোহিনী, বিপ্লব প্রভৃতির।

আউশ ধান উৎপাদনের একটি পরিসংখ্যান

	একর	উৎপন্ন পরিমাণ (টন হিসাবে)
১৯৪৭-৪৮	২,৭৮,৫০০	৮৯,২০০
১৯৬৩-৬৪	৩,৫৭,০০০	১,৫৭,২৪০
১৯৭২-৭৩	৩,৬০,৭৪৫	১,০৪,৫৬৫
১৯৮৬-৮৭	৩,২৯,৭১৫	১,৪৩,৮৫৫ (মে. টন)
১৯৮৭-৮৮	২,৮৩,৫৩০	১,০৯,০১০ (মে. টন)

ঢাকা জেলায় রোপা এবং বোনা আমন দুধরনেরই চাষ হয়। রোপা হয় উঁচু জমিতে এবং বোনা হয় নিচু জমিতে। রোপা আমন উন্নমানের। উত্তরাঞ্চলের উঁচু লালমাটিতে এই চাষ হয় ভাল। নিচু জমি, বিল, হাওড় সর্বত্রই বোনা আমনের চাষ ভাল।

জেলায় যেসব আমনের চাষ হয়ে থাকে, তার একটি তালিকা।

রোপা আমন

বাদশা ভোগ	জামিল শাইল	মানিকমাধুরী
বাউশা মুচি	ঝোর ছটা	মুড়িহর
বাড়িচাংগা	কাটাজোকা	নালুচ
বাঁশিরাজ	কালজিরা	পোড়াবিন্নি
চাপলাস	কার্তিক শাইল	রাইমুখনি
চিনিগুড়া	কাটারিভোগ	সাদাবালাম
দাদখানি	লালবালাম	তেতুলমুখী
ঘৃত শাইল	লাহাডাং	তুলসিমালা
গোবিন্দভোগ	মাধুমাধব	তোতাশাইল
হাতিশাইল	মালতি	ইন্দ্রোশাইল
	কার্তিক সিন্নি চিনিগুড়া	

বেশি জলের আমন

আচমিতা	দিঘা	নেতনা আমন
আশ্বিনী	গিলার মাইট	লক্ষ্মীবিলাস
বইদবীর	গোদা আমন	লেনজা আমন
বইঝাক	হরহরি	লতা
বাতেশ্বর	জামালভোগ	নাতফাহা
বাজাল	জাতরা নটুক	পঙ্খিরাজ
ভাওয়ালী	কাইমাগুড়ি	রাজামোড়ল
বরোন	কালা আমন	রাইনডা
বোয়াও	কালাজাতা	সেচি আমন
চরাগোটা	কলাই আমন	তিলবাজাল
ধলপাতা	খাসা	বেতিশাইল
	কার্তিক শাইল	বেগুন বীচি

বোনা আমন

বাইনাচাংগা	গইরা	নেওতা
ভবানীভোগ	হাইডা আমন	নিল ভায়রা
চাপলাস	লাউবাজাল	সীমরাইল
দুদ বাজাল	ময়ূরনেপরী	সোনাজল
ঘৃত শাইল	মুড়িহর	মুইড়ল

এইসব আমনের বেশির ভাগের চাষ এখন বন্ধ হয়ে গেছে। বেড়েছে উফলী আমনের চাষ। বোরো চাষের সাফল্য নির্ভর করে জল সরবরাহের ওপর। সেচের জল পর্যাপ্ত পরিমাণ পাওয়ায় বোরো চাষ বাড়ছে। অবশ্য উফলী জাতের ধানের আবাদ এখন বোরো চাষে প্রধান্য পাচ্ছে। ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে গাজি, মোহনী, বিপ্লব, মঙ্গল, চান্দিনা, মালা, আইআর-৮, হাসি, পূর্বাচী, সুফলা, ময়না, শাহিবালাম, শাহজালাল-এর আবাদ। আগে বেশি চাষ হত পুশু শাইল, বাঁশফুল, টেপি, খৈয়া প্রভৃতি।

বোরো ধান উৎপাদনের একটি পরিসংখ্যান

	একর (মোট)	উৎপন্ন পরিমাণ (টন হিসাবে)
১৯৪৭-৪৮	৭৫,০০০	২৮,১০০
১৯৬৩-৬৪	৯০,১০০	৪২,৭৬৫
১৯৭২-৭৩	২,০৬,৭৩৫	২,১১,১৩০
১৯৮৬-৮৭	২,৬৯,৪৯৫	৩,০৯,৮৫০ (মে. টন)
১৯৮৭-৮৮	৩,৪৫,৯৯৮	৩,৩০,৭৬৪ (মে. টন)

ঢাকায় ধান গবেষণার শুরু ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে। সংস্থাটি পরিচিত ছিল ঢাকা ফার্ম নামে। দীর্ঘকাল নিরলস গবেষণার মধ্য দিয়ে ৬০ প্রকার দেশি-বিদেশি উন্নতমানের ধানকে এদেশে চাষের উপযোগী ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু উফলী ধানের আবাদ শুরু মাত্র ১৯৬৬ খ্রিঃ থেকে। ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্র থেকে আই আর-৮, আই আর - ৫ এবং আই আর-২০ ধানের বীজ এনে বাংলাদেশে চাষ শুরু হয় ১৯৬৬-৬৯ খ্রিস্টাব্দে। খাদ্য সমস্যা দ্রুত সমাধানের দিকে লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয় (১৯৭০ খ্রিঃ অক্টোবর) ঢাকা থেকে ৩৬ কি. মি. দূরে জয়দেবপুরে। এই ইনস্টিটিউট থেকে ২২টি উফলী ধানের উদ্ভাবন করা হয় ১৯৭০ খ্রিঃ থেকে ১৯৮৮ খ্রিঃ মধ্যে। এছাড়া বাংলাদেশ আনবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলা দেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ও উফলী ধানের উদ্ভাবন করেছে কয়েক প্রকার। আধুনিক প্রযুক্তি, কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার এবং জলসেচের সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকলে হেক্টর প্রতি উফলী ধানের উৎপাদন অন্যান্য ধানের তুলনায় বেশি। যে কারণে উফলীর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। উফলীর আউশ, আমন এবং বোরো তিন রকম ফলন সম্ভব।

গম :

ধান বাংলা দেশের প্রধান খাদ্যশস্য। তারপরই গমের স্থান। গমের উৎপাদন ক্রমবর্ধমান।

গম উৎপাদনের একটি পরিসংখ্যান

	একর	উৎপন্ন পরিমাণ (টন হিসাবে)
১৯৪৭-৪৮	৮,০০০	১,৯৯৫
১৯৬৩-৬৪	৭,৬০০	১,৮৬০
১৯৭৩-৭৪	১৩,৫৫০	৪,২৪৮
১৯৭৮-৭৯	২২,৪০০	১১,৬৭৫
১৯৮২-৮৩	৫৯,৬৯০	৪৭,১৬৭
১৯৮৩-৮৪	৫৯,৯৪৫	৫০,৪৮০
১৯৮৪-৮৫	৯২,৮৯০	৭৭,৯৪০
১৯৮৫-৮৬	৯৮,২২৫	৭৫,৪৭৫
১৯৮৬-৮৭	৯৪,২০৫	৫১,৫৫৫
১৯৮৭-৮৮	৯১,৯১০	৬৪,০৮০
১৯৮৮-৮৯	৭৫,৭২০	৫১,৫৫০

মুন্সিগঞ্জ ও গাজিপুর জেলায় একর প্রতি গড় উৎপাদন ঃ ১৯৮৮-৯১

শস্যের নাম	১৯৮৮-৮৯		১৯৮৯-৯০		১৯৯০-৯১	
		গাজিপুর		গাজিপুর	মুন্সিগঞ্জ	গাজিপুর
	মে. টনে	টনে	মে. টনে	টনে	মে. টনে	টনে
১. আউশ	০.৮৬	০.৫০	১.১০	০.৫৭	১.০৫	০.৬৩
২. বোনা আমন	০.৫৬	—	০.৫৬	—	০.৫২	—
৩. রোপা আমন (বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত)		০.৬৭	১.৯১	১.০৮	১.০১	১.১৭
৪. বোরো	১.৯৫	১.১৫	১.৮৭	১.০৫	১.৯৮	১.১৭
৫. গম	০.৯৪	০.৮৫	০.৫৬	০.৭৫	০.৭১	০.৭৪
৬. পাট	০.৭১	০.৫৯	০.৬৭	০.৭৮	০.৬৭	০.৭৫
		(৩.১ বেল)		(৪.১ বেল)		(৪.০ বেল)
৭. আখ	১৮.৭২	৯.০০	১৮.৮	১১.৩৭	১৯.৬৯	১৪.২৫
৮. সরিষা	০.৪৫	০.৩০	০.৪৫	০.৩৪	০.৩৭	০.৩১
৯. গোল আলু	৬.৫৫	৩.৭১	৮.৪২	৩.৩৭	১২.১৬	৪.৫৫
১০. শাক-সবজি	৬.৫৯	—	৬.১৪	—	৫.৬৯	—

মুন্সিগঞ্জ ও গাজিপুর জেলায় একর প্রতি উৎপাদন ১৯৯০-৯১
সর্বোচ্চ উৎপাদন একর প্রতি

শস্যের নাম	মুন্সিগঞ্জ (মে. টনে)	গাজিপুর (টনে)
১. আউশ	১.৩১	০.৬৩
২. বোনা আমন	০.৬০	—
৩. রোপা আমন	১.০১	১.১০
৪. বোরো	২.০৫	১.৮১

শস্যের নাম	মুন্সিগঞ্জ (মে. টনে)	গাজিপুর (টনে)
৫. গম	০.৮২	০.৮৬
৬. পাট	০.৬৭	০.৮২ (৪.৪ বেল)
৭. আখ	২৯.৯৫	১৪.২৫
৮. সরিষা	০.৪৫	০.৪৯
৯. গোল আলু	১৯.০১ (প্রদর্শনী প্লট)	৯.৬৭
১০. শাক সবজি	৫.৮০	—

উৎপাদিত বিভিন্ন ফসল

খাদ্যশস্য :

১. আউশ	২. আমন	৩. বোরো	৪. গম
৫. চিনা	৬. বার্লি/যব	৭. ভুট্টা	৮. অন্যান্য খাদ্যশস্য

ডাল :

৯. ছোলা	১০. অড়হর	১১. মসুর	১২. মটর
১৩. মুগ	১৪. মাসকলাই	১৫. খেসারি	১৬. অন্যান্য ডাল

তৈলবীজ :

১৭. তিল	১৮. সরিষা	১৯. চীনাবাদাম (খরিফ ও রবি)	২০. তিসি
২১. রেড়ি	২২. অন্যান্য তৈলবীজ	২৩. নারকেল	

মসলা :

২৪. মরিচ (খরিফ ও রবি)	২৫. পিঁয়াজ	২৬. রসুন	২৭. আদা
২৮. হলুদ	২৯. ধনিয়া	৩০. অন্যান্য ফসল	

অর্থকরী ফসল :

(ক) চিনি ও গুড় উৎপাদনকারী

৩১. আখ	৩২. খেজুর	৩৩. তাল

(খ) তন্তু উৎপাদনকারী

৩৪. পাট	৩৫. মেপাতা	৩৬. তুলা	৩৭. শন (খরিফ ও রবি)
৩৮. অন্যান্য তন্তু (রবি)			

(গ) ভেষজ ও মাদকদ্রব্য

৩৯. তামাক জাতি, মতিপুর ও ভর্জিনিয়া	৪০. সুপারি	৪১. পান	৪২. অন্যান্য ভেষজ ও মাদ্রকদ্রব্য

(ঘ) ফল

৪৩. কলা	৪৪. আম	৪৫. আনারস	৪৬. কাঁঠাল
৪৭. পেঁপে	৪৮. তরমুজ ও বাংগি	৪৯. লিচু	৫০. পেয়ারা
৫১. বাতাবিলেবু	৫২. লেবু	৫৩. অন্যান্য ফল	
৫৪. অন্যান্য লেবু জাতীয় ফল			

শাক-সবজি ঃ গ্রীষ্মকালীন ও বর্ষাকালীন :

৫৫. কুমড়া (খরিফ ও রবি)	৫৬. বেগুন (খরিফ ও রবি)	৫৭. পটল	৫৮. ঢেঁড়শ
৫৯. ঝিংগা	৬০. করলা	৬১. কচু	৬২. চালকুমড়া
৬৩. শস্য	৬৪. বরবটি	৬৫. পুঁইশাক	৬৬. চিচিংগা
৬৭. ডাঁটা	৬৮. অন্যান্য গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন শাক-সবজি		

শাক-সবজি ঃ শীতকালীন :

৬৯. ফুলকপি	৭০. বাঁধাকপি	৭১. লাউ	৭২. টমেটো
৭৩. মূলা	৭৪. সিম	৭৫. পালংশাক	
৭৬. অন্যান্য শীতকালীন শাক-সবজি			

অন্যান্য খাদ্য ফসল :

৭৭. মিষ্টি আলু	৭৮. আলু	৭৯. গবাদি পশুর শুষ্ক খাদ্য (খরিফ ও রবি)

ধান, গম ছাড়াও অন্যান্য খাদশস্যের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। জেলায় ডালের উৎপাদন ঘাটতি থাকায় দেশ বিভক্তির আগে পাটনা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ডাল আমদানি করতে হত। বর্তমানে ডালের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও, ঘাটতি পূরণ করতে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ডাল আমদানি করতে হয়। ডালের অন্যতম উৎপাদন কেন্দ্রগুলি হল নবাবগঞ্জ, হরিরামপুর, দৌলতপুর, ধামরাই, মানিকগঞ্জ, শিবালয়, নবাবগঞ্জ এবং শটুরিয়া। তৈলবীজ উৎপাদনের অন্যতম কেন্দ্রগুলি হল মুন্সিগঞ্জ, ঘিওর, ধামরাই, শটুরিয়া, মানিকগঞ্জ, সোনারগাঁ, নরসিংদি, সিংগাইর, কালিয়কৈর, রায়পুরা, সাভার এবং দৌলতপুর।

ঢাকা জেলায় পর্যাপ্ত পিঁয়াজ উৎপন্ন হয় নবাবগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, কেরানিগঞ্জ, কাপাসিয়া ও শ্রীপুরে। মানিকগঞ্জ, নরসিংদি, নবাবগঞ্জ ও দোহারে সবথেকে বেশি ধনিয়ার চাষ হয়।

গোল আলু পাওয়া যায় রায়পুরা, মুন্সিগঞ্জ, টংগিবাড়ি, ফতুল্লা, নরসিংদি, সিরাজদিখান, শ্রীনগর, লৌহজং, গজারিয়া এলাকায়। গোল আলুর চাষ গত শতাব্দীর মাঝামাঝি শুরু হলেও মিষ্টি আলু এই অঞ্চলে চাষ হচ্ছে সুদীর্ঘকাল যাবৎ। এই আলু সব থেকে বেশি চাষ হয় মুন্সিগঞ্জ, রায়পুরা, গজারিয়া, দোহার, নরসিংদি, কেরানিগঞ্জ, সোনারগাঁ, নবাবগঞ্জ, সাভার, মানিকগঞ্জ এবং মনোহরদি অঞ্চলে।

আখ :

ঢাকা জেলার অন্যতম অর্থকরী ফসল আখ। আখের রস থেকে চিনি, গুড় তৈরি হয়। তাছাড়া এর সবুজপাতা গবাদিপশুর খাদ্য। শুকনো পাতা, কাণ্ড ও ছোবড়া জ্বালানি ও সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সব থেকে বেশি আখ চাষ হয় শ্রীপুর, কাপাসিয়া, সাভার এবং সিংগাইর উপজেলায়। আখও আছে নানা রকম। খাগড়ি, দেশি গেণ্ডারি, সারাং, কালাই প্রভৃতি আখের চাষ হচ্ছে প্রাচীনকাল থেকে। এখন কিছু উন্নত জাতের আখের চাষ শুরু হয়েছে।

পাট :

[বর্তমান সংস্করণ ৬২০-৬২২ পৃঃ দেখুন]

বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল পাট মাধ্যমেই অর্জিত হয় বৈদেশিক মুদ্রার বেশির ভাগই। পাটের বস্তার ব্যবহার আজও অব্যাহত। বস্তা, চট, ক্যানভাস, কাপড়, দড়ি-দড়া প্রভৃতির বিকাশ ঘটে ছিল কুটির শিল্প হিসাবে। কম্বল গালিচা, পরদা, জায়নামাজ, গৃহসজ্জার বিবিধ উপকরণ তৈরিতে পাটের ব্যবহার অব্যাহত। দেশের সর্বত্র পাট চাষ হয় কয়েক প্রকারের। "ঢাকা জেলায় পাটের চাষ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে ব্রিটিশদের এদেশে আগমনের বহুকাল পূর্ব

থেকেই এর চাষ হত। কিন্তু ১৮৬৫ সাল থেকে নীলের আবাদি হ্রাস এবং অর্থকারী ফসল হিসেবে পাটের গুরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তী প্রায় একশ' বছর যাবত পাটের চাষাবাদ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশ্ববাজারে বাংলা দেশের পাট বিশিষ্ট স্থান দখল করে নেয় এবং বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে গৌরব অর্জন করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এ দীর্ঘকাল পরিক্রমায় পাটের বাজারে অনেক উত্থান-পতন ঘটেছে। কখনো কখনো এর মূল্যের নিম্নগতির ফলে পাট চাষে ব্যবহৃত জমির পরিমাণের হ্রাস প্রাপ্তি এবং কখনো কখনো অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে মূল্য হ্রাস ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এবং কোরিয়ান যুদ্ধে বহিঃবিশ্বে পাটের চাহিদার অস্বাভাবিক উর্ধগতি ঘটে। অর্থকরী ফসল হিসেবে পাটের গুরুত্ব অত্যধিক বেড়ে যায় এবং পাটের আঁশের নাম দেওয়া হয় 'সোনালী আঁশ'। পাকিস্তান আমলে কাঁচা পাট ছিল দেশের সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী রপ্তানিদ্রব্য। কিন্তু পাটের বাজারে মহাজন, বেপারী, ফড়িয়া, ইত্যাদি মধ্যগণের দৌরাত্ম্যে পাট উৎপাদনকারী কৃষকরা কোনদিনই ন্যায্য মূল্য পায়নি। এ প্রেক্ষিতে বর্তমান আমলে সরকার পাটের একটি সর্বনিম্ন মূল্য স্থির করে দেয়। অধিকন্তু সরকারও এজেন্টদের মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি পাট ক্রয় করে থাকে। কিন্তু দিন দিন পাটের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় এবং সে তুলনায় এর ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় কৃষকরা পাট চাষের উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিশ্বের বাজারে পাট কৃত্রিম আঁশ ও আঁশজাত পণ্যের বিশেষ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের চাহিদা ও মূল্য হ্রাস পাওয়ায় পাট চাষের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। বিশেষতঃ ধান চাষের তুলনায় পাট চাষ অধিক ব্যয় বহুল হয়ে পড়ায় এবং উফশী ধান চাষের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত বেশি লাভবান হওয়ায় বর্তমানে পাটের পরিবর্তে ধান চাষের প্রতি কৃষকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া বন্যা উপদ্রুত এলাকার জনসাধারণ পাটের চেয়ে বসন্ত ও গ্রীষ্মকালীন ধান উৎপাদনে অধিক আগ্রহী।"[১]

"যদিও এদেশের পাটের বাণিজ্যে অনেক বড় বড় মহাজন গত সর্বস্ব হইয়াছেন অনেকে সেই চোটে সঞ্চিত পৈতৃক অর্থ—এমন কি ভূসম্পত্তি হইতেও বিচ্যুত হইয়াছেন, তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, অনেকে আবার এই পাটের বাণিজ্যে বিলক্ষণ লাভবানও হইয়াছেন। মধ্যবর্তী "ব্যাপারী" প্রভৃতিতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি মাত্রই হয় নাই। বিশেষতঃ পাট উৎপাদনকারী কৃষকেরা এ পর্যন্ত এতৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিতমাত্র ক্ষতি স্বীকার করে নাই। প্রত্যুত তাহারা পাটের কৃষি করিয়া সবিশেষ লাভই করিয়াছে। যশোহর, পাবনা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষি ব্যবসায়িদিগের অনেকে যে ধানোৎপাদনের অল্পতা করিয়া পাটের কৃষির প্রাচুর্য আরম্ভ করিয়াছে, বোধ হয় অধিকতর লাভ দর্শনই তাহার একমাত্র কারণ। যাহা হউক এতদঞ্চলের কৃষকদিগের পাটের কৃষিতে এইরূপ লাভাধিক্য দর্শন করিয়া "চোক্‌টাটানি" উপস্থিত হওয়াতে হউক, অথবা আজকাল কেবল ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডে নহে আমেরিকায়ও প্রচুর পরিমাণে এদেশ হইতে পাট রপ্তানি হইতে আরম্ভ হইয়াছে এই দেখিয়া প্রলুব্ধ হওয়াতেই বা হউক, ইদানীং ইউরোপীয় আবাদকরদিগেরও এদেশের পাটের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। সংবাদপত্র পাঠে অবগতি হইল, ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলের আবাদকরগণ কাফি প্রভৃতি কৃষি আরম্ভ করিয়াছেন। অচিরকাল পরেই তথায় বহুল পরিমাণে পাট উৎপাদিত হইবে সন্দেহ নাই। ইউরোপীয়দিগের স্বভাবই এই তাঁহারা যে কোন কার্যে লাভ সম্ভাবনা দেখেন, তাহাতেই সমাকৃষ্ট হইয়া পড়েন। ক্রমে তাহাতে এরূপ উৎকর্ষ সাধন করেন যে, পরে আর কেহই তাঁহাদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপেই তাঁহারা এদেশের বস্ত্রের ব্যবসায় বিলুপ্তপ্রায় করিয়া উহা একপ্রকার একচেটিয়া করিয়া বসিয়াছেন। এদেশের তাঁতি জোলা যুগী প্রভৃতি বস্ত্র ব্যবসায়ীরা যে ইদানীং একেবারে অর্থহীন, ব্যবসায় হীন এবং নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহার একমাত্র কারণ উহাই। ইত্যাকার অবস্থা অনেকে আশঙ্কা

করিতেছেন. "ইউরোপীয় আবাদকরেরা যখন পাটের কৃষি ধরিলেন তখন এদেশীয় কৃষকেরা কোনরূপেই তাঁহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা রক্ষা করিতে পারিবে না। তদ্বশতঃ অবিলম্বেই এদেশীয়দিগকে পাটের কৃষি পরিত্যাগে বাধ্য হইবে। সুতরাং পাটের কৃষিদ্বারা বঙ্গদেশের বিশেষতঃ আমাদিগের এই পূর্বাঞ্চলের কৃষক প্রভৃতির যে উন্নতি হইতেছিল, তাহা রহিত হইয়া যাইবে। তন্নিবন্ধন হয়ত তাহাদিগেরও অতঃপর অন্নমেলা সুকঠিন হইয়া উঠিবে।" যাঁহারা এইরূপ অশঙ্কা করেন, তাহাদিগের প্রবোধার্থ আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, পাটের কৃষি সম্বন্ধে এদেশের তদ্রূপ অনিষ্ট সম্ভাবনা অল্প। কারণ ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড প্রভৃতির ন্যায় যখন আমেরিকায়ও পাটের টান পড়িয়াছে, তখন এদেশের উদয়োন্মুখ মুখপাটের কৃষির সহসা ব্যাঘাত হইবে বোধ হয় না। হইলেই বা কি? বাস্তবিক ধরিয়া দেখিলে কৃষির প্রাচুর্য নিবন্ধন সাধারণতঃ ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক হইতেছে। পাটের প্রাচুর্যে ধানের অল্পতা হইতেছে। অনেক কৃষক আশু প্রলোভনে লুব্ধ হইয়া ধানের জমিতে পাট বুনিতে আরম্ভ করিয়াছে। ... এদেশে দিন দিনই যে ধান এত মহার্ঘতর হইয়া উঠিতেছে—অনেক কৃষকের ঘরেই যে এখন পূর্বের ন্যায় তত সঞ্চিত ধান্য থাকে না, বোধ হয় ধানের কৃষির খর্বতা করিয়া পাটের কৃষির আধিক্যও তাহার অন্যতর কারণ। পাটের প্রচুরতাবশতঃ স্রোতোজলহীন অনেক গ্রামের জলও নিতান্ত দূষিত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহা পীড়া বৃদ্ধিরও গুরুতর কারণ হয়। অতএব উপরিউক্ত কারণে যদি এতদঞ্চলে পাটের কৃষির অল্পতা ঘটিয়া উঠে, তাহাতে আমরা সাধারণ্যে বিশেষতঃ এতদঞ্চলের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল আশা করি না।"[২]

পাটের আবাদ ও ঢাকাবাসীর সাবধানতা :

পাটের আবাদ দিন দিন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। কৃষকেরা টাকার লোভে পাট বুনিয়া সারবনে জমিগুলিকে উষর করিয়া তুলিতেছে এবং জীবনের প্রধান উপাদান ধান্য, তিল, ইক্ষু প্রভৃতির আবাদ ছাড়িয়া দিয়াছে। প্রচুর টাকা হস্তগত হওয়াতে তাহাদের বিলাসিতা, পরিশ্রম বিমুখতা ও অভিমান বৃদ্ধি হেতু মোকদ্দমাপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইতেছে। পাটের আবাদ বৃদ্ধিতে নানাপ্রকারে দেশের ভয়ানক অবস্থা সূচিত হইতেছে। পাটের আবাদ কোন্ জেলায় কোন বর্ষে কত বিঘা ভূমিতে হইয়াছে তাহার তিন বৎসরের হিসাব প্রদত্ত হইল।

জেলা	১২৯৫ সন	১২৯৭ সন	১২৯৮ সন
ময়মনসিংহ	৭৫০০০০,	৯০৩০০০,	৭৩৫৬০০
ঢাকা	৫১০০০০,	১৬২৭৫০,	১৩৭৪০০
ফরিদপুর	২৫৫০০০,	২৪০০০০,	১৯৫০০০
রংপুর	৪৮৬০০০,	১৮৫২৮০০,	১২৩৮৪০০
পাবনা	৪৫০০০০,	১০৫২৬৪০,	১০০৮৭৮৮০
রাজশাহী	১৩৫০০০,	০,	৩২৩০৪০
দিনাজপুর	১২০০০০,	০,	২২০৮০০
বগুড়া	১০২০০০,	০,	১৯২০০০
জলপাইগুড়ি	৯০০০,	০,	৩৬৪৮০
ত্রিপুরা	৩৫১০০০,	৩৭২৪০০,	৫৫৯২০০
২৪ পরগণা	১৩২০০০,	০,	৯২৩১০
নদীয়া	৯০০০০,	০,	১৬৮০০০
যশোহর	৯০০০০,	০,	১০৯২৬০
খুলনা	১০০০০,	৯০,	৮০৮৮০
পূর্ণিয়া	৭২০০০,	০,	১৭৭০০০

জেলা	১২৯৫ সন	১২৯৭ সন	১২৯৮ সন
মালদহ	২৫৫০০,	০,	৯১২২১
হুগলি	৫৭০০০,	০,	২৯৭০০
	৩৯০৫৫০০,	প্রয়োজনাভাব,	৫৬৯৫০৭১

বঙ্গে তিন বৎসরেই মোটের উপরে প্রায় ১৭ লক্ষ বিঘা ভূমিতে পাটের আবাদ বাড়িয়াছে। উল্লিখিত হিসাবে এ বৎসর ঢাকার মাত্র মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ মহকুমার ভূমি উল্লিখিত হইয়াছে ; সদর ও কালীগঞ্জের অধীন ভূমিতে উল্লিখিত হিসাবের $\frac{১}{৩}$ অংশ যোগ করিলে প্রায় ১২০ হাজার বিঘা পাটের অধিকৃত হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। তাহা হইলেও তিন বৎসর পূর্ব অপেক্ষা $\frac{৩}{৫}$ তিনপঞ্চমাংশ ভূমি হইতে পাট দূরীকৃত হইয়াছে। ইহা ঢাকার পক্ষে খুব গৌরবের বিষয় বলিতে হইবে। ঢাকার প্রতিবেশী ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর এবং ২৪ পরগণা, খুলনা, হুগলি ও জলপাইগুড়িও কিয়ৎ পরিমাণে এ গৌরবের দাবী করিতে পারে বটে, কিন্তু নিজ ঢাকার বাহাদুরি খুব বেশী। ঢাকাবাসীর কেন এ সমুতি হইল, তাহার কারণ অবধারণ তত কঠিন নহে। লোকে ঠেকিয়াই শিখে, কিন্তু যাহারা কিছু অধিক চালাক চতুর তাহারা কিছু অল্পতে শিক্ষা লাভ করিতে পারে। ঢাকাবাসী সকল হুজুগেরই অগ্রবর্তী পথপ্রদর্শক, ইহাদের চেতনা লাভও সকল বিষয়ে কিছু সকালে সকালে হয়। ঢাকাবাসীর চেতনা লাভ সম্বন্ধে আমাদের আন্দোলন কত দূর কাজ করিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। কলিকাতাস্থ সহযোগীদিগের জন্যও ২৪ পরগণা, হুগলি ও খুলনা অনেকটা সাবধানতা লাভ করিয়াছে বলা যায়। পূর্বে যাহারা ভালরূপে পাটের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে নাই, সেখানে সকালে আমাদের উপদেশ কাটিবে না, সাধ মিটিবার বিলম্ব আছে।

রেলওয়ে দ্বারা ঢাকা গোয়ালন্দ সংযুক্ত না হওয়াও পাটের কৃষি কমিবার একটি কারণ। পূর্ব কয়েক বৎসর মাল চালাইতে না পারায় তাহা অনেকের ঘরে নষ্ট হইয়াছিল। কলকাতায় যে মূল্যে পাট বিক্রী হয়, এখানে তাহার অর্দ্ধেকও পাওয়া যায় না। এখানকার পাটের কুঠিয়াল সাহেবগণ যেরূপ দরে, যেরূপ ও যেরূপ বে-ওজনে পাট কাড়াকাড়ি করিয়া নেন, তাহাতে নিতান্ত দায়ে না পড়িয়া কেহ তাঁহাদের নিকটে যায় না। রেলওয়ে সুবিধা থাকিলে দেশীয় মহাজনের সাহায্যে ইহারা একেবারে কলিকাতায় চালান করিতে পারিত। ঢাকার স্থানে স্থানে গ্রামে গ্রামে সাহেবদিগের কারবার বিস্তৃত হওয়ায় দেশীয় মহাজনেরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে। দেশীয় মহাজনের নিকট মাল বিক্রয় করিতে কোন ভয়ের কারণ ছিল না, কিন্তু সাহেবদিগের ভয়ে কৃষকগণ কোন প্রকার স্বার্থহানিতে প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। সুতরাং সাহেবদিগের সংসর্গ হইতে ব্যবধান থাকিবার জন্য তাহারা পাটের কৃষি ছাড়িয়া দিয়াছে। পেটো সাহেবরা অন্যায় অত্যাচার করিয়াও যে প্রকরান্তরে এদেশের উপকার করিতেছেন, এজন্য আমরা তাহাদিগকে ধন্যবাদ দেই। ঢাকার পথ যেরূপ লাভজনক, তাহাতে গবর্ণমেন্ট নিশ্চয়ই এ পথে রেলওয়ে করিবেন ; ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড হইতে একটা ট্রামওয়ে হইলে গবর্ণমেন্ট রেলওয়ে করিতে পারেন। ট্রামওয়ে দ্বারা লোক চলাচলের সুবিধা হইলেও পাট প্রভৃতি ভূমি মালের পক্ষে সুবিধা হইবে না, এ জন্য আমরা ট্রামওয়ের বড় পক্ষপাতী।

পাবনা ও রংপুর দিয়া রেলওয়ে গিয়াছে, আমাদের সহিত সে দিকের সম্পর্ক খুব কম, কলিকাতা ও ঢাকার সমীপবর্তীগণ মধ্যে যে পাটজাত প্রলোভন অতি দ্রুত প্রবাহিত হইয়াছিল, উত্তর বঙ্গের মস্তিষ্কে এতদিন তাহা পূর্ণ মাত্রায় প্রবেশ করিয়াছে। উত্তর বঙ্গের রংপুর এখন পাটের রাজা, পাবনা ত পাটরাণী, দিনাজপুর যুবরাজ, বগুড়া ও পূর্ণিয়া রাজনন্দিনী পদে অভিষিক্তা। পাবনা রুহিনী পাটরাণীর প্রলোভনে পড়িয়াই বোধ হয় ঢাকার পার্শ্বচর ময়মনসিংহ মহাশয় অদ্যপি ঠাটঠমক পরিত্যাগ করে নাই।

দুর্জয়লিঙ্গের বাতাসেই বোধ হয় জল্পেশ্বরের জলপাইগুড়ি চৈতন্য লাভ করিয়াছে। তথাকার পাটের আবাদ খুব কমিয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় এবার সর্বত্রই চেতনা পরিলক্ষিত হইতেছে। আহা, চৈতন্যদেব কি সত্য সত্যই দেশে আসিয়াছেন? পাটে দেশের সর্বনাশ করিল, পাটে জীবন হানি করিতে বসিয়াছে। শাস্ত্রে "বিষস্য বিষমৌষধং" হোমিওপ্যাথিক মূলসিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, যদি বহুরোগের পক্ষে পাট উপকারী হয়, তবে পাট সেই সকল রোগ সৃষ্টিরও কারণ বলিতে হইবে। এদেশে যখন এত পাট ছিল না, মেলেরিয়ার কথাও এত ছিল না। তখন বড় কেহ শুনে নাই, পাট পাতার জল খাইয়া কিন্তু অনেকের মেলেরিয়া সারিতে দেখা যায়। অতএব সকলের সাবধান হইয়া পাটের আবাদ যাহাতে কমিতে থাকে তৎপক্ষে বিশেষ যত্নপর হওয়া কর্তব্য।[৩]

শন :

বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের উল্লেখযোগ্য কাঁচামাল তুলার চাষ হ্রাস পেতে পেতে একসময়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। উৎকৃষ্ট মানের তুলা থেকে তৈরি হত মসলিন কাপড়ের সুতো। এই তুলোর চাষ হত সোনারগাঁ, কাপাসিয়া, টোক এবং জঙ্গলবাড়ি এলাকায়। বর্তমানে তুলার চাষ হয় জয়দেবপুর, কাপাসিয়া, মনোহরদি, ধামরাই এবং কালিয়াকৈর অঞ্চলে। তন্তু উৎপাদনে মেস্তা এবং শনেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। বর্তমানে এর উৎপাদনও হ্রাস পেয়েছে।

জেমস টেলরের সময় ব্যাপকভাবে শনের চাষ হত জেলার উত্তর ও দক্ষিণ সর্বত্র। সবথেকে ভাল শন পাওয়া যেত গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে লাখ্যানদীর পূর্বতীর সোনারগঞ্জ এলাকায়। শনের বীজ বোনা হত অক্টোবর-নভেম্বরে। ফেব্রুয়ারি-মার্চ-এপ্রিলে শিকড়সহ গাছ তুলে নিয়ে আঁটি বেঁধে কাছের ঝিল বা নদীতে ভিজিয়ে রাখা হত। জলে ভিজে বাকল আলগা হয়ে গেলে জলের মধ্যে তা ছাড়িয়ে নেওয়া হত। আঁশযুক্ত অংশ থেকে বের করা হত শন। একটা কাটের পাটার ওপর বাকলকে কাপড় কাচার মত আস্তে আস্তে পিটিয়ে ভিতরের আঁঠা বের করে দেওয়া হত। এভাবে না করে একটা মোটা চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়েও বাকল পরিষ্কার করে নেওয়া হত। একবিঘা জমি থেকে তিন মন শন পাওয়া যেত। শনচাষের জমি তৈরি করতে সময় লাগত। বার থেকে ষোলটি চাষের পর জমি তৈরি হত। জমির খাজনা, শ্রমিক মজুরি, বীজের দামসহ প্রতি বিঘায় খরচ হত ২ টাকা ৮ আনা। ঢাকা জেলায় ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে ১০ হাজার মণ শন উৎপন্ন হয়েছিল। এইবছর পাশের জেলা থেকে ৫৫ হাজার মণ শন কেনা হয়েছিল ব্রিটিশ নৌসেনাদের জন্য। শনের উৎপাদন দ্রুত হ্রাস পায়। যা উৎপন্ন হত, তার বেশির ভাগ দিয়ে তৈরি হত মাছ ধরার জাল।

নীল :

ঢাকা জেলায় একসময় নীল চাষ হত। এই নীল চাষ জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হত স্থানীয় কৃষকদের ওপর। জেমস টেলরের গ্রন্থে উল্লেখ আছে জেলার দক্ষিণাংশে নীল চাষ শুরু হয়। আর নীল তৈরি শুরু হত মে মাসের শেষ সপ্তাহে। শেষ হত জুলাইএর প্রথম সপ্তাহে। উত্তরের উঁচু জমিতে নীল চাষ শুরু হত ফেব্রুয়ারি মার্চে। নীল তৈরি শেষ হত জুনের শেষ দিকে। ঢাকা জেলার উৎপন্ন নীলের মান যশোরের তুলনায় নিকৃষ্ট। নীল তৈরিতে ব্যবহার করা হত ব্রহ্মপুত্র নদীর জল। নদীর জলে বালি মিশে থাকায় নীল হত শক্ত। নীল ভাঙলে তা ঝকঝক করত। জেলায় মাত্র দুটো নীলের কারখানা ছিল ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে। কয়েক বছরের মধ্যে ঐ সংখ্যা হয় ৩৩৩। ১,০০,০০০ বিঘা জমিতে উৎপন্ন গাছ থেকে নীল উৎপন্ন হত ২,৫০০ মণ।

সাম্প্রতিক অগ্রগতি :

যদিও কৃষিকাজে এখনও পুরনো সাজসরঞ্জামের গুরুত্ব কমে যায়নি। লাঙল, কোদালের যুগকে পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে ট্রাক্টর আর পাওয়ার টিলার। যদিও দেশের প্রায় সর্বত্র

লক্ষ্য করা যায় দুটির সহাবস্থান। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করর্পোরেশন, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এবং ওয়াপদা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আধুনিক যন্ত্র ব্যবহারে কৃষি উন্নয়নে অন্যতম প্রতিবন্ধক হল অধিকাংশ জমিই ছোট ছোট প্লটে বিভক্ত। কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করেছে ২৪ টি বীজ উৎপাদন খামার। এখানে সাধারণত ধান, গম, ভুট্টা, ডাল, তেল, আলু ও শাক-সবজির বীজ উৎপন্ন হয়। এখান থেকে কৃষকদের উন্নমানের বীজ বণ্টন করা হয়। বৃহত্তর ঢাকা জেলার মিরপুরে আছে এইজাতীয় একটি মাত্র খামার।

দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত, বৃহত্তর ঢাকা জেলায় সেচ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ঘটছে। যদিও 'সেউতি' ও 'দোন' মাধ্যমে সেকালের সেচের ব্যবস্থা এখনও বর্তমান। পাকিস্তান আমলে হস্তচালিত নলকূপ এবং শক্তিচালিত পাম্পের সাহায্যে যে সেচ ব্যবস্থার সূচনা ঘটেছিল, এখন তা অনেক বিস্তৃত এবং বহু এলাকা সেচ আওতাভুক্ত হয়েছে। ফসলের উৎপাদনও বেড়েছে। এক ফসলি জমিতে দু তিনটি ফসল হচ্ছে। ধানের চাষ ও উৎপাদন বেড়েছে সব থেকে বেশি।

সেচ উপকরণের সংখ্যা ও সেচ সুবিধা প্রাপ্ত জমির পরিমাণ ঃ ১৯৮২-৮৯

	পাওয়ার পাম্প		গভীর নলকূপ		অগভীর নলকূপ	
	সক্রিয় সংখ্যা	জমির পরিমাণ	সক্রিয় সংখ্যা	জমির পরিমাণ	সক্রিয় সংখ্যা	জমির পরিমাণ
১৯৮২-৮৩	৩,৮০৬	১,৩৩,১১৯	১,৭৭০	১,০২,০৬৩	৩,৫৪০	৫৮,৮৯১
১৯৮৩-৮৪	৩,৯৯৮	১,২৮,৬১৭	১,৮৮১	১,০১,৮৯৩	৪,১৫২	৫০,৩৯২
১৯৮৪-৮৫			১,৯৯৪	১,০৯,৪০১	৪,৪৬৭	৪৫,৮০১
১৯৮৫-৮৬			২,১৪৭	৯৫,৮০০	৩,৮৪৩	৩৯,১৯২
১৯৮৬-৮৭			২,১৭২	৯১,৯২৩	—	—
১৯৮৭-৮৮			২,১৯৬	৯১,৮৬২	৫৯৮	৬,৬৫৩
১৯৮৮-৮৯			২,৩০৩	১,২১,৯২২	৯৬২	১৩,২৩০

জৈব সার এবং রাসায়নিক সারের মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে শেষোক্তটির প্রয়োগ বাড়ছে। ফলন বৃদ্ধির জন্য কৃষকরা এই সার বেশি ব্যবহার করছে।

পশু সম্পদে বৃহত্তর ঢাকা জেলা সমৃদ্ধ হলেও, অধিকাংশ পশু অযত্নে লালিত। কৃষিকাজে এখনও পশুর ব্যবহার অব্যাহত। মহিষ ও ঘোড়ার সংখ্যা কম। হাঁস-মুরগি পালন আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। তাছাড়া আছে গরু, ছাগল, ভেড়া।

বৃহত্তর ঢাকা জেলায় পশু সম্পদের পরিসংখ্যান ঃ ১৯৯১

	মুন্সিগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	মানিকগঞ্জ	গাজিপুর	নরসিংদি	ঢাকা
১. গরু	২,৩৯,১৮৬	২,১৮,৯৩১	২,১৭,২৬৯	২,৯৮,০৩২	২,৮২,৬৫৬	—
২. মহিষ	২০০	১০	২৯০	৬৩৫ (গরু-মহিষ)	—	—
৩. ঘোড়া	১০	২৩০	৭২৬	৬২৮	—	—
৪. ছাগল	২৯,২৩৯	৭৯,২০৫	৭০,৮৮৩	১,৭৬,৪২৭	২,৩২,৯৪৪	—
৫. ভেড়া	৫,৮৫৯	১৮,৪০২	১০,৫৪৬ (ছাগল-ভেড়া)	২৮,৯১০	—	—
৬. হাঁস	১,০৭,৯৮০	২,১৩,৫৪৯	১,৬০,৭৩৬	২,০৯,৮৬৯	৮,৭০,১৮৪ (হাঁস-মুরগি)	—
৭. মোরগ-মুরগি	৯,৭৯,৭০১	১১২৬,৪৮৮	১০,৯৬,১১৯	১২,৭৬,৩৯৫	—	—

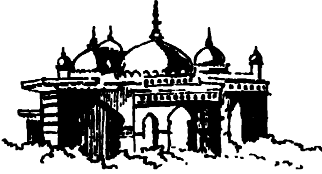
মুন্সিগঞ্জ জেলায় চামড়া ও মাংসের পরিসংখ্যান : ১৯৮৮-৯১

	১৯৮৮		১৯৮৯		১৯৯০	
	চামড়া	মাংস	চামড়া	মাংস	চামড়া	মাংস
১. গরু	১৩,৫০০টি	১০৫০মে.টন	১৪০০টি	১১০০মে. টন	১৪,৭৫৭টি	১১৮০.৫০মে.টন
২. মহিষ	৪টি	—	৩টি	—	৫টি	০.৭৫টি
৩. ছাগল	১৩,৩০০টি	১৩৫মে.টন	১৩,৯০০টি	১৪০,১৪মে. টন	১৪,২০০টি	১৪২টি
৪. ভেড়া	৫১০টি	৭মে.টন	৬৭০টি	৮মে. টন	৮৭৩টি	৯টি

১. ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯৩। পৃঃ ১৯৩

২. ঢাকা প্রকাশ, ২১ নভেম্বর ১৮৭৫

৩. ঢাকা প্রকাশ, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯১



৬. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও পুরসভা

[বর্তমান সংস্করণ ৬৪০-৬৪৮ পৃঃ দেখুন]

আজকের পরিচ্ছন্ন পরিকল্পিত ঢাকা শহরকে দেখে কারো পক্ষে অতীতের রোগগ্রস্ত শহরের ছবিটা কল্পনা করা সম্ভব হবে না। সোনারগাঁ নেই, বিক্রমপুরও তাই। ঢাকায় তৈরি হল মোঘল প্রশাসন কেন্দ্র। প্রশাসকের সঙ্গী আগতরা চারদিকে ঘুরে ফিরে বসতি গড়ে তুলল। এদের আগেই অনুকূল পরিবেশ পেয়ে বসতি করেছিল বসাকরা। মোঘলরা আসবার পর একে একে বিদেশি বণিক এসে বানাল বাণিজ্যকুঠি। আশপাশ থেকে দলে দলে আসতে থাকে মানুষজন। দ্রুত ঘন জনবসতিপূর্ণ নগরীতে পরিণত হল ঢাকা। মনুষ্য বসতি হল ঠিকই, তা ছিল অপরিকল্পিত, অস্বাস্থ্যকর। রোগব্যধিতে চিকিৎসার তেমন কোন ব্যবস্থাই ছিল না। শহরের কেন্দ্রস্থলের বসতি ছিল ঘন সন্নিবদ্ধ। সরু সরু পথ। বড় সড়ক ছিল মাত্র দুটি। নদীর ধারের বড় বড় বাড়ি ছিল যা নয়নশোভিত। যা ছিল একমাত্র ধনীদের বসতি। শহরের ভিতরের অজস্র খালবিল, ডোবা, পরিত্যক্ত পুকুর ছিল রোগসৃষ্টির কেন্দ্র। মশার উৎপাত চরম হয়ে ওঠে। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে কেবল ঢাকাই নয়, পূর্ববাংলার বহু জনবসতিই বারবার পরিত্যক্ত হয়েছে। ১৮০০ থেকে ১৮৩৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ঢাকার জনসংখ্যা ব্যাপক হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ রোগের আক্রমণ। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। ঢাকার জনগণ ছিল স্বাস্থ্য ব্যাপারে অত্যন্ত অসচেতন। ময়লা আবর্জনা জমে থাকত। চারপাশে পচে দুর্গন্ধ বেরোত। পোকামাকড় জন্মাত। মশা, মাছির উপদ্রব ছিল প্রাণান্তকর। পায়খানা পরিষ্কারের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। বর্ষায় সব নোংরা ধুয়ে পড়ত পুকুরের জলে। কুয়ো পায়খানা ছিল খুবই সীমিতসংখ্যক বাড়িতে। অধিকাংশ খাল, নানা আর পুকুরে ফেলা হত যাবতীয় অব্যবহৃত বা বর্জ্য দ্রব্যাদি। সেইসব স্থানের জলই মানুষ পান করত। একমাত্র ধনীরাই ভিস্তি দিয়ে জল আনত শীতলক্ষা থেকে। কেবল ম্যালেরিয়া নয়, কলেরা, টাইফয়েড এবং বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব বাড়তে থাকে। ১৮০৩ খ্রিঃ ঢাকায় যে ছোট একটি হাসপাতাল তৈরি হয়েছিল, রোগাক্রান্ত শহরবাসীদের পক্ষে তা ছিল একেবারেই অপ্রতুল। এই অবস্থার মধ্যে ঢাকাবাসীকে দীর্ঘকাল বাস করতে হয়েছে।

ডিস্ট্রিক্ট ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাক্ট (১৮৬৪ খ্রিঃ) অনুসারে ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১ আগস্ট ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কমিটি গঠন করার পর শহরবাসীদের নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যে দৃষ্টিপাত করা হয়। মিউনিসিপ্যালিটির আয়তন বাড়তে থাকে। রায়েরবাজার, কালরনগর, জাফরাবাদ, বিবিরবাজার পিলখানা পুরসভার এলাকাভুক্ত হয় ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে গেন্ডারিয়া অঞ্চলও আসে পুর এলাকায়। তার আগে এই জঙ্গল অধ্যুষিত এলাকাকে বসবাসের উপযোগী করেন জমিদার রায়সাহেব দীননাথ সেন এবং বাবু রজনীকুমার চৌধুরী। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ঢাকা পুরসভার আয়তন হয় ৬.১৫ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ১,০৮,৫৫১। তখনও পর্যন্ত ঢাকা নগরীর উন্নয়ন তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য ছিল না। বসবাসের বাড়ির ওপর ধার্যকর, পয়ঃকর, রাস্তা ও ফেরি পারাপারের ওপর কর, পশু ও যানবাহনের ওপর কর আরোপ করা হলেও, সে উপার্জনও উন্নয়নের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না। বঙ্গভঙ্গের পর (১৯০৫ খ্রিঃ) ঢাকার গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি সরকারি অনুদান লাভে বিবিধ উন্নয়ন কাজ

ত্বরান্বিত হয়। পানীয় জলসরবরাহ, পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা, ইটের রাস্তায় পাথর দেওয়া এরকম কিছু কাজ হলেও, বঙ্গভঙ্গ রদের পর কাজের গতিধারা আবার মন্থর হয়ে পড়ে। দেশভাগের পর ঢাকা পরিণত হয় প্রাদেশিক রাজধানীতে। ঢাকার গুরুত্ব বাড়ল। ১৯৬০ খ্রিঃ ১৩ আগস্ট গঠিত হল মিউনিসিপ্যাল কমিটি। পুরনো ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির অস্তিত্ব থাকল না। ১৯৬১-৬৪ খ্রিঃ মধ্যে মিউনিসিপ্যাল কমিটি সরকারি অনুদান পায় ১৩,৭৫,২৪১ টাকা। এছাড়া মিউনিসিপ্যালিটির কর বাবদ আয়ও বেড়ে যায়। রাস্তা, পার্ক, কমিউনিটি সেন্টার, স্কুলবাড়ি প্রভৃতি নির্মাণ ও সংস্কারে বিস্তর অর্থব্যয় করা হয়।

ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কমিটি ঢাকা পুরসভা নামে পরিচিত হয় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে ১ জন চেয়ারম্যান, ১ জন ভাইস-চেয়ারম্যান এবং প্রতি ওয়ার্ডে একজন কমিশনার নিয়ে মিউনিসিপ্যাল কমিটির অনুরূপভাবে কাজকর্ম চলতে থাকে। ১৯৭৮ খ্রিঃ অক্টোবর রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স অনুসারে পুরসভা পরিণত হয় ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে। কর্পোরেশনের সর্বোচ্চ পদাধিকারী হলেন মেয়র। তার কাজে সাহায্যের জন্য একজন ডেপুটি মেয়র এবং ওয়ার্ড কমিশনারদের ভূমিকা আরও গুরুত্ব পায়। সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য গঠিত হল ৮টি স্ট্যান্ডিং কমিটি। কমিটিগুলি হল :

১. অর্থ ও সংস্থাপন
২. শিক্ষা
৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
৪. হিসাবরক্ষণ
৫. পূর্ত ও ইমারত
৬. জল ও বিদ্যুৎ
৭. নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন
৮. সমাজকল্যাণ, মিলনায়তন ও যুবশক্তি ব্যবহার

ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন রাষ্ট্রপতি আদেশে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে পরিণত হয় ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে। কর্পোরেশনের আয়তন বেড়ে হয়েছে ৩৩৯ বর্গ কিমিঃ। জনসংখ্যা ৭০ লক্ষ। ওয়ার্ড সংখ্যা ৭৫। পাকা রাস্তা ১৬৪৩.৭৪ কিমিঃ কাঁচা রাস্তা ৩২৩.৭৪ কিমিঃ, ব্রিজ ৬, কালভার্ট ২৮ এবং ওভার ব্রিজ ৪।

টাউন ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাক্ট (১৯৫৩) অনুসারে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় ঢাকা উন্নয়ন সংস্থা (DIT ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট)। পূর্তবিভাগের অধীন এই সংস্থা শহরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রূপায়ণ ও কার্যায়নের ব্যবস্থা করে। বর্তমানে DIT-র কাজকর্ম চলে ২৫০ বর্গমাইল এলাকায়। নারায়ণগঞ্জের দক্ষিণ থেকে টংগির উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত উন্নয়ন সংস্থার কাজ বিস্তৃত। "১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের টাউন ইমপ্রুভমেন্ট আইনের ধারা অনুযায়ী এই ট্রাস্টের প্রধান কাজ ছিল ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও পরিবর্ধন করা। এছাড়াও সরকারি বাসস্থানের সংস্থান, সরকারি কাজে ব্যবহারের জন্য নতুন নতুন ইমারত তৈরি, যোগাযোগের জন্য রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন, পার্ক, খেলার মাঠ, খোলা ময়দান এবং অনুরূপ অন্যান্য কিছুর উন্নততর সুযোগ-সুবিধা বিধান এ ট্রাস্টের আওতাভুক্তি ছিল। ..." (ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯৩। পৃঃ ৭৪৯)। টাউন ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাক্ট সংশোধিত হল ১৯৮৭ খ্রিঃ-এ। গঠিত হল রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট থেকে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ উন্নয়নমূলক যেসব কাজ করেছে, তার ফলে ঢাকা পরিণত হয়েছে প্রাচ্যের অন্যতম আধুনিক শহরে। উল্লেখযোগ্য কাজগুলির মধ্যে আছে নতুন নতুন আবাসিক বাণিজ্যিক-শিল্প এলাকা গঠন ও উন্নয়ন, উন্মুক্তস্থান ও পার্ক নির্মাণ, পুরনো সংকীর্ণ রাস্তাকে প্রশস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তার সম্প্রসারণ, বস্তি উচ্ছেদ এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসন, ঢাকা মহানগরী, নারায়ণগঞ্জ, টংগি, গাজিপুর, কালিগঞ্জ, সাভার, কেরানিগঞ্জ অঞ্চলে সুপরিকল্পিতভাবে বাড়িঘর নির্মাণ, জনসন রোডের উন্নয়ন, দিলখুশা বাণিজ্যিক এলাকার উন্নয়ন, গুলশন মডেল টাউন নির্মাণ, উত্তরা উপশহরের সম্প্রসারণ, মিরপুর সেতু থেকে কামরাঙিচর পর্যন্ত বিস্তৃত নিম্নাঞ্চলের উন্নয়ন, সাইদাবাদ-

কমলাপুর সড়ক নির্মাণ, নারায়ণগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে পঞ্চবটি উপশহর নির্মাণ, বিজয় সরণি ও প্রগতি সরণি নির্মাণ, এয়ারপোর্ট ও গ্রীন রোডের মধ্যে সংযোগ সড়ক নির্মাণ, সোনারগাঁ হোটেল সংলগ্ন এলাকার উন্নয়ন—মগবাজারের সঙ্গে সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং নতুন বাণিজ্যিক এলাকা গঠন।

পানীয় জল সরবরাহ এবং দূষিত জল নিষ্কাশনের জন্য ১৯৬৩ সালে গঠন করা হয় ঢাকায় জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড গঠিত হয় ১৯৫২ সালের ১ নভেম্বর। প্রথমে গঠিত হয়েছিল ৪ জন সদস্য নিয়ে। ক্যান্টনমেন্ট এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রাত্যহিক বাজার ও দ্রব্যাদি সরবরাহ, পানীয় জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, দূষিত জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা হল বোর্ডের দায়িত্বের মধ্যে। সেনাবাহিনীর অফিসার ও সেনানীদের সার্বিক সুব্যবস্থার দায়িত্ব বোর্ডের।

নারায়ণগঞ্জ পুরসভা :

সমগ্র ঢাকা জেলায় সবথেকে উন্নতমানের উল্লেখযোগ্য মিউনিসিপ্যালিটি হিসাবে চিহ্নিত ছিল। এর অন্যতম কারণ স্থানীয় বিদেশি পাট ব্যবসায়ীদের উদ্যোগ। তাদের প্রদত্ত কর থেকে মিউনিসিপ্যালিটির আয়ও ছিল যথেষ্ট। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ১১.৬৫ বর্গ কিমিঃ এলাকায় ২৭,৮৭৬ জনসংখ্যা নিয়ে গঠিত হয়েছিল মিউনিসিপ্যালিটি। শহর এলাকা, রাস্তা, বাজার ও আশপাশের সমগ্র অঞ্চল মিউনিসিপ্যালিটির তদারকিতে পরিচ্ছন্ন থাকত। পানীয় জল সরবরাহে খরচ হত ২ লক্ষ টাকা। নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যাল কমিটি গঠিত হয় ১৯৬০ খ্রিঃ ১৯ আগস্ট। পাকা রাস্তা ৩৫.৩৯৮ কিমিঃ এবং কাঁচা রাস্তা ১৯.৩৮০ কিমিঃ। মিউনিসিপ্যালিটির একটি মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থাগার আছে। তাছাড়া ৪১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫০টি মক্তাব, ২টি দাতব্য চিকিৎসালায় পরিচালনা করে পুরসভা।

মানিকগঞ্জ পুরসভা :

মানিকগঞ্জ টাউন কমিটি গঠিত হয়েছিল ১৯৬০ খ্রিঃ ১২ জুন। আয়তন ছিল ৮.০৪৫ বর্গ কিমিঃ এবং জনসংখ্যা ১১,৬৬৬। ১৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত কমিটি, পাকা ও কাঁচা রাস্তা এবং কবরস্থান ও শ্মশানঘাট রক্ষণাবেক্ষণ, পানীয় জল সরবরাহ, মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে আসছে। ১৯৭২ খ্রিঃ মানিকগঞ্জ পুরসভা গঠিত হলে তার আয়তন হয় ৩৬.২৮ কিমিঃ এবং জনসংখ্যা ৩৭,১৩২। ৩টি ওয়ার্ড, ৩৪টি মৌজা, ৪১টি মহল্লা নিয়ে পুরসভার কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে পুরসভার জনসংখ্যা গঠনের সময়কার দ্বিগুণেরও বেশি।

গাজিপুর পুরসভা :

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গাজিপুর পুরসভা গঠিত। আয়তন ৪২.৯২ বর্গ কিমিঃ জনসংখ্যা ৬০,০০৭, মৌজা ৩৪, পাকা রাস্তা ৩৪ কিমিঃ, আধা পাকা রাস্তা ১৪ কিমিঃ, কাঁচা রাস্তা ১৫০ কিমিঃ, কালভার্ট ১৭, পুল ১০।

টংগি পুরসভা :

টংগি হল গাজিপুর জেলায়। টংগি পুরসভার আয়তন ১২½ বর্গ কিমিঃ এবং জনসংখ্যা ১,৯৮,৪৩২ জন, কমিশনার ৯, মৌজা ২৯, পাকা রাস্তা ৩৫ কিমিঃ, আধা কাঁচা রাস্তা ৭৮ কিমিঃ, পুল ৭।

নাগরিক পরিষেবার সূচনা পর্বে আলোকপাত করা যেতে পারে। ঢাকা শহরাঞ্চলের নগরোন্নয়নের সূচনা ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে। যখন ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন রাসেল মেরিল্যান্ড স্কিনার। নতুন মানসিকতার উন্মেষ ঘটে ঢাকাবাসীর জনগণের মধ্যে। এর আগে

উল্লেখযোগ্য পদ থেকে হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে ১৮৩৭ খ্রিঃ সরকার ১৫ নং বিধি অনুসারে চৌকিদারি ট্যাক্স প্রবর্তন। যে ট্যাক্সের একটা অংশ ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিতে। স্কিনার এই আইন প্রয়োগে তৎপর হয়ে রমনা অঞ্চলের উন্নয়নই কেবল নয়, যতটা সম্ভব রাস্তাঘাট মেরামত, অব্যবহৃত জলাধার খানা ডোবা বুজিয়ে পরিচ্ছন্নতা আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের একার পক্ষে একটি শহরকে আস্তাকুড় থেকে তুলে আনা সম্ভব ছিল না বলে, তাঁর সুপারিশ ক্রমে এবং উদ্যোগে ১৮৪০ খ্রিঃ ১০ জুলাই গঠিত হয় "মিউনিসিপ্যাল কমিটি"। এই কমিটিতে ছিলেন স্থানীয় ব্যবসায়ী, জমিদার, উকিল, আরমেনিয় এবং য়ুরোপীয় অধিবাসীরা। কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন রেভারেন্ড এইচ আর শেফার্ড। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। তাঁর সহযোগিতায় কমিটি সক্রিয় হয়ে ওঠে। ঢাকা শহরকে ৫টি ওয়ার্ডে ভাগ করে, ওয়ার্ড কমিটির ওপর যাবতীয় কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব দেওয়া হয়। শহরের যাবতীয় আবর্জনা অপসারণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাস্তাঘাটও আগের তুলনায় বেশ পরিচ্ছন্ন রূপ পায়। বিভিন্ন সড়ক সংস্কারের সঙ্গে পাকাও করা হয়। বিশেষ করে শহরের দুটি প্রধান সড়কই পাকা হয়। এইসব উন্নয়ন কাজে ঢাকার কয়েদিদের ব্যবহার করা হত নানাভাবে। কমিটির উদ্যোগে ১৮৫৩ খ্রিঃ আরমানিটোলা ঝিলের ওপর নির্মিত সড়ক সংযুক্ত হয় নবাবপুর রোডের সঙ্গে। সড়ক নির্মাণের সময় সংলগ্ন জমি অধিগ্রহণ করার ক্ষেত্রে নানা প্রতিকূলতা দেখা গিয়েছিল। নতুন সেতু নির্মাণ এবং সংস্কারের কাজেও এগিয়ে আসে কমিটি। রাস্তার পাশে ময়লা অপসারণ, পুকুর সংস্কার, লালবাগ দুর্গের সংস্কার এরকম বিবিধ কাজের মধ্যে কমিটির উদ্যোগ ছিল উল্লেখযোগ্য। চৌকিদারি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটে। কিন্তু মুসলমানদের কবরখানা শহরের আবহাওয়াকে দূষিত করতে থাকে। যা কমিটির পক্ষে দূর করা আদৌ সম্ভব হয়নি। শহরে জ্বর, বসন্ত ও কলেরা মহামারী আকারে দেখা দেয় ১৮৫০ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলা কমিটি এবং সরকারি কর্তাব্যক্তিরা ২৬ আইন প্রয়োগে অনুরোধ জানায়। ঢাকা কলেজ প্রাঙ্গণে সাধারণ মানুষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৮৫২ খ্রিঃ ২১ মে। বিপুল জনসমাগম ঘটে। কিন্তু আইন প্রয়োগের বিরোধিতায় সরব হয়ে ওঠে জনসভা। এব্যাপারে সরকারের কাছে লিখিত আবেদনও জানান হয়। সমগ্র উদ্যোগ স্তিমিত হয়ে যায়। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে নতুন চৌকিদারি ২০ আইন জারির পর, শহরের নৈশ প্রহরার উন্নতি ঘটলেও, শহরের উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হতে থাকে অর্থাভাবে।

ঢাকায় ২৬ আইন প্রয়োগ সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ঃ

"বৃহস্পতিবারের সভায় প্রথমত কমিশনার সাহেব ২৬ আইন প্রচলিত করিবার ঔচিত্য বিষয়ে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তৎপর সিবিল সার্জন সিমসন সাহেব অত্রত্য জলবায়ুর দূষিত অবস্থার বিষয়ে আর একটা বক্তৃতা করেন। তিনি বলিলেন, ঢাকার জলবায়ু অত্যন্ত দূষিত হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, ঢাকাবাসীরা সচরাচর যে জলবায়ু ব্যবহার করে, তাহা ঠিক বিষতুল্য। এই বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে প্রায় সকলেই ২৬ আইনের প্রচলন বিষয়ে এক প্রকার স্থির নিশ্চয় হইয়া গভর্নমেন্ট আবেদন করিতে সমুৎসক হইলেন। কিন্তু সদ্বিবেচক এন, পি. পোগস সাহেব তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, অদ্যকার এই সভায় ঢাকার সাধারণ লোক উপস্থিত হয় নাই। কেবল কতিপয় বিশেষ ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব সর্বসাধারণের মত নিরপেক্ষ হইয়া কেবল এই সভার সভ্যগণের অভিপ্রায় মতে প্রস্তাবিত বিষয়ে গভর্নমেন্টে আবেদন করা যুক্তি বহির্ভূত। এই নিমিত্তেই পুনর্বার মঙ্গলবারের এক সভাধিবেশন হয়। ... সভায় আর অধিক কিছু হয় না, কেবল কমিশনার সাহেবের বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ পাঠ করা হয়। পাঠকবর্গের অবলোকনার্থ কমিশনার সাহেবের বক্তৃতার সারাংশ নিম্নভাগে গৃহীত হইতেছে।

"ইতঃপূর্বে ঢাকায় একটা মিউনিসিপ্যাল কমিটি ছিল। ইহা ১৮৪০ সালে জজ কুক সাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং বিগত বর্ষের শেষ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। ইহারা কোন রাজবিধানানুসারে নিযুক্ত হন না। ইঁহারা চৌকিদারী টাক্সের উদ্বৃত্ত টাকা এবং ফেরিফণ্ড ইত্যাদির আয়ের দ্বারা কর্মনির্বাহ করিতেন। পূর্বে কয়েদীদিগের দ্বারা নগর পরিষ্কার করা হইত। পরে কয়েদীরা স্থানান্তরিত হইলে নগরের অবস্থা অতিশয় কদর্য হয়। তন্নিবন্ধন এস্থলে ১৮৫৬ সনের ২০ আইন (চৌকিদারী অ্যাক্ট) প্রচলিত করা হয়। .... এক্ষণে এস্থলে ২৬ আইন প্রচলিত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। যদি স্থানীয় লোকেরা এ বিষয়ে সম্মত হন, শীঘ্রই উক্ত আইন অনুসারে এক কমিটি নিযুক্ত করা হইবে। গভর্নমেন্ট সমুদায় শ্রেণীর লোকের মধ্য হইতেই এক একজন কমিশনার নির্বাচন করিবেন। ঢাকার অবস্থা অনুসারে যখন যে কোন নিয়ম করিতে হয়, তাহা তাহারাই করিবেন। .... সর্বশ্রেণীস্থ লোক হইতে কমিশনার নিযুক্ত হইলে নাগরিকেরা যাহা ভাল বোধ করেন, তাহাই করিতে পারেন। টাক্সাদি নিরূপণের ভারও নাগরিকদিগের প্রতিই থাকিবে। ... সর্বসাধারণের এই আইনের প্রতি এই তিনটি আপত্তি করিতে পারেন ; প্রথম, উক্ত আইন প্রচলিত হইলে নগরবাসীদিগকে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে কর প্রদান করিতে হইবে। ২য়, গভর্নমেন্ট স্বয়ং কমিশনার নিয়োগ করিবেন, এ বিষয়ে সাধারণের অভিপ্রায় গৃহীত হইবে না। ৩য়, কোন অভিনব নিয়ম সংস্থাপন অথবা কোন প্রচলিত নিয়মের পরিবর্তন সময়েও সাধারণের মত গ্রহণ করা যাইবে না।...[১]

ঢাকা পুরসভার (মিউনিসিপ্যালিটি—১৮৬৪) প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এডওয়ার্ড ড্রামন্ড পদাধিকারবলে। ভাইস চেয়ারম্যান পদে লেঃ গভর্নর পদসমতুল্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করে, তাকে কমিশনার নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়। তিনি কমপক্ষে ৭ জন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নিয়োগ করতেন। সর্বপ্রথম ২১ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় মিউনিসিপ্যাল কমিটি। এই ২১ জনের মধ্যে ৮ জন য়ুরোপীয়, ৩ জন আর্মেনিয় এবং ১০ জন এদেশীয়। তার মধ্যে ৮ জনকে সরকারি চাকুরে হতে হত। এই মিউনিসিপ্যালিটির সাধারণ সদস্য ছিলেন খাজা আহসানুল্লাহ, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, সৈয়দ আবদুল মজিদ, জি. বেলেট, এ. ডি. ডান, জে. পি ওয়াইজ, এন. পোগজ, জগন্নাথ রায়চৌধুরী, রামকুমার বসু, মির্জা গোলামপীর, মুহাম্মদ আকমল খাঁন, মধুসূদন দাস, মৃত্যুঞ্জয় সিংহ, এম. ডেভিড প্রমুখ।

বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন আইন (১৮৮৫ খ্রিঃ) অনুসারে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১ অক্টোবর গঠিত হয় ঢাকা জেলা বোর্ড। এই জেলা বোর্ডের অধীনে প্রতিটি মহকুমায় লোকাল বোর্ড গঠিত হত। অবিভক্ত বাংলায় এই জেলা বোর্ডও গুরুত্বপূর্ণ জনসেবামূলক কাজকর্ম তদারক করত। ১৯৬০ খ্রিঃ ২১ জুন জেলা কাউন্সিল গঠনের পর জেলা বোর্ডের ক্ষমতাও লোপ পায়।

চৌকিদারি আইন (১৮৭১ খ্রিঃ) প্রবর্তিত হওয়ার পর সমগ্র বাংলার গ্রাম অঞ্চলে গঠিত হয় ইউনিয়ন। এই চৌকিদারি আইন ব্যাপক রূপ পায় ১৮২০ খ্রিঃ। কয়েকটি গ্রাম বা ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত হয় পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েতের ৫ জন সদস্য নিয়োগ করতেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। গ্রামের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব বর্তায় পঞ্চায়েতের ওপর। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয়স্বায়ত্তশাসন আইন গৃহীত হওয়ার পর জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় পঞ্চায়েত কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটি। স্থানীয়স্বায়ত্তশাসন আইন (১৯১৯ খ্রিঃ) পাশের পর গঠিত হয় ইউনিয়ন বোর্ড।

ইউনিয়ন কমিটি, থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল, বিভাগীয় কাউন্সিল, জেলা পরিষদ সব মিলিয়ে ঢাকা জেলার জনসেবার সার্বিক উন্নয়ন দায়িত্ব নানাভাবে পালিত হয়ে এসেছে। রাস্তা নির্মাণ ও সংরক্ষণ, ফেরিঘাট, ডাকবাংলো, পুকুর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান. দাতব্য চিকিৎসালয় সংরক্ষণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা করত জেলা বোর্ড, আবার কখনো লোকাল বোর্ড। ১৯৫৯

খ্রিস্টাব্দে এক আদেশে ঢাকা জেলা বোর্ডকে বাতিল করে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুন গঠিত হয় ঢাকা জেলা পরিষদ। ৪২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন ঢাকা জেলার ডেপুটি কমিশনার পদাধিকার বলে। সদস্যদের মধ্যে ২ জন সংখ্যালঘু এবং ১ জন মহিলা সদস্য ছিলেন। জেলা পরিষদের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ৯টি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। এইসব কমিটি বিভিন্ন কাজের ব্যাপারে পরিষদকে সুপারিশ করত। ঢাকা জেলা পরিষদের এলাকা ছিল ২,৭২৮ বর্গমাইল, যার জনসংখ্যা ছিল ৪৫,৯৫,১১৪ জন।

বর্তমান ঢাকা পুরসভার ইতিহাস দীর্ঘদিনের নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে।

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম সভা হয় ১৮৬৪ খ্রিঃ ১১ আগস্ট ডিভিশনাল কমিশনারের অফিসে। মাত্র ১৬ জন সদস্য-যাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠরাই ছিলেন বেসরকারি সদস্য। সভায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ড্রামন্ড সভাপতিত্ব করেন। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছিল। কাছারির কাছে একটি ভাড়াবাড়িতে মিউনিসিপ্যালিটির অফিস সুরু হয়। প্রথম সেক্রেটারি ছিলেন এস. কিং নামে একজন য়ুরোপীয়। কমিটি রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা, কর আদায়ের কর্মী, ঝাড়ুদার, মালি, ভিস্তি এরকম কর্মী নিয়োগ করে। কমিটির আয়তন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আয়ও বাড়তে থাকে। কিন্তু কমিশনারদের বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ জনসাধারণের মনে ক্রমশ সোচ্চার হতে থাকে। কর আরোপে বৈষম্য করা হচ্ছে বলেও নানা কথা শোনা যেতে থাকে। সংবাদপত্র থেকে জানা যায়।" ... ঢাকার সবিশেষ অবস্থা অবগত আছেন এবং ঢাকার সর্বশ্রেণীস্থ লোকের সুখ-দুঃখ অনুভব করেন অত্রত্য মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদিগের মধ্যে এরূপ লোক অতি অল্পই বিদ্যমান আছেন, যাহারা উচ্চবেতনভুক রাজ-কর্মচারী, যাহারা জমিদার বা মহাজনের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন, যাহারা বড় মানুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ, দেখিতে হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ, দুই বেলা গাড়ি-ঘোড়া দৌড়াইয়া বেড়ান, মধ্যে মধ্যে যাহারা রাজপুরুষ বিশেষকে লম্বা সেলাম, ভোজ ও ভেট দিয়া অথবা নিতান্ত উচ্চভাষায় চাটুকারিতা প্রকাশ করিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন, এবং যাঁহারা সাহেবদিগের কোন প্রস্তাব শ্রবণ করিলেই 'যে আজ্ঞা, বহুত খোব, ও বেবির গুড স্যার', বলিয়া নিরাপত্তিতে অনুমোদন করিতে সুশিক্ষিত, আজকালের বাজারে আমাদিগের ঢাকায় তাঁহারাই মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের পদে নিয়োজিত হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি। তাঁহারা নগরের ও নাগরিক লোকের অবস্থা যত জানুন, আইন-কানুন-বিধি-ব্যবস্থা যত অবগত থাকেন না থাকুন, তাঁহাদিগের উপরোক্ত কয়েকটি গুণ বিদ্যমান থাকিলেই সব হইল। যে স্থানে কমিশনার নির্বাচনের এইরূপ নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে, তথায় ইষ্ট সাধনের সম্ভাবনা কি? গভর্নমেন্ট যে উদ্দেশ্য সাধনার্থ মিউনিসিপ্যাল সংক্রান্ত আইন প্রচলিত করিয়াছেন, এইরূপ কমিশনার নির্বাচন দোষে অনেক স্থলেই তাহা সুসিদ্ধ হইতেছে না, বলা বাহুল্য।

"আমাদিগের কমিশনারদিগের বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতার কতদূর দৌড় এবং সাধারণ লোকের সহিত সমসুখ-দুঃখ তার কতদূর প্রাবল্য, বক্ষ্যমান কার্য দ্বারা পাঠকগণ তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।—অনেক দিন হইল গভর্নমেন্ট অত্রত্য মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদিগের নিকট একবার জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান ঢাকায় যে সকল খড়ের ঘর আছে তথার খোলার ঘর নির্মাণ করিবার নিয়ম প্রবর্তন করা যাইতে পারে কিনা? তখন কমিটির প্রায় সকল কমিশনারই একবাক্য হইয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, অনায়াসে এরূপ নিয়ম প্রবর্তিত হইতে পারে। গভর্নমেন্ট তদনুসারে বিধি প্রণয়ন করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। অত্রত্য লোকে এখন এই নিয়মের বিষয় অবগত হইয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে। খোলার ঘর সর্বত্র নির্মিত হইলে অগ্নিভয় নিবারিত হয় সত্য, কিন্তু সাধারণ লোকের তন্নির্মানোপযোগী ব্যয় নির্বাহ করিতে সামর্থ্য আছে কিনা, অভিপ্রায় প্রকাশকালে আমাদিগের কমিশনারগণ একবারও সে চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। যাহা হউক, অল্পদিন হইল প্রায় ৭০০ শত ব্যক্তি সমবেত হইয়া উক্ত নিয়ম প্রবর্তিত না হয় এই

মর্মে কমিশনার সাহেবের নিকট আবেদন করে। কমিশনার সাহেব তদ্বিষয়ের বিবেচনার্থ সেই আবেদনপত্র মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদিগের নিকট অর্পণ করেন। সেদিন এই বিষয় লইয়া কমিশনারদিগের মধ্যে তুমুল বাকবিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। অনেকে স্বীকার করিয়াছেন, এ নিয়ম সাধারণ লোকের পক্ষে কষ্টকর হইয়াছে। অবশেষে স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে খড়ের [ঘর] প্রাসাদ সংলগ্ন আছে, সেই সেই ঘর জীর্ণ হইলে পুনরায় আর তাহার সংস্কার করিতে দেওয়া হইবে না তখন সেই সেই স্থানের খোলার ঘর নির্মাণ করাইতে হইবে।..."

মিউনিসিপ্যালিটি সক্রিয় হয়ে উঠলেও, শহর ঢাকার ওপর নোংরা বদনাম লেগে ছিল যথারীতি। শহরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ যথারীতি থেকে গেছে। পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া ছিল দুরূহ। শব-সৎকার ব্যবস্থাও ছিল দূষিতকরণের অন্যতম কারণ। কিন্তু নতুন চেয়ারম্যান জর্জ গ্রাহাম এবং নতুন সিভিল সার্জন ডাঃ হেনরি চালর্স কাট-ক্লিফের সময় নগরীর উন্নয়ন লক্ষ্য করা যায়। জনাকীর্ণ স্থানের পুনর্বিন্যাস, জঙ্গল অঞ্চলের সংস্কার, শহরের বাজারগুলিকে আধুনিক সুবিধাসমন্বিত করা হতে থাকে। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ঢাকাকে একটা সুন্দর জনবসতিতে পরিণত করায় কাটক্লিফের উদ্যোগকে স্বাগত জানান খাজা আবদুল গনি।

শহরটার গায়ে যে দুর্গন্ধ জড়িয়ে ছিল তা যেন কিছুতেই দূর করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। নগর জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উদ্যোগও নানা ভাবে ব্যর্থ হয়ে যেতে থাকে। "দিন দিনই ঢাকা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। ১০/১৫ বৎসর পূর্বে এই নগরীর অবস্থা যেরূপ ছিল এক্ষণ আর সেরূপ নাই। আজি কালি ওলাউঠা, জ্বর, প্লীহা, বসন্ত, অর্শ ও আমশয়াদির পীড়া ইহার প্রায় নিত্যসহচর হইয়া উঠিয়াছে। কি কি কারণে ঢাকা এই সকল রোগের আস্পদ হইয়া উঠিয়াছে, এবং কি কি উপায়ে এস্থানের এইরূপ রোগজনকতা বিদূরিত হইয়া স্বাস্থ্যবিধায়কতা সম্পাদিত হইতে পারে, সাধারণে থাকুক, বড় বড় চিকিৎসকেরাও তাহা নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এতদর্থ কেহ কেহ এমন সকল প্রস্তাব করিতেছে, যাহা অনুষ্ঠিত হওয়া এক প্রকার অসম্ভাবিত। ভূতপূর্ব অ্যাক্টিং সিভিল সার্জন আর্চার সাহেব একদা প্রস্তাব করিয়াছিলেন, 'ঢাকাকে বুড়ীগঙ্গার দক্ষিণ পারে লইয়া যাওয়া উচিত'। তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বলিয়া যেরূপ হউক, অন্যে উক্তরূপ প্রস্তাব করিলে সকলেই একবাক্যে উপহাস করিত সন্দেহ নাই। যাহা হউক, নানা কারণে অসম্ভবপর বলিয়াই আর্চার সাহেবের সেই প্রস্তাবে কেহ শ্রুতিপাত করেন নাই। সম্প্রতি আমাদের বর্তমান সুযোগ্য সিভিল সার্জন শ্রীযুক্ত কটক্লিফ সাহেবও ঢাকার স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহার প্রস্তাবের স্থূলমর্ম এই প্রথমত, দালালসকল ভাঙ্গিয়া পূর্ব-পশ্চিমে এবং উত্তর-দক্ষিণের কয়েকটি সুপ্রশস্ত রাস্তা প্রস্তুত করা হউক, তাহা হইলে নগর মধ্যে অনুক্ষণ বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারিবে। দ্বিতীয়ত, নগরের আবর্জনা ও ময়লা সকল নগরের বহির্ভাগে কোন দূরবর্তীস্থানে নিক্ষেপ করিবার উপায় করা হউক। তৃতীয়ত, শীতলক্ষ্যা হইতে ঢাকায় বিশুদ্ধ জল আনয়ন করিবার সুবিধা করা হউক। এই তিনটি প্রস্তাব কার্যে পরিণত হওয়া কিরূপ কঠিন, যাহারা স্থিরচিত্তে ঢাকার যাবতীয় অবস্থা চিন্তা করিবেন, তাহারাই বুঝিতে পারিবেন। আমরা যতদূর আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে ডাক্তার কটক্লিফের প্রস্তাব উপকারী হইলেও তাহা কার্যে অনুষ্ঠিত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব।

ডাক্তার কাটক্লিফ সাহেবের প্রস্তাবে উত্তেজিত হইয়া হউক, অথবা আপনা হইতেই হউক, আমাদিগের মিউনিসিপ্যাল কমিটির চেয়ারম্যান ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর শ্রীযুক্ত গ্রেহাম সাহেবও সম্প্রতি ঢাকার অস্বাস্থ্য সম্পাদনের মনোনিবেশ করিয়াছেন। তিনি কয়েকটি প্রস্তাব মুদ্রিত করিয়া সকলের নিকটে বিতরণ করিয়াছেন। অল্পদিনের মধ্যেই তদ্বিষয়ে যাবতীয় মিউনিসিপাল কমিশনারদিগের অভিপ্রায় গৃহীত হইবে। যদি মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদিগের অধিকাংশ

গ্রেহাম সাহেবের প্রস্তাব অনুমোদন করেন তাহা হইলে সত্বরই অনুরূপে কার্যানুষ্ঠান হইবে। তিনি বলেন, ঢাকার অস্বাস্থ্য দূরীকরণ ও স্বাস্থ্য বিবেচনার্থ কি কি কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহা চিন্তা করিবার পূর্বে কিসের দ্বারা তদ্রূপ কার্য নির্বাহিত হইবে, তাহা অবধারিত হওয়া আবশ্যক। ঢাকার মিউনিসিপ্যাল ফাণ্ডে এরূপ আয় নাই যে, নিয়মিত ব্যয় কুলাইয়া তাহা হইতে উল্লিখিতরূপ কার্যের নিমিত্তও ব্যয় করা যাইতে পারে। কিন্তু যেরূপে হউক ঢাকায় স্বাস্থ্যোন্নতির নিমিত্তই তিনি প্রস্তাব করেন, যে উপায়ে মিউনিসিপ্যাল ফান্ডে অধিক টাকা যাইতে পারে, অগ্রে তাহাই অবলম্বন করা আবশ্যক। ইহা কহিয়া তিনি নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায় প্রদান করিয়াছেন—

'প্রথমতঃ গৃহকর দ্বিগুণ করা—এই টাকা হইতে বাড়ির ট্যাক্সে ৪০০০০ টাকা উঠিয়া থাকে। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাড়ি ব্যতীতও এখানে প্রায় ১৬০০০ হাজার বাড়ি আছে। সুতরাং এক্ষণে প্রতি বাড়ি হইতে গড়ে বার্ষিক ২৷৷ আড়াই টাকা হিসাবে ট্যাক্স গ্রহণ করা হয়। অতঃপর যদি প্রতি বাড়ি হইতে গড়ে ৫ টাকা করিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে এক গৃহ-ট্যাক্সই ৪০ হাজার টাকা বর্ধিত হইতে পারে। দ্বিতীয়ঃ, খেয়া ঘাটের কর বর্ধিত করা। বুড়িগঙ্গাতে এক্ষণে যে কয়েকটি খেয়াঘাট আছে তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে প্রতিবারে আধ পয়সা মাত্র লওয়া হইয়া থাকে, সেই স্থলে অক্লেশেই এক পয়সা করিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এতদ্দ্বারা বার্ষিক ৩০০০ তিন সহস্র টাকা আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। তৃতীয়ত, কুকুরের উপর ট্যাক্স স্থাপন করা। ঢাকায় ১০,০০০ দশ হাজার পালিত কুকুর আছে। যদি কুকুর প্রতি দুই টাকা করিয়া ট্যাক্স গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে বার্ষিক ২০,০০০ টাকা (কুড়ি হাজার টাকা) আদায় হইতে পারে। পরে কুকুর লোকে না পালিতে পারে বটে, কিন্তু বার্ষিক ৭০০০ সাত হাজার টাকা কুকুরের ট্যাক্স ঢাকা হইতে সকল সময়েই উঠিবার সম্ভাবনা আছে। অনেকে এই বলিয়া আপত্তি করিতে পারেন, কুকুরের দ্বারা নগর পরিষ্কার কার্যের অনেক সহায়তা হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহারা গলিতদ্রব্য ও পুরীষাদি ভক্ষণ করিয়া নগর পরিষ্কার রাখে, অতএব তাহাদিগের উপর কর স্থাপন করিয়া তাহাদিগের সংখ্যা ন্যূন করা কর্তব্য নয়। এ আপত্তি কোন কার্যকর নয়। শকুনী গৃধিনী ও ইত্যাদি পাখিদিগের দ্বারা তাহাদিগের ঐ কার্য সম্পাদিত হইতে পারে। বিশেষত ১০ হাজার কুকুরে যে পরিমাণ বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহাও অল্প নয়। কুকুরের সংখ্যা কম হইলে একদিকে যেমন তাহাদিগের পূর্বোল্লিখিত কার্যে কথঞ্চিৎ ত্রুটি হইবে, অন্যদিকে সেইরূপ তাহাদিগের ভূরি পরিমাণ মল মূত্রাদি হইতেও নগর রক্ষিত হইবে। অতএব, কুকুরের প্রতি ট্যাক্স স্থাপনে ইষ্ট ভিন্ন কোন অনিষ্টই লক্ষিত হয় না।

"গ্রেহাম সাহেবের মূল প্রস্তাবে আমরা অনুমোদন করি সন্দেহ নাই। ঢাকার স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানার্থ আশু কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন নিতান্ত আবশ্যক এবং তাহা করিতে হইলেই মিউনিসিপ্যাল ফান্ডের আয় বৃদ্ধি করা কর্তব্য, একথা আমরা কোনরূপেই অস্বীকার করিতে পারি না। কেবল বাটির ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রস্তাবে আমরা সম্যক অনুমোদন করিতে পারি না। খেয়া ঘাটের কর বৃদ্ধিতে এবং কুকুরের প্রতি কর স্থাপনে সাধারণের তত আপত্তি নাই। কিন্তু বাটির কর দ্বিগুণিত করিলে ঢাকায় অনেকের অবস্থা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা কখনই এত কর দিয়া বসতি করিতে সমর্থ হইবে না। এজন্যেই আমরা অনুরোধ করি, বৎসরে যে পঞ্চাশ হাজার টাকা করবৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, উক্ত দুই বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর কর স্থাপন করিয়া তৎপূরণ করিবার চেষ্টা করা হউক। গাড়ি ও ঘোড়ার উপরে ট্যাক্স দ্বিগুণ করা হউক, গো শকটের উপর ট্যাক্স স্থাপন করা হউক, চামড়া মাংস, মদ এবং ইট ও চুনাপোড়ান প্রভৃতি ব্যবসায়ের উপরও স্বতন্ত্ররূপে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স আদায় করা হউক। পরন্তু ঢাকায় যেসকল মিছিল বাহির হয়, তৎসংশ্লিষ্ট ... লোকের সংখ্যা বিবেচনা

করিয়া তাহার উপরেও ন্যূনাতিরিকেরূপে ট্যাক্স লওয়া হউক। পূজার সময়ে ঢাকায় যে সকল কবিওয়ালা প্রভৃতি আগমন করিয়া থাকে, তাহাদিগের নিকট হইতে কিছু কিছু কর গ্রহণ করিলেও হানি দেখা যায় না। ইত্যাদি বিষয়ের উপর ট্যাক্স স্থাপন করিলে বৎসরে যত টাকা সংগৃহীত হইতে পারে, তাহাতে যদি ৫০ হাজার না হয়, বড় বড় বাড়ির উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া তৎপূরণ চেষ্টা করা হউক। সাধারণের তত অসন্তোষ জন্মিতে পারে ও নূতন কর স্থাপনের কথাটি যেরূপ জোর দিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, সেই করের টাকা দিয়া কি কি কাজ করা হইবে, তাহা তত সুস্পষ্টরূপে বলেন নাই। লোকের কর দান করিবার পূর্বেই মনোমধ্যে এই প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে, কি নিমিত্ত তাহারা সেই টাকা প্রদান করিবে। যদি তাহারা প্রকৃত রূপে জানিতে পায়, যে কর প্রদান করিবে, তদদ্বারা বিশেষ কোন হিতকর কার্যানুষ্ঠান হইবে, তাহা হইলে তাহা দান করিতে তাহাদিগের তত কষ্টবোধ হয় না, প্রত্যুত উৎসাহ এবং আগ্রহই জন্মিয়া থাকে। পক্ষান্তরে যদি করদাতা করদানের উদ্দেশ্য ভালরূপে না জানিতে পারে, তাহা হইলে নিতান্তই ক্লেশবোধ করিয়া থাকে। সাধারণত জলে টাকা নিক্ষেপ করিলে লোকের যেরূপে অনিচ্ছা হইয়া থাকে, নিরুদ্দেশ্যে টাকা দিতে তদপেক্ষাও অধিকতর অনিচ্ছা হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাধ্যতা থাকিলে সাতিশয় কষ্টও অনুভব হইয়া থাকে বলা বাহুল্য। অতএব নূতন ট্যাক্স নির্ধারণ করিবার পূর্বে সাধারণকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেয়া উচিত, কি জন্য কর স্থাপন করা হইবে এবং সংগৃহীত অর্থ দ্বারা কি কার্যানুষ্ঠান হইবে। গ্রেহাম সাহেব সাধারণরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, সংগৃহীত ট্যাক্স দ্বারা উৎকৃষ্ট সলিলানয়ন, ময়লা অপসারণ এবং বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের সুবিধা করা হইবে। এতদ্বারা অনেকেরই অনুমান হইতেছে, বুঝি গ্রেহাম সাহেব ডাক্তার কটক্লিফ সাহেবের প্রস্তাবানুসারে কার্যানুষ্ঠান করিতেই মনস্থ করিয়াছেন। যদি অনুমান যথার্থ হয়, আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলতে পারি, সাধারণে তাহাতে অনুমোদন করিবেন না। একতঃ তাহাতে এত অর্থব্যয়ের প্রয়োজন, যাহা ঢাকা হইতে সহজে সংগৃহীত হওয়া অসম্ভব, সুতরাং বহুকাল পর্যন্ত লোকদিগকে ভয়ানক কর যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতে হইবে। দ্বিতীয়ত, যেসকল কার্যের অনুষ্ঠান করা হইবে, তাহাতে আশু লোকের যত অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা পরে তত ইষ্ট হইবে কিনা তাহা ভবিষ্যতের গর্ভস্থ। অতএব, সাধারণের যাহাতে নিশ্চিত উপকার হইবে এরূপ কয়েকটি বিশেষ কার্য নির্বাচনপূর্বক তৎসমাধানোপযোগী অর্থ সংগ্রাহার্থ চেষ্টা করা কর্তব্য।

"এস্থলে ইহাও বলা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, সচরাচর আমাদিগের মিউনিসিপ্যাল কমিটির কার্যপ্রণালী যেরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাতে সাধারণের এরূপ সংস্কার জন্মিবার কারণ বিদ্যমান আছে যে, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দ্বারা নগরের প্রকৃত উন্নতিজনক কার্য প্রায় করা হয় না, অফিস সংক্রান্ত কর্মচারীদিগের নিয়মিত বেতন দিতে ও কয়েকজন ইউরোপীয়োদের সুবিধা বিধানকেই প্রায় ব্যয়িত হইয়া থাকে। ইউরোপীয়েরাই এই কমিটির সর্বেসর্বা, তাহারা যখন যাহা করেন, মিউনিসিপ্যাল ফান্ড হইতে তখন তাহাই করিয়া থাকেন। তাহাদিগের সহিত তর্কবিতর্ক করিয়া স্বমত প্রবল করিতে পারেন, এতদ্দেশীয় কমিশনারদিগের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি অতি অল্প। বাছিয়া বাছিয়া সাহেবদিগের মতপোষক অকর্মণ্যলোকদিগকেই প্রায় মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের পদে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। ফলতঃ সাহেবদিগের প্রতিকূলে কোন কথা কহিলেও প্রায় তাহা গ্রাহ্য হয় না। সুতরাং মিউনিসিপ্যাল সংক্রান্ত কার্যে সাহেবদিগের সর্বকর্ম ক্ষমতা রহিয়াছে, ইহা ব্যক্তিমাত্রেরই প্রায় সুনিশ্চিত সংস্কার। যতদিন এই সংস্কার বদ্ধমূল থাকিবে ততদিন বর্ধিত মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স প্রদান করিতে লোকের কত প্রবৃত্তি জন্মিবে সকলেই তাহা বিবেচনা করিতে পারেন। অতএব, আমরা গ্রেহাম সাহেবকে বিনয়ের সহিত অনুরোধ করি, তিনি যদি ঢাকার প্রকৃত কল্যাণার্থী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সর্বাগ্রে স্থানীয় লোকদিগের উক্তরূপ সংস্কার দূর করিতে চেষ্টা করুন,—স্থানীয় লোকদিগের যুক্তি-যুক্ত

প্রস্তাব শ্রবণমাত্রে উপেক্ষিত না হয় সুদৃঢ়রূপে তাহার ব্যবস্থা করা হউক, পরে নগরের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানার্থ কয়েকটি সুসাধ্য প্রস্তাব করিয়া তৎসাধনার্থ নূতন কর স্থাপনের প্রস্তাব করা হউক। এরূপ হইলে সহজেই উদ্বিগ্ন কার্য সকল সম্পাদিত হইতে পারিবে সন্দেহ না।[৩]

ঘরবাড়ির ওপর কর আরোপে ঢাকাবাসীদের ছিল প্রবল প্রতিকূলতা। কিন্তু ১৮৭০ খ্রিঃ সরকার ঢাকার মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের ওপর শতকরা ১০ টাকা হারে কর নির্ধারণের ক্ষমতা প্রদান করে বিশেষ আইন বলে। কমিশনাররা আয় বৃদ্ধির দিকে নজর দেন। কোন কোন অঞ্চলের কর বৃদ্ধি করাও হয়" ঃ ...বাড়ির ট্যাক্স যেরূপ ভয়ানক উচ্চ করা হইয়াছে, শুনিলে অত্রত্য সমুদয় লোকেরই মুখ মলিন হয়। ট্যাক্স বৃদ্ধি কর্তৃপক্ষের এক রোগ হইয়াছে। বাষ্পীয় যন্ত্র যেমন আজকাল বলসাপেক্ষ সর্বপ্রকার কার্য সাধনের একটি প্রধান উপায়, ট্যাক্সও এদেশে রাজকীয় সকল প্রকার অর্থ সংগ্রহের সেইরূপ একটি উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে বিষয়ই কেন হউক না, অর্থের আবশ্যক হইল, আর অমনি ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া গেল, অথবা স্থল বিশেষে নূতন ট্যাক্সের সৃষ্টি করা হইল। ঢাকার গৃহ ট্যাক্স যেরূপ উচ্চ করা হইয়াছে, ইহাতে সাধারণের কষ্টের সীমা থাকিবে না। শতকরা দশ টাকা ট্যাক্স সামান্য নয়, তারপরেও আবার পায়খানার ট্যাক্স। যাহা হউক, ট্যাক্স দিয়াও যদি প্রকৃত উপকারের প্রত্যাশা থাকিত, তথাপি লোকের প্রবোধের অনেক হেতু ছিল। কিন্তু প্রকৃত কাজে কিছুই হইবে না, লাভের মধ্যে, লোকে ট্যাক্স দিয়া প্রাণান্ত হইবে; সহস্ররূপে অর্থ সংগ্রহ করা, স্বাস্থ্যের উপায় প্রদর্শন করা, যতদিন না ঢাকার নিষ্কর্মা মিউনিসিপ্যাল কমিটির সংশোধন হইতেছে, ততদিন ঢাকার ভাগ্যে বিধানে মঙ্গল স্বাস্থ্য বিষয়ে এত দুরবস্থা, তাহা অর্থের জন্যে নয়। সাধারণরূপে ময়লা পরিষ্কার করা, সড়কে জল দেওয়া, অর্থের জন্যে ঠেকে না ; এখন মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে যাহা আয় হয়, দেখিয়া শুনিয়া কাজ করিলে ইহাতেও অনেক হইতে পারে। কিন্তু এখন কি হইতেছে? মধ্যে মধ্যে সাহেবদের সুবিধা লক্ষ্য করিয়া দুই একটি কাজ মাত্র হইতেছে। যেরূপ ট্যাক্সের প্রস্তাব করা হইয়াছে, তদ্দারাও যে তাহাই হইবে না, কে বলিতে পারে? অতএব আমাদের বিবেচনায় সর্বপ্রথমে মিউসিলিপ্যাল কমিটিকে সংশোধন করা উচিত। যতদিন ইহার সংশোধন না হইবে, ততদিন কিছুতেই কিছু হইবে না। কমিটিতে বাঙালি মেম্বরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা কর্তব্য, এবং স্থানীয় লোকের হস্তে মেম্বর মনোনীত করার ভার রাখা উচিত। ঋণের ক্ষমতা যে কমিটিকে দেওয়া হইয়াছে, সেটিও ভাল হয় নাই। এখন দিগ্বিদিক বিবেচনা না করিয়া কমিটি টাকা ঋণ করিবে, আর তাহার সুদ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। পরে কি হইবে? শতকরা ১৫ টাকা ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। সুতরাং সকল মতেই আমাদের মরণ।[৪]

১৮৬৫ থেকে ১৮৮৬ খ্রিঃ মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক কর বৃদ্ধি ঘটে। যা মিউনিসিপ্যালিটির আয় বৃদ্ধির পথ সুগম করে। শৌচাগার কর চালু হয় ১৮৭৮ খ্রিঃ। বেশ কয়েকটি রাস্তা পাকা করার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো বিপজ্জনক বাড়ি ভেঙেও ফেলা হতে থাকে। এইসব ভাঙা বাড়ির বর্জিত অংশ রাস্তা নির্মাণ ও খানা ডোবা বোজাবার কাজে ব্যবহার করা হত।

"আমাদের মিউনিসিপ্যাল কমিটির আর সংশোধন হইল না। ঢাকায় মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স আছে, কমিটি আছে, বড় বড় লোক তাহার মেম্বর আছেন এবং কমিটিতে সবলকায়, সুস্থ শরীর, সতেজ ও যুবক একজন সম্পাদকও আছেন, অথচ ঢাকার দুরবস্থার অবসান হইতেছে না। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রকৃতি কোন ঋতুতেই ঢাকার সড়ক দিয়া সুখে চলা যায় না ইতঃপূর্বে সড়কের ধূলি নিবন্ধন আমাদিগকে যেরূপ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে, সম্প্রতি কর্দমপ্রযুক্ত তাহা অপেক্ষা কম ক্লেশ পাইতে হইতেছে না। এমন অনেক সড়ক আছে, যাহারা জুতা ব্যবহার করে তাহারা ঐ সড়ক দিয়া চলিতে পারে না। সড়কের মধ্যে অনেক স্থান গর্তপ্রায়

হইয়া রহিয়াছে। সকল স্থান দিয়া যে কেবল পদচারী লোকের গতায়াতে কষ্ট হয় এরূপ নহে। শকটারোহণে গমনাগমনও অক্লেশে সম্পন্ন হয় না। ঐ দিবস ঢাকায় কোন সাহেব আমাদের কটক্লিপ সাহেবকে চিকিৎসা জন্য তাঁহার বাটিতে যাইতে বলেন। শুনিলাম কটক্লিপ সাহেব তাহাতে এই উত্তর প্রদান করেন, অদ্য বৃষ্টি হওয়াতে সড়ক অত্যন্ত দুর্গম হইয়াছে, অতএব আমি যাইতে পারিব না। তিনি যে গাড়িতে যাতায়াত করেন, একথা পাঠকগণকে বলিয়া দিতে হইবে না এখন সকলেই দেখুন যে স্থান দিয়া শকটারোহণে লোক যাইতে অক্ষম, সে স্থান দিয়া পদচারণে কিরূপে চলা যাইতে পারে। সড়কগুলি সমতল করা কি মিউনিসিপ্যাল কমিটির কর্তব্য মধ্যে নয়। কর্তব্য মধ্যে কি কেবল ট্যাক্স আদায় করা?"[৬]

মিউনিসিপ্যালিটির কাজকর্ম নিয়ে জনগণের ক্ষোভ ছিল ক্রমবর্ধমান। তাতে ইন্ধন জুগিয়েছি স্থানীয় ইংরেজি ও বাংলা সব ধরনের সংবাদপত্র। পৌরসংস্থার অকার্যকারতার নানান কারণ থাকলেও চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও কমিশনাররা ছিলেন সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত। এরা কেউ জনসাধারণের দ্বারা তখনও পর্যন্ত নির্বাচিত হতেন না। এবার ওঠে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবি। ঢাকা জনসাধারণ সভা এব্যাপারে এগিয়ে আসে। এইসভার সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ঢাকার ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশিষ্ট মানুষজনসহ স্থানীয় জমিদার ও ধনী ব্যক্তিরা। দীর্ঘকাল এইসভা নানান দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনও চালিয়েছিল। তাদেরই উদ্যোগে ছোট লাট স্যর রিচার্ড টেম্পলের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠান হয় ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুন। ৭০০ নাগরিক সাক্ষরিত এই দাবিপত্রে কশিনারদের নির্বাচনের দাবি জানান হয়েছিল। কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

"অবগত হইয়া আহ্লাদিত হইলাম, আমাদিগের অচিরাগত ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর ওয়েস্টমেকট্ সাহেব ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্বাচন প্রণালী প্রবর্তিত হইয়া সুফলপ্রসূ হইতে পারে কিনা, করদায়ী প্রজাবর্গের প্রতিনিধিগণের হস্তে কিয়ৎ পরিমাণে কার্যভার প্রদান পূর্বক আংশিকরূপে তৎপরীক্ষা করিতে সমুদ্যুক্ত হইয়াছেন এবং কিরূপে উহার সূত্রপাত করিবেন, তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পরামর্শ গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার বাসনা এই যে, ঢাকা নগরীকে কতিপয় ওয়ার্ডে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ওয়ার্ডের কার্য নির্বাহার্থ তদন্তর্গত করদাতাদিগের ভোট গ্রহণপূর্বক কতিপয় প্রতিনিধি মনোনীত করেন এবং মিউনিসিপ্যালিটির ইদানীন্তন কমিশনারগণকে স্ব স্ব নিকটবর্তী ওয়ার্ডের এক্স অফিসিয়েল মেম্বর পদে নিয়োজিত রাখেন। অভীপ্সিত প্রণালীতে কার্য ভাল চলিতেছে দেখিলে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে যথাবৎ নির্বাচন প্রণালী প্রবর্তনার্থ গভর্নমেন্টের অনুমতি গ্রহণ করিবেন, এই তাঁহার মুখ্যোদ্দেশ্য। আমরা মেকট সাহেবের এই সৎসঙ্কল্প পরিজ্ঞাত হইয়া যেমন পরিতুষ্ট তেমন সশঙ্কও হইয়াছি। কারণ তিনি যে বিষয়ের সূত্রপাত করিতে প্রবৃত্তিমান হইয়াছেন তাহা অতি গুরুতর এবং উহার সুফল-কুফলের উপরেই ঢাকার ভবিষ্যৎ ইষ্টানিষ্ট অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া যদি উত্তমরূপে ওয়ার্ডের কার্য পরিচালন করিতে পারেন, তাহা হইলেই ভবিষ্যতে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্বাচন প্রণালী প্রবর্তিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। পক্ষান্তরে অনুপযুক্ত ও অকর্মণ্য প্রতিনিধি মনোনয়ন বশতঃ কার্য পণ্ড হইয়া গেলে, ভবিষ্যতের আশায় জলাঞ্জলিই দিতে হইবে। আমরা মিউনিসিপ্যালিটিতে সচরাচর যেরূপ অকর্মণ্য ও অযোগ্য কমিশনারের সংখ্যা বাহুল্য দর্শন করিতেছি, তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে, পাছে নির্বাচনদোষে ঐরূপ অকার্যকর অযোগ্য প্রজাপ্রতিনিধি মনোনীত হইয়া ম্যাজিস্ট্রেট মেকট সাহেবের উক্ত ঔদার্য্যমূলক সঙ্কল্প অনর্থকর হইয়া উঠে,—ঢাকাবাসীগণের আশালতা চিরকালের নিমিত্ত অফলিতা থাকিবারই হেতুভূত হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং যাহাতে বাঞ্ছিত বিষয়ের সুফল ফলিতে পারে,—সুশিক্ষিত স্বাধীনচেতা যোগ্যতর প্রজা প্রতিনিধি সকল মনোনীত হইয়া ভবিষ্যতে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন প্রণালী লাভের পথ সুপরিষ্কৃত

হয়, সবিশেষ পর্যালোচনা ও বিবেচনা সহকারে তদ্রূপ বিধান করাই ম্যাজিস্ট্রেট মেকট সাহেবের একান্ত কর্তব্য। ঢাকাবাসীগণেরও কর্তব্য হইতেছে যে তাহারা এক সময়ে মেকট সাহেবকে এতদ্বিষয়ক সদুপায় প্রদর্শন করিয়া সহায়তা করেন। আমরা অনুরোধ করিতেছি, ঢাকা জনসাধারণসভা অবিলম্বে উদ্যুক্ত হইয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে সৎপথ প্রদর্শন করুন,—যাহাতে ওয়ার্ডের কার্যনির্বাহার্থ সুশিক্ষিত, স্বাধীনমনা যোগ্যতর প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতে পারেন তাহার চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হউন।...*

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি ও স্বাস্থ্য সংবিধান :

ঢাকা অনতিদীর্ঘ শহর। কলিকাতার পর বঙ্গদেশে ঢাকার সদৃশ উন্নত শহর অতি অল্প। শিল্প-কার্যে, ঢাকা পৃথিবীতে সুপরিচিত। ঢাকার বাহ্য সৌন্দর্য ন্যূন নহে। ঢাকাতে হিন্দু-মুসলমান, আরমানি প্রভৃতি বহুতর সম্প্রদায়ের ঘনসন্নিবিষ্ট বসতি। ঢাকার বন্দর নারায়ণগঞ্জ সুপ্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান। বলিতে কি এই নগর ভারতবর্ষে একটি প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণীয়। ইহা এক সময়ে সমুদয় বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। কলিকাতা ও হুগলি ভিন্ন ঢাকার ন্যায় আর কোন স্থানই অধিকতর সুশিক্ষিত ও ক্ষমতাসম্পন্ন লোকের জন্মভূমি নহে। সেই প্রাচীনা ঢাকা নগরী, স্বাস্থ্যের অপঘাতে ক্রমশঃ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছিল। ইহা, জলবায়ু উৎকৃষ্ট নহে তলবাহিনী বৃদ্ধ গঙ্গা ক্রমে স্তিমিত বেগা ও উৎভিন্ন চড়া হইয়া পড়িয়াছে। বায়ু পরিশুষ্ক। সন্নিবিষ্ট বসতিবশত ঢাকার অধিকাংশ স্থান ময়লা দুর্গন্ধ পরিপূর্ণ বিশেষত গৃহ নির্মাণ প্রণালী প্রশংসনীয় কি স্বাস্থ্যজনক নহে। স্থানের অভাবই তাহার কারণ। শ্রেণী কি ব্যবসায়ী ভেদে, বসতির শৃঙ্খলা না থাকায়, অনেক অসুবিধা ও স্বাস্থ্যের বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে। তদুদাহরণে বলিতে চাই মুচি, কসাই ও পশুপালক এবং দুর্গন্ধপ্রদ শাখ প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের বসতি শহরের নানাস্থানে ও মধ্যে থাকায় স্বাস্থ্যের বহুল বিঘ্ন সম্পাদিত হইয়া থাকে। অপিচ গলি প্রভৃতি স্থানের জল নিঃসারণের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত নাই। প্রশস্ত পথের অভাব আর এক কারণ। এদিকে এই সকল ব্যাধির বিনায়ক ভিষক মিউনিসিপ্যাল কমিটি এক প্রকার চেতনা শূন্য। তাহা দ্বারা অর্থনাশ ভিন্ন, ঢাকার স্বাস্থ্যোন্নতি সম্পাদিত হইয়াছে এমত কিছুই নাই। ভগবান জানেন, তাহাদের কি উদ্দেশ্য। ভাল রাস্তা, ঘাট, সরোবর কি, নালা কি কোনও প্রকার উৎকৃষ্ট সংস্কার, এখানে যাহা কিছুই দেখিতেছি, তাহা কেবল নবাব আব্দুল গণি ও নবাব আসানুল্লা খাঁ বাহাদুরের প্রসাদাৎ। সেই প্রসাদ, জলের কলের সৃষ্টি। জলের কলের সৃষ্টি অবধি ঢাকার বড় রাস্তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিগণের কোন প্রকার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে দেখা যায় না। ওলাউঠা নামক যে, এক রাক্ষসী ব্যাদিত মুখে চিরদিন অবস্থান করিতেছিল, শহরের মধ্যস্থল হইতে সে কলের বিশদ বরুণবাণে এক প্রকার বিতাড়িত হইয়াছে। উদরাময়, জ্বর প্রভৃতি নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এই স্থানে আর একটি মর্মবিদারক কথা আমরা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। ঢাকাতে বহুতর গলি এবং তাহাতে অনেক লোকের বাস। তাহাদের রোগ, শোকে ও দুঃখে ঢাকার পক্ষদর্শী মিউনিসিপল কমিটির একবিন্দু নেত্রজল পতিত হয় না। আমরা জানি, জলের কলের সমস্ত ভার মিউনিসিপ্যালিটির হস্তে রহিয়াছে। নবাব সাহেব কেবল সাহেব ও বড় বড় লোকদের জন্য জলের কলে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রদান করেন নাই, তাঁহার হৃদয় সংকীর্ণ নয়। সাধারণের উপকারার্থেই তাঁহার অর্থ উৎসৃষ্ট হইয়াছে। ঢাকার প্রায় অধিকাংশ গলিতেই জলের কল আসে নাই। বোধহয় সে স্থানবাসীরা মিউনিসিপ্যাল কমিটির উপেক্ষিত প্রজা। অথবা স্বীকার করিতে হইবে সেই সকল গলিনিবাসী কেহই মেম্বর নাই। নতুবা তাহারা কম ট্যাক্স দেয় ইহা স্বীকার করিতে পারি না। বলিতে কি, গলিগুলির প্রতি মিউনিসিপ্যাল কমিটির দৃষ্টি নাই। কেবল বারংবার পায়খানার নোটিশ আসিতে দেখিতে পাই। ঢাকার গলিতে যাহারা বাস করে, তাহারাই বাস্তব ঢাকা নিবাসী। তাহারাই নিয়মিতরূপে ট্যাক্স প্রদান করে। অথচ কি অবিচার ও আশ্চর্য যে, সে সকল স্থানের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি ক্ষীণ।

যাহারা উপনিবেশী, কেবল কার্যগতা,—কিছুকালের জন্য বাস করিতেছে, এমত কি ট্যাক্সও প্রদান করে না, তাহাদের জন্যই মিউনিসিপ্যাল কমিটি ব্যস্ত।

সম্প্রতি গত অধিবেশনে মিউনিসিপ্যাল মেম্বরগণ, ঢাকাতে ড্রেন সৃষ্টির কল্পনা করিয়াছেন। এই কার্যটি যে মহৎ, তাহার সন্দেহ নাই। ইহা দ্বারা স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হইবে। ড্রেন ও জলের কল দ্বারাই কলিকাতা এখন স্বাস্থ্যশালী স্থান হইয়াছে। এই দুটির সৃষ্টিতে ঢাকার সমধিক উপকারের সম্ভাবনা। ড্রেন বিস্তারের জন্য সম্প্রতি কমিটি গভর্নমেন্ট হইতে লক্ষ টাকা ঋণ করিবেন স্থিরীকৃত হইয়াছে। শীঘ্রই ভাইস চেয়ারম্যান ঢাকার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের নিকট উল্লিখিত বিষয়ের এক ইষ্টিমিট প্রার্থনা করিবেন। মিউনিসিপ্যাল কমিটির এই অনুষ্ঠান ও তৎপরতাকে আমরা প্রশংসা করি। কিন্তু আমাদের চিন্তার বিষয় এই, ড্রেন প্রবাহিত ময়লা কোথায় পরিণতি পাইবে। নিকটে সমুদ্র কি বড় নদী নাই। যদি ভাওয়ালের কোন বিলে কি মহারণে তাহার স্থান নির্দিষ্ট হয় তবে কতকাল যে তাহা সংরক্ষিত থাকিবে জানি না। তৎদ্বারা ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি বিস্তারেরই বা বৈচিত্র্য কি? অবশ্য কমিটি সে বিষয়ে একটি সুপন্থা নির্ধারিত করিয়া থাকিবেন।

গত অধিবেশনে আর একটি মহৎ বিষয়েরও সঙ্কল্প হইয়াছে। মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ ম্যাজিস্ট্রেট, সিভিল সার্জন প্রভৃতির ঐকমত্যে স্থির করিয়াছেন যে, ঢাকাতে ১৪ আইনের আবশ্যক। এবং সেই আইনের ২০ ধারামতে বেশ্যাদিগকে শহরের বাহিরের কোন স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। মেম্বরগণের এই সঙ্কল্প, অনুষ্ঠিত হইলে, ঢাকা একটি দেবস্থান হইবে তাহার সন্দেহ নাই। যেহেতু এই আইন ঢাকাতে প্রচলিত হইলে আমাদের বিশ্বাস এই, ঢাকাতে বেশ্যার সংখ্যা ন্যূন হইয়া পড়িবে। তৎসঙ্গে সুরাদেবীরও অনুরাগ কমিয়া যাইয়া পঞ্চমকারসেবী তন্ত্রের মাহাত্ম্য কমিয়া যাইবে। তবে যাহারা সমাজ রক্ষার জন্য বারবণিতাদের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিতে চান এই 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে' তাহাদের সহিত আমাদের আর তর্ক নাই। চৌদ্দ আইনের অন্য বিধান পালিত হউক না হউক, কিন্তু বেশ্যাদিগকে শহর হইতে দূরীভূত করা নিতান্ত উচিত। আমরা স্থানীয় গভর্নমেন্টকে ঢাকার জন্য এই হিতসঙ্কল্পের অনুমোদন করিতে অনুরোধ করি।

উপসংহারে মিউনিসিপ্যাল কমিটির প্রতি আমাদের গুটিদুই কথা। ঢাকাতে ড্রেন সৃষ্টি, যেন কেবল সদর রাস্তাতে না হয়। যাহাতে সর্বত্র গলি ও অন্যান্য স্থানে ড্রেন প্রচারিত হয়, সে বিষয়ে নিরপেক্ষরূপে মনোযোগ বিধান করেন, এবং ড্রেন সৃষ্টির পূর্বে যাহাতে স্বাস্থ্যের অন্যতম প্রধান উপাদান জলের কল ঢাকার অপরাপর গলি ও স্থানে প্রচুর পরিমাণে প্রচারিত হয় সত্বর তাহার বিধান করেন। পথের আলোর বন্দোবস্তও অতিশয় অপকৃষ্ট। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, ইহা খদ্যোতবৎ জ্বলিতেছে। ঈদৃশ আলোর জন্য ব্যয় অনাবশ্যক। প্রত্যেক প্রকাশ্য গলিতে আলোর ব্যবস্থা নিতান্ত আবশ্যক। সেই সকল স্থানেই রাত্রি যোগে অনেক অসদনুষ্ঠান ও পাপকার্য হইয়া থাকে। যাহাতে সর্বত্র সমানরূপে রাস্তাঘাট প্রস্তুত হয় তৎবিষয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টি থাকে। আমরা জানি, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারও একজন মিউনিসিপ্যাল মেম্বর। সুতরাং তাহা দ্বারা এই সকল বিষয়ের সাময়িক পরীক্ষা নিতান্ত আবশ্যক। ব্যক্তিবিশেষকে সর্বতোমুখী ক্ষমতা প্রদান অনুচিত। তাহার কার্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি আবশ্যক। এই স্থানবাসী লোক যাহাতে অধিক পরিমাণে মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে সংসৃষ্ট হইতে পারে, তাহাই করা কর্তব্য।[১]

লর্ড রিপন ১৮৮২ খ্রিঃ ১৮ মে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করেন। বাংলার ছোটলাট স্যর রিভার্স টমসন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেও, প্রস্তাবের স্বপক্ষে ঢাকায় একটি বিশাল জনসমাবেশ হয় ২৪ জুলাই। জগন্নাথ স্কুলের প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা জনসাধারণ সভার প্রেসিডেন্ট ব্রজেন্দ্রকুমার রায়। ঢাকার ইতিহাসে এ

এক ঐতিহাসিক জনসমাবেশ। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলির সদস্যদের সরাসরি নির্বাচনের দাবি জানান হয়। সেদিনের সভা সম্পর্কে ঢাকারই সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণে আছে :

"ঢাকাস্থ জনসাধারণ সভার উদ্যোগে ও আহ্বানে গত ৯ই শ্রাবণ সোমবার অপরাহ্নে ঢাকা জগন্নাথ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ও নাটক গৃহে স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে সত্য সত্যই এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিলাম, যাহাতে এই সভার উদ্দেশ্য নগরে ও গ্রামে সর্বত্র প্রচারিত হয়, এবং যাহাতে সকলশ্রেণীর লোক সভায় যোগদান করিতে পারেন, এই অভিলাষে জনসাধারণ সভা ৫০০০ খণ্ড মুদ্রিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনেক হাটে বন্দরে ঢেঁঢড়াও দেওয়া হইয়াছিল এবং ব্যক্তিবিবেচনায় বহুস্থানে নিমন্ত্রণপত্রও প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং সভাগৃহ, তাহার পার্শ্বস্থ সমস্ত প্রাঙ্গন ও রাজপথ যে প্রকৃত প্রস্তাবেই লোকারণ্য ও লোককোলাহলে রৌরুয়মান হইয়াছিল, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। ...কতলোক সভাগৃহে ও তাহার চতুর্দিগ্বর্তী সুবিস্তীর্ণস্থানে উপস্থিত ছিল, কতলোক স্থান না পাইয়া বা প্রবিষ্ট হইতে না পারিয়া বহির্ভাগে অবস্থান বা প্রতিগমন করিয়াছিল, কত লোক পার্শ্বস্থ গৃহনিচয় ও বৃক্ষাদির উপরে দণ্ডায়মান ছিল, তাহার সংখ্যা করা নিতান্তই সুকঠিন। কেহ কেহ অনুমান করেন, লোকসমষ্টি সংখ্যা ১০/১২ হাজার, অপরেরা বলেন, ১৫/২০ হাজার হইয়াছিল। এবিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত প্রায় অসম্ভব। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, এরূপ বহুলঘটাপূর্ণ সুবিশাল বিরাট সভা এখানে আর কখনও কেহ কেহ দেখে নাই এবং সর্বসাধারণের এরূপ উদ্যম, উৎসাহ ও আনন্দোচ্ছ্বাস আর কখনও কেহ অনুভব করে নাই। এই সভায় হিন্দু মুসলমান, আর্মেনিয়ান প্রভৃতি ঢাকা নিবাসী ও প্রবাসী বহুসংখ্যক লোক একযোগে ও এক হৃদয়ে মহাত্মা লর্ড রিপনকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্বক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের কর্তব্যতায় সম্যগ করিয়াছেন। আমাদের কোনও প্রকার ত্রুটিতে ইহা প্রকৃতরূপে কার্যে পরিণত হইতে না পারে তাহা হইলে নিশ্চয়ই হতাশ হইয়া আমাদিগকে বলিতে বাধ্য হইতে হইবে যে, এখন পর্যন্তও ভারতবর্ষে এইরূপ উচ্চ ও উদারপ্রণালীকে প্রবর্তনের সময় উপস্থিত হয় নাই। স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী আমাদের দেশে নির্বিরোধে প্রচলিত চাহিলে ইহার দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ আমাদিগের প্রত্যেকের নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করা অবশ্য কর্তব্য কার্য হইবে। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, বিদ্বেষ পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি যেসকল নিকৃষ্ট রিপু ভারতবর্ষের অস্থি মজ্জাভক্ষণ করিতেছে, তাহাদের সমুলোৎপাটন ভিন্ন, স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী কখনও আমাদের দেশে একটি প্রকাণ্ড ক্ষমতারূপে পরিগণিত হইতে পারিবে না। সুতরাং যদি এই সময়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আমরা কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হই, তাহা হইলে ইংরাজ সম্পাদকগণ ব্যঙ্গভাবে আমাদিগের সম্বন্ধে যাহা যাহা ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহার অনেক কথাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। সভ্য জাতিদিগের সম্মুখেও আমরা নিতান্ত অপদার্থরূপে সর্বদা পরিচিত থাকিব। সঙ্কীর্ণমনা হইলে আমরা কখনও এই উচ্চ রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করিতে সমর্থ হইব না। এই বিষয়টি সর্বদা আমাদের অন্তঃকরণে জাগরুক থাকে, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। স্বায়ত্তশাসনপ্রথার অভ্যন্তরে যাহাতে আমাদের ব্যক্তিগত কোনও প্রকার স্বার্থ প্রবেশ করিতে না পারে, তৎপক্ষে, বিশেষ অবহিত থাকিতে হইবে। আমাদের দেশে যেসকল কার্য সমবেত চেষ্টাসাপেক্ষ, তাহার অধিকাংশই আমাদের নিশ্চেষ্টতা নিবন্ধন অকালে বিলয় প্রাপ্ত হয়। আমাদের মধ্যে অনেকই স্ব-স্ব প্রধান হইতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং কোনও গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে মহাযোগাযোগ উপস্থিত হইয়া উঠে। যে দেশে এই প্রকার অবস্থা, তাহার উন্নতি সুদূর পরাহত। যে সমাজে যে ব্যক্তি যতদূর প্রতিভাশালী, তিনি লোকদিগ কর্তৃক ততদূর সম্মানিত হইয়া থাকেন। জ্ঞান, বিদ্যা ও চরিত্র সর্বত্ররূপে যোগবিধান করিয়াছেন। এই সময়ে প্রত্যেকের সুপ্রসন্নবদন ও উৎসাহপূর্ণ আকৃতি সন্দর্শনে বোধ

হইয়াছিল, এতদিনে বঙ্গদেশ জাতীয় জীবন লাভে পরিসমর্থ হইবে, এতদিনে স্বায়ত্তশাসন সংজীবনে মৃতবঙ্গের শরীরে জীবন সঞ্চার হইবে। ...

প্রভাত হইতেই দিক্‌স্পর্শী আনন্দ ধ্বনিতে সভার গৃহ ও প্রাঙ্গণ আনন্দময় হইয়া উঠিতে লাগিল। চারিদিক পথের উভয় পার্শ্বে মাঙ্গল্যফলপল্লবালিঙ্গিত ও সুগন্ধিমাল্য পরিশোভিত পূর্ণকুম্ভ ও কদলীতরুসকল সংস্থাপিত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে তোরণদ্বার নির্মিত হইয়া ললাটদেশে, ভারতেশ্বরীর শুভনাম ও তৎপ্রতি আশীর্বচন অঙ্কিত হইয়াছিল। উৎসবব্যঞ্জক নানাবিধ ঐকতান সুমধুর ধ্বনিতে সভার প্রাঙ্গনক্ষেত্র প্রকৃতরূপে আনন্দক্ষেত্রই হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কেহই ছিল না, আনন্দে যাহার হৃদয় তরলিত না হইয়াছিল। বলিতে কি, এমন শুভ, আনন্দপূর্ণ ও প্রাণময় উৎসব, অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হইয়াছে।

ইত্যাকার বহুলোক সমাকীর্ণ সভায় কোথায় কে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কাহার সাধ্য লক্ষ্য করিতে পারে? তবে নিম্নলিখিত পদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ দৃষ্টিপথবর্তী হইয়াছিল। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে জি, জি, ডে, ঢাকার ডিস্ট্রিক্ট ... জে, বি, এস, পোপ, ঢাকা ... প্রিন্সিপাল, রেলওয়ের এজেন্ট সাহেব জর্জ ডেবারল সাহেব, বেঙ্গল টাইমসের এডিটর কেম্প সাহেব।

জমিদারদিগের মধ্যমীর সৈয়দ হাসন আলি, মৌলবী বেজারগবানী, মৌলবী গোলাম মস্তাফা, নবাব সাহেবের পরিবারস্থ খাজে মনসুর মিঞা ও খাজে মহাম্মদ আজগর মিঞা, হাজি বদরুদ্দিনের পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ, আই, সি, পাইনটি, বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, বাবু গিরিশচন্দ্র রায়চৌধুরী, বাবু রঘুনাথ দাস, বাবু প্রতাপচন্দ্র দাস, বাবু মদনমোহন বসাক, বাবু রাধিকামোহন বসাক, বাবু চন্দ্রবিনোদ পালচৌধুরী, বাবু ললিতমোহন রায়, বাবু মাধবনারায়ণ ঘোষ, বাবু ব্রজবিহারী রায়, বাবু কৈলাশচন্দ্র সেন চৌধুরী, ঈশানচন্দ্র রায় (কাইতলা) বাবু শ্রীনাথ রায় (শ্রীনগর)।

গভর্নমেন্ট কর্মচারীদিগের মধ্যে বাবু নবীনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (সাবর্ডিনেট জজ), বাবু গিরিশচন্দ্র চৌধুরী (সবর্ডিনেট জজ), বাবু রেবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মুন্সেফ, বাবু যদুনাথ ঘোষ মুন্সেফ, কৃষ্ণচন্দ্র রায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, মৌলবী ওবেদুল্লা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল, বাবু দীননাথ সেন জয়েন্ট ইন্সপেক্টর, ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় ঢাকা কলেজের প্রফেসর, বাবু নীলকান্ত মজুমদার (ঐ), বাবু কৈলাশচন্দ্র ঘোষ কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাস্টার, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বসু, বাবু জগবন্ধু লালা ঢাকা নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক, বাবু কাশীচন্দ্র দত্ত মেডিকেল স্কুলে প্রফেসর, বাবু দুর্গাদাস রায় (ঐ) ইত্যাদি।

উকিলদিগের মধ্যে বাবু আনন্দচন্দ্র রায়, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র দাস, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ, রজনীকান্ত চৌধুরী, বাবু শরচচন্দ্র বসু, বাবু শরচচন্দ্র গুপ্ত, বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, বাবু হরিচরণ চক্রবর্তী, বাবু আশুতোষ সরকার, বাবু শ্যামাকান্ত নাগ, বাবু তারকচন্দ্র বসু, গুরুচরণ ভট্টাচার্য, বাবু রামচন্দ্র সেন, বাবু রোহিনীকুমার বসাক, বাবু চন্দ্রকুমার সেন, বাবু রামাকান্ত নন্দী প্রভৃতি প্রায় সমস্ত।

ইহা ভিন্ন আমলা, জমিদার, কর্মচারী, তালুকদার মহাজন ও অন্যান্য প্রকার স্বাধীন ব্যবসায়ী ও পরিচিত ভদ্র সম্ভ্রান্ত বহুলব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিয়া পত্র দ্বারা সভার উদ্দেশ্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং ইহাদের অনেকে প্রতিনিধিও প্রেরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজা শ্যামাশঙ্কর রায় (তেঁওতা)

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায় (শ্রীনগর)

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায় (নাল্লার)

শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসন্ন ও যোগেশ চক্রবর্তী, রহমতপুর (বরিশাল)

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণমোহন, চন্দ্রমোহন ও গোপীমোহন রায় চৌধুরী (নবীনগর, ত্রিপুরা)
শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র রায়, ...
শ্রীযুক্ত বাবু বাবু শশীকুমার সেনগুপ্ত (কীর্তিপাশা)
শ্রীযুক্ত বাবু পার্বতীশঙ্কর রায় (তেঁওতা)
শ্রীযুক্ত বাবু রাজবিহারী রায় (মাইজপাড়া)
শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র রায়
শ্রীযুক্ত বাবু দক্ষিণাচরণ রায় (লাখুটিয়া)
শ্রীযুক্ত বাবু রূপলাল দাস (ঢাকা)
শ্রীযুক্ত বাবু অভয়াকান্ত লাহিড়ী (ময়মনসিংহ, কালীপুর)
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীধর আচার্য চৌধুরী (মুক্তাগাছা)
শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার সেন (বাসন্ডা)
শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল গুপ্ত (মানিকগঞ্জ)
শ্রীযুক্ত বাবু মৌলবী আব্দুল হক
শ্রীযুক্ত বাবু সৈয়দ ফেরক হুসেন (জমিদার জলিলচর)

অপরাহ্ণ ৬টার সময়ে সভার সভাপতি বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় সর্বসম্মতিতে সভাপতির আসন পরিগ্রহপূর্বক নিতান্ত উৎসাহ সহকারে গভীরনিনাদে সংক্ষেপে অতি সুন্দররূপে সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলে অত্রত্য অন্যতর জমিদার শ্রীযুক্ত মীর হাসন আলি নিম্নলিখিত ১ম প্রস্তাব উপস্থাপন করেন এবং লৌহজঙ্গের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রবিনোদ পালচৌধুরী তাহার পোষকতা করেন।—

১ম প্রস্তাব।

ভারতবর্ষীয় গভর্নমেন্ট স্বশাসন প্রথা প্রবর্তনায় গত ১৮ মে তারিখে যে উদারনৈতিক মন্তব্যপত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি ও গভর্নর জেনেরেল বাহাদুর সমীপে এতদ্দেশীয় জনসাধারণের আন্তরিক গভীর কৃতজ্ঞতা উপহার ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হউক।

বক্তৃপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ সুযুক্তিপরিপূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। তিনি ইহা ঐতিহাসিক প্রমাণযোগে অতি দৃঢ়রূপে সপ্রমাণ করেন যে, স্বায়ত্তশাসন প্রথা পৃথিবীর কোনও দেশেই এক মুহূর্তে কি একদিনে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই. উহা সর্বত্রই ধীরে ধীরে ফুটিয়াছে ও ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া কালক্রমে সুশৃঙ্খল ও সর্বাতসৌষ্ঠব সম্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং ভারতবর্ষ বর্তমান অবস্থায় পূর্ণাবয়ব স্বায়ত্তশাসনের নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত না হইয়া থাকিলেও মহাত্মা লর্ড রিপন যে প্রণালীতে উহা প্রবর্তিত করিতে ইচ্ছা করেন, সেই প্রণালীর নিমিত্ত যে এখন প্রস্তুত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার পর বক্তা এতৎসম্বন্ধে বহু বিষয়ের অবতারণা...।

তৎপরে বাবু মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় নিম্নলিখিত ২য় প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং মৌলবী গোলাম মস্তাফা সাহেব উর্দুভাষায় বক্তৃতাসহকারে উদ্দিষ্ট বিষয় জ্ঞাপনপূর্বক উক্ত প্রস্তাবের পোষকতা করেন। বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু সমর্থন করিলে, সর্বসম্মতিক্রমে উহা অবধারিত হয়।

২য় প্রস্তাব।

যে অভিনন্দনপত্র এইমাত্র পাঠ করা হইল, তাহা এই সভাকর্তৃক অনুমোদিত ও ঢাকা জেলার বহু সংখ্যক প্রবাসী ও অধিবাসীগণ দ্বারা স্বাক্ষরিত হউক এবং উহা সমুচিত রাজকীয় প্রণালী অনুসারে গভর্নর জেনেরল বাহাদুর সমীপে প্রেরণ করার জন্য জনসাধারণ সভার কার্যনির্বাহক সভ্য মহোদয়গণকে অনুরোধ করা যাউক।

তদনন্তর বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন নিচের লিখিত তৃতীয় প্রস্তাব করিলে, বাবু কমলানাথ দাস তাহার পোষকতা করেন—

৩য় প্রস্তাব।

বঙ্গদেশের মাননীয় লেপ্টেনেন্ট গভর্নর বাহাদুরের বর্তমান ১৮৮২ সনের ৫ জুলাই তারিখের মন্তব্যপত্রে যে সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যুত্তরে একটি কার্যপদ্ধতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এক বিশেষ শাখা সভা গঠিত হউক। নিম্নলিখিত মহাশয়েরা সেই সভার সভ্য হইবেন এবং তাঁহারা আবশ্যক জ্ঞান করিলে অন্যান্যকেও তাঁহাদের সভার সভ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন। আর আপনাদের সভ্য আপনারা নির্বাচন করিয়া লওয়া এবং সেই সভ্যদিগের দ্বারা স্থানীয় বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হওয়া এই দুই মুখ্যসূত্র মনে রাখিয়া তাঁহারা প্রস্তাবিত কার্যপদ্ধতি প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা বিভাগীয় কমিশনার সাহেবের যোগে বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেন্ট গভর্নর বাহাদুরের হুজুরে প্রেরণ করিবেন।

বাবু আনন্দচন্দ্র রায়
বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ
বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাস
বাবু ঈশ্বরচন্দ্র দাস
বাবু হরিচরণ চক্রবর্তী
বাবু কেদারনাথ ঘোষ
বাবু রামপ্রসাদ সেন
বাবু রূপলাল দাস
বাবু যদুনাথ বসাক
বাবু রজনীকান্ত চৌধুরী
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু
মৌলবী গোলাম মস্তাফা।

বাবু, আনন্দচন্দ্র রায় এই তৃতীয় প্রস্তাবের সমর্থন উপলক্ষে একটি বক্তৃতা করেন। আনন্দবাবু বলেন যে, অদ্যকার এই বিরাট সভা শুধু মহাত্মা লর্ড রিপন বাহাদুরকে তাহার স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন বিষয়ক উদার অভিপ্রায়ের নিমিত্ত ধন্যবাদ প্রদানার্থ আহুত হয় নাই ; আমাদিগের বর্তমান লেপ্টেনেন্ট গবর্নর বাহাদুর স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন বিষয়ে মন্তব্যসহ যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কার্যপদ্ধতি প্রদর্শনপূর্বক তাহার উত্তর দান করাও ইহার অন্যতর উদ্দেশ্য। অদ্যকার এই বৃহতী সভায় তন্নির্ধারণ সহজ হইবে না বিবেচনায়ই এতদর্থ এক বিশেষ শাখাসভা গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে। ভরসা করি, প্রস্তাবিত শাখাসভা স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধীয় যথাযোগ্য কার্যপদ্ধতি প্রস্তুত করিতে সমর্থন হইবেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে দুইটি মুখ্য বিষয়ে মনে রাখিয়া পদ্ধতি প্রস্তুত করিতে হইবে।

প্রথমত শুধু মিউনিসিপ্যাল বোর্ড সম্বন্ধে নয়, সকল প্রকার বোর্ডেই যাহাতে সাধারণভাবে সর্বত্র নির্বাচনপ্রণালী প্রবর্তিত হইতে পারে; দ্বিতীয়ত নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যাহাতে আপনাদিগের সভাপতি ও কর্মচারী আপনাদিগের মধ্য হইতে মনোনীত করিতে পারেন—তাহাতে গভর্নমেন্টের কোনও সম্পর্ক না থাকে। লেপ্টেনেন্ট গভর্নরের প্রশ্নোত্তর দেওয়ার সময় গভর্নর জেনেরল বাহাদুরের রিজলিউশনের প্রতিও সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ ছোট লাট বাহাদুরের এতদ্বিষয়ক মন্তব্যের ভাব অপেক্ষাকৃত সঙ্কুচিত। কোন ব্যক্তি নির্বাচনের অধিকারী, কে কে নির্বাচিত হইবার উপযুক্ত এবং বোর্ডের আয়, ব্যয় ও ক্ষমতা বিষয়ে কিরূপ অধিকার থাকিবে, সভাকে তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া অবধারণ করিতে হইবে। মহাত্মা লর্ড রিপন বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন আমরাও বলি যে, সুযোগ ও সময় পাইলে

সকলেরই শক্তির বিকাশ হইতে পারে, এই বিবেচনার প্রথমেই কোন বিষয়ে হতাশ হওয়া কর্তব্য নয়। বর্তমান আইনে যেরূপ আছে, সেরূপ না হইয়া সাধারণভাবে নির্বাচনপ্রণালী প্রবর্তিত হয়, ইহাই বাঞ্ছনীয়। অবচ্ছেদাবচ্ছেদে সর্বত্রই প্রতিনিধি প্রণালী প্রতিষ্ঠায় অধিকার দান করা হয়, তাহা গভর্নমেন্টের ইচ্ছাধীন না থাকে, যে স্থানের লোকেরা ঐ প্রণালী না চায়, কেবল সেখানেই গভর্নমেন্টের ইচ্ছানুরূপ প্রণালী প্রবর্তিত হয় ইহাও নিতান্ত অভিলষনীয়।

শুনিলাম, এই অভিনন্দন পত্র পার্চমেন্টে মুদ্রিত করিয়া রৌপ্যাধারে ভরিয়া যথানিয়মে গভর্নর জেনেরল বাহাদুর সমীপে প্রেরিত হইবে।

বাবু ললিতমোহন রায়, নিম্নলিখিত চতুর্থ প্রস্তাব করেন। বাবু কালীনারায়ণ গুপ্ত... পোষকতা করিলে সকলেই করতালি দ্বারা ইহাতে সম্মতি দান করিলেন।

৪র্থ প্রস্তাব।

জনসাধারণ সভার কার্যনির্বাহক সভ্যগণ যে সভা আহ্বান করিয়াছেন সেইজন্য তাঁহাদিগকে এই সভা হইতে ধন্যবাদ প্রদান করা হউক।

সভাগৃহের বহিঃপ্রাঙ্গনে বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাস, বাবু রামপ্রসাদ সেন, বাবু উমাপ্রসাদ বিশ্বাস প্রভৃতি চারব্যক্তি বক্তৃতা করিয়া চত্বরস্থ সাধারণকেও সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

সর্বশেষে নিম্নলিখিত গানটি সমবেতস্বরে গীত হইলে সকলে একপ্রাণে এক হৃদয়ে অত্যুচ্চস্বরে মহাত্মা লর্ড রিপনের জয়ধ্বনি করিয়া আকাশ নিনাদিত করিলেন। তৎপরে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

'জয় জয় লর্ড রিপন, ভারত-শরণ।
যাচে ভারত অবিরত কর সুখ সম্প্রদান।
এ ভারত আঁধারে স্বায়ত্ত-শাসন দীপ,
সে আলোকে পুলকে গাও জয় লর্ড রিপন।
করি আশায় প্রলোভিত কত প্রভু গত,
শুনেছি শপথ কত, কেহ না দেখলো পথ,
না দেখি উদার, তব সম কভু আর,
লও 'কৃতজ্ঞতাহার' এই অভিনন্দন।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিলাম যে বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরীর বিশেষ উৎসাহ উদ্যোগেই এই সভার ঈদৃশ সুষমা সম্পাদিত হইয়াছিল, অতএব তিনি এজন্য বিশেষ ধন্যবাদার্হ।[৮]

জনসাধারণের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ৩ আইন পাশের পর। এই আইনে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচনের অনুমোদন দেওয়া হয়। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির ২১ জন সদস্যের মধ্যে ১৪ জনকে নির্বাচিত হতে হবে ৭টি ওয়ার্ড থেকে। জনসাধারণের ভোটাধিকার ছিল সীমিত।

"বহু আন্দোলন, আলোচনা ও বাদানুবাদের পর পূর্ব শনিবার বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল বিল বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বঙ্গবাসীর পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, উচ্চ অঙ্গের স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভ হইতে পারিবে। অতএব বঙ্গবাসীকে সবিশেষ বিবেচনাপূর্বক ন্যায়ধর্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, স্বার্থপরতা ও বিদ্বেষবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, অবিচলিত যত্ন, চেষ্টা ও অধ্যবসায় সহকারে কার্য করিতে হইবে। নিঃস্বার্থ হইয়া চেষ্টা করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি সুকঠিন হইবে না—সকলকে ভাইয়ের ন্যায় দেখিয়া বুদ্ধি বিবেচনার সহিত কার্য করিলে, পদস্খলন ঘটিবে না। উত্তরোত্তর উন্নতি সোপানে আরোহণ করা সহজ হইয়াই উঠিবে। বঙ্গবাসীগণ! সাবধান। চারিদিকে ছিদ্রান্বেষী শত্রু বিরাজমান। ত্রুটি ঘটিলে, আর রক্ষা থাকিবে না, বিষম কলঙ্ক ও অনর্থপাত হইবে। সুশিক্ষিত বাঙালি যৎসামান্য

কার্য সুনির্বাচিত করিতে পারিল না এই কলঙ্ক খ্যাপন করিয়া, শত্রুরা ভাবী আশা ভরসায় ভস্ম নিক্ষেপ করিতে ত্রুটি করিবে না। তাই বলিতেছি, ভাই বঙ্গবাসী! সদাসাবধানে কার্য করিবে —দক্ষতার নিদর্শন দেখাইবার এই উপযুক্ত সুযোগে ঔদাস্য ও অবহেলা না করিয়া ঈর্ষাদ্বেষাদিবর্জিত হইয়া, কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে। দেখিও যেন কলঙ্কস্পর্শ না ... ভবিষ্যতের উন্নতি দ্বার রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা না ঘটে।

রিভার্স টমসন স্বায়ত্তশাসনের বীজস্বরূপ এই মিউনিসিপ্যাল বিল বিধিবদ্ধ করিয়া, বঙ্গীয় প্রজাবর্গের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আশাপূর্ণ হইবে মনে করিয়াই অনেকেই আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু মুসলমানগণের ভাবগতি দেখিয়া শুনিয়া জানি কেমন বোধ হইতেছে। মুসলমানেরা এখন পর্যন্তও যে হিন্দুদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেছেন না, শত্রুস্থানীয় বোধ করিতেছেন, ইহাতে নিতান্তই ক্ষোভ জন্মিতেছে। মিউনিসিপ্যাল সভায় হিন্দু প্রতিনিধির সংখ্যা অত্যাধিক হয় এই আশঙ্কায় মুসলমানেরা ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করিয়া প্রতিকারার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু আশঙ্কার কোন কারণ নাই স্পষ্টাক্ষরেই ইহা প্রদর্শন করা হইয়াছে, যদি কোন স্থলে মুসলমানদের প্রতিপত্তি একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় তাহা হইলে গভর্নমেন্ট তো মুসলমানদিগকে কমিশনার পদে নিয়োজিত করিতে পারিবেন, গভর্নমেন্টের এক-তৃতীয়াংশ কমিশনার নির্বাচনের অধিকার থাকিতেছে। আমরা বলি, মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি অত্যল্প হইলেও তাহাদের অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। হিন্দুগণ মুসমানদিগকে এখন আর শত্রু বলিয়া জ্ঞান করেন না। মুসলমানের উন্নতি হিন্দু মাত্রেরই অভিপ্রেত। তবে এ আপত্তি ও স্বাতন্ত্রীভাব কেন? এখন কি হিন্দু-মুসলমানের অহিনকুল সম্বন্ধ রাখা উচিত? হিন্দুর প্রাণে আঘাত লাগিলে, মুসলমানের ও মুসলমানের ব্যথা জন্মিলে হিন্দুর কি কৌতুক দেখিবার সময় রহিয়াছে?

এ সময়ে হিন্দু-মুসলমানের জাতীয় বিদ্বেষ বিস্মৃত হইয়া, পরস্পরের সুখ-দুঃখে সহানুভূতি দেখাইয়া, কার্য করাই একান্ত বাঞ্ছনীয়। এ জন্যই বলিতেছি, ভাই হিন্দু মুসলমান গলাগলি ধরিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও—অভিমান ও বিদ্বেষ বুদ্ধি দূরে রাখিয়া কার্য করিতে আরম্ভ কর।"[১]

এই পত্রিকায়ই ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্বাচন প্রথা সম্পর্কে প্রকাশিত হয় ঃ "নূতন মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হইতে চলিল। বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেন্ট গভর্নর বাহাদুরের নির্দেশানাসুরে আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট এফ. ওয়েয়ার সাহেব সংবাদপত্র ও শহরের নানা স্থনে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া সাধারণকে সভ্যনির্বাচনের আবেদন করিতে বলিতেছেন। ২৪ অক্টোবর বা তৎপূর্বে মনোনীত সভ্যের নাম ও ঠিকানাসহ ঐ আবেদন করিতে হইবে। ২৫ নভেম্বর সমস্ত ওয়ার্ডের কমিশনার নির্বাচিত হইবেন। ঢাকা নগরীকে ৭টি ওয়ার্ড বিভাজিত করিয়া ১ম ওয়ার্ডে ২, দ্বিতীয় ২, তৃতীয় ২, চতুর্থ ২, পঞ্চম ২, ষষ্ঠে ১, ও সপ্তমে ২ জন কমিশনার নির্বাচন করা হইবে। সর্বসাধারণের অবগত্যর্থ ওয়ার্ড-সমূহের চতুঃসীমা অঙ্কিত করিয়া মিউনিসিপ্যাল নকশা রাখা হইয়াছে। কোন শ্রেণীর লোক নির্বাচনাধিকারী, তাহারও এক লিস্ট উক্ত অফিসে প্রকাশিত হইয়াছে।

এদিকে অধিবাসীদের মধ্যেও সভ্য মনোনীত করিবার উদ্যোগ চেষ্টা দেখা যাইতেছে। কোন ওয়ার্ডের নিমিত্ত কে কে মনোনীত হইয়াছেন কোন শ্রেণীর কি রূপ কার্যদক্ষ লোকের হস্তে মিউনিসিপ্যাল কার্যভার দিয়া করদাতারা নিশ্চিত হইতেছেন, এ পর্যন্ত জানা যায় নাই। আমরা ভরসা করি বিদ্যাবত্তা, কার্যকুশলতা, ইচ্ছা ও তদুপযোগী অবসর প্রভৃতির প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াই সভ্য মনোনীত করা হইতেছে। ঐ সকলের কোন একটি বা দুইটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া সভ্য মনোনীত করিলে পরিণাম মঙ্গলকার হইবে না। বড় বিদ্বান, বড় ধনী, বড় বিচক্ষণ হইলেই হয় না; সঙ্গে সঙ্গে কার্য করিবার ইচ্ছা ও অবসর না থাকিলে কোন

ব্যক্তি দ্বারাই কর্তব্য সুসম্পাদিত হইতে পারে না, ইহা স্মরণ রাখা সর্বদা কর্তব্য। আবেদন করিবার নিয়মিত সময় অতীত প্রায়, কালবিলম্বমাত্র নাই। এখনও যদি কোন ওয়ার্ডের লোক নিদ্রিত থাকেন, তাহাদের সত্বর জাগরিত হইয়া উচিত। অন্যথা পরিণামে অনুতপ্ত হইতে হইবে।

লর্ড রিপন বাহাদুর যখন স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন, তখন দেশীয়গণের মনে এক অতুল আনন্দোচ্ছ্বাস উদগত হইয়াছিল। 'স্বায়ত্তশাসন' নামের মাধুরিমায় লোকের মন বিমোহিত হইয়া গিয়াছিল কিন্তু সেই সাধের স্বায়ত্তশাসন অনেকে রাজপুরুষের বিশেষত বর্তমান স্টেট সেক্রেটারির অননুকূলতায় বিকৃতাঙ্গ হওয়াতে লোকের সেই আশা ভরসার মূলে কুঠারাঘাত হইয়াছে। এখন আর স্বায়ত্তশাসনের নামে কেহ নাচিয়া উঠে না। উহা যদি প্রস্তাবনুরূপ অবিকৃত থাকিয়া যাইত, পরায়ত্ত শাসনের নামান্তররূপে পরিণত না হইত, তাহা হইলে আজ এই মিউনিসিপ্যাল সভ্যনির্বাচনরূপ প্রাথমিক সোপানে পদার্পণ করিতে লোকের কতই না আনন্দোচ্ছ্বাস দৃষ্ট হইত। কিন্তু 'হায়!' অদৃষ্টদোষে সে আহ্লাদে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। সুতরাং নির্বাচনপ্রথা ইষ্টকারী হইলেও লোকে এখন তত ঔৎসুক্যসহকারে তাহা প্রতীক্ষা করিতেছে না। এসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই, পূর্ব আশানুরূপ উন্নতি লাভের সম্ভাবনা না থাকিলেও ভাবী আশার ভিত্তিভূমি বলিয়া কাহারও এবিষয়ে হতৎসাহ হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। হইতে পারে, এই মিটমিটে দীপই কালে বিলক্ষণ জ্যোতিষ্মান হইয়া দেশ আলোকময় করিয়া তুলিবে। অতএব আমরা স্থানীয় অধিবাসীমাত্রকে এই অনুরোধ করিতেছি, যাহাতে উপযুক্ত কমিশনার সকল নির্বাচিত হইয়া ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কার্য সুচারু রূপে চলিতে পারে ভাবী আশা ভরসায় পত্তনভূমি সুগঠিত হইয়া তদুপরি সুখশান্তির রম্য নিকেতন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কেন কোনও ত্রুটি ধরিয়া যাহাতে ভবিষ্যতের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিতে না পারেন, সকলেরই মনে প্রাণে সে চেষ্টা পাওয়া কর্তব্য। ঢাকা জনসাধারণের বোধহয় লীলা সংবরণ করিয়া থাকিবেন। নতুন আমরা এসময়ে সভাকে উদ্বুদ্ধ হইয়া কর্তব্যোপদেশ দিতেই দেখিলাম।

মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন সম্বন্ধে কলিকাতা গেজেটে যে নিয়মাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, পাঠকবর্গের অবগত্যর্থ আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এস্থলে প্রকটন করিলাম ... সফলপূর্ণবয়স্ক পুরুষ নির্বাচনের পূর্বে অন্তত এক বৎসরকাল কোন মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে বাস করিয়াছেন এবং যাঁহারা নির্বাচনের পূর্ববৎসর মোটের উপর অন্যূন ২॥ টাকা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দিয়াছেন, তাঁহারা কমিশনার নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন। একান্নভুক্ত পরিবারের মধ্যে যদি কেহ উক্ত টেক্স প্রদান করেন, সেই পরিবারের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিকারী অথবা লাইসেন্স প্রাপ্ত, কিংবা ওকালতী কি মোক্তারী সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত অথবা অন্যূন ৫০ টাকা বেতনভুক্ত ব্যক্তি উক্ত ১॥ ট্যাক্স না দিলেও ভোট দিতে অধিকারী হইবেন।

জেলার ম্যাজিস্ট্রেট তাহার তালিকা প্রস্তুত করিবেন। নির্বাচনের একমাস পূর্বে সমস্ত ওয়ার্ডের নির্বাচকদের নামের তালিকা মিউনিসিপ্যাল অফিসে এবং যে ব্যক্তি যে ওয়ার্ডের নির্বাচক, তাহাদের নামের তালিকা সেই ওয়ার্ডের প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গাইয়া রাখিবেন। তালিকা প্রচারের অন্তত ১৯ দিন পরে এবং নির্বাচনাধিকার বঞ্চিত ব্যক্তিদিগের দাবি ও নির্বাচনাধিকার বিষয়ক অপর সাধারণের আপত্তি শ্রবণ করিবেন। তাঁহার মীমাংসাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। আপত্তি শুনিবার পর যে তালিকা হইবে, সেই তালিকাভুক্ত ব্যক্তিরাই কেবল ভোট দিতে পারিবেন।

যাঁহার নির্বাচনাধিকার জন্মিবে তিনি কমিশনার রূপে মনোনীত হইতে এবং কাহাকেও কমিশনারীতে বরণও করিতে অধিকারী হইবেন। ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাচনের ৬ সপ্তাহ পূর্বে কমিশনার মনোনীত করিয়া মিউনিসিপ্যাল অফিসে নাম পাঠাইবার এক নোটিশ জারি

করিবেন। নোটিশ জারির পর দুই সপ্তাহর মধ্যে নাম নির্বাচনের ৩ সপ্তাহ পূর্বে মিউনিসিপ্যাল অফিসে ও ওয়ার্ডে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে। ভাবী কমিশনার নিয়োগে কাহারও আপত্তি থাকিলে, ম্যাজিস্ট্রেট বা ভারপ্রাপ্ত কোন কর্মচারী এক সপ্তাহের মধ্যে সে আপত্তি শুনিবেন। আপত্তি মীমাংসার যে সংশোধিত তালিকা প্রস্তুত হইবে, তাহাতে যাঁহাদের নাম থাকিবে কেবল তাঁহারাই কমিশনার হইতে পারিবেন।

ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাচনের স্থান নির্ধারণ করিবেন। নির্বাচনের পূর্বের ঢেডরা দিয়া ও নোটিশ জারি করিয়া সকলকে সংবাদ জানাইতে হইবে। যিনি যে ওয়ার্ডে বাস করেন, তিনি কেবল সেই ওয়ার্ডের কমিশনার নিয়োগে ভোট দিতে পারিবেন। যতটি কমিশনারী খালি, প্রত্যেক ভোটার ততটি ভোট দিতে সমর্থন হইবেন। ভোটারগণকে নির্বাচনস্থলে উপস্থিত থাকিয়া ভোট দিতে হইবে। পত্রযোগে বা অন্য ব্যক্তিদ্বারা ভোট দিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। ম্যাজিস্ট্রেট প্রথমত ভোটারদিগকে তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া কমিশনারগণের নামের তালিকা পাঠ করিবেন এবং কোন ওয়ার্ডে কতজন কমিশনারের প্রয়োজন তাহা বলিবেন। একজন ভোটারকে প্রস্তাব ও অপর একজনকে পোষকতা করিতে হইবে। প্রস্তাবক, পোষন ও ভাবী কমিশনার সকলেই নির্বাচন সভাকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করিতে পারিবেন। যাঁহার সম্বন্ধে প্রস্তাবক ও সমর্থন না জুটিবে, লিস্ট হইতে তাঁহার নাম কাটিয়া দেওয়া হইবে। রেজিস্টরিভুক্ত নির্বাচকদিগের অন্তত দশমাংশ উপস্থিত থাকিলে সভাপতি মহাশয় কমিশনার মনোনীত করিবেন। প্রস্তাব ও সমর্থনে কমিশনার সংখ্যা অধিক হইলে, প্রত্যেক ভোটারকে হস্তোত্তোলন করিয়া প্রত্যেক সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে বলিবেন। যাঁহার অনুকূলে বেশি হাত উঠিবে, তিনি মনোনীত হইবেন। কোন কমিশনার ভগ্ন মনোরথ হইয়া লিখিত ভোট লইতে বলিলে তাহাই করা যাইবে। নির্বাচনস্থলে শতকরা দশজন নির্বাচক উপস্থিত না থাকিলে ম্যাজিস্ট্রেট রিপোর্ট করিবেন, নির্বাচকগণ কমিশনার নিয়োগে বিমুখ হইয়াছেন। একটি পদ পাইবার যতজন প্রার্থী তাহাদের সম্বন্ধে সমান সংখ্যক মত হইলে, সে দিন নির্বাচন বন্ধ থাকিয়া অন্য দিন হইবে। মিউনিসিপ্যালিটির কোন কার্যকারক ব্যক্তি বিশেষকে কমিশনার পদে বরণ করিবার জন্য মত সংগ্রহ করিলে কর্মচ্যুত হইবেন।[১০]

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২৪ নভেম্বর (১৮৮৪ খ্রিঃ)। ১৪ জন কমিশনার পদের প্রার্থী সংখ্যা ছিল ১১৩ জন। কিন্তু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান পারস্পরিক সম্পর্ক বিষাক্ত হয়ে উঠতে থাকে। তা সত্ত্বেও মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম ভারতীয় চেয়ারম্যান হিসাবে আনন্দচন্দ্র রায়ের নাম প্রস্তাব করেন সৈয়দ গোলাম মোস্তাফা। খাজা আবদুল গনির জামাই খাজা আমিরউল্লাহের নাম ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে প্রস্তাব করেন রূপলাল দাস। ২০, এপ্রিল (১৮৮৫ খ্রিঃ) নবনির্বাচিত কমিশনারদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনের আগে ঢাকা শহরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নানাভাবে তিক্ত হয়ে উঠতে থাকে। যা অনেকের কাছেই ছিল অসহনীয়। সে সম্পর্কে জানা যায় ঃ "মিউনিসিপ্যালিটি আর ঢাকাই মুসলমান প্রধান অধিবাসীবৃন্দ মধ্যে বিলক্ষণ তুলাতুলি চলিতেছে। মিউনিসিপ্যালিটির অন্যায় ব্যয় বিধানে ট্যাক্স বৃদ্ধির অনুষ্ঠান দেখিয়া অধিবাসীগণ ক্ষেপিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি মিউনিসিপ্যালিটি হইতে প্রত্যেক বাড়ির জমি ও আয় নিরূপণ জন্য যে কড়াকড়ি বিজ্ঞাপন প্রচার হইয়াছে, তদ্দৃষ্টেই অধিবাসীরা নিতান্ত ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া কর্তব্যাবধারণের জন্য স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইতেছে। শুনিতেছি তাহাদের অনুষ্ঠানে ব্যস্তসমস্ত কমিশনারগণ ম্যাজিস্ট্রেটকে এ বিষয়ে জানালে, ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর নবাব সাহেবকে এ বিষয়ে যাহাতে বেশি গোলযোগ না হয় তজ্জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। নবাব বাহাদুর তাহাদের উপযুক্ত কারণ অবগত হইয়া তাহাদিগকে গভর্নমেন্ট দরখাস্তাদি দ্বারা যাহাতে প্রতিকার পাওয়া যায়, তাহা করিতে উপদেশ

দিয়াছেন এবং নিজেও অর্থাদি দ্বারা বিশেষত সহায়তা করিতে সম্মত ও কার্যনিষ্ঠ হইয়াছেন। নবাব বাহাদুর এই গোলযোগ মিটাইয়া দিতে পারিলে খুব কাজ করিবেন সন্দেহ নাই। আর এই সম্বন্ধে ঢাকা নিবাসী মুসলমানবর্গের সজীবতা দেখিয়া আমরা অতিশয় আশান্বিত হইলাম। নিজের স্বার্থ বুঝিয়া কাজ করিতে পারিলে কখনও কাহারও দুর্ভোগ করিতে হয় না, একথা যাহারা বুঝে তাহাদিগকে শতে শতে ধন্যবাদ দিতেছি। আমরা বর্তমান মিউনিসিপ্যালিটির কার্যের ন্যায্যান্যায্যে কোন মত প্রকাশ করিতেছি না, হইতে পারে যে, শুভোদ্দেশেই মিউনিসিপ্যালিটি পুনঃ টেক্স নিরূপণ করিতেছেন। কিন্তু ভাল হউক, মন্দ হউক সকলেরই বুঝিয়া লওয়ার অধিকার আছে। সেই অধিকার অনুসারে কাজ করিতে যাহারা প্রবৃত্ত, আমরা তাহাদিগের ধন্যবাদ দিতেছি। উপযুক্ত বিচার হইয়া যাহাতে শুভাশুভ নিরূপণ হয়, আমরা তাহাই দেখিতে চাই।[১১]

উনিশ শতকে ঢাকার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা পানীয় জল সরবরাহ ও রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা। দুটিই ছিল ঢাকা শহরের পক্ষে অপরিহার্য। যা এতদিন উপেক্ষিত থেকে গিয়েছিল। পানীয় জল সরবরাহে ঢাকার নবাব পরিবারের অবদান সব থেকে উল্লেখযোগ্য। খাজা আবদুল গনি একা দিয়েছিলেন দু'ক্ষেপে ১ লক্ষ টাকা এবং তারপর খাজা আমানুল্লাহ দিয়েছিলেন ৫০ হাজার টাকা। জলসরবরাহের বিশেষ কমিটির সদস্য ছিলেন খাজা আহসনুল্লাহ্। অবশ্য তাঁরা এই টাকা দিয়েছিলেন শহরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য। খাজা আবদুল গনি জল সরবরাহ ব্যবস্থার ওপরই গুরুত্ব দিতেন। বলা যায়, এই দেড় লক্ষ টাকা পাওয়ার পর ঢাকায় পানীয় জল সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা সম্ভব হয়। অবশ্য সরকার আরও ৪৫ হাজার টাকা দেয় কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য। *[বর্তমান সংস্করণ ৬৪৩ পৃঃ]*

ঢাকায় ওয়াটার ওয়ার্কস নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয় পি. ডবলু. ডি-র ওপর। ওয়ার্কসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭৪ খ্রিঃ ৯ আগস্ট। নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৮৭৮ খ্রিঃ ২৪ মে। জল সরবরাহের পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছিল ২ লক্ষ গ্যালন। শুরুতে অল্প জায়গায় সরবরাহের ব্যবস্থা হয়। দৈনিক সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৩৫ হাজার গ্যালন। রাস্তার ধারে ধারে ২৫টি কল বসান হয়। এই কল থেকে স্থানীয় মানুষ সংগ্রহ করত তাদের প্রয়োজনীয় পানীয় জল। প্রথমে সরবরাহ হত মাত্র ৪ মাইল এলাকায়। কিন্তু ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ম্যালেরিয়া মহামারীর পর পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাপক করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু সরবরাহ ব্যবস্থার গুরুতর কয়েকটি ত্রুটি ধরা পড়ে, যেগুলি সংস্কারে ও অতিরিক্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের। প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্যের পর সে সমস্যার সমাধান। খাজা আহসানুল্লাহ এবং মদনমোহন বসাক কিছু কিছু স্থানে নিজেদের অর্থব্যয়ে জল সরবরাহ ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা একটি কার্যকরী রূপ পায়। *[বর্তমান সংস্করণ ৬৪৩ পৃঃ দেখুন]*

ঢাকায় বিদ্যুৎ বাতি আসে উনিশ শতকের প্রথমে, ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর। তার আগে সব বাড়িতে জ্বলত কেরোসিন আলো আর মোমবাতি। ১৮৭৭ খ্রিঃ ঢাকা শহরকে সুসজ্জিত, সুশোভিত করা হয় মহারানী ভিক্টোরিয়াকে "ভারত সাম্রাজ্ঞী" উপাধি দান উপলক্ষে। উৎসব উপলক্ষে গঠিত কমিটি ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিকে ৬,৪৪৫ টাকা অনুদান দিয়েছিল রাস্তায় আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা কার্যকরী করতে। কমিশনাররা সে সময়ে ১০০ বাতি জ্বালাবার ব্যবস্থা করে। ১৮৮৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাস্তায় লাইট পোস্টের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু এসব আলো জ্বলত কেরোসিনে। জোরে হাওয়া দিলে নিভে যেত আলো। শহর আবার তার অন্ধকার জগতেই ফিরে যেত। ব্যাংকার রূপলাল দাস মিউনিসিপ্যালিটিকে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান ১৮৮৪ খ্রিঃ। এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বহনের অঙ্গীকারও করেছিলেন। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটি রক্ষণাবেক্ষণে

অপারগ হওয়ায়, প্রস্তাবটি সে সময়ে কার্যকর হয়নি।

তারপর ঢাকায় বিদ্যুৎ আলোর ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নবাব আহসানউল্লাহ। পিতা নবাব আবদুল গনির সি এস আই উপাধি প্রাপ্তিতে খুশি হয়ে তিনি সংবাদপত্রে এই প্রতিশ্রুতির কথা ঘোষণাও করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটির ওপর যে শর্ত আরোপ করেন, তা মিউনিসিপ্যালিটি পালন করতে না পারায়, ঢাকায় বিদ্যুতের আগমন ঘটতে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটে। অবশেষে একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয় মিউনিসিপ্যালিটির নিয়ন্ত্রণে। তারাই শহরে বিদ্যুতায়ন ঘটায়। প্রথমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় যে সব অঞ্চলে এবং রাস্তায় তার মধ্যে ছিল রহমতগঞ্জ রোড, চক সার্কুলার রোড, মোঘলটুলি রোড, লালগোলা রোড, বাবুবাজার রোড, কমিটিগঞ্জ রোড, আরমেনিয়া স্ট্রিট (রায়বাহাদুর স্ট্রিট পর্যন্ত), ইসলামপুর রোড, আহসান মঞ্জিল রোড, পটুয়াটুলি রোড, হোসেনঘাট রোড, পটুয়াটুলি লোয়ার রোড, বাংলাবাজার রোড, ডালবাজার রোড, ফরাসগঞ্জ রোড থেকে আয়রন সাসপেনসন ব্রিজ, দিগবাজার রোড, ভিক্টোরিয়া পার্ক, লক্ষ্মীবাজার রোড, সদর ঘাট রোড, শাঁখারিবাজার রোড (ঢাকা কলেজের পশ্চিম দিকে), জনসন রোড, নবাবপুর রোড, রেলওয়ে স্টাফ কোয়ার্টার রোড (রমনা শিক্ষা প্রাঙ্গন পর্যন্ত), জামদানি নগর রোড ও রাজদারী লেন (সাহেব বাজার পর্যন্ত)।

ঢাকার মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের কার্য বিবরণ—১৮৮৮ :

"১৮৮৮ সনের ৫ মার্চ তারিখ হইতে গত তিন বৎসরের মধ্যে ঢাকার মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ যে যে কার্য করিয়াছেন, এ স্থলে তৎসমুদয়ের বিশেষ বিবরণ দেওয়া উদ্দেশ্য নহে। মাত্র তাহারা যে যে অত্যাবশ্যকীয় ও নতুন কার্য করিয়াছেন তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল এবং তদ্বারাই তাঁহারা ঢাকা শহরের করদাতাগণের সম্বন্ধে তাহাদিগের কর্তব্য কতদূর সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন, তাহা প্রকাশ পাইবে।

১. মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ কার্যভার গ্রহণ করিয়াই নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে আরম্ভ করেন। তন্মধ্যে প্রধান অসুবিধা মিউনিসিপ্যালিটির নিতান্ত শোচনীয় আর্থিক অভাব, ৪০০ হাজার টাকা ঋণ। কিন্তু হাউস ও প্রিভিট্যাক্স দরুন মাত্র ৩৩,০০০ হাজার টাকা পাওনা ছিল। এদিকে মিউনিসিপ্যালিটির নিকট যাহারা টাকা পাইবেন, তাহারা আদালতে নালিশ করিতে উদ্যত। পক্ষান্তরে মিউনিসিপ্যালিটি যাহাদের নিকট ট্যাক্স পাইবেন তাহারা উক্ত ট্যাক্স আদায়ের বিরুদ্ধে ১৪৮৭ খানা আপত্তির দরখাস্ত দিলেন। এই বিপদাপন্ন অবস্থায় কমিশনারগণ দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মিউনিসিপ্যালিটির স্বার্থের প্রতি সমুচিত দৃষ্টি রাখিয়া আপত্তির দরখাস্ত সকল যত শীঘ্র সম্ভব নিষ্পত্তি করিতে আরম্ভ করিলে, ইতিমধ্যে যাহারা মিউনিসিপ্যালিটির নিকট টাকা পাইতেন তাহাদের টাকা পরিশোধের জন্য কিছু দিনের অবকাশ লইলেন, এবং কমিশনারগণ কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার ১ মাস কাল মধ্যেই ১৫১৪০ টাকা বাকি আদায়, ১৬৪৮০০ টাকা পরিমাণ দেনা পরিশোধ করিতে সক্ষম হন। বক্রিদেনা ১৮৮৮/৮৯ সনে পরিশোধ করা হয়। এসেসমেন্ট সাব কমিটি প্রথম বৎসর ১৪৮৭ খানা আপত্তির দরখাস্ত নিষ্পত্তি করিয়াছেন।

২. কমিশনারগণ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন যে, মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারিগণের নতুন কোন বন্দোবস্ত করা অতি আবশ্যক। মিউনিসিপ্যালিটির একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিল না এবং কমিশনারগণ মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে একজন ইঞ্জিনিয়ার রাখা স্থির করিলেন এবং সেই পরিমাণ সেক্রেটারির বেতন হ্রাস করিলেন। বিভাগীয় কমিশনারের সহিত অনেক বাদানুবাদের পর ১৮৮৮ সনের ৬ সেপ্টেম্বর এবং ইঞ্জিনিয়ার সম্বন্ধীয় বিষয় কমিশনারগণের সভা উপস্থিত হইলে কমিশনার ২০০ টাকা বেতনে একজন ইঞ্জিনিয়ার সেক্রেটারি ও ১০০ টাকা বেতনে একজন এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি নিযুক্ত

করা স্থির করেন। যথাসময়ে কমিশনারগণ কর্তৃক নিযুক্ত সেক্রেটারি এবং এসিস্টেন্ট সেক্রেটারির পর অত্র বিভাগীয় কমিশনার সাহেব বাহাদুর কর্তৃক অনুমোদিত হয়। নিম্নলিখিত কারণে এসিস্টেন্ট সেক্রেটারির পদ উঠাইয়া দিয়া তাহাকে জলের কল বিভাগে নিযুক্ত করা হয়, তদ্দরুন মিউনিসিপ্যালিটির ব্যয়ের অনেক লাঘব হইয়াছে।

৩. জলের কল শহরের অন্যান্য স্থানে বিস্তারিত করার প্রস্তাব ১৮৮১ সনে প্রথম উত্থাপিত হয় এবং অনেক লেখালেখি ও বিবেচনার পর ১৮৮৫/৮৬ সনে উক্ত কার্যে কত ব্যয় পড়িবেক, তাহার এক এস্টিমেট প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু অর্থাভাবে ঐ কার্যে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। মিউনিসিপ্যালিটির ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া উক্ত টাকা সংগ্রহ করিতে কমিটি যত্নবান হন। প্রথমতঃ কলের নিয়মিত মাসিক ব্যয়াদি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গেল যে কয়লা প্রভৃতি অপরিমিতরূপ ব্যয়িত হইতেছে। রেল অফিসের লোকো ফোরমেন মিঃ ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাহেবের সহিত পরামর্শ ক্রমে জানা গেল যে কলের কোন বিশেষ দোষ না থাকিলে কয়লার এত ব্যয় বাহুল্য হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। ইতিমধ্যে যে নবাব বাহাদুরের সম্পূর্ণ ব্যয়ে জলের কল সংস্থাপিত হয় এবং যাহার প্রসাদে সহরবাসিগণ এই সুখ সম্ভোগ করিতেছেন, তিনিই জলকষ্ট পাইতেছেন, এইটি কমিশনারগণ নিতান্ত অসঙ্গত বোধ করিলেন। তদন্তে জানা গেল যে জলের কলের ইঞ্জিনিয়ার এ বিষয়ে এককালীন উদাসীন এবং নবাব বাহাদুরের অসুবিধা নিবারণ বিষয়ে একবার নিশ্চেষ্ট। মিঃ মেকডলেডকে এই অসুবিধা নিবারণ করিতে বলিলেই তিনি উত্তর করিলেন যে কল আর অধিক জোরে চালান হইলে বিপদের আশঙ্কা অনেক বৃদ্ধি পাইবে। অত্রাবস্থায় কল পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক হইল। বিশেষতঃ ১৮৭৬/৭৭ সনে কলের কার্য আরম্ভ করার পর আর কল পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই এবং তিনি যে সকল মেরামতের কথা উল্লেখ করিলেন, তাহা তৎক্ষণাৎ করা হয়। কয়লার কিছু কম খরচ হইতে লাগিল বটে কিন্তু সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের মতে যে পরিমাণ কম হওয়া উচিত, সে পরিমাণে কম হয় নাই। এই সমস্ত এবং মিঃ মেকডোনেল্ডের কার্যের অন্যান্য দোষ উল্লেখ করিয়া কমিশনারগণের নিকট রিপোর্ট করিলে তাহারা মিঃ মেকডোনাল্ডকে সাসপেণ্ড করিলেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু তারকচন্দ্র ঘোষ অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারিকে তাহার কার্যে নিযুক্ত করিলেন। তারকবাবু জলের কল আরও কিছু মেরামত করেন, এবং কয়লা কম খরচ দরুন মিউনিসিপ্যালিটির ব্যয় বার্ষিক ২১,০০০ টাকা পরিমাণ হ্রাস হয়। মি মেকডোনাল্ডকে কার্য হইতে অবসর দিয়া তারকবাবুকে বার্ষিক ১০ টাকা বৃদ্ধি পাওয়া নিয়মে ১৫০-২০০ বেতনে নিযুক্ত করা হয় এবং তারকবাবুর কার্য সেক্রেটারির পরিদর্শন করার জন্য তাঁহাকে মাসিক ৫০ টাকা বেতন বৃদ্ধি দেওয়া হয়। এইরূপে এবং অন্যান্য পরিবর্তনের দরুন মিউনিসিপ্যালিটির ১০০০ টাকা ব্যয় হ্রাস হয়।

এই প্রকার ব্যয় হ্রাস হওয়ায় গভর্নমেন্ট হইতে টাকা কর্জ করিয়া সহরের অন্যান্য স্থানে জলেব কল সংস্থাপন করার প্রস্তাব কমিশনারগণের নিকট সেই সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং গভর্নমেন্টও দয়া করিয়া বার্ষিক শতকরা ৪৷৷০ টাকা সুদে ৩০ বৎসরের ম্যাদে ১২৫০০০ টাকা মিউনিসিপ্যালিটিকে কর্জ দেন।

অত্র স্থলে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে পাইপের ও পাইপ বসানোর আনুমানিক ব্যয় ৩২১৬৩ টাকা ধরা হয়, তৎস্থলে ২২০০০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। অন্যান্য আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি ও অন্যান্য ব্যয়ের জন্য ১৯৫১৯ টাকা ধার্য হইয়াছিল তাহা ৪৭৬ টাকাতেই সম্পন্ন হইয়াছে। নূতন ইঞ্জিনিয়ার ও বয়লার আনার প্রস্তাব ছিল না। ৩১০০০ হাজার টাকা দ্বারা ঐ ইঞ্জিন ও বয়লার ক্রয় করা হইয়াছে। বাকি যে টাকা থাকিবে, তাহা দ্বারা আরও জলের কলের বিস্তার করা যাইবে। সম্ভবত এই বৎসরেই জলের কল সম্বন্ধীয় সমস্তকার্য সম্পন্ন হইবে। ২০৪৬০ ফিট পরিমাণ রাস্তার জলের কল বৃদ্ধি করা হইয়াছে, শীঘ্রই আর একটি

মাইল রাস্তায় পাইপ বসান হইবে। সেক্রেটারী এবং জলের কলের ইঞ্জিনিয়ারকে জেল ও পাগলা গারদখানায় কত পরিমাণ জল ব্যয় হয় তাহা পরীক্ষা করিতে বলায় পরীক্ষাতে দেখা গিয়াছে (৬০০০ গ্যালন জল) যাহা উক্ত দুই স্থানে দেওয়ার কথা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ জল উক্ত দুই স্থানে ব্যয় হইয়া থাকে। এতদরুন জেল হইতে ১৩২০ টাকার স্থলে ১৯৮ টাকা জলের ট্যাক্স আদায় হইতেছে। এবং পাগলা গারদ খানায় ১৮ টাকা স্থলে ১০০ টাকা করিয়া বিল করা হইয়াছে। কিন্তু এপর্যন্ত কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। জলের ট্যাক্সের দরুন রেলওয়ে হইতে বার্ষিক ৩০০ টাকা পাওয়া যায়। পাইপ বসানোর খরচ এবং মাসিক ৮ টাকা কর দিলে নগরবাসীগণও নিজ নিজ বাটিতে জলের কল নিতে পারিবেন। পূর্বোক্ত কারণাধীন জলকর ২২০০টাকা পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে।

১৮৮৫ সনে কমিশনারগণ লোহার পোল মেরামত করার আবশ্যকতা বোধ করেন, ১৮৮৯ সনের বাজেটে মেরামত খরচ ধরা হইয়াছে। ১৮৯০ সনে মেরামত শেষ হইয়াছে।

নথব্রুক হল, মিটফোর্ড হাসপাতাল জলের কলের দালান সম্পূর্ণরূপে মেরামত করা হইয়াছে।

বাৎসরিক প্রিটি ট্যাক্স ৩৪০০০ টাকা। কিন্তু এতদ্দরুন বাৎসরিক ৪৫০০০ টাকা খরচ হইয়া থাকে। আয় হইতে ব্যয় অধিক দেখিয়া কার্যের অসুবিধা না করিয়া আয় হইতে ব্যয় কমানোর চেষ্টা করা হয়। পূর্বে প্রত্যেক ময়লার গাড়ি একবার ময়লা নিত, এখন প্রত্যেক গাড়ি তিনবার না হইলেও অন্তত দুইবার ময়লা নিবে এই বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। মেথরগণ দ্বারা অধিকক্ষণ কাজ করার আবশ্যকতা হওয়ায় ১৮৯০ সনের জানুয়ারি মাসে এই সম্বন্ধে একটি প্লেন করিয়া মিটিংএ দেওয়া হয়। ময়লা নেওয়ার গাড়ির আয়তন বৃদ্ধি করাতে পূর্বে যে গাড়ি দ্বারা ২০ টাকা পরিমাণ পায়খানা পরিষ্কার হইত এখন সেইখানে ৩০ টাকা হয়। ইতিমধ্যেই একটি ময়লা ফেলিবার জায়গা খোলা হইয়াছে, অপরটিও শীঘ্র খোলা হইবে। গাড়ির বলদ ও মেথর একস্থানে থাকিলে কার্যের সুবিধা হয়, এই জন্যেও চেষ্টা করা হইতেছে। ময়লার গাড়ির বলদ দ্বারা দিনে অন্য কোন কাজ করান না হয় ও ঐ সকল বলদ পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। এই বন্দোবস্তে এই বিভাগে ৭৫০০ টাকা ব্যয় লাঘব হইয়াছে। ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে এই বিভাগে ১৩ জন জমাদার ও তিনজন ওভারসিয়ার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। পূর্ব হইতে পায়খানার সংখ্যা অন্যূন ১০০০ হাজার বৃদ্ধি হইয়াছে। ১১টি মেথরের যাতায়াতের রাস্তা খোলা হইয়াছে এবং কালেক্টর সাহেব কর্তৃক স্থান ক্রীত হইতে আরও রাস্তা খোলা হইবে। স্থান ক্রয়ের ব্যয় তের জুরিতে আমানত করা হইয়াছে। ১৮৮৮/৮৯ সনে ৮৪ জন মেথর ও মেথরানী আনা হয়। বলদ রাখার ঘর সূত্রাপুর হইতে উয়ারীতে নেওয়া হইয়াছে, মেথর গরু ও গাড়ির জন্য ঘর প্রস্তুতের আনুমানিক এষ্টিমেট ধরা হইয়াছে।

৬। ড্রেন সম্বন্ধে কমিশনারগণ বিশেষ মনোযোগ দিতেছেন। ড্রেনের জন্য বার্ষিক ৫০০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। পাথরের সসারড্রেন ১৮৮৯ সনে খোলা হইয়াছে।

সেনেটরি কমিশনার বলিয়াছেন যে স্লুইস গেট দ্বারা এই শহরে ড্রেন করা অতিশয় কঠিন। তিনি পুরাতন গড় খনন করার পরামর্শ দেন। ড্রেন সম্বন্ধে এক সাবকমিটি গঠিত হয়, তাহারা যে রিপোর্ট দিয়াছেন কমিশনারগণ তাহাই মঞ্জুর করিয়াছেন। ১নং ওয়ার্ডের ড্রেন প্রস্তুত করা প্রথমে আরম্ভ করা সুস্থির হয়।...

গভর্নমেন্ট কর্তৃক সে সেনেটারি বোর্ড গঠিত হইয়াছে সেই বোর্ড কি প্রকারে এই শহরের ড্রেনের কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে ও সেই সম্বন্ধে কি উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য, এই জন্য একজন ইঞ্জিনিয়ার এখানে পাঠাইবেন।

১৮৮৮/৮৯ সন হইতে অদ্য পর্যন্ত দুই মাইল পরিমাণ ড্রেন প্রস্তুত হইয়াছে।

৯ ইঞ্চি মাটির সসার ড্রেন	১৬২৯ ফুট
৬ "	৮৩৫ ফুট
৬ ইঞ্চি কনক্রিট ড্রেন	২৪৬২ ফুট
কনক্রিট ডিপ ড্রেন	৪৬০০ ফুট
মোট	১২১৪৫ ফুট

আরও কয়েকটি ড্রেন প্রস্তুত হইতেছে। শাঁখারীবাজারের ড্রেন তৈয়ার করার জন্য স্থান লওয়া হইয়াছে। এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে অনেক বাড়ির জন্য ১ ড্রেন... করার জন্য করদাতাদাগণ হইতে অনেক টাকা আদায় করা হইয়াছে।

৭। রাস্তা : ১৮৮৮/৮৯ সন হইতে রাস্তার কার্য মিউনিসিপ্যালিটি নিজেই সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং তাহাতে ব্যয়ের অনেক লাঘব হইয়াছে। কন্ট্রাক্টরগণ হইতে মাল খরিদ করিয়া কুলি দ্বারা কার্য করান হয়। পূর্বে সমুদায় কার্যই কন্ট্রাক্টরগণ করিতেন। পূর্বলিখিত উপায়ে ৪০০ ফুট রাস্তা মেরামতের ব্যয় নিম্নে দেওয়া গেল। ঝামা ও কঙ্কর দ্বারা মেরামত করিতে পূর্বে ১২ টাকা লাগিত এখন উক্ত স্থলে ৯ আনা শুধু কঙ্কর ৭ আনা লাগিত, সেইস্থলে পাক্কা রাবিসে ৪৷৷০ টাকা সেইস্থলে ২ টাকা মাত্র এখন লাগিয়া থাকে।

৮ আট মাইল কাঁচা রাস্তা ও লেন পাকা করা হইয়াছে যথা—

৬৩ টানেল	৪২১৬৪ ফিট
৩টা রাস্তা	৩৫৮০ ফিট
	৪৫৭৫৪ ফিট

১৮৮৮/৮৯ সন হইতে ১২টি রোড ও লেন প্রস্থে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। আরও ৭টি লেনের পরিসর বৃদ্ধি করার জন্য যে স্থানের আবশ্যক তাহা নেওয়ার ব্যয় কালেক্টর সাহেবের নিকট আমানত করা হইয়াছে। শীঘ্রই আরও তিনটি লেনের পরিসর বদ্ধি করা হইবে।

৮। আলো

৩৫টি আলো বৃদ্ধি করা হইয়াছে। আরও আলো বৃদ্ধির জন্য ১০০০ টাকা বাজেট দেওয়া গিয়াছে। সেই সকল আলো শীঘ্রই দেওয়া হইবে। কানপুর হইতে অত্যন্ত জ্যোতি বিশিষ্ট ৬টি আলো আনা হইয়াছে, ইহাতে আলো অত্যন্ত বেশি হয়, কিন্তু তৈল কম লাগে।

৯। কি পরিমাণ ব্যয় সংক্ষেপ করা গিয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল—

খরচের তালিকা ব্যয় সংক্ষেপে	১৮৮৭/৮৮		১৮৮৮/৮৯
হেড অফিসের	৫৯৯৬	৪৮৯৬	১১০০
কর আদায় বিভাগ	৫০৫৮	৪৫০০	৫৫৮
		১৬৫৮	
সরকারি বাগিচা	৫৫৮	৩৭৩	১৪
শ্মশান ঘাট ও গোরস্থান			২১৬
জলের কল	৫২৬২	৪২৬৮	৯৯৪
জলের কলের ময়লা			২২০০
শহরের ময়লা পরিষ্কার			৭৫০০
			১৩০৮২[১২]

বেঙ্গল টাইমস পত্রিকায় (১১ এপ্রিল ১৯০০ খ্রিঃ) একটি চিঠি প্রকাশিত হয় :

Sir—Last Wednesday, 4th April, our District Magistrate and Collector, Mr. Rankin, was appointed, Chairman of Dacca Municipality. We poor rate

payers appeal to him in the interest of the Municipality. **First**—There is no urgent need for a health officer. were he dismissed each ward commissioner will do the health officer's work of his own ward as did a late commissioner. Mr. Frangopon'o. He was always at work ; **Second**—The present head clerk's pay should either he ruduced or he should be dismissed, and another head-clerk be appointed on smaller pay. By these reductions poor rate-payers will benefit. We have not received any substantial good from our present health officer. We yet eat nut-oil bread, bad ghee in sweetmeats, impure milk, rotten fish, etc. **Third**—We wish to present our urgent business to the chairman without any chupresses's interference. We ask that the Chairman's office door will be open to the public as in the late chairman, K.M. Yousuff's time. We hope our food collection will be accessible to us. We are natives or black men, and fear a white men and for fifteen years, we have not seen any European, Chairman of the Municipality. This is the first step towards abolishing self-government."

এই তারিখেই প্রকাশিত আর একখানি চিঠিতে ছিল : "Sir Mr. Rankin, the district Magistrate of Dacca, has after all, been elected Chairman of our Municipality. This has given entire satisfaction to the Dacca public except some diseffected congress Walah. The elected Commissioners tried their utmost to have one of their colleagues elected, but when they found that some of their own men deserted the camp, they became hopeless of their cause and voted in a body in favour of Mr. Rankin. So much so good. But the Vice-Chairmanship fell to the lot of one Debendra Nath Saha, we defeated Mr. Weatheral, a gentleman, much more competent than Debendra. I am glad to observe that the Chairman has begun work with rightdown earnestness. He is visiting laone and bye-lanes almost every morning, and trying to save the Dacca public from the stenches of dirty drains. The most unsatisfactory sanitary condition of the town will be, it is hoped, much improved during the present *regime*. The people of Dacca will be thankful to Mr. Rankin, if he can arouse the conservancy department out of their drowsiness and make the *methers* a little more amenable to discipline. I have another suggestion much more important to make in connection with public force in her Majestys Service, has been quartered at Faridabad. A sergent attached to the Volunteer corps residing at that place, died of cholera the other days. The sanitary condition of a neighbouring... known as Kaparianagar is respousible for the outbreak of this malady. If the Chairman happen to walk by that street he will observed that no conservancy—cart ever turns up in that quarter. There is no arrangement made for removal of nightsoil or for suplying the people with pure water, it may be, at the expense of the State. If the Municipality look to this matter, the want may be removed. If the Government is desirous of preserving the health of soldiers residing in that quarter, the unsanitary

conditions of all neighbouring place should be seen to at once, or also out break of any epidimic diseases in the neighbourhood may tell seriously upon the health and lives of these soldiers."

১. ঢাকা প্রকাশ, ১১ জুন ১৮৬৩
২. ঢাকা প্রকাশ, ২৫ নভেম্বর ১৮৬৬
৩. ঢাকা প্রকাশ, ২ মে ১৮৬৯
৪. ঢাকা প্রকাশ, ২৪ এপ্রিল, ১৮৭০
৫. ঢাকা প্রকাশ, ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭০
৬. ঢাকা প্রকাশ, ৭ মে, ১৮৮০
৭. ঢাকা প্রকাশ, ৫ ডিসেম্বর, ১৮৮০
৮. ঢাকা প্রকাশ, ৩০ জুলাই, ১৮৮২
৯. ঢাকা প্রকাশ, ৬ এপ্রিল, ১৮৮৪
১০. ঢাকা প্রকাশ, ২৬ অক্টোবর, ১৮৮৪
১১. ঢাকা প্রকাশ, ১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬
১২. ঢাকা প্রকাশ, ১৮৮৮



৭. শিক্ষা ব্যবস্থা

[বর্তমান সংস্করণ ৫৯৬-৬০২ পৃঃ দেখুন]

বৃহত্তর ঢাকা জেলার শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। মুসলমান আগমনের আগে পাঠশালা, চণ্ডীমণ্ডপের মাধ্যমে এবং গুরুগৃহে শিক্ষা দেওয়া হত। বহিরাগত মুসলমানদের আগমনের পর মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রচলন ঘটে। আরবি-ফারসি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। সুলতানি আমলে প্রতিষ্ঠিত হয় মাদ্রাসা। তাছাড়া খানকাহ নির্মাণ করে আধ্যাত্মিক শিক্ষার সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। পাঠান আমলে শিক্ষার প্রসার না ঘটলেও মোঘল আমলে শিক্ষা ব্যবস্থার চরিত্র অনেক বদলে যায়। বাংলা, আরবি আর ফারসির সঙ্গে উর্দুরও প্রচলন ঘটে। বিত্তশালী মুসলমানদের পারিবারিক বিদ্যালয় একসময় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। শিক্ষাক্ষেত্রকে সজীব রাখতে নিষ্কর, ওয়াকফ ও লাখেরাজ সম্পত্তি দান করেছিলেন অনেকে। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমনের পর মুসলমান সমাজে দেখা দেয় অর্থনৈতিক বিপর্যয়। ওয়াকফ ও লাখেরাজ সম্পত্তি হস্তচ্যুত হতে থাকে। ১৭৯৩ খ্রিঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর তা আরও জটিল হয়ে ওঠে। কিন্তু সংস্কৃত টোল ও মুসলমানদের মক্তাব মাধ্যমে শিক্ষার ধারা অব্যাহত থেকে যায়। ১১টি টোল জাতীয় প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩০২ এবং ৯টি মক্তাবে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১১৫। মাওলানা আসাদুল্লাহকে মোঘল সরকার ৬০ টাকা মাসিক বেতন দানের পর নিজের মাদ্রাসায় আরবি, তর্কশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র ও ফিকাহশাস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ১৭৫১ খ্রিঃ তাঁর মৃত্যুর পর আর কাউকে এই পদে নিযুক্ত করা হয়নি।

ইংরেজ আগমনের পর শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তনের সূচনা ঘটলেও, পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে থাকে। মসজিদকেন্দ্রিক মক্তবে সরকারি সাহায্য বন্ধ হয় যায় ১৮৫৪ খ্রিঃ। ফলে ঐতিহ্যবাহী মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে যায়। ঢাকা গেজেটিয়ার (১৯৯৩) থেকে জানা যায় : "ইউরোপীয়দের তত্ত্বাবধানে একজন মিশনারী রেভারেন্ড ও লিওনার্দ ১৮১৭ সনে প্রথম ৭টি স্কুল স্থাপন করেন। এর মধ্যে ৫টিতে বাংলা ভাষার মাধ্যমে, ১টিতে ফারসি ভাষার মাধ্যমে এবং ১টিতে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিত। পাঁচ বছর পর এসব স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩টিতে এবং ছাত্র সংখ্যা হয় ১,৩০০ জন। ১৮২৫ সালে বালিকাদের জন্য পৃথকভাবে কয়েকটি স্কুল চালু হয়। অর্থাভাবের কারণে সে বছর এসব স্কুলের সংখ্যা কমে ১১টিতে দাঁড়ায়। ১৮৪১ সনে ঢাকা কলেজ সংলগ্ন কলেজিয়েট স্কুলটি স্থাপিত হয়। একই সময় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ২টি নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেশ কিছু সংখ্যক মাদ্রাসা এবং টোল খোলা হয়। এরপর প্রতিবছর বেসরকারি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ফলে ১৮৫৬-৫৭ সালে সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী হয় ১,৪৪৯ জন, ১৮৬০-৬১ সনে ২০০৩ জন, ১৮৭০-৭১ সনে ৭,১৫৫ জন, ১৮৮২-৮৩ সনে ১৮,০৮৬ জন, ১৮৯২-৯৩ সনে ৭৮,৮৩৪ জন এবং ১৯০৯-১০ সনে ৮৬,৫৮৬ জনে দাঁড়ায়।" [১]

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল এবং ঢাকা কলেজ :

ঢাকায় প্রথম স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন ব্যাপটিস্ট মিশনারি ওয়েন লিওনার্দ। লিওনার্দ

শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। প্রথমে ছিলেন সেনাবাহিনীতে। সে সময়ে শ্রীরামপুর মিশন বেশ কয়েকটি বেনিভোলেন্ট ইনস্টিটিউশন স্থাপন করেন। লিওনার্দ সেরকম একটি ইনস্টিটিউশন গঠনের উদ্দেশ্যে ঢাকায় আসেন ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে। ঢাকায় ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি খ্রিস্টান ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ঢাকায় প্রথাগত বিদ্যাশিক্ষার সূচনা ঘটে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। লিওনার্দ আরো পাঁচটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময়ে লিওনার্দকে সাহায্যের জন্য শ্রীরামপুর মিশন থেকে এসেছিল খ্রিস্ট ধর্মান্তরিত রামপ্রসাদ। লিওনার্দ ঢাকায় ছিলেন ১৮৪৮ খ্রিঃ পর্যন্ত।

অবিভক্ত বাংলার প্রথম সরকারি বিদ্যালয় ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের যাত্রা শুরু হয় ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুলাই। ঢাকাবাসীরা চাঁদা তুলে দিয়েছিল পাঁচ হাজার টাকা। এর মধ্যে একা রামলোচন ঘোষ দিয়েছিলেন এক হাজার টাকা। প্রথমে বিদ্যালয়ের নাম ছিল ইংলিশ সেমিনারি স্কুল। বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন মিঃ ব্রিজ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষক ছিলেন প্যারীচরণ সরকার এবং মিঃ গান। প্রথম পর্বে বিদ্যালয়ের কয়েকজন কৃতী ছাত্র হলেন ব্রজসুন্দর মিত্র, নবাব আবদুল গনি, আবদুল আলি (মৌলভি বাজারের প্রতিষ্ঠাতা) এবং আরমানি জমিদার হার্নি ও পোগজ। এঁদের প্রত্যেকের নাম লেখা আছে ঢাকা জেলার ইতিহাসের পাতায়। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন রায়বাহাদুর রতনমণি গুপ্ত, বাবু ভুবনমোহন সেন, বাবু কৈলাশচন্দ্র ঘোষ, খানবাহাদুর আসার্দ্দু আহমেদ, খানবাহাদুর বদিউর রহমান, ওসমান গনি, ডঃ এ. এ. মাহমুদ, এস. এন. সদরুদ্দিন প্রমুখ। বিদ্যালয়ে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন মিঃ সিনক্লেয়ার। সূচনা থেকেই বিদ্যালয় সরকার পরিচালিত।

বিদ্যালয়ের একটি কলেজ শাখার উদ্বোধন হয় ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে। হান্টারের বিবরণে আছে: "...In 1841 the school was raised to the position of a College and the foundation laid of the present building, which was completed in 1846. The College is affiliated to the Calcutta University, and is open to all who have passed the University Entrance Examination. In 1867 the College staff consisted of the Principal, two Professors, an Assistant Professor and a Law Lecturer. The students pay a fee of ten shillings a month. An English school is also attached to the College. Conducted in 1867, by a Head Master, Assisted by eight Sub-Masters, a *Pandit* for teaching Sanskrit, and a Munshi for Urdu and Persian. The schooling fees vary from three shillings to six shillings per month. The other principal educational institutions in the town are the Pogose School, established by a wealthy Armenian gentleman, the Brahma School, the Boy's School, and the Bangala Bazar School, at all of which English is taught. There are also two Government normal Schools, one for training male, and the other for female teachers...

"...Of course there are a large number of Private schools but those who do not receive, and have no expectation of receiving Government aid seldom take the trouble to make returns to the Inspectors, or to give them any assistance. It is impossible, therefore, to give any trustworthy statistics as to even the approximate total number of schools, Government, aided, and Private. There are also numerous Sanskrit *tols*, or Sanskrit schools, where logic, rhetoric, grammar and astronomy are taught. These are principally situated in Bikrampur, which, as regards Sanskrit learning, ranks second only

to Nadiya in all Bengal. English education is making great progress among the Hindu population, who regard it as a *sinequa non* for obtaining any of the higher-paid Government appointments. The Vernacular scholarships have also afforded a strong stimulus to vernacular education, and the Collector reports that a school of this class exists in almost every village of the District. Femal education, however does not make much progress. Parents do not object to their daughters being instructed, so long as they do not have to pay anything ; but they remove the girls from school at an early age. A few years ago a native institution called the Antaspur Stri Siksha Sabha was established for the purpose of advancing female education." ২

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের প্রাক্তন কৃতী ছাত্রদের অন্যতম হলেন অধ্যাপক রমেশ মজুমদার, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত, কবি বুদ্ধদেব বসু, অধ্যাপক কবির চৌধুরী, চিত্রপরিচালক খান আতাউর-রহমান, এয়ার ভাইস-মার্শাল এ. জি. মাহমুদ প্রমুখ।

পূর্ব বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে ঢাকা ইংলিশ সেমিনারির ভূমিকা ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের দোতলায় শুরু হয় কলেজ এবং একতলায় স্কুল। প্রথমে নাম ছিল ঢাকা সেন্ট্রাল কলেজ। প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন কেম্ব্রিজের জে. আয়ারল্যান্ড। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে কলেজে য়ুরোপীয় ও এদেশীয় শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ১৪ জন। কলেজে সিনিয়র ও জুনিয়র দুটি ভাগ ছিল। সিনিয়র বিভাগের পাঠ্যসূচীতে ছিল য়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও সাহিত্য। জুনিয়র বিভাগে পড়ান হত ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস ও ভূগোল। কলেজের নতুন ভবন নির্মাণের জন্য জমি কেনা হয় মিঃ শেফার্ডের কাছ থেকে। ১৮৪১ খ্রিঃ ২০ জুন কলেজ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কলকাতার বিশপ। কলেজ ভবনের নকশা নির্মাণ করেন কর্নেল গ্যার্সটিন। পুরনো ঢাকায় ভবন নির্মাণ শেষ হয় ১৮৪৪ খ্রিঃ। ভবনটিতে ছিল কলেজিয়েট স্কুল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে। সেই বছরই কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। সম্ভবত এই সময়ই ঢাকা কলেজ এবং ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের নামকরণ হয়। কলেজে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু হয় ১৮৫৭-৫৮ খ্রিস্টাব্দে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনক্রমে এখানে রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, অর্থনীতি ও স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা চালু হয়। শিক্ষার উন্নততর ব্যবস্থার কারণে এই মহাবিদ্যালয় ছিল কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের মর্যাদা সম্পন্ন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে কলেজে বিজ্ঞান বিভাগ নতুন পর্বের সূচনা করে। ঢাকা কলেজের প্রথম হিন্দু গ্রাজুয়েট ছাত্র রোহিনীকুমার বসাক এবং প্রথম মুসলমান গ্র্যাজুয়েট সিরাজুল ইসলাম। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন প্যারীমোহন বিশ্বাস (দ্বিতীয় শ্রেণী) এবং হরিচৈতন্য ঘোষ (তৃতীয় শ্রেণী)। এরা ছিলেন অঙ্কের ছাত্র। ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে। মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে নাজিরুদ্দিন আহমদ ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণী পান (১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে)।

কলেজের অগ্রগতি ছিল অব্যাহত। ১৮৪১ খ্রিঃ জজ কাছারির কাছে যে বাড়িতে মহাবিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়েছিল পরে সেই বাড়িতে হয় স্টেট ব্যাঙ্ক। রমনা মাঠের কাছেই ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মহাবিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মিত হয়েছে (১৯৯৮ খ্রিঃ)। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর, কলেজে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পড়াশুনো বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকা কলেজ পরিণত হয় একটি মাধ্যমিক কলেজে। এর আগে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা কলেজ উঠে এসেছিল কার্জন হল ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি ভবনে। পুরনো ভবনে

কেবলমাত্র স্কুলেই বসত। কলেজের বিজ্ঞান বিভাগকে দেওয়া হয়েছিল বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রি ভবন। কলেজের ছাত্রদের জন্য নবনির্মিত ছাত্রাবাসটির নাম ছিল ঢাকা হল। উচ্চমাধ্যমিক কলেজে পরিণত হওয়ার পর, কলেজকে স্থানান্তরিত করা হয় পুরনো হাইকোর্ট ভবনে। এই ভবনটি অবশ্য নির্মিত হয়েছিল ছোটলাটের বসবাসের জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন (১৯৪৮ খ্রিঃ) লাভের পর আবার ডিগ্রি কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে এখানে মানবিক বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৪ হাজার এবং অধ্যাপক আছেন ১০০ জনেরও বেশি।

ঢাকার ইতিহাসকার মুনতাসীর মামুন লিখেছেন ঃ "ঢাকা কলেজ শুধু ঢাকারই নয়, পূর্ববঙ্গে উচ্চশিক্ষা, বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ঢাকা কলেজ 'এলিট' কলেজ। ডঃ শরিফউদ্দিন মন্তব্য করেছেন, শহরের সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে যে নতুন দিক উন্মোচন হয়েছিল, সেক্ষেত্রে এ অঞ্চলে পালন করেছিল কলেজটি প্রধান ভূমিকা। উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে, বিশ শতকের প্রথম দিকে অখণ্ড বাংলায় যাঁরা প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের একটি বড় অংশ ছিলেন এ কলেজের ছাত্র। ঢাকা কলেজকে অত্যন্ত গর্বের বিষয় হিসেবে দেখতেন ঢাকাবাসী।..." (ঢাকা প্রথম : পৃঃ ২৬)

"এ পর্যন্ত এ প্রদেশের যে যৎকিঞ্চিৎ উন্নতি লাভ হইয়াছে, তাহার আদি কারণই ঢাকা কলেজ। এবং যদি ভবিষ্যতে ইহার আর কিছু উন্নতি লাভ হয়, তাহার আদি কারণ স্থলেও ঢাকা কলেজই নির্দেশিত হইবে। পোগস স্কুল ও ব্রাঞ্চ স্কুল প্রভৃতির দ্বারাও এদেশের অল্প উন্নতি হইতেছে না। কিন্তু তাহার মূল ঢাকা কলেজের দ্বারাই দৃঢ়কৃত হইতেছে। আমরা স্পষ্টাবিধানে নির্দেশ দিতে পারি, এক ঢাকা কলেজের অভাব রহিলে আজি অন্যান্য স্কুল দ্বারা এ প্রদেশের কদাচ এতদূর উন্নতি দর্শন ঘটিয়া উঠিত না।[৩]

পূর্ববাংলার শিক্ষাচিত্রকে স্বাস্থ্যকর করে তোলার অন্তরালে ঢাকা কলেজের অবদান ইতিহাস স্বীকৃত। কিন্তু এই কলেজকেও নানান বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। কলেজ বিভাগ বন্ধ করে, হাই স্কুলে পরিণত করার প্রচেষ্টাকে ঢাকাবাসী সহজে মেনে নিতে পারেনি।

"এতদিনে শিক্ষা বিভাগে কীট লাগিয়াছে। দেশীয়গণ স্বীয় স্বীয় পন্থা নিজেরাই দেখিতে চেষ্টা করুন। শিক্ষা বিষয়ে এখন তার গভর্নমেন্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবেন না। যদি থাকেন নিরাশ হইত হইবে। ক্রমশঃ যেরূপ ভাবগতি দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় না, এদেশীয়দিগকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করা গভর্নমেন্টের আন্তরিক উদ্দেশ্য। আমাদের নিশ্চয় বোধহয়, কেবল নির্বোধ বাঙালীদিগের মনস্তোষণ এবং ২/৪/৫ টাকার কেরানি পাওয়ার জন্য শিক্ষা বিষয়ে বাহিরে বাহিরে একটুকু অনুরাগ দেখান হয়। যদি এদেশীয়দিগকে শিক্ষিত করার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিত, কখন এরূপ কার্যের অনুষ্ঠান হইত না। সম্প্রতি প্রস্তাব হইতেছে ঢাকা কলেজটি হাইস্কুল করা হইবে। ঐ দিন উঠাইলেন ইংল্যাণ্ডের ছাত্রবৃত্তি, আজ উঠাইলেন ঢাকা কলেজ, কাল উঠাইবেন প্রেসিডেন্সী কলেজ, পরশু উঠাইবেন একেবারে শিক্ষাবিভাগ। তাহা হইলে যন্ত্রণার অবসান হয় এবং গভর্নমেন্টেরও অনেক টাকা বাঁচিয়া যায়। লর্ড মেও না ব্যয় সংক্ষেপেকৃত সংকল্প হইয়াছেন? ঢাকা কলেজকে কেন হাই স্কুল করা হইবে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা কর্তব্য। যেদিন হইতে ইহা কলেজ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, সেই অবধি ইহার কার্য ও ফল বিষয়ে কোন ত্রুটি হইতেছে না। বৎসর বৎসর আর্ট, বিএ. এমএ প্রভৃতি পরীক্ষায় অতি উৎকৃষ্ট ফল দৃষ্ট হইতেছে। ঢাকা কলেজের ছাত্রগণ কোনবার কৃতকার্যতা লাভে অসমর্থ হইয়াছেন? বাস্তবিক শিক্ষা বিষয়ে ঢাকা কলেজ যে অন্যান্য কলেজের তুলনায় নিকৃষ্ট ইহা কোন মতেই স্বীকার কার যায় না। আর ঢাকা কলেজে ছাত্র সংখ্যাও কম নয়। যাহা হউক এ সকল বোধ হয় প্রকৃত কারণ নয়। আমাদের অনুভব হয় ঢাকা কলেজ ব্যয় সংক্ষেপের

জালে পড়িয়া গেল। যদি ইহা সত্য হয়। তবে বড় অবিবেচনার কাজ হইতেছে। এরূপ কথা শুনিলে কাহার না হাসির উদয় হইবে।...

ঢাকা কলেজকে হাইস্কুল করিলে কত অনিষ্ট হইবে, তাহা কি গভর্নমেন্ট হিসাব করেন? পূর্ববাংলার কতগুলি লোক ঢাকা কলেজ দ্বারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছেন, তাহা ভাবিলে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইবে। যদি ঢাকায় কলেজ না থাকিত তবে কখনো পূর্ব বাংলায় এতগুলি লোক বিএ এমএ পাশ করিতে পারিতেন না। যখন ইহাতে বি এ এমএ পরীক্ষার পাঠ্য সকল পড়ান হইত না তখন এ অঞ্চলের কয়েকজন লোক বিএ এমএ পাশ করিয়াছিলেন? গৃহে শিক্ষিত হইয়া ঐ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। প্রায় কাহারো দ্বারাই ইহা সুসম্পন্ন হয় না। অথবা এমন অনেক ছাত্র আছেন তাঁহারা কলিকাতা বা অন্য কোন স্থানে যাইয়া শিক্ষালাভ করিতে নিতান্ত অসমর্থ সুতরাং ঢাকা কলেজ পূর্ব বাংলার লোকের একটি শিক্ষালাভের পরম সুযোগ স্থল। প্রত্যুত ঢাকা কলেজ হাই স্কুল হইলে এ অঞ্চলীয় লোককে সম্পূর্ণরূপে উচ্চ শিক্ষায় বঞ্চিত হইতে হইবে। এখন এ প্রদেশীয় লোককে যদি মূর্খ করিয়া রাখা গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য হয় তবে ঢাকা কলেজ হাই স্কুল করা হউক। কিন্তু পূর্ব বাংলার লোকদিগকে উচ্চশিক্ষা প্রদানের বাসনা থাকিলে ঢাকা কলেজের প্রতি হস্তক্ষেপ করা বিহিত নয়। [৪]

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পূর্ববাংলা ভ্রমণকালে ঢাকা যান। 'সংবাদ প্রভাকরে' তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়েছিল। সেই বিবরণে ঢাকা কলেজ সম্পর্কে বহু তথ্য রয়েছে। তিনি লিখেছিলেন ঃ

কলেজের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ও শ্রেণী :

কলেজ তিন অংশে বিভক্ত আছে। যথা— কলেজ ডিপার্টমেন্ট, সিনিয়ার ডিপার্টমেন্ট ও জুনিয়ার ডিপার্টমেন্ট। কলেজ ডিপার্টমেন্টে প্রথমতঃ দুই শ্রেণী ছিল, পরে ১৮৪৯ সালে চারি শ্রেণী হইয়াছে। সিনিয়ার ডিপার্টমেন্টেও প্রথমতঃ দুই শ্রেণী ছিল, ১৮৫১ সালে তিন শ্রেণী হইয়াছে এবং জুনিয়ার ডিপার্টমেন্টে চারি শ্রেণী আছে। প্রত্যেক শ্রেণী দুই দুই ভাগে বিভক্ত। এবং চতুর্থ শ্রেণী, মধ্যে মধ্যে ছাত্র অধিক হইলে তিন চারি অংশেও অংশীকৃত হইতে থাকে।

ছাত্রের বেতন :

প্রথমত স্কুল স্থাপন হইলে ছাত্রদিগের বেতন লাগিত না, পরে ১৮৩৭ সালাবধি অত্যল্প বেতন দিতে হইত। তদন্তর কালেজ স্থাপিত হইলে পর প্রথমতঃ জুনিয়ার ডিপার্টমেন্টে অর্দ্ধ মুদ্রা, এবং সিনিয়ার ও কালেজ ডিপার্টমেন্টে এক মুদ্রা বেতন দিতে হইত। তৎপর ।।০ অর্দ্ধ মুদ্রার স্থলে এক মুদ্রা এবং এক মুদ্রার স্থলে দেড় তঙ্কা হইয়াছিল। কয়েক বৎসর হইল, জুনিয়ার ডিপার্টমেন্টে পূর্ব্বমত এক মুদ্রা, কিন্তু সিনিয়ার ও কালেজ ডিপার্টমেন্টে দুই তঙ্কা বেতন দিতে হয়। ছাত্রবৃত্তি ভোগিদিগের বেতন লাগে না।

এখানে ৮ আটটি ত্রিংশৎ তঙ্কা করিয়া সিনিয়ার অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর ছাত্র বৃত্তি আছে ও ৮ আটটি করিয়া ১২টি জুনিয়ার অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র বৃত্তি আছে, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তিভোগিরা দুই বৎসর ক্রমাগত ছাত্র বৃত্তি রক্ষা করিতে শক্ত হইলে চত্বারিংশৎ মুদ্রা পাইয়া থাকেন। গত পরীক্ষায় যাঁহারা ছাত্রবৃত্তিভোগি হইয়াছেন তাঁহাদের নাম।

নাম	কোন শ্রেণী হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন	ছাত্রবৃত্তির বিবরণ	মুদ্রার সংখ্যা	বিশেষ বৃত্তান্ত
শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	কলেজ ডিপার্টমেন্ট	প্রথম শ্রেণী	৪০	
মেং সি, এষ্টিফেন	ঐ	ঐ	৪০	
মেং টি কালনাবু	ঐ	দ্বিতীয় শ্রেণী	৪০	

নাম	কোন শ্রেণী হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন	ছাত্রবৃত্তির বিবরণ		মুদ্রার সংখ্যা	বিশেষ বৃত্তান্ত
উমাকান্ত ঘোষ	ঐ	ঐ		৪০	
ঈশ্বরচন্দ্র বসু	ঐ	ঐ		৪০	
দীনবন্ধু মল্লিক	ঐ	তৃতীয় শ্রেণী		৩০	
গিরিজাশঙ্কর দাস	ঐ	চতুর্থ শ্রেণী		৮	
কালীপ্রসন্ন রায়	ঐ	ঐ		৮	
রাধাগোবিন্দ মৈত্র	সিনিয়র ডিপার্টমেন্ট	প্রথম	দ্বিতীয় শ্রেণী	৮	
রাজচন্দ্র সান্যাল	ঐ	ঐ	ঐ	৮	বহরমপুর
কালীনাথ বিশ্বাস	ঐ	ঐ	ঐ	৮	কলেজে গিয়াছেন
মদনমোহ গুপ্ত	ঐ	ঐ	ঐ	৮	
রাজকুমার রায়	ঐ	ঐ	ঐ	৮	বহরমপুব কলেজে গিয়াছেন
ঈশানচন্দ্র নাগ	ঐ	ঐ	ঐ	৮	
আনন্দমোহন মজুমদার	ঐ	ঐ	ঐ	৮	
শরচ্চন্দ্র সেন	ঐ	ঐ	ঐ	৮	কলেজ পরিত্যাগ করিয়াছেন
ব্রজমোহন রায়	ঐ	ঐ	ঐ	৮	
মেং এম, জে. ষ্টিফেন	ঐ	ঐ	ঐ	৮	

প্রাপ্ত হয়েন নাই।

পুরস্কার :

অত্রত্য কতিপয় সম্ভ্রান্ত সজ্জনেরা দানশীলতা, গুণগ্রাহকতা ও বিদ্যানুরাগ প্রকাশ পুরঃসর প্রত্যেক বার্ষিক পরীক্ষান্তর সকলেই যথাসাধ্য মতে পুরস্কার বিতরণে পরাঙ্মুখ হয়েন না, এ নিমিত্ত মুক্তকণ্ঠে ঐ সকল বিদ্যোৎসাহি মহাত্মাদিগ্যে ধন্যবাদ প্রদান করি। যাঁহারা স্বীয় স্বীয় বদান্যতা প্রকাশপূর্বক এ কালেজে প্রতিবর্ষে সহস্রাধিক মুদ্রার নানাবিধ পুরস্কার বিতরণ করিয়া থাকেন, এবং প্রতি বৎসর যাঁহারা নিয়মিত সংখ্যা প্রদান করেন, তাঁহারদিগের নাম ও মুদ্রার সংখ্যা নিচে লিখিত হইল। যথা,

দাতার নাম	মুদ্রার সংখ্যা	বিশেষ বৃত্তান্ত
শ্রীযুক্ত এন, পি, পোগাস	১০০ (স্বর্ণমুদ্রা)	ইনি কলেজের ছাত্র ছিলেন।
" হেনরি এথার্টন	১০০	পূর্বে এখানকার আফকারি কমিস্যানর ছিলেন।
" জে, পি, ওয়াইস	৫০	
" খাজে আলী মূল্যা	৫০	
" চার্লস এলেন	২৫	
" জে, ষ্টিফেন	৫০	
" কে, ষ্টিফেন	১০০	ইনি পূর্বে কলেজের ছাত্র ছিলেন।
" বাবু রামলোচন ঘোষ	৪০	এইক্ষণে জিলা কৃষ্ণনগরের প্রধান সদর আমিন।

দাতার নাম	মুদ্রার সংখ্যা	বিশেষ বৃত্তান্ত
শ্রীযুক্ত বাবু রাজমোহন রায়	৪০	
" বাবু মিত্রজিৎ সিংহ	৪০	
ডনেলি মেডাল নামক রৌপ্যমুদ্রা	৫০	ডনেলি সাহেব পূর্বে এখানকার আফগারি কমিশনর ছিলেন এবং এখানে তাঁহার পরলোক হইলে পর তাঁহার অধীন কর্মচারিরা তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করণার্থে এই পুরস্কার দেওয়ার জন্য মুদ্রা দিয়াছেন।

এতদ্ব্যতিরিক্ত এই জিলা সিবিল সংক্রান্ত সাহেবেরাও কেহ কেহ শ্রীযুক্ত ও বাবু সনাতন বশাখ ও শ্রীযুক্ত বাবু রাইমোহন রায় ও অন্যান্য কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে পুরস্কার দিয়া থাকেন।

পুরস্কার বিতরণ :

পূর্বে পূর্বে লোকেল কমিটির মেম্বর ও অধ্যক্ষ দ্বারাই এই মহৎ কার্য নির্বাহ হইত। পরে ১৮৪৯ সাল হইতে ক্রমিক দুই বৎসর মান্যবর মৃত মহাত্মা বেথুন সাহেব আসিয়া পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহার পরলোক গমনের পরে এক বৎসর কৌন্সেলের সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত মোয়েট সাহেব আসিয়াছিলেন, পরে এক বৎসর শ্রীযুক্ত ডাক্তার গ্রান্ট যিনি পূর্বে কৌন্সেলের মেম্বর ছিলেন এবং গত সন এখানকার সুপরিটেণ্ডেন্ট সারজন সাহেব তৎপরিবর্তে এই কর্ম নির্বাহ করিয়াছিলেন। এই বৎসর কি হয় বলা যায় না। কৌন্সেলের কেহ আসিয়া পুরস্কার দিলে যে ছাত্র ও লোকদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি হয় তাহার সন্দেহ কি?

পুস্তকালয় :

এইক্ষণে কালেজে সর্ব শুদ্ধ ১৯৫৩ এক সহস্র নয়শত ত্রিপঞ্চাশৎ গ্রন্থ।

কালেজ বাটি :

পূর্বে ভাড়াটিয়া এক বাটি ছিল, পরে ৩৬৬৬৯ টাকা ১১ আনা ৩ পাই মুদ্রা ব্যয় দ্বারা এক বাটি নির্মিত হইয়াছে, তত্রাচ পারিতোষিক বণ্টন কিম্বা বার্ষিক পরীক্ষার জন্য একটি বৃহৎ ঘর নাই, পুরস্কার বিতরণ কালে কালেজ বাটির উত্তর পার্শ্বস্থ প্রাঙ্গণ মধ্যে এই কর্ম নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ১৮৪৬ সালের ১ মে অবধি এই বাটিতে কলেজ হয়।

পরিশেষ :

উপরোক্ত বৃত্তান্ত সমস্ত হইতে ইহা দেদীপ্যমান প্রতীত হইবেক যে, ঢাকা জিলার চতুষ্পার্শ্বস্থ সকল লোকেই বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য অতিশয় ব্যগ্র। এমত বিদ্যালয়ের যথার্থ যে উপকার তাহা তাঁহারাই সুন্দরমত অবগত আছেন তাহার সন্দেহ নাই, ইহা যে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার, বিদ্যা শিক্ষা ও অন্তকরণ প্রশুদ্ধ করার স্থল, তাহা তাঁহারা বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত হইয়াছেন। ঢাকা, ফরিদপুর, ত্রিপুরা, ভুলুয়া, বাকরগঞ্জ, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জিলার লোকদিগের সন্তানদের বিদ্যাশিক্ষার প্রধান স্থলই ঢাকা কালেজ। উপরোক্ত সকল স্থানেই এক একটি গভর্নমেন্ট বিদ্যালয় আছে বটে, কিন্তু সে সকলই এই কালেজের অধীন, এবং তথা হইতে এই ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইলে ঐ ছাত্রবর্গ এই কালেজে আসিয়া পাঠ করিয়া থাকেন। এই কালেজের শ্রীবৃদ্ধি শ্রীযুক্ত লুয়িচ সাহেবের দ্বারা সংপূর্ণরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। এবং আমরা সর্বজ্ঞ সর্বব্যাপি সর্বশক্তিমান পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিকট অহরহ এই প্রার্থনা করি, যে, তিনি ত্বরায় ইংলণ্ড হইতে [illegible] প্রত্যাগমন পুরসর স্বীয় কর্ম পূর্বমত নির্বাহ করত বঙ্গ দেশের পূর্বাঞ্চলের লোক স[illegible] সুখ স[illegible]দ্ধি করেন।

দ্বিতীয় পত্র :

মহামান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর ও সাধুরঞ্জন সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

অত্র কতিপয় দিবস অবস্থিতি করত সদালাপ ও সৌজন্য দ্বারা মহাশয় অস্মদাদিকে যাদৃশ বাধিত করিয়াছেন তাহা আমরা কখনই বিস্মৃত হইতে পারিব না। মহাশয় সুধারাম গমন কালীন অত্রত্য মহাবিদ্যালয়ে আদিমাবস্থা হইতে বর্তমান কালীয় সমস্ত বিবরণ আমারদিগকে সংগ্রহ পুরসর প্রেরণ করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন, তদনুসারে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ মৈত্র মহাশয় কথিত বিষয় প্রস্তুত করত অদ্য প্রেরণ করিলেন, এ বিধায় উক্ত সমস্ত বৃত্তান্ত পুনর্বার আমরা প্ররচন করিলাম না, নিবেদন ইতি। পৌষ মাসীয় চতুর্বিংশ দৈবসিক লিপী।

ঢাকা কলেজ। নিঃ পত্র। শ্রীহরকিশোর বসোঃ
শ্রীচন্দ্রকুমার গুহ রায়স্য।
শ্রীকালীনাথ মিত্রস্য

উল্লিখিত ছাত্রগণের নিকট অতিশয় বাধিত হইলাম।

প্রভাকর সম্পাদক *(সংবাদ প্রভাকর, ২৪-২৫-২৬ মাঘ ১২৬১)*

ঢাকা কলেজে বারবার দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। ১৮৭২ খ্রিঃ পরিস্থিতি বেশ জটিল হয়ে ওঠে। সে সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ থেকে জানা যায় ঃ

এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। ঢাকা কলেজ নাকি উঠিয়া যাইতেছে। মস্তকে বজ্রঘাত হয় সে ভাল। তথাপি এরূপ নিদারুণ কথা যেন ফলে পরিণাম না হয়। না হইবেই বা কেন? কেম্বল সাহেবই হর্তা কর্তা ও বিধাতা তখন এ বস্তুত অঘটন ঘটনা সংগঠন তত আশ্চর্যের বিষয় নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বঙ্গবাসীরা একেবারে অজ্ঞানান্ধকারে মগ্ন হইবে। রাজভক্তি পরায়ণ বঙ্গবাসীরা এমন কি অপরাধই করিয়াছে যে তাহাদিগকে উচ্চ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে? অথবা তাহাদের অপরাধ মধ্যে এই যে, তাহারা কেন বিদ্যা বুদ্ধিতে ইংরেজ ভায়াদের সমকক্ষ হইল? কেম্বল সাহেবের চক্ষে বুঝি বাঙালির উন্নতি সহ্য হইল না। তাহার মনের এক এরূপ গূঢ় অভিসন্ধি যে বনবাসীগণ চিরকাল মূর্খ থাকিয়া হলকর্ষণ অথবা "খেইতা আমিনী করতঃ" কষ্টে সৃষ্টে উদর পূরণ করুক আর ইংরেজ কর্মচারীরা নিজ নিজ স্বার্থ সাধনে রত থাকিয়া বিপুল লাভবান হউন। কি পক্ষপাত। বাঙালি জাতি নিরীহ বলিয়াই কি কেম্বল সাহেব তাহদের সুখ সূর্য অপহরণ করিবেন? লোকে কথায় বলে, "জোর যার ভাত তার". আমাদের ন্যায়পরায়ণ কেম্বল সাহেবের শাসন প্রণালীও ঠিক তদ্রূপ। তিনি মুখে জানান বাঙালি জাতির হিত সাধনই তাহার মুখ্যোদ্দেশ্য কিন্তু তিল তিল এমন চিকন বুদ্ধি প্রয়োগ করেন যে, থাকুক হিতঅহিতই সমুৎপন্ন হইতেছে।

সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রভাবে যে কেম্বল সাহেব স্বজাতি স্বার্থ সাধনে সায় প্রদান করিতেছেন আমরা তাহাতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত নই কিন্তু আমাদিগকে যে উচ্চ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিতেছেন। ইহাই একান্ত দুঃখের বিষয়। ঢাকা কলেজকে হাই স্কুল করিলে পূর্ববঙ্গবাসীগণের সর্বনাশ হইবে ইহা কি কেম্বল সাহেবের চক্ষের তৃপ্তি দায়ক এবং সুসভ্য ইংরাজ শাসনের কীর্তি পতাকা? কেম্বল সাহেব যদি ব্যয় লাঘব জন্য একান্তই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন, তবে বরং স্কুল ডিপার্টমেন্ট উঠাইয়া কলেজ বিভাগ রাখা একান্তই কর্তব্য। নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার নিমিত্ত ঢাকায় অনেক স্কুল আছে। এখন পূর্ব বঙ্গবাসী ধনী ও জমিদারবর্গ সমীপে প্রার্থনা, তাঁহারা আমাদের পক্ষ বল হইয়া যাহাতে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত না হয় তৎসাধনে সচেষ্ট হউন। কল্পনা মাত্রেই যখন সকল প্রকার কার্য ও নিয়ম সাধিত হইতেছে, তখন এই বিষবৃক্ষ যে ফলবান না হইবে তাহারই বা সম্ভাবনা কি? অতএব ঢাকাস্থ জাতি সাধারণ সভা সমীপে ও আমাদের প্রার্থনা সে সভা অতি সত্বর এই অসদভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে গবর্নমেন্টে আবেদন প্রেরণ করুন।[৫]

সংস্কৃত অধ্যাপক নিয়োগ নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয় ১৮৭৯ খ্রিঃ। পরিস্থিতি বেশ সঙ্গীন হয়ে ওঠে। সমকালীন সংবাদপত্রে সেই পরিস্থিতির চিত্রটি ধরা আছে ঃ

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, ঢাকা কলেজের সুযোগ্য সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সোমনাথ মুখোপাধ্যায় শারীরিক পীড়ানিবন্ধন তিন মাসের বিদায় লইতেছেন। তাঁহার কার্যে প্রতিনিধি নিয়োজিত হইবার নিমিত্ত নর্মাল স্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলেজিয়েট স্কুলের প্রথম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্তী এবং রূপ-রঘুলাল স্কুলের অতিরিক্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী হইয়াছেন। শুনা যায় কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত পোপ সাহেব উক্ত কার্যে সংস্কৃত কলেজ হইতে একজন এম. এ. উপাধিধারীকে পাঠাইবার জন্য ডাইরেক্টর সাহেবের নিকট লিখিয়াছেন। যদি তাহা না পাঠান হয়, তবে তিনি এখান হইতেই উক্ত কার্যের বন্দোবস্ত করিবেন।

কলেজে সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপন শুদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ লোক দ্বারা নির্বাহিত হওয়া সুকঠিন। কারণ সচরাচরই কলেজের ছাত্রদিগকে সংস্কৃত হইতে ইংরাজিতে ও ইংরাজি হইতে সংস্কৃতে অনুবাদন শিক্ষা দিতে হয়। অপিচ ছাত্রগণ সংস্কৃত অপেক্ষা ইংরাজিতেই বিশেষ বুৎপন্ন, সুতরাং তাহাদিগকে অপর কোন ভাষা বুঝাইতে হইলে, অনেকাংশে ইংরাজিতেই বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ পরীক্ষা সময়ে এরূপও অনেক প্রশ্ন হইয়া থাকে, যাহার উত্তর ইংরাজিতেই লিখিয়া দিতে হয়। সুতরাং উক্ত অধ্যাপকতায় সংস্কৃত ও ইংরাজি এই উভয়বিধ ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিরই বিশেষ প্রয়োজন। যদি সংস্কৃত কলেজ হইতে কোন উপযুক্ত লোক উক্ত পদে মনোনীত হন, তবে উল্লিখিত অধ্যাপনায় কোনও ত্রুটির আশঙ্কা থাকে না। এইজন্য সাধারণের ইচ্ছা যে সংস্কৃত কলেজের কোন সুযোগ্য ব্যক্তিকেই আনয়ন করা অনাবশ্যক বিবেচনায় অত্রত্য প্রার্থীগণ মধ্যেই কোন একজনকে নিয়োগ করা কর্তব্য বোধ করেন, তবে তৎ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। ন্যায়ানুগত কার্য সকলেরই প্রার্থনীয় ; এই কার্য ও পক্ষপাতমূলক প্রিয়ভেদ বা পরিচিতা পরিচিতজ্ঞান পরিত্যাগপূর্বক ন্যায়ানুসারে যাহার প্রাপ্য তাহাকেই মনোনীত করা হয়, এই আমাদের প্রার্থনা।

এখানে যে তিন জন প্রার্থী আছেন, তন্মধ্যে ঔচিত্য ও যোগ্যতা অনুসারে মনোনীত করিতে হইলে, নর্মাল স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই ন্যায়তঃ এই কার্যের অধিকারী। ইনি বহুকালযাবৎ অত্রত্য উচ্চশ্রেণীর নর্মাল স্কুলে অধিকতর বেতনে প্রশংসার সহিত কার্য করিয়া আসিতেছেন। বিশেষতঃ তিনি তত্ত্বাবৎকাল রঘু, ভর্ডি প্রভৃতি সংস্কৃতের প্রধান প্রধান সাহিত্য গ্রন্থের আলোচনা ও অধ্যাপনা করিতেছেন বলিয়া, তাঁহার উচ্চদরের সাহিত্যাধ্যাপনা চলের মধ্যে রহিয়াছে। শাস্ত্রীয়জ্ঞান অধ্যাপনা সাপেক্ষ। অধ্যয়ন জ্ঞানলাভের সোপান মাত্র ; অধ্যাপনা তাহাকে চরম সীমায় উন্নয়ন করে। সুতরাং দুর্গাচরণ বাবু বহুদিন উচ্চশ্রেণীর সংস্কৃতের অধ্যাপনা করাতে যে উক্ত বিষয়ে অধিকতর ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কোনও সংশয় নাই। অপিচ প্রাগুক্ত ব্যক্তিত্রয়ের মধ্যে ইনিই অধিক বেতনভোগী এবং প্রধান পদারূঢ়। নর্মাল স্কুলের প্রধান পণ্ডিত, কোনও এন্ট্রেন্স স্কুলের প্রধান পণ্ডিত হইতে যে পদ মর্যাদার শ্রেষ্ঠ, একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং প্রার্থীগণ মধ্যে সর্বাংশেই যে ইনি উক্তপদে নিযোজ্য, তদ্বিষয়ে কেহই দ্বিরুক্তি করিতে পারেন না। পরন্তু গবর্নমেন্ট কর্মচারীদিগকে গ্রেডভুক্ত করার সময় দুর্গাচরণ বাবুর প্রতি কর্তৃপক্ষ সম্যক প্রকার অবিচার করিয়াছেন। শিক্ষা সংক্রান্ত যে সকল কর্মচারীকে গ্রেডেট করা হইয়াছে, আমাদের বিবেচনায় তাহাদের মধ্যে দুর্গাচরণ বাবুও গণনীয় ছিলেন, কিন্তু যে কারণেই হউক কর্তৃপক্ষ উক্ত বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া কেবল তাঁহার উপর অবিচার করিয়াছেন এমন নহে, তাঁহাদের নিজের উপরও একটি কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছেন। সে কলঙ্ক অপনয়ন করা কর্তৃপক্ষের অবশ্য কর্তব্য। সম্প্রতি তাহার অবসরও উপস্থিত হইয়াছে, ভরসা করি এই সুত্রে

কর্তৃপক্ষ দুর্গাচরণ বাবুর কথঞ্চিৎ মনস্তুষ্টিবিধান করিয়া নিজের ত্রুটি খ্যালনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে না।

যদিচ আমরা অন্যতর প্রার্থী চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কেও এই কার্যে উপযুক্ত মনে করি, কিন্তু তাহার এমন কোনও পদমর্যাদা নাই, যদ্বারা তিনি একবারেই এতাদৃশ সম্মানকর ও উচ্চবেতনের কার্যপ্রাপ্ত হইতে পারেন। অতএব আমরা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি, যদি অত্রত্য কোন ব্যক্তিকেই এই কার্যে নিয়োগ করা হয়, তবে দুর্গাচরণ বাবুকেই উক্ত কার্যে নিযুক্ত করুন। আমরা নিশ্চয় জানি যে দুর্গাচরণ বাবু উক্ত কার্যে নিয়োজিত হইলে চন্দ্রকান্ত বাবুরও মনঃক্ষোভ জন্মিবার কারণ নাই।[৬]

শিক্ষা বিভাগের কর্তাদের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে সংবাদপত্রে লেখা হয়ঃ "প্রেসিডেন্সি কলেজের গৌরব বৃদ্ধির জন্য এতকাল শিক্ষা বিভাগেয় উর্ধতন কর্মচারীরা ঢাকা কলেজকে দাবাইয়া রাখিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। ঢাকার ছাত্রদিগের স্বাভাবিক গুণে যখনই ঢাকা কলেজের ফল ভাল হয়, তখনই ইহার প্রফেসারের উপরে টান পড়ে। প্রেসিডেন্সি কলেজের কর্তৃপক্ষ ঢাকার যে প্রফেসারকে যখন ভাল মনে করেন, তখনই তাঁহাকে ঢাকা হইতে সরান হয়, আর যত নূতন শিক্ষানবীসকে ঢাকা কলেজের ঘাড়ে দেওয়া হয়। এই ব্যাপার সুদীর্ঘকাল দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম, ঢাকা কলেজটিকে বিনাশ করাই শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য, কিন্তু ৪ বৎসর পূর্বে যখন এই কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রায় ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি নূতন গৃহ নির্মিত হইল তখন ভাবিলাম, শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের যাহাই কেন অভিপ্রায় হউক না, ঢাকা কলেজকে নষ্ট করা গবর্নমেন্টের অভিপ্রায় নহে। যদ্যপি বিজ্ঞান শিক্ষার গৃহ নির্মাণে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াও বিজ্ঞান শিখাইবার যোগ্য ক্ষমতাশালী কোন প্রফেসারকে ঢাকা কলেজে দেওয়া হয় না ; উপযুক্ত অধ্যাপকের অভাববশতঃ কোন ছাত্র বিজ্ঞানে বি. এ., এম. এ., পরীক্ষার জন্য উৎসাহী হয় না ; যদ্যপি উপযুক্ত অধ্যাপকের অভাবে এম. এ ক্লাসটিই একেবারে মাটি হইয়াছে ; ভালরূপ শিক্ষা পায় না বলিয়া সমর্থ ছাত্রগণ প্রেসিডেন্সি কলেজে যাইতেছে, আর নির্ধন অধিকাংশ ছাত্র মনোদুঃখে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া কোনরূপে জীবন কাটাইতেছে, তথাপি আমরা ঢাকা কলেজের প্রতি গবর্নমেন্টের অভিপ্রায় মন্দ মনে করি নাই।

কিন্তু সম্প্রতি গত সপ্তাহে একটা কথাতে ঢাকা শহর তোলপাড় হইয়াছিল। কমিশনর মিঃ সেভেজ বাহাদুর এই কলেজটিকে বর্তমান কলেজ গৃহ হইতে ঢাকা শহরের পূর্ব দক্ষিণ সীমান্তে কলঘর নামে প্রসিদ্ধ সৈন্যাবাসে স্থানান্তর করিবার পরামর্শ করিতেছিলেন। তিনি যে একটি সাধু উদ্দেশ্যে এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, একমাস পূর্বে আমরা তাহা পাঠককে জানাইয়াছি। ঢাকায় একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন কমিশনার সেভেজ বাহাদুরের একান্ত অভিপ্রেত। এবং ঐ কলেজ ও গবর্নমেন্টের অন্য সমস্ত স্কুল কলেজ এক স্থানে এক প্রিন্সিপালের তত্ত্বাবধানে রাখা কর্তব্য ; কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছাত্রগণের কার্য শিক্ষার জন্য যে সকল কল কারখানা করিতে হইবে, তাহা বর্তমান কলেজের নিকটবর্তী স্থানে করিতে হইলে লোকের বিরক্তিজনক হইতে পারে ; এই ভাবিয়া তিনি উহা সুবিস্তৃত কলঘরে প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করেন। নিজের এই ইচ্ছা স্থানীয় সাধারণের মনোনীত কিনা, এ বিষয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি রাজপুরুষদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হয়েন নাই ; শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন কোন কোন ভদ্রলোককেও তিনি এ বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। বলাবাহুল্য যে, রায় বাহাদুরের ন্যায় বিবেচক ব্যক্তিদিগকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করাতেই আশঙ্কা দূর হইয়াছে। তাঁহাদের কথায় সুযোগ্য কমিশনর সাহেব নিজেই বুঝিয়াছেন, এই কলেজটিকে স্থানান্তর করিলে ছাত্র ও শিক্ষকদিগের অত্যন্ত অসুবিধা হইবে। সেরূপ অসুবিধাবশতঃ সরকারি স্কুল কলেজের অধিকাংশ ছাত্র বেসরকারি স্কুল কলেজসমূহে যাইবে। সুতরাং তদ্বারা সরকারি স্কুল কলেজের অত্যন্ত অনিষ্ট হইবে।

আহ্লাদের বিষয়, ঐ সমস্ত চিন্তা করিয়া কমিশনর বাহাদুর ঢাকা কলেজ ও স্কুলসমূহ স্থানান্তর করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছেন। কমিশনর প্রভৃতি রাজ-পুরুষদিগের এক একটি কথার ক্ষমতা এত বেশি যে, সেই একটি কথা হইতে শত শত লোকের সর্বনাশ হইতে পারে। ... ঢাকা প্রকাশ সম্পাদন করিবার পরেই যেমন এই কথাটি প্রকাশ পাইল, তখনি চারিদিকে উহা ছড়াইয়া পড়িল। শিক্ষানুরাগী সমস্ত লোক সরকারি স্কুল কলেজের বিলোপ সম্ভাবনা মনে করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। কমিশনর বাহাদুরকে এই কার্যের অনিষ্টকারিতা বুঝাইবার নিমিত্ত তাঁহার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাঁহাকে বুঝাইবার জন্য এত চেষ্টা, অল্প সময় মধ্যে তিনি নিজের গরজেই তাহা বুঝিয়া লইয়াছিলেন, সুতরাং তাহার নিকটে যে ভদ্রলোকগণ সমবেত হইয়া ডেপুটিশনরূপে যাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাহা আর যাইতে হইল না।

এই কার্যের জন্য গবর্নমেন্টের সুযোগ্য উকিল বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ দিতেছি। আর যাঁহার পরামর্শে কমিশনর বাহাদুর অত সহজে ঐ প্রস্তাবের অনিষ্টকারিতা বুঝিয়াছেন, সেই রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরকেও ধন্যবাদ দিতেছি। বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র কমিশনর স্যাভেজ সাহেব বাহাদুর নিজে। তিনি যে সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াই ঐ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ; একবার সকল দিক চিন্তা করিয়া কাজ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। অনেকেই এক দিকে ভাল করিতে বসিয়া অন্যদিকে মন্দ করেন। যাহারা শুধু নিজের বুদ্ধিতে কাজ করেন তাঁহাদের দ্বারাই অধিক স্থলে মন্দ হয়। স্থানীয় অভিজ্ঞলোকের পরামর্শ গ্রহণ না করিলে অনেক কাজেই হিতে বিপরীত হয়। অনেক ইংরাজ রাজপুরুষ, দেশীয়ের পরামর্শ লওয়া অপমান মনে করেন। ধন্য স্যাভেজ বাহাদুর। তিনি যে স্বজাতিকে ঐরূপ কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিবার জন্য এরূপ গুরুতর কার্যে দেশীয় ভদ্রলোকের মত গ্রহণ করিতেছেন, ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয়। আশা করি, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিগণ দ্বারা এদেশের অনেক উপকার হইবে। এই স্থানেই কমিশনর বাহাদুরকে নিবেদন করি, তাহার সাধু সঙ্কল্প ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি যাহাতে তাঁহার চিরস্মরণীয় কীর্তি হয়, তাহার চেষ্টা অবশ্যই তিনি করিবেন। বর্তমান সময়ে ঢাকা কলেজের পশ্চিমেই যে সুবিস্তৃত স্থান রহিয়াছে, ইহাতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রতিষ্ঠা করুন। এক কলঘরের নিকটে যত স্থান কলেজিয়েট স্কুল হইতে জগন্নাথ স্কুল পর্যন্ত স্থান তদপেক্ষা বেশি অল্প নহে। বর্তমান অবস্থায় এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বাড়ি নির্মাণেও বেশি ব্যয় পড়িবে না, কাহারও অসুবিধারও সম্ভাবনা নাই। অতএব এই স্থানেই কলেজ করিয়া তাঁহার সঙ্কল্প রক্ষা দ্বারা নিকটে চিরস্মরণীয় হউন [৭]

একশ বছরের মধ্যে দেশের সামগ্রিক শিক্ষাচিত্র আমূল বদলে যায়। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন স্কুল, এবতেদায়ী মাদ্রাসা, সেটেলাইট স্কুল, নিম্ন মাধ্যমিক, উচ্চবিদ্যালয়, নর্মাল ও ট্রেনিং স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় (২) নিয়ে জেলার সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন যুগের সূচনা ঘটেছে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি শিক্ষার অগ্রগতি ছিল লক্ষ্যণীয়। স্কুল বাড়ছিল। সেই সঙ্গে সন্তানদের শিক্ষিত করার মানসিকতা অভিভাবকদের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। সরকারি উদ্যোগের তুলনায়, বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে অনেক বিদ্যালয়। ঢাকা সহ পূর্ববাংলার সর্বত্র নারী শিক্ষা প্রসার ঘটতে থাকে। সরকারি ও বেসরকারি রিপোর্টের ভিত্তিতে 'ঢাকা প্রকাশের' প্রতিবেদন ছিল ঃ "১৮৬১-৬২ সালের শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ডিরেক্টর সাহেবের রিপোর্টে অবগতি হইল, বঙ্গদেশে ৯৬৫টি বিদ্যালয় সংস্থাপিত আছে, ৫৭,২০০ জন ছাত্র তাহাতে অধ্যয়ন করিতেছে। পূর্ব বৎসর অপেক্ষা ৬৪৬৬টা ছাত্র বাড়িয়াছে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের নিমিত্তে ১১,০১,৪৬৬ টাকা ব্যয় পড়িয়াছে। ২,২০,৬৮৮ টাকা ছাত্রগণের বেতন ও সাধারণের দান প্রভৃতি দ্বারা উৎপন্ন হয়। অবশিষ্ট ৮,৮০,৭৮৮ টাকা

রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, পূর্বাপেক্ষা এদেশের বিদ্যাশিক্ষার সবিশেষ উন্নতি সাধন হইয়াছে। গভর্ণমেন্ট প্রজাগণের শিক্ষাদানে বিলক্ষণ মনোযোগী হইয়াছেন। ইহা সামান্য আহ্লাদের বিষয় নয় যে, ইতঃপূর্বে যমালয়স্বরূপ গুরুমহাশয়দিগের কতিপয় পাঠশালা ব্যতীত একটা মাত্র উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় ছিল না। ...এ নিমিত্তে আমরা অতি কৃতজ্ঞচিত্তে আমাদিগের করুণাময় বৃটিশ গবর্নমেন্টকে শতসহস্রবার ধন্যবাদ প্রদান করি। কিন্তু আবার যখন আমরা এদেশের লোকসংখ্যা এবং আয় চিন্তা করিয়া দেখি, তখন অন্তঃকরণ নিতান্ত পরিতাপিত হইয়া উঠে। তখন বোধহয়, এদেশে বিদ্যাশিক্ষার অদ্য পর্যন্ত কিছুমাত্র উন্নতি লাভ হয় নাই। গবর্নমেন্ট অদ্যপি প্রজাগণের শিক্ষাদান বিষয়ে যথোচিত মনোযোগ করেন নাই। পাঠকবর্গও বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে দেশের লোকসংখ্যা ৪ কোটি সেদেশে কেবল কিঞ্চিদধিক ৫৫ সহস্র লোক শিক্ষা পাইতেছে। এবং অন্যূন ১৪,১৩,২৩৫০০ টাকা যে দেশের বার্ষিক আয়, তত্রত্য গবর্নমেন্ট বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত সম্পূর্ণ ৯ লক্ষ টাকাও ব্যয় করিতেছেন না। ইহা কি সামান্য ক্ষোভের বিষয়?...

ইডেন সাহেব অন্য এক স্থলে বলেন, এক্ষণে নর্মাল স্কুলে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহার শিক্ষিতগণের তদুপযুক্ত কর্মের নিতান্ত অসম্ভব দৃষ্ট হয়। অতএব তাঁর অভিপ্রায় এই যে নর্মাল স্কুলের শিক্ষার খর্বতা করা হউক, নতুবা ইংরাজি শিক্ষার রীতি প্রবর্তিত করিয়া শিক্ষিতদিগকে ইংরাজি স্কুলের শিক্ষকের উপযুক্ত করা যাউক। তিনি আরো বলেন, 'গত বর্ষের পরীক্ষার নম্বর দ্বারা দেখা যায়, সাধারণত হুগলি নর্মাল স্কুলের ১ম শ্রেণী কলকাতা নর্মাল স্কুলের ২য় শ্রেণী এবং ঢাকা নর্মাল স্কুলের ৩য় শ্রেণী উত্তম। এতদ্বারা বোধহয় জেলার বঙ্গবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ হুগলি ও চব্বিশ পরগণার ছাত্রগণ হইতে উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হইয়া নর্মাল স্কুলে প্রবেশ করে।...

...মার্টিন সাহেবের রিপোর্টে দৃষ্ট হয়, পূর্ব দক্ষিণ বিভাগে ২৫৯টা বিদ্যালয় আছে। তাহার ছাত্রসংখ্যা ১৩,৪৮৯ জন। পূর্বাপেক্ষা ঢাকা কলেজের ছাত্রসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। মার্টিন সাহেব বলেন আমি যে কয়েকটি জেলা স্কুল দেখিয়াছি তন্মধ্যে বরিশালের স্কুল সর্বোৎকৃষ্ট পোগস স্কুলকে গবর্নমেন্টের উৎকৃষ্ট জেলা স্কুলের তুল্যকক্ষ বিবেচনা করা যাইতে পারে। এবারে পোগস স্কুলের যতো অধিকসংখ্যক ছাত্র ১ম শ্রেণী পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন কলেজিয়েট স্কুল কলিকাতার নিকটবর্তী কতিপয় স্কুল এবং ময়মনসিংহ ও বরিশাল স্কুল ব্যতীত আর কোন স্কুলের ৯ম শ্রেণীর পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা তত দৃষ্ট হয় না। অথচ এই পোগস স্কুলের ছাত্রগণের নিমিত্ত গবর্নমেন্টের মাসিক কেবল ৯৪ ব্যয় পড়ে। পূর্বে একজন সাহেব বহুদিন পর্যন্ত পোগস স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার আমলে আমরা একজন ছাত্রকেও প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে দেখি নাই। তিনি স্থানান্তরিত হইলে প্রথমতঃ আমাদিগের বর্তমান ডেপুটি ইনস্পেকটর শ্রীযুক্ত বাবু কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়, তৎপরি ঢাকা কলেজের সুশিক্ষিত শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সেন তৎস্থানাভিষিক্ত হন। ইহাদিগের পরিশ্রম ও শিক্ষা নৈপুণ্যেই পোগস স্কুলের এইরূপ উৎকৃষ্ট অবস্থা লাভ হইয়াছে। ... আশ্চর্যের বিষয় এই কর্তৃপক্ষ একজন সাহেব শিক্ষককে যত বেতন দেন, তাহার তুল্য পদস্থ একজন বাঙালি শিক্ষককে প্রায়শঃ তাহা প্রদান করেন না। কুমিল্লা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ২০০ টাকা বেতন পাইতেছেন, কিন্তু এ বিভাগের সর্বোৎকৃষ্ট বরিশাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ১৫০ টাকার অধিক পান না। আবার আজি যদি একজন হতভাগ্য বাঙালি কুমিল্লা স্কুসের শিক্ষক হন তবে অমনি ৫০টা টাকা সরকারে জব্দ করিয়া তাঁহার ১৫০ টাকা বেতন নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইবে। ইহা কি সামান্য ক্ষোভের বিষয়?...

ঢাকা বিভাগে এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষা বিলক্ষণ বদ্ধমূল হইয়াছে। অদ্য পর্যন্ত এখানে অনেক বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। বিবাহিত স্ত্রীগণের শিক্ষার্থও এ স্থলে একটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষাদাত্রীর অভাব না হইলে এখানে আরো অধিক বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইত।'

রিপোর্টের আর এক স্থলে লিখিত হইয়াছে, 'ছাত্রগণ' পুরাবৃত্ত উত্তম রূপে জানে। কিন্তু আধুনিক বৃত্তান্ত কিছুই বলিতে পারে না। এই—নিমিত্ত আমি (মার্টিন সাহেব) আমার সমুদয় সার্কেল বিদ্যালয়ে ৬ মাস পর্যন্ত একই খণ্ড ঢাকা প্রকাশ প্রদান করিয়াছি। সম্প্রতি এই নিয়ম করিয়াছি, এক্ষণ অবধি ঐ সকল বিদ্যালয়কে নিজ মাশুলের ব্যয় দিতে হইবে। এতদ্বারা দেখা যাইবে, ছাত্রগণ সংবাদপত্র পাঠ করিতে কতদূর পর্যন্ত সমুৎসুক হইয়াছে।...

কাশীবাবুর রিপোর্টেরও কিয়দংশ গৃহীত হইল।

'গত বৎসর ঢাকা বিভাগে ৭টা ইংরাজি বঙ্গ বিদ্যালয় ছিল এ বৎসর ১টা হইয়াছে। ইহাতে গবর্নমেন্টের মাসিক দাতব্য ২৬২ টাকা। এতদ্বারা ৯৮০ জন বালক (গত বৎসর ৮০৭ জন ছিল) শিক্ষা পাইতেছে। প্রত্যেক বালকের নিমিত্তে গবর্নমেন্টের মাসিক ৩ পাই ব্যয় হইয়া থাকে।

'বঙ্গ বিদ্যালয়'—গতবৎসর ১১টা বঙ্গ বিদ্যালয় ছিল। এ বৎসর ১৫টা হইয়াছে। গবর্নমেন্টের মাসিক দাতব্য ১৭৮ টাকা। ইহাতে ৭৯৫ জন ছাত্র (গত বৎসর ৫৭২ জন ছিল) গড়ে ৬ পাই ব্যয়ে শিক্ষা পাইতেছে। অনেক বঙ্গ বিদ্যালয়ে ইংরাজি শিক্ষা হইতেছে। এবং কোন কোন সার্কেল বিদ্যালয়তে ও স্থানীয় লোকেরা স্বতন্ত্র শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া ছাত্রদিগকে ইংরাজি শিক্ষা দিতেছেন।'

'সার্কেল স্কুল—এক্ষণে ১৭টা সার্কেল এবং ৪৯ টা পাঠশালা আছে। তাহার ছাত্র সংখ্যা ২২৩০ জন। প্রত্যেক ছাত্রের নিমিত্ত গবর্নমেন্টের মাসিক ৮১০ পাই ব্যয় হইয়া থাকে, গত পরীক্ষার তৃতীয় স্থলই সার্কেল একজন বালকপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

'বালিকা বিদ্যালয়।—যে পর্যন্ত আমাদিগের দেশের অবলাগণ সুশিক্ষিত না হইবে, যে পর্যন্ত আমাদিগের অন্তঃপুরে বিদ্যালোক প্রবেশ না করিবে, সে পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় লোকের অবস্থা প্রকৃত উন্নত হইয়া উঠিয়াছে, এরূপ কখনই বলা যাইতে পারিবে না। সৌভাগ্যের বিষয় এই এক্ষণে স্থানে স্থানেই বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে।

ঢাকা নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক এরাটুন সাহেবের রিপোর্টেরও কিয়দংশ গ্রহণ করিলাম।

'গত বৎসর এই নর্মাল স্কুলে হইতে ৯৯ জন শিক্ষক প্রেরিত হইয়াছেন। ডিরেক্টর সাহেব ইহার কার্য দর্শন করিয়া নিতান্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। এ বৎসর অন্যান্য নর্মাল স্কুল হইতে বাংলা ভাষার পরীক্ষায় ঢাকা নর্মাল স্কুল উৎকৃষ্ট নম্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। কলিকাতা ও হুগলির বালকগণ পূর্বদেশীয় বালকগণ অপেক্ষা বাংলা ভাষায় অধিকতর পটু বলিয়া আমাদিগের যে সংস্কার ছিল, এতদ্বারা তাহার সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে।[৮]

লর্ড মেয়োর শিক্ষা বিষয়ক সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। নানাস্থানে সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হতে থাকে। শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি করার বিরুদ্ধে জনরোষ প্রবল হয়ে ওঠে। ঢাকার একটি জনসভায় ডাক্তার রামপ্রসাদ সেন বলেছিলেন ঃ "আমাদের বড় কর্তা লর্ড মেয়ো বর্তমান উচ্চতর ইংরাজি শিক্ষার ব্যয়ের ভার আমাদের দেশীয় লোকের স্কন্ধে দিয়া ঐ ব্যয়ে সাধারণকে বাংলা শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার মনের ভাব কি, তাহা অদ্যকার সভায় বলিতে ইচ্ছা করি না, আপনারা সকলেই মনে মনে এক প্রকার বুঝিতে পারিয়াছেন। যদি তিনি ইহা ভাবিয়া থাকেন যে ইংরাজি ভাষার বিজ্ঞানসাহিত্য শিল্প ও রাজকীয় ব্যবস্থা সকল কেবল বাংলায় শিক্ষা প্রদান করিয়া আমাদের দেশীয়দিগকে উন্নত করিবেন, তবে একথা আমি সাহস সহকারে বলিতেছি লর্ড মেয়ো নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়া এইরূপ রাজনীতি অবলম্বন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল বাংলা ভাষায় ইংরাজি ভাষার বিজ্ঞান শিল্পাদি শিক্ষা দিলে বর্তমান উচ্চ ইংরাজি শিক্ষাদ্বারা আমাদের দেশীয়েরা মনের যে রূপ তেজস্বিতা লাভ করিয়া আপন আপন গৌরব ও স্বত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন ; বাংলা শিক্ষা হইতে কোন প্রকারেই মনের সেইরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না। এই উপলক্ষে আমরা একটি গল্পের কথা মনে পড়িল। আমি একবার কোন নর্মাল বিদ্যালয় দেখিতে গিয়াছিলাম। ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক

ছাত্রদিগকে ভূগোল শিক্ষার সময় পৃথিবীর গোলকারের বিষয় শিক্ষা দিতেছিলেন। একটি ছাত্র পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণ বুঝিতে না পারিয়া বড়ই বিরক্ত হইতেছেন। অন্য একটি ছাত্র তাহার পশ্চাৎ হইতে বলিতেছে ভাই মুখে বল না যে পৃথিবী গোল, তিন বৎসরকাল এইরূপ গোলই বলিবে। "পরে, যে চেপ্টা সে চেপ্টাই থাকিবে" আমাদের গবর্নমেন্টের কেবল বাংলা শিক্ষার রাজনীতির ফল কিছু কাল পর উক্ত ছাত্রের পৃথিবীর গোল বুঝার ন্যায় হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা উদ্ধত ভাবে গবর্নমেন্টের কোন দোষকীর্তন করিতে এখানে উপস্থিত হই নাই।—কেবল গবর্নমেন্ট ভ্রমবশতঃ বর্তমান শিক্ষা সম্বন্ধে যে রাজনীতি অবলম্বন করিতেছে তাহাতে আমাদের বহু প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকাতে আমাদের মনের দুঃখের কথাগুলি শান্তভাবে আমাদের রাজ্ঞীর নিকটা জানাইবার জন্য আমরা এই সভায় সকলে একত্রিত হইয়াছি।[৯]

শিক্ষকদের বেতন এমন কিছু ছিল না সে সময়ে। কখনও কখনও বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব শোনা যেত। কিন্তু তা কখনও কার্যকর হয়নি। সংবাদপত্র থেকে জানা যায় ঃ

"শিক্ষকদিগের দুর্ভাগ্য বোধ হয় এ সংসারে দূর হইবার নয়। সকলেই জানেন, সময়ে গবর্নমেন্ট স্কুলের শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি হইবে বলিয়া অনেকদিন হয় প্রস্তাব হইয়াছিল। ইহাতে বোধ হয় অনেক শিক্ষক আকাশ মণ্ডলে সৌভাগ্য মেঘ সজ্জিত দেখিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তাহা আকাশেই বিলীন হইয়া যাইতেছে। শিক্ষকগণ বোধ হয় আর ঐ মেঘ দর্শন করিতে পাইবেন না—

ডাইরেক্টরের এক সারকুলারে প্রকাশিত হইয়াছে যে, তিনি শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি না করিয়া বরং প্রকারান্তরে কমাইতে আদিষ্ট হইয়াছেন। তাহার প্রণালী এই এখন গবর্নমেন্ট স্কুলে যে সকল শিক্ষকের বিশেষ প্রয়োজন না থাকে এবং যাহাদের বিশেষ দাবিও নাই সেই সকল শিক্ষককে দীর্ঘ বিদায় দেওয়া হইবে। আর ঐ সকল স্কুলে যে সকল পদশূন্য হইবে, নিতান্ত ঠেকা না হইলে তাহাতে নতুন লোক আনা হইবে না। নিচের শিক্ষকদিগকে ঐ পদে প্রমোশন দেওয়া হইবে, কিন্তু তাহারা ঐ শূন্য পদের বেতন পাইবেন না। স্বীয় স্বীয় বেতনেই উপরিস্থ পদে প্রমোশন পাইবেন। মনে করুন দেড়শত টাকা বেতনের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য হইল, তাহাতে ৮০ টাকা বেতনের দ্বিতীয় শিক্ষককে প্রমোশন দেওয়া গেল, কিন্তু প্রমোশন পাইয়াও বেতন ঐ ৮০ টাকাই রহিল। এইরূপ সমুদয় শিক্ষককে প্রমোশন দিয়া আবশ্যক হইলে কেবল নিচে ১০/৫ টাকা দিয়া একজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে। সুতরাং ৬০/৭০ টাকা বাঁচিয়া গেল। এই কার্যটি দ্বারা যে শিক্ষকদিগের উৎসাহ ভঙ্গ করা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। এখন লোকে কেবল উচ্চপদের লোভে লালায়িত নয়। টাকা বৃদ্ধির আশা না থাকিলে কেবল উন্নত পদে শিক্ষকগণ থাকিবেন না। যত শিক্ষক যত পরিশ্রম করেন সকলেই টাকা বৃদ্ধির জন্য। যাহাদের টাকার লোভ নাই তাহারা কখন চাকুরি করিতে আসেন না। অতএব আমরা বলিতেছি, এই নিয়মদ্বারা শিক্ষকদিগের উৎসাহ ভঙ্গ হইবে। সুতরাং প্রাণান্ত স্বীকার করিয়া কোন শিক্ষক স্কুলের কার্য করিতে ইচ্ছুক হইবেন না। বিশেষ পুরস্কারের আশা না থাকিলে কেহই মনোযোগী হইয়া কার্য করিতে চায় না, ইহা মানব প্রকৃতির সাধারণ ধর্ম। এই প্রণালী প্রবর্তিত হইলে গবর্নমেন্ট স্কুলের উন্নতি আশা বৃথা। স্কুল কলেজের প্রতি গবর্নমেন্টের কি কোপদৃষ্টি পতিত হইয়াছে বুঝিতে পারি না। নানা প্রকারে তাহারা স্কুলের উন্নতির প্রতিবন্ধকতা জন্মাইবার উপক্রম করিয়াছেন।[১০]

পোগোজ স্কুল :

আর্মেনিয়ান ব্যবসায়ী ও জমিদার নিকি পোগোজের স্মৃতি আজও জড়িয়ে আছে শহর ঢাকার সঙ্গে। আরমানিটোলায় পোগোজ একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে ১২ জুন। প্রথমে বিদ্যালয়টির ক্লাস বসত পোগোজের বাড়িতেই। বিদ্যালয়টি পরিচিত ছিল "পোগোজ অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুল অ্যাট ঢাকা" নামে। পোগোজ ইংল্যান্ড চলে যান ১৮৭০

খ্রিঃ। সেখানেই তিনি মারা যান। তিনি মারা যাওয়ার পর বিদ্যালয়ের পরিচালনায় জটিলতা দেখা দেয়। ১৮৭৮ খ্রিঃ বিদ্যালয়টি উঠে আসে সদরঘাটের বর্তমান স্থানে। বিদ্যালয়টির প্রভাতী ও দিবা বিভাগ।

"আমরা গত সপ্তাহেই প্রকাশ করিয়াছি, ঢাকা পোগস্ স্কুলের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল এবার অতি সন্তোষজনক হইয়াছে। ৩৫ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিলেন ২৭ জনই উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে ৮ জন বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা সম্প্রতি ফলের লিস্ট দেখিয়া আরো সন্তোষ লাভ করিলাম। পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে যে ৮ জন অনুত্তীর্ণ রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের ৬ জন ইতিহাসে, একজন গণিতে, একজন বাংলা ভাষায় এবং একমাত্র ইংরাজি সাহিত্যে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন নাই। ইংরাজি সাহিত্যের পরীক্ষায় ৩৫ জনের মধ্যে একটি ভিন্ন সমুদায়ের কতৃকার্যতা লাভ সামান্য কথা নয়। এজন্য তদধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু গোপীমোহন বসাক মহাশয় সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নাই।

"গোপীমোহন বাবুকে আমরা পূর্বাবধিই একজন সুযোগ্য ও সুদক্ষ শিক্ষক বলিয়া জানি। ইঁহারই শিক্ষা নৈপুণ্যে ঢাকার ব্রাহ্মস্কুল (এক্ষণ যাহা বাংলা বাজার স্কুল বলিয়া অভিহিত হয়) অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। তাহাতেই ইহার পরিচয় পাইয়া শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষ অধিকতর বেতনে বরিশাল গবর্নমেন্ট স্কুলে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি স্বেচ্ছাপূর্বক কার্য পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা পোগস্ স্কুলে কোন নিম্নতর শিক্ষকের পদে নিয়োজিত হন। ক্রমে উন্নত হইয়া এক্ষণ দ্বিতীয় শিক্ষকতায় ইন্‌চার্জ স্বরূপ আছেন। প্রায় দুই বৎসর হইল ইনি পোগস্ স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা নির্বাহ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু আশ্চর্য ও আক্ষেপের বিষয় এই, স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত এন. পি. পোগস্ সাহেব আজিও ইহাকে প্রধান শিক্ষকের পদে স্থিরতররূপে নিযুক্ত করিতেছেন না। বর্তমান স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত ক্লার্ক সাহেব এই নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধও করিয়াছেন, স্কুল ফাণ্ডের যথেষ্ট টাকা আছে, তথাপি কি জন্য তিন এ বিষয়ে কাল গৌণ করিতেছেন, বলিতে পারি না। বোধ হয় গোপীমোহন বাবুর বিজ্ঞতা বিষয়ে সংশ্রব থাকাই এরূপ করিবার কারণ। যাহা হউক এবারকার ফল দর্শনে অবশ্যই তাঁহার সে সংশয় দূরগত হইয়াছে। অতএব আমরা ভরসা করি পোগস্ সাহেব বি. এ. এম. এর আশা পরিত্যাগ করিয়া গোপীমোহন বাবুকেই প্রধান শিক্ষকের পদে স্থিরতররূপে নিযুক্ত করিবেন। আমরা বিলক্ষণরূপে অবগত আছি গোপীমোহন বাবুর অধ্যাপনায় এবং শিক্ষকোচিত সদ্ব্যবহারাদিতে ছাত্রগণ সবিশেষ সন্তুষ্ট আছেন। অতএব তিনি স্থিরতররূপে নিয়োজিত হইলে তাহারা সবিশেষ সন্তোষ লাভ করিবেন। অন্যথা সকলেরই বিরাগ উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই।[১১]

পোগোজের মৃত্যুর পর সবজিবাগানের জমিদার বিদ্যালয়ের দুই তৃতীয়াংশ কিনে নেন।

"বাবু মোহিনীমোহন দাস পোগোজ স্কুলের স্বত্বাধিকারিত্ব গ্রহণ করিয়া খুব প্রশংসা লাভ করিলেন। অমনি তাঁহার প্রতিবেশী জ্ঞাতি রূপলাল ও রঘুনাথ দাসও একেবারে উভয়ের নাম সম্বলিত একটি স্কুল স্থাপন করিয়া অনেকদিন হইতে চালাইতে ছিলেন; স্কুলটি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিল না। এদিকে বাবু গোপীমোহন বসাক জুবিলী স্কুলের সম্পর্কচ্যুত হইয়া ইষ্টবেঙ্গল ইনস্টিটুসন নামে একটি স্কুল তিন বৎসর চালাইয়াও সফল প্রযত্ন হইতে পারিলেন না। হঠাৎ গত সোমবার দুইটি স্কুল ভাঙ্গিয়া গেল, এইদিকে কমিশনর সাহেবের পরিত্যক্ত বাড়িতে দুই স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকগণের সম্মেলন। কিছুকাল পরেই শুনিলাম, গোপীমোহন বাবুর সে ইনস্টিটুসন গৃহেই উভয় স্কুলের একীকৃত স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হইল। দুই স্কুল অন্য স্থানে নিয়া মিশাইবার প্রয়োজন কিছু রহস্য বটে। এস্কুলের কার্য পরিচালনা ক্ষমতা বাবু গোপীমোহন বসাকেই অধিকৃত রহিল। কেহ কেহ বলিতেছেন, মিশ্রিত স্কুলাধ্যক্ষ একটা কলেজ খুলিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। আমরা উহা সম্ভব মনে করি না। রূপরঘুস্কুলের ন্যায় একটা কলেজ হইলে

কাহারও ইষ্টাপতিত দেখি না। মিশ্রিত স্কুলের লাভ হইতে যদি একটা কলেজ চলিয়াও অতিরিক্ত একটা নাম হয় তবে ক্ষতি কি? [১২]

নর্মাল স্কুল :

অবিভক্ত বাংলায় প্রথম ফিমেল নর্মাল স্কুলে স্থাপিত হয় ঢাকায় ১৮৬৩ সালের ১১ মে। প্রথমে বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৬। কিন্তু এই নর্মাল স্কুলের উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্ত্র।

"অনেকেই জানেন, কেবল মাত্র বাংলা বিদ্যালয়ের নিমিত্ত সুশিক্ষক প্রস্তুত করাই গভর্নমেন্টের নর্মাল স্কুল সংস্থাপনের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা কোন কোন প্রধান ব্যক্তির নিকট আরো একটা উদ্দেশ্যের কথা শুনিয়াছি। সে উদ্দেশ্যটি এই, প্রত্যেক্ নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ইংরেজি ভাষার অননুবাদিত পূর্ব উচ্চ উচ্চ বিষয়গুলি বাংলায় সঙ্কলন করিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবেন, পরে তাহা পুস্তকাকারে প্রচার করিয়া দরিদ্র বঙ্গভাষাকে ঋদ্ধিসম্পন্ন করিবেন।...

কিন্তু এক্ষণে বলিতে লজ্জাবোধ হইতেছে, ক্ষোভও জন্মিতেছে, আমরা আমাদিগের ঢাকা নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষককে আজও গভর্নমেন্টের উক্ত মহৎ উদ্দেশ্যটি সম্পাদন করিতে নিতান্ত উদাসীন দেখিতে পাইতেছি। আমাদিগের প্রধান শিক্ষক প্রতি বৎসর অনেক উৎকৃষ্ট শিক্ষক প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছেন বটে, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহাকে একখানি যৎসামান্য পুস্তকও প্রচার করিতে দেখিলাম না।

যাহা হউক ভবিষ্যতে আমরা আমাদিগের দরিদ্র বাংলা ভাষাকে ঢাকা নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকট ঋণী দেখিতে পাই, ইহা নিতান্ত প্রার্থনীয়। যদি মি. এরাটুন (ইনিই ঢাকা নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক) আমাদিগের এই প্রার্থনীয় বিষয়টির উপর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে কেবল যে বাংলা ভাষার মূলধনের যৎকিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইবে, এরূপ নয়, তিনিও জনসমাজ নির্মল যশোভাজন হইতে পারিবেন। [১৩]

"আজকাল আমরা উক্ত নর্মাল স্কুলের এই একটি দুর্নাম শুনিতে পাইতেছি যে তাহার আধুনিক শিক্ষিতেরা উত্তম বাংলা লিখিতে জানেন না। যথারীতি ১০টা ছত্র শুদ্ধ করিয়া লিখিতেও অনেকে গলদঘর্ম কলেবর হন। ব্যাকরণ অশুদ্ধির কথা দূরে থাকুক, তাঁহাদের লিখিত পত্রাদিতে সচরাচর এত বর্ণশুদ্ধি ঘটে যে, তাহা দেখিয়া কেহ এরূপ বিবেচনা করিতে পারেন না, তাঁহারা কোনদিন কোন স্কুলে যথানিয়মে শিক্ষালাভ করিয়াছেন।...[১৪]

"নানা কারণে অনেকেই ইংরাজি নর্মাল স্কুলের প্রতি বড় অনুরাগ সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। এতৎ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের অযথোচিত নিয়ম বিধানই এই... প্রধান কারণ। নিয়ম আছে, ইংরাজি নর্মাল স্কুলের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে স্ট্যাম্প কাগজে এই মর্মে এক একবার লিখিয়া দিতে হইবে, "এই বিদ্যালয়ে এক বর্ষকাল অধ্যয়ন করিয়া আমি অন্যূন তিন বৎসরকাল শিক্ষকতা করিব। কর্তৃপক্ষ যখন যে স্থানে শিক্ষকতায় নিযুক্ত করিয়া পাঠান, বিনা আপত্তিতেই সেই স্থানেই গমন করিব। যদি এই প্রতিজ্ঞাস্বরূপ কার্য না করি, গবর্নমেন্টকে দুইশত টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিব।" কিন্তু শিক্ষিত ছাত্রদিগের কর্ম দেয়ার বিষয়ে কোন সুদৃঢ় নিয়ম নাই। গত বর্ষে যে সকল ছাত্র নিয়মিতকাল শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এইক্ষণ বহির্গত হইয়া আছেন, তাঁহাদিগের অনেকেই আজি পর্যন্ত কর্ম পাইতে পারেন নাই। প্রতিজ্ঞা অনুরোধে তাহারা কর্মান্তরও গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। ইহা কি তাহাদিগের পক্ষে সামান্য ক্ষতি? কর্তৃপক্ষ যেমন গবর্নমেন্টের কাজ বুঝিয়া নর্মাল স্কুলের ছাত্রগণকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহাদিগেরও যাহাতে হানি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। যে সকল ছাত্র শিক্ষার ব্যয় নির্বাহে অক্ষমতাহেতু কলেজ প্রভৃতিতে অধ্যয়ন করিতে না পারেন, সাধারণত তাঁহারাই বৃত্তিলাভ ও সত্বর চাকরি পাওয়ার প্রত্যাশায় ইংরাজি নর্মাল স্কুলে ভর্তি হইয়া থাকেন। এখানে যদি তাঁহারা সেই প্রত্যাশানুরূপ কাজ পাইতে না পারিলেন, একবর্ষকাল কথঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াই যদি তাঁহাদিগকে হাত পা গুটাইয়া গৃহে বসিয়া থাকিতে হইল, ভবিষ্যতে আর

কাহারও ইহাতে প্রবেশ করিতে আগ্রহ জন্মিবে কেন? আমরা কেবল অনুমান করিয়া এরূপ বলিতেছি না। গতবর্ষের ভাবগতি দেখিয়া এবার অতি অল্প ব্যক্তিই ইংরাজি নর্মাল স্কুলে প্রবেশ করিয়াছেন। নিয়ম করা হইয়াছে, এই স্কুলে অনেকেই বেতন দিয়া পড়িতে পারিবেন, ১২ জন ১০ টাকা করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া এবং তদতিরিক্ত কয়েকজন অবৈতনিকরূপে শিক্ষা করিতে পারিবেন, এবং নিম্নশ্রেণীস্থ স্কুল মাস্টারগণ ইহাতে শিক্ষা করিয়া গিয়া পুনরায় পূর্ব কার্য লাভ করিতে পারিবেন। সাধারণত নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকতা কার্যে ইহাদিগেরই অধিকার দাবি থাকিবে। আমরা প্রথমত বিবেচনা করিয়াছিলাম এই সকল প্রলোভনে অনেকেই ইহাতে শিক্ষার্থ আগমন করিবেন। কিন্তু বাস্তবিক অতি অল্প ব্যক্তিই এই বিদ্যালয় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। বর্তমান বর্ষে ঢাকা ইংরাজি নর্মাল স্কুলে মোট ৭ জন মাত্র ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। শিক্ষকতা ছাড়িয়া এবার একব্যক্তিও এখানে সমাগত হন নাই। এক্ষণ ইহাতে যে কয়েকজন ছাত্র বিদ্যমান আছেন তাঁহারাও নিম্নলিখিত কারণে নিতান্ত বীতরাগ হইয়া উঠিয়াছেন।

এ বর্ষের যেমন আরম্ভ হইয়া অবধি আজ পর্যন্ত উক্ত স্কুলের ছাত্রদিগকে ইংরাজি ভাষায়ই প্রায় যাবতীয় পাঠ্য বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু এক্ষণে শুনা যায়, নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহোদয় ডিরেক্টর সাহেবের বাচনিক অবগত হইয়াছেন, সাহিত্য ভিন্ন আর সকল বিষয়েই উক্ত ছাত্রদিগকে বাংলা নর্মাল স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগের সহিত এক প্রশ্নে পরীক্ষা দিতে হইবে। অঙ্ক, ক্ষেত্রতত্ত্ব, বীজগণিত প্রভৃতি যাহারা বরাবর ইংরাজি ভাষায় শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, সমস্যা তাঁহাদিগের বাংলা ভাষায় পরীক্ষা দেওয়া সহজ কথা নয়। পূর্বাবধি অভ্যাস না থাকিলে অতিবড় কৃতবিদ্য লোকেও বোধ হয় এরূপ বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারেন না। সংজ্ঞার অনবগতি ও অঙ্কপাতের অনভ্যাস প্রযুক্ত অবশ্যই ইংরাজি ডিপার্টমেন্টের ছাত্রদিগকে বাংলা নর্মাল স্কুলের ছাত্রদিগের অপেক্ষা অপকৃষ্ট হইতে হইবে। যদিও তাঁহারা এই কয়েক মাস বসিয়া এ বিষয়ে অভ্যাস করিতে থাকেন, তথাপি তাহাদিগের চিরন্তন অভ্যাস পরিহার নিতান্ত দুরূহ হইয়া উঠিবে। সুতরাং তাঁহারা বাংলা ডিপার্টমেন্টের ছাত্রদিগের সহিত পরীক্ষা দিয়া তুল্যতা লাভ করিতে পারিবেন না। যাহা হউক যদি কর্তৃপক্ষের যথার্থই উক্তরূপ অভিপ্রায় হইয়া থাকে, শিক্ষকদিগকে প্রকাশ্যরূপে তাহা জ্ঞাপন করিয়া অতি সত্বর ইংরাজি নর্মাল স্কুলের শিক্ষাদান রীতি পরিবর্তিত করিয়া দিউন। অন্ততঃ এখন হইতেও যদি উক্ত স্কুলের ছাত্রদিগকে বাংলা নর্মাল স্কুলের ছাত্রদিগের সহিত এক সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয়, আগামী পরীক্ষায় ফল অত্যন্ত অসন্তোষজনক না হইতে পারে। আমাদিগের বিবেচনায় বাংলা নর্মাল স্কুলের ছাত্রদিগকে যে সময়ে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, সেই সময়ে ইংরাজি ডিপার্টমেন্টের ছাত্রদিগকে ইংরাজি সাহিত্যের শিক্ষা দিয়া অন্যান্য সময়ে উভয় ডিপার্টমেন্টের ছাত্রদিগকে একত্র শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। তাহা হইলে উক্ত উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ সুসিদ্ধ হইতে পারে। এবং ইংরাজি ডিপার্টমেন্টের বর্তমান ছাত্রদিগেরও বিরক্তচিত্ততা কিয়ৎ পরিমাণে নিবারিত হয়। পরিশেষে আমাদিগের বক্তব্য এই, যদি এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের কর্তৃপক্ষ এই বিদ্যালয়ের সাধারণ উদ্দেশ্য সৎসাধন করিতে চান, হয় একবার লওয়ার নিয়ম একবারে উঠাইয়া দিউন, নয় নিয়মিত শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদিগকে অবশ্যই শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত করা হইবে, এইরূপ সুদৃঢ় নিয়ম বিধান করুন। অন্যথা এ বিদ্যালয়ের অসদ্ভাব, শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের অকল্যাণকর হইবে না। [১৫]

"আমরা যখনই এই স্কুলের বিষয় চিন্তা করি, তখনই নিরতিশয় ক্ষোভ প্রাপ্ত হই। এই স্কুলের নিমিত্ত গবর্নমেন্টের অল্প অর্থ ব্যয়িত হইতেছে না, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা সম্পূর্ণরূপে বৃথায় যাইতেছে। আমরা কি নিমিত্ত এরূপ বলিতেছি, এই বিদ্যালয়ের বর্তমান বর্ষের পরীক্ষার ফল জানিতে পারিলে পাঠকগণ তাহা কথঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারিবেন। আমরা ভবিষ্যজ্ঞের ন্যায় এখনই বলিয়া রাখিতেছি, এবার এই বিদ্যালয়ের

পরীক্ষার্থীরা অনেক বিষয়েই শূন্য ফললাভ করিবেন। আমরা জানি, উহাতে যে পরিমাণ পাঠ্য অবধারিত আছে, এবার তাহার অর্ধাংশও অধ্যাপিত হয় নাই। ইহা কি—কর্তৃপক্ষের অবিবেচনার না শিক্ষক বা শিক্ষাপ্রণালীর ত্রুটির ফল, আমরা তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি না। যাহা হউক যদিও এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক যথোচিত মনোযোগ সহকারে শিক্ষাদান না করিয়া থাকেন, যদিও তাহার শিক্ষা প্রণালীতে কোন প্রকার মারাত্মক ত্রুটি থাকে, তথাপি ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে, এই বিদ্যালয়ের যে পরিমাণ পাঠ্য নির্দিষ্ট আছে, এক বৎসর কাল মধ্যে তাহার অধ্যাপনা করা কঠিন। এই নিমিত্ত সময়বৃদ্ধি অথবা পাঠ্য ন্যূন করা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু পাঠ্য ন্যূন করিলে যে উদ্দেশ্যে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে উদ্দেশ্যসিদ্ধি দুরূহ হইয়া উঠিবে। অতএব আমরা ভূতপূর্ব অফিসিয়েটিং স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বেলেট সাহেবের সহিত এক বাক্য হইয়া অনুরোধ করি, ইংরাজি নর্মাল স্কুলের পাঠ্য বিষয়ে সুশৃঙ্খলা বিধান করিয়া অত্রত্য শিক্ষার্থীদিগের অন্তত দুই বৎসর কাল শিক্ষা করিবার নিয়ম হউক। অন্যথা এই বিদ্যালয় সর্বদাই একটি বিরক্তি স্থান হইয়া থাকিবে। ভরসা করি, বর্তমান স্কুলে ইনস্পেক্টর ক্লর্ক সাহেবও এ বিষয়ে মনোযোগবান হইবেন।

আমরা উক্ত বিদ্যালয়ের এবারকার বার্ষিক পরীক্ষণ সম্বন্ধে আর কিছু না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। আগামীকল্য এই বিদ্যালয়ের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। গতকল্য কর্তৃপক্ষের চিঠি আসিয়াছে, ইংরাজি নর্মাল স্কুলের ছাত্রদিগকে সংস্কৃত ব্যতীত বাংলা নর্মাল স্কুলের ৩য় বার্ষিক শ্রেণীর যাবতীয় পাঠ্য বিষয়েই তুল্যরূপে পরীক্ষা দিতে হইবে। অধিকন্তু কেবল তাহাদিগের ইংরাজি সাহিত্যের পরীক্ষা হইবে। কর্তৃপক্ষ এতদিন কোথায় ঘুমাইয়া ছিলেন (!) আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। একতঃ এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে এখন এমন অনেক বিষয়ে (প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ভূমিপরিমাণ, শিল্পবিদ্যা ও জ্যোর্তিবিদ্যা ইত্যাদি) পরীক্ষা দিতে হইবে যাহা তাঁহাদিগের জন্মাবচ্ছিন্নে একদিনও শিক্ষা করা হয় নাই। তাহাতে যদি আবার উক্ত নিয়মানুসারে তাঁহাদিগকে পরীক্ষা দিতে হয়, তবেই প্রতুল হইবে। ভূগোল ইতিহাস গণিতাদি এ পর্যন্ত তাঁহাদিগের ইংরেজীতেই শিক্ষা হইয়াছে, এখন বাংলা ভাষায় সেই সমুদায়ের প্রশ্নোত্তর লেখা কি সহজ ব্যাপার? কোন্ ব্যক্তি এক ভাষায় কোন বিষয় শিক্ষা করিয়া সহসা ভাষান্তরে তাহার পরীক্ষা দিতে পারিবেন? এরূপ ব্যবহার কি কর্তৃপক্ষের নিতান্ত ঔদাসীন্য বা অবিমৃষ্যকারিতা প্রকাশ নহে? কর্তৃপক্ষ যদি স্কুলটি দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন করিতে চান, এরূপ খেলাখেলী পরিত্যাগ করিয়া এতৎ সম্বন্ধে কোন স্থিরতর নিয়ম অবধারিত করিয়া দিউন। যাহাতে শিক্ষার্থীরা কিছু অধিক কাল অবস্থান করিয়া সুশিক্ষা লাভ করিতে পারেন, এক্ষণ স্কুল পরিত্যাগ করিয়াই কোন কার্যে নিযুক্ত হন, তাহার সদুপায় বিধান করুন, অন্যথা স্কুলটিকে উঠাইয়া দিলেও কোন হানি দেখা যায় না।[১৬]

জগন্নাথ স্কুল :

ঢাকা শহরে ব্রাহ্ম স্কুল স্থাপিত হয় ১৮৫৮ সালে। বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন ঢাকার অন্যতম ব্রাহ্মকর্মী দীননাথ সেন, পার্বতীচরণ রায় প্রমুখ। এই বিদ্যালয়টিই পরবর্তী কালে জগন্নাথ স্কুল এবং জগন্নাথ কলেজে রূপান্তরিত হয়েছিল। ১৮৮৪ সালে সেকেণ্ড গ্রেড কলেজ এবং ১৯০৮ সালে পরিণত হয় ফার্স্ট গ্রেড কলেজে।

"পূর্বে যে বিদ্যালয়টি" ঢাকা ব্রাহ্ম স্কুল নামে অভিহিত হইত, "কতিপয় মাস গত হইল, বালিয়াটির প্রসিদ্ধ মৃত জগন্নাথবাবুর মাধ্যমপুত্র শ্রীযুক্তবাবু কিশোরীলাল রায় চৌধুরী উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহনে সম্মত হইয়া উহার নাম "জগন্নাথ স্কুল" রাখিয়াছেন। পূর্বে ব্রাহ্ম স্কুলে বাংলা ভাষায় অধ্যাপনা মাত্র হইত। তৎপরে উহার সহিত ইংরেজি ভাষার কয়েকটি শ্রেণী সন্নিবেশিত করিয়া উহাকে মাইনর ক্লাস করা হয়। কয়েকজন মাত্র মাইনার স্কুলসিপ প্রাপ্ত হইলে

শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কগণ প্রোৎসাহিত হইয়া উহাকে হায়ার ক্লাস স্কুল করেন। অর্থাৎ উহা হইতে ছাত্রগণ প্রবেশিকা পরীক্ষাদান আরম্ভ করে। উহাতে ক্রমোন্নতি লক্ষিত হওয়াতেই বোধ হয় কিশোরীবাবু স্কুলটি তাঁহার পিতার নামে গ্রহণ করিয়াছেন। যোগ্য যোগ্য শিক্ষকদিগের হস্তেই এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ভার সমর্পিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষা দান করিয়া যাহারা বেকার বসিয়া থাকিতেন, অথবা ল ক্লাশে আইন অধ্যয়ন মানসে বাধ্য হইয়া ঢাকায় অবস্থান করিতেন, সাধারণতঃ তাহারাই অল্প অল্প বেতনে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য সম্পাদন করিতেন।[১৭]

জগন্নাথ কলেজ :

কলেজের ইতিহাস বেশ দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল। "ঢাকার প্রথম বেসরকারি কলেজ জগন্নাথ কলেজ। সরকারি ঢাকা কলেজের মত জগন্নাথ কলেজও ঢাকার শিক্ষার ক্ষেত্রে পালন করেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। জগন্নাথ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে যাত্রা শুরু হয়েছিল ঢাকা কলেজের এবং কালক্রমে তা পরিণত হয়েছিল একটি 'এলিট' কলেজে যেখানে সাধারণ ছাত্রদের প্রবেশাধিকার ছিল না। জগন্নাথ কলেজ সে সব ছাত্রদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। বোধ হয় একারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়ের কোষাধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র নাগ লিখেছিলেন, গরিব ও পশ্চাৎপদ জনসংখ্যার হাতের নাগালের মধ্যে বিদ্যাকে এনে দিয়ে জগন্নাথ কলেজ পূর্ববাংলায় সৃষ্টি করেছিল সামাজিক বিপ্লবের।"[১৮]

অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত ছিলেন এই কলেজের ছাত্র। স্মৃতিচারণায় তিনি বলেছেন "...যে সব অধ্যাপক পেয়েছিলাম, তাঁদের মত শিক্ষক আজকাল কোন বিশ্ববিদ্যালয়েও পাওয়া শক্ত।" ইংরেজির অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র এবং ফণিভূষণ চক্রবর্তী, অর্থনীতির অধ্যাপক সুধাংশুকুমার গুহঠাকুরতা ও অধ্যাপক শচীন চৌধুরী, ইতিহাসের অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র গুপ্ত, ভূগোলের অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র গুহ, রসায়নের অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র ঘোষ (সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা), এরকম শিক্ষক সমাবেশে জগন্নাথ কলেজ, কেবল পূর্ববাংলায় নয়, অবিভক্ত বাংলার বেসরকারি কলেজগুলির মধ্যে ছিল আদর্শ স্থানীয়।

মুনতাসীর মামুন কলেজটির ইতিহাস আলোচনায় উল্লেখ করেছেন, ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রজসুন্দর মিত্রের আরমেনিটোলায় বাসায় একটি ব্রহ্ম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, ব্রজসুন্দর মিত্র, অনাথবন্ধু মৌলিক, পার্বতীচরণ রায় এবং দীননাথ সেনের উদ্যোগে। ব্রজসুন্দর বিদ্যালয়ে আর্থিক সাহায্য করতেন। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হত এখানে। প্রথমে মাইনর স্কুল ও পরে হায়ার স্কুলে পরিণত হয়। এখানকার ছাত্ররা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারত। ব্রহ্ম বিদ্যালয় পড়াতে আসেন অঘোর নাথ গুপ্ত, গোবিন্দপ্রসাদ রায়, জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী এবং কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের দায়িত্বে ছিলেন অনাথবন্ধু মৌলিক। তাছাড়া ঢাকায় যে সব কৃতী ছাত্ররা আইন পড়তে আসত, তাদের কেউ কেউ এখানে স্বল্প বেতনে শিক্ষকতা করত।

কিন্তু আর্থিক সংকটের কারণে বিদ্যালয় পরিচালনা অসম্ভব হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে, এর সমস্ত দায়দায়িত্ব বালিয়াটির জমিদার কিশোরীলাল রায় চৌধুরীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। তিনি পিতার নামে বিদ্যালয়ের নামকরণ করেন জগন্নাথ স্কুল। গোপীমোহন বসাক ছিলেন প্রধান শিক্ষক। বিদ্যালয়ের খ্যাতি বেড়ে যায়। ছাত্র সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ৫/৬ বছর এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হয়। বিদ্যালয় একটি লাভজনক সংস্থায় পরিণত হলে, গোপীমোহন বেতন বৃদ্ধি দাবি করেন। সে সময়ে তাঁর বেতন ছিল মাত্র দু'শ টাকা। এই নিয়ে কিশোরীলাল-গোপীমোহনে বিবাদের পরিণামে প্রধান শিক্ষক কর্মচ্যুত হন (১৮৮৭ খ্রিঃ)। কিশোরীলাল প্রধান শিক্ষককে কর্মচ্যুত করার পর ভয় পেলেন, যদি প্রধান শিক্ষক ক্ষতিপূরণের দাবি করেন। তাই রাতারাতি বিদ্যালয়ের নাম গেল বদলে—হল জুবিলী স্কুল। এই জুবিলী স্কুল এখনও চলছে সগৌরবে।

এই ঘটনায় আগে, কিশোরীলাল ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার প্রখ্যাত আইনজীবী ত্রৈলোক্যনাথ বসু, অনাথবন্ধু মৌলিক এবং বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের সহযোগিতায় একটি কলেজ খোলার অনুমতি পান, যেখানে আইন পড়াবার ব্যবস্থা থাকবে। কলেজের নাম হল জগন্নাথ কলেজ। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা পর্যন্ত স্কুল ও কলেজ ছিল একই পরিচালক মণ্ডলীর অধীনে। জগন্নাথ স্কুল লুপ্ত হলে, তার জমিজমা কিনে নিয়ে নির্মিত হয় কলেজ ভবন। কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন কুঞ্জলাল নাগ। অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন। কলেজের শুরুতে কুঞ্জলালের সঙ্গে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন বৈকুণ্ঠকিশোর চক্রবর্তী, রাখালকৃষ্ণ ঘোষ এবং বসন্তকুমার রায়। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে জগন্নাথ কলেজের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪৮; ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে হয় ৩৯৬। সূচনাকাল থেকেই কলেজটির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। কুঞ্জলাল অসুস্থ হয়ে অবসর নেন। বৈকুণ্ঠকিশোর অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিলেও তিনি চলে যান তিন বছর পর। দু'বছরের জন্য অধ্যক্ষ হিসাবে যোগ দেন হেরম্বচন্দ্র মৈত্র। তারপর ১৯০৪ খ্রিঃ অধ্যক্ষ হিসাবে যোগ দেন ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ললিতমোহনের আমলই কলেজের সমৃদ্ধির যুগ। ঢাকার কমিশনার আর. নাথান এবং ললিতমোহনের উদ্যোগে জুবিলী স্কুল ও জগন্নাথ কলেজ চলে যায় ট্রাস্টি বোর্ডের পরিচালনায় (১৯০৮ খ্রিঃ)। সরকার কলেজকে ৮৫ হাজার টাকা ক্যাপিটাল এবং ১২ হাজার টাকা রেকারিং গ্রান্ট মঞ্জুর করে। ললিতমোহন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত ছিলেন জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ। ব্রাহ্ম স্কুল থেকে জগন্নাথ স্কুল হয়ে জগন্নাথ কলেজ পর্যন্ত অন্তরালের কৃতী উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন অনাথবন্ধু মৌলিক। আর কলেজ প্রতিষ্ঠায় অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ঢাকার বিশিষ্ট আইনজীবী ও নাগরিক আনন্দচন্দ্র রায়। স্বদেশী আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ রদের সভা, রাজনৈতিক আন্দোনের কেন্দ্র জগন্নাথ কলেজের প্রাঙ্গনে ভাষণ দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ (১৯০১ খ্রিঃ)

প্রথমে যে বাড়িতে ছিল, সেখান থেকে সরে আসে সদরঘাটের বর্তমান অবস্থানে। প্রতিষ্ঠাকালে ছিলেন মাত্র এক জন শিক্ষক। বর্তমানে দিবা ও নৈশ বিভাগ মিলিয়ে প্রায় ১৯০ জন। ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১৩,৭৯২ দিবা এবং ৫,৫২২ নৈশ। এখানে ইংরেজি ও সংস্কৃত অনার্স এবং পারসি, বাংলা, উর্দু, দর্শন, গণিত, ইতিহাস ও অর্থনীতিতে পঠন-পাঠনের অনুমতি দিয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকায় স্ত্রী শিক্ষা :

'ঢাকাবাসী শিক্ষিত প্রধান প্রধান লোকদিগের সৎকার্য লিপ্সা বড় প্রবল। আমরা তাঁহাদিগের একটি সৎকার্যোৎসাহের কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম। কয়েকদিন হইল লালবাগ বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে অত্রত্য অনেক প্রধান কৃতবিদ্য ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই তাহাতে কেহই উপস্থিত হন নাই। কেবল দুই তিন জন যুবক এবং আমাদিগের মিলিটারী ডাক্তারবাবু কালীপদ গুপ্ত নিয়মিত সময়ে উপস্থিত হইয়া বালিকাদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে পুরস্কার বিতরিত হয়। ঢাকা শহরের উপরিস্থ একটি বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণোপলক্ষে ২/৩ জন হিতৈষী লোকমাত্র উপস্থিত ছিলেন, এ অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। ঢাকাবাসীরা বাক্যে এবং বক্তৃতায় দেশের হিতসাধন করিতে একপ্রকার মন্দ ক্ষমতাবান নহেন। তাহারা কথোপকথনে স্ত্রী শিক্ষায়ও বিলক্ষণ অনুরাগ প্রদর্শন করেন। কিন্তু কাজে দূরে থাকুক তদ্বিষয়ে উৎসাহের অভাব ও অন্যান্য নানা কারণে ঢাকার স্ত্রী শিক্ষা একপ্রকার উঠিয়া যাওয়ার মধ্যে আসিয়াছে। এখন তিনটি প্রণালীতে ঢাকায় স্ত্রী শিক্ষা হইতেছে। ফিমাল নর্মাল স্কুল, জননা মিশন এবং বালিকা বিদ্যালয়। কিন্তু অবস্থা একটারও ভালমন্দ নয়। ফিমাল নর্মাল স্কুলটির অবস্থা গভর্নমেন্ট অত্যন্ত হীন করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাও আবার কখন উঠিয়া যায়, স্থিরতা নাই। গভর্নমেন্ট ইহার মূলে কুঠার সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন,

আঘাত কার বাকি রহিয়াছে। জননা মিশনের দ্বারাও বিশেষ উপকার হইতেছে না। যে সকল স্ত্রীলোক উক্ত শিক্ষয়িত্রীর কার্যে নিযুক্ত হন, তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি অতি কম। সুতরাং তদ্বারা ভালরূপে শিক্ষা হইতে পারে না। তাহাতে আবার শুনা যায়, মনোযোগেরও নাকি কিছু কিছু ত্রুটি হয়। বালিকা বিদ্যালয়গুলিরও অবস্থা ভাল নয়। ইহার প্রতি স্থানীয় লোকের বিশেষ যত্ন নাই। এখন পাঠকগণ বুঝিতে পারেন, ঢাকার স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা কতদূর শোচনীয়। অতএব আমরা গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করি আর কিছু টাকা দিয়া ফিমাল নর্মাল স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান হউন। জননা মিশনের প্রতিও দৃষ্টি করা কর্তব্য। আর স্থানীয় লোকদিগের নিকট অনুরোধ এই শহরের বালিকা বিদ্যালয়গুলির প্রতি একটুকু যত্ন বিধান করুন। যদি উপরি উক্ত তিনটি প্রণালীরই অবস্থা অতি উন্নত ও উত্তম থাকে তবে অতি অল্পকাল মধ্যেই ঢাকার স্ত্রীশিক্ষা অন্যরূপ ধারণ করে। এই তিনটি উপায় সর্বাবস্থ স্ত্রীলোকেরই শিক্ষা লাভ হইতে পারে। কিন্তু এই তিনটি উপায় থাকিয়াও যদি গভর্নমেন্ট ও স্থানীয় লোকের দোষে ঢাকায় স্ত্রীশিক্ষা হইতে না পারে, তবে বড় দুঃখের বিষয়। [১৯]

ফিমেল নর্মাল স্কুল :

ঢাকায় নারী শিক্ষা প্রসারে ব্রাহ্ম সমাজের ভূমিকা ছিল সব থেকে উল্লেখযোগ্য। তাদের অনেকেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার উদ্যোগ নেন। যা ক্রমশঃ বৃহৎ রূপ নিতে থাকে। ১৮৬৩ খ্রিঃ স্কুল ইনসপেক্টর মার্টিন সাহেব ফিমেইল নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করলে সে সম্পর্কে 'ঢাকা প্রকাশে' লেখা হয় ঃ "আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, আমাদিগের স্কুল ইনস্পেক্টর মার্টিন সাহেব এস্থলে একটি ফিমেইল নর্মাল স্কুলে সংস্থাপনার্থ যে রিপোর্ট করিয়াছিলেন, ডিরেক্টর এটকিন্সন সাহেব তাহা গ্রাহ্য করিয়াছেন। ....যাহা হউক এস্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই উক্ত ফিমেইল নর্মাল স্কুলটা নিজ ঢাকায় না করিয়া ঢাকার নিকটবর্তী কোন একটা প্রশস্ত ভদ্রগ্রামে সংস্থাপন করা অপেক্ষাকৃত ভাল বোধ হয়। পল্লীগ্রামে ফিমেইল নর্মাল স্কুল দ্বারা যেরূপ সহজে কৃতকার্যদা লাভ সম্ভাবনা আছে, ঢাকায় সেরূপ নাই। ঢাকায় ফিমেইল নর্মাল স্কুলে ভদ্র বংশ কামিনীগণের প্রবেশ দর্শন নিতান্ত দুরূহ হইবে। আমরা তাহাতে প্রায়ই বৈরাগিনী প্রভৃতি নীচ বংশীয় স্ত্রীলোকদিগকে প্রবেশ করিতে দেখিব। নগরীয় বৈরাগিনী প্রভৃতি নীচ বংশীয় স্ত্রীগণের বিরূপ দূষিত স্বভাব এবং কিরূপ কুটিল অন্তঃকরণ, বোধকরি অনেকেই অবগত আছেন। এই সকল নীচবংশীয় ও কুটিলচিত্ত স্ত্রীগণ নর্মাল স্কুলে কিঞ্চিৎকাল শিক্ষালাভ করিয়া কি প্রকৃত শিক্ষাদাত্রীর উপযুক্ত হইতে পারিবে। [২০]

"আমরা সাতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি উক্ত বিদ্যালয়টি সত্বরই উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। ঢাকার ভূতপূর্ব ডেপুটি ইনস্পেক্টর বাবু কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের নিরতিশয় যত্নে তৎকালীন স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত আর এল মার্টিন সাহেবের উৎসাহে এডাল্ট ফিমেল স্কুলও স্থাপিত হইয়াছিল। ইতপূর্বে এডাল্ট ফিমেল স্কুল উঠিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি নর্মাল স্কুলটিরও উঠিয়া যাওয়ার কথা শুনা যাইতেছে। ইহা ঢাকার একান্ত দুর্ভাগ্য এবং আমাদিগের নিতান্ত আক্ষেপের কারণ সন্দেহ নাই। স্থানীয় লোকের অনুৎসাহ এবং অযত্নই ঢাকা এডাল্ট ফিমেল স্কুল উঠিবার প্রকৃত কারণ। কিন্তু যদিও আমরা নিশ্চিতরূপে অবগত হইতে পারি নাই, যে পর্যন্ত জানা গিয়াছে তাহাতে এই বোধ হয় বর্তমান স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত সি বি ক্লার্ক সাহেবের কুসংস্কারই ঢাকা ফিমেল নর্মাল স্কুল উঠিবার প্রধান কারণ। কাহারো কাহারো কথা শুনিয়া হউক অথবা আপনা হইতেই হউক তাঁহার সুদৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে ঢাকা ফিমেল নর্মাল স্কুলের ছাত্রীদিগের মধ্যে অনেকে সচ্চরিত্রা নয়। তাহারা সুশিক্ষিতা হইলেও তাহাদিগের চরিত্র সংশোধনের সম্ভাবনা অল্প সুতরাং এই বিদ্যালয় দ্বারা কোন উপকার হইতেছে না। নিরর্থক গবর্নমেন্টের কতকগুলি অর্থের বিনাশ হইতেছে। শুনিতে পাওয়া যায় ক্লার্ক সাহেবের এই সংস্কার তাঁহাতেই বদ্ধ হইয়া রয় নাই, ডিরেক্টর ও লেপ্টেনেন্ট গবর্নরকে পর্যন্ত উহাতে

বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহাদিগেরও নাকি ঢাকা ফিমেল নর্মাল স্কুল এবালিস করিয়া ফেলা অভিপ্রেত হইয়াছে। ক্লার্ক সাহেব কাহারো কাহারো নিকটে স্পষ্টাক্ষরেই ব্যক্ত করিয়াছেন আগামী জানুয়ারি হইতে ঢাকা ফিমেল নর্মাল স্কুল উঠিয়া যাইবে। এক কারণে কর্তৃপক্ষের এই কুমতি জন্মিয়াছে। আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না, আমাদিগের নিশ্চিত বিশ্বাস এই ঢাকা ফিমেল নর্মাল স্কুল উঠাইয়া দিলে এতদাঞ্চলের অঙ্কুরোদ্‌গম স্ত্রী শিক্ষাদানের মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। আমরা কিয়দ্দিন উক্ত বিদ্যালয়ের সহিত সবিশেষ সম্বন্ধ ছিলাম তদ্বশত যতদূর জানিতে পাইয়াছি তাহাতে একপ্রকার নিশ্চিতরূপেই বলিতে পারি ইনস্পেক্টর ক্লার্ক সাহেবের সংস্কার ভ্রমমূলক। ঢাকা ফিমেল নর্মাল স্কুলে একটিও অসচ্চরিত্রা ছাত্রী আছে আমরা এরূপ জানি না। দেশীয় খৃষ্টানদিগের যে সকল স্ত্রীরা এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে, তাহাদিগের সচ্চরিত্রতা বিষয়ে কাহারো সন্দেহ নাই। তবে বৈরাগিনী ছাত্রীদিগের পূর্ব চরিত্রে অনেকে সংশয় প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু তাহাদিগের বর্তমান চরিত্র দূষিত একথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারিবেন না। বিদ্বেষীরা যাহাই বলুক না কেন অন্ধকার হইতে যত লোষ্ট্র নিক্ষেপই করুক না কেন, বোধ হয় না কেহ সাহসী হইয়া প্রকাশ্যরূপে এরূপ বলিতে পারিবে অমুক ছাত্রীর চরিত্র ভাল নয়। এ বিষয় লইয়া আমরা অধিক বাগবিতণ্ডা করিতে চাই না। আমাদিগের এই মাত্র কর্তব্য, যদি সত্য সত্যই ফিমেল নর্মাল স্কুলের কোন কোন ছাত্রীর চরিত্রে দোষ থাকে, সবিশেষ অনুসন্ধানপূর্বক তাহা অবগত হইয়া কেবল সেই সকল দূষিত চরিত্রা ছাত্রীদিগকেই স্কুল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত।

দুই একটি ছাত্রীর দোষে স্কুলের প্রাণদণ্ড কখনই কর্তব্য নয়। অঙ্গুলিতে ঘা হইলে তজ্জন্য কে শিরোচ্ছেদন করিয়া থাকে। ফিমেল নর্মাল স্কুলের দ্বারা কোন উপকার হইতেছে না একথার অর্থ কি? ছাত্রদিগের শিক্ষান্নোতি হইতেছে না, কি সাধারণ্যে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার হইতেছে না? আমরা স্বীকার করি, যে সুমহান উপকার উদ্দেশ্যে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে নানা কারণে ততদূর উপকার হয় নাই সহসা হওয়া অসম্ভাবিত ; কিন্তু যতদূর হইয়াছে তাহাও সামান্য নয়। দর্শকেরা এই বিদ্যালয় দর্শন করিয়া যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তৎপাঠে জানা যায় অধিকাংশ দর্শকই সবিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। ভূতপূর্ব লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সরাসরি ... বীডন, মিসেস উড্রো ডাইরেক্টর, একটিনসন এবং বর্তমান লেপ্টেনেন্ট বাহাদুর উইলিয়াম গ্রে মহোদয়, ব্যারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের উন্নতি দর্শন করিয়া যেরূপ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে কেহই বলিতে পারেন না, ঢাকা ফিমেল নর্মাল স্কুলের ছাত্রীদিগের শিক্ষান্নোতি হয় নাই।...যাহা হউক আমরা সবিশেষ রূপে জানিয়া বলিতেছি ঢাকা ফিমেল নর্মাল স্কুলের ছাত্রীদিগের দ্বারা ঢাকার সাধারণ স্ত্রী শিক্ষার বিলক্ষণ সহায়তা হইতেছে। এই স্কুলের ছাত্রীরা অনেক ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবার মধ্যে যাইয়া যুবতী যবুতী মহিলাদিগকে লেখাপড়া ও শিল্পকার্য শিক্ষা দিয়া থাকেন। লিবিঙ্গস্টোন সাহেবের পত্নী এবং মিসেস সিমসন এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের সাহায্যে ঢাকায় "জাননা সিষ্টাম" (পুরস্ত্রী শিক্ষাপ্রণালী) প্রবর্তিত করিয়া কত লোকের উপকার করিয়া শেষ করা যায় না। এই স্কুলের ছাত্রীরা অনেক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়ত্রী পদে নিযুক্ত হওয়াতেও অনেক উপকার হইতেছে। আজিকালি অনেকস্থলে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে বটে কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষয়ত্রীর অভাবে অচিরাৎ তাহা উঠিয়া যাইতেছে। ফিমেল নর্মাল স্কুল সেই অভাব নিরাকরণের একমাত্র স্থান। এই আলোচনা করিয়াই মিস মেরী কার্পেন্টির এদেশে বাহুল্য রূপে ফিমেল নর্মাল স্কুল স্থাপন করিতে ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন তদনুসারে সম্প্রতি গবর্নমেন্ট প্রধান প্রধান কতিপয় স্থান নূতন নূতন ফিমেল নর্মাল স্কুল স্থাপনে হইয়া এক্ষণ উঠিয়া যাওয়ার প্রস্তাব হইতেছে।

আমরা কর্তৃপক্ষকে নির্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করি যদি ঢাকা ফিমেল নর্মাল স্কুলের কোন দোষ থাকে, তাহা দূরীভূত করিয়া যাহাতে ইহা স্থায়ী থাকিতে পারে তাহারই চেষ্টা করুন। বিদ্যালয়টি একেবারে উঠাইয়া দিলে অনিষ্ট ভিন্ন কোন ইষ্ট লাভ হইবে না।[২১]

"ঢাকার ফিমেল নর্মাল স্কুল নিয়া মন্দ এক গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। ইহার সমুদয় বিবরণ বোধ হয় পাঠকবর্গ অবগত নন। ঢাকায় এরূপ বিদ্যালয় টিকিবে কিনা, পূর্বে গবর্নমেন্টের তাহাতে অনেক সন্দেহ ছিল। অতএব তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য প্রথমে এক বৎসরের নিমিত্ত এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এক বৎসর উত্তীর্ণ হইলে, গবর্নমেন্ট পুনরায় গত ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত রাখার অনুমতি দেন। সম্প্রতি সে কালও অতীত হইয়াছে। অতএব দক্ষিণ পূর্ব বিভাগের বর্তমান স্কুল ইন্সপেক্টর সাহেব, এই স্কুলের জন্য মাসিক আরও দেড় শত টাকা চাহিয়া উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট এক পত্র লিখেন। তাহাতে কতকগুলি নূতন নিয়মেরও প্রস্তাব করা হইয়াছিল। তদুত্তরে গবর্নমেন্ট অধিক টাকা দেওয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু গতবর্ষে যে দেড় শত টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যতে থাকিবে, কি স্কুলের কার্য জানুয়ারি হইতে বন্ধ করা হইবে সে বিষয় কিছু লিখেন নাই : অতএব ইনস্পেক্টর সাহেব সন্দেহাকুল হইয়া এ বিষয়ের কোন প্রকার স্পষ্ট আদেশের জন্য বিদ্যাধ্যাপনার ডিরেক্টর সাহেবকে পত্র লিখেন। ডিরেক্টর সাহেব ইহার উত্তরে লিখিয়াছেন দ্বিতীয় আদেশ পর্যন্ত এই দেড়শত টাকা স্থিরতর থাকিবে। কিন্তু পরে ইহার কি হয়, আমরা বলিতে পারি না। যাহা হউক তদ্বিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহাতে মৌনাবলম্বন বিধেয় নয়। আমরা এক্ষণ গবর্নমেন্টের যেরূপ বিবেক শূন্য শিক্ষা সংক্রান্ত রাজনীতি দর্শন করিতেছি, তাহতে ভবিষ্যতের জন্য এই দেড় শত টাকা স্থিরতর থাকিবে এরূপ ভরসা হইতেছে না। শিক্ষা বিভাগের যে সকল ব্যয় চিরস্থায়ী বলিয়া গবর্নমেন্ট স্থির প্রতিজ্ঞ ছিলেন, আজকাল তাহা ধরিয়াই টানাটানি আরম্ভ করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় প্রস্তাবিত বিষয়ের কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? কিন্তু যদি এই স্কুলটির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, তবে আমরা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিব। এই স্কুলটি এবালিশ করিয়া দেড়শত টাকা বাঁচান হউক, আমরা একথা কোন মতেই অনুমোদন করিতে পারি না। আমাদের গবর্নমেন্ট শিক্ষার প্রতি যেরূপ অনুকূল, একবার বিদ্যালয়টি উঠিয়া গেলে যে আর কখনও তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবে, স্বপ্নেও এরূপ কল্পনা করা যায় না। অতএব ইহার মূলে যেন গবর্নমেন্ট কুঠারাঘাত না করেন। অনেকদিন হইল ইংরাজি নর্মাল স্কুল এবালিশ হইয়া গিয়াছে। অর্থের অনটন হইলে তাহার টাকাগুলি এদিকে আনয়ন করা যাইতে পারে। আমাদের ইনস্পেক্টর সাহেব যে মাসিক ৩০০ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক উপযুক্ত প্রস্তাব। গবর্নমেন্ট যদিও আমাদের এ সকল কথায় কর্ণপাত না করেন, অন্ততঃ যে দেড় শত টাকা এক্ষণ ব্যয়িত হইতেছে, তাহাই রাখিয়া দিন। মাসিক দেড় শত টাকার অধিক লাভও হইবে না, মধ্য হইতে স্ত্রীশিক্ষার একটি সোপান ভঙ্গ করা হইবে। আমাদের ইন্‌স্পেক্টর সাহেব যে সকল নিয়মের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহারও অধিকাংশই আমরা অনুমোদন করি। ইহাতে যে সকল অভাব লক্ষিত হয়, ডেপুটি ইনস্পেক্টর, ইনস্পেক্টর ও স্থানীয় প্রধান প্রধান লোকের মত লইয়া গবর্নমেন্ট কেবল এতদিন ইহার কথঞ্চিৎ ব্যয় নির্বাহ মাত্র করিয়াছেন, কিন্তু উন্নতি কিরূপ হইতে পারে, তৎপ্রতি দৃকপাত করেন নাই। যদি ইহার প্রতি গবর্নমেন্টের বিশেষ দৃষ্টি থাকিত, তবে যে এ অঞ্চলীয় নারীজাতির এক মহৎ পরিবর্তন ঘটিত, তাহাতে সন্দেহ মাত্র ছিল না।[২২]

ঢাকায় যুবতী বিদ্যালয় :

এক্ষণে বালক বিদ্যালয়ের ন্যায় নানা স্থানে বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে বটে কিন্তু উল্লিখিত (বর্তমান বাংলাবাজার গার্লস স্কুল) একটা ভিন্ন আর কুত্রাপি যুবতী বিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হয় যুবতী বিদ্যালয় সংস্থাপনের উপকারিতা বিষয়ে অনেকে সন্দিহান

আছেন বলিযাই কেহ তৎসংস্থাপন বিষয়ে ঔদাসীন্য পরিহার করিতেছেন না। ....দেশীয় বিদ্যানুরাগী মহোদয়গণকে এই অনুরোধ করিতেছি, তাহারা কেবল বালক ও বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন বিষয়ে মনোযোগ বিধান করিতেছেন, যুবতী বিদ্যালয় স্থাপন বিষয়েও সেইরূপ বা ততোধিক যত্নশীল হউন। শীঘ্রই দেশের অবস্থা বিষয়ে যুগান্তর দেখিতে পাইবেন।...[২৩]

ঢাকার যুবতী বিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেকের অনেক প্রকার দূষিত সংস্কার আছে। অনেকে মনে করেন, উহা কেবল নাম মাত্র, উহাতে কেহই অধ্যয়ন করে না। কর্তৃপক্ষকে প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত মিছামিছি কয়েক জন যুবতীর নাম লিখিয়া একখানি রেজেস্টর বহি রাখা হয়। কেহ কেহ এরূপও মনে করেন, উক্ত বিদ্যালয়ে কয়েকটি যুবতী একত্রিত হন বটে, কিন্তু লেখাপড়া শিক্ষাকরণোদ্দেশ্যে নয়। এটি সাধারণের বিশেষত কেবল হাস্য পরিহাস ও আহ্লাদ আমোদ করিয়া থাকেন। এটি সাধারণের বিশেষত পুরুষ জাতির দর্শনীয় নয় বলিয়াই এতৎসম্বন্ধে নানা লোকের নানা সংস্কার জন্মিয়াছে সন্দেহ নাই। এতদিন এ বিষয়ে আমাদের বাক্য ব্যয় করা তত উচিত বোধ হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি যেরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহাতে আবাম্মুখ থাকা উচিত বোধ হইতেছে না। সেই ঘটনাটি এই অত্রত্য কোন ব্যক্তি আগমাদিগের কমিস্যনর সাহেবকে জ্ঞাপন করিয়াছেন, "যুবতী বিদ্যালয়ের সবৈবমিথ্যা। উহা কেবল গবর্নমেন্ট হইতে কতকগুলি টাকা গ্রহণ করিবার একটি অভিসন্ধি মাত্র। বাস্তবিক উহাতে শিক্ষার্থিনী নাই, কোন ইউরোপীয়া বিদ্যোৎসাহিনী মহিলা ঐ বিদ্যালয় দেখিতে চাহিলে পূর্বে তাহার তত্ত্ব পাইয়া কতগুলি যুবতীকে শিক্ষার্থিনীরূপে প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। তাঁহারা (ইউরোপীয়ারা) পুস্তকধারিণী যুবতীদিগকে দেখিয়াই মনে করেন, যথার্থই বুঝি তাহারা শিক্ষার্থ তথা সমবেত হইয়া থাকে। তাঁহারা বাংলা ভাষা জানে না, সুতরাং অতি সহজেই প্রতারিত হন।" কমিস্যনর সাহেবের প্রত্যয়ার্থ ইহাও বলা হইয়াছে, "যদি যুবতী বিদ্যালয়টি প্রতারণাকাণ্ডই না হইবে, দর্শনার্থিনীদিগের পূর্ব তত্ত্ব দিবার নিয়ম প্রচলিত থাকিবে কেন? পূর্বে সংবাদ না দিয়া যাওয়ার নিয়ম না থাকাতে কি এই অর্থ সহজেই উদ্ভাবিত হয় না, ঐ অবকাশে ... যুবতীকে একত্র করিয়া ছাত্রী স্বরূপ প্রদর্শন করা হয়? কমিস্যনর সাহেব এইরূপ কথায় বিশ্বাস করিয়া স্কুল ডেপুটি ইনস্পেক্টর মহাশয়কে উহার সত্যাসত্যতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ডেপুটি বাবু কি উত্তর প্রদান করিয়াছেন, এবং কমিস্যনর সাহেবের সংস্কারই বা তাহাতে কতদূর অপনীত হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত বলিতে পারি না।

যিনি যাহাই বলুন, যুবতীবিদ্যালয় সম্বন্ধে আমরা নিতান্ত অনভিজ্ঞ নই। উহাতে এরূপ কোন কোন লোক সংসৃষ্ট আছেন, যাঁহাদিগকে ক্ষণকালের নিমিত্তও আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না। তাঁহাদিগের কেহ কেহ নিজ হইতে এজন্য অনেক টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। গবর্নমেন্ট এই বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ৩০ টাকা সাহায্য প্রদান করেন, এবং স্থানীয় চাঁদা ২০ কুড়ি। কিন্তু মাসে মাসে গড়ে প্রায় ৬০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। সুতরাং প্রতি মাসেই কোন কোন ব্যক্তিকে অতিরিক্ত ব্যয় প্রদান করিতে হয়। যাঁহারা এতদুদ্দেশ্যে আপনা হইতে ব্যয় স্বীকার করিতেছেন, তাঁহারা প্রবঞ্চনোদ্দেশ্যে উহার সংস্থাপন করিয়াছেন, একথা কি বিশ্বাস করা যাইতে পারে? অধিকন্তু আমরা এই বলিতে পারি, ভূতপূর্ব জজ ও ইনস্পেক্টর সাহেবের মেম প্রায়ই এই বিদ্যালয়ের পরিদর্শন করিতেন, কলেজের প্রিন্সিপল শ্রীযুক্ত ব্রেনেন্ট সাহেবের মেম এবং অধুনাতন জজ সাহেবের মেমও মধ্যে মধ্যে পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা (বাংলা ভাষা না জানিলেও) কি এমনই নির্বোধ বিদ্যালয়টি ফাঁকি কি যথার্থ তাহা বুঝিতে পারেন নাই?...[২৪]

বিজ্ঞাপন : ১৮৭০ :

ঢাকার অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষার তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রীদিগের মধ্যে যিনি সাহিত্যের পরীক্ষাতে প্রথম হইবেন, তাঁহাকে ৪ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

আমরা সাতিশয় কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে শ্রীযুক্ত বাবু রামপ্রসাদ সেন (ডাক্তার) মহাশয় ঢাকার অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার ছাত্রীদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত ধর্ম বিষয়ক পুস্তকের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ প্রথম ছাত্রীকে ৬ টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন। ছাত্রীদিগের মধ্যে যাঁহারা এই পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক তাঁহারা আমাদিগকে আশ্বিন মাস মধ্যে অবগত করাইবেন। এই পরীক্ষাও পৌষ মাসে গৃহীত হইবে।

নির্বাচিত পুস্তক।
স্ত্রীর প্রতি উপদেশ
নির্মলার উপাখ্যান

২৬ শ্রাবণ — ঢাকার অন্তঃপুর
১২৭৭ সন — স্ত্রীশিক্ষা সভা।[২৪]

ঢাকা ইডেন ফিমেল স্কুল/কলেজ :

ঢাকায় ব্রাহ্ম বালিকাদের জন্য যে পাঠশালা স্থাপিত হয়, পরবর্তীকালে সেই পাঠশালাই রূপান্তরিত হয় ইডেন স্কুলে। ১৮৭৮ সালে মেয়েদের মিডল ভার্নাকুলার স্কুল হিসাবে বিদ্যালয়টির যাত্রা শুরু হয়েছিল। তখন বাংলার লেঃ গভর্নর ছিলেন স্যর অ্যাশলি ইডেন। তিনি ছিলেন শিক্ষানুরাগী। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিদ্যালয়টির নামকরণ হয় ইডেন ফিমেল স্কুল।

"আমরা সাতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, "ঢাকা ইডেন ফিমেল স্কুলের" প্রায় সমস্ত অভাবই একে একে দূর হইতে চলিল। ইহার উৎকৃষ্ট বাটি, উপযুক্ত পরিমাণ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী, উৎসাহদাতাও পরিদর্শকের অভাব অনেকদিন হইতেই নিরাকৃত হইয়াছে। এতদিন কেবল যথোপযুক্ত যানাদির অভাবে শিক্ষার্থিনী বালিকা ও যুবতীগণের স্কুলে যাতায়াতের তত সুবিধা ছিল না। কিন্তু সংপ্রতি উপরিউক্ত স্কুল কমিটির অন্যতর মেম্বর ধনীপ্রবর বাবু রঘুনাথ দাস সে অসুবিধাও দূর করিতেছেন। অনুরোধক্রমে, তদর্থ তিনি ১০০০ (এক হাজার) টাকা এককালীন দান করিতে অঙ্গীকার করিতেছেন। এই টাকা দ্বারা একখানি "অমনিবাস গাড়ি" ও ছয়টি ঘোটক ক্রয় করা হইবে ; ২০টি বালিকা অনায়াসে বসিতে পারে প্রস্তাবিত গাড়িতে তদুপযুক্ত স্থান থাকিবে। এত নিবন্ধন শুদ্ধ উক্ত স্কুলের মেম্বরেরা নহেন ঢাকার সর্বসাধারণই রঘুবাবুকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিবেন সন্দেহ নাই। আমরা বেশ জানি, অনেকের স্বস্ব কন্যাগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে বলবতী বাসনা রহিয়াছে। কিন্তু স্বকীয় ব্যয়ে যানাদিযোগে তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে পারেন না; স্কুলের উপযুক্ত পরিমাণ গাড়ি না থাকায় প্রতিদিন তাহাদিগকে লইয়া যাইতে পারে না। সুতরাং তাহাদের হৃদয়ের বাসনা হৃদয়েই থাকিয়া যায়। সংপ্রতি রঘুবাবুর বদান্যতায় যানাভাব বিমোচিত হইলে, স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী অভিভাবকদিগের আর আহ্লাদের সীমা থাকিবে না বলা বাহুল্য।

বালিকাদিগের যাতায়াতের সুবিধা হইল বটে, কিন্তু তাহাদের শিক্ষা বাসনা বাসনানুরূপ ফলো পধায়িনী হইতেছেন না বলিয়া যে সময়ে অনেকেই আক্ষেপ প্রকাশ করিতে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা দূরগত হইল না। আমরা জানি, এই স্কুলটির নিমিত্ত গভর্নমেন্টের ও দেশীয় বদান্যগণের যথেষ্ট অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। প্রধান শিক্ষায়িত্রী ও পরিদর্শিকা বিনাব্যয়ে বাসযোগ্য সুরমৎ অট্টালিকা পাইয়াও মাসিক ১৬০ টাকা বেতন পাইতেছেন। ইহা ভিন্ন দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শিক্ষয়িত্রী ক্রমে ৫০, ৩০, ১৫, এবং ইংরাজি শিক্ষক ৪০ ও পণ্ডিত ২০ টাকা মাসে মাসে গুনিয়া লইতেছেন অর্থাৎ এই স্কুলের জন্য সাকুল্যে মাসে প্রায় ৪০০ টাকা করিয়া গভর্নমেন্টের ব্যয় হইতেছে। কিন্তু এত ব্যয় ফল কি হইতেছে। যদি অনুসন্ধান করা যায় কোন রূপেই সন্তোষ

লাভ করিতে পারা যায় না। অনেকেরই বিশ্বাস অধিকাংশ শিক্ষয়িত্রী দ্বারা সূচারুরূপে অধ্যাপনা কার্য নির্বাহিত হইতেছে না। স্কুল কমিটি হয়ত ইহা বুঝিতে পারিয়াই তদর্থ দুইজন শিক্ষক নিয়োজিত রাখিয়াছেন। এই শিক্ষকদিগের দ্বারাই বালিকাদিগের যাহা কিছু শিক্ষা হইতেছে। "তবে লম্বা বেতন দিয়া শিক্ষয়িত্রী রাখিবার প্রয়োজন কি?"— কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন। তদুত্তরে আমরা শ্রুতুক্তি প্রমাণে এইমাত্র বলিতে পারি, শিক্ষয়িত্রীদিগের অনেকেই খ্রিস্টিয়মন্ত্রে দীক্ষিতা বলিয়া কর্তৃপক্ষ এই উপলক্ষে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন। স্কুলে কমিটির স্বাধীনচেতা মেম্বারগণ এ বিষয়ে আজও নির্বাহ নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন কেন, আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাহাদিগের সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যদি বর্তমান শিক্ষয়ত্রীগণ দ্বারা সুচারুরূপে কার্য সম্পাদিত না হয়, অবিলম্বে কমিটি তাহাদিগের স্থলে উপযুক্ত লোক নিয়োজনে দৃঢ়যত্ন হউন। যদি একান্তই উপযুক্ত শিক্ষায়িত্রী প্রাপ্ত হওয়া না যায়, সচ্চরিত্র সুযোগ্য শিক্ষকগণকেই নিয়োজন করা হউক। যে স্থলে দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত করিতে আপত্তি হয় নাই, তথায় যাবতীয় শিক্ষায়ত্রীর পরিবর্তে সুযোগী সচ্চরিত্র শিক্ষক নিয়োগের বাধা কি? কমিটি যদি শিক্ষাদান কার্যের উৎকর্য সাধন করাইতে না পারেন, স্কুলের কেবল বাহ্য অভাব নিরাকরণে ও বাহ্য সুবিধা বিধানে কি ফল হইবে? [২৫]

প্রথমে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪৭ জন। পরে বাড়তে থাকে। ১৯২৫ খ্রিঃ বিদ্যালয়ের ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস চালু হলে পরিণত হয় উচ্চমাধ্যমিক মহাবিদ্যালয়ে। এখানে মানবিক, গার্হস্থ্য, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল। একটি ছাত্রী নিবাসও ছিল। ১৯৩৬-৩৭ সাল পর্যন্ত মহাবিদ্যালয় ছিল একটি ভাড়া বাড়িতে। ১৯৪৫ খ্রিঃ নিজস্ব ভবন ইডেন বিল্ডিং-এ মহাবিদ্যালয় স্থানান্তরিত হলেও, দেশভাগের পর ১৯৪৭ খ্রিঃ ইডেন বিল্ডিং পরিণত হয় পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সচিবালয়ে। বকসিবাজারে সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত হয় মহাবিদ্যালয়। পরে আজিমপুরে নবনির্মিত ভবনে ইডেন কলেজের ক্লাস শুরু হয়। বর্তমানে ঢাকা মহানগরীতে এটি একমাত্র সরকারি মহিলা কলেজ। বিজ্ঞানসহ অন্যান্য বিষয়ে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আছে। অর্থনীতি, ইতিহাস, বাংলা এবং গণিতে অনার্স ক্লাস খোলা হয় ১৯৬২ খ্রিঃ। কয়েকটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পঠন-পাঠনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন রয়েছে।

ঢাকা বাংলাবাজার ব্রাঞ্চ স্কুল :

ঢাকা বাংলা বাজার ব্রাহ্ম স্কুলটি প্রথম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলেও এর পরিচালনায় ত্রুটি ছিল নানা রকম। ছাত্রেরা একে একে অন্য বিদ্যালয়ে চলে যেতে থাকে। কারণ শিক্ষকরা পঠন পাঠনে ছিলেন অমনোযোগী। তাদের বেতন ছিল খুবই কম। নিজেদের মধ্যে গোলযোগ মাঝে মাঝে তীব্র হয়ে উঠত। উপযুক্ত ফান্ড থাকা সত্বেও সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে উঠে যাওয়ার উপক্রম হত।

"বিদেশিয় পাঠকবর্গ আমাদের এই বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া হয়ত মনে করিবেন এই বিদ্যালয়টা অতি উৎকৃষ্ট, ইহার যখন এত আয় এবং গভর্নমেন্ট মাসে মাসে ইহাতে ৬০ টাকা সাহায্য দান করিয়া থাকেন, তখন এটি অবশ্যই একটি উন্নত ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন বিদ্যালয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আজি আর ইহার সে অবস্থা, সে শ্রী নাই, আজিকালি ব্রাঞ্চ স্কুলে গমন করিলে ব্যথিত হৃদয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। তথায় গেলেই দেখিবে কোন শ্রেণীতে কেবল শূন্য কাষ্ঠময় আসনগুলি পড়িয়া রহিয়াছে। কোন শ্রেণীতে দুই তিনটি ছাত্র বসিয়া আপনাদের দুর্ভাগ্যের কথোপকথন করিতেছে। কোন শ্রেণীতে বা শিক্ষক মহাশয় বিষণ্নবদনে অন্য বিদ্যালয় গমনোন্মুখ শিষ্যমণ্ডলীকে নানা প্রকারের প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা দান করিতেছেন। বাস্তবিক গতপূর্ব সপ্তাহে, বিদ্যালয়টার এমন দুরবস্থা ঘটিয়াছিল যে তাহা দেখিয়া আমরা এক মুহূর্তের জন্যও ইহার পুনর্জীবনের আশা করিতে পারি নাই। অনেক ছাত্র হতাশ হইয়া অন্যান্য স্কুলে প্রবেশ করিতেছে, এমন কি বোধ হয় কোন কোন শিক্ষকও জীবিকা নির্বাহ ভঙ্গ ভয়ে স্বাভাবিক ত্রাস পরায়ণ হইয়া

অন্য বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার চেষ্টা করিতেও ত্রুটি করেন নাই। যাহা হউক ক্রফট সাহেব সম্পাদক হইয়াছেন পর পুনর্বার ইহার জীবনাশা বৃদ্ধি পাইয়াছে। শুনিলাম উক্ত সাহেব মহোদয় কখনও বিদ্যালয়টির সম্পাদকের মুখদর্শন করেন নাই। সেদিন ক্রফ সাহেব বিদ্যালয়টির অবস্থানুসন্ধান ও তৎসঙ্গে ছাত্রবর্গের উৎসাহ বর্ধনার্থ ব্রাঞ্চ স্কুল দেখিতে গিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে তাহার মনে কিরূপ সংস্কারের উদয় হইয়াছে তাহা তিনিই জানেন। আমরা ঢাকা জনসাধারণের পক্ষ হইয়া বিদ্যালয়টির দুরবস্থার কতকগুলি কারণ প্রকাশ করিতেছি ভরসা করি সম্পাদক ক্রফট সাহেব এদিকে একটুকু মনোযোগ বিধান করিবেন।

শিক্ষক যতই বিদ্বান হউন না কেন, স্থায়ী হইবার আশা না থাকিলে কখনই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য যত্নবান হন না। শিক্ষকগণ যদি কোন উদ্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য অহোরাত্র নিজের পাঠ্য পুস্তক পঠনেই ব্যাপৃত হইয়া পড়েন, তবে সুন্দর করিতে পারিবেন তাহার আশা কি? ব্রাহ্ম স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিয়োগ সময়ে নিয়োগ কর্তা একটি প্রধান ভ্রমে পতিত হইয়া কেবল এম.এ. পরীক্ষার্থী বি. এ. উপাধীধারীদিগকেই নিযুক্ত করিতেন। শিক্ষক মহাশয় নিজেই একটি গুরুতর পরীক্ষার পরীক্ষার্থী, সুতরাং দিবারাত্র এমন কি একটু সুবিধা পাইলে স্কুলের সময়েও কেবল নিজ পাঠ্য পুস্তকেই মস্ত দৃষ্টি হইয়া থাকিতেন। স্কুলের অধ্যাপনা ও তত্ত্ববধানাদি তাহার অতিরিক্ত কার্য বলিয়া বোধ হইত। কেবল ইহাও নয় শিক্ষকগণ যদি এক একজনে অন্ততঃ তিনচারি বৎসব করিয়াও স্থায়ী থাকিতেন তথাপি স্কুলের প্রতি তাহাদের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অনুরাগ জন্মিতে পারিত। কিন্তু তাহা কোথায়। ব্রাহ্ম স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ ধূমকেতুবৎ আজি উদিত হইয়া স্কুলের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া কল্যই কার্যান্তরে নিযুক্ত হইলেন। গত পনের বৎসরে উক্ত বিদ্যালয়ে ৯/১০ জন প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রধান শিক্ষকগণের এইরূপ অমনোযোগিতা ও অস্থায়িতা বশতঃই কয়েক বৎসর হইতে বিদ্যালয়টি প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল যৎপরোনাস্তি অসন্তোষজনক হইতেছে। বাহিরের ছাত্রগণে সাধ্যসত্তে কেহই এই স্কুলে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হয় না।

প্রধান শিক্ষকের বেতন অতি অল্প। বি. এ. বা এম. এ. উপাধিধারী কোন ভাল সুশিক্ষিতই মাসিক ৪০ টাকা বেতনে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। সুতরাং প্রধান শিক্ষককে অন্যদিকে তাকাইতে হয়। ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণের মধ্যে যে এত পরিবর্তন, বেতনের অল্পতাই তাহার কারণ। আমরা ক্রফট সাহেবকে অনুরোধ করি উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা পদের বেতন বর্ধিত করিয়া দিউন। নচেৎ স্থায়ী শিক্ষক পাওয়া দুর্লভ হইবে।

শিক্ষকের অল্পতাও বিদ্যালয়ের অনুন্নতির অন্যতম কারণ। যথোচিত ছাত্র এবং আয় সত্ত্বেও যদি কার্পণ্য বশতঃ অল্প শিক্ষক রাখিয়া কোন প্রকারে বিদ্যালয়ের কার্যচালন উদ্দেশ্য হয়, তবে স্কুলের দুর্দশা না ঘটাই অসম্ভব। মান্যবর খাজে আবদুল গনিজ স্কুল ইহার অন্যতম উৎকৃষ্ট উদাহরণ। স্কুলে ছাত্রদিগকে বেতন দিতে হয় না। বিশেষতঃ প্রধান শিক্ষকও একজন বিজ্ঞ ও বহুদর্শী তথাপি কেন সে স্কুলের আশানুসারিনী উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না, একমাত্র শিক্ষকের অল্পতাই কি তাহার প্রধান কারণ নহে? আমরা সন্তুষ্ট হইলাম ক্রফট সাহেব এদিকে মনোনিবেশ করিয়াছেন। তিনি এক দিকে ছাত্র বেতনের হার কমাইয়া যেমন দরিদ্র ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। এটি সুবিবেচনার কার্য হইয়াছে। এই এক সপ্তাহের মধ্যেই উপস্থিত ছাত্র সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। এখন স্কুল উঠিয়া যাইবার বড় ভয় নাই কিন্তু কতদূর আশা আছে তাহাও আমরা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি না।

উপরে যে কয়েকটি কারণ উল্লিখিত হইল, স্কুল সর্বনাশে যাইবার পক্ষে তাহার এক একটি যথেষ্ট। গত সন আর একটি কাণ্ড ঘটিয়া এখানে প্রায় ত্রিদোষ ক্ষেত্রে সান্নিপাতিক উপস্থিত হইয়াছিল। এখন বৈদ্য বিষ বড়ি না দিলে পুনর্জীবনের বড় সম্ভাবনা নাই।

বর্তমানে প্রথম শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে কয়েকজন শিক্ষকের মনোবাদই এই রোগের মূল।

গত সন এই মনোবাদে ঢাকায় এক তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দু হিতৈষিনী পত্রিকার নামে লাইবেল মোকদ্দমায় ঐ মনোবাদ বিশেষরূপে স্ফুটিকৃত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে। এক পরিবারস্থ লোকদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ সংঘটিত হইলে কিরূপ অশান্তি ও দুর্দশার কারণ হইয়া উঠে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। ব্রাঞ্চ স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে মনোবাদ ও বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত হওয়াতেই স্কুলটি ভগ্নাবশেষ ও ছারখার হইবার উপক্রম হইয়াছে। যদি শীঘ্র ইহার কোন প্রতিবিধান না করা যায় তবে সম্পূর্ণ অমঙ্গল সম্ভাবনা। ছাত্রগণ নাকি কোন কোন শিক্ষকের শিক্ষা কার্যে ও আচরণে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। যদি একথা সত্য হয় তবে আমরা ক্রফট সাহেব মহোদয়কে সর্বান্তকরণে অনুরোধ করি, তিনি কিঞ্চিৎ গুঢ় অনুসন্ধান সহকারে ইহার প্রকৃত মূলবৃত্তান্ত অবগত হউন এবং বিবেচনানুসারে ইহার যথোচিত প্রতিবিধান করিতে সচেষ্ট হউন। যে স্কুলে গভর্নমেন্ট মাসিক ৬০ টাকা সাহায্য দেন। এক সহস্র টাকারও অধিক যে স্কুলের আয় রহিয়াছে। নগরীর উপরিস্থ এরূপ একটি প্রসিদ্ধ-উচ্চশ্রেণীর ইংরেজি স্কুল এই সকল তুচ্ছ কারণে উঠিয়া যায় ইহা ঢাকার পক্ষে একটি দুঃখজনক ব্যাপার সন্দেহ নাই। ক্রফট সাহেব এই বিপত্তি সময়ে একটুকু ক্লেশ স্বীকারপূর্বক এই বিদ্যালয়টির জীবন দান করিয়া প্রভূত যশ এবং ঢাকাবাসিগণের আর্শীবাদ লাভ করুন।[২৬]

ঢাকা মাদ্রাসা : *[বর্তমান সংস্করণ ৫৯৮ পৃঃ ৯৬৬ পৃঃ]*

ঢাকা মাদ্রাসা ১৮৭৪ সালে ভারত সরকারের উদ্যোগে স্থাপিত হয়। প্রকৃত নাম শেহসানীয়া মাদ্রাসা হলেও, ঢাকা মাদ্রাসা নামেই পরিচিত ছিল। পাকিস্তান আমলে হাইস্কুলে পরিণত হয়। তার আগে ১৯১৯ সালে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ হিসাবে পরিচিত ছিল। একই সঙ্গে ঢাকা আর রাজসাহীতে মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল। অবশ্য এই মাদ্রাসার জন্ম মহসীন ফান্ডের আর্থিক আনুকূল্যে। কয়েক বছরের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় মাদ্রাসার নিজস্বভবন নির্মিত হয়। অবশ্য ঢাকার নবাব আবদুল গনিসহ বিশিষ্ট শহরবাসী মুসলিমরা ঢাকায় একটি মাদ্রাসা স্থাপনের দাবি জানান সরকারের কাছে। মাদ্রাসার প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দি সোহরাওয়ার্দি (১৮৩৪-১৮৮৫)। তারই নাতি হলেন পরবর্তী কালের বিখ্যাত শাহিদ সোহরাওয়ার্দি।

স্থানাভাবের কারণে প্রথমে মাত্র ১৬৯ ছাত্র এখানে লেখাপড়ার সুযোগ পায়। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে অ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ খোলার পর ছাত্র সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে। ফলে স্থান সংকুলান না হওয়ায় নতুন ভবনের প্রয়োজন দেখা দেয়। নতুন ভবনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে জানা যায় ঃ "গত শনিবার ঢাকা মাদ্রাসার নব প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে। ঢাকার প্রায় যাবতীয় সিবিলিয়ান ও ইউরোপীয়গণ এবং সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় রমণী সকল ও নবাব খাজে আবদুল গনি প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ও মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। সভাগৃহ বিলক্ষণ সুসজ্জিত ও সুরম্য হইয়াছিল। ঢাকার প্রতিনিধি কমিস্যনর মিঃ বিমস সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল ও মাদ্রাসা কমিটির সেক্রেটারি মিঃ পোপ সাহেব মাদ্রাসার সৃষ্টি ও মহম্মদ মোশনের (মহসীন) বিষয়ে একটি অনতিদীর্ঘ রিপোর্ট পাঠ করেন। সেই রিপোর্টে অবগতি হইল, "এই স্বল্পকাল মধ্যেই ঢাকা মাদ্রাসার সমধিক উন্নতি সংঘটিত হইয়াছে। বহুতর ছাত্র ঢাকা মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করিতেছে। পারসি ও আরবীর ন্যায় ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থ ও মুসলমান ছাত্রগণ নিতান্ত উৎসুক ও উৎসাহিত। বর্তমান প্রিন্সিপাল মৌলবি ওবেদুল্লা ও তৎসহকারিগণের সমধিক যত্নে ও সুশিক্ষায় ঢাকা মাদ্রাসা আশাতিরিক্ত ফল প্রসব করিয়াছে। রিপোর্ট পাঠ হইলে পর সভাপতি কমিস্যনর সাহেব মহোদয় ছাত্রগণকে নিয়মানুসারে বার্ষিক পুরস্কার প্রদানপূর্বক অতীব মনোহর ও বিজ্ঞতাব্যঞ্জক একটি সুললিত ইংরেজি বক্তৃতা করিলেন, স্থনান্তরে আমরা তাহার সারাংশ প্রকটন করিলাম। ইংরেজি বক্তৃতার পর কমিস্যনার সাহেব, খান উর্দুতে আর একটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা শ্রবণে মুসলমান সম্প্রদায় মিঃ বিমস সাহেবের

পাণ্ডিত্যে অত্যন্ত মোহিত হইয়াছিলেন। ...বাস্তব একজন উর্দু মৌলবী হইতে যাহা আশা করা যায় কমিস্যনর সাহেবের বক্তৃতা ঠিক তদনুরূপ হইয়াছিল। অনন্তর নবাব খাজে আসানুল্লা খাঁ বাহাদুর, গভর্নমেন্ট ও কমিস্যনর সাহেবকে এবং মৌলবি গোলাম মস্তাফা খাঁও যৎপরোনাস্তি আনন্দ সহকারে কমিস্যনর সাহেবকে প্রশংসা করিলে পর একজন মৌলবি কতিপয় পারসি কবিতা পাঠ করিয়া সভাপতিকে অভিনন্দিত করেন। সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে সভাভঙ্গ হয়। মাদ্রাসা গৃহের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এক পক্ষে গভর্নমেন্টের অন্যতঃ মুসলমান সম্প্রদায়ের উৎসাহ দেখিয়া সাধারণত বিলক্ষণ পরিতুষ্ট হইয়াছেন। [২৭]

"আমরা ঢাকা প্রকাশে ঢাকা মাদ্রাসা স্কুলে এন্ট্রেস ক্লাশ খুলিবার প্রস্তাবনা করিয়াছিলাম। গবর্নমেন্ট সেই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া শীঘ্রই এন্ট্রেস ক্লাশ খুলিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। সম্প্রতি ২৫/২০ টাকা বেতনে দুইটি মুসলমান মাস্টার নিযুক্ত হইবেন। এই বন্ধের মধ্যেই শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন, পরে নূতন বাটীতে স্কুল গেলে পর উচ্চ ক্লাশের কার্য আরম্ভ হইবে। ঢাকা মাদ্রাসার ইংরাজি ডিপার্টমেন্টের প্রধান শিক্ষক অতীব সুশিক্ষিত, সুদক্ষ ও বহুদর্শী শিক্ষক। তাঁহার যত্নে ও শিক্ষায় ঢাকা মাদ্রাসায় এন্ট্রেন্সের শিক্ষা ও ফল উত্তম হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা। ঢাকা মাদ্রাসার সুপরিনেটডেন্ট মৌলবি ওবেদুল্লা সাহেবের মত উপযুক্ত, বিদ্বান ও ন্যায়পর এবং সচ্চরিত্র লোক মুসলমান সম্প্রদায়ে অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ও হেড মাস্টারের যত্নে স্বল্প দিনের ঢাকা মাদ্রাসার ভূয়সী উন্নতি দেখিতেছি। [২৮]

"অচির প্রতিষ্ঠিত ঢাকা মাদ্রাসার স্বল্পদিনেই ভূয়সী উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। কী আরবি পারসি বিভাগ কী ইংলিশ ডির্পাটমেন্ট সকল স্থলেই সমোৎসাহে বহুল ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। প্রতি বৎসরই ইহার উপাদেয় ফল প্রসূত হইতেছে। কলিকাতার প্রাচীনতম মাদ্রাসাকেও ঢাকা-মাদ্রাসা পশ্চাদবর্তী করিয়াছে। আমরা পূর্ব হইতেই জানি, ঢাকা একটি মুসলমান প্রধান স্থান, ইহাতে মাদ্রাসার উপযোগিতা বিশেষ রক্ষিত হইবে। স্যার জর্জ কেম্বলের বহুবিতান চক্ষে কিছুই অপ্রতিবিম্বিত ছিল না। তিনি, হুগলি কলিকাতার ন্যায় ঢাকা প্রভৃতি কতিপয় স্থানে মুসলমানদের স্বতন্ত্ররূপে শিক্ষা প্রদানের জন্য মোশন (মহসীন) ফন্ডকে নানাভাগে বিভক্ত করিয়া ঢাকা রাজসাহী ও চট্টগ্রামে এক একটি মাদ্রাসার সৃষ্টি করিয়া যান। কিন্তু ঢাকার ন্যায় অচিরকাল মধ্যে কোন মাদ্রাসাই এতাদৃশী উন্নতি প্রদর্শন করিতে পারে নাই।

ঢাকা মাদ্রাসার বহুল মুসলমান ছাত্র নানা দিগদেশ হইতে আগত হইয়া অধ্যয়ন করিতেছে। ঢাকা মাদ্রাসার অধ্যাপনার রীতি ও উন্নতিই তাহার প্রধান কারণ। বিশেষত ঢাকা মাদ্রাসার বর্তমান সেক্রেটারি ঢাকা কলেজের সুযোগ্য প্রিন্সিপাল মিঃ পোপ সাহেব ও অন্যান্য শিক্ষকগণের যোগ্যতায় এই ফল ও উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকগণও অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত কার্য করিতেছেন। বলিতে কি, ঢাকা মাদ্রাসার কিছুই অভাব নাই। বিদ্যাধ্যাপনার ডিরেক্টর প্রতিবারই ঢাকা মাদ্রাসার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। আমরা শুনিতে পাইতেছি ঢাকা মাদ্রাসায় অত্যধিক ছাত্র হওয়ায় বর্তমান নবনির্মিত সুরম্য প্রাসাদে স্থানাভাব ঘটিতেছে। শীঘ্রই ইহার অংশত বৃদ্ধি নিতান্ত প্রয়োজনীয় দেখিতেছি।

বিদ্যাধ্যয়নের ডাইরেক্টর মিঃ ক্রুপট সাহেব অতি অল্প দিনেই ঢাকা মাদ্রাসার ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের সমাধিক উন্নতি দেখিয়া এবং মুসলমান ছাত্রদের ইংরেজি পড়িতে নিতান্ত উৎসাহ জানিয়া সম্প্রতি এন্ট্রেন্স ক্লাস খুলিবার আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। আমারও পূর্বে অনেকবার ঢাকা মাদ্রাসার এন্ট্রেন্স ক্লাসের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছিলাম। সম্প্রতি তাহা কার্যে পরিণত হইয়াছে। ছাত্র সংখ্যার আধিক্য হেতু বাবু প্রসন্নকুমার গুহ বি.এ. সম্প্রতি অন্যতম শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। এন্ট্রেন্স ক্লাসের কার্য আরম্ভ হইয়াছে।

ঢাকা মাদ্রাসায় মুসলমান ছাত্রদের অধ্যয়ন করিবার জন্যও সবিশেষ সুবন্দোবস্ত দেখিতে পাই। বিদেশিয় ছাত্রদের তথায় থাকিয়া অধ্যয়ন করিবার জন্য একটি বোর্ডিং অর্থাৎ ছাত্রনিবাস

আছে। এই ছাত্রনিবাস অতিরমনীয়। মাসিক দেড় টাকা ফি দিলেই ছাত্ররা (খাবার) ও অবস্থান প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদিগকে স্বতন্ত্ররূপে আর বেতন দিতে হয় না। বিনা বেতনেই অধ্যয়ন করিতে পারে। ছাত্রদের সুবিধার জন্য আরবি বিভাগে ছটি এবং ইংলিশ বিভাগে ২টি স্কলারসিপ রহিয়াছে। প্রতি বৎসর অন্যান্য স্কুল ও কলেজের ন্যায় ইহাতেও পুরস্কার বিতরিত হইয়া থাকে। এই সকল সুচারু বন্দোবস্ত ও অধ্যাপনায় ঢাকা মাদ্রাসায় বহুসংখ্যাক ছাত্র নিত্য প্রবেশ করিতেছে।[২৯]

জানা যায় ১৮৮৩ সালে ঢাকা মাদ্রাসায় যে ৩৩৮ জন ছাত্র ছিল তার মধ্যে ১০২ জন ছিল অ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগের। তারা ফাইনাল এন্ট্রান্স পরীক্ষায়ও কৃতিত্ব দেখায়।

"মাদ্রাসা স্কুলের ছাত্রগণের পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে গত সোমবার একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ঢাকাস্থ ইংরাজ ও দেশীয় প্রধান ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। মাননীয় কমিশনার শ্রীযুক্ত স্যাভেজ বাহাদুর সভাপতি হইয়াছিলেন। ছাত্রগণ আরবি পারসি ও ইংরাজি রচনা পাঠ করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত স্যাভেজ বাহাদুর এই উপলক্ষে যে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা বহু প্রশংসারযোগ্য। তাঁহার বক্তৃতায় একটি কথা এই ছিল যে, মুসলমান ছাত্রগণ শুধু আরবি পারসিতে লিপ্ত থাকিলে চলিবে না, কার্যক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে ইংরাজি শিক্ষা করা তাহাদের প্রধান কর্তব্য। মুসলমানগণ বলিয়া থাকে যে, তাহাদিগকে উপযুক্ত পরিমাণে চাকরি দেওয়া হয় না; কিন্তু অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, মুসলমানকে চাকরি দেওয়ার সঙ্কল্প করিয়াও উপযুক্ত মুসলমান প্রার্থী না থাকায় তাহা দেওয়া ঘটে নাই। এইরূপ বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধ বাগ্মী রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরকে বাংলা ভাষায় তাহার বক্তৃতাটির উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। রায়বাহাদুর যদ্যপি ইদানীং সভসমিতিতে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিতে কষ্ট বোধ করেন, তথাপি কমিশনার বাহাদুরের অনুরোধে সংক্ষেপে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহার বক্তৃতার অন্যান্য কথার মধ্যে এই প্রয়োজনীয় কথাটি ছিল যে, বাংলা ভাষা এদেশের মাতৃভাষা। ইহা যেমনই হিন্দুর তেমনই মুসলমানের সম্পত্তি। কিন্তু মুসলমান ছাত্রগণ যে, এই স্বাভাবিক সম্পত্তিটিকে অবহেলা করেন, ইহা অধিকতর ক্ষতিজনক। ইংরাজির ন্যায় বাংলা ভাষা অধ্যয়ন করাও মুসলমান ছাত্রগণের অতি আবশ্যক। এতগুলি ভাষা শিক্ষা করা যে কঠিন তাহা নহে। ইহার প্রমাণ কমিশনার বাহাদুর নিজে দিয়াছেন। তাহাকে এবং সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থী সকলকেই ইংরাজির সঙ্গে গ্রীক, লাটিন, ফরাসি প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হয়। এইরূপ বক্তৃতা যে মুসলমান ছাত্রগণের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও উপাদেয় হইয়াছে তাহা বলাবাহুল্য। আমরা কমিশনার বাহাদুর ও রায়বাহাদুরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।[৩০]

ঢাকায় খাজে আবদুল গনি মিঞা ১৮৬৩ সালে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যালয়টি স্থায়ী ছিল মাত্র ১৭/১৮ বছর। বিদ্যালয়টি সম্পর্কে জানা যায় ঃ

"আমরা শুনিয়া আমোদিত হইলাম, শ্রীযুক্ত খাজে আবদুল গনি মিঞা একটা অবৈতনিক ইংরাজি বাংলা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। এতদ্বারা নির্ধন ও উপায়হীন বালকগণের বিলক্ষণ উপকার দর্শিবে। খাজে আবদুল গনি একজন প্রধান ধনাঢ্য, কিন্তু ঢাকার উন্নতি সাধনার্থ তিনি এই প্রথম সচেষ্ট হইলেন। মনে করিলে খাজে আবদুল গনি অনায়াসে একটা কলেজ সংস্থাপন করিতে পারেন এরূপ স্থলে তিনি যে এতদিন একটা সামান্য বিদ্যালয় সংস্থাপনেও নিতান্ত উদাসীন রহিয়াছিলেন, অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। যাহা হউক এখন মিঞা সাহেবের নিকট বক্তব্য এই প্রস্তাবিত বিদ্যালয়টি যাহাতে চিরস্থায়ী হয়, তৎপ্রতি যেন তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি থাকে।[৩১]

কিন্তু কয়েকবছর বাদেই শিক্ষকের অভাবে বিদ্যালয়ের একটি ক্লাস উঠিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবে সংবাদপত্রের মন্তব্য ঃ

শুনা যায়, অত্রত্য প্রধান জমিদার খাজে আবদুল গণি সাহেব, তাঁহার স্কুলের একটি শ্রেণী

উঠাইয়া দিতেছেন। শিক্ষকের অভাবই ইহার কারণ। অতি অল্প বেতনে একজন শিক্ষক রাখিলেই ক্লাসটি এবালিস করিতে হয় না। খাজে সাহেবের ন্যায় বক্তির ২০/২৫ টাকা স্কুলের জন্য মাসিক ব্যয় করা সম্ভবপর কি অসম্ভবপর, অনেকেই বুঝিতে পারেন। যদি এ বিষয়টি সত্য হয় তবে বড় হাস্যের বিষয়। খাজে সাহেবের অন্যান্য খরচের তালিকা দেখিয়া এ বিষয়টি চিন্তা করিলে হাস্য সংবরণ করা যায় না।[৩২]

মেডিকেল স্কুল :

[বর্তমান সংস্করণের ৬৪৭ পৃঃ দেখুন]

দীর্ঘকাল পূর্ববাংলা ও আসামের ছাত্রদের চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য আসতে হত কলকাতায়। তাছাড়া চিকিৎসার সুব্যবস্থা ঐ বিস্তৃত অঞ্চলের কোথাও বিশেষ ছিল না। ঢাকায় প্রথম ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে যে হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছিল, সেখানে মাত্র ৪০ জন রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। কলকাতার নেটিভ হাসপাতালের শাখা হলেও, এটি পরিচালিত হত জনগণের চাঁদায়। ঢাকার চকবাজারের কাছে ছিল একটি পাগলা গারদ ও জেল হাসপাতাল। তাছাড়া একটি সামরিক হাসপাতালও ছিল। কিন্তু সেখানে সাধারণ মানুষের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

এই অবস্থা প্রতিকারে ঢাকাবাসীদের দাবি ক্রমশ সোচ্চার হয়ে উঠছিল।

"আজিকাল ঢাকায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা কেবল মন্দ হয় নাই। কলিকাতা ব্যতীত বঙ্গদেশের অন্য কোন স্থানই বিদ্যালয় বিষয়ে ঢাকার ন্যায় এত সৌভাগ্যশালী না হইবে। এখানে একটা কলেজ আছে, একটা নর্মাল স্কুল আছে, ২টা ইংরাজী স্কুল আছে, ৩টা বালিকা বিদ্যালয় আছে, একটা যুবতী বিদ্যালয় আছে, একটা ফিমেইল নর্মাল স্কুল আছে, একটা নাইট স্কুল আছে, একটা ব্রাহ্ম বিদ্যালয় আছে এবং কয়েকটি সার্কেল পাঠশালা আছে। এক্ষণে কেবল একটা চিকিৎসা বিদ্যালয়েরই অভাব রহিয়াছে. এই চিকিৎসাবিদ্যালয়ের অভাবে এ প্রদেশের অল্প অনিষ্টের কারণ হয় নাই। ...যাহা হউক, এক্ষণে স্কুল ইনস্পেক্টর মার্টিন সাহেবের নিকট আমাদিগের বক্তব্য এই, তিনি এ প্রদেশে আসিয়া অবধি অনেক বিষয়েই আমাদিগের বিলক্ষণ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এক্ষণে এস্থলে একটা চিকিৎসালয় সংস্থাপিত করিতে যত্নবান হইয়া আমাদিগকে আরো উপকৃত করেন, ইহা নিতান্ত প্রার্থনীয়।"[৩৩]

কিন্তু ঢাকায় মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হতে কয়েক বছর পেরিয়ে যায়। প্রথমে মিটফোর্ড হাসপাতালে মেডিকেল স্কুল শুরু হয় ১৮৭৫সালে। ১৮৮৯ সালে বিদ্যালয়ের জন্য যে স্বতন্ত্র ভবন নির্মিত হয়, তার জন্য ঢাকাবাসীরা দান করেছিল ৬৪ হাজার টাকা। স্কুলে পড়াশোনার মাধ্যম ছিল বাংলা। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কয়েকজন চিকিৎসা বিষয়ক বই লিখেছিলেন বাংলায়।

শিক্ষা সংক্রান্ত বার্ষিক রিপোর্টে ১৮৬৯ খ্রিঃ ঢাকায় একটি মেডিকেল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছিল ঃ

"এবারকার বার্ষিক রিপোর্ট উপলক্ষে এতদঞ্চলীয় শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য কারকেরা শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন প্রস্তাব করিয়াছেন। ... অদ্য তন্মধ্যে কেবল চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপন প্রস্তাবে আমাদিগের মতামত প্রকাশ করা যাইতেছে।—

বিক্রমপুরের স্কুল ডেপুটি ইনস্পেক্টর বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন এবং ঢাকার ডেপুটি ইনস্পেক্টর বাবু অক্ষয়কুমার সেন এতদুভয়ের এই মর্মে রিপোর্ট করিয়াছেন ঢাকায় একটি "মেডিকেল স্কুল" অর্থাৎ চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক। অধুনা সর্বস্থানেই নানা রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইতেছে। এমন স্থান প্রায় নাই যেখানে অধিকাংশ সময়েই কোন না কোন রোগের আধিক্য দৃষ্ট না হইয়া থাকে। কিন্তু ক্ষোভ এই, অধিকাংশ গ্রামেই চিকিৎসা প্রাপ্তির

সুবিধা নাই। এই নিমিত্ত কত লোককে যে বিনা চিকিৎসায় অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হয়, তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন। অতএব যাহাতে ঐ সকল গ্রামের অধিবাসীরা বিনা চিকিৎসায় অকালে মারা না পড়ে—অন্ততঃ সাধারণ রোগ সমূহের প্রতিকার হইতে পারে, তাহার উপায় বিধান নিতান্ত কর্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। অনেক গ্রামেরই এরূপ অর্থ সঙ্গতি নাই, যেখানে বর্তমান নিয়মানুসারে এক একটি সামান্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া তত্তৎ স্থানীয় লোকসমূহের রোগাপণয়ন চেষ্টা হইতে পারে। এজন্য এমন উপায় ধারণ করা আবশ্যক যাহা অনুষ্ঠিত হইলে গ্রাম্য লোকেরা স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসক পাইতে পারে। এতৎ সৌকর্যর্থেই তাহারা ঢাকায় একটি সামান্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে প্রস্তাব করিয়াছেন। শুনিলাম স্কুল ইনস্পেক্টর ক্লার্ক সাহেব উক্ত প্রস্তাবের সারাংশ তাহার রিপোর্টে উদ্ধৃত করিয়া অনুমোদন করিয়াছেন।

স্কুল ডেপুটি ইনস্পেক্টর বৈকুণ্ঠবাবু উল্লিখিত প্রস্তাব কেবল তাঁহার বার্ষিক রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি অত্রত্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটও স্বতন্ত্ররূপে ঐ প্রস্তাব করিয়াছেন। শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রেহাম সাহেবও নাকি উক্ত প্রস্তাবের পোষকতা করিয়া বলিয়াছেন, তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিয়া কমিস্যনর সাহেবকে উক্ত প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবেন। কি উপায়ে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহিত হইবে, বৈকুণ্ঠ বাবু তাহা প্রদর্শন করিতেও ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলেন, ঢাকা বিভাগের প্রত্যেক স্থানীয় মিউনিসিপাল কমিটির (যাঁহাদিগের সহিত এই বিদ্যালয়ের সবিশেষ সম্বন্ধ থাকিবে) উচিত, তাহারা এতৎসংক্রান্ত ব্যয়ের আংশিক ভার গ্রহণ করেন। বৈকুণ্ঠবাবু বলেন, "ঢাকা মিউনিসপাল খণ্ড হইতে মাসিক একশত, বরিশাল হইতে ৫০, ময়মনসিংহ হইতে ৫০, শ্রীহট্ট হইতে ২৫ এবং ফরিদপুর হইতে ২৫ এই আড়াই শত এবং আনুমানিক ছাত্র বেতন দেড়শত মোট এই চারিশত টাকা স্থানীয় আয় হইলে গবর্নমেন্ট আর চারিশত টাকা দিবেন। তবেই মাসিক ৮০০ টাকা আয় হইবে। ইহা দ্বারাই প্রস্তাবিত চিকিৎসাবিদ্যালয়ের কার্যারম্ভ হইতে পারিবে। তিনি আরো বলেন, অত্রত্য মিটফোর্ড হস্পিটালের একাংশ (যে অংশে হাউস সার্জেন বাস করিয়া থাকেন) যদি স্কুলের নিমিত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অত্রত্য সিবিল সার্জেনকে যদি মাসিক একশত টাকা বেতন দিয়া স্কুলের অধ্যক্ষতায় ও সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেনকে ৫০ টাকা বেতন দিয়া কোন বিষয়ের শিক্ষকতায় নিযুক্ত করা যাইতে পারে তাহা হইলে একশত বা দেড়শত টাকা মাসিক বেতনে আর দুইজন নূতন সাব অ্যাসিস্ট্যান্টকে অন্যান্য বিষয়ের নিযুক্ত করিলেই বোধ হয় এক প্রকার কার্য নির্বাহিত হইতে পারে।"

উপরে যেরূপ প্রস্তাবের কথা উল্লিখিত হইল, তদনুযায়ী কার্যানুষ্ঠান হইলে এতদঞ্চলের অনেক উপকার হইতে পারে যদিও ইউরোপীয় চিকিৎসা প্রণালীর প্রতি ইদানীং অনেকেই বীতশ্রদ্ধ এবং তাহাতে অশ্রদ্ধা জন্মিবার অনেকগুলি প্রকৃত কারণও বিদ্যমান আছে ; এবং যদিও ইহা নিশ্চয়, সমগ্র সম্পদ প্রধান চিকিৎসা বিদ্যালয়ে অধিককাল শিক্ষা লাভ করণনান্তর যাঁহারা চিকিৎসারম্ভ করে তাঁহাদিগের চিকিৎসাতেও অনেক ত্রুটি লক্ষিত হয়, সুতরাং প্রস্তাবিত নাম মাত্র চিকিৎসা বিদ্যালয়ে যাহার শিক্ষালাভ করিবে, তাহাদিগের চিকিৎসার প্রতি তত নির্ভর করা যাইবে না ; তথাপি এতদ্দ্বারা একবারেই কোন উপকার হইবে না, ইহা বলা যাইতে পারে না। উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের দ্বারা সামান্য রোগের অনেক প্রতিকার এবং পল্লীগ্রামস্থ অনেকের অচিকিৎসা জনিত মৃত্যুর নিবারণ চেষ্টা হইতে পারে সন্দেহ নাই। পল্লীগ্রামে ডাক্তার প্রাপ্ত হওয়া যায় না বলিয়াই ডাক্তারি চিকিৎসার প্রতি অধিকাংশ গ্রাম্য লোকের বিদ্বেষ ভাব রহিয়াছে, যদি তত্তৎ স্থানে ডাক্তার সুলভ হয়, তাহা হইলে অল্পে অল্পে সেই বিদ্বেষভাবে চলিয়া গিয়া তৎপ্রতি অনেকের অনুরাগেরই সঞ্চার হইবে এবং তদ্দ্বারা সময়ে সময়ে অনেক উপকার হইবে বলা বাহুল্য। অতএব প্রস্তাবিত বিষয়টি কার্যে পরিণত

হয়, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়। কিন্তু এক বিষয়ে আমাদিগের মনে মহতী আপত্তি উত্থিত হইতেছে, তাহা এই...

যখন আয়ের তাদৃক্ সম্ভাবনা নাই, তখন প্রস্তাবিত চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপিত হইলেও তাহার ভাল বন্দোবস্ত হইতে পারিবে না। অর্থাৎ তাহাতে ভালরূপ সুশিক্ষা হইবে না। সেরূপ অল্প শিক্ষা লাভ করিয়া যাহারা বহির্গত হইবে, তাহারা কোন স্থানে যাইয়া সবিশেষ আদর লাভ করিতে পারিবে না। গবর্নমেন্টও এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে সরকারি কোন কার্যে নিযুক্ত করিবেন না। সুতরাং তাহাদিগের এরূপ উপার্জন হওয়া সুকঠিন হইবে, ... বিশেষত এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের এমন কোন বিদ্যা থাকিবে না, যাহার সাহায্যে তাহারা ব্যবসায়ন্তর অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবে। অতএব বিদ্যালয় বলিয়া প্রথম প্রথম যেরূপ হউক, কিছুদিন পরে আর কেহ এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে না। নর্মাল স্কুলের ছাত্রদিগের অর্থোপার্জনের অনেক উপায় আছে। তাহাতে যেরূপ শিক্ষা হয়, তাহা অনেক কার্যেরই উপযোগী। কেবল বিদ্যালয়সমূহের পণ্ডিতী নয়, ওকালতি মোক্তারি, এবং আমলাগিরি, প্রভৃতিতেও নর্মাল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের অধিকার আছে। এতগুলি অধিকার সত্ত্বেও ইদানীং অনেকে নর্মাল বিদ্যালয়ের প্রতি বীতরাগ হইয়া উঠিয়াছেন। প্রস্তাবিত চিকিৎসা বিদ্যালয়ে যাহারা শিক্ষা লাভ করিবে, এক চিকিৎসা ভিন্ন অন্য ব্যবসায়ে তাহাদিগের অধিকার মাত্র থাকিবে না। যখন লক্ষিত হইবে সেই চিকিৎসা ব্যবসায়েও তাহাদিগের তাদৃশী সুবিধা নাই, তখন সে বিদ্যালয়ে কে প্রবেশ করিতে চাহিবে? অতএব উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা নির্দিষ্টরূপ শিক্ষালাভ করিয়া বহির্গত হইলেই নিশ্চিত কোন ব্যবসায় অবলম্বনপূর্বক জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিবে, উল্লিখিত প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে এতদ্বিষয়েরও প্রস্তাব করিয়া অবধারণ করিয়া রাখা উচিত। সে বিষয়টি অবধারিত না হইলে প্রস্তাবিত চিকিৎসা বিদ্যালয় দ্বারা বাসনানুরূপ ফল লক্ষিত হইবে আমাদিগের এরূপ ভরসা হইতেছে না। যদি গ্রাম্য সার্কেল বিদ্যালয় ও সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের ন্যায় স্বল্প ব্যয়ে সার্কেল চিকিৎসালয়ও সাহায্যকৃত চিকিৎসালয়ের প্রণালী প্রবর্তিত হয় এবং সেই সেই চিকিৎসালয়ের কার্য চিকিৎসা বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের নিশ্চিত অধিকার থাকে, তাহা হইলে উল্লিখিত আপত্তির নিরসন হইতে পারে।[৩৪]

ঢাকার জনসাধারণ সভাও এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছিল। ঢাকার বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে গঠিত ছিল এই সভা। সভার আবেদনে সরকার সম্মতি জানালেও, ঢাকার সিবিল সার্জন ডাঃ ওয়াইজ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

"কিছু দিন হইল ঢাকা জনসাধারণ সভার সভ্যগণ ঢাকায় একটি মেডিকেল স্কুল সংস্থাপন জন্য গবর্নমেন্ট আবেদন করেন। গবর্নমেন্ট ঐ আবেদনপত্র চিকিৎসা বিভাগের প্রধান কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া জনসাধারণ সভার সভ্যগণকে জ্ঞাপন করেন যে তাহাদিগের আবেদনপত্র চিকিৎসা বিভাগের কর্তৃপক্ষের বিবেচনার নিমিত্ত প্রেরণ করা হইল। জনসাধারণ সভার সভ্যগণ গর্ভমেন্ট হইতে ঐ সংবাদপ্রাপ্ত হইয়া অত্রত্য কমিশনার সাহেবের নিকট এই মর্মে আর এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন যে তিনি ঢাকায় মেডিকেল স্কুল সংস্থাপন প্রস্তাবে নিজের অভিপ্রায় গবর্নমেন্টে জ্ঞাপন করেন। ঢাকার ভূতপূর্ব একটি সিবিল সার্জেন জনসাধারণ সভাকে আশ্বাস দেন, তিনি ঢাকায় মেডিকেল স্কুল সংস্থাপন বিষয়ে সহায়তা করিবেন। যাহা হউক, অত্রত্য কমিস্যনর সাহেব জনসাধারণ সভা হইতে আবেদনপত্র পাইয়া স্থানীয় সিবিল সার্জেনের মত জিজ্ঞাসু হন। তদনুসারে ডাক্তার ওয়াইজ ঢাকায় মেডিকেল স্কুল সংস্থাপনবিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া এক সুদীর্ঘ রিপোর্ট লিখিয়াছেন। কমিস্যনর সাহেব ডাক্তার ওয়াইজের ঐ রিপোর্ট জনসাধারণ সভার সভ্যদিগের নিকট পাঠাইয়া দেন, আমরা ডাক্তার ওয়াইজের রিপোর্টের মর্ম অবগত হইয়া বিস্মিত হইলাম।

"ঢাকায় মেডিকেল স্কুল সংস্থাপিত হইলে ভালরূপ শিক্ষা হওয়া অসম্ভব, তাহাতে ইষ্ট

ফল না হইয়া অনিষ্ট হইবার ভূয়সী সম্ভাবনা, অতএব ঢাকাতে মেডিকেল স্কুল সংস্থাপিত না করিয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে যে নেটিব ক্লাশ আছে তাহারই শিক্ষার উন্নতি করা উচিত।" ডাক্তার ওয়াইজ যদি কেবল এইমাত্র মত প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে আমরা অধিক বাক্য ব্যয় প্রয়োজন বোধ করিতাম না। কিন্তু তিনি উক্ত বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে গিয়া প্রথমতঃ ঢাকার জনসাধারণ সভার অস্তিত্ব অস্বীকার, পরে ঢাকার স্বাধীন দেশীয় ডাক্তারদিগকে নিতান্ত মূর্খ ও অপদার্থ ইত্যাদি গালি দেওয়াতে আমরা এতৎসম্বন্ধে কিছু না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

ডাক্তার ওয়াইজের মতে ঢাকার জনসাধারণ সভা, কেবল কয়েকজন শিক্ষিত বাবুর বাগ্‌বিতণ্ডার সভামাত্র, এই সভাতে এ নগরের প্রধান হিন্দু মুসলমান একজনও সভ্য নাই, যে কয়েকজন আছেন তাহাদিগের অধিকাংশই গবর্নমেন্টের কর্মচারী, তাহারা পূর্ববাংলার সর্বসাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ গণ্য হইয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন না, জনসাধারণসভার সভ্যগণ সর্বসাধারণের হিতের জন্য ঢাকায় মেডিকেল স্কুল সংস্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হন নাই, কেবল আপন আপন সন্তান ও আত্মীয়দিগকে অল্প ব্যয়ে চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষা দেওয়ার জন্য এই প্রস্তাব করিয়াছেন, অতএব তাহাদের এই প্রস্তাব অকিঞ্চিৎকর।

জনসাধারণসভা সম্বন্ধে ডাক্তার ওয়াইজের মত নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক এবং তিনি যে ঐ সভার বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। ঢাকার জনসাধারণ সভায় ঢাকার ও অন্যান্য স্থানের প্রধান প্রধান ধনী, জমিদার ও সম্ভ্রান্ত লোক সভ্য নিযুক্ত আছেন এবং সম্প্রতি একজনও গবর্নমেন্ট কর্মচারী নাই। স্বাধীন ব্যবসায়ী সম্ভ্রান্ত ও বিজ্ঞ বিজ্ঞ লোক এই সভার কার্য নির্বাহ করিয়া আসিতেছেন। তাহাদিগকে কোন মতেই এইরূপ ... বলিয়া সভা হইতে কোন বিষয়ে প্রস্তাব করেন। ডাক্তার ওয়াইজ বলেন, ঢাকায় ২০/৩০ জন ডাক্তার স্বাধীনভাবে চিকিৎসা করিতেছেন। ইহাদিগের মধ্যে কয়েকজন সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন শ্রেণীভুক্ত অনেকেই নেটিব ডাক্তার। এই নেটিব ডাক্তারদিগের মধ্যে কয়েকজন কলকাতার মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ আর কয়েকজন অনুত্তীর্ণ ছাত্র। ডাক্তার ওয়াইজের মতে উপরি উক্ত সকল ডাক্তারই চিকিৎসা বিদ্যায় অনভিজ্ঞ। ইহারা বঙ্গদেশের রোগাদির লক্ষণ ও চিকিৎসা কিছুই অবগত নহেন, কেবল এক একটি চিকিৎসালয়ে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করিতেছেন। ডাক্তার ওয়াইজের এই সকল কথায় আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারি না। আমরা স্বীকার করি, ডাক্তার ওয়াইজের ন্যায় দেশীয় ডাক্তারদিগের পুস্তকগত বিদ্যা না থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ কয়েকজন দেশীয় ডাক্তার স্বাধীন চিকিৎসা দ্বারা ঢাকায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় ডাক্তার ওয়াইজ কেমন করিয়া বলিলেন যে, ঢাকায় দেশীয় কোন ডাক্তারই বঙ্গদেশের রোগাদি নির্ণয় ও চিকিৎসা করিতে পারেন না, ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। আমরা বোধ করি দেশীয়রোগ দেশীয় ডাক্তারগণ যেমন সহজে বুঝিতে পারেন, ভিন্ন দেশীয় বিজ্ঞ চিকিৎসক হইলেও দেশীয়দিগের আচার, নিষ্ঠা ও প্রকৃতি অবগত না থাকাতে তত সহজে বুঝিতে পারেন না। ডাক্তার ওয়াইজ যে বলিয়াছেন দেশীয় ডাক্তারগণ এক একটি ঔষধালয় খুলিয়া কেবল অর্থ উপার্জনেই সর্বদা ব্যস্ত আছেন তাহা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি না উপার্জন চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে? তবে ঢাকায় দেশীয় ডাক্তারদিগের অর্থ উপার্জনে ব্যস্ত থাকা দোষের বিষয় হইল কেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ঢাকায় এ পর্যন্ত যতজন সিবিল সার্জেন আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও প্রায় সকলেই চিকিৎসা দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। ডাক্তার সিমসন একমাত্র চিকিৎসা দ্বারা এখানে বহুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন, অনেকেই অবগত আছেন। ডাক্তার সিমসন লোকের নিকট আট আনা গ্রহণ করিয়াও চিকিৎসা করিতেন তবে আমরা একথা অবশ্যই স্বীকার করি যে, ডাক্তার ওয়াইজ চিকিৎসা করিয়া কাহারও নিকট

অর্থ গ্রহণ করেন না। ইহা তাঁহার পক্ষে প্রশংসার বিষয়ই বটে। কিন্তু তাঁহার ঘরে ঢাকার রাশি রাশি অর্থ সঞ্চিত রহিয়াছে। তিনি চিকিৎসা দ্বারা অর্থগ্রহণ করিয়া আর কি করিবেন? আমাদিগের সন্দেহ আছে ডাক্তার ওয়াইজ অর্থ গ্রহণ করিয়া চিকিৎসা করিলে তাঁহা দ্বারা সর্বসাধারণে চিকিৎসা করাইত কিনা? ডাক্তার ওয়াইজের অন্যান্য অনেক গুণ থাকিতে পারে কিন্তু তিনি ৬/৭ বৎসর ঢাকায় থাকিয়াও ডাক্তার সিমসন বা কটক্রিব সাহেবের ন্যায় চিকিৎসা সম্বন্ধে সাধারণের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই।—

ডাক্তার ওয়াইজ বলেন, ঢাকায় মেডিকেল স্কুল না করিয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে যে বাংলা শ্রেণী আছে তাহারই শিক্ষোন্নতি করা উচিত, একথা আমরাও অস্বীকার করি না। আমরাও বলি কেবল বাংলা শ্রেণীর কেন সকল শ্রেণীরই চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার যতদূর উন্নতি হইতে পারে, তৎপক্ষে যত্ন করা কর্তব্য। ডাক্তার ওয়াইজ আরো বলিয়াছেন, কলকাতার মেডিকেল কলেজের নেটিব ডাক্তারগণ দ্বারা দেশের কোন উপকার না হইয়া বরং ইংরেজি ঔষধের অপমান হইতেছে। ডাক্তার ওয়াইজের এই মত যে ভ্রান্তিমূলক তাহাতেও সন্দেহ নাই, বাংলা গবর্নমেন্ট ও অনেক ... সিবিল সার্জেন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন "যেসকল স্থানে পূর্বে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একা এক জন সিবিল সার্জন কি সব আসিষ্টান্ট সার্জন পাঠাইতে হইত, কলকাতা মেডিকেল কলেজে বাংলা শ্রেণী সংস্থাপিত হওয়াতে সেই সকল স্থানে অল্প অর্থ ব্যয়ে এক এক জন নেটিব ডাক্তার দ্বারা সেই কার্য নির্বাহ হইতেছে। বঙ্গদেশের প্রায় সমুদায় সবডিভিসনের চিকিৎসা নেটিব ডাক্তার দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে, কয়েক বৎসর হইল সুপ্রসিদ্ধ সিবিল সার্জন ডাক্তার চক্রবর্তী মেডিকেল কলেজের থিয়েটারে প্রকাশ্যরূপে যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে তিনি স্বীকার করিয়াছেন, নেটিব ডাক্তারদিগের দ্বারা ইংরেজি ঔষধের উপকারিতা বঙ্গদেশ বিশেষ উপলব্ধি করিতেছে। যখন বঙ্গদেশের প্রত্যেক পল্লীগ্রামে কলিকাতার মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ নেটিব ডাক্তারগণ প্রবেশ করিয়া চিকিৎসা করিতে থাকিবেন, তখন বঙ্গদেশে ইংরাজি ঔষধ দ্বারা আরো উপকৃত হইবে। মহামান্য সিবিল সার্জন ডাক্তার গুডিব সাহেব ও স্যর ওশানেসি সাহেবেরও এই মত ছিল। আমরাও অবগত আছি, বাংলা গবর্নমেন্টের সাহায্যকৃত প্রায় দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার অধিকাংশ নেটিব ডাক্তারদিগের উপর অর্পিত আছে, এমত অবস্থায় ডাক্তার ওয়াইজ একজন জেলার সিবিল সার্জন হইয়া কেমন করিয়া মত প্রকাশ করিলেন যে, নেটিব ডাক্তারগণ দ্বারা দেশের কোন উপকার না হইয়া বরং ইংরেজী ঔষধের আপমান হইতেছে। ইহার মর্ম তাহার ন্যায় নেটিব ডাক্তার বিদ্বেষী দুই এক জন জেলার সিবিল সার্জন ভিন্ন আর কেহই বুঝিতে পারে না। ডাক্তার ওয়াইজের আর একটি প্রস্তাবে তাহার বিলক্ষণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন, দেশীয় কবিরাজদের ছাত্রদিগকে আনিয়া ২/১ বৎসর ঢাকা মিটফোর্ড হস্পিটালে বিদ্যাশিক্ষা দিলে তাহারা উভয়বিধ চিকিৎসা প্রণালী অবগত হইয়া নেটিব ডাক্তারদিগের অপেক্ষা দেশের উপকার করিতে পারিবে। ওয়াইজ সাহেব যখন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন কলকাতা মেডিকেল কলেজে শিক্ষা ভাল হইতেছে না, তখন দেশীয় কবিরাজদিগের ছাত্রদিগকে ২/১ বৎসর মিডফোর্ড হস্পিটালে যেরূপ ফোঁড়া কাটা ইত্যাদি শিক্ষা হয়, মেডিকেল কলেজে সেরূপ শিক্ষা হইতেছে না। না হইবে কেন। তিনি যে হস্পিটালের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক এবং এ পথিকেরি মেঃ বেরণ যে হস্পিটালের হাউজ সার্জন সেখানে ২/১ বৎসর কেন ২/৪ মাস শিক্ষা দিলেই নেটিব ডাক্তারদিগের অপেক্ষা এক এক জন উৎকৃষ্ট ডাক্তার প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

উপসংহারকালে আমরা ঢাকার জনসাধারণে সভাকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা আপনাদিগের সভার গুরুত্ব মনে করিয়া ডাক্তার ওয়াইজের ভ্রমাত্মক মতের প্রতিবাদ করুন।[৩৫]

অবশেষে গভর্নর স্যর জর্জ ক্যাম্পবেলের আমলে (১৮৭৩ খ্রিঃ) সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়

সরকারিভাবে যে, কলকাতা, ঢাকা এবং পাটনায় তিনটি মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হবে। এইসব স্কুলে পড়ান হবে মাতৃভাষা বাংলায়। কলকাতা মেডিকেল কলেজ যে বিরাট সংখ্যক ছাত্র আসে পূর্ব বাংলা থেকে, তাদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে ঢাকার মেডিকেল স্কুল। আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, স্কুলটি সংশ্লিষ্ট থাকবে মিডফোর্ড হাসপাতালের সঙ্গে। বলা হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষা, ভার্নাকুলার স্কলারশিপ বা মাইনর স্কলারশিপ পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে, তারা ঢাকা মেডিকেল স্কুলে পড়ার সুযোগ পাবে। কলকাতার শিয়ালদহের অনুরূপ হবে এই স্কুল। পাঠক্রম তিন বছরের। শরীরবিদ্যা, শল্যচিকিৎসা, রসায়ন, মেডিসিন, ধাত্রীবিদ্যা এবং ভেষজবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে। তিন বছরের শেষে হবে ফাইনাল পরীক্ষা। পরীক্ষা গ্রহণ করবে একটি কমিটি। এই কমিটির সদস্য হবেন এই অঞ্চলের ডেপুটি সার্জেন, স্কুল সুপারিনটেনডেন্ট এবং অন্য একজন মেডিকেল অফিসার। প্রয়োজনে তাদের সাহায্য করতে পারবেন, প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে ছাত্রদের ক্লাস পরীক্ষা গ্রহণ করেছেন যেসব শিক্ষক। ক্যাম্পবেল হাসপাতালের মতই এখানেও ভর্তি ফি ২ টাকা, মাসিক ৩ টাকা এবং রেজিস্ট্রেশন ফি ১০ টাকা। ভর্তি হওয়ার বয়স সীমা হল ১৬ থেকে ২০।

স্কুলের ক্লাস শুরু হয় ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুন। প্রথম বছরের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩৮৪। ১৮৭৮-৮৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ১৩৬ জন এল. এম. এফ. ডাক্তার পাশ করে বেরোয় এই স্কুল থেকে। ক্রমশ ঢাকা মেডিকেল স্কুলের সুনাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কলকাতামুখীনতাও কমে যায়। ফলে স্কুলে স্থান সংকুলান কঠিন হয়ে ওঠে। ঢাকার ধনীরা এগিয়ে এলেন। নতুন ভবন নির্মাণে সেদিন তাদের দানের তালিকা ছিল এরকম ঃ

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর	২০,০০০ টাকা
বাবু রঘুনাথ দাস	১৫,০০০ টাকা
রাজা সূর্যকান্ত আচার্য বাহাদুর	১০,০০০ টাকা
মীর মোহম্মদ	৫,০০০ টাকা
শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী দেবী	২,০০০ টাকা
মহারাজ স্যর যতীমোহন ঠাকুর	১,০০০ টাকা
রাজা সুরেন্দ্রমোহন ঠাকুর	১,০০০ টাকা
বাবু শ্রীনাথ রায়	১,০০০ টাকা
শ্রীমতী জাহ্নবী চৌধুরানী	১,০০০ টাকা
বাবু প্রাণশঙ্কর ও বাবু প্রভাতশঙ্কর রায়চৌধুরী	৫০০ টাকা
বাবু শ্যামাপ্রসাদ রায় চৌধুরী	৫০০ টাকা
বাবু যোগেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	২০০ টাকা
বাবু হেমচন্দ্র	২০০ টাকা
বাবু হেমচন্দ্র	১০০ টাকা

ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ঢাকার কমিশনার ডবলু. আর. লারমিনি (১৮৮৭ খ্রিঃ ২ এপ্রিল)। নতুন ভবনের উদ্বোধন হয় ১৮৮৯ খ্রিঃ ২২ সেপ্টেম্বর। ঢাকার বিদ্যালয়টি দীর্ঘকাল এই অঞ্চলের চিকিৎসা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই কেবল গ্রহণ করেনি, উচ্চতর শিক্ষার দুয়ার মুক্ত করেছে। বাংলাভাষায় পড়াশুনার জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ের বই লিখেছিলেন স্থানীয় শিক্ষকরা। মুনতাসীর মামুন তিনটি বইয়ের উল্লেখ করেছেন তার গ্রন্থে। বই তিনটি হল কালীচন্দ্র গুপ্তর 'অস্ত্র চিকিৎসা' (১৮৮৯ খ্রিঃ), চুনিলাল দাসের অ্যানাটমি বিষয়ক গ্রন্থ 'নিদান ও রুগ্ন দেহ সূক্ষ্মতত্ত্ব' (১৮৯৬ খ্রিঃ), হরপ্রসাদ চক্রবর্তীর 'ডাক্তারি অভিধান' (১৮৮৯ খ্রিঃ) এবং সূর্যনারায়ণ ঘোষের 'অস্ত্র চিকিৎসা' (১৮৯২ খ্রিঃ)। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে বেরিয়ে ছিল চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা 'ভিষক'।

দীর্ঘপথ পরিক্রমার পর মেডিকেল স্কুল ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত হয়। তখন নামকরণ ঘটে সলিমুল্লাহ কলেজ। দশ বছর বাদে এই কলেজ পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজে পরিণত হয়। প্রথম অধ্যক্ষ ডঃ এ. এফ. এস. নুরুল ইসলাম।[৩৬]

ঢাকায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয় ১৯৪৬ খ্রিঃ। সে সময়ে কলেজ এবং সংলগ্ন হাসপাতাল ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের পর কলেজটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক কর্তৃত্বাধীন হয়। এটি বর্তমানে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক সুযোগ-সুবিধাযুক্ত হয়েছে।

ডেন্টাল সার্জারি কোর্সে পড়াশোনার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল কলেজ স্থাপন করা হয়। পরে এই হসপিটাল রমনার নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে।

চিকিৎসা ব্যবস্থার উচ্চতর শিক্ষার জন্য ১৯৬৫ খ্রিঃ স্থাপিত হয় ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিসিন অ্যান্ড রিসার্চ। ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থল শাহবাগ এভিনিউতে প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত। উন্নতমানের চিকিৎসার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে রোগি আসে এখানে। বর্তমানে এই ইনস্টিটিউটে যেসব কোর্স চালু হয়েছে, তার মধ্যে আছে : ১. এফ. সি. পি. এস., ২. এম. ফিল., ৩. ডিপ্লোমা, ৪. এম. ডি. এবং ৫. পি. এইচ. ডি.। বছরে দুবার ভর্তির পরীক্ষা হয়।

উচ্চশিক্ষালাভের অসুবিধা :

ঢাকায় উচ্চ শিক্ষালাভের একমাত্র কেন্দ্র ছিল ঢাকা কলেজ। কিন্তু বেতন হার বেড়ে যেতে থাকায়, ছাত্রদের পক্ষে উচ্চশিক্ষালাভ কঠিন হয়ে পড়তে থাকে। এদের বেশিরভাগেরই কলকাতায় গিয়ে পড়াশোনার সামর্থ না থাকায় ঢাকায় শিক্ষার অগ্রগতি ক্রমশঃ শ্লথ হয়ে পড়ে। তাছাড়া বৃত্তিদানের ক্ষেত্রেও সরকারি ঔদাসীন্য ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। সেকারণে "ঢাকা প্রকাশে" একটি আলোচনায় ফ্রি কলেজ ও স্কুল প্রতিষ্ঠার আবেদন জানান হয় ঃ

"পূর্ববঙ্গের প্রধান নগরী ঢাকার উচ্চশিক্ষালাভের একমাত্র ঢাকা কলেজের উচ্চতর ছাত্র বেতন হার নির্ধারিত হওয়াতে এতদঞ্চলীয় কয়েকটি জেলার উচ্চশিক্ষালাভার্থী ছাত্রদিগের সবিশেষ অসুবিধাই পরিলক্ষিত হইতেছে। বলিতে কি, দ্বিতীয় উপায় না থাকাতে অনেকে উচ্চ শিক্ষালাভের আশা বিসর্জন দিতেও বাধ্য হইতেছেন। স্থূলদর্শীরা বলিতে পারেন, ঢাকার ন্যায় শহরে একটি মাত্র কলেজ বর্তমান থাকাই যথেষ্ট, এখানে এক্ষণ যে পরিমাণ উচ্চশিক্ষালাভার্থী ছাত্রসংখ্যা দৃষ্ট হয়, তাহাতে একের অধিক কলেজ বা হাই স্কুল থাকার আবশ্যকতা নাই। এক শ্রেণীর অধিক বিদ্যালয় হইলে বরং নানা দোষ ঘটিবারই সম্ভাবনা। কিন্তু যাঁহারা অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, বোধ হয় না তাঁহারা ঐরূপ উক্তি করিতে পারেন। আমরাও স্বীকার করি যে, এক শ্রেণীর অধিক সংখ্যক বিদ্যালয়ের বিদ্যামানতায় নানা কারণে নানা দোষ ঘটিয়া থাকে। বর্তমান সময়ে ঢাকা কলেজে যে পরিমাণ ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা বিবেচনায় উচ্চ শিক্ষালাভার্থ ঢাকায় স্বতন্ত্র কলেজ বা হাই স্কুল স্থাপনের আবশ্যকতা নাই, আমরা ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু পূর্ববাংলার এতগুলি এন্ট্রান্স স্কুলে বহু সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে, দিন দিন আবার এন্ট্রান্স স্কুল ও তাহার ছাত্র সংখ্যা পরিবর্ধিত হইতেছে, অথচ উচ্চ শিক্ষালাভার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে না কেন, যখন মনোমধ্যে এ প্রশ্নের উদয় হয়, তখন এতদঞ্চলের উচ্চ শিক্ষার অসুবিধাই তৎকারণ স্বরূপ প্রতীত হইয়া থাকে। আমরা সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি সমস্ত পূর্ববাংলার উচ্চ শিক্ষালাভের একমাত্র স্থান ঢাকা কলেজের অত্যুচ্চ ছাত্রবেতনহারই এতদঞ্চলীয় উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্রসংখ্যা হ্রাসের প্রধানতম কারণ। পূর্বে ঢাকা কলেজে ছাত্র বেতন হার ৫ টাকা ছিল, এখন ৬ টাকা নির্ধারিত হইয়াছে। পূর্বে ৫ টাকা বেতন

দিয়াও যাহাদের উচ্চশিক্ষালাভ অদৃষ্টে ঘটে নাই, তৎসদৃশাবস্থ ছাত্রদিগের ৬ টাকা বেতন দিয়া অধ্যয়ন যে সবিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়াছে, বলা বাহুল্য। পরন্তু যাঁহারা পূর্বে ৫ টাকা বেতন দিয়া ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারিয়াছেন, এক্ষণ তুল্যাবস্থ ছাত্রদিগের ৬ টাকা বেতন দিয়া অধ্যয়নও এদেশীয়দিগের ক্রমবর্দ্ধনশীল সাম্প্রতিক আর্থিক অনুন্নতি-বিবেচনায় সামান্য অসুবিধাজনক হয় নাই। এদেশীয়দিগের উচ্চশিক্ষার প্রতি উর্ধতন কর্তৃপক্ষ বিরূপ বলিয়া হউক, আর কারণান্তর প্রযুক্তই বা হউক, বৃত্তির সংখ্যা হ্রাস হওয়াতেও উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তির অসুবিধা আরো অধিকতর পরিমাণে বর্ধিত হইতেছে; বৃত্তির সংখ্যান্যূনতাপ্রযুক্ত এখন পূর্বাপেক্ষা অল্পতর ছাত্রের ভাগেই বৃত্তিলাভ ঘটিতেছে; সুতরাং প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ অবৃত্তিক ছাত্র সংখ্যা বর্ধিত হওয়াতে এবং তাহাদের অনেকেরই কলেজের উচ্চ বেতন চলিয়া না উঠিতে এন্ট্রেন্স পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্তই শিক্ষার শেষসীমা হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এন্ট্রেস পরীক্ষার পর প্রতিবৎসরই উচ্চ শিক্ষার সুবিধা হইল না, বলিয়া অনেক ছাত্রের বিদ্যালয় পরিত্যাগ দর্শন করিয়া দুঃখিত হইতেছি। এতদঞ্চলীয় প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ অবৃত্তিক ছাত্রগণের অনেককে জানুয়ারি মাসে ঢাকায় আসিয়া সম্পন্ন লোকের সাহায্য প্রাপ্তির আশ্বাসে "ভো ভো" করিয়া ঘুরিতে দেখিয়াও আমাদের কষ্ট হইতেছে। সত্য বটে রাজধানীস্থিত প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র বেতন হারও অত্যুচ্চ, কিন্তু তথায় এরূপ অনেক বিদ্যালয় আছে যে, তাহাতে অনেকেরই প্রবেশ লাভে সামর্থ রহিয়াছে। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, এতদঞ্চলীয় ছাত্রেরা তথায় যাইয়াই অধ্যয়ন করেন না কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, সকল ছাত্রের অল্প ব্যয়বিধান করিয়া ঢাকায় থাকিবার সামর্থ নাই, বহু ব্যয় বিধান সাধ্য কলিকাতায় অবস্থান কি তাহাদের ন্যায় লোকের সাধ্যায়ত্ত? ফলত ইত্যাকার নানা অসুবিধা প্রযুক্তই এতদঞ্চলীয় অধিকাংশ ছাত্রের উচ্চ শিক্ষালাভেচ্ছা অন্ধের চিত্রদর্শনস্পৃহার ন্যায় বিফল হইতেছে। সমধিক দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই যে ইংরেজ কর্তৃপক্ষগণ উচ্চশিক্ষার আস্বাদ দিয়া এদেশীয়দিগের উচ্চশিক্ষালাভাশা বল কী করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু দিন দিন সুবিধাগুলি উঠাইয়া লইয়া ইঁহাদিগকে নিরাশ ও অসুখীই করিতেছেন।

আজি ঢাকায় যদি একটি ফ্রি কলেজ বা হাইস্কুল বর্তমান থাকিত, কিংবা অল্প বেতন দিয়াও ছাত্রেরা কোন বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে কি এতদঞ্চলীয় অসম্পন্ন ছাত্রগণের দুর্গতিভোগ দেখিয়া আমাদিগকে দুঃখ ভোগ করিতে হইত? আজিকালি যখন এম, এ, বি, এ উপাধিধারীদিগেরই অন্নসংস্থান করা এক প্রকার কষ্ট-সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে,—তাহাদিগকেই অত্যল্প বেতনে কর্ম স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইতেছে, তখন এতদঞ্চলীয় অধিকাংশ ছাত্রের প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়াই বিদ্যার চরম সীমা হইতে তাঁহাদের ও তৎসঙ্গে পূর্ববাংলার কি দুর্গতি ঘটিবে, ভাবিলে অবসন্ন হইতে হয়। এ জন্যই আমরা পূর্ববাংলার দেশহিতৈষী মহোদয়গণের নিকটে সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা পূর্ববাংলার প্রধান নগরী ঢাকায় হয় একটি ফ্রি কলেজ অন্তত হাইস্কুল স্থাপনের উপায় করিয়া এল এ ক্লাস পর্যন্ত খুলিবার চেষ্টা পাউন ; এরূপ হইলেও ঢাকা বিভাগের দরিদ্র ছাত্রগণ পেটের ভাত করিয়া খাইবার উপযুক্ততা লাভ করিতে পারিবেন। একটি ফ্রি কলেজ বা হাইস্কুল স্থাপন সমধিক অর্থব্যয়সাধ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু এতদঞ্চলে যে সব ধনীব্যক্তি বর্তমান আছেন, তাঁহাদের দ্বারা একার্য সম্পাদিত হইতে পারে না, এমন নয়। অদ্য আমরা ঢাকার সদাশয় নবাব খাজে আবদুল গনি ও তৎপুত্র নবাব আসানুল্লা সাহেবের নিকটেও একটি বিনীত প্রার্থনা জানাইতেছি। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ফ্রি স্কুলটির যেরূপ অপকৃষ্টাবস্থা তাহাতে তদ্দারা কোন উপকার দর্শিতেছে বোধ হয় না অথচ মাস মাস তাহাতে তাঁহাদের কতগুলি অর্থব্যয়িত হইতেছে। ঢাকায় এন্ট্রেন্স স্কুলের অভাব নাই এবং তত্তৎ স্কুলে অধ্যয়ন ও সমধিক কষ্টসাধ্য নয় ; সুতরাং তাঁহাদের ফ্রি স্কুলটি উঠিয়া গেলেও সাধারণের তত অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা

দেখা যায় না। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি, নবাব খাজে আবদুল গনি মিঞার কীর্তিমন্ পুত্র ঢাকার কোন স্থায়ী উপকারার্থ ২০ সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছেন, তদ্দারা গবর্নমেন্ট কাগজ ক্রয় করিয়া রাখুন এবং উক্ত ফ্রি স্কুলটিতে মাসিক যে ব্যয় হয়, তাহা উঠাইয়া'লইয়া উহার সহিত একত্রকরণানন্তর একটি এল, এর ক্লাস স্থাপন করুন। উল্লিখিত অর্থ দ্বারা তদ্রূপ স্কুলের কার্য সুসম্পন্ন না হইলে অল্প পরিমাণ স্কুলিং ফিজ নির্ধারণ করিলেও হইতে পারে। আর না হয় কার্যের জন্য নবাব সাহেবের আরো কিয়ৎ পরিমাণ অর্থই ব্যয়িত হইল। ঢাকায় নবাব সাহেবের যেরূপ প্রাধান্য রহিয়াছে, তাহাতে তাঁহার নামে দুরবস্থাপন্ন একটি ফ্রি স্কুল প্রশংসনীয়ও নয় ; এরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলে তদীয় সম্মান ও নামের অনুরূপ কার্য হয় তৎপ্রতি তাঁহার মনোযোগবিধানই একান্ত কর্তব্য হইতেছে। আমরা আশা করি, নবাব খাজে আবদুল গনি মিঞা সাহেবও তদীয় সদাশয় পুত্র আমাদের প্রস্তাবানুরূপ কার্যানুষ্ঠান করিয়া পুণ্য প্রতিষ্ঠা লাভ কুণ্ঠিত হইবেন না।[৩৭]

ছাত্রসাধারণ সভা :

ছাত্রদের অসুবিধা-সুবিধা এবং মানসিক উৎকর্ষ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ঢাকায় গঠিত হয়েছিল ছাত্রসাধারণ সভা। এই সভার সম্পর্কে কয়েকটি বিবরণ পাওয়া যায়, যার মধ্যে আছে এই সভার ভূমিকা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য ঃ

"ভ্রাতৃভাব ও জ্ঞানবর্ধন এবং যথাশক্তি হিতানুষ্ঠানার্থ ছাত্রবৃন্দ সমবেত হইতে পারেন এইরূপ কোন একটি সাধারণ সম্মিলন ভূমির আবশ্যকতা ঢাকার ছাত্রগণ বহুকাল যাবৎ অনুভব করিয়া আসিতেছেন। অজ্ঞানাচ্ছন্ন বর্তমান ভারতে যাঁহারা সমাজের নেতা, তাঁহাদিগেরই অধিকাংশ ব্যক্তি এতদূর অপূর্ণশিক্ষিত যে, তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে একথা বলিতে লজ্জিত নহেন যে ছাত্রগণ অহোরাত্র বিদ্যামন্দিরের নির্বাচিত গ্রন্থই অধ্যয়ন করিবে, এতদ্ভিন্ন তাহাদিগের অন্য কোন কর্তব্য নাই। পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও একতার বন্ধন সংস্থাপন চেষ্টা, সমাজনীতি ও রাজনীতির পর্যালোচনা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার কার্যে সংযোগদান তাহাদিগের পক্ষে ঘোরানিষ্টকারী ও দুর্বিসহ ধৃষ্টতার কার্য। তাঁহারা মনে করেন, কেবল বিদ্যামন্দিরে অধ্যাপিত সাহিত্য, গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ববিদ্যা প্রভৃতিতে পাণ্ডিত্যলাভ করিতে হইলেই নিয়মিত শিক্ষার প্রয়োজন ; সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি এক মনে বহু পরিশ্রমে শিক্ষা করিতে হয়, একথা তাঁহারা অবগত নহেন। যাঁহারা রাজনীতি ও সমাজতত্ত্বের আদ্যাক্ষরও পড়িয়াছেন, তাহারা জানেন যে ইহারা দুরূহত্বে সর্বথা অতুল্য ; অক্লান্ত অধ্যবসায় ও বহুকালব্যাপিনী শিক্ষা ব্যতীত ইহাদিগকে কেহ অধিকৃত ও আয়ত্ত করিতে পারে না। ইংলন্ড, আমেরিকা প্রভৃতি সৌভাগ্যশালী দেশবাসীগণ একথা বুঝিতে পারিয়াছেন। উক্ত দেশসমূহে বহু সংখ্যক সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতি সমালোচনী সভা রহিয়াছে। প্রতি বিদ্যামন্দিরে ছাত্রগণ নিয়মিতরূপে সমবেত হইয়া সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতির পর্যালোচনা করিয়া থাকেন ; এতদ্বিষয়ক মৌলিক ও সাময়িক প্রশ্নসমূহের মীমাংসা চেষ্টা করেন। এই উপায়ে বিদ্যালয়স্থ যুবকমাত্রই রাজনীতি ও সমাজনীতির মূলতত্ত্বসমূহ এবং স্বদেশীয় শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষাপকর্ষ বিষয়ে সাধারণভাবে পরিষ্কার উত্তর প্রদান করিতে পারেন। এই কারণেই ইংলন্ড ও আমেরিকা প্রভৃতিদেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা এবং সুখ বিষয়ে পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। প্রথম বয়সই শিক্ষার কাল! এই সময়ে যে দেশের অধিবাসীগণ রাজনীতি ও সমাজনীতি শিক্ষা না করিল, সে দেশ উক্ত বিষয়দ্বয়ে ধরণীতলে ক্ষুদ্র, নীচ হইতেও নীচ রহিল। পণ্ডিতমাত্রই স্বীকার করেন, প্রথম বয়সেই মনুষ্যের রাজনীতি ও সমাজনীতি শিক্ষা করা কর্তব্য ; কেননা সংসারে প্রবেশ করিতেই উহাদিগের সহিত সংস্পর্শে আসিতে হয় ; যে ব্যক্তি সংসার প্রবেশের পূর্বেই উক্ত বিষয়দ্বয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন ; তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে সংসার প্রবেশমাত্রই বহুদর্শী ব্যক্তির ন্যায়

কার্য করিতে পারেন। অস্মদেশে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণও যে সাধারণতঃ সমাজতত্ত্ব এবং রাজনীতি বিষয়ে এত অজ্ঞ এবং শিথিল প্রযত্ন, প্রথম বয়সে উক্ত শাস্ত্রদ্বয় শিক্ষার উপায়াভাবই তাহার প্রধান হেতু। এই সমস্ত কারণে ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয় যে ভারতের সর্বত্র ছাত্রগণ সমবেত হইয়া সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতির পর্যালোচনা, পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও একতাবর্ধন উদ্দেশ্যে বহুসভা সংস্থাপন করেন এবং তৎসমুদায় হইতে সম্মিলিতভাবে যথা শক্তি হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। ঢাকার ছাত্রগণ বহুকাল হইতে পূর্ববঙ্গে এই প্রকার একটি সভার অভাব অনুভব করিতেছেন। এই অভাব যথাসম্ভব দূরীকরণাভিপ্রায়ে তাঁহারা ছাত্রসাধারণ সভা নামে একটি সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। শিক্ষা, সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতির আলোচনা, ছাত্রসাধারণের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন ও একতাবর্ধন এবং যথাশক্তি হিতানুষ্ঠান চেষ্টাই এই সভার উদ্দেশ্য। কার্যক্ষেত্র অতিবিস্তৃত করিলে এই সভার পক্ষে কর্তব্য সম্পাদন অসম্ভব হইয়া উঠিবে আশঙ্কায় ইহার কার্যক্ষেত্র পূর্ববঙ্গেই নিবদ্ধ থাকিবে। পূর্ববঙ্গের উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়মাত্রেরই ছাত্রগণ ইহার সহিত যোগদান করেন, ইহা ছাত্রসভার প্রতিষ্ঠাতৃগণের আন্তরিক কামনা। এই সভার কি পরিণাম হইবে, কেহ বলিতে পারে না। সম্ভবতঃ অন্যান্য বহুসভার ন্যায় কিয়ৎকাল প্রতিকূল ঘটনার সহিত যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে পূর্ববঙ্গীয় ছাত্রসাধারণের ঔদাসীকারণে ইহা প্রাণত্যাগ করিবে। তবে ইহার মৃত্যু যতক্ষণ ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত, ততক্ষণ আমরা তাহাকে অগ্রে আহ্বান করিয়া আনিয়া এই শুভোদ্যম হইতে বিরত হইব না। আমরা পূর্ববঙ্গের ছাত্রসাধারণকে স্বার্থের নামে, মাতৃভূমির নামেও সর্বশেষে ধর্মের নামে আমাদিগের সহিত যোগদান করিতে আহ্বান করিতেছি। যদি এ আহ্বান অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহারা আমাদিগের সঙ্কল্প নিস্ফল করেন, আমরা নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিতে পারিব—আর আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত কি? তাই বলিতেছি, ভাই! এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিও না। জ্ঞানাভিমানী লোকেরা তোমাকে উপহাস করিবে, তুমি তাহাদিগের উপহাসে কর্ণপাত করিও না। আইস আমরা সমবেত হইয়া সে বীজবপন করি এবং বপনান্তে সে বীজোপরি জলসেচন করি, যাহা কালক্রমে এরূপ বিপুলকায় বিশালচ্ছায় বৃক্ষে পরিণত হইবে যাহার নিম্নদেশে বসিয়া আতপদগ্ধ ভারতভূমি একদা তাহার বর্তমান দুঃসহ সন্তাপ বিস্মৃত হইতে পারিবে।

ঢাকা
৮ই বৈশাখ।
১২৮৬ সাল।

শ্রী শ্যামাকান্ত নাগ, এম, এ।
শ্রী শীতলকান্ত চট্টোপাধ্যায়।
শ্রী নবকুমার চক্রবর্তী, বি, এ।
শ্রী প্রসন্নকুমার সেন।
শ্রী বসন্তকুমার ঘোষ।
শ্রী সারদাচরণ ঘোষ।[৩৮]

(২)

বিগত রবিবার অপরাহ্ন চারিটার সময়ে পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি গৃহে অত্রত্য ছাত্রসাধারণ সভার এক সুমহদধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সোমপ্রকাশের মৃত্যু নিবন্ধন শোক প্রকাশ ও সমালোচনার আবশ্যকতা প্রতিপাদনই এই সভাধিবেশনের মুখ্যোদ্দেশ্য ছিল। আমরা ঢাকায় আর কখনো এরূপ অত্যধিক লোকপূর্ণ সভা সন্দর্শন করি নাই, সভাসংসৃষ্ট ব্যক্তি মাত্রের এরূপ জ্বলদুৎসাহও প্রত্যক্ষ করি নাই। সভাস্থলে সহস্রাধিক লোক সমবেত হইয়াছিল। অনেকেই গৃহমধ্যে স্থান না পাইয়া বহির্দেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ একটি সঙ্গীত হইলে পর সম্পাদক চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, ফরিদপুর, বরিশাল, বোয়াইল প্রভৃতি নানাস্থানাগত সহানুভূতিমূলক পত্র পাঠ করিলেন। তৎপর বাবু চন্দ্রকিশোর রায়, শিবেন্দ্রনাথ সেন, প্রসন্নকুমার বসু ও

শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃগণ এক একটি প্রস্তাব এবং তৎপোষকতা উপলক্ষ্যে বক্তৃতাদান করিলেন। সর্বসম্মতিতে প্রস্তাবগুলি পরিগৃহীত হইলে সভাপতি বাবু কৈলাসচন্দ্র সেনের বক্তৃতা ও একটি সঙ্গীতের পর সভাভঙ্গ হইল। ঢাকা জনসাধারণ সভা সোমপ্রকাশের মৃত্যুজনিত শোকপ্রকাশার্থ যে সকল প্রস্তাবধারণ করিয়াছেন, এই সভার প্রস্তাবগুলিও প্রায় তদনুরূপ, ...

বাবু শিবেন্দ্রনাথ সেন, প্রসন্নকুমার বসু ও শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা এরূপ উৎকৃষ্ট, যুক্তিযুক্ত ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, সকলেই তচ্ছ্রবণে বিস্মিত হইয়াছিলেন। বিংশ, দ্বাবিংশ বা চতুর্বিংশ বর্ষদেশীয় যুবকদিগের মুখ হইতে এরূপ শুদ্ধভাষায় অনর্গল সারগর্ভ বক্তৃতা বোধ হয় অনেকেই এই প্রথম শুনিলেন। ইতঃপূর্বে কেহই এরূপ আশা ও ভরসা করেন নাই যে, বিদ্যালয়ের যুবক ছাত্রগণ রাজনৈতিক বিষয়ে এতাদৃশ যুক্তিযুক্ত মনোহর বক্তৃতা করিতে পরিসমর্থ। বলিতে কি, অনেকেই ঐ দিবসীয় সভা হইতে এই মত পরিগ্রহ করিয়া গিয়াছেন যে, বিদ্যালয়স্থ অপরিজ্ঞাত ছাত্রদিগের মধ্যেও এরূপ অনেক লোক রহিয়াছেন যে, তাঁহার প্রধান প্রধান বক্তাদিগ হইতে কোন বিষয় ন্যূন নহেন ; ইহারা যদি এক্ষণ হইতে রাজনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে মনঃসন্নিবেশ করেন,— প্যাঠ্যাধ্যয়ণের সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নতি সাধন কল্পেও কিছু কিছু চেষ্টা করেন, ভবিষ্যতে এক একটি রত্ন স্বরূপ হইয়া দেশের হিতসাধনে সমর্থ হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। আমরা অনুরোধ করি, ইহারা উৎসাহ ও উদ্যম পরিত্যাগ না করিয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়ার চর্চা বিসর্জন না দিয়া অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে বিদ্যা ও জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্ব স্ব স্বাভাবিকী বক্তৃতা শক্তির পরিচালনে সযত্ন থাকুন ; কালে অবশ্যই বড় লোক বলিয়া গণনীয় হইতে পারিবেন। ছাত্র সভা সোমপ্রকাশের মৃত্যুতে যে যে রূপ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ নূতন কথা অধিক ছিল না সত্য, কিন্তু যে দেশীয় সংবাদপত্রের উপর রাজকীয় নিগ্রহ সাধারণ শিক্ষিতবর্গের উপেক্ষাগ্রাহক মণ্ডলীর নির্দয়তা চলিয়া আসিতেছে, তাহারই জন্য যে দেশের ভাবী আশা ভরসাস্থল যুবকগণ যে, সমবেত হইয়া এক-হৃদয়ে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাতে আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত ও আশ্বস্ত হইয়াছি। নিয়মিতরূপে কোন না কোন সংবাদপত্র পাঠ না করিলে আজিকালি ভদ্রলোকের সহিত আলাপ ব্যবহার করা সুকঠিন হয়—অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন বিজ্ঞসমাজে মুখব্যাদন করিতেই পারা যায় না—কোন রাজ্যের বর্তমান অবস্থা কিরূপ তাহা পরিজ্ঞাত না থাকাতে অনেক বিষয়েই অন্ধকার অন্ধকার বোধ হইয়া থাকে, বিশেষতঃ কোন দেশীয় সংবাদপত্র পাঠ না করিলে, দেশের প্রকৃতাবস্থাভিজ্ঞই হওয়া যায় না—দেশীয় সংবাদপত্রের প্রতি সমাদর প্রদর্শনে দেশের প্রতিই সমাদর প্রদর্শন করা হয়, এতদঞ্চলীয় ছাত্রবর্গ যে এই বিষয়গুলি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন ইহা অপেক্ষা আমাদিগের সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

ঢাকার ছাত্রসভা ছাত্রগণের রাজনৈতিক আলোচনার আবশ্যকতা বিষয়েও সেদিন বিলক্ষণ আন্দোলন করিয়াছেন। কোন কোন সংবাদপত্র ছাত্রদিগের রাজনৈতিক আলোচনার দূষণীয়তা প্রতিপাদন করাতেই বোধহয় ছাত্রসভা এতদ্বিষয়ক আন্দোলনে সঙ্কুক্ষিত হইয়াছেন। তাহারা বহুল ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপাদন করিতে ত্রুটি করেন নাই যে, কোন ব্যক্তিই আশৈশব সমালোচনা ও শিক্ষা ব্যতিরেকে রাজনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ে বড়লোক হইতে পারেন নাই। বালকদিগের রাজনীতি সমালোচনায় প্রতিষেধই বা কি? যদি পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিগণের রাজনীতির আন্দোলন দূষণীয় না হয়, তবে শিক্ষার্থী যুবকদিগের পক্ষে তাহা কেন দূষণীয় হইবে? বালকের রাজনৈতিক আলোচনার আস্বাদ পাইলে উচ্চ উচ্চ বিষয়ে আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলে, অন্য কোনও বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্তিমান হইবে না অল্পকাল মধ্যে "জেঠা" হইয়া উঠিয়া অকর্মণ্য হইয়া পড়িবে, রাজনীতির কুটিল পরিচ্ছেদ বিশেষ পাঠ করিয়া বিদ্রোহ প্রবৃত্তি

প্রশমিত রাখিতে পরিসমর্থ হইবে না, আমাদিগের বিবেচনায় একথার কোন অর্থ নাই। যখন তাহাদের অনেকেই যুগপৎ বহুলবিষয় শিক্ষা করিয়া কৃতকার্যতা লাভ করিতেছে, তখন তৎসঙ্গে রাজনীতিও অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয় মধ্যে পরিগণিত থাকিলে তাহাদের অপরাপর বিষয়ে অকৃতার্থতালাভের সম্ভবনা কি? যাহারা সাধারণত বখা হইয়া উঠিয়া অকর্মণ্য হয়, তাহারা রাজনীতির ধার অল্পই ধরিয়া থাকে। শুদ্ধ রাজনীতি কাহাকেও বখা করিয়া তুলিতে পারে না, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই ইহা অবশ্য স্বীকার করিবেন। ছাত্রেরা রাজনীতির আলোচনা করিলে বিদ্রোহীই বা হইবে কেন? ছাত্র জীবনে কোনও বিষয়েরই কার্যকারিতা থাকে না, শুদ্ধ কেবল আলোচনা ও জ্ঞানলাভের ক্ষমতামাত্র থাকে, তন্নিবন্ধন তাহারা সকল বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়াই পরিতৃপ্ত হয়। যদি পরিণতবয়স্ক কার্যক্ষম ব্যক্তিবর্গের রাজনৈতিক আলোচনা করিয়া রাজবিদ্রোহী হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তবে আলোচনৈকপরায়ণ কর্মক্ষম যুবকবৃন্দের সম্বন্ধে রাজবিদ্রোহিতার আশঙ্কা কি? যিনি যাহাই বলুন, যুবকেরা ভালরূপ রাজনীতির সমালোচনা করিলে তাহাদিগের অধিকতর রাজভক্তি জন্মিবারই ভূয়সী সম্ভাবনা। সাধারণ অজ্ঞলোকে রাজকীয় যে বিষয়ের গূঢ়তর অনবগত থাকাতে রাজার প্রতি অভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে, রাজনীতির গূঢ়তত্ত্বজ্ঞ হইলে যুবকদিগের তদ্রূপ অভক্তি প্রকাশ করিবার কারণমাত্র থাকে না। ফলতঃ অজ্ঞতা ও অন্ধকার রাজভক্তির যেরূপ বিরোধী, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানালোক রাজানুরক্তির তদ্রূপ পরিপন্থী নহে। প্রত্যুত রাজনীতি বিষয়ক বহুজ্ঞতা ইংরাজদিগের ন্যায় সুসভ্য রাজগণের প্রতি প্রকৃত ভক্তি উৎপাদনের সহায়তাই করিয়া থাকে।[৩৯]

(৩)

গত রবিবার অপরাহ্ন ৪।। টার সময়ে পূর্ববঙ্গে রঙ্গভূমিগৃহে অত্রত্য ছাত্রসাধারণ সভার এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সবর্ডিনেট জজ বাবু গঙ্গাচরণ সরকার সেই সভায় সভাপতির কার্যনির্বাহ করিয়াছেন। সভাস্থলে পদস্থ ভদ্র সম্ভ্রান্ত অনেক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সাকুল্যে প্রায় সহস্রলোক সমবেত হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমিত হইল। সভাপ্রারম্ভে সম্পাদক বাবু শ্যামাকান্ত নাগ এম, এ, রিপোর্ট পাঠ করিলেন এবং গ্রীষ্মাবকাশ সময়ে বাবু শীতলকান্ত চট্টোপাধ্যায় ময়মনসিংহে ও বাবু শিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিক্রমপুরে যে যে অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তদ্বিবরণ পাঠ করিলেন। ইহাদের কার্যবিবরণ শ্রবণে অবগতি হইল, ময়মনসিংহে ইতঃপূর্বে যে দুইটি ছাত্রসভা ছিল, তন্মধ্যে তত সদ্ভাব ও একতা ছিল না ; সম্প্রতি সেই অসদ্ভাব ও অনৈক্য দূরগত হইয়া সেখানেও একটি মাসিক ছাত্রসাধারণ সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—বিক্রমপুরস্থ যপশা, লোনসিংহ ও কোঁয়রপুর গ্রামেও ঢাকা ছাত্রসাধারণ সভার এক একটি শাখা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, ইতঃপূর্বেই সন্তোষ ও রোয়াইল গ্রামে দুইটি শাখাসভা সংস্থাপিত হইয়াছিল।

যখন ঢাকা ছাত্রসাধারণ সভার প্রতিষ্ঠা হয়, তখন সোমপ্রকাশের মৃত্যুবিষয়ক কর্তব্যবতা নির্ধারণ ও আন্দোলনেই ব্যাপৃত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল বলিয়া সভা নিয়মাবলী নির্ধারণ করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হয় নাই, অধিকন্তু সভার প্রথমাধিবেশনের অব্যবহিত পরেই কলেজ ও স্কুলসকল বন্ধ হওয়াতে এতদিন ঐ বিষয়ে সভা হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। প্রোক্ত দিবসীয় সভায় ছাত্রসাধারণের সভার এই অভাব বিমোচিত হইয়াছে। প্রত্যেক স্কুলের এক একটি ও কলেজের প্রত্যেক শ্রেণীর এক একটি ছাত্র লইয়া কার্যনির্বাহক রচিত হইয়াছে। বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় স্থায়ী সভাপতি ও বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন সহকারি সভাপতিপদে বরিত হইয়াছেন। বাবু শ্যামাকান্ত নাগ এম, এ সম্পাদক, বাবু আশুতোষ সরকার বি, এ সহকারি সম্পাদকতাপদে নিয়োজিত হইয়াছেন। ১৪ বৎসরের অধিকবয়স্ক স্কুলের ছাত্রমাত্র এবং উৎসাহ প্রদর্শক অপরাপর পদস্থ ব্যক্তিগণও এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন, এরূপ নিয়ম

নির্ধারিত হইয়াছে। আরো অনেক অবান্তর নিয়ম নিরূপিত ও কার্যপ্রণালী অবধারিত হইয়াছে, বাহুল্য বিবেচনায় তত্ত্বাবতের উল্লেখ করা হইল না।

নিয়মাবলী নির্ধারণের পর "শ্রমোপজীবিগণের মধ্যে বিদ্যালোক বিস্তরার্থ নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হউক" এই প্রস্তাব করিয়া বাবু শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় একটি সুদীর্ঘ ও উৎকৃষ্ট বক্তৃতা প্রদান করিলেন। সভাস্থ সকলেই সাধারণ লোকদিগকে শিক্ষাদান অত্যাবশ্যক বলিয়া শীতলাকান্ত বাবুর প্রস্তাবে সম্মতিপ্রদান করিলে, ঢাকায় একটি রজনী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, নির্ধারিত হইল। গ্রামে গ্রামে নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতাও উপলব্ধি হইল। শাখাসভাগুলির উদ্যোগে বোধ হয় সত্বরই তাহারই অনুষ্ঠান করা হইবে। ফলত যে উদ্দেশ্যে নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ২/১টি মাত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হওয়া সুদূরপরাহত। বাবু গঙ্গাচরণ সরকার যথার্থই বলিয়াছেন যে, "শ্রমজীবিসাধারণের মধ্যে জ্ঞানালোকে বিস্তার" বিষয়টি বড়ই গুরুতর, সুতরাং তৎসমাধানার্থ অসাধারণ যত্ন চেষ্টা ও অনুষ্ঠানাদির প্রয়োজন দুই একটি নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐ মহদুদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র। তবে উদ্যোগ, উৎসাহদিদর্শনে আমাদের প্রত্যাশা হইতেছে, সভা সময়ে এই গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী উপায় বিধান করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য হইতে পারিবেন। বাবু শিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শীতলাকান্ত বাবুর প্রস্তাবের পোষকতা উপলক্ষে একটি বক্তৃতা দান করেন। অতঃপর বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন ও বাবু গঙ্গাচরণ সরকার উৎসাহ প্রদানার্থ দুই চারিটি কথা বলিলে, সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

আমরা ছাত্র সাধারণ সভার যেরূপ যত্ন চেষ্টা, অধ্যবসায়াদি প্রত্যক্ষ করিতেছি—অত্যল্পকাল মধ্যে যেরূপ কার্যকারিতা দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে ইহা দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে সুফল ফলিবে, প্রতীত হইতেছে। কেহ কেহ ছাত্রসভার কার্যকে "ছেলে খেলা"—বলিয়া উপহাস করিতেছেন; কিন্তু আমরা পদস্থ সম্মান্য ব্যক্তিগণকে এই সভার পৃষ্ঠপূরক, উৎসাহদাতা ও সাহায্যকারী দেখিয়া কখনই তদ্রূপ সংস্কারাপন্ন হইতে পারিতেছি না ; ফলত ভাল ভাল লোক যখন ইহার উন্নতিকামুক ও সহায় হইয়াছেন, তখন ভাবি সুফল দর্শনে নিরাশ হইবার কারণ দেখা যায় না। এক্ষণ ছাত্র সাধারণ সভা কর্তব্যব্রত পালনে সবিশেষ মনোযোগী হন,—ঢাকাস্থ অপর কোন কোন সভার ন্যায় নামমাত্র পর্যবসিত না হন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।[৪০]

ছাত্র নির্যাতন :

"ঢাকার ছাত্রদিগকে যে অযথোচিত বেত্রাঘাত দণ্ড করা হইয়াছে, তাহা লইয়া দেশবিদেশিয় সংবাদপত্রে বিলক্ষণ আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, এডগার, টমসনের রিপোর্ট, রিজলিউশন বাহির হইয়াছে। সম্প্রতি মহাসভা পার্লিয়ামেন্টেও ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। ভারতবন্ধু উদারাশয় ওডনেল কমন্স হাউস আণ্ডার সেক্রেটারি ক্রস সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—পুলিসের সহিত সামান্য কলহ করাতে ঢাকার কোনও উচ্চশ্রেণীর স্কুলের ৩টি ছাত্রকে যে বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল, আপনি কি সে বিষয়ে অবগত হইয়াছেন? ঐ সকল বালক সম্ভ্রান্তলোকের সন্তান কি না, তাহার কি কোনও অনুসন্ধান লইয়াছেন? ক্রস সাহেব প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন—স্টেট সেক্রেটারি ভারতবর্ষীয় একখানি সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন মারপিটের মকদ্দমায় ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ৩টি ছাত্রের বেত্রাঘাত দণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। তন্মধ্যে দুইটিকে বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে বেত্রাঘাত করা হইয়াছে। ছাত্রেরা সম্ভ্রান্তলোকের সন্তান কি না, অফিসে পৌঁছে নাই। এখন তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান চলিতেছে।...

ঢাকার ছাত্রদিগকে বাঁধিয়া বেত্রাঘাত করা হইয়াছে ; কোন ছাত্রের বেত্রাঘাতদণ্ডেই স্কুলে শাসননীতি রক্ষিত হয় নাই ; ছাত্রত্রয় সুসম্ভ্রান্ত লোকের সন্তান ; এ সকল কথা বাবু লালমোহন ঘোষের অবিদিত নাই। তিনি যদি ইহা মহাসভার ওডনেল প্রমুখ উদারাশয় সভ্যগণকে জ্ঞাপন

করেন, এবং তাঁহারা সবিশেষ বিবরণ জানিয়া শুনিয়া যদি পুনরান্দোলন করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে এদেশীয় ছাত্রশাসনবিষয়ে স্বেচ্ছাচারী বিচারপতিগণের অবিচারের পথ বন্ধ হইতে পারে। সুতরাং আমরা বাবু লালমোহন ঘোষ মহাশয়কে এই অনুরোধ করিতেছি যে, তিনি যেন উল্লিখিত প্রশ্নোত্তরকে বায়ুতে বিলীন হইতে না দিয়া, মহাসভার ভারত হিতৈষী সভ্যগণ দ্বারা এ বিষয়ে পুনরান্দোলন উপস্থিত করিবার সমুচিত যত্ন বিধান করেন।[৪১]

(২)

ঢাকার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ম্যারিয়ট সাহেব যে, অত্রত্য মেডিকেল স্কুলের ছাত্র কামিনীকুমার দাসকে ঘাড়ে ধরিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দেন, সপাদুক পদাঘাত করেন—ঐ বিষয়ে মকদ্দমা উপস্থিত হইলে ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েয়ার সাহেব সাক্ষীর জবানবন্দি লইয়া, পূর্বে আসামীর নামে শমন করিবার আদেশ দিয়া, পরে বাদী ও তাহার উকিলের অসাক্ষাতে হঠাৎ মকদ্দমাটি ডিস্‌মিস্‌ করিয়া যে, স্বজাতি বাৎসল্য ও বিধানশাস্ত্রীয় সূক্ষ্মদর্শিতা প্রদর্শন করেন, এবং জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ ম্যারিয়ট ভদ্রতানুরোধেই হউক, অথবা ভাবী গোলযোগ ভয়েই হউক, ক্ষমাপ্রার্থী হওয়াতে যে, ছাত্রটি উর্ধতন বিচারালয়ে প্রতীকারর্থী না হইয়া, অতি কষ্টে চুপ করিয়া থাকিতে সম্মত হয়, পাঠকবর্গ তাহা জ্ঞাত আছেন। সম্প্রতি অবগতি হইল, বিষয়টি বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেন্ট গবর্নর বাহাদুরের কর্ণগোচর হইয়াছে। তিনি অমৃতবাজার পত্রিকায় ঘটনাটি পাঠ করিয়াছেন এবং পেন্সিলের চিহ্ন দিয়া ঐ পত্রিকাখানি আমাদের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে প্রেরণপূর্বক তথ্য জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন। তদনুসারে কমিস্যনর আলেকজাণ্ডার সাহেব, নথি ও ম্যাজিস্ট্রেটের কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন। প্রকাশ যে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নথি ও কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। কিরূপ কৈফিয়ৎ প্রদত্ত হইয়াছে, এ পর্যন্ত তাহা অবগত হওয়া যায় নাই। তবে ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েয়ার সাহেব স্বজাতিপ্রেমে প্রণোদিত হইয়া প্রথমে যেরূপ কাণ্ড করিয়াছেন, তাহাতে অনুমিত হইতেছে, কৈফিয়তে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ম্যারিয়টের দোষ-সংগোপনে ত্রুটি হয় নাই। সে যাহা হউক, ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় আত্মত্রুটি ক্ষালণোপলক্ষে কি কি কথা বলিয়াছেন জানিবার নিমিত্ত সকলেরই একান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। বাদী, বিবাদী গোলযোগের মীমাংসা করিয়া ফেলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য হইবে না, সুতরাং বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিয়া ফলোদয় নাই, এই মনে করিয়াই আমরা নির্বাক ছিলাম ; কিন্তু ব্যাপারটি যখন এতদূর পর্যন্ত গড়াইয়াছে, তখন আর মৌনাবলম্বন করা উচিত বোধ হইতেছে না ; দুই একটি কথা বলা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

কামিনীকুমার দাস ভর্ৎসিত ও প্রহৃত হইয়া অভিযোগ করিল, যোগ্য যোগ্য উকিলেরা তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন, সাক্ষীর জবানবন্দিতে আসামী জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের দোষ প্রমাণিত হইল, ম্যাজিস্ট্রেট দেখিলেন, জেতৃজাতীয় একজন রাজকর্মচারী, জিত নেটিভের গাত্রে হস্ত তুলিয়া দণ্ডীয় হইতে চলিলেন, বড়ই বিভ্রাট উপস্থিত, তাই তিনি আইন খুঁজিয়া বাহির করিলেন—"সরকারি কার্যোপলক্ষে যে কোন অপরাধ করিলে, গবর্নমেন্টের অনুমতি ভিন্ন অভিযোগ চলিতে পারে না।" আরও লিখিলেন, "অপরাধ সত্য হইলেও অতি সামান্য, এ জন্য গবর্নমেন্টকে জ্ঞাপন করা আবশ্যক বোধ করি না। অতএব মকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিলাম।" আমরা পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, ম্যাজিস্ট্রেট মহামতির এই আদেশ আইনসঙ্গত সদ্বিচারকোচিত হয় নাই। কেননা বিধানের তাৎপর্য এই শাসন কর্তৃপক্ষ কোনও স্থলে যাইয়া সরকারি কার্যনির্বাহার্থ ভর্ৎসনা বা প্রহরাদি করিতে বাধ্য হইলে (আসামী গ্রেপ্তার প্রভৃতি স্থলে) তাহা সরকারি কার্যকালীন অপরাধ বলিয়া ধর্তব্য হইয়া থাকে এবং সেস্থলে অভিযোগ করিতে হইলে, গবর্নমেন্টের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাই বলিয়া কাছারি গমনকালে, বিহারাদি সময়ে, ক্রীড়াকালে, অথবা সরকারি কার্যস্থলে বিনাকারণে কাহাকেও ভর্ৎসনা বা প্রহার করিলে, তাহা আর সরকারি কার্যকালীন অপরাধ বলিয়া ধর্তব্য

হয় না এবং তৎসম্বন্ধে অভিযোগ করিতে হইলে আর গবর্নমেন্টের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে না। জেলা ও উপবিভাগের শাসকেরা বিচারক ও শান্তিরক্ষক দ্বিমূর্ত্তিতে বিরাজমান। তাঁহারা ঘাটে, মাঠে, পথে, গৃহে আমোদাগারে সর্বত্রই সরকারি কর্মচারীরূপে অবস্থিত। ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েয়ার মহোদয় আইনের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যদি প্রকৃত তাৎপর্য তাহাই হয়, তবে শাসকদিগকর্তৃক যেখানেই সেখানে, যে কোন কারণে ... বিনাকারণে যে কোন দূষণীয় কার্য অনুষ্ঠিত হইলে গবর্নমেন্টের অনুমতি ভিন্ন ... কোনটিরই তো অভিযোগ হইতে পারে না ... নিরীহ, গরিব বেচারাদিগকে শমনসদনে পাঠাইয়া শাসনকর্তৃগণের অব্যাহত থাকিবার পথ বড়ই পরিষ্কৃত। ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয়, কৈফিয়তে ও উক্তরূপ বিধানজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন কিনা, জানি না। যদি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উৰ্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের উচিত যে, তাঁহারা আরও কিছুকাল তাঁহাকে (ওয়েয়ার সাহেবকে) বিধানশাস্ত্র পাঠ করিবার অনুজ্ঞা করেন। অন্যথা তদ্বারা বিচার বিড়ম্বনা হওয়া বড় আশ্চর্যের হইবে না। নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, যাঁহাদের হস্তে আইন কানুনের মর্যাদারক্ষার ভার অর্পিত, প্রজার সুখ-শান্তি যাঁহাদের কর্তব্য কার্য মধ্যে পরিগণিত, তাঁহারাই যদি বিধিব্যবস্থার প্রকৃত মর্মগ্রহণ না করিলেন, অথবা তাৎপর্যগ্রহণ করিয়াও জাতিভায়াদিগকে বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে স্বেচ্ছানুসারে পৃথক পৃথক অর্থব্যাখ্যা করিয়া অক্ষতদেহে অব্যাহতি পাইতে পারিলেন,—স্বয়ং অত্যাচারী বা অত্যাচারীর প্রশ্রয়দাতা হইয়া দাঁড়াইলেন, তবে আর বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন ও বিচারালয়ের কার্যপরিচালনের প্রয়োজন কি? জেতৃজাতীয় শ্বেতপুরুষ, জিত কালা আদমীকে প্রহার করিলে, অতি সামান্য অপরাধ হয়, আত্মাভিমানী ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েয়ার যদি পুনরায় একথার উল্লেখ করেন, তাহা হইলে তাহাকে সমদর্শিতা শিক্ষা দিতে কি সিভিলিয়ানবৎসল টমসনের প্রবৃত্তি হইবে?

এইত গেল বিচারপতিদিগের কথা। পাঠক মেডিকেল স্কুলের ধুরন্ধরগণের কাহিনীও শুনুন,—কামিনীকুমার দাস যখন বড়কোমর বাঁধিয়া লাগিল, উচ্চ আদালতের আশ্রয় লইবার যোগাড় দেখিতে থাকিল, তখন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েয়ার হয়ত অন্ধকার দেখিলেন এবং তজ্জন্যই মকদ্দমা আপোষের কথা উত্থাপিত হইল। আপোষমীমাংসায় জয়েন্ট ম্যারিয়টের উদারসহৃদয়তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল। তিনি কামিনীকুমারকে মেডিকেল স্কুলের ছাত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া তাহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, কামিনীকুমারকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া দিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে মেডিকেল স্কুলের নেতৃপুরুষদের কেহ কেহ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত হইলাম। কামিনীকুমার আপোষ করিতে অসম্মত হইলে উক্ত স্কুলের দুইজন অধ্যাপক ও নায়ক প্রবর নানারূপ বলিয়া কহিয়া নাম কাটিবার ভয় প্রদর্শন করিয়াও নাকি তাহাকে স্বীকৃত করাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। উহাদের একজন নাকি কামিনীকুমারের হস্ত টানিয়া লইয়া মীমাংসাপত্রে তাহার নাম স্বাক্ষর করাইয়াছিলেন। কামিনীকুমার তখন কি করে? অধ্যাপকগণের অনুরোধে উপেক্ষা করিলে, তাহাদের বিরাগভাজন হইতে হইবে, ভবিষ্যতে বিপদ ঘটা তো আশ্চর্যের হইবে না, এই ভাবিয়া সে অগত্যা মীমাংসাপত্রে নাম দস্তখত করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু পরে যখন মকদ্দমার উকিল ব্যয় প্রার্থনা করে, তখন কোন কোন অধ্যাপক নাকি একেবারে ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠেন এবং এই মর্মে কামিনীকুমারকে ভর্ৎসনা করেন যে, তুমি একটা সামান্য লোক, তোমার নিকটে যে ত্রুটি স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট, ইহার উপরে আবার মামলা খরচ? অধ্যাপক বাবুদ্বয়ের ছাত্রস্নেহের ইহাই শেষ সীমা নহে। কামিনীকুমার প্রহৃত হইয়া যখন পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে, তখন তাহারা নির্বাক থাকিতে বলিয়া রাজপুরুষের "খয়ের খাঁ গিরী" প্রদর্শন করেন ; "ছাত্র বিনাকারণে অপমানিত হইয়াছে, ইহার প্রতিবিধান হওয়া উচিত, অন্যথা স্কুলের—স্কুল কর্তৃপক্ষের বড়ই নিন্দার কথা।" এভাব তাঁহাদের মনেও উদিত হয় না। এরূপ

শিক্ষকগণের বালাই লইয়া মরিতেই ইচ্ছা হয়। বলি, উক্ত অধ্যাপকদ্বয় কি চাকুরি এতই ধার ধারেন—শাসন কর্তৃপক্ষের এতই খয়ের খাঁ হইতে চাহেন যে, তাঁহাদের খাতিরে ন্যায়ানুমোদিত কর্তব্য কার্য করিতেও ভীত হইয়া থাকেন? একরূপ জোর করিয়া মীমাংসাপত্রে ছাত্রের স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া বাহাদুরী লওয়া কি তাঁহাদের চিকিৎসাজীবিগণের পক্ষে শোভা পায়? আমাদের বিশ্বাস, সরকারি কার্য না থাকিলেও তাঁহারা বাহিরের চিকিৎসায় মাসিক ৩/৪ শত টাকা উপার্জন করিয়া অক্লেশেই জীবিকানির্বাহে সক্ষম। তবে আর এ বিড়ম্বনা কেন? সাহেব তুষ্টির নিমিত্ত এত আগ্রহ কেন? রাজপুরুষের তোষণার্থ ছাত্রমহলে ভীরু, কোপনস্বভাব ও মমতাহীন বলিয়া পরিচিত হইতে যাওয়া কেন? ফলতঃ উঁহাদের যেরূপ ব্যবহারের কথা শুনা যায়, তাহা নিতান্তই অসন্তোষজনক। উহারা যদি ধরিয়া বাঁধিয়া মীমাংসা করাইয়া না দিতেন, তাহা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যথেষ্ট কৈফিয়ৎ দিলেও তাহা শূন্যে বিলীন হইয়া যাইতে পারিত না। উর্ধতন কর্তৃপক্ষকেও ঘটনার তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত পরের অম্ল চাকিতে হইত না। তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন, মফস্বলে শ্বেতশাসকেরা কিরূপ আচরণ করিতেছেন ; কেমন লীলাখেলা করিয়া তাহা ঢাকা দিবার চেষ্টা পাইতেছেন। মেডিকেল স্কুলের নেতৃপ্রবর যে, মীমাংসার চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহাতে আমরা তাঁহার বড় একটা দোষ দেখিতে পাইতেছি না, কারণ স্বজাতি স্নেহ লোককে এইরূপে প্রণোদিত করিয়াই থাকে।[৪২]

(৩)

... ঢাকার জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মেডিকেল স্কুলের ছাত্র কামিনীকুমার দাসকে সপাদুক পদঘাত ... লেপ্টেনেন্ট গবর্নর বাহাদুর বিভাগীয় কমিস্যনর আলেকজাণ্ডার সাহেবের নিকটে তাহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান এবং তদনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েয়ার সাহেবের নিকট হইতে মকদ্দমার নথি ও কৈফিয়ত তলব হয়। সম্প্রতি বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে, কমিস্যনর আলেকজাণ্ডারও ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েয়ারের কৈফিয়ত ও মন্তব্যদর্শনের রহস্য অবগত হইয়া, টমসন বাহাদুর নিম্নলিখিত মর্মে অভিপ্রায় লিপি প্রেরণ করিয়াছেন।—

যেরূপ অবস্থা জানা গিয়াছে, তাহার সন্তোষজনক উত্তর আছে, বোধ হয় না। পূর্বে এরূপ অবস্থাবগতি হইলে, ম্যারিয়ট সাহেবকে হঠাৎ ফার্লো বিদায় লইয়া দেশে যাইতে দেওয়া হইত না। যাহা হউক, যে পর্যন্ত তিনি উত্তর দিতে না পারিবেন, তাবৎ তাঁহাকে ভারতীয় সিবিল সার্বিসে পুনঃপ্রবিষ্ট হইতে দেওয়া যাইবে না। মকদ্দমাটি তাড়াতাড়ি ডিস্‌মিস্ করা ম্যাজিষ্ট্রট ওয়েয়ারের পক্ষেও সঙ্গত হয় নাই।

যে শাসনকর্তার আমলে খামখেয়ালী শাসক ও বিচারকদের তিরস্কার ও অবনতিভোগের পরিবর্তে প্রায়শই পদোন্নতি লাভ উৎকৃষ্টতর স্থানে পরিবর্তন হইতে দেখা যাইতেছে—ষ্টেলি, ম্যাগোয়ার, লাউইস, সার্প, টেইলর, লয়েড, জার্বো, বীম্‌স প্রভৃতি যাঁহার শাসনকালে আদুরে ছেলের ন্যায় কার্য করিয়া উত্তরোত্তর প্রশ্রয়ই প্রাপ্ত হইতেছেন—বিদ্যালয়ের বালকভীতি যাঁহাকে ছাত্রশাসনমন্তব্য লিখিত প্ররোচিত করিয়াছে, চট্টগ্রাম, বহরমপুর, ঢাকা, কৃষ্ণনগর ও কলকাতার অপূর্ব ছাত্রপীড়ন যাঁহার শাসনকালীন স্মরণীয় ঘটনা,—রাজপুরুষেতর শ্বেতকায়ের অকার্য পরম্পরায় সাহেব পক্ষপাতী বিচার-বিড়ম্বনা দেখিয়াও যাঁহার ঔদাসীন্য দূরগত হয় নাই, তিনি জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যারিয়টের সম্বন্ধে উক্তরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন, প্রহৃত ছাত্রের মনোবেদনায় সহানুভূতি ... স্বজাতিস্নেহের, অনুগত বাৎসল্যের দৃঢ়বন্ধন সহজে ছেদন করিবেন, সহসা ইহা বিশ্বাস হয় না ; তাই কয়েকদিন হইতে কানাঘোষা শুনিয়াও আমরা উহার সত্যতায় সন্দিহান ছিলাম, ইতস্তত করিতেছিলাম ; কিন্তু সম্প্রতি যে গূঢ় সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছে, বিশেষত যে সূত্রে সহযোগী ষ্টেটস্‌ম্যান সিমলা হইতে গুপ্তসংবাদ পাইয়াছেন, তথাকার বড় বড় লোকদের মধ্যে রামসে ও টেইলরের উদ্ভাবিত কৃষ্ণনগরী ছাত্রবিরুদ্ধ মকদ্দমা লইয়া বড় তীব্র

সমালোচনা চলিতেছে। বর্তমান সময়ে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিসের যে সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহার সম্যক্ পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক, একথা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ছাত্রদিগকে অপরাধী ঠাওরাইবার নিমিত্ত পুলিশকে তাহাদের পিছনে লাগাইয়া দেওয়াতে যে, অকারণ বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা লইয়াও অনেক টীকা টিপ্পনী হইয়াছে। ষ্টেটস্‌ম্যান ইহাও শুনিতে পাইয়াছেন। যে, সকলের অনুভব হইয়াছে, এ বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শনপূর্বক খোঁজ খবর না লওয়া লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের পক্ষে একান্ত অনুচিত হইয়াছে ; যদি তিনি কিছু না করেন, তাহা হইলে গবর্নর জেনারেল বাহাদুরই সম্ভবত এতদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন।

সিমলার এই গুপ্তসংবাদে প্রবোধিত হইয়া হউক, অথবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই হউক, টমসন বাহাদুর যে পদাঘাতকারী ম্যারিয়টের প্রতি কড়া হুকুম করিয়াছেন মঙ্গলেরই অনুচিত প্রশ্রয় পাইয়া বঙ্গের অনেক সিবিলিয়ান প্রভুই বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের অবিচার, অত্যাচারে দেশ জ্বালাতন হইয়া পড়িয়াছে। এ সময়ে উপরিওয়ালার তীব্র কটাক্ষপাত হইলে অনেকটা হিত প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

লেপ্টেনেন্ট গবর্নর বাহাদুর যদি ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েয়ারকে মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া ক্ষান্ত না হইতেন, পুনরায় মকদ্দমাটির ... করিবার অনুজ্ঞ করিতেন, তাহা হইলেও আরও রহস্য ভেদ হইতে পারিত মেডিকেল স্কুলের কোন কোন ধুরন্ধর যে, আপোসমীমাংসা করিতে যাইয়া একে আর করিয়াছেন—কর্তৃপক্ষের খয়েরখাঁগিরি করিতে যাইয়া যে, সত্যের অপলাপ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, সে বুজরুকিও প্রকাশ পাইত। সাধারণের বাসনা, এখানেই যেন এ নাটকের যবনিকাপাত হইয়া না যায় ; ম্যারিয়ট যে কোনরূপ কৈফিয়ত দিলেই যেন তাহা সন্তোষজনক বলিয়া পরিগৃহীত না হয় এবং প্রকৃত রহস্য জানিবার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা জানিয়া নিরপেক্ষভাবেই যেন কর্তব্যানুসরণ করা হয়। [৪৩]

(৪)

ছাত্রে প্রফেসারে একটা ভয়ানক গোলযোগ হইয়া গেল। ঢাকা কলেজের প্রফেসার মণ্ডী সাহেবের অত্যাচার আমরা অনেক শুনিয়াছি। তাঁহার ইংরাজি আবদার রক্ষার্থই ঢাকার ঘাটে নৌকা রাখা নিষিদ্ধ হইয়াছে। তিনি নিজে চাবুক হাতে করিয়া অনেকদিন অনেক নাবিককে দৌড়াইয়াছেন, তজ্জন্য অনেকদিন অনেক পুলিশ পাহারাকেও নাস্তানাবুদ করিয়াছেন। যা হউক, সম্প্রতি তাঁহার মহিমাতে একটি গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছে। দিনকতক হয়, পোগোজ স্কুলের নিকটে বাসা করিয়াছেন। স্কুলের ছাত্রেরা স্কুলে গোলমাল করে, তাহা তাঁহার কানে সহ্য হয় না ; তিনি তজ্জন্য শাসন চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য হইয়াছেন। তারপরে গত মঙ্গলবার তাঁহার একজন আরদালী একটি স্কুলের ছাত্রকে জুতা চোর বলিয়া গ্রেপ্তার করে। বালকের পায় যে জুতা ছিল, আরদালী তাহার অপহৃত জুতা বলিয়া বালককে ধরিয়া যন্ত্রণা দিতে থাকে। বালকের চিৎকার শুনিয়া আর কতকগুলি ছাত্র সেই অত্যাচারের প্রতিবিধানস্বরূপ আরদালীকে ধরিয়া কিছু যন্ত্রণা দেয়। পরে সমাগত মণ্ডী সাহেবকে দেখিয়া ছাত্রগণ পলায়ন করে। যে ছাত্রটিকে জুতাচোর বলা হইয়াছে, সে গোপীমোহন বাবুর ইনস্টিটিউশনে পড়িত, কিন্তু মণ্ডীসাহেব আরদালী প্রহারকগণকে পোগোজ স্কুলের ছাত্র সন্দেহ করিয়া পোগোজ স্কুলে পুনঃ পুনঃ প্রবেশ করেন।

কিন্তু একটি ছাত্রকে তিনি পরিচিত করিতে না পারিয়া ঐ স্কুলের মাস্টারগণ প্রতি তাম্বি করেন, তাহারা ছাত্রদিগকে গোপন করিয়াছেন, সন্দেহে রেজেস্টেরী বহি দেখিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহারা সাহেবের অনধিকার চর্চার সহায়তা না করাতে সাহেব তাঁহাদিগকে অনেক তর্জন করিয়াছেন। [৪৪]

ঢাকার শিক্ষা পরিস্থিতি :

প্রাথমিক পর্বে শিক্ষা ক্ষেত্র যে সম্পূর্ণ নির্মল ছিল তা বলা যায় না। অনেক অযোগ্য ব্যক্তি শিক্ষক হিসাবে যোগদান করায় জটিলতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। তাছাড়া কিছু বেসরকারি বিদ্যালয় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়ায় এক অমঙ্গলজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

"যে সকল স্কুল কলেজের অধ্যক্ষেরা নিজে অধ্যাপনা করিতে সমর্থ নহেন ; যাঁহাদিগকে ঐ কাজের জন্য সম্পূর্ণরূপে পরের উপর নির্ভর করিতে হয়, তাঁহাদিগকে অধ্যাপকদিগের সঙ্গে বিশেষরূপে ভদ্র ব্যবহার করিতে হয় ; অধ্যাপকেরা ত্রুটি করিলেও ক্ষমা এবং ভবিষ্যতে সে রূপ না হওয়ার নিমিত্ত মিষ্ট বাক্য ব্যবহার করিতে হয়। একেই পেনসনের আশা ও বিশেষ উন্নতির আশা নাই দেখিয়া ক্ষমতাপন্ন শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা পার্যমানে গবর্নমেন্টের চাকরি ছাড়িয়া বেশি বেতনের লোভেও প্রাইভেট স্কুল কলেজের চাকরি লইতে অনিচ্ছুক ; তাহারা উপরে যদি চাকরির স্থায়িত্বে বিশ্বাস না থাকে, স্বত্বাধিকারী সামান্য দোষ ত্রুটি ধরিয়া ফেরেন, তাহার হইলে সেই স্কুল কলেজে সক্ষম ভদ্রলোকেরা নিতান্ত পেটের দায়ে চাকরি লইলেও মনোযোগী হইয়া কাজ করিতে পারে না।" [৪৫]

"ছাত্রগণ স্বভাবতই শিক্ষকের অনুগত। অধীনস্থ শিক্ষকেরাও কিয়ৎ পরিমাণে প্রধান শিক্ষকের অনুগত না হইয়া পারে না। এরূপ স্থলে প্রধান শিক্ষকদিগের ক্ষমতা স্বভাবতই স্কুল কলেজের পক্ষে স্বত্বাধিকারীদের অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়ে। যদি স্বত্বাধিকারীরা তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অনুচিত ব্যবহার করেন, তবে তিনি ইচ্ছা করিলে সেই স্কুল ভাঙিয়া অন্য একটা স্কুল করিতে খুব সহজে পারেন। অবশ্য, ইহার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত না আছে, তাহা নহে। এই ঢাকা শহরেই বাবু গোপীমোহন বসাককে তাড়াইয়া কিশোরী বাবু অনায়াসে নিজ স্কুল রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার ভিতরে একটা বিশিষ্ট কারণ ছিল। গোপীমোহন বাবুর কর্কশ ব্যবহার জন্যই হউক, অথবা আভিজাত্যহীনতা জন্যেই হউক, কিংবা খুব বড় বিদ্বান ছিলেন না বলিয়াই হউক, তৎপ্রতি অধিকাংশ শিক্ষক বিরক্ত ছিলেন ; তাহার উপরে তিনি গালি দেওয়াতে অধিকাংশ ছাত্র একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। ছাত্রদিগের অনুরোধেই কিশোরী বাবু গোপীমোহন বাবুকে কর্মচ্যুত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; এরূপ অবস্থায়ই গোপীবাবু জুবিলী স্কুলের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারেন নাই। তথাপি অনেক ছাত্র তৎপ্রতি গুরুভক্তি ছাড়িতে না পারিয়া তদীয় নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুলে ভর্তি হইল। কিশোরী বাবুর বিশেষ ক্ষতি না হইলেও ঐ স্কুলের জন্য অনেক পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছিল। কিশোরী বাবু যদি সেই সময়ে অধিকতর উপযুক্ত শিক্ষক না পাইতেন, তবে হয়ত পূর্ববঙ্গ স্কুলের অস্তিত্ব লোপ না হইয়া একটা ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার আড্ডা হইয়া থাকিত। [৪৬]

"প্রাইবেট এন্ট্রেন্স স্কুলগুলির অযথোচিত অপ্রতিহত স্বাতন্ত্রে অনুচিত সর্বাধিকারত্বে ও অর্থাগমের দূরাকাঙক্ষামূলে সদস্য বস্তু বিবেক রহিত ঢাকা নগরীতে পথ ক্রমশঃ প্রশস্তত হইয়া উঠিতেছে। অবস্থা এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে শীঘ্র কোন প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবিত ও কার্যে পরিণত না হইলে, এই সকল বিদ্যালয় কেবল অবিদ্যা ও অনাচারের আশ্রয়স্থানমাত্রে পর্যবসিত হইবে। এ অবস্থার পর্যালোচনায় আমরা অনেকদিন হইতেই দুঃখ প্রকাশ ও প্রতিকারের ভরসায় চিৎকার করিয়া আসিতেছি। প্রত্যাশিত ফল লাভ কিন্তু এ পর্যন্ত ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

আমরা দুঃখ প্রকাশ করিতে পারি, অন্যায় দেখাইয়া চীৎকার করিতে পারি। কিন্তু প্রতিকার ব্যাপারে প্রকৃত প্রস্তাবে কোনই হস্ত নাই। যদি কেহ শুধু স্কুল প্রতিষ্ঠারূপ ব্যবসায়ে লাভের দুরাশায় অথবা শিক্ষায় লক্ষ্য না রাখিয়া নামের ভিখারিরূপে কেবল প্রতিপত্তির প্রত্যাশায় স্কুল খুলিয়া থাকেন, তিনি তাহার মনোগতভাবের বিরুদ্ধবাদে কর্ণপাত করিবেন কেন? তিনি সুশিক্ষা চাহেন না, তিনি চাহেন নাম, অথবা তিনি চাহেন অর্থ ; তিনি আমাদের চিৎকার

শুনিয়া বিচলিত হইবেন কেন? তাঁহার অধ্যাসিত পথ প্রত্যাখ্যান করিয়া অন্যের প্রদর্শিত পথ সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইলেও তাহাতে পদচারণা করিতে রাজি হইলে কেন? সৎপ্রসঙ্গে ও সাধু কার্যে আন্তরিক অভিপ্রায় না থাকিলে অথবা তাহাতে বাধ্যবাধকতার কোন সংস্রব না থাকিলে অধিকাংশ স্থলেই কাহারও হইতে এ সংসারে নিঃস্বার্থে সদনুষ্ঠানের প্রত্যাশা দুরাশা বই আর কিছুই নহে। অমন লোক এ সংসারে আজকাল বড় বিরল।

আমরা ত আমরা ইনস্পেক্টর যে ইনস্পেক্টর অথবা ডিরেক্টর যে ডিরেক্টর যাহাদিগকে সর্বময় কর্তা বলিলেই চলে, তাঁহারাও নাকি গবর্নমেন্টের বিধান বশে সিণ্ডিকেটের অনভিমতে প্রাইভেট স্কুল কর্তৃক সমনুষ্ঠিত অপকারিতার প্রতিবিধানে সক্ষম নহেন। ইঁহারাও নাকি প্রাইভেট স্কুলের কর্তৃপক্ষকে কোনও বিশেষ কার্যে ও সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তিমান ও বাধ্য করিতে ক্ষমতাবান নহেন। আমরা শুনিয়াছি ইহাদেরও সদুপদেশ অনেক স্থলে উপেক্ষিত ও প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকে ও হইয়াছে। অথচ তজ্জন্য কেহ তাঁহাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহার অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে।

তহবিলে হাত পড়িবার দুশ্চিন্তায় অধিকাংশ প্রাইভেট স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ বার্ষিক পরীক্ষান্তে বালকগণকে যেভাবে প্রমোশন দিয়া থাকেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কোন কোন স্কুলে "সেকেণ্ড ক্লাস টুদি সেকেন্ড ক্লাস" এইভাবে প্রমোশন দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে যে কত ছেলের মাথা খাওয়া হয়, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখেন না। অনেক স্থলেই এসব বিষয় অভিভাবকগণ জানিতে পারেন না, সুতরাং কাহারও কোন আপত্তি করিবার কারণ উপস্থিত হয় না। বিশেষ অনেক অভিভাবক সমীচীন দূরদর্শনের অভাবে ইহার পরিণামের বিষময় ফল অনুভবই করিতে পারেন না বরং আপন স্বজন প্রমোশন পাইয়াছে ভাবিয়া তাঁহাদের মনে সন্তোষেরই উদ্রেক হইয়া থাকে। আমরা জানিতে পারিয়াছি লাভের লালসায় ও অর্থগত ক্ষতির আশঙ্কায় অনেক স্কুলে এন্ট্রেন্স পরীক্ষায় বালক প্রেরণ সম্পর্কেও এই কদাচার ও কুপ্রথাই অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাই আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইতেছি যে, স্কুল হইতে শতের অধিক বালক প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে হয়ত ২৫/৩০ জন উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। যাহা হইতে ৫০ অনধিক বালক প্রেরিত হয়, সেখানে ৫/৭ জন উত্তীর্ণ হইলেই কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্টচিত্তে বুক ফুলাইয়া বাহাদুরী লইয়া থাকেন। কবে এমন ভাবের তিরোভাব হইবে ভগবান জানেন। যতদিন এ আবর্জনা প্রক্ষালিত ও বিদূরিত না হয়, ততদিন এই ঢাকাতে সাধারণ শিক্ষার সমুন্নতর দূরাশা মাত্র। দায়িত্বজ্ঞান শূন্য অনুন্নতমনা লোকের হস্তে গুরুতর কার্যের ভার পড়িলে প্রায়শঃ এই রূপ অবস্থা দাঁড়াইয়া থাকে। যে জন জানে না, লজ্জায় শিখে না, অথচ জানায় যে জানি কিংবা অভিমান ভরে অন্যের পরামর্শে গ্রহ যে কুণ্ঠিত হয়, তাহার মুর্খতা কদাপি ঘোচে না, তাহার দ্বারা আশানুরূপ ফল প্রাপ্তির প্রত্যাশা করাই বিড়ম্বনা।[৪৭]

শিক্ষক সমিতি :

একটি শিক্ষক সমিতিও গঠিত হয়েছিল। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির যোগদানের ফলে এদের ভূমিকা হয়ে উঠেছিল গুরুত্বপূর্ণ।

"শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের আদেশানুসারে গতকল্য অপরাহ্ন ২/১৫ মিনিটের সময় অত্রত্য সরকারি কলেজগৃহে স্থানীয় সরকারি ও বে-সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক এবং বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণকে লইয়া এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে বর্তমান কালের শিক্ষাজীবী ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত, বিভাগীয় স্কুলসমূহের অবসরপ্রাপ্ত ইনস্পেক্টর বাবু মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টার রায় সাহেব দুর্গাকুমার বসু, বাবু মোহনচাঁদ বসাক, বাবু গোপীনাথ বসাক, বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় প্রভৃতি কতিপয় বিজ্ঞব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা কলেজের বর্তমান সুযোগ্য প্রিন্সিপাল ড. পি. কে. রায় মহোদয় সভাপতি নির্বাচিত হইয়া সভার কার্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন, প্রথমে সভাপতি মহোদয় ডিরেক্টর বাহাদুরের আদেশ পত্র পাঠ করিয়া উপস্থিত শিক্ষকবর্গকে সভার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করেন। বর্তমানকালের শিক্ষকদিগকে উপযুক্ত শিক্ষাদানপ্রণালী শিক্ষা দেওয়ার সঙ্কল্পেই ডিরেক্টর মহোদয় কলিকাতা, ঢাকা ও পাটনা এই তিন শহরে তিনটি চিরস্থায়ী সভা স্থাপনের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। গতকল্য সভায় স্থানীয় প্রায় ৬০ জন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। সাধারণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে সভার কার্যবিবরণী সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

১। চিরস্থায়ী সভার জন্য সভাপতি ও সম্পাদক প্রভৃতি নির্বাচন এবং সভার অধিবেশন স্থান ও কার্যকাল নির্ণয়।

সর্বসম্মতিক্রমে ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মহোদয় এই সভার সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। উক্ত প্রিন্সিপ্যাল মহোদয়ের অনুপস্থিতিতে স্থানীয় জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কিংবা ঢাকার কলেজের কোন সিনিয়ার প্রফেসার বা জগন্নাথ কলেজের কোন সিনিয়ার প্রফেসার সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। ঢাকার কলেজের প্রফেসার বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র এই সভার স্থায়ী সম্পাদক ও উকিল ইন্‌ষ্টিটিউশনের হেডমাস্টার বাবু যোগেন্দ্রনাথ গুহ এই সভার স্থায়ী সহকারি সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। প্রত্যেক মাসের প্রথম ও তৃতীয় সপ্তাহে এই সভার দুইটি অধিবেশন হইবে। স্থানীয় সরকারি কলেজ কি কলেজিয়েট স্কুল কিংবা অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে এই সভার স্থান নির্ণীত হইবে।

২। রচনা পাঠ—গতকল্য সভায় ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের বর্তমান হেডমাস্টার বাবু রাজকুমার দাস, শিক্ষাদানপ্রণালী সম্বন্ধে, এক সুদীর্ঘ সারগর্ভ রচনা পাঠ করিয়াছেন। আগামী সভায় ঢাকা কলেজের সুযোগ্য প্রফেসার গণিতশাস্ত্রবিশারদ বাবু কালীপদ বসু, ও ঢাকা ট্রেনিং স্কুলের সুযোগ্য হেডমাস্টার বাবু বিশ্বেশ্বর সেন মহোদয়দ্বয় "পাটীগণিত শিক্ষা" সম্বন্ধে দুইখানি রচনা পাঠ করিবেন।

সভাপতি ডাক্তার রায় মহাশয় বক্তৃতাকালে, এইরূপ সভাস্থাপনের উদ্দেশ্য, সভার উপকারিতা এবং এদেশের শিক্ষকদিগের জন্য এইরূপ সভার আবশ্যকতা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সভা কেবল নামে মাত্র পর্যবসিত না হইয়া যদি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাদানপ্রণালীর উন্নতিকল্পে যত্নবান হয়, তবে ইহার নিকট অনেক উপকারের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।" [৪৮]

প্রতিবাদ সভা :

গত রবিবার স্থানীয় জগন্নাথ কলেজগৃহে, নিম্নশিক্ষার পুস্তকসমূহ প্রাদেশিক ভাষায় বিরচিত হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদার্থ ঢাকার জনসাধারণের এ সভা আহূত হইয়াছিল। সভাস্থলে সর্বশ্রেণীর অন্যূন তিন সহস্র ব্যক্তি যোগদান করিয়া উক্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। সর্বসম্মতিক্রমে বঙ্গের অদ্বিতীয় লেখক, তীক্ষ্ণ-ধী রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর সভাপতি পদে বৃত হন। ঢাকার নবাব মাননীয় সলিমুল্লা বাহাদুর সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সহানুভূতিজ্ঞাপক পত্রপ্রেরণ করিয়াছিলেন। জয়দেবপুরের জ্যেষ্ঠ রাজকুমার রণেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, রায় যোগেশচন্দ্র মিত্র বাহাদুর, রায় চন্দ্রকুমার দত্ত বাহাদুর, বাবু আনন্দচন্দ্র রায়, বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু, বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বাবু বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বাবু রাজেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ সাগ্রহে সভায় সমাগত হইয়াছিলেন। গবর্নমেন্টের প্রস্তাবের সমালোচনা ও উহার অনিষ্টকারিতা প্রদর্শনপূর্বক পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন, উকিল বাবু গোবিন্দচন্দ্র ভাওয়াল, মুন্সী হেদায়েত বক্স প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। অতঃপর রায় বাহাদুর বিবিধ যুক্তির সহিত ধীরগম্ভীরস্বরে, উপস্থিত জনমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ রাখিয়া, আপন স্বাভাবিক মধুর শব্দবিন্যাস

ও ওজস্বিতার সহিত প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল বাংলা ভাষার উৎপত্তি, প্রাচীনত্ব, বিস্তৃতি এবং সংস্কৃতের সহিত উহার নৈকট্য প্রদর্শনপূর্বক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। সভার বিবরণ কলিকাতার প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে ও কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে যে সকল মন্তব্য পরিগৃহীত হইয়াছে, পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে তাহা অবিকল মুদ্রিত হইল।

RESOLUTIONS

That this meeting while thanking the Govt. for its intention to give usual training to the Children of the agricultural population of Bengal in easy and common Bengali, would respectfully point out that the object can be attained is thout resorting to the local dialects, the text books being written in a simple form of the standard Bengali, understood all over the country.

Proposed by Rai Chandra Kumar Datta Bahadur

Seconded by Kazi Rajiuddin.

2. That while there are no less than fifty Bengali dialects spoken in different parts of the country and widely different from one another, there is one standard Bengali—the universally acknowledged written language of the country which is acutally used in correspondence by all classes of people, including even petty shopkeepers and agriculturists, and which may therefore form a general medium of instruction.

Proposed by Rai Jogesh Chandra Mitra Bahadur.

Seconded by Babu Bisvesvar Banerji M.A.

Supported by Pandit Prosanna Chandra Vidyaratna.

3. That the writting of text books in the local dialects will tend to vulgarise and injure the nicety and punity of the Standand Bengali language which steadily growing in power and beauty and has already produced an important literature.

Proposed by Babu Ananda Chandra Roy.

Seconded by Babu Gobinda Chandra Bhowal.

Supported by Munshi Hadayet Bux.

4. That a copy of these resolutions be submitted to the Government, under the signature of the president of the meeting as a prayer, that the Government may in consideration of the opinion of all classes of the people of Bengal, be graciously pleased to use till now the common standard of written Bengali in all text books to be introduced in its primary schools.

Proposed by Babu Trailokya Nath Bose M.A., B L.

Seconded by Babu Sarat Chandra Chakravorty B L.

Supported by Dr. Raj Kumar Chakravorty. [৪৯]

সংস্কৃত শিক্ষা ও সারস্বত সমাজ : *[বর্তমান সংস্করণ ৬০১-৬০২ পৃঃ দেখুন]*

পূর্বে এদেশীয় অধিকাংশ লোকের শিক্ষা বিষয়ে এককালে অনুরাগ মাত্র ছিল না। বলিতে কি যে সময় এখানে প্রথম নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয় তখন বৃত্তিদান স্বীকার করিয়াও মৃত মহাত্মা অভয়চরণবাবুকে ছাত্র সংগ্রহ বিষয়ে অনেকদিন পর্যন্ত অকৃতকার্য হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু এইক্ষণ আর সেদিন নাই। এইক্ষণ এ প্রদেশীয় দেশীয় ভাষাধ্যায়ীদিগের অধিকংশের শিক্ষানুরাগ তেজীয়ান হইয়া উঠিয়াছে তাহারা, নর্মাল স্কুলের বর্তমান শিক্ষাদ্বারা পরিতৃপ্ত হইতেছেন না। কী নর্মাল স্কুলের ছাত্র কী ইংরাজি স্কুলের ছাত্র, কী অন্যান্য লোক, অনেকের একান্ত বাসনা উত্তমরূপে সংস্কৃত ভাষা ও তদন্তর্গত নানাশাস্ত্র শিক্ষা করেন। কেবল উপায়ের নিতান্ত অসম্ভাববশত তাঁহাদিগের সেই বাসনা পরিপূর্ণ হইতে পারিতেছে না। যদি বল কলিকাতাস্থ সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহারা শিক্ষালাভ করিতে পারেন, কিন্তু এ প্রদেশীয়দিগের পক্ষে তাহা সহজ ব্যাপার নহে। কলিকাতা দূরবর্তী স্থান। এ অঞ্চল নিবাসীদিগের প্রায় কাহারই আত্মীয় বন্ধু-বান্ধাব বা জ্ঞাতি কুটুম্ব তথায় নাই। বিশেষতঃ তথায় অবস্থা তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। অনেকে অন্যের শরণ গ্রহণ করিয়া কোন প্রকারে শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন। এমন অবস্থায় কলিকাতায় থাকিয়া শিক্ষা করা তাঁহাদিগের কতদূর সাধ্যায়ত্ত, পাঠকবর্গই বিবেচনা করিতে পারেন।

যদি ঢাকায় একটি সংস্কৃত কলেজ সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলেই এ প্রদেশীয়দিগের সংস্কৃত শিক্ষার অসুবিধা দূরীকৃত হইতে পারে। ঢাকায় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হইলে যে কেবল ঢাকারই উপকার হইবে এমত নহে। দক্ষিণ-পূর্ব বিভাগের কয়েক জিলারই উপকার হইবে। কুমিল্লা ময়মনসিংহ প্রভৃতি জিলার লোকের পক্ষে কলিকাতায় থাকা যতদূর কষ্টসাধ্য ও অর্থসাধ্য। ঢাকায় থাকা তত ক্লেশকর নহে।

আমরা নির্বন্ধাতিশয় সহকারে গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করি, তাঁহারা ঢাকায় যেমন ইংরেজি কলেজ স্থাপন করিয়া নিম্নবাংলার মহান উপকার সাধন করিতেছেন, সেইরূপ একটি সংস্কৃত কলেজও সংস্থাপন করিয়া লোকের সংস্কৃত শিক্ষার অভাব দূরীভূত করুন। [৫০]

টোল সমূহে গবর্নমেন্টের সাহায্য দান :

...গবর্নমেন্ট এতদঞ্চলের সংস্কৃত টোলসমূহের উন্নতি সাধন জন্য বর্তমান বর্ষে ৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। গত বর্ষে এতদর্থে ৩৫০ টাকা প্রদান করা হয়। এবারে পাঁচশত টাকা প্রদান করা হইল ভবিষ্যতে আরো অধিক দান করা-হইবে এরূপ ভরসা করা যাইতে পারে। ভিন্ন দেশীয় ও ভিন্ন জাতীয় গবর্নমেন্ট অস্মদ্দেশীয় মৃতকল্পা সংস্কৃত ভাষার জীবন রক্ষণে সযত্ন হইয়াছেন, ইহা গবর্নমেন্টের অল্প উদারতা ও আমাদিগের অল্প আনন্দের বিষয় নয়। এদেশীয় সকলেরই কৃতজ্ঞচিত্তে গবর্নমেন্টকে ধন্যবাদ প্রদান করা উচিত। গত ৩১ বৈশাখের ঢাকা প্রকাশে আমরা প্রকাশ করিয়াছি। বিগত বর্ষে এতদঞ্চলস্থ সংস্কৃত টোলের ছাত্রদিগের পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক ছাত্র ও অধ্যাপক মহাশয়দিগকে পুরস্কার দেওয়া হয়। তাহার কতক টাকা এ পর্যন্ত বিক্রমপুরের স্কুল ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়ের নিকট গচ্ছিত আছে। অদ্যাপি তাহাদিগের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করেন নাই। অত্রত্য হিন্দু ধর্ম রক্ষিণী সভার কোন কোন সভ্য অধ্যাপকগণকে উক্ত টাকা গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই তাহারা তাহা গ্রহণ করিতেছেন না। আমরা কোন প্রামাণিক লোক প্রমুখাৎ শুনিয়াই এরূপ লিখিয়াছিলাম। এক্ষণে শুনিতে পাইলাম, স্কুল ইনস্পেক্টর মার্টিন সাহেবও ঐরূপ রিপোর্ট করিয়াছিলেন। যাহা হউক স্থানীয় কোন পত্রিকা সম্পাদক আমাদিগের কথায় প্রতিবাদ করিয়া লিখেন, "হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভার সভ্যগণ অধ্যাপকদিগকে উক্ত টাকা লইতে নিষেধ করিয়া দেন নাই। তাহারা আপনা হইতেই গবর্নমেন্টের প্রদত্ত টাকা গ্রহণ করিতে অসম্মত।" যে কারণেই হউক বিক্রমপুরস্থ কোন কোন প্রধান অধ্যাপক যেমন—গবর্নমেন্ট প্রদত্ত টাকা গ্রহণে সম্মত হইতেছেন না, তখন অন্যান্য অধ্যাপকেরা সাহস অবলম্বন করিবেন আমাদিগের অন্তঃকরণে স্থান পাইতেছে না। অতএব

গবর্নমেন্ট যে উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ সংস্কৃত টোলের সাহায্য দানে উন্মুখ হইয়াছেন, সে উদ্দেশ্য বৃথায় যাইবে। সুতরাং গবর্নমেন্ট উত্তরোত্তর টোল সমূহে অধিকতর সাহায্য দিতে থাকুক। এক্ষণ যাহা দান করিয়াছেন, ভবিষ্যতে তাহাও স্থগিত করিয়া দিবেন। ইহা কি সামান্য লজ্জা ও দুঃখের বিষয় হইবে? যে কার্যের উৎসাহদাতা ও সাহায্যকারী নাই, সে কার্যে যদি গবর্নমেন্ট আগ্রহপূর্বক উৎসাহ প্রদর্শন ও সাহায্য দান করেন, তাহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? ... অধ্যাপকগণকে সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি, তাঁহারা যদি সংস্কৃত ভাষা ও টোলের জীবন রক্ষা করিতে চান, বৃথা মান অভিমানের বশবর্তী হইয়া কখনো যেন রাজকীয় উৎসাহে উপেক্ষা প্রদর্শন না করেন। রাজাকে হীন জাতি বিবেচনা করিয়া তৎসাহায্য গ্রহণে অসম্মত হওয়া কোন শাস্ত্র সঙ্গত কার্য? আমরা হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভার সভ্যগণকেও বিনয়ের সহিত অনুরোধ করি যথার্থই যদি তাহাদিগের উক্ত কার্যে অমত না হয়, তাহারাও একবার সভার পক্ষ হইতে অধ্যাপকগণকে অনুরোধ জ্ঞাপন করুন। ভরসা করি হিন্দু ধর্ম রক্ষিণীসভা প্রযত্নপরায়ণ হইলে টোলধারী পণ্ডিতগণ এ পর্যন্ত অসম্মত থাকিলেও সম্মত হইতে পারেন। প্রসঙ্গতঃ বিদ্যাধ্যাপন সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষকে একটি কথা বলিয়া আমরা প্রস্তাব উপসংহার করিতেছি। গতবর্ষে বিক্রমপুর ও পারজোয়ার ব্যতীত অন্যান্য স্থানের টোল সমূহে পরীক্ষার সংবাদ বড় প্রচার হইয়াছিল না। সুতরাং কেবল উক্ত স্থান হইতে কয়েকটি ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এবার যেন সেরূপ না হয়. ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী বিক্রমপুর, পারজোয়ার, চাঁদপ্রতাপ ভাওয়াল ও সোনারগাঁ, প্রভৃতি প্রত্যেক পরগণার টোল সমূহেই যেন সবিশেষরূপে পরীক্ষার সংবাদ প্রচার করা হয়। তাহাতে যেমন কর্তৃপক্ষের সমদর্শিতা প্রকাশ পাইবে, সেইরূপ পরস্পর প্রতিযোগিতা দ্বারা উপরিউক্ত আশঙ্কাও ক্রমে বিদূরিত হইবে।[৫১]

কেদারনাথ মজুমদারের বিবরণ থেকে জানা যায় সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চার জন্য ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা সারস্বত সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। তৎকালীন ধনাঢ্য ব্যক্তিদের আর্থিক অনুদানে সমাজের কার্যাবলী পরিচালিত হত। ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হত এবং কৃতী ছাত্রদের পুরস্কৃত হত। সমাজ বিধিবদ্ধ নিয়মে পরিচালিত হত। কৃতী অধ্যাপক ছিলেন পরীক্ষক। কিন্তু ক্রমে সারস্বত সমাজে দুর্নীতি বাসা বাধে এবং দুটি ভাগ হয়ে যায়। তাদের দলাদলি প্রকাশ্যে বেরিয়ে পড়ে। সে সম্পর্কে সংবাদপত্র থেকে জানা যায় ঃ

"সারস্বত সভার দলাদলিতে যে একটা কুফল ফলিতেছে। ইহা কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নহে। যেমন দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইউনিভার্সিটি) সৃষ্টি, তদ্রূপ সংস্কৃত শিক্ষার নিমিত্ত পূর্ববঙ্গ সারস্বত সভার সৃষ্টি হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বয়ং গবর্নমেন্ট, সারস্বত সভার অধ্যক্ষ ছিলেন। এক মতাবলম্বী কয়েকজন পণ্ডিত। এক ব্যক্তি অথবা একমত ভিন্ন এরূপ কার্য পরিচালিত হওয়া নানা কারণে নিতান্ত কঠিন। অথবা বিশৃঙ্খলাজনক। মনে করুন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সম্বন্ধে কত শাসন। বিদ্যালয়ের পরিচালন সম্বন্ধে কত বন্ধন, তথাপি কঠিন দণ্ডের ভয় না করিয়া ছাত্রেরা প্রশ্নপত্র চুরি করে, শিক্ষকেরা উত্তর বলিয়া দেন, শিক্ষকেরা পুরস্কারের লোভে নিতান্ত অনুপযুক্ত ছাত্রকেও পরীক্ষোত্তীর্ণ করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়া থাকেন। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কত শিক্ষক প্রতি বৎসর দণ্ডপ্রাপ্ত হইতেছেন। তাহার সংখ্যা করা যায় না। অন্যায়রূপে অনুপযুক্ত ছাত্র পাশ করার পক্ষে শিক্ষকের কিরূপ স্বার্থ, তাহা উহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

এতকাল পূর্ববঙ্গে একটি মাত্র সারস্বত সভা থাকাতে এবং তাহাতে প্রকৃত পক্ষে অল্প ক. একজন মাত্র পণ্ডিতের হস্তে সমস্ত টোল চতুষ্পাঠীর শাসন ক্ষমতা অর্থাৎ অনুপযুক্ত টোলের পণ্ডিতকে বৃত্তি না দেওয়া ও উপযুক্ত পণ্ডিতকে বৃত্তি দেওয়ার অধিকার থাকাতে ছাত্রদিগকে পরীক্ষোত্তীর্ণ করার কার্যটি সুশৃঙ্খল রূপেই চলিত, সম্ভাবনা ছিল ; কিন্তু বর্তমান দলাদলিতে ছাত্রদিগের মধ্যে ভাল শিক্ষা হওয়া অসম্ভব।

দলাদলিতে পণ্ডিতের গন্ধ যাহার গাত্রে আছে তিনিই অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ছাত্র মহামূর্খ হইলেও তাহকে পাশ করিয়া বৃত্তি ও পারিতোষিক দিতে হইবে। না দিলেই যে তিনি অন্য দলে যাইয়া সর্বনাশ করেন, ইহা কোনক্রমেই সহ্য নহে। পরীক্ষকদিগের নিজ ঘর হইতে যখন বৃত্তি পারিতোষিক দিতে হয় না, যাহারা টাকা দাতা, তাহারা যখন পরীক্ষা গ্রহণে সমর্থ নহেন, তখন আর কথা কি? যে কোন প্রকারে স্বদল বাড়াইতে হইবে। যত গণ্ডমূর্খকে ধরিয়া আনিয়া বিদ্যাসাগর উপাধি প্রদান করা হইবে।

এরূপভাবে দলাদলিতে দেশের ভয়ানক অনিষ্ট সম্ভাবনা। বাংলাদেশে প্রাচীন নিয়মে পরীক্ষোত্তীর্ণ একজন পণ্ডিত থাকিলেও আমরা পরিতৃপ্ত থাকিতে পারি। কিন্তু হাজার হাজার মূর্খ পণ্ডিত দেখিতে চাহি না। এরূপ মূর্খ পণ্ডিত যাহাতে জন্মিতে না পারে, তজ্জন্য সকলেরই সাবধান হওয়া আবশ্যক। যাহাতে দুইটা সারস্বত সভা ভাঙিয়া পূর্ববৎ একটা হয়, তাহাই করা এখন সকলের কর্তব্য হইতেছে। দুইটা দল হওয়াতে যাঁহাদের স্বার্থ তাহারা নিশ্চয়ই আমাদিগকে শত্রু মনে করিবেন। কিন্তু দেশের দিকে চাহিয়া আমরা তাহাদের শত্রু হইতে প্রস্তুত আছি, তথাপি পণ্ডিত সমাজের ভয়ানক পরিণাম দেখিতে ইচ্ছুক নহি। কি উপায়ে দুইটা সমাজ এক হইতে পারে, তাহাই এখন আমাদের বিবেচ্য।

আমাদের বিবেচনায় যে দলে পণ্ডিত সংখ্যা অধিক, সেই দলের মতানুসারে অন্য দলের আইস উচিত। কেননা সর্বত্রই অধিকাংশের মতানুসারে কাজ হয়। যে দলের সংখ্যা কম, সে দলের যুক্তি ভাল হইলেও কোন কাজে লাগে না। অধিকের মতানুসারে না চলিলেই যখন বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী, এবং তাহাতে অধিকাংশেরই জয়লাভের সম্ভাবনা, তখন একটু ন্যূনতা স্বীকার করিতে হইলেও অল্পসংখ্যককে অধিকাংশের মতানুসরণ করিতে হইবে। দুইটি সারস্বত সমাজকে ঐভাবেই এক করিতে হইবে। এখন কোন দলে পণ্ডিত সংখ্যা অধিক, তাহাই নির্ধারণ করা আবশ্যক হইতেছে। এখন কোন পণ্ডিত কোন দলে, তাহা গণিতে লইলে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা হইবে। নিজ নিজ দলবৃদ্ধির জন্য অনেক অকার্য কুকার্য করা হইবে। বিশেষতঃ সমস্ত দেশের কোন পণ্ডিত কোনদিকে, তাহা নির্ণয় করা কাহারও সাধ্যাশয় নহে। অতএব পূর্বে কোন পক্ষে কত পণ্ডিত স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মীমাংসা করাই কর্তব্য। আমরা পূর্বে দুই সভারই স্বাক্ষরকারী পণ্ডিতদিগের নাম দেখিয়াছি, তাহাতে যে পণ্ডিত জগদ্বন্ধু তর্করত্ন সভাপতি ও যে দলের পোষটা স্বয়ং ভাওয়ালের রাজা প্রভৃতি, সেই দলেই পণ্ডিত সংখ্যা অধিক দেখিয়াছি। এ দলের পণ্ডিত সংখ্যা অন্যদল অপেক্ষা দ্বিগুণেরও বেশি, এবং যাহারা অন্যদলে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহাও আমরা অবগত হইয়াছি। অতএব পণ্ডিত জগদ্বন্ধু তর্করত্ন দলকেই সারস্বত সমাজরূপে স্বীকার করা ও অন্য দল ভাঙিয়া ফেলান কর্তব্য হইতেছে।

আরও বিশেষ কারণে পণ্ডিত জগদ্বন্ধুর দলকেই স্থায়ী সারস্বত সমাজ মনে করা আবশ্যক হইতেছে। এতকাল সারস্বত সমাজ প্রধানতঃ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের অর্থে ও ভাগ্যকুলের সরীকের অর্থে চলিয়াছে। বর্তমান দলাদলিতে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে ভাগ্যকুলের বাবু হরেন্দ্রলাল ও অন্য এক সরীক আছেন। কিন্তু অন্যপক্ষে মাত্র ভাগকুলের দুই সরীক আছে।

ঐ দুই সরীকের মধ্যে কর্তা কিন্তু ৭/৮টি। লোকে বলে "ভাগের মায় গঙ্গা পায় না"। ইহাদের নিকটে সে আশঙ্কা খুব আছে। আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি, ইহারা ঐ কারণে কখনও নিজের কথা ঠিক রাখিতে পারেন না। কিন্তু এ পক্ষে সেরূপ সরীকী মতভেদ নাই। বাবু হরেন্দ্রলাল প্রভৃতিতে আছেনই, তদ্ভিন্ন যাহার প্রচুর অর্থে এতকাল সারস্বত সভা পরিচালিত হইয়াছে, সেই রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের সদনুষ্ঠানে সদা উন্মুক্ত ধন ভাণ্ডার রহিয়াছে। এতৎভিন্ন রায় যোগেন্দ্র কিশোর চৌধুরী বাহাদুর প্রভৃতি যাহারা সারস্বত সমাজের পোষক, তাহারা ব্রাহ্মণ বংশধর রাজার পক্ষ ছাড়িয়া যে অন্যপক্ষ যাইবেন, ইহা কিছু অসম্ভব।

কেননা আমরা জানি, ময়মনসিংহের ব্রাহ্মণ জমিদারগণ শূদ্র বৈদ্য যাজী ব্রাহ্মণদিগকেও একটু ঘৃণা করেন। ব্রাহ্মণ রাজার অর্থে সারস্বত সভার পণ্ডিতেরা চলিতেছেন, এই বিশ্বাসে তাঁহাদের কোন দ্বৈধ উপস্থিত হয় নাই বটে, কিন্তু এখন সে ভাব থাকিবে কিনা সন্দেহ। রাজা শ্রীনাথ এই উত্তেজনার সময়ে যদি দুই লাখ টাকার কোম্পানির কাগজ করিয়া সারস্বত সমাজকে দান করেন, তবে তাহার সুদে দ্বিতীয় সারস্বত সভা টিকিয়া দেশে একটা অবিদ্যা প্রকাশের দলাদলি চিরস্থায়ী হইতে পারে। নতুবা অন্য উপায়ে পণ্ডিত অদ্বৈত ন্যায়রত্ন প্রমুখ পণ্ডিতগণ দল রক্ষা করিতে পারিবেন না, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। অতএব এখন দলাদলি না করিয়া যাহাতে সারস্বত সভার সম্মান ও উদ্দেশ্য ঠিক থাকে তাহা করাই তাহাদের কর্তব্য। যাহারা শুধু দলাদলি বৃদ্ধির চেষ্টায় আছেন, এ প্রবন্ধ তাঁহাদের বিরক্তির কারণ হইলেও ভবিষ্যতের ও সমাজের প্রতি চাহিয়া ধীরভাবে বিবেচনা করিতে আমরা তাহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি।[৫২]

দুটি সারস্বত সমাজের ভূমিকা নিয়ে সংবাদপত্রের সমালোচনার পটভূমিকায় পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের উজ্জ্বল কার্যাবলীর একটি পর্যালোচনাও চোখে পড়ে। তাছাড়া সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য একটি কলেজ পর্যায়ের শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল ঃ বিগত ২৯শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের একবিংশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ মহাশয়ের স্বরচিত শ্লোকাবলী পাঠ, সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কৃত সংস্কৃত ও বাংলাভাষায় বক্তৃতা ও অর্থসচিব শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের প্রাণস্পর্শিনী ইংরাজি বক্তৃতা প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা বক্তব্য ছিল, গত সপ্তাহেই আমরা তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি। সভার সাজসজ্জা, আড়ম্বর ও বার্ষিক রিপোর্ট ইত্যাদি সম্বন্ধে আমরা বেশি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। বাগ্মিপ্রবর শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের সেদিনকার সেই সারগর্ভ সুন্দর বক্তৃতা ও সভার রিপোর্টে সভার আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত শ্রবণে এবং স্থানীয় উচ্চতম ইংরেজ রাজপুরুষদিগের এ সভার প্রতি সানুরাগ উৎসাহ দর্শনে, অদ্য আমরা সভার কর্তৃপক্ষের সমীপে একটি প্রস্তাব করা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিতেছি।

এই পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ আজ বাইশ বৎসর যাবৎ ঢাকা নগরে প্রতিষ্ঠিত। এ সমাজ হইতে এই বাইশ বৎসরে কৃতী ছাত্র উপযুক্ত উপাধি পাইয়া পণ্ডিতের ব্যবসায় লিপ্ত রহিয়াছেন। এই পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের অনুকরণে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে অনেকগুলি পরীক্ষাসমিতি গঠিত হইয়াছে। এবং সেই সকল সমাজ হইতেও বর্ষে বর্ষে বহু ছাত্র পণ্ডিত উপাধি লইয়া বাহির হইতেছেন। এ অংশে, বঙ্গদেশে ঢাকার এই সারস্বত সমাজই আদি প্রথপ্রদর্শক।...

পাশ্চাত্য জ্ঞানে শিক্ষিত, সভায় উপস্থিত অন্যবিধ গণ্যমান্য দেশীয় ভদ্র সম্প্রদায়েরও এই সমাজের প্রতি যেরূপ অনুরাগ দেখিতেছি, তাহাও পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ আশাপ্রদ। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়াই, আমরা আজি, পূর্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজের নিকট এক অতি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব করিতে অগ্রসর। প্রস্তাবটি এই, এই পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের অনুকরণে এদেশে বহু সংখ্যক পরীক্ষাসমিতির সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ঢাকার এই পূর্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজই এ বিষয়ে প্রথপ্রদর্শক। দেশে এখনও বহু টোল আছে—টোলে কথঞ্চিৎ শাস্ত্রচর্চাও হইতেছে। কিন্তু, যে শিক্ষায় বর্তমান যুগে সেই পুরাতন ঋষিদিগের সেই পুরাতন ভাব পূর্ণাবয়বে বিকাশপ্রাপ্ত হইতে পারে, তাদৃশ গভীর ও ... বিদ্যালাভের ব্যবস্থা কোথাও নাই বলিয়াই আমরা দুঃখিত। একমাত্র শাস্ত্রের, অন্নচিন্তাক্লিষ্ট একটিমাত্র অধ্যাপকদ্বারা প্রতি টোলে সেইরূপ ব্যাপক শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়াও অসম্ভব। বিশেষতঃ গবর্নমেন্টও যখন উচ্চ শিক্ষা হইতে ক্রমশঃ হাত গুটাইয়া লইতেছেন এবং উচ্চকল্পের যথার্থ শিক্ষা ভিন্ন দেশে

যথার্থ উন্নতি যখন অসম্ভব, তখন দেশীয়দিগের যত্নে, দেশীয়ভাবে, দেশীয় শিক্ষাদানের নিমিত্ত কলেজ প্রভৃতির মত উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় থাকা একান্ত আবশ্যক। অতএব আমরা প্রস্তাব করি, পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের যত্নে ও কৃতিত্বে ঢাকা নগরে একটি উচ্চশ্রেণীর সংস্কৃত শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হউক এবং এই শিক্ষালয়ে—ন্যায়, দর্শন, বিজ্ঞান, বেদ, বেদান্ত, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ এবং উচ্চ শ্রেণীর ব্যাকরণ ও উচ্চশ্রেণীর কাব্য সাহিত্যাদি অধ্যাপনার বিশদ ব্যবস্থা থাকুক। ইহার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানাদি সংক্রান্ত বিবিধতত্ত্ব, এনাটমি, সার্জারী ও রাসায়নিকতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদানের নিমিত্ত ইংরাজি প্রফেসার নিয়োগেরও বিধান হউক। এইরূপে পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ একদিকে শিক্ষাদান, অপরদিকে পরীক্ষাগ্রহণ ও উপাধি দান প্রভৃতি কর্মের যথারীতি অনুষ্ঠান করিয়া ছোট খাট একটি দেশী বিদ্যালয়ে পরিণত এবং পরীক্ষাসমিতি সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ যেমন আদর্শস্বরূপ উচ্চ শিক্ষাদান সম্বন্ধেও সেইরূপ আদর্শ স্থানীয় হউন, ইহাই আমাদিগের প্রস্তাব ও অনুরোধ।... [৫৩]

ঢাকা ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ক্রিকেট খেলা :

ঢাকা কলেজ ক্লব ও প্রেসিডেন্সি কলেজ ক্লবের ক্রিকেট খেলা নিয়া বড়ই গোল বাধিয়া উঠিয়াছে দেখিতেছি। কলিকাতার কতিপয় সহযোগী প্রেসিডেন্সির জয় ঘোষণা করিতেছেন। তন্মধ্যে সহযোগ "সময়" যে কিছু বিস্তৃতভাবে তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত হইয়াছি। নিম্নে তাঁহার মত সংক্ষেপে লিখিত হইল।

১. এই খেলায় কোন অধ্যাপকের খেলিবার কথা ছিল না।

২. খেলায় প্রথম দিন বুথ ও টেপার বেশি দৌড় করিয়াছিলেন বলিয়া ঢাকার জয় হইয়াছিল।

৩. দ্বিতীয় দিনে ঢাকার সাহেব দুইজনকে ছাড়িয়া খেলিবার, ও প্রথম দিনের মধ্যে ষোলআনা পরিত্যাগ করিয়া শুধু দ্বিতীয় দিনের দৌড় দেখিয়া জয় পরাজয় স্থির করার কথা হয়।

৪. দ্বিতীয় দিনে ৪টা দৌড় বেশি করিয়া প্রেসিডেন্সী ক্লব জিতিলেন। ঐ দিন প্রেসিডেন্সির কতটা ভাল খেলুড়ে খেলিতে পান নাই, নচেৎ ঢাকার বিলক্ষণ হার হইত।

একটি একটি করিয়া সহযোগীর এই কয়েকটি কথার বিচার করিব।

১. অধ্যাপকগণের খেলিবার কথা ছিল না একি সহযোগীর কল্পনা? আমরা ঢাকা কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকগণের নিকট শুনিয়াছি অধ্যাপকগণ খেলিবার জন্যই কলিকাতা গিয়াছিলেন, নচেৎ তাঁহাদের যাইবার প্রয়োজন ছিল না। এ কথার প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি কথা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক।

ক. ঢাকা কলেজের কাপ্তান বাবু সারদারঞ্জন রায়ের নিকট কোন অধ্যাপক খেলিতে পারিবেন না এই মর্মের কলিকাতা হইতে কেহ কোন চিঠি লিখেন নাই। অথচ কোন খেলুড়েকে ছাড়িয়া বা লইয়া খেলিবার বন্দোবস্ত কাপ্তেনের সহিতই করিতে হয়।

খ. ঢাকায় যখন ১১ জন ক্রীড়ক নির্বাচিত হন তখন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট বুথ সাহেব শুধু ৯ জন বাঙালিকে প্রস্তুত রাখিতে বলেন, কিন্তু সারদাবাবু পীড়ার আশঙ্কা দেখাইয়া আরও দুই জন লোক সঙ্গে নেন। বুথ সাহেবের খেলিবার মতলব না থাকিলে শুধু ৯ জনকে প্রস্তুত থাকিতে বলিবেন কেন?

গ. সারদাবাবু উভয় দিন খেলিয়াছিলেন অথচ তিনি একজন অধ্যাপক জানিয়াও তাঁহার খেলাতে কেহ আপত্তি করে নাই।

ঘ. ঢাকার ক্রীড়কগণ কলিকাতায় যাইয়া শুনিলেন, বুথ ও টেপার যাহাতে না খেলিতে পান রো সাহেব সে চেষ্টা করিবেন। এ বিষয়ে নিশ্চিত সংবাদ জানিবার জন্য প্রথম খেলার

দিবস প্রাতে সারদাবাবু বুথ সাহেবের সহিত দেখা করেন। সারদাবাবুর কথার উত্তরে বুথ সাহেব বলেন "What has Mr. Rowe to do with me? I shall make my own arrangements" ঢাকার ভাল বোলারটির জ্বর হইয়াছে শুনিয়া বুথ বলেন, "Doesn't matter. Mr. Tepper will bowl them all out". সহযোগীকে জিজ্ঞাসা করি এসকল কথা হইতে অধ্যাপকগণের খেলিবার কথা ছিল না, এরূপ বোধ হয় কি?

ঘ. চিহ্নিত কথাগুলি আমরা সারদাবাবুর নিজ মুখে শুনিয়াছি। সুতরাং ঐ সকলে কোন ভ্রান্তি থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

২. বুথ ও টেপার সাহেব বেশি দৌড় করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহাদের দৌড় ছাড়িয়া দিলে ও ঢাকার ৭৬ এবং প্রেসিডেন্সির ৪৯ দৌড় হয়। অথচ সহযোগী অম্লান মুখে বলিতেছেন, বুথ ও টেপার বেশি দৌড় করিয়াছিলেন বলিয়াই প্রথম দিন ঢাকার জয় হইয়াছিল। ধন্য সহযোগীর সত্যপ্রিয়তা। অথবা শাস্ত্রের কথা ফলিতেছে, কাল ধর্ম কীর্তনে লিখিত আছে সত্য গোপন এ সময়ের ধর্ম।

৩. সহযোগীর ৩ সংখ্যক মতগুলি সম্পূর্ণ অলীক। দ্বিতীয় দিনে প্রেসিডেন্সির ক্রীড়কগণ প্রথম দিনের দৌড় বহাল রাখিয়া বাট ধরিতে অগ্রসর হন। কিন্তু রো ও হুইলার সাহেব এবং অপর কয়েকটি প্রেসিডেন্সির ক্রীড়ক একবাক্যে স্বীকার করেন যে, দ্বিতীয় দিন হাজার ভাল খেলিলেও পূর্ব দিনের ক্ষতিপূরণ প্রেসিডেন্সির পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। তখন সারদা বাবু রো সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন—

"তবে কি আপনারা স্বীকার করিতেছেন যে Dacca College vs Presidency College পূর্ব দিনের ক্রীড়া দৃষ্টেই ঢাকার স্বপক্ষে নিস্পত্তি হইল?"

রো সাহেব তাহাই স্বীকার করেন।

সারদাবাবু পুনরায় বলেন "তাহা হইলে আমরা যে উদ্দেশ্যে ঢাকা হইতে আসিয়াছিলাম তাহা "সিদ্ধ" হইয়াছে। এক্ষণে আর খেলা নিষ্প্রয়োজন। তৎপর সেদিনকার জন্য উভয় দলে Scratch match (আপোশ খেলা) খেলিবার প্রস্তাব হয়। বুথ ও পেটার খেলিতে অসম্মত হন।

এক্ষণে দ্বিতীয় দিনের খেলা লইয়া হারজিত ধরা হইল, সহযোগীর এই উক্তি কতদূর সত্য সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। বস্তুতঃ দ্বিতীয় দিনের খেলার যথা সম্ভব প্রতিযোগিতার ভাব দূরে রাখিবার জন্য এমনও প্রস্তাব হইয়াছিল যে, উভয় দল হইতে কিছু কিছু নিয়া নতুন দুইটি দলে গড়িয়া খেলা হউক। টেপার সাহেব সময় যাইতেছে বলিয়া তাড়াতাড়ি না করিলে তাহাই করিত।

৪. দ্বিতীয় দিনে প্রেসিডেন্সির কতকটা ভাল খেলুড়ে খেলিতে পান নাই সত্য। এই ঘটনা হইতে সহযোগী বিস্তৃত বাধাপ্রোল্লঙ্ঘন করিয়া একসঙ্গে এই সিদ্ধান্তে গিয়া পঁহুছিয়াছেন যে, উহারা খেলিতে পাইলে প্রেসিডেন্সির বিস্তর নম্বর বেশি হইত। সহযোগীকে অনুরোধ করি, ঐ সকল ব্যক্তি পূর্বদিনের খেলার ২/১ দৌড় করিয়া একজন জ্বরভোগ সাগুখেকো বাঙালির বলে আউট হইলেন কেন? তাহার কারণ প্রদর্শন করুন।

দুঃখের বিষয়, প্রেসিডেন্সির পক্ষ সূক্ষ্ম লক্ষ্য করিলে পরই সহযোগীর চক্ষে পক্ষপাতের পরদা চড়িল। ঢাকার দিক তিনি আর দেখিতে পাইলেন না। তিনি দেখিতে পাইলেন না যে, ঢাকার সর্বপ্রধান Bowler ও সর্বপ্রধান Hard hitter জ্বরে পড়িয়া একেবারে অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছেন। তিনি দেখিতে পাইলেন না যে দ্বিতীয় দিনে ঢাকার পক্ষের Back stop টীর হাতে চোট লাগাতে বাই নম্বর বেশি হইতেছে দেখিয়া বুথ সাহেব একজন নিরীহ প্রকৃতির লোককে বল করিতে নিযুক্ত করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন না যে, যে সকল ব্যক্তিকে আউট না করা পূর্বদিন প্রেসিডেন্সির পক্ষে দায় হইয়া উঠিয়াছিল ঢাকার দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার পরদিন Runout হইয়া গেলেন। হরি! হরি! পরিশেষে এসকল দুর্ঘটনা সত্ত্বেও যখন টেলিগ্রাফ বোর্ডে

ঢাকার পক্ষে ১০৩ দৌড় উঠিয়া পড়িল তখন umpire সাহেবের চক্ষু ও মন অন্যত্র থাকাতে তিনি ঢাকার একটা ভাল খেলুড়েকে অকারণ আউট বলিয়া বসিলেন, দর্শক মাত্রেই সেটি দেখিয়া umpire-কে ধিক্কার দিতে লাগিল, আমাদের সহযোগী তাহা দেখিলেন না। সহযোগীদিগকে উপসংহারে বলিয়া রাখি, যে প্রেসিডেন্সির ভাল খেলুড়ে কয়টিই আশৈশব ঢাকা ক্রিকেট ক্লবে শিক্ষিত প্রেসিডেন্সি ক্লব ক্রীড়ার পটুতা দেখাইতে পারিলেও তাহা ঢাকা ক্লবেরই গৌরব ঘোষণা করিত। অধিক কি ঢাকা ক্লবে যাহারা শিক্ষিত হন নাই, তাহাদের পক্ষে ঢাকা ক্লবকে পরাজয় করা সহজ নহে। সম্প্রতি এখানে "পূর্ববঙ্গ ক্রিকেট ক্লব" নামে একটি ক্লব হইতেছে, আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেছি পশ্চিম ও দক্ষিণ সমবেত হইয়া আগামী বৎসর ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করুন, তবেই পূর্ববঙ্গ অপেক্ষা ক্রিকেট খেলার নিজহীনতা বুঝিতে পারিবেন।

এস্থলে আমরা শ্রীযুত বাবু প্রতাপচন্দ্র দাসকে ঢাকা ক্লবের জন্য তাঁহার প্রচুর ও অকাতর অর্থব্যয় হেতু ধন্যবাদ দিয়া অনুরোধ করিতেছি, তিনি যেন এই নবজাত পূর্ববঙ্গ ক্রিকেট ক্লবের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তাহারই প্রথিত বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া এই ক্লবের মেম্বারগণ কার্যে অগ্রসর হইতেছেন।[৫৪]

বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :

বর্তমানে ঢাকাসহ সমগ্র দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত। ১৯৮০ খ্রিঃ দেশব্যাপী সাক্ষরতা কর্মসূচি পালিত হওয়ার পর দেশে শিক্ষিতের হার বেড়েছে। সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের সঙ্গে বেশ কয়েকটি মিশন স্কুলও আছে ঢাকায়। ১৯৬৫ খ্রিঃ তালিকায় ৬টি মিশনারী বিদ্যালয়ের নাম পাওয়া যায় ঃ

১. বান্দুরা হাইস্কুল, নওয়াবগঞ্জ, ঢাকা সদর, দক্ষিণ।
২. সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস হাইস্কুল, সূত্রাপুর, ঢাকা সদর, দক্ষিণ।
৩. সেন্ট গ্রেগরীস হাইস্কুল, সূত্রাপুর, ঢাকা সদর, দক্ষিণ।
৪. সেন্টা যোসেফ হাইস্কুল, মোহাম্মদপুর, তেজগাঁও, ঢাকা সদর, দক্ষিণ।
৫. সেন্ট মেরিস গার্লস হাইস্কুল, কালীগঞ্জ, ঢাকা সদর, উত্তর।
৬. সেন্ট নিকোলাস হাইস্কুল, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

বৃহত্তর ঢাকা জেলার অন্যতম কয়েকটি বিদ্যালয় (১৯৮৩ খ্রিঃ) হল :

১. এ. ডি. জে. এম. সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা।
২. আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, আরমানিটোলা, ঢাকা।
৩. বাংলাবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বাংলাবাজার, ঢাকা।
৪. বরানদ্রি কে. কে. এম. কলেজিয়েট সরকারি হাইস্কুল, নরসিংদি, ঢাকা।
৫. ধানমণ্ডি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ধানমণ্ডি, ঢাকা।
৬. ধানমণ্ডি সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ধানমণ্ডি, ঢাকা।
৭. ঢাকা কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয়, বাংলাবাজার, ঢাকা।
৮. গণভবন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
৯. গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, নিউমার্কেট, ঢাকা।
১০. সরকারি মুসলিম হাইস্কুল, পুরান ঢাকা।
১১. ইসলামিয়া সরকারি হাইস্কুল, পুরান ঢাকা।
১২. জয়দেবপুর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, জয়দেবপুর, ঢাকা।
১৩. কালীগঞ্জ আর. আর. এন. পাইলট সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, কালীগঞ্জ, ঢাকা।
১৪. খিলগাঁও সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, খিলগাঁও, ঢাকা।

১৫. মানিকগঞ্জ সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, মানিকগঞ্জ, ঢাকা।
১৬. মুন্সিগঞ্জ কে. কে. ইনস্টিটিউশন, মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা।
১৭. এম. কে. সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
১৮. মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
১৯. মতিঝিল সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
২০. মতিঝিল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
২১. নারিন্দা সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, নারিন্দা, ঢাকা।
২২. নারায়ণগঞ্জ আই. ই. টি. সরকারি উচ্চবিদ্যালয় নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।
২৩. নরসিংদি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, নরসিংদি, ঢাকা।
২৪. নবাবপুর সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, নবাবপুর, ঢাকা।
২৫. নিউ গভর্নমেন্ট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা।
২৬. কামরুন্নেছা সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, টিকাটুলি, ঢাকা।
২৭. নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।
২৮. কামরুন্নেছা সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, ধানমণ্ডি, ঢাকা।
২৯. রানি বিলাসমণি সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।
৩০. শেরে বাংলানগর সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
৩১. শেরে বাংলানগর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
৩২. তেজগাঁও পলিটেকনিক সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩৩. তেজগাঁও পলিটেকনিক সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

এর মধ্যে ১৩টি বালিকা বিদ্যালয় এবং ২০টি বালক বিদ্যালয়।

আনন্দময়ী স্কুল :

আনন্দচন্দ্র রায়কে একসময় ঢাকাবাসী একবাক্যেই চিনত। সফল আইনজীবী এবং প্রভাবশালী জমিদার আনন্দচন্দ্র ছিলেন অন্যতম সমাজসেবক। তিনি ছিলেন ঢাকা পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান। আনন্দচন্দ্র নিজের গ্রামে স্ত্রী আনন্দময়ীর নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। পরে বিদ্যালয়টি উঠে আসে আর্মানিটোলায় আনন্দচন্দ্রের নিজস্ব বাড়িতে।

সেন্ট গ্রেগরি স্কুল :

ঢাকার অন্যতম এই প্রাচীন বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় ১৮৯২ খ্রিঃ-এর জানুয়ারি মাসে প্রধানত ইংরেজ ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছাত্রদের জন্য। এখানে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ান হত। পুরনো বিদ্যালয় ভবন এখন আর নেই। ১৯১২ খ্রিঃ ছাত্রীদের জন্য যে বিভাগ খোলা হয়, পরে তার নাম হয় সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার স্কুল। ১৯২৪ খ্রিঃ ঢাকা বোর্ডের স্বীকৃতি পাওয়ার পর বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরে কলেজ বিভাগও খোলা হয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র হেক্টর ড্যানিয়েল ম্যাট্রিকে প্রথম হয় ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে। ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে দেশেবিদেশে সুনাম অর্জন করেছে।

আনোয়ারা মুসলিম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় :

ঢাকার অন্যতম প্রাচীন মহিলা শিক্ষাকেন্দ্র। বেচারাম দেউড়িতে ১৯৩২ খ্রিঃ ফরিদউদ্দিন সিদ্দিকি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এই বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন বেগম আমিরুন্নেছা। বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধিতে বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরা এগিয়ে আসেন। তাদেরই উদ্যোগে বিদ্যালয়টি উঠে আসে ১৩ নাজিমুদ্দিন রোডে আনোয়ারা বেগমের বাড়িতে। বিদ্যালয়ের নতুন নাম হয় মুসলিম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। আনোয়ারা বেগম নামমাত্র মূল্যে বাড়িটি বিদ্যালয়কে দেওয়ার পর, বিদ্যালয়ের নাম হয় 'আনোয়ারা বেগম

মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়"। বিদ্যালয়ের নিজস্ব তিনটি বৃহৎ ভবনের একটি হল পাঁচতলা। মোট প্রায় দু'বিঘা জমির ওপর বিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন ও খেলার মাঠ রয়েছে। একটি ছাত্রী নিবাসও আছে।

ভিকারুন্নিসা নুন বালিকা বিদ্যালয় :

প্রথমে ঢাকার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে ১৯৫২ খ্রিঃ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হলেও, পরে ১এ নিউ বেইলি রোডে দুটি বাড়িতে উঠে আসে। ইংলিশ প্রিপারেটরি স্কুল হিসাবে যাত্রা শুরু করলেও, পরে সিনিয়ার কেমব্রিজ কোর্স চালু হয়। এস. এস. সি. পরীক্ষা শুরু হয়। ১৯৬০ খ্রিঃ বর্তমানে বিদ্যালয়টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় (১৯৭৮ খ্রিঃ থেকে)।

অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয় :

আজিমপুরে ১৯৫৭ সালে যে কিন্ডারগার্টেন স্কুলটির যাত্রা শুরু হয়েছিল, পরবর্তীকালে তা প্রাইমারি ও জুনিয়ার স্কুলে পরিণত হয়। বর্তমানে এই বেসরকারি বিদ্যালয়টিতে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে কলেজ বিভাগও চালু রয়েছে। ছাত্রী সংখ্যা ২ হাজারের ওপর।

হলিক্রশ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় :

এটিও বেসরকারি বিদ্যালয়। দ্য কংগ্রিগেশন অফ দ্য সিস্টারস অফ দ্য হলিক্রশ দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়টি হলিক্রশ কলেজের একটি কক্ষে শুরু হলেও পরে স্বতন্ত্র জমি কিনে সেখানে বিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র ভবন তৈরি হয়েছে। ঢাকা বোর্ড অনুমোদিত বিদ্যালয়ে ১ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। ছাত্রী সংখ্যা হাজারের ওপর।

আজিমপুর গার্লস হাইস্কুল :

সরকারি জমিতে ১৯৫৭ খ্রিঃ এই গার্লস হাইস্কুলটি স্থাপিত হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। ১ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ান হয়।

কামরুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় :

আগে ছিল ঢাকা ইডেন কলেজের স্কুল শাখা। ১৯২৪ খ্রিঃ থেকে স্কুল বিভাগটি ঢাকা নবাব পরিবারের বিদুষী মহিলা কামরুন্নেছার নামে স্বতন্ত্রভাবে পরিচিত। ছাত্রী নিবাসসহ বিদ্যালয়টি পরবর্তী সময়ে ২৫ অভয়দাস লেনে স্বতন্ত্রভবনে স্থানান্তরিত হয়। বিদ্যালয়ের উর্দু শাখাটি পলাশীতে স্থানান্তরিত হয় পাকিস্তান আমলে। পরে ১৯৭৪ খ্রিঃ উর্দু শাখাটি সরিয়ে আনা হয়েছে ধানমণ্ডি সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে।

মহাবিদ্যালয় :

বর্তমানে ঢাকা জেলায় ১১টি সরকারি এবং ৪১টি বেসরকারি যেসব মহাবিদ্যালয় রয়েছে, সেগুলি হল ঃ

সরকারি মহাবিদ্যালয় ঃ ১৯৯০ :

১. ঢাকা কলেজ, মীরপুর রোড, ঢাকা।
২. জগন্নাথ কলেজ, সদরঘাট, ঢাকা।
৩. ইডেন মহিলা কলেজ, আজিমপুর, ঢাকা।
৪. বেগম বদরুন্নেছা মহিলা কলেজ, বকসিবাজার ঢাকা।
৫. কবি নজরুল কলেজ, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।
৬. গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, নীলক্ষেত, ঢাকা।
৭. তিতুমির কলেজ, গুলশান, ঢাকা।
৮. বিজ্ঞান কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা।

৯. সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, গ্রীন রোড, ঢাকা।
১০. শহিদ সোহরাওয়ার্দি কলেজ, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।
১১. বাংলা কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।

বেসরকারি ৪১টি মহাবিদ্যালয় হল ঃ ১৯৯০ :

১. বি. এ. এফ. শহিন কলেজ, তেজগাঁও।
২. আদমজী সেনানিবাস কলেজ, ঢাকা সেনানিবাস।
৩. দনিয়া কলেজ, গেন্ডারিয়া।
৪. নবযুগ কলেজ, কুসুরা।
৫. ইউ. উইমেন্স কলেজ, ধানমণ্ডি।
৬. ঢাকা সিটি কলেজ, ধানমণ্ডি।
৭. আদর্শ কলেজ, ধানমণ্ডি।
৮. ডঃ মালেকা সাইন্স ইনস্টিটিউট, ধানমণ্ডি।
৯. রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, মোহাম্মদপুর।
১০. মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবঃ ইনস্টিটিউট কলেজ, মিরপুর।
১১. হাবিবর জামান কলেজ, উত্তরখান।
১২. রামপুরা একরামুন্নেছা কলেজ, শান্তিনগর।
১৩. এ. বাওয়ানি মহিলা কলেজ, ঢাকা বদরঘাট।
১৪. শেখ বোরহানউদ্দিন কলেজ, নাজিমউদ্দিন রোড, ঢাকা।
১৫. রাইফেলস পাবলিক স্কুল কলেজ, পিলখানা।
১৬. শহিদুল্লাহ কলেজ, বকসিবাজার, ঢাকা।
১৭. এম. জি. আইডিয়াল ল্যাবরেটরি ইনস্টিটিউট।
১৮. মিরপুর কলেজ, মিরপুর।
১৯. মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ, মোহাম্মদপুর।
২০. লালমাটিয়া মহিলা কলেজ, মোহাম্মদপুর।
২১. নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজ, মোহাম্মদপুর।
২২. বি. ইসলামিক মহিলা কলেজ, মোহাম্মদপুর।
২৩. টি. অ্যান্ড. টি. কলেজ, মতিঝিল।
২৪. খিলগাঁও মডেল কলেজ, খিলগাঁও।
২৫. আবজুর গিফারি কলেজ, শান্তিনগর।
২৬. নটরডেম কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা।
২৭. ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি কলেজ, রমনা।
২৮. ভিকারুন্নেসা কলেজ, শান্তিনগর।
২৯. সিদ্ধেশ্বরী মহিলা কলেজ, রমনা।
৩০. হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ, শান্তিনগর।
৩১. পুরনো পল্টন মহিলা কলেজ, রমনা।
৩২. সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ওয়ারি।
৩৩. সলিমুল্লাহ কলেজ, টিপু সুলতান রোড।
৩৪. বঙ্গবাসী কলেজ, ওয়ারি।
৩৫. শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়, ওয়ারি।
৩৬. ফজলুল হক মহিলা কলেজ, ফরিদাবাদ।
৩৭. তেজগাঁও কলেজ, তেজগাঁও।

৩৮. তেজগাঁও মহিলা কলেজ, তেজগাঁও।
৩৯. হলিক্রস কলেজ, তেজগাঁও।
৪০. বি. এ. এফ. শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা।
৪১. সিদ্ধেশ্বরী কলেজ, সিদ্ধেশ্বরী।

ঢাকানগরীতে অবস্থিত পালি ও সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় ঃ ১৯৯০ :

১. ধর্মরাজিক পালি কলেজ, বৌদ্ধবিহার, কমলাপুর।
২. গেড়িবন্ধু সংস্কৃত কলেজ, হাটখোলা, টিকাটুলি।
৩. ঢাকা সংস্কৃত কলেজ, ফরাসগঞ্জ, সূত্রাপুর।
৪. পি. সি. স্বারাত চতুষ্পাটি, আরমানিটোলা।

কবি নজরুল সরকারি কলেজ :

আগে নাম ছিল ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। ঢাকা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল ১৮৪৭ খ্রিঃ। শিক্ষাব্যবস্থার কিছু সংস্কার হয় ১৯১৫ খ্রিঃ। ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কোর্স প্রবর্তন ঘটে ১৯২৩ খ্রিঃ থেকে। ১৯৬০-এর দশকে সরকার অধিগ্রহণের পর থেকে মহাবিদ্যালয় ডিগ্রি কলেজে পরিণত এবং তখন থেকে কবি নজরুল সরকারি কলেজ নামে পরিচিত।

সলিমুল্লাহ্ কলেজ :

মদনমোহন বসাক রোডে গ্র্যাজুয়েট হাইস্কুলে মহাবিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয় ১৯২৫ খ্রিঃ। বর্তমানে কলেজটি উঠে এসেছে টিপু সুলতান রোডে।

সরকারি হরগঙ্গা কলেজ :

মুন্সিগঞ্জে ১৯৩৮ খ্রিঃ এই মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় আশুতোষ গাঙ্গুলি, সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের সহায়তায়। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী এ. কে. ফজরুল হক। অন্যতম প্রতিষ্ঠা আশুতোষ গাঙ্গুলির পিতা হরনাথ এবং মাতা গঙ্গামণির নাম অনুসারে মহাবিদ্যালয়ের নাম হয় হরগঙ্গা। প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন বীরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৯৪২ খ্রিঃ ডিগ্রি কোর্স পড়ান শুরু হলেও ১৯৪৭ খ্রিঃ দেশভাগের পর মহাবিদ্যালয় নিদারুণ আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হয়। সরকারি অনুদানে মহাবিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবন ও ছাত্রাবাস তৈরি হয়। গ্যালারি সজ্জিত বিজ্ঞানবিভাগ, মূল্যবান গ্রন্থ সমৃদ্ধ। গ্রন্থাগার, মিলনায়তন 'আশুতোষ হল' এই শিক্ষাকেন্দ্রটিকে স্বাতন্ত্র চিহ্নিত করেছে। আশুতোষ হল নির্মাণের জন্য আশুতোষ গাঙ্গুলি ১০ হাজার টাকা দান করেছিলেন। ১৯৮০ খ্রিঃ সরকার মহাবিদ্যালয় অধিগ্রহণ করে।

নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ :

নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ অতিক্রম করেছে নানান সংকটের পথ। বারবার পরিবর্তিত হয়েছে স্থান। ৫ জন ছাত্রী নিয়ে ১৯৪৩ খ্রিঃ মহাবিদ্যালয়টি স্থাপনের সময় নাম ছিল শেঠ তোলারাম গার্লস কলেজ। নিজস্ব ভবন না থাকায় মরগানে উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের ক্লাস হত। অধ্যক্ষা নিবেদিতা দাস নাগ দেশত্যাগ করায় অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বিদ্যোৎসাহী খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অধ্যক্ষের দায়িত্বপান করেন। ১৯৪৮ খ্রিঃ শেঠ তোলারামের অর্থানুকূল্যে চাষড়ায় মহাবিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবনই কেবল তৈরি হল না, নামও পরিবর্তিত হল। পরিচিত হল তোলারাম কলেজ নামে। সে সময়ে সহ-শিক্ষারও প্রবর্তন হয়। নারায়ণগঞ্জে সম্পূর্ণভাবে ছাত্রীদের জন্য নারায়ণগঞ্জ উইমেন্স স্থাপিত হয় ১৯৬২ খ্রিঃ। প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন মেহের কবির। ছাত্রী সংখ্যা খুব কম ছিল। এদের ক্লাস বসত নারায়ণগঞ্জ রাইফেলস ক্লাব ভবনে। এই মহাবিদ্যালয়ের অবৈতনিক অধ্যক্ষের দায়িত্ব নেন খগেন্দ্রনাথ

চক্রবর্তী ১৯৬৩ খ্রিঃ। তখন মহাবিদ্যালয়ের ক্লাস বসত মিউনিসিপ্যাল পাবলিক লাইব্রেরি ভবনে। কিন্তু ছাত্রী সংখ্যা বাড়লেও এদের নিজস্ব ভবন তৈরি অসম্ভব হওয়ায় উইমেন্স কলেজ স্থানান্তরিত হয় তোলারাম কলেজ ভবনে এবং দুটি কলেজ তখন একীভূত হলেও, ১৯৬৫ খ্রিঃ উইমেন্স কলেজ নিজস্ব ভবনে উঠে যায়। এই ভবন নির্মাণের জমি দান করেন তোলারাম কলেজ পরিচালনা পরিষদ এবং ভবন নির্মাণের অর্থ আসে নারায়ণগঞ্জ পুরসভার শিক্ষা তহবিল থেকে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তোলারাম কলেজ পরিচালনা পরিষদ উইমেন্স কলেজকে অন্যত্র সরে যাওয়ার তাগিদ দিলে, কলেজ উঠে যায় দিগুবাবুর বাজারের স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার পরিত্যক্ত ভবনে। কিন্তু ভবনটিতে অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় উইমেন্স কলেজ চাষাড়ায় নিজস্ব ভবনে ফিরে যায়। সরকারি ৭ লক্ষ টাকা সাহায্য লাভের পর মহাবিদ্যালয়ের অনেক পরিবর্তন ঘটে। কলেজটির সরকারিকরণ ঘটে ১৯৮৪ খ্রিঃ।

সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ :

সমগ্র মানিকগঞ্জ অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয় ১৯৪২ খ্রিঃ। দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় এখানে ক্লাস শুরু হয়। তখন নাম ছিল মানিকগঞ্জ কলেজ। প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিমাংশুভূষণ সরকার ছিলেন স্থানীয় মানুষ। তিনি বেতন নিতেন না। সরকারি অনুদান ছিল না। জনগণের চাঁদায় কলেজ চলত। মহাবিদ্যালয়ের আর্থিক সংকট দূর করতে অধ্যক্ষ হিমাংশুভূষণ টাংগাইলের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রণদাপ্রসাদ সাহার শ্মরণাপন্ন হন। রণদাপ্রসাদ আর্থিক সহযোগিতায় সম্মত হন। বিনিময়ে তাঁর পিতার নামে মহাবিদ্যালয়ের নাম হয় দেবেন্দ্র কলেজ। এবং কলেজের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চলে যায় তাঁর কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের অধীনে। ১৯৪৯ খ্রিঃ ডিগ্রি কলেজে উন্নীত হয়। উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান কোর্স (১৯৬৩ খ্রিঃ এবং উচ্চমাধ্যমিক কৃষি কোর্স চালু হয় (১৯৭৬ খ্রিঃ)। এই সময়ের মধ্যে ডিগ্রি বাণিজ্য কোর্স (১৯৬৪ খ্রিঃ), বিজ্ঞান কোর্স (১৯৭০ খ্রিঃ) এবং ১৯৭২ খ্রিঃ অনার্স চালু হয়। এই কলেজে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বাংলা, অর্থনীতি, দর্শন, ইতিহাস, (বিজনেস অর্গানাইজেশন) এবং গণিতে এম. এস. সি. কোর্স পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আছে। ১৯৮০ খ্রিঃ সরকারিকরণের পর নাম হয় সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ। শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় তিন হাজার।

সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় :

বর্তমান বাংলাদেশে সঙ্গীত চর্চা এবং সঙ্গীত প্রসারে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রথমে স্থাপিত হয়েছিল ঢাকার সেগুন বাগিচায়। পরে গ্রীন রোডের একটি ভাড়া বাড়িতে উঠে আসে। সরকারিকরণ ঘটে ১৯৮৪ খ্রিঃ। এখানে আই. মিউজ এবং বি. মিউজ পড়ান হয়। বাংলাদেশের সংস্কৃতি জগতের দিকপাল মানুষরা ছিলেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার মূলে। পরবর্তীকালে সঙ্গীত জগতে যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই ছিলেন এখানকার শিক্ষার্থী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় :

ভাইসরয়ের কাছে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি নিয়ে মুসলিম প্রতিনিধিরা সাক্ষাৎ করে। সে সম্পর্কে কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল : "Commenting in Yesterday's paper on the secret interview between the Viceroy and a deputation of Mahomedau at Dacca we wrote : "We may presently expect to hear of some important 'boons' to the Mahomedan community in Bengal which represent the fruits of the unaassisted wisdom of the goverment of

India." The prophecy which was not without a tinge of irony, has been literally fulfilled. His Excellency, so prodigal of "boons" at the cost of the people of India, has made the Mahomedans present of a University at Dacca, with a special Officer for Education in Eastern Bengal. True to their policy of planning their gifts in secret and without any regard to the opinion of their, own officers or of the public, the Government of India have decided upon these far-reaching changes in the education of the Presidency without consulting anybody. So far as we can associate, neither the local Government nor the Education Department of Bengal have been consulted; and the Vice-Chancellor of the University of Calcutta will learn of what has been done for the first time when he reads his morning paper. It is difficult to characterise these proceedings in courteous language. Is there to be no end to this intolerable disregard for the established unages of government in this country, to this studied contempt for the opinions of those competent to advise, to this tyrannical defence of the right of the people to be consulted in matters of public concern? There was once a Parliament in England which was known as the Mal Parliament. It would almost seem that the present Government of India, are ambitious to earn the same epithet. The "boons" are as ill-considered and mischievous as their secret hatching might have led one to anticipate. It never entered into the head of the Mohammedans to ask for a University at Dacca. Such as institution is wholly superfluous and purposeless. (3 February, 1912).

বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয় ১৯১১ খ্রিঃ। তার আগে থেকেই ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি প্রবল হয়ে ওঠে। সরকার এই দাবির যৌক্তিকতা এবং প্রয়োজনীয়তা অনুসন্ধানে 'নাথনি' কমিশন গঠন করে। কমিশনের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৩। তারা ঢাকায় একটি রাষ্ট্রীয় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করেন। ভারতীয় আইনসভায় "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট" গৃহীত হয় ১৯২০ খ্রিঃ। এই বছরেরই ১ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন পি. জে. হার্টস। ছাত্রদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার মুক্ত হয় ১৯২১ খ্রিঃ ১ জুলাই। রমনা এলাকার ৬০০ একর জমির ওপর শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম। আগেই এখানে যেসব গৃহাদি ছিল, সেগুলিতেই প্রথমপর্বে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ। এরমধ্যে ছিল পরিত্যক্ত সচিবালয়, যেখানে বর্তমান মেডিকেল কলেজ, ঢাকা কলেজের বিভিন্ন ভবন (কার্জন হল ও পাশের ভবন) পুরনো হাইকোর্ট ভবন, যেখানে ছিল গভর্নমেন্ট হাউস। তাছাড়া ছিল ১০০ অতি সুন্দর বাংলো। অর্থাৎ প্রথম অবস্থাতেই বিশ্ববিদ্যালয় পেয়ে যায় একটি মনোরম পরিবেশ। দেশভাগের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। সেসময়ে নব গঠিত পূর্ব পাকিস্তানের ৫৫টি ডিগ্রি ও সম-মানের কলেজ ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আছে ৩৬টি বিভাগ, ৭টি ইনস্টিটিউট, ১৩টি আবাসিক হল, ৯টি উচ্চতর গবেষণাকেন্দ্র এবং ১টি আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়েছিল তিনটি বিভাগ নিয়ে—কলা, বিজ্ঞান এবং আইন। শুরু থেকে ১৯৪৭ খ্রিঃ মধ্যে যুক্ত হয়েছিল আরো দুটি বিভাগ—কৃষি এবং চিকিৎসা। ১৯৪৭-৭১ খ্রিঃ অন্যান্য পাঁচটি বিভাগ যুক্ত হয়। তার মধ্যে ছিল ঃ

প্রকৌশল বিভাগ	:	১৯৪৭-৪৮ খ্রিঃ
শিক্ষা বিভাগ	:	১৯৬০-৬১ খ্রিঃ
চারুকলা বিভাগ	:	১৯৬৩-৬৪ খ্রিঃ
সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগ	:	১৯৬৯-৭০ খ্রিঃ
বাণিজ্য বিভাগ	:	১৯৭০-৭১ খ্রিঃ

ষাটের দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ঘটে। তার মধ্যে ছিল :

১. শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
২. পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষা ইনস্টিটিউট
৩. ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট
৪. পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট
৫. সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
৬. আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট
৭. ইনস্টিটিউট অফ ফাইন আর্টস

ঢাকা দেশের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র হওয়ায় বিভিন্নস্থান থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চতর শিক্ষার জন্য এখানে আসে। তাদের বাসস্থান ও পড়াশুনোর দায়িত্বও বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর। ছাত্রদের থাকা ও পড়াশোনার জন্য ১৫টি হোস্টেল আছে। সেগুলি হল :

১. জসিমউদ্দিন হল	৬. জগন্নাথ হল	১১. এফ রহমান হল
২. সূর্য সেন হল	৭. ফজলুল হক হল	১২. বঙ্গবন্ধু হল
৩. মুহসীন হল	৮. শহীদুল্লাহ হল	১৩. জিয়াউর রহমান হল
৪. জহরুল হক হল	৯. রোকেয়া হল	১৫. আন্তর্জাতিক হোস্টেল
৫. সলিমুল্লাহ মুসলিম হল	১০. সামসুন্নাহার হল	(বিদেশি ছাত্রদের জন্য)

এইসব হোস্টেলে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। কিন্তু তাতেও স্থান সংকুলান হয় না।

আগেই বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়েছিল ১৯২১ সালের জুন মাসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন রমেশচন্দ্র মজুমদার, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরুর আগেই। তাঁর আত্মস্মৃতি 'জীবনের স্মৃতিদীপ' গ্রন্থে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনাপর্বের আকর্ষণীয় বিবরণ। তিনি লিখেছেন : "... ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গভঙ্গ রহিত হয় বটে কিন্তু পূর্ব বাংলার বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের মধ্যে একটি আন্দোলন চলতে থাকে। এই আন্দোলন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ইংরাজ সরকার এই বলে তাদের আশ্বাস দিলেন যে, পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। মুসলমানরা এতে খুবই খুশি হলেন বটে, কিন্তু হিন্দুদের মনে অসন্তোষ দেখা দেয়। তাঁরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেন। সাধারণত যাঁরা রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে থাকতেন, তাঁরাও এবার এই প্রতিবাদ আন্দোলনে যোগ দিলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন রাসবিহারী ঘোষ এবং গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ....

'বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পূর্বে ঢাকা শহরে ঢাকা কলেজ নামে একটি সরকারি কলেজ ছিল। সেখানে এম. এ. পর্যন্ত পড়ান হত। আর একটি বেসরকারি কলেজ ছিল—জগন্নাথ কলেজ। সেখানে বি. এ. পর্যন্ত পড়ান হত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এই দুই কলেজে মাত্র ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস রইল ; বি. এ., এম. এ. ক্লাস উঠে গেল। কারণ একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়েই এই দুই ক্লাসের শিক্ষা ও পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এই পরিবর্তনের ফলে ঐ দুই কলেজের শিক্ষকদের সম্বন্ধে নতুন ব্যবস্থা করা নিয়ে একটি সমস্যা দেখা দেয়। ফলে সরকারি কলেজের কয়েকজন শিক্ষককে বিশ্ববিদ্যালয়ে আনা হয়। তাঁদের বেতন ও চাকুরির অন্যান্য

সুবিধা পূর্বের মতই অব্যাহত থাকে। জগন্নাথ কলেজের কয়েকজন শিক্ষককেও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত করা হয়। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে দুইটি পৃথক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। একদল সরকারি চাকরে; এঁদের মধ্যে দু'জন আই. ই. এস. এবং বাকি কয়েকজন প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসের লোক। এঁরা ছাড়া আর সকল শিক্ষকই হলেন সম্পূর্ণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কর্মচারী এবং তাঁদের বেতন, বিদায় ও অবসর গ্রহণের ব্যবস্থা প্রভৃতি সবই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে হত।" ঢাকা কলেজের শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাগত শিক্ষকদের মধ্যে বিসংবাদ বজায় ছিল দীর্ঘকাল। পরে অবশ্য সেই পরিস্থিতির অবসান ঘটে।

রমেশচন্দ্রের বিবরণ থেকে আরও জানা যায় : 'ঢাকা শহরের উপকণ্ঠে রমনার মাঠ নামে একটি বিস্তৃত প্রান্তর ছিল। ১৯০৫ সনে বঙ্গবিভাগ এবং ঢাকা শহর পূর্ববঙ্গ ও আসামের রাজধানী হওয়ায় এই রমনার মাঠে নতুন শহর পত্তন করে বড় বড় সরকারি দপ্তর এবং কর্মচারীদের বসবাসের জন্য সুন্দর সুন্দর অনেক বাড়ি তৈরি হয়। প্রত্যেক বাড়িতেই বড় বড় কম্পাউন্ড, বাড়িগুলিও ফাঁকা ফাঁকা; প্রশস্ত এবং সুপরিকল্পিত রাস্তা। বঙ্গবিভাগ রহিতের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা শহর আর রাজধানী রইল না। পরে নতুন তৈরি সেক্রেটারিয়েট ভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বসবাসের জন্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে দিলেন। ...."

সূচনা পর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল আবাসিক। ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দশ মাইল চৌহদ্দির মধ্যে থাকতে হত। ঢাকা হল ও জগন্নাথ হলে থাকত হিন্দু ছাত্ররা। মুসলমান ছাত্রদের জন্যও হোস্টেল একটি। প্রতিটি হলে থাকতেন একজন প্রোভোস্ট এবং দু'জন হাউস টিউটর। প্রতিটি হল সংলগ্ন সভাকক্ষে ছাত্রদের নানারকম সভা ও নাট্যাভিনয় হত। সভাকক্ষে বসতে পারত ছ-সাতশ লোক। দেশভাগের পর জগন্নাথ হলে সভাকক্ষে পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভার অধিবেশন হত। বিভিন্ন হলের ছাত্ররা খেলাধূলা, সাহিত্যচর্চা, পত্রিকা প্রকাশ, বিতর্ক সভা, নাট্যাভিনয় ও নানারকম সমাজসেবা কাজে জড়িত থাকত। "জগন্নাথ হলের সাহিত্য বিভাগের খুব নাম ছিল। জগন্নাথ হল থেকে একটি বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। তার নাম ছিল বাসন্তিকা"। হলের ছাত্র এবং সংযুক্ত শিক্ষকেরা এই পত্রিকায় লিখতেন। সে সময়ে কয়েকজন ছাত্রের রচনা পড়ে আমি খুবই মুগ্ধ হই। আমার এই বিচারশক্তি যে খুব ভ্রান্ত ছিল না, তার প্রমাণ এদের মধ্যে কয়েকজন পরবর্তীকালে সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদের মধ্যে একজন মন্মথ রায়। এর একাঙ্ক নাটক জগন্নাথ হলে অভিনীত হয়েছে। আজ একাঙ্ক নাটক লেখকদের মধ্যে মন্মথ রায় সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিচিত। আর একজন বুদ্ধদেব—সাহিত্য জগতে আজ বিশেষভাবে পরিচিত। বুদ্ধদেবের কয়েকখানি ছোট নায়ক হলে অভিনীত হয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক। জগন্নাথ হলে থাকতেই সে তার সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় দেয়। অজিত দত্ত প্রভৃতি আরও কয়েকজন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।" —এক সময় বহুকৃতী ছাত্র বেরিয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, যারা বাংলার সংস্কৃত জগতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন।[৫৫]

ঢাকায় থেকে পড়াশুনো করতে এসেছিলেন বুদ্ধদেব বসু; তাঁর বিবরণে পাই : 'কার্জন কল্পিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হিসেবে তৈরি হয়েছিল রমনা—অনেকের মুখে তখনও নাম ছিল 'নিউ টাউন'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমলে এখানেই অধিষ্ঠিত ছিল ঢাকা কলেজ; বঙ্গভঙ্গ ভেস্তে যাবার প্রায় দেড় দশক পরে, সেই পুরনো বিদ্যাপীঠকে কেন্দ্র করে, স্থাপিত হলো নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয়—নবনির্মিত অব্যবহৃত হর্ম্যসমূহ প্রাণপ্রাপ্ত হলো। রেল-লাইন থেকে শহরের উত্তরতম প্রান্ত পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি ; উত্তর অংশটি সরকারি কেষ্টবিষ্টুদের বাসভূমি, মধ্যিখানে আছে বিলেতি ব্যসন ঘোড়দৌড়ের মাঠ, গলফ-খেলার মাঠ, আছে ঢাকার নাগরিকদের পক্ষে অপ্রবেশ্য ঢাকা ক্লাব, যেখানে মদ্যবিলাসী বলনৃত্য প্রিয়

শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষ ও নারায়ণগঞ্জের পাটকল-চালক ফিরিঙ্গিরা নৈশ আসরে মিলিত হন; আর আছে কাননবেষ্টিত উন্নতচূড়া একটি কালীমন্দির যেখানে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি অর্ঘ্য দিতে আসেন শাহবাগের মাকে—সেই দিব্যিবিভান্বিত ব্রাহ্মণী যিনি পরবর্তীকালে 'মা আনন্দময়ী" নামে সর্বভারতে বিখ্যাত হন। কিন্তু দক্ষিণ অংশটি পুরোপুরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারভুক্ত; সেখানে ছাত্র এবং অধ্যাপক ছাড়া ভিড় দেখা যায় শুধু শীতে বর্ষায় শনিবারগুলির অপরাহ্নে, যখন জুয়াড়ি এবং বেশ্যায় বোঝাই খড়খড়ি-তোলা ঘোড়ার গাড়ি ছোটে অনবরত রেসকোর্সের দিকে—শান্ত রমনাকে মর্দিত করে, কলেজ-ফেরতা আমাদের চোখে-মুখে কর্কশ ধুলো ছিটিয়ে দিয়ে। আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ অন্তরঙ্গ ক্যাম্পাসটিতে ঐ একই বই অপলাপ ছিলো না।

ভিতরে-বাইরে জমকালো এক ব্যাপার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। নিখিল বাংলার একমাত্র উদ্যান-নগরে পনেরো কুড়িটি অট্টালিকা নিয়ে ছড়িয়ে আছে তার কলেজ-বাড়ি, ল্যাবরেটরি, ছাত্রাবাস : আছে ব্যায়ামাগার ও ক্রীড়াঙ্গন ও জলক্রীড়ার জন্য পুষ্করিণী—যেখানে-সেখানে সবুজ মাঠ বিস্তীর্ণ। ইংলন্ড দেশীয় পল্লী-নিবাসের মতো ঢালু ছাদের এক একটি দোতলা বাড়ি—নয়নহরণ, বাগানসম্পন্ন : যেখানে কর্মস্থলের অতি সন্নিকটে বাস করেন আমাদের প্রধান অধ্যাপকেরা ; অন্যদের জন্যেও নীলখেতে ব্যবস্থা অতি সুন্দর। স্থাপত্যে কোনও একঘেয়েমি নেই, সরণি ও উদ্যান রচনায় নয়াদিল্লির জ্যামিতিক দুঃস্বপ্ন স্থান পায়নি। বিজ্ঞান ভবনগুলি আরক্তিম ও তুর্কি শৈলীতে জাফরিখচিত, মিনারশোভন ; অন্যান্য বিভাগ স্থান পেয়েছে একটি সরল ছাদের বহু পক্ষযুক্ত দীর্ঘাকার সাদা দোতলার একতলায়—সরকারি সেক্রেটারিয়েট হবার জন্য তৈরি হয়েছিল। বাড়িটি সর্বত্র প্রচুর স্থান, ঘেঁষাঘেষি ঠেলাঠেলির কোনো কথাই ওঠে না।

ভিতরকার ব্যবস্থাপনাও উচ্চাঙ্গের। ঘরে-ঘরে বিরাজ করছেন নানা-নামাঙ্কিত কর্তৃবৃন্দ : ডীন, প্রভস্ট, প্রক্টর এবং বিভাগীয় শীর্ষস্থানীয়েরা—ক্বচিৎ-দৃষ্ট, ক্বচিৎ-শ্রুত ও ক্বচিৎ কথিত উপাচার্য মহোদয়ের কথা ছেড়েই দিচ্ছি। এঁদের কোনজনের সঙ্গে বিদ্যার্থী ঠিক কোন সূত্রে যুক্ত আছে, তা সমঝে নিতে নতুন ভর্তির বেশ কিছুটা সময় কেটে যায়। আক্ষরিক অর্থে আবাসিক নয়, কিন্তু গড়ন কিছুটা সেই ধরনের : যে-সব ছাত্র স্বগৃহবাসী তাদেরও সংলগ্ন থাকতে হয় কোনো-না-কোন 'হল' অথবা হস্টেলে—তাদের প্রাচীরাতিরিক্ত ক্রিয়াকর্মের সেটাই হ'লো ঘটনাস্থল। সেখানে আছে আলাদা আলাদা গ্রন্থাগার ও রঙ্গালয় ও নানান ধরনের খেলার ব্যবস্থা ; অনুষ্ঠিত হয় বিতর্কসভা, সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা, বার্ষিক ভোজ ও আরও অনেক সময়োচিত অধিবেশন : সেখানকার নাট্যাভিনয় দেখতে নগরবাসীরাও সোৎসাহে সমবেত হন। ক্লাশ ফুরানোমাত্র কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক চুকলো, এমন এখানে হ'তেই পারে না—কেন না প্রায়ই আমাদের ফিরে আসতে হয় কোনো-না-কোনো সান্ধ্য অনুষ্ঠানে—মনোজ্ঞ না হোক অন্ততপক্ষে কৌতূহলজনক। আর যেহেতু ছাত্রেরাই এই অনুষ্ঠানগুলির আয়োজক ও প্রযোজক এবং মাস্টারমশাইরাও কেউ-না-কেউ উপস্থিত থাকেন ও অংশও নেন মাঝে মাঝে, তাই ছাত্র-শিক্ষকের একটি পারিবারিক সান্নিধ্যবোধ অনুভূত হয়। ..."[৫৬]

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ ডঃ ভবতোষ দত্ত তাঁর স্মৃতিচারণায় আছে : "১৯২১-১৯২২-এর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার আগে থেকেই শহরে দুটো বড় কলেজ ছিল—একটি সরকারি ঢাকা কলেজ, আর অন্যটি বেসরকারি জগন্নাথ কলেজ। দুটোরই নামডাক ছিল প্রচণ্ড, দুটোতেই বি.এ./বি. এস. সি. অনার্স পড়ানো হত এবং কোনো কোনো বিষয়ে এম. এ.-ও পড়ানো হত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবার পরে এই কলেজগুলি জাতে নেমে গেল—হয়ে গেল 'ইন্টারমিডিয়েট কলেজ'—আমেরিকার 'জুনিয়ার কলেজ'-এর মত। মেয়েদের জন্য ছিল ইডেন কলেজ এবং আরো ছিল একটি কলেজ শুধু মুসলমানদের জন্য

এবং একটা ছোট বেসরকারি কলেজ। জগন্নাথ কলেজে হত প্রচুর ছাত্র—প্রত্যেক 'কমবিনেশন'-এর আলাদা সেকশন—বিষয়ের নামানুসারে। ... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তখন শৈশব কাটিয়ে উঠেছে। অনেক ভাল ভাল অধ্যাপক এসেছিলেন এখানে—ইংরেজিতে মামুদ হাসান, সংস্কৃতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বাংলায় সুশীলকুমার দে, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় আর মোহিতলাল মজুমদার, ইতিহাসে রমেশচন্দ্র মজুমদার ও হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, অর্থনীতিতে যোগীশচন্দ্র সিংহ ও হীরেন্দ্রলাল দে, পদার্থবিদ্যায় সত্যেন বসু, রসায়নে জ্ঞানচন্দ্র গোষ। যেরকম পণ্ডিত সমাবেশ হয়েছিল তাতে ঢাকা একটা অসাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠতে পারত, কিন্তু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আবর্তে পড়ে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ভাল অধ্যাপকদের মধ্যে কেউ কেউ অল্পদিনের মধ্যেই চলে গিয়েছিলেন। শোনা যেত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নাকি বলেছিলেন—"এসেছিলাম ডাক্কা (ঢাকা) ইউনির্ভাসিটিতে, এসে দেখি মক্কা ইউনিভার্সিটি। কিছুদিন পরে দেখলাম ফক্কা ইউনিভার্সিটি, এখন দেখছি ধাক্কা ইউনির্ভাসিটি।' একটা শহরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় থাকলে সেখানকার সাংস্কৃতিক জীবনের সবদিকে তার প্রভাব পড়া উচিত। ঢাকাকে বলা হত 'অক্সফোর্ড অব দ্য ইস্ট'—অনেক সময়ে ব্যঙ্গ করে। রমনা ছিল আলাদা রাজ্য, অধ্যাপকেরা সেখানে থাকতেন, সিভিল-সার্ভিসি স্বাতন্ত্র্যে, যে ছাত্ররা ও কম-বয়সী অধ্যাপকেরা ওখানে যেতেন শহর থেকে, তাঁরা অনেকটা দরিদ্র অভ্যাগতের মত বোধ করতেন।" [৫৭]

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় :

১. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকার ২৫ মাইল দূরে জয়দেবপুরের শালানায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৪ খ্রিঃ ২৮ আগস্ট আরম্ভ হলেও পরে উঠে আসে সাভারে। ভারতের আলীগড়ের আদর্শে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনই ছিল উদ্দেশ্য।

২. নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়

ফাউন্ডেশন ফর প্রমোশন অফ এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ কর্তৃক স্থাপিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হল : ".... শিক্ষা প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং জনসেবার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে যুগোপযোগী শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক মানের উপযোগী করে গড়ে তোলা। দেশের মানবসম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সামাজিক অবকাঠামো গঠন করা। বর্তমান নগরকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীরা যেভাবে রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রকৃত শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে (NSU) তাদেরকে এই সর্বনাশা ছোবল থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে অঙ্গীকারবদ্ধ।" [৫৮]

৩. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯৯২ খ্রিঃ ২১ অক্টোবর। ছাত্র-ছাত্রীদের সরাসরি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না করলেও, মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। শিক্ষার্থী শিক্ষকদের আবাসনের ব্যবস্থা আছে। ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি কলেজগুলিকে বিযুক্ত করে, এই বিশ্ব বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক এবং বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক অনুদানে স্থাপিত হয়েছে। দেশের অবহেলিত জনগণের কাছে আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞান পৌঁছে দেওয়াই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য।

৫. প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়

অনেক পথ পেরিয়ে আসতে হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে। ঢাকা কলেজ সংলগ্ন প্রতিষ্ঠান হিসাবে ১৮৭৬ খ্রিঃ স্থাপিত হয় জরিপ বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় ১৯০২ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং

স্কুলের রূপ পায় ৬০ হাজার টাকা সরকারি অনুদান এবং ঢাকার নবাব খাজা আহসানউল্লাহ প্রদত্ত ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা দিয়ে ভবন নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়। পরে নাম হয় আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল। ছাত্রদের আবাসনের ব্যবস্থা, ওয়ার্কসপ তৈরি করে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। স্কুলটি ছিল শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধীন। ১৯৯৬ খ্রিঃ পর্যন্ত এখানে ওভারশিয়ার ও মেকানিক্যাল কোর্স কেবলমাত্র চালু ছিল। তারপর স্কুলটি ঢাকা কলেজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সম্পূর্ণ পুনর্গঠিত করা হয়। ছাত্রদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হয়েছিল। দেশভাগের পর স্কুলটির নাম হয় আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, কেমিক্যাল, টেক্সটাইল এবং এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি কোর্স চালু হয়। ১৯৬০-৬১ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেয়।

ঢাকা কারিগরি এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ পাঠক্রম ঃ

১. সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
২. মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
৩. ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং
৪. ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
৫. কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
৬. মেটালর্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
৭. নেভাল আর্কিটেকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং
৮. ওয়াটার রিসোর্সেস ইঞ্জিনিয়ারিং
৯. আর্কিটেকচার ইঞ্জিনিয়ারিং
১০. আরবান অ্যান্ড রিজওন্যাল প্লানিং ইঞ্জিনিয়ারিং
১১. কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং

এসব ছাড়াও বর্তমানে বাংলাদেশের কারিগরি ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে :

১. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি
২. লেদার টেকনোলজি কলেজ, ঢাকা
৩. টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা
৪. কলেজ অফ টেক্সটাইল টেকনোলজি, ঢাকা
৫. ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
৬. মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ঢাকা
৭. মনোটেকনিক ইনস্টিটিউটস্
৮. বি. আই. টি. ঢাকা
৯. ইসলামিক সেন্টার ফর টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশন্যাল ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্স (ICTVTR)

চারুকলা ইনস্টিটিউট :

সরকারি চারুকলা ইনস্টিটিউটে শিক্ষাকালীন সময় পাঁচ বছর। মহাবিদ্যালয়ের মর্যাদাসম্পন্ন। ১৯৪৮ সালে স্থাপিত ইনস্টিটিউট শাহবাগ অঞ্চলে নিজস্ব ভবনে অবস্থিত।

বাংলাদেশ শিল্পকলা আকাদমি :

ঢাকায় ১৯৭৪ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত হয় এই আকাদমি। ভূতপূর্ব আর্টস কাউন্সিলের যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আসে শিল্প আকাদমির এক্তিয়ারে। পারফরমিং আর্টস আকাদমিও ১৯৮০ খ্রিঃ শিল্পকলা আকাদমির অঙ্গীভূত হয়। বর্তমানে শিল্পকলা আকাদমি একটি সুবৃহৎ বহুমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ঢাকা ব্যতীত নবগঠিত ৬৪টি জেলায় আছে শিল্পকলা আকাদমির শাখা, জেলা শিল্পকলা আকাদমি। আকাদমির বিভাগসমূহ :

১. চারুকলা বিভাগ
২. সঙ্গীত ও নৃত্য বিভাগ
৩. নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিষয়ক বিভাগ
৪. প্রশাসন, অর্থ, হিসাব ও পরিকল্পনা বিভাগ
৫. প্রযোজনা বিভাগ
৬. আলোকচিত্র বিভাগ।

বুলবুল ললিতকলা আকাদমি :

সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র, নাচ, নাটক ও চিত্রাঙ্কন শিক্ষার জন্য শিল্পী বুলবুল চৌধুরীর স্মরণে বুলবুল চৌধুরী ললিতকলা আকাদমি স্থাপিত হয় ১৯৫৫ খ্রিঃ ১৭ মে।

কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি :

এই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত বইয়ের সংখ্যা ১,১১,৪২৯। দৈনিক গড় পাঠক সংখ্যা ২৫০০ জন। এখানে আছে সাধারণ, বিজ্ঞান এবং পত্র-পত্রিকা ও সাময়িক পত্রের তিনটি পাঠকক্ষ। ৩টি বুক স্ট্যাক। শাহবাগ এলাকায় তিনতলা গ্রন্থাগার ভবন এবং ৫২৫ আসনের একটি মিলনায়তন গ্রন্থাগারকে স্বাতন্ত্র চিহ্নিত করেছে।

পাকিস্তান আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন এলাকায় যে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই গ্রন্থাগার ১৯৬১ খ্রিঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে হস্তান্তর করা হয়। নতুন প্রকল্প অনুসারে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি শাহবাগ অঞ্চলে উদ্বোধন হয় ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি। বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থাগার।

বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার :

বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারে সংগৃহীত পুস্তক সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ এবং পত্র-পত্রিকা সংখ্যা ৩ হাজার। পাকিস্তান আমলে আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগারের কাজকর্ম শুরু হলেও, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের পর এসেছে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে। দীর্ঘদিন ভাড়া বাড়িতে থাকলেও ১৯৮৫ খ্রিঃ জাতীয় গ্রন্থাগার শেরে বাংলানগরের আগারগাঁয়ের নিজস্ব ভবনে উঠে আসে। চারটি ব্লকে বিভক্ত ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৭ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। 'জাতীয় গ্রন্থাগারটি দেশের শীর্ষ স্থানীয় গ্রন্থাগার। দেশে প্রকাশিত সকল পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে লিখিত বিদেশে প্রকাশিত সকল প্রকাশনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার দায়িত্ব জাতীয় গ্রন্থাগারের। গ্রন্থ স্বত্ব আইন (১৯৭৪ খ্রিঃ) অনুযায়ী দেশের প্রকাশকগণ তাদের সকল প্রকাশনার এক কপি জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা দিতে বাধ্য, যা গবেষণা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এছাড়া আন্তর্জাতিক পুস্তক বিনিময় প্রোগ্রাম অনুযায়ী বিভিন্ন দেশ থেকে যে সমস্ত পুস্তক ও সাময়িকী সংগৃহীত হয়, সেগুলিও গবেষণার জন্য সংরক্ষণ করা হয়।" [৫৯]

বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস :

একটি দেশের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সংগ্রহশালা। এখানে আছে বিভিন্ন বিষয়ের রেকর্ডস। ঐতিহাসিক উপকরণ, দলিল দস্তাবেজ, ইতিহাস ও জীবনধারণের সার্বিক তথ্যাবলী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে। অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলা ও থানার দুষ্প্রাপ্য মানচিত্র, নদ-নদী ও রেলপথের মানচিত্র এবং বহু মূল্যবান রেকর্ড সংগৃহীত হয়েছে। দেশভাগের পর কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস পূর্ববাংলা বিষয়ক তথ্য থেকে আসে ঢাকার সচিবালয়ে। সংগৃহীত ৩ লক্ষ ৫০ হাজার নথি জাতীয় আরকাইভসকে দেওয়া হয় ১৯৮৫-৮৭ খ্রিঃ। পরবর্তীকালে এমন বহু ঐতিহাসিক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, যা বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থাগার ও গবেষণাকেন্দ্র :

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন
২. জাতীয় সংসদ গ্রন্থাগার
৩. জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র
৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি
৫. বি. আই. ডি. এস লাইব্রেরি

৬. আই. সি. ডি. ডি. আর. বি. লাইব্রেরি
৭. সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরি
৮. বাংলা আকাদেমি লাইব্রেরি

এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি দেশের বৃহত্তম। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দেই এদের সংগ্রহে ছিল ২,১০,০০০ বই এবং ২৩,৪৪০ পাণ্ডুলিপি, যা ১৯৯০-৯১ খ্রিঃ দাঁড়ায় বাঁধাই করা বই ও সাময়িকপত্র সহ ৫,৩৬,৩৯৬। পূর্ব প্রতিষ্ঠিত সেন্ট্রাল পাবলিক লাইব্রেরি বিশ্ববিদ্যালয়কে হস্তান্তর করার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ হয়েছে।

বাংলা আকাদমি লাইব্রেরী :

অবিভক্ত বাংলায় দুটো সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরি ছিল কলকাতা এবং দার্জিলিঙে। দেশভাগের পর দার্জিলিঙের লাইব্রেরি ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। উনিশ শতকের মূল্যবান দলিল দস্তাবেজসহ মূল্যবান গ্রন্থ সমৃদ্ধ এই গ্রন্থাগার বর্তমান সচিবালয়ের অংশে পরিণত হয়েছে। ঢাকা সোহরাওয়ার্দি উদ্যাগের বিপরীতে বাংলা আকাদমি নবনির্মিত ভবনে অবস্থিত হলেও, গ্রন্থাগারটি পুরনো বর্ধমান হাউসে অবস্থিত। বাংলা আকাদমির কাজকর্ম অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। নানা বিষয়ে এরা অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে বহু মূল্যবান ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদও আছে। আকাদমির একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার আছে।

বাংলা আকাদেমির অন্যতম কয়েকটি বিভাগ হল :

১. ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সাময়িকী বিভাগ।
২. গবেষণা, গ্রন্থনা এবং লোক সাহিত্য বিভাগ।
৩. পাঠ্যপুস্তক বিভাগ।
৪. সংস্থাপন, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ।

মাদ্রাসা : *[বর্তমান সংস্করণের ৫৯৮ পৃঃ ৯২৩-৯২৬ পৃঃ দেখুন]*

দেশভাগের পর কলকাতার মাদ্রাসা-ই-আলিয়া দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। অ্যাংলো পার্সিয়ান সেকশন থেকে যায় কলকাতায় এবং আরবি সেকশন স্থানান্তরিত হয় ঢাকায়। প্রথমে ভিক্টোরিয়া পার্কের ইসলামিয়া ইন্টারমিডিয়েট কলেজে, তারপর সরকারি মুসলিম হাইস্কুলের ডাফরিন হোস্টেলে ক্লাস বসত। ১৯৬০ সালের পর উঠে আসে বকসিবাজারের নিজস্ব ভবনে।

দেশভাগের পরবর্তী দু'বছর মাদ্রাসাগুলি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। ১৯৪৯ খ্রিঃ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

সিনিয়ার ও জুনিয়ার মাদ্রাসা ব্যতীত ২২টি ফোরকানীয়া মাদ্রাসা বা মক্তব আছে ঢাকায়।

মাদ্রাসা সংখ্যা (১৯৮২ খ্রিঃ)		এবতেদায়ী মাদ্রাসা (১৯৯০)			
ঢাকা সদর	৪০২	মোহম্মদপুর থানা	৫	দাখিল মাদ্রাসা	১৭
গাজিপুর	৪৭	তেজগাঁও থানা	৫	আলিম মাদ্রাসা	২
মানিকগঞ্জ	৪৩৪	ডেমরা থানা	২	ফাজিল মাদ্রাসা	১০
	১৪৪	সূত্রাপুর থানা	৪	কামিল মাদ্রাসা	৩
নারায়ণগঞ্জ	৪৭	সেনানিবাস	৩		
নরসিংদি	১৬৪	মিরপুর থানা	১৫		
		লালবাগ	৬		
কওমা মাদ্রাসা	(১৯৯০)	মতিঝিল	৫		
	৭৬	গুলশান	১৩		

অতিরিক্ত সংযোজন ঃ শিক্ষা সংক্রান্ত

WHEN the question of raising the Collge fees was first mooted,we gave it our cordial support : chiefly for the reasons, that the College was overcrowded and could not receive all who wished to enter it, at the same time that the fees were too low to admit of schools being established by private enterprise, with any hope that they would pay those who might open them. We believed that, were the fees of the College raised, a number of those studying there would be unwilling to pay the larger sum demanded from them, but would be willing to pay a fee large enough to induce ex-students of the College to open schools for their instruction : and a career would be opened up to those ex-students, much more inviting than the drear waste of Keraneedom, or the not very inviting life, as the Courts are now constituted, of a pleader. — Our anticipations have been fulfilled. The fee was raised only eight annas a month, but the effect has been to deter many from entering the College, and to drive away severl who had already entered. The absurd rules concerning the age of admission, that prevail in the Government Institutions, was another circumstance that would tend to render popular, a school where they would not be so strictly insisted upon. Bengalee ladies are, like their English sisters, very often unwilling to part with their little darlings at seven and eight years of age, and to trust them at a distance to the tender mercies of a large public school : and Bengalee gentlemen are, like their English brothers very often under the control of their wives. A school then, cheap enough, where there were no difficulties raised about the age of admission, and where the education given was good as that of the College, was thought by many to be sure to succeed. Such a school was, on the 3rd December 1855, opened by Baboo Anundomohun Doss, under the auspices of Mr. Brennand the officiating Principal of the College, and Mr. Tydd officiating Head master, who we believe took upon themselves all pecuntary responsibility in case of failure. We are now happy to state that the school is self-supporting. It has at present 140 scholars divided into 8 classes. The students in the first class read the junior scholarship standard. Some of the lads expect to be able to compete for a Junior Scholarship at the next College examination. Messrs Clint and Tydd, the principal, and head master, of the College pay frequent visits to the school. We may therefore depend upon the quality of the instruciton afforded. The schooling fees, amount to Rs. 110 a month. — Baboo Anundomohun Doss expresses a hope that Government may make some grant to the school. We hope not. We should like to see it succeed as a commercial speculation. We hope it may succeed so well as to cause other schools to spring up, and we look forward to the day, not far distant now we hope, when the College will deserve that name, when it shall not longer have a Dame School—as Lord Dalhousie called it—

department, but be led by scholars from these schools. We should then wish that the only test of admission should be ability to pay the fees, and to pass the examination at the end of the term. If too many crowd to the Colloges let us have twice the number of Colleges and twice the number of master ; but let us have no dodges for keeping out those thirsting for knowledge, at the same time that our Government boasts of its Education despatches, and its anxiety to educate the people.

But we must say a few words about the Pride of Dacca, our Female School. The subscription lists amounts to about Rs. 60 a month. To this Government has added a monthly grant of Rs. 130. It is propossed to spend the money in the following manner :

Salary of 1st Teacher	Rs.	50	per mensem
do of 2nd do	,,	30	,,
do of 3rd do	,,	20	,,
Servants wages	,,	10	,,
Furniture &c	,,	5	,,
Books and sundries	,,	5	,,
Two palanquin Carriages	,,	50	,,
House rent	,,	20	,,

Mr. Woodrow however has forgotten to buy the Garees and horses. We believe a sum of Rs. 400 at least would be required for that purpose. The little ladies. were very much gratified the other day by visit from Mr. and Mrs. Muspratt for the interest she has shown in this school.

Dacca News, 2.8.1856

Lalbagh School

To the Editor of the Dacca News

Sir—As the Gentry of the Dacca are very forward to see the establishment of schools all around the city, and take great interest in promoting learning. I beg, for the information of the public, your favour of giving the following a little space in corner of your much esteemed Dacca News.

I am extemely sorry to hear that the Lalbagh School, once a pommissing one, is now verging towards a fall : and ere long will be abolished, not withstanding the care and exertions of a master. Who hardly could draw a poor salary of 10 rupees a month. This I feared, would have been the case with the Boboo Bazar Branch School, but by the kind attention and encouragement of Mr. Brennand, it is at present going on pretty well and promises a future prospect of success. For further encouragement, I would advice the headmaster to exert his utmost to instruct his pupils and to raise a subscription to give prizes to his best students after the examination in April next. It is then the school will grow like an April plant, shooting forth now and then a branch or a leaf for it

will grow as much by encouragement as it will wither and die by negligance.

Dacca
21st January 1857

Your obediently
MEMORABILIA

Dacca News, 7.3.1857

Baboo Bazar Branch School

To the EDITOR of the DACCA NEWS.

Sir—As I know not any better way to return our thank and acknowledgement to the liberal promoters and friends of Education, who have given so much encouragement to the student of the Baboo Bazar Branch School by their donations for prizes, will you allow me to beg the favour of your inserting the following in a corner of your universally esteemed DACCA NEWS and oblige.

Dacca
6th April 1857

Your most obdt. servant
RADHAKISHORE DASS
Head Master

W. Brennard Esq.	Rs.	10
A. Forbes Esq.	Rs.	5
J. G. N. Pogose Esq.	Rs.	5
Captain J. D. Macnaghten	Rs.	4
J. N. Sadder Esq.		3
Moulana Mohamed Nazir		3
Kajeh Abdool Gunny		5
H. Muspratt. Esq.		1
Baboo Muddun Mohan Bysack		1
„ Radha Kishore Dass		5
„ Huny Mohun Bysack		4

Dacca news 11.4.1857

VERNACULAR EDUCATION

To the EDITOR of the DACCA NEWS

Dear Sir,—there is not far from my residence a hut with an enclosure of mat in the centre, about eight feet square. This I am informed is the *Government Vernacular School* for this part of the country about fourteen miles north of Dacca. I have passed this building at all hours, from 8 o'clock A.M. to 12 at noon, but I have never yet seen a single soul in it. One forenoon I pulled up my horse as I was passing, intending to get off and see what the boys were learning, or (perhaps) taught : but with the exception of one single Jhanwar about ten years old, who popped his head out of the mat enclosure on hearing my vioce. I could see no one and this little fellow jumped down and ran away on seeing me, singing out at the

top of his vioce Bapre ! So that I turned round and rode homewards very quietly, lest I should have been accused by the people of the neighbouring village of intending to do the fellow some grievous bodily harm! Who are the folks at Dacca responsible to the Inspector of schools that the "young idea is taught how to shoot here." I suppose the Gooroomohashoy draws his pay from some person.............

31st March, 1857 LACHAR

Dacca News, 11.4.1857

BANGLA BAZAAR FEMALE SCHOOL

We are very glad to learn ant the Government has sanctioned a Grant-in-aid of Rs. 80 a month for the Bangla Bazzar Female School from November 1856 on condition that the private subscriptions amount to Rs. 50 a month. They were we believe considerably more than this when an appeal was first made to the public on this account, bur from many gentlemen having left the station, and no application having been made to the new-comers, they are now reduced to about Rs. 40. A paper will we believe be almost immediately circulated to the inhabitants of Dacca, who are sure will make top, the amount required to make the Government Grant-in-aideble. There has never been any want of fund in Dacca...

Dacca News, 22.6.1857

ENGLISH EDUCATION

The Mohammedans knows how dangerous an English education is, and in the Pubna and some other districts, they excommunicate those among the Mussulmans who send their children to a school in which English is taught.

Dacca News, 24.10.1857

THE BISHOP'S SHCOOL

It was understood that the chief promotor of the Bishop's School was under the impression that the school would be strongly supported by planters in Sylhet and Cachar. Why these gentlemen—who presumably can afford to give their children a proper education—should select Dacca of all plaees in the world, instead of sending their children to England or to some hill station. In India, it is a mystery into which, as into some other ecelesiastical mysteries, we will not be so irreverent as to inquire.

Dacca is supposed to contain about seventy children old enough to be sadly in want of schooling. Upwards of fifty of these are already collected in Mr. Vyse's School. This school has for two year been the only school in Dacca. It was worked up amidst great difficulties both financial and otherwise. It is well known that the inability of very poor European to pay for the education of their children is fully equalled by the careless

indifference with which their families are often allowed to grow up in deplorable ignorance. All the difficulties however were overcome by the energy and perseverance of Mr. Vyse. His shool is now recognised by Government and receives a grant-in-aid. It is undergoing a through re-organisation and improvement. The school however is not intended to supply a showy education. The three'R's and a little History, Geography and religious instruction compose the standard aimed at Music, Drawing and other elegant accomplishments will be taught if a sufficient number of parents are willing to pay for the expenses of providing such teaching. And lastly the school must always pay its way—for such quiet work as that in which Mr. Vyse has been engaged in not likely to be rewarded with donations of five hundred and a thousand rupees, from English and NATIVE gentlemen.

We stated that Dacca contains about seventy children of European or Eurasian parentage. About twenty of these belong to what we may call well to-do parents. It is of course true that a gentleman whose income may be five or six hundred rupees a month (or even more) but who has a very large family is really far poorer than a man whose income is three hundred ... More especially is this the case if the latter parent belongs to a lower stratum of society. Stilkl parents must be class ... in general lists according to their incomes and social positions and not according to the number of their little ones, who—in the days before taxes were known (and before Daccas landlords existed)—might possibly be fairly enough described as "arrows in the hands or a giant." These well to-do parents—whether rightly or worngly so-called— might start a second and more exclusive school in Dacca. But no one who pays a moment's attention to the subject can fail to see that such a school must be expensive in proportion both to the excellence of the teaching and to scanty number of the pupils. Any attempt to provide for a few children a first class education with masters and mistresses imported into the station for the purpose, and with such a scale of fees as shall bring the new school into competition with Mr. Vyse's must infallibly end in bankrupicy.

Neither the Government nor private liberality will permanently provide well to do parents with money to educate their children. Very hard cases no doubt occur among those whose we must imperfectly describe by classing them among well-to-do people. In fact the reason why such exceptional people are not really well of is not that their actual income is small but that the number of their children and the style in which they must live combine to cause their difficulties.

The attempted establishment in Dacca of new school—its management of mismanagement—its real or apparent opposition to the school of Mr. Vyse—these elements—intensified by theological bigotry—have introduced into the discussion of the educational needs of Dacca much

acrimony and many needless personalittes.

The local authorities have been standing bewteen two fires. One party would have had them stamp out the school of Mr. Vyse and reduce a deserving man to utter destitution. The other party would have them frown on the attempted establishement of a new school intended by its more liberal advocates, not to rob Mr. Vyse of his pupils but to supplement the education which his school can give by something beyond his standard. What the local authorities had to do was to support each school in proportion to its actual merits. And as we understand that the late Commissioner was President of the committee of each school, it seens clear that though certain members of one committee might cherish hostile feelings towards the school watched over by the other yet the local authorities were honestly striving to stand neutral. Like all neutrals they must not be surprised to find themselves bitterly attacked by both sides.

Then as regards the management of the new school, it is wellknown that its organisation and aims were entirely settled by the Bishop. The conclusion is not difficult to draw. Certainly the school has proved a miserable failure and has thrown discredit quite undeserved on the members of the local committee. The Bishop enters the station driving a four in hand. The local authorities are persuaded to get up and he tumbles them into the mind. Whether he can succed in settling the blame on the shoulders of a particular outrider is more than we care to inquire. There is however no doubt that for some little time ecclesiastical driving will be viewed with much suspicion in Dacca.

Dacca News, 9.2.1876

LOCAL SCHOOLS

In the last issue of a local contemporary we notice an article entitled "Schools in Dacca". It commences by drawing attention to the fact that there is a want of proper discipline in our Native schools. It points out that a student who is punished in one school for idleness, disobedience or other offences, has occasionally have known to leave that school and find no difficulty in obtaining admittance eleswhere. It also states that a student who is denied promotion to a higher class—for which in the opinion of the Head Master of his school he is judged to be utterly unfit—can readily obtain in another school the vital promotion which be covets. In other words, if he has been a year in the thrid class and is quite unfit—to pass into the second class, he leaves his school and is easily admitted elsewhere as a second class student. In this way a number of students ultimately find their way into the Entrance class, and when they appear in the Calcutta Entrance Examination they are plucked as a matter of course. On repeating the experiment the next year they will probably be plucked again, for no amount of contiuance in the Entrance class will supply them with

knowledge which is only taught in lower classes. For the want of this knowledge they are unable to benefit by the instruction given in the highest class. Self-evident as are these considerations, students will refuse to accept them. Thus their parents are denying themselves to little purpose to provide their childs, with schooling. Thus the higher classes of our Native schools are filled with boys who are prone to be idle and troublesome in class because they cannot really follow the expositions of the Master owing to their ignorance of the rudiments of the subject. True also boys are tempted to use unfair means to pass the university examination from their obvious unfitness to pass it honestly. We are informed by the writer of the same article that the Head Masters of the private schools in Dacca endeavoured to combine to carry out improvements in these respect. But—the writer goes on to say—the movement fell through owing to the "want of sympathy and co-operation evinced by the then Principal of the College. Mr. Garratt and the present Head Master of Collegiate School Baboo Koilas Chunder Ghose. The writer however is careful to save us the task of disproving this last assertion, for he forthwith proceeds to supply evidence that the Principal and the Head Master in question showed decided sympathy with the movement. We believe that the matter has also privately been brought before the present of officiating Principal. It is understood that he has expressed his readiness and anxiety to do all in his power to further so desirable an improvement. It is natural that Head Masters of Private schools should feel a difficulty in taking the initiative. For these schools being proprietary must be made to pay. Any such improvements in discipline—especially if confined to one or two schools—which are necessarily rivals—show perhaps a little mutual distrust. They agree however, in considering that the Collegiate school which has a Government treasury behind it, should lead the way in preparing the necessary reforms. In this expectation we cannot see that they are unreasonable, and we sincerely hope that the Principal of the College will not be wanting on this occassion. We are encourage in this hope, as it is well known that he has already directed his attention to plans for raising that one of the students in our Government Schools and Colleges. Shortly after he took over charge of the College. He addressed the Director of Public Instruction on this subject. The matter appears to have hung fire for some little time but lately the Director has carried out the suggestion or Mr. Ewbank, by submitting certain difinite proposals—framed by the latter gentlemen— to the eldest educational officers of the department and to other gentlemen both English and Native, who are likely to be interested in the question. It seems that replies to these proposals have not as yet been collected. It is however certain that they will be strongly supported by the officers of the Education Department. The article in our contemporary closes by referring in terms of disapproval to some

change in the routine of the Collegiate School which has lately been introduced. The reasons on which this change was based, were laid down with sufficient fulness, in the order book or the College. It does not appear that in the framing of the order in question, any opposition to the measure on the parts of guardians of the pupils, or others, was foreseen. But as a matter of fact it is sufficient for anyone to read that order— a copy of which has already incidentally found its way into the columns of our contemporary—to see that the measure was a wise one. It is well known that the Head Masters of some other schools would like to see the same system introduced, but they are prudently allowing the Principal of the College to fight the battle single-handed. This change execited at the time some controversy in Native papeers. Several utterly unfounded statements apparently framed to injure the Principal of the College and the Head Master of the Collegiate School—where recklessly introduced into the discussion. It is understood that before Mr. Ewbank made the change he collected opinions on the piont from various sections of the Native community. The answers obtaind might be divided into two categories. One class of parents give it as their opinion that the matter was one which should be left to the diseretion of the Educational officers. The parants of the other class appeared to look on a school as a king of nursery where a child might be sent to be kept out of mischief during the day while the father is engaged in his business, and the mother is occupied with her domestic duties. In their opinion school which keeps its scholars for five hours, this fact would establish its preeminence. In this latter class of opinions, indeed, there is nothing peculier to Bengal. The same views may be gathered in all countries among corresponding classes of the community. It is said that pettitions against this change of routine have been sent both to the Principal and to the Director. In India it is impossible to estimate the importance of a pettion by the number of signatures it contains. It would in fact be necessary first to analyses carefully the names on the document and, secondly, to learn the exact circumtances under which the signatures were obtained. On the whole we are of opinion that Native gentlemen who realise the many evils of the want of proper discipline in our various Native schools, should endeavour by all means in their power to stregthen the hands of heads of schools, and that to attempt to interfere with these officers in the settlement of school routine, an only be productive of mischief.

Dacca News, 22.1.1876

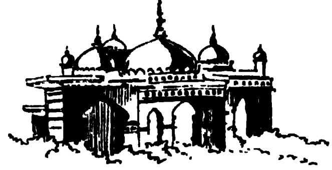
১. ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯৩। পৃঃ ৫১৪

২. Statistical Account of Bengal. Vol. V. Dacca. Page 135-136

৩. ঢাকা প্রকাশ, ৯ এপ্রিল ১৮৬৩

৪. ঢাকা প্রকাশ, ২৩ জানুয়ারি, ১৮৭০
৫. ঢাকা প্রকাশ, ১৭ নভেম্বর ১৮৭২
৬. ঢাকা প্রকাশ, ৩১ আগষ্ট, ১৮৭৯
৭. ঢাকা প্রকাশ, ১২ আগষ্ট, ১৯০০
৮. ঢাকা প্রকাশ, ৯ এপ্রিল, ১৮৬৩
৯. ঢাকা প্রকাশ, ১৭ জুলাই, ১৮৭০
১০. ঢাকা প্রকাশ, ৭ জুলাই, ১৮৭২
১১. ঢাকা প্রকাশ, ১৩ জানুয়ারি, ১৮৭৭
১২. ঢাকা প্রকাশ, ১৭ আগষ্ট, ১৮৯০
১৩. ঢাকা প্রকাশ, ১৬ এপ্রিল, ১৮৬৩
১৪. ঢাকা প্রকাশ, ৯ জুলাই, ১৮৬৩
১৫. ঢাকা প্রকাশ, ১৫ এপ্রিল, ১৮৬৬
১৬. ঢাকা প্রকাশ, ১৬ ডিসেম্বর, ১৮৬৬
১৭. ঢাকা প্রকাশ, ৫ জানুয়ারি ১৮৭৩
১৮. ঢাকার প্রথম—মুনতাসীর মামুন। পৃঃ ২৮
১৯. ঢাকা প্রকাশ, ৫ জুন, ১৮৭০
২০. ঢাকা প্রকাশ, ৩০ এপ্রিল, ১৮৬৩
২১. ঢাকা প্রকাশ, ৪ এপ্রিল, ১৮৬৯
২২. ঢাকা প্রকাশ, ২৪ এপ্রিল, ১৮৭৮
২৩. ঢাকা প্রকাশ, ১৮ জুলাই, ১৮৬৪
২৪. ঢাকা প্রকাশ, ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৭
২৫. ঢাকা প্রকাশ, ২১ জানুয়ারী ১৮৮৩
২৬. ঢাকা প্রকাশ, ২৩ জানুয়ারি ১৮৭৩
২৭. ঢাকা প্রকাশ, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮০
২৮. ঢাকা প্রকাশ, ২৩ মে, ১৮৮০
২৯. ঢাকা প্রকাশ, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১
৩০. ঢাকা প্রকাশ, ১৬ ডিসেম্বর ১৯০০
৩১. ঢাকা প্রকাশ, ৯ জুলাই ১৮৬৩
৩২. ঢাকা প্রকাশ, ১ মে ১৮৭০
৩৩. ঢাকা প্রকাশ, ৪ জুন ১৮৬৩
৩৪. ঢাকা প্রকাশ, ২ মে, ১৮৬৯
৩৫. ঢাকা প্রকাশ, ৬ জুলাই, ১৮৭৩
৩৬. ঢাকার প্রথম—মুনতাসীর মামুন। পৃঃ ৩৩
৩৭. ঢাকা প্রকাশ, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৭
৩৮. ঢাকা প্রকাশ, ৪ মে, ১৮৭৯
৩৯. ঢাকা প্রকাশ, ১৮ মে, ১৮৭৯
৪০. ঢাকা প্রকাশ, ২০ জুলাই, ১৮৭৯
৪১. ঢাকা প্রকাশ, ২০ এপ্রিল ১৮৮৪
৪২. ঢাকা প্রকাশ, ৪ আগস্ট, ১৮৮৪
৪৩. ঢাকা প্রকাশ, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪
৪৪. ঢাকা প্রকাশ, ১৭ জুন, ১৮৯০
৪৫. ঢাকা প্রকাশ, ২৪ নভেম্বর, ১৮৯৫
৪৬. ঢাকা প্রকাশ, ২৪ নভেম্বর, ১৮৯৫
৪৭. ঢাকা প্রকাশ, ২ মে, ১৮৯৭
৪৮. ঢাকা প্রকাশ, ৭ আগস্ট, ১৯০৪
৪৯. ঢাকা প্রকাশ, ৯ এপ্রিল, ১৯০৫

৫০. ঢাকা প্রকাশ, ২১ জুলাই ১৮৬৪
৫১. ঢাকা প্রকাশ, ২২ আগস্ট, ১৮৬৬
৫২. ঢাকা প্রকাশ, ২৭ জুন, ১৮৯৭
৫৩. ঢাকা প্রকাশ, ১৫ জুলাই ১৯০০
৫৪. ঢাকা প্রকাশ, ৯ জানুয়ারি ১৮৮৭
৫৫. জীবনের স্মৃতিদীপে—রমেশচন্দ্র মজুমদার। পৃঃ ৪২-৫৯
৫৬. আমার যৌবন—বুদ্ধদেব বসু ॥ পৃঃ ৪-৬
৫৭. আট দশক—ভবতোষ দত্ত।
৫৮. ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯৩
৫৯. ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার। ১৯৯৩। পৃঃ ৫৭৪



৮. উৎসব পাল-পার্বণ

"... পুরনো শহর একদিকে ছিল মোগলাই কালচারের একটা ধারা। আর অন্যদিকে বসাক-সাহাদের বাণিজ্যিক কালচার। ঢাকা ছিল পূর্ববঙ্গের একমাত্র শহর যেখানে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী ছিল না। কিন্তু এর মধ্যেই লেখাপড়া ঢুকে গিয়েছিল খুব গভীরে—বিশেষত বসাকদের মধ্যে রাধাগোবিন্দ বসাকের মত পণ্ডিত ছিলেন, শরৎ বসাকের মত অ্যাডভোকেট ছিলেন, কান্তি বসাকের মত আই সি এস ছিলেন। শহরে ছিল বহু বিশিষ্ট মুসলমান পরিবার—শিক্ষা-দীক্ষা সব দিক থেকে গণ্যমান্য।..."

(ভবতোষ দত্ত, আট দশক। পৃঃ ৫২-৫৩)

ইংরেজরা এসে দেখেছিল, ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। হিন্দু, মুসলমান দুটি সম্প্রদায়ের মানুষ স্বতন্ত্রভাবেই নিজেদের জগত গড়ে তুলেছিল। রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে বার বার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবন ধারায় তার প্রভাব পড়েছে গভীরভাবে। সনাতন হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে মুসলমান আগমনের সূচনাপর্বেই। সংঘাতহীনভাবেই পারস্পরিক সুস্থ সহাবস্থানের বিবরণ পাওয়া যায় ইতিহাসের পাতা থেকেই। মোঘল শাসনের প্রাণকেন্দ্র ঢাকায় আমরা দেখতে পাই—সুস্পষ্ট পরিবর্তনের স্রোতধারা। পরবর্তী ইংরেজ শাসনকালে, সংখ্যাগুরু মুসলমানদের পিছনে ফেলে সংখ্যালঘু হিন্দুরা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। এর অন্যতম কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি হিন্দুদের তীব্র আকর্ষণ। মুসলমান সম্প্রদায় যা থেকে দীর্ঘকাল দূরত্বে অবস্থান করেছে।

ঢাকার জনজীবনের দৈনন্দিন চিত্রটি কেমন ছিল, সে সম্পর্কে বিভিন্ন বিবরণ থেকে আকর্ষণীয় তথ্য পাওয়া যায়। ঘুড়ি ওড়ান, পাখির লড়াই, নাচ, গান, বাইচ, অভিনয়—এসব নিয়ে হিন্দু-মুসলমান বাঙালি দ্বৈত জীবনধারার যে রূপটি ধরা পড়ে, আজকের বিচ্ছিন্ন মানসিকতায় তার মূল্যায়ন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ডবলু. ডবলু হান্টারের বই-এ বাঙালি জীবনের সনাতন ধারায় কীভাবে বিদেশি প্রভাব পড়েছিল তার একটি পরিচয় পাওয়া যায়।

মিঃ ক্লে-র 'হিস্ট্রি অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্স অফ দি ঢাকা ডিভিসন' থেকে ডবলু. ডবলু. হান্টার এই অংশটি উদ্ধৃত করেছেন : The principal amusements are kite-flying, bird-flights, *nautches, lilas* or theatrical representations, cards, and other games of chance. In former times boating was a favourite pastime, and probably originated with the Nawabs, who took great pleasure in this exercise, and had magificent state barges. In imitation of these, the merchants, weavers and others kept pleasure - boats fancifully decorated, with their crews dressed in various costumes ; and moonlight regattas formed at one time on the chief amusements of the people. The practice has now died out, and regattas are almost unknown except on special occasions, when they are got up among the natives for the entertainment of visitors by the European residents at the

station. Kite-flying is a very general pastime during the cold weather and spring months. The kites are made of coloured paper stretched over a light frame work of bamboo, and, as a rule have no tail, no tassels like the kites in England. The string is wound on a revolving spindle, and is let out or shortened at measure by a rotary motion of the hands. Kite-flying at times becomes a perfect nuisance and has to be prohibited in the public streets and throughfares for carriages. Young men as well as boys engage in it and evince a skill and dexterity in the management of their kites which would challenge admiration were it displayed in the pursuit of any less unmanly and childish amusement.

"Deer are sometimes caught with nets, and the natives generally, especially the Musalmans, are fond of shooting, if such a term can be applied to their habit of prowling about in the jangle, and murdering any unlucky beast or bird that gives them a chance of a close shot. Angling is a common pursuit but it is practised in a clumsy and unskilful manner. The Hindus are fond of fights between rams, *bulbuls* or nightingales, *dahials*, and *mainas* ; and large sums of money are frequently staked on the event. Other indoor amusements consist of games of chance with dice, cowries, cards, eggs, and coca-nuts; while the weavers and other Vaishnavs indulge in *nautches* and *lilas* or theartical representations of the exploits of Krishna. Among the Hindus the *behela* (a kind of violin) is the common musical instrument, but the European pattern is now much used, and is procurable in all the bazars. It need perhaps scarcely be mentioned that these instruments are not equal to Cremonas. *The sitar* (a kind of guitar with three strings) is the favourite to instrument among the Musalmans. Their passive amusements are *nautches*, firewokes, cock-fighting, dice, and cards. The above sports and pastimes, requiring, as a rule, no courage or endurance, and little or no physical exertion are eminently by charactertistic of the indolent and spiritless nature of the natives of this District, who are as a body, fair average specimens of the languid population of the Bengal Delta. If must be admitted, however, that some attempt has been made, in the city at least, to indroduce a more manly style of amusement among the rising generation ; and some of the boy at the Government College may now be seen, during the cold weather, imitating the performances of the European risidents at Cricket. They do not however, appear to appreciate or enter into the spirit of the game; and their play in generally of the mildest description." [১]

জেমস টেলর ঢাকাবাসীদের এক আনন্দময় জীবনধারার মুখোমুখি হয়েছিলেন। যার সঙ্গে ওপরের বিবরণের সাদৃশ্য আছে। টেলরের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি, ঘুড়ি উড়ানো, বুলবুলির লড়াই, নাচগান - লীলা ও তাস খেলার মধ্যে সমীবদ্ধ ছিল আমোদপ্রমোদ। শহরের ধনী লোকদের অন্যতম প্রমোদ অঙ্গ ছিল নৌকাবিহার। রাজকীয় বিশাল বিশাল নৌকা তৈরি হত তাদের বিনোদনের জন্য। এসব নৌকার অন্যতম ছিল ময়ুরপঙ্খী আর 'মগরচেরা'। এ

ছিল নবাবী বিলাস। শহরের বণিক আর তাঁতিরা নিজেদের সুসজ্জিত প্রমোদতরী তৈরি করত। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় নদীতে নৌকা বাইচ ছিল সকল শ্রেণীর মানুষের প্রিয়। দেশের এই অঞ্চলে ঘুড়ি ওড়ানো খুবই জনপ্রিয়। ঘুড়ি ওড়ানো হয় শহরাঞ্চলে শীতকালে এবং গ্রামে বসন্তে। কেবল বালক নয়, বয়স্করাও এই খেলায় যোগ দেয়। ঘুড়িগুলো হয় ছোট আর হাল্কা। পাতলা কাগজ আর বাঁশের লম্বা আর সরু টুকরো দিয়ে তৈরি। রেশমি বা সাধারণ সুতো দিয়ে ঘুড়ি ওড়ান হয়। চড়ক পুজোর দিনই ঘুড়ি ওড়াবার উৎসব। বলা যায় বছরের শ্রেষ্ঠ উৎসব। বাস্তু পুজো হয় মকর-সংক্রান্তি বা পৌষমাসের শেষ দিনে। হিন্দু জমিদাররা তাদের জমিদারির ভিতর কোন উন্মুক্ত স্থানে সব সম্প্রদায়ের প্রজাদের ভোজন উৎসবে আমন্ত্রিত করেন। চাল, গুড়, পিঠা দেওয়া হয় তাদের। বিক্রমপুরে কুস্তি ও লম্ফদান বিশেষ জনপ্রিয়। গলফ খেলার মত আরুন্দা নামে একটি খেলা প্রচলিত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে। কাঠের বল আর ছোট ছোট বাঁশের লাঠি নিয়ে ওই খেলা। হিন্দু জমিদাররা জাল দিয়ে হরিণ ধরে আর মুসলমানরা গুলি ছুঁড়ে শিকার করে। ঘরের ভিতর পাশা খেলা, কড়ি ও তাস খেলা হয়। নারকেল ভাঙাও জনপ্রিয়। তাঁতি ও বৈষ্ণবদের মধ্যে কৃষ্ণলীলা জনপ্রিয়।

আজও ঢাকার সব থেকে জনপ্রিয় উৎসব মহরম। অনেক আগে থেকেই ঢাকায় এই ধর্মীয় উৎসব আড়ম্বরের সঙ্গে পালত হয়ে আসছে। মোঘল আমলে বিপুল সংখ্যক শিয়া-র বসবাস ছিল এই জেলায়। মূলত শিয়াদের উৎসব হলেও, সুন্নিরাও যোগ দিত। মোঘল রাজত্বের সময় শিয়াদের সংখ্যাধিক্যের কারণে ঢাকায় মহরমের উৎসব হয়ে উঠেছিল জাঁকজমকপূর্ণ। এই উৎসবের কেন্দ্রস্থল ছিল ইমামবাড়া ও হোসেনি দালান। অনুষ্ঠান হত ১০ দিন।

ঢাকা জেলার মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসবগুলির অন্যতম কয়েকটি হল :

১. মহরম	৪. রমজান
২. ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী	৫. ইদুল ফিতর ও ইদুল আযহা
৩. শব-ই-বরাত	৬. তেলা বা ভেরা উৎসব

তাছাড়া আছে জুম্মার সালাত। প্রতিটি মসজিদে শুক্রবার জুম্মার সালাত আদায় করা হয়। চিরাচরিত রীতিমত এখনও হোসেনি দালান ও ইমামবাড়ায় মহরম পালিত হলেও, কিছু পরিবর্তন ঘটেছে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানে। কিন্তু মূল ১০ দিনের অনুষ্ঠান যথাযথ পালিত হয়। এই মহরম অনুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ হল মেলা। আগে উল্লেখযোগ্য মেলা হত হোসেনি দালান, বকশিবাজার, ফরাশগঞ্জ এবং আজিমপুরে। এখনও আজিমপুরের মেলার আকর্ষণ আগের মতই আছে।

ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার থেকে জানা যায়, মহরমের শুভ সূচনা হয় ইমামবাড়া থেকে। ঢাকায় বেশ কয়েকটি ইমামবাড়া আছে। সব থেকে পুরনো ইমামবাড়া আছে ফরাসগঞ্জে, যেটি ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেছিলেন আমির খান। হোসেনি দালানই সব থেকে উল্লেখযোগ্য। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের কাছেও একটি হোসেনি দালান ছিল। যেটি জেলার মধ্যে সব থেকে প্রাচীন। ফুলবাড়িয়ার ইমামবাড়াকে বলা হয় ইয়াকুবের হোসেনি দালান এবং মৌলভি বাজারের ইমামবাড়াকে বলা হয় ছোট কাটরা।

ঢাকার মহরমের ছবি মনোদা দেবীর 'সেকালের গৃহবধূর ডায়েরিতে' চিত্রিত হয়েছে এইভাবে ঃ "মহরমের সুন্দর তাজিয়া দেখিয়া আমরা খুবই আনন্দ পাইতাম। সেখান মাঠের মধ্যে সেদিন গরিব-দুঃখীদের খিঁচুড়ি খাওয়ান হইত। হাজার হাজার লোক সেদিন পেট ভরিয়া খাইয়া যাইত, হুসনী দালানের কাছের মাঠের মধ্যে বসিয়া। মার কাছে মহরমের ঘটনাটি পূর্বেই শুনিয়াছিলাম, সেই নির্মম ঘটনার দিনটিকে সেদিন মনে পড়িয়া যাইত। এখন হিন্দু মুসলমানে বিবদমান ঝগড়া-ঝাঁটি, খুনাখুনির কথা সর্বদাই শুনিতে পাইও জানিতেছি, তখন

কিন্তু সেসবের বিন্দুমাত্রও কেহ্ শুনিতে বা জানিতে পারে নাই। কিন্তু তখন ঐ মুসলমানের মধ্যে দুটি ভাগ ছিল শিয়া ও সুন্নি, তাদের মধ্যে খুব বিবাদ-বিসম্বাদ চলিত। তাহা ছোটকালেও আমরা বেশ শুনিতে পাইতাম। নবাব গনি মিয়ার বাড়ি হইতে তাঁর বাগানের রকমারি বহু ফুল ঝুড়ি ভরিয়া আমাদের বাড়িতে আসিত তাহা খুব মনে পড়ে। আর মনে পড়ে রমনার মাঠে নবাবের চিড়িয়াখানা। যখন সবাই মিলিয়া দেখিতে যাইতাম, কত জীবজন্তুর সমাবেশ; কতরকম পাখি, বানর, বাঘ, সিংহ। বিশেষ করিয়া সেই চিড়িয়াখানার মাঠ জুড়িয়া যখন বিরাট উটপাখিগুলি দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত, তখন খুবই আনন্দ পাইতাম। তারপরে বাঁধান বড় বড় চৌবাচ্চার মধ্যে দেখিতাম কত লাল, সাদা কালো রঙ-বেরঙের মাছের খেলা। আমরা সেই চৌবাচ্চার জলে খই ছিটাইয়া দিতাম, তৎক্ষণাৎ দেখিতাম মাছগুলি জলের মধ্যে থাকিয়াই যেন আমাদের অতি নিকটে আসিয়া পড়িত আমরাও ঐ তামাশা দেখার জন্য বেশি বেশি খই ছিটাইয়া দিতাম। বাঁদরদেরও প্রচুর কলা দিতাম ও উহাদের নানারূপ অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া খুব আনন্দ পাইতাম। গনি মিয়ার বড় ছেলের আবার একটি ভিন্ন বাগান ছিল। তাহা ঐ চিড়িয়াখানার কাছাকাছি ছিল, সে বাগানে কত ফুল ও ফলের গাছ তার যেন আর অন্ত ছিল না। সে বাগানে 'পান্থ-পাদপ' গাছ ছিল, একটু খোঁচা দিলেই পরিষ্কার জল বাহির হইত। একটি কৃত্রিম পাহাড়ও ছিল, আমরা সে পাহাড়ে দৌড়াইয়া ছুটিয়া যাইতাম, কে কাহার আগে যাইব এই ছিল মনের ভাব। কালের স্রোতে আজ কিন্তু সবই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।..." [২]

ওপরের বিবরণটি উনিশ শতকের প্রথম বা বিশ শতকের প্রথমদিকের। তার আগেকার একটি বিবরণ আরও আকর্ষণীয়। 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় (১৮৬৩ খ্রিঃ) মহরম প্রসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল ঃ

"...এখানে 'হোসেনি দালান' নামক একটা প্রাচীন দালান আছে। ইহা মুসলমানদিগের অধিকার সময়ের নির্মিত। এইটিই মহরম পর্বাহানুষ্ঠানের প্রধান স্থান। মহরমের সময় ঢাল তরবার এবং অন্য নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র ও চিত্র ইত্যাদি দ্বারা ইহার মধ্যভাগ উত্তমরূপে সুসজ্জিত করা হইয়া থাকে। এবং দালানের প্রাচীরের কোন কোন স্থান কৃষ্ণবস্ত্রে আবৃত অথবা মসী দ্বারা রঞ্জিত করা হয়। ... মহরমের সময় হোসেনী দালানের চারদিকে একটি বাজার বসিয়া যায়। যতদিন ১০ দিবস অতীত না হয়, ততদিন রাত্রি-দিনের মধ্যে প্রায় একমুহূর্তকালও বাজার অবরুদ্ধ হয় না। যখন যাও, তখনি ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে, দেখিতে পাইবে। রাত্রিকালে হোসেনী দালান আলোকমালায় বিলক্ষণ শোভিত করা হয়। হিন্দুদের চৈত্রোৎসব নিকটবর্তী হইলে অনেক সামান্য লোকে যেমন ভজন শিক্ষা করিয়া থাকে, অত্রত্য মুসলমানেরাও তেমন মহরমের সময় নিকটবর্তী হইলে 'জারী' গাইতে এবং ইয়া হোসেন ইয়া হোসেন বলিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে অভ্যাস করে। ... জারী গানের চিৎকার ধ্বনি এবং করাঘাতের দুপদাপ শব্দে মুহূর্তেকের মধ্যে কর্ণ বধিরপ্রায় হইয়া উঠে। ইহাদিগের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের অভাব থাকে না। কিন্তু বাদ্যযন্ত্রের নিনাদ উক্ত মহাশব্দ সকল ভেদ করিয়া উপরে উত্থিত হইতে সমর্থ হয় না। ৭ম দিবস পর্যন্ত এইরূপ ধুমধাম চলিতে থাকে। ৮ম দিবস তোপগস্তের দিন। এই দিবস সন্ধ্যায় কিঞ্চিৎ পূর্বে হোসেনী দালান হইতে একটা মিছিল বাহির হয়। মিছিলের অগ্রভাগ কয়েকটি হস্তি এবং কতকগুলি পতাকা দ্বারা সুশোভিত করা হয়। পতাকাধারীর পশ্চাদভাগে কতকগুলি বাদ্যকর থাকে। তৎপশ্চাতে কয়েক ব্যক্তি লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে এবং তরবারি চালাইতে চালাইতে চলে। তৎপর দুইখানি শিবিকা দৃষ্ট হয়। ... শিবিকার পশ্চাদভাগে কয়েকজন অশ্বারোহন সৈন্য শোকপ্রকাশ করিতে করিতে যায়। তৎপর একদল গায়ক একটি শোকসূচক গান গাইতে গাইতে দর্শনপথে উপস্থিত হয়। অনন্তর একটি সুসজ্জিত অশ্বে হোসেনের শব লইয়া যাওয়া হয়। শবের চারদিকেই বীজন হইতে

থাকে। এতৎপশ্চাতে একটা আহত অশ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ... সর্বশেষে কয়েকজন মোঘল শোকসূচক কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া আরব্য ভাষায় একটি গান গাইতে গাইতে এবং বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে যাইতে থাকে। ৯ম দিবস রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকা হইতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত চকের মাঠে যষ্ঠি ক্রীড়া ইত্যাদি হইয়া থাকে। ১০ম দিবসে ঢাকার পশ্চিমভাগে একটা কল্পিত কারবালার ময়দানে হোসেনের সমাধি করা হয়, মহরমও শেষ হইয়া যায়।

এই ব্যাপারে যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহা গবর্নমেন্ট হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে। গবর্নমেন্ট প্রতি বৎসর ২৫০০ টাকা করিয়া প্রদান করিয়া থাকেন। যে বৎসর ইহাতে ভালরূপে ব্যয় কুলান না হয়, সে বৎসর কোন ধনী মুসলমান কিছু কিছু প্রদান করেন।

বিগত বিদ্রোহোপলক্ষে গবর্নমেন্ট অত্রত্য মুসলমানদিগকে মহরমের সময় যষ্ঠি ক্রীড়া ইত্যাদি করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। ... কিন্তু এ বৎসর পুনর্বার তাহার অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

আমরা কোন কোন বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিলাম, অনুসন্ধান করিয়াও জানিলাম, কায়েতটুলি প্রভৃতি স্থানবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকে মহরমের সময় মুসলমানদিগের ন্যায় উপবাসাদি করিয়া থাকে। এবং কেহ কেহ মৎস্য আহার করে না ...।"

শ্রীমতী শোভা ঘোষের বিবরণে মহরম প্রসঙ্গে জানা যায় : "...আমাদের বাড়ির সামনে শিয়া মুসলমানদের মহরমের মিছিলও যাইত। তিন চারিদিন ধরিয়া সাদা জরির ঝালর দেওয়া সবুজ পোশাকে সজ্জিত ছেলেরা পতাকা উড়াইয়া ডুম্ ডুম্ শব্দে দুন্দুভি বাজাইয়া, এক-একটি দলে বিভক্ত হইয়া আমাদের বাড়ির সম্মুখ দিয়া যাইত। শুনিতাম তাহারা হুসনীদালানের কাছে গিয়া জমায়েত হয়। মুসলমানদের হুসনী দালান শহরের একপ্রান্তে ছিল। সেটি দেখিতে দুর্গের মত ছিল। মহরমের শেষদিন মস্ত উঁচু তাজিয়া ২/৩ খানা যাইত। সবগুলিতেই গম্বুজের মত চূড়া তৈয়ারী করা আছে। দেখিতাম মুসলমানেরা মানত করা কবুতর বা পায়রা ছুড়িয়া মারিত তাজিয়ার দিকে। ফেরিওয়ালারা 'সেরা সিনি' বলিয়া এক একটি সবুজ কাগজ ও কলাপাতার মোড়ক বিক্রয় করিত। দেখিতাম তাহারা সেগুলিও এক একখানা কিনিয়া তাজিয়ার দিকে ছুঁড়িয়া দিতেছে।"[৩]

ঢাকার যে কোন মেলার অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল সঙ। সঙ্ না থাকলে মেলা জমত না। সঙ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল পাড়ায় পাড়ায়। চৈত্র সংক্রান্তির দিন মেলা বসত মসজিদগঞ্জে। হিন্দু-মুসলমানের যৌথ মেলা। মাটির খেলনা ও মাটির বাসনপত্রে ভরে থাকত। শামিয়ানা টাঙিয়ে তার নিচে বসত গানের আসর। সঙ আসত বিভিন্ন অঞ্চলের। পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল এদের মধ্যে। পয়লা বৈশাখ মেলা বসত ফরিদাবাদ ও শ্যামপুরে। শ্যামপুরের মেলাটি ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক বড়। এইদিনে চিল পুজোর অনুষ্ঠান ছিল বেশ আকর্ষণীয়। বাড়ির ছাদের ওপর হত এই পূজা। পাখিদের উদ্দেশ্যে খাবার ছুঁড়ে দেওয়া হত আকাশে। সেই খাবার মাটিতে পড়ার সুযোগ পেত না। তার আগেই ছো মেরে নিয়ে যেত পাখিরা। চড়কের মেলার সঙ্গে পয়লা বৈশাখের মেলা মিশে একাকার হয়ে যেত। হাকিম হাবিবুর রহমান লিখেছেন চড়কের দিন বেরোত কালী ও শিব-গৌরীর সঙ। কালীনৃত্যটি ছিল বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কালীর দুই হাতে তলোয়ার বা রামদা থাকত। নাচের সঙ্গে ঢাক বাজত। দক্ষ বাদ্যযন্ত্রীরাই ঢাক বাজাত। কারণ, এই বাজনার জন্য পারদর্শিতার প্রয়োজন হত। বৈশাখের শুরুতেই বেরোত লালচাঁদ গোয়ালার মিছিল। মির্জা মান্না দেউড়ির গোয়ালারা শিবপূজা উপলক্ষে এই মিছিল করত। বিশ শতকের শুরুতেই এটি অবশ্য বন্ধ হয়ে যায়। লালচাঁদের মূর্তি থাকত মিছিলে। কোতোয়াল পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসত। মহাদেবের বিশাল মূর্তি বহন করে নিয়ে যেত কাহার বা পাল্‌কিবাহকরা। মূর্তির ওপর ফুল বর্ষণ করা হত। যেসব সঙের দল আসত তাদের মধ্যে ছিল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কিন্তু দেববিগ্রহে কেউ আঘাত না করায়,

দাঙ্গা কখনও সাম্প্রদায়িক চেহারা নিত না। দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং লালচাঁদের উত্তারাধিকারীদের আর্থিক অবনতির কারণে, এই আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়।

শাহবাগে ১ জানুয়ারি জশন অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেছেন হাবিবুর রহমান। নবাব আবদুল গনি ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে স্যর উপাধি পেয়েছিলেন। সেই উপলক্ষে শাহবাগের মনোহর বাগিচায় হত এই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান বৈচিত্র্যের অন্যতম ছিল হিন্দু-মুসলমান সঙ। ঢাকাবাসী সকল সম্প্রদায়ের প্রিয় এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন শহরের বিশিষ্ট মানুষজনসহ সাধারণ নাগরিক।

ঢাকায় এক সময় বহু হিন্দুর বসবাস থাকায়, তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য ছিল লক্ষ্যণীয়। সব থেকে প্রাচীন উৎসব ছিল জন্মাষ্টমী। আর এই উৎসব উপলক্ষে যে মিছিল বেরোত তার খ্যাতি ছিল বহু দূর বিস্তৃত। কেবল ঢাকায় মানুষই নয়, পূর্ববাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ যোগ দিত এই উৎসবে। তাছাড়া ছিল দুর্গাপূজা, লক্ষীপূজা, সরস্বতী পূজা এবং রথযাত্রা। পয়লা বৈশাখের হালখাতাও ছিল বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত। হিন্দুদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায়, তাদের বিভিন্ন উৎসবের জাঁকজমক আর আগের মত নেই।"... ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঢাকা জেলায় বহু মেলা অনুষ্ঠিত হয়। লাঙ্গলবন্ধের স্নান হচ্ছে বৃহৎ, ১,০০,০০০ লোক উপস্থিতির সর্ববৃহৎ মেলা। ধামরাই এর রথযাত্রায় অসংখ্য লোক উপস্থিত হয়ে থাকে। কিন্তু, কার্তিক বারুণীর মেলায় বেশ ভাল ব্যবসা চলে যা শীতকালে ধলেশ্বরী নদীর তীরে অনুষ্ঠিত হয় এবং তা মুন্সিগঞ্জ কোর্ট হাউসের উত্তরে অবস্থিত। ... বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের মত এই জেলাতেও মেলা একটি বড়রকমের ঘটনা। কারণ গ্রামবাসীরা এখানে যথেষ্ট আনন্দস্ফূর্তি লাভ করে থাকে। হকার, দোকানদার, ফেরিওয়ালা ও ব্যবসায়ীরা দূর ও সন্নিকট থেকে পণ্যসামগ্রী মেলায় নিয়ে আসে। রাজমিস্ত্রি, কুমার, লোহার, ঝুড়ি প্রস্তুতকারী ও অন্যান্য গ্রামীণ শিল্পী তাদের তৈরি করা সামগ্রী এখানে এনে হস্তশিল্পের রঙ-বেরঙের প্রদর্শনীর মাধ্যমে তা বিক্রির ব্যবস্থা করে। মিষ্টি বিক্রেতা, খেলনা প্রস্তুতকারী ও অন্যান্য মেলায় আগমনকারীদের আনন্দ দানকারীরা বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করে থাকে। মূলত এই মেলাগুলোর মাধ্যমে তারা বেশ আয় করে থাকে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ঢাকা শহর জন্মাষ্টমির শোভাযাত্রা সবচেয়ে বড় মেলা ছিল। ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো থেকে হাজার হাজার হিন্দু সম্প্রদায় এই শোভাযাত্রা ও মেলা দেখার জন্য ঢাকায় আসত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আগ্রহের অভাবে বর্তমানে তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে।"[৪]

"বারোয়ারি দুর্গা পূজার প্রচলন তখনও হয়নি—অন্তত ঢাকাতে। পুজো দেখতে যেতাম মৈশুণ্ডি, যেখানে এক বাড়িতে লাল দুর্গার প্রতিমা তৈরি করা হত। আর যেতাম সূত্রাপুরে "ঢাকার বাবু নন্দলালে"র বাড়িতে যেখানে দোতলা-প্রমাণ বড় প্রতিমা হত। সবচেয়ে বেশি যেতাম টিকাটুলি ছাড়িয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের পুজোয়। আমরা সবাই মিলে কাজ করতাম—ভিড় সামলানো থেকে দর্শনার্থীদের জুতোর খবরদারি পর্যন্ত। সন্ন্যাসীরা কীর্তন করতেন, আমরাও তাতে যোগ দিতাম। ... রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের সঙ্গে আমাদের খুব সহজ যোগাযোগ ছিল। বাড়ি বাড়ি তাঁরা একটি হাঁড়ি দিয়ে যেতেন, রোজ এক মুষ্টি চাল তাতে রাখবার জন্য। সপ্তাহান্তে এসে "মুষ্টি ভিক্ষা" সংগ্রহ করে নিয়ে যেতেন। আমরা হাঁড়িটি কানায় কানায় পূর্ণ করে দিতাম।...

"ঢাকার মত বৈষ্ণব-প্রধান শহরে সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা নয়। আসল উৎসব ছিল ঝুলন আর জন্মাষ্টমী। শহরে অনেক মন্দির ছিল, যেগুলি ঝুলনের সময়ে উৎসবের সাজে সাজান হত। জন্মাষ্টমী মিছিলের খ্যাতি ছিল দূর-ব্যাপ্ত। আশেপাশের গ্রাম ভেঙে লোক আসত দুদিনের এই মিছিল দেখতে—একদিন নবাবপুরের আর অন্যদিনটিতে ইসলামপুরের মিছিল বেরোত সন্ধ্যার মুখে—যাতে "বড়চৌকি"গুলিতে আলোর খেলা দেখানো যায় (বিদ্যুৎ নয়, কারবাইডের ল্যাম্প ও পেট্রোম্যাক্স)। হাতিতে চড়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আগে আগে আসেন,

তারপরে নিশান আর ঝালর, রুপোর আশাসোটা নানারকমের সঙ (যাতে থাকত বহু সাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে ব্যঙ্গ এবং বিপক্ষ দল সম্বন্ধে বক্রোক্তি)। তারপর "ছোট চৌকি" (অনেকটা চতুর্দোলার মত) আর রথের মত "বড় চৌকি"। সবশেষে আবার হাতি, যার নাম "রাজার হাতি"। শহরের সবচেয়ে বড় উৎসব। অফিস-কাছারি, স্কুল-কলেজ সব দুদিনের জন্য ছুটি। দ্বিতীয় ব্যাপক উৎসব ছিল মহরমের লাঠি খেলা। চৈত্রমাসের শেষে আসত "হরগৌরী" আর "কালী" নাচ। কেন জানি না, অনেকে বলত কালী-কাচ। দেবতাদের এনে বাড়ি বাড়ি নাচানো কার মাথায় এসেছিল তাও জানি না। গায়ে সাদা পাউডার মাখা সিঙা হাতে শিবের চারপাশে অল্পবয়সী একটি ছেলে দুর্গা সেজে নেচে যাচ্ছে, বা লাল রঙের একটা টিনের টুকরো দাঁতে চেপে রক্তজিহ্বা কালী সবার মনে ভয়ের উদ্রেক করছেন এতে কেউ কোনও অসঙ্গতি দেখতে পেত না। আমাদের সবচেয়ে ভাল লাগত "বহুরূপী"— বিশেষত তাড়কা রাক্ষসীর বেশে।

"যখন স্কুলে পড়ি তখন সারা শহরে একটি মাত্র সিনেমা ছিল—আর্মানিটোলার "পিকচার হাউস"। লম্বা গুদামের মত টিনের চালা দেওয়া ঘর। চার আনার সিটে ছারপোকা অধ্যুষিত বেঞ্চ, আট আনার সিটে বেঞ্চই, কিন্তু তাতে হেলান দেবার ব্যবস্থা ছিল। ছবি আরম্ভ হবার আগে কনসার্ট বাজত, আবার বাজত ইন্টারভ্যালের সময়। প্রত্যেক রিল শেষ হলে আলো জ্বলে উঠত, কারণ একটি মাত্র প্রজেক্টারে রিল বদল করতে সময় লাগত। ইংরেজি ছবিই বেশি এবং এরমধ্যে থাকত "ফুল সিলিয়াল—এডিপোলো, এলমো দ্য মাইটি, স্যানসোনিয়া, টারজন—দু-তিন কিস্তিতে দেখানো হত। ডাগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস-এর ছবি দেখানো হলে ভিড় উপচে পড়ত।

"উৎসাহের জোয়ার উঠত বাংলা টাইটেল দেওয়া ছবি দেখান হলে। শহরের সব পাড়া থেকে ঘোড়ার গাড়ি করে আশেপাশের গ্রাম থেকে—এপাড়া হইতে আয় মায়ে ঝিয়ে, ওপাড়া হইতে আয় খেয়া দিয়ে—অগুণতি লোক আসত "কমলে কামিনী" বা "পতিভক্তি" দেখতে। সপ্তাহান্তে ঘোড়ার গাড়িতে বাজনা বাজিয়ে পাড়ায় পাড়ায় হ্যান্ডবিল দিয়ে যেত "আরও এক সপ্তাহ"। তারপরে "শেষরজনী" তারপরে "নিতান্তই শেষ রজনী"। একবার "শেষ" এবং "শেষেরও শেষের" পরে হ্যান্ডবিল পাওয়া গেল "বিদায় নিয়ে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম ফিরব নারে, এই ত আবার নবীন বেশে ফিরে এলাম হৃদয় দ্বারে—সম্পূর্ণ নতুন প্রিন্ট, আবার দেখুন।" সব ছবি নির্বাক—খানিকক্ষণ পরে পরে পর্দার উপরে ফুটে ওঠে কথাবার্তার কোনও অংশ, আর সব দর্শক সমস্বরে সেটা পড়ে যায়। হলঘর মুখর হয়ে ওঠে। পরে আরো দুটো সিনেমাগৃহ স্থাপিত হল। আমরা অবশ্য বলতাম "বায়োস্কোপ" (সে নামটা কোথায় গেল?) একটা থিয়েটারও ছিল, কিন্তু সেটা ছিল এমন একটা জায়গায় যেটা ভদ্রজনের অগম্য। রেডিও তখনও আসেনি। কিন্তু একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা রেডিয়োর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমরা দল বেঁধে গিয়েছিলাম—একটা বাক্সের পাশে বসানো একটা হর্নের ভিতর থেকে অস্পষ্ট একটা ধাতব আওয়াজও শুনেছিলাম। কলকাতায় গান হচ্ছে, আর আমরা ঢাকাতে বসে শুনছি, প্রচণ্ড থ্রিল।" [৫]

জন্মাষ্টমীর আর একটি অসাধারণ বিবরণ লিখেছেন শ্রীমতী শোভা ঘোষ : "... ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল ভারত বিখ্যাত ছিল। জন্মাষ্টমীর সময় দেশ-দেশান্তর হইতে লোকেরা ঢাকায় মিছিল দেখিতে আসিত। এইসব সাহা ও বসাকদের মধ্যে দুইটি দল ছিল - নবাবপুরের দল ও ইসলামপুরের দল। জন্মাষ্টমীর পূজাপাট সাঙ্গ হইলে দিন দুই পরে একদিন নবাবপুরের ও আর একদিন ইসলামপুরের মিছিল বাহির হইত। এই বিষয়ে দুই দলে বেশ আড়াআড়ি ছিল।

"...নবাবপুরের মিছিল নবাবপুরের এলাকার কাছাকাছি যে যে রাস্তা দিয়া যাইবে এবং ইসলামপুরের মিছিল ইসলামপুর এলাকার যে যে পথ দিয়ে যাইবে তাহা পূর্ব হইতেই স্থির করা থাকিত। বেলা ১২টার পর মিছিল বাহির হইবার নিয়ম ছিল। সেইজন্য ১১টার মধ্যেই ঐসব পথে গাড়িঘোড়া চলা নিষিদ্ধ হইয়া যাইত। বেলা দশটার মধ্যেই ঐ সব রাস্তায় দুইধারের

বাড়ির একতলা, দোতলা এমন কী ছাদ পর্যন্ত লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। রাস্তার দুইধারে দড়ির বেড়া থাকিত। যেন, দর্শকেরা সীমা অতিক্রম করিতে না পারে। আর, এইবিষয়ে লক্ষ্য রাখিত পুলিশবাহিনী। পথে পথে চীনাবাদাম, গেন্ডারি (আখ বা ইক্ষু) ও সরবৎ বিক্রেতা ফেরিওয়ালা বহু দেখা যাইত। আমাদের বাড়িটি ছিল ইসলামপুর এলাকায় পাটুয়াটুলির রাস্তার উপরে।" এই দিন বাড়িটির চেহারা যেত বদলে। প্রায় শ'দেড়েক আত্মীয়স্বজন এসে হাজির হতে থাকত সকাল থেকেই। দোতলা বাড়িটা লোকে লোকারণ্য। একতলায় বসত পুরুষরা, দোতলায় মহিলারা। তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা থাকত ওখানেই। সবাই উদগ্রীব বয়ে থাকত মিছিলের অপেক্ষায়। বেলা বারোটার পর এগিয়ে আসত মিছিল।

"...২/৩টি ঘোড়ায় ঘোড়সওয়াররা প্রথমে দেখিতে দেখিতে অগ্রদূত হইয়া আসিতেছে, যেন দর্শকেরা ঠিক লাইনমত দাঁড়ায়। এইবার আসিতেছে হাতি, তাহার উপর সোনার শিবিকার মধ্যে আছে রাজপুত্রবেশে একটি ছেলে জরির সাজে। হীরায় মুক্তায় ঝলমল করিতেছে। মাহুতের সাজটিও বেশ মনোহারী। হাতির হাওদার দুইধার দিয়া সোনার জরির ঝালর ঝুলিতেছে, সেই ঝালর ধরিয়া ধরিয়া চলিতেছে রূপার আশাসোটাবাহী আট-দশজন সাদা চোগাচাপকান পরিহিত পরিচারক। তারপর তিন চারটি হাতি এগিয়ে আসত। তারাও সুসজ্জিত। তারপর আসত আট-দশটি ঘোড়া। তাদের পিঠে লাল-সবুজ ভেলভেটের আসন। তাদের পিঠে সুসজ্জিত গোপী বালক। তাদের পরনে হলুদরঙা ধুতি। মাথায় পাগড়ি, গায়ে ফতুয়া। এরপর থাকত বাদক দল। তারপর সারি সারি গায়কেরা। তাদের কারো কারো গলায় ঝুলত হারমোনিয়াম। গোপী বালিকারা রাস্তার দুধার দিয়ে চলেছে গান গাইতে গাইতে। এই শোভাযাত্রায় পিচকারি হাতে নিয়ে দোল লীলা দেখাতে ব্যস্ত কিছু বালক। গরুর গাড়ির ওপর থাকত সঙ। তারা নানারকম অভিনয় করত। তারপর আসত চৌকি। ... চারিটি বলদ টানা, প্রশস্ত একটি গাড়ির ওপর, বাঁশের মজবুত ও প্রশস্ত একতলা সমান উঁচু মাচা বা structure ইহাকে চৌকি বলা হইত। নানারকম সোলার সাজ, রাংতার সাজ, রঙিন কাগজ ও কাপড়ের সাথে আচ্ছাদিত হইয়া বাঁশগুলি অদৃশ্য হইয়া যাইত। এইসব মাচার উপর এক-একটি পৌরাণিক কাহিনীর দৃশ্য রচনা করা হইত। যেমন, মোহিনী মূর্তিতে বিষ্ণু অমৃত ভাগ করিতেছেন—দেবতা ও দৈত্যদের মধ্যে। ১৪/১৫ বছরের সব ছেলেদের বিষ্ণু, দেবতা ও দৈত্যের রূপ দেওয়া হইয়াছে। আবার একখানাতে হয়তো ইন্দ্রের দেবসভা রচিত হইয়াছে, সেইখানে অপ্সরাগণও বাদ পড়ে নাই। এইরকম ২/৩ খানা চৌকি গেলে পর নানা বাদ্য বাজনার দল, ঘোড়সওয়ার ও পুলিশবাহিনীর আগমনে মিছিল শেষ হইত। প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগিত এই মিছিল শেষ হইতে। মিছিল চলিয়া গেলে প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে, গাড়িঘোড়া চলিতে আরম্ভ করিলে পরে, আমাদের বাড়ির দর্শকবৃন্দ যার যার বাড়ির দিকে রওনা হইতেন। এই জন্মাষ্টমীর মিছিল উপলক্ষে স্থায়ী চৌকিও এক-একটা চৌরাস্তার মোড়ে মোড়ে দেড়তলা সমান উঁচু করিয়া তৈয়ারি করা হইত। এগুলিতেও নানা পৌরাণিক কাহিনীর চিত্র। যেমন, বামন অবতার দেখাইতে গিয়া প্রথমে বলিরাজার সঙ্গে বামনের সাক্ষাৎ। তারপর, বামনের হাতজোড় করিয়া ত্রিপাদভূমি যাঞ্চা, তারপর বামনের নিজমূর্তি পরিগ্রহণ ও একটি পা বলিরাজার মাথার উপর ন্যস্ত। এই দৃশ্যপরম্পররাগুলি (পুতুল নাচের মত) পুতুলের সাহায্যে ও দড়ির সাহায্যে সৃষ্টি করা হইত। বিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত নয়টা অবধি দেখান হইত, প্রায় চারি-পাঁচ ঘণ্টা; ৩/৪ খানা চৌকি ৩/৪টি রাস্তার মোড়ে থাকিত। অগণিত লোক জমায়েত হইত এই দৃশ্য দেখিবার জন্য। গাড়ি করিয়া স্ত্রীলোক ও শিশুরাও দেখিতে যাইত।" ৬

জন্মাষ্টমীর উৎসব প্রসঙ্গে মনোদা দেবীর বেশ দীর্ঘ এবং বিস্তৃত। মিছিলের অসাধারণ বৈচিত্র্য যেন আজও জীবন্ত হয়ে আছে তাঁর রচনায়। তিনি লিখেছেন, : ... "ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখাও ছিল একটি অতি বড়রকমের আনন্দের আস্বাদন। জন্মাষ্টমীর মিছিল বাহির

হওয়ার পূর্বেই দলে দলে বাবুরা ও ছোট ছেলেমেয়েরা হাতির পিঠে চড়িয়া রাস্তার উপরে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইত। সেসব হাতি প্রায়ই ভাড়া করা হাতি। মাঝে মাঝে বড়লোকদের নিজের নিজের হাতিও রাস্তায় বাহির হইত।...যতক্ষণ জন্মাষ্টমীর মিছিল বাহির না হয় ততক্ষণই ঐসব হাতি রাস্তায় চলিতে পারিত, মিছিল বাহির হওয়ার পূর্বেই রাস্তাঘাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। সেসময় হাতি, গাড়ি, ঘোড়া কিছুই রাস্তায় চলাচল করিতে পারিত না।

"ক্রমে জন্মাষ্টমীর মিছিল বাহির হইতে থাকিত। সে মিছিলের কত যে রকমারি রূপ ছিল তাহার যথোচিত রূপে বর্ণনা করার মত ক্ষমতা আমার নাই। মিছিলে পূর্বগামী শোভাযাত্রা ছিল শত শত হাতির মন্থর গমনে চলিয়া যাওয়া, তাদের গায়ের মূল্যবান এক একখানা সোনার জরি শাল দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য হইয়া যাইত, প্রতি হাতির শালের চার কোণ ধরিয়া চলিত চারটি লোক। হাতির কপালে সোনা-রূপা জহরতের জৌলসের যেন অন্ত ছিল না। কোনো কোনো অতিকায় হাতির সুদীর্ঘ দুই দাঁতের উপরে একখানা সোনার ছোট চৌকি রাখিয়া তদুপরি ছোট্ট একটি ছেলেকে বসাইয়া দিয়া শোভাযাত্রার শোভাটিকে আরো যেন চমৎকৃত করিয়া দিত। আমাদের ছোটদের কিন্তু ঐ ছোট ছেলেটির জন্য খুবই ভাবনা হইত। এইসবই হাতি ও ছেলের শিক্ষার গুণ সন্দেহ নাই, কিন্তু, তখন আর অতশত বুদ্ধি-বিবেচনা আমাদের ছিল কই? এইরূপে শত শত হাতি চলার পর চলিতে থাকিত রকমারি জরির পোশাকে আবৃত ঘোড়ার শোভাযাত্রা—তাহাও শত শত। কপালে সোনা রূপা। জরির কারুকার্যময় মুকুট ও সিঁথি। তারপরে অনেক অনেক খাট অর্থাৎ চৌকি ধরনের এক একটি খাটের মত, তদুপরি এক একটি ফুলের বাগান ইত্যাদি। যথা পদ্মবনে হস্তির দলন, গাছের উপর উল্লুকের দোল খাওয়া—কত কত অপরূপ দৃশ্যই না চলিতে থাকিত।

"তারপরে আসিত বড় চৌকি, তাহা ছিল অতিকায় ও খুব উঁচু উঁচু চৌকিতে কত যে চিত্র ও অভিনয় চলিত। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, দ্রৌপদীর মস্তকহীন পুত্রদের দেহ কোলে বিলাপ, নল-দয়মন্তীর উপাখ্যান, রাবণের সীতা হরণ, জটায়ু পক্ষী নিধন, ইত্যাদি। আবার গ্রিস দেশের কৃত্রিম ঘোড়া হইতে সৈন্য আবির্ভাব ও যুদ্ধের অভিনয় চলিত। এদিকে, আবার চলিত সমস্ত বৎসরের উভয়পক্ষের অর্থাৎ মিছিল বাহির হইত একদিন নবাবপুর-আলাদের তরফে হইতে। একদিন বাহির হইত ইসলামপুর আলাদের তরফ হইতে। প্রথম যে দলের মিছিল বাহির হইত সে দল অপেক্ষা দ্বিতীয় দলের মিছিল বেশি ভাল হইত। ইহার আবার ভাগ-বাঁটরা থাকিত। একবৎসর একদল আগে একদল পিছে এইভাবেই মিছিলের শোভাযাত্রা চলিত প্রতিবৎসর। উভয় দলের বাৎসরিক সাংসারিক কেলেঙ্কারি কেচ্ছাও অভিনয় করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে কসুর করিত না, যেমন, শাশুড়ি বৌ-র চুল ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, আবার বৌ তার বৃদ্ধা শাশুড়ির গালে ঠোঁঙ্গনা দিতেছে, মায়েরা ছেলে-মেয়েদের ঠেঙাইতেছে, ইত্যাদি রকমারি অভিনয়। সেদিনের জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখিবার জন্য কত গ্রাম গ্রামান্তর হইতে লোকজনের সমাগম হইত। কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতেও লোকজন আসিয়া আত্মীয়স্বজনের বাড়ি উঠিয়া তাহাকে আনন্দমুখরিত করিয়া তুলিত। তাছাড়া, বুড়িগঙ্গায় ছোটবড় বিপুল সংখ্যায় নৌকা সারিবদ্ধভাবে নোঙর গাড়িয়া থাকিত ও যথাসময়ে মিছিল দেখিতে নৌকা হইতে বাহির হইয়া মিছিল দেখিয়া পুনরায় নৌকায় ফিরিত। বলাবাহুল্য, ঐসব আরোহী দৈনিক হিসাবে ভাড়া করিয়া লইত। কখন কখন নির্দিষ্ট দিনে মিছিল বাহির হইতে পারিত না নানাকারণে। যেমন প্রবল বারিপাত ইত্যাদিতে মিছিল বাহির হওয়া সম্ভব হইত না; ইহাতে দূরাগত বিশেষ করিয়া যাহারা নৌকা ভাড়া করিয়া মিছিল দেখিতে আসিত তাহাদের লাঞ্ছনার একশেষ হইত। কিন্তু, তাহারা ঐসব তুচ্ছ করিয়াও বহু অর্থ ব্যয়ে জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখার আনন্দ উপভোগ করিতে ছাড়িত না। তখন মানুষের মনে যেন আনন্দ উপভোগের প্রবৃত্তিটা বেশি ছিল, এখন সেই আনন্দই নানাভাবে রূপান্তরিত হইয়া আনন্দের

ভাবধারায় বদল হইয়া গিয়াছে। এখন যারা ঐসব কাহিনী শুনিবে তাহারা তখনকার দিনের ঐসব আনন্দের ব্যাপারকে নিতান্তই অপ্তজন সুলভ ব্যাপার বলিয়া নির্দেশ করিবে।"[৭]

ঢাকা প্রকাশে (২ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪) বেরিয়েছিল : "বহুকাল অবধি ঢাকায় জন্মাষ্টমীর তামাশা বাহির হইয়া থাকে। নবাবপুর ও ইসলামপুর দুই স্থানের লোকেরা তামাশা বাহির করে। নবাবপুরের সকলে চাঁদা করিয়া ব্যয় নির্বাহ করেন। পূর্বে উভয়পক্ষেরই তামাসা এক দিবস বাহির হইত। তাহাতে উভয়পক্ষে একবার দাঙ্গা হওয়াতে ৫/৭ বৎসর যাবৎ গবর্নমেন্ট হইতে দুইদিবস তামাসা বাহির হওয়ার আদেশ হইয়াছে। তামাসায় কতকগুলি বড় চৌকি ও ছোট চৌকি এবং হাতিঘোড়াও পদাতিকের মিছিল বাহির হইয়া থাকে। বড় চৌকিতে পৌরাণিক ঘটনার প্রতিমূর্ত্তি প্রদর্শিত হয়। ছোট চৌকিতে নাচ ও বিবিধ প্রকার সঙ প্রভৃতি বাহির হয়। এই সমুদয় চৌকি বেহারা স্কন্ধে করিয়া মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যায়। ছোট চৌকিতে যে সকল সঙ ও কৌতুকজনক অনুকরণ বাহির হয়, তাহাতে অনেকপ্রকার অশ্লীল গানাদি হইয়া থাকে, এইক্ষণ অশ্লীল গানাদি অনেক কমিয়া আসিয়াছে। সর্বদাই একপক্ষ অন্য পক্ষের গালি দিতে অথবা কোন হাস্যজনক কার্যের অনুকরণ করিতে ক্রটি করে না। একটি হাস্যজনক উদাহরণ লিখিতেছি।

"নবাবপুরের তামাসার কর্তৃপক্ষীয় কোন ব্যক্তির গাড়ি বোধহয় জীর্ণ অবস্থায় ছিল। গত সন তাহার নকল করিয়া ইসলামপুরের পক্ষ হইতে ছোট চৌকির সঙ্গে সঙ্গে একখানি যারপরনাই জীর্ণ গাড়ি ও তাহার সংযুক্ত একটি শীর্ণ ঘোড়া বন্ধন করা হইয়াছিল, আর গাড়ির মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে একটা মাস্তুল লাগাইয়া তাহাতে পাল ও কয়েকগাছি গুণ দেওয়া হইয়াছিল এবং গাড়ির ছাদের উপর বসিয়া কয়েক ব্যক্তি দাঁড় ও লগি মারিতেছিল। এইরূপ চৌকি প্রায় বৎসরই বাহির হইয়া থাকে।

"বড় চৌকিগুলি তামাসার প্রধান অংশ। কাঠ, বাঁশ ও কাগজ দিয়া একটি প্রকাণ্ড চৌকি প্রস্তুত হয়। তাহাতে নানাপ্রকার চিত্র চিত্রিত হয় এবং অভ্যন্তরে পৌরাণিক ঘটনার অনুরূপ থাকে। গত সন, পাণ্ডবদিগের দ্বারা দ্রুপদ রাজার লক্ষ্যভেদ এবং আরকিমিডিস কর্তৃক কাঠফলক দ্বারা রোমানদিগের পোত ও সৈন্য বিনাশ এই দুইটি ঘটনার অনুকরণে দুইখানি সুখদৃশ্য বড় চৌকি বাহির হইয়াছিল। এবার হনুমান কর্তৃক গন্ধমাদন পর্বত আনয়ন, সুগ্রীব রাবণের কথোপকথন, কমলে কামিনী দর্শন, প্রদর্শিত হইয়াছিল।"

কার্তিক বারুণীর মেলা :

"বঙ্গদেশে কার্তিক বারুণীর মেলার ন্যায় আর প্রধান মেলা নাই। ঢাকার পূর্ববর্তী মুন্সিগঞ্জের নিকটে প্রতিবর্ষে এই মেলা মিলিয়া থাকে। কার্তিক পূর্ণিমার দিন অবধি এই মেলা বিদ্যমান থাকে। এই মেলায় দেশ-বিদেশাগত লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। বহুসংখ্যক লোকের একত্র সমাবেশ হেতু হউক, অথবা যে কারণেই হউক, প্রতিবর্ষেই কার্তিক বারুণী মেলায় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এবার এই মেলা মিলিবার পূর্বেই ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে ওলাউঠার বিলক্ষণ প্রভাবদৃষ্ট হইয়াছিল। এই নিমিত্ত অত্রত্য সিবিল সার্জন রিপোর্ট করেন, "এবার কার্তিক বারুণীর মেলায় ভয়ানক মহামারী কাণ্ড উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। ঢাকা এবং নারায়গঞ্জের ভুরি ভুরি লোক মেলায় যাইতে থাকে তাহাদিগের দ্বারা যদি এই দুই স্থানের ওলাউঠা উক্ত মেলায় প্রবেশিত ও বিস্তারিত হয়, তাহা হইলে... মেলাগত ভিন্ন ভিন্ন দেশে লোকদিগের দ্বারা উহা নানা দেশে বিস্তারিত হইয়া অমোঘ অনিষ্টসাধন করিবে। অতএব এবার কার্তিক বারুণীর মেলা স্থগিত করিয়া দেওয়া কর্তব্য। আমাদিগের কমিস্যনর সাহেব এই রিপোর্ট পাইয়া তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাফ দ্বারা গবর্নমেন্টে এই বিবরণ জ্ঞাপন করেন। গবর্নমেন্ট উত্তরদান করিয়াছেন, "কার্তিক বারুণীর মেলার বলপূর্বক

স্থগিত করা কখনই বিধেয় নয়। তবে ওলাউঠা যাহাতে জেলায় প্রবেশ করিতে না পারে তদর্থ যথোচিত উপায় অবলম্বন করা যাইতে এবং মহাজনদিগকেও উপদেশস্বরূপ সাবধান করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।" তদনুসারে আমাদিগের কর্তৃপক্ষ জেলায় রোগ বিস্তার নিবারণার্থ অনেকগুলি সদ্‌উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। ...[৮]

তিননাথের মেলা :

ঢাকা চতুর্দ্দিগ্‌বর্তী গ্রামসমূহে বিশেষত মানিকগঞ্জ এবং আটিয়া কালমারি অঞ্চলের যাবতীয় পল্লীগ্রামে এই তিননাথের মেলার প্রথা অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত পল্লীসমূহের মধ্যে এমন পল্লী নাই বলিলেই হয়, যেস্থানে প্রতি রাত্রিতে কোন না কোন গৃহস্থের আলয়ে এই মেলায় অনুষ্ঠান না হয়। গ্রামবিশেষে কোন কোন রাত্রিতে ৩/৪ বাড়িতেও মেলা হইয়া থাকে। সচরাচর ইতর জাতীয় লোক সকলই এই অনুষ্ঠানের ভক্ত। ভদ্রশ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে ইহা প্রায় দৃষ্ট হয় না। এক পয়সার পান সুপারী, এক পয়সার তৈল এবং এক পয়সার গাঁজা, সাধারণতঃ এই তিন দ্রব্য তিননাথের মেলার উপকরণ। সেবকগণ ঐ এক পয়সার গাঁজা প্রস্তুত করিয়া তিনটি নূতন কলকায় ভরিয়া তিনটি টিকা ধরাইয়া দেয় এবং ঐ পানও তিন ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। একপয়সার তেল দ্বারা একটি প্রদীপ জ্বালিয়া তিননাথের মাহাত্ম্যসূচক একটি অদ্ভুত কথা কহিতে আরম্ভ করা হয়। কথা সাঙ্গ না হইতে হইতেই যদি গাঁজার কল্কে জ্বলিয়া উঠে, ভক্তগণ সতৃষ্ণ নয়নে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করে। তৎপর সার সার করিয়া কথা সাঙ্গকরণান্তর গাঁজার কল্কে গ্রহণ আরম্ভ হয়। তৎপর প্রসাদী তাম্বুল গ্রহণান্তর নানাবিধ ভজনা সংক্রান্ত সংগীত গান হয়। এইরূপে বহু লোক সমবেত হইয়া তিননাথের মাহাত্ম্য কথন ও সংগীতকরণকেই "তিননাথের মেলা" কহে। যে পর্যন্ত প্রদীপ নির্বাপিত না হয় সাধারণত সে পর্যন্তই সংগীত হইয়া থাকে। এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে গাঁজাও চলিতে থাকে। ভক্ত বিশেষের বাঞ্ছা হইলে তেল গাঁজা কি তদ্ভিন্ন অন্য কোন সামগ্রী ব্যয় করিতেও নিষেধ নাই। যে সকল সংগীত হইয়া থাকে, তাহা অনিত্যাদি ঘটিত ধর্মাভাব সমুদ্দীপক বটে, সুতরাং কোন অংশেই তাহা দূষণীয় হইতে পারে না।

কোন প্রকার অসুখের সম্ভাবনা দেখিলে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভাশয়ে, অথবা "আপাতত ক্লেশ বিদূরিত হইয়া সুখপ্রাপ্তি হউক", এই আকাঙক্ষায় গ্রাম্য ব্যক্তিরা তিননাথের মেলার মানস করিয়া থাকে। অতি যৎসামান্য অসুখ নিবারণ ও সুখপ্রাপ্তি হইলেই লোকে এই মেলার অনুষ্ঠান প্রবৃত্ত হয়। কারণ, ইহাতে ব্যয় অতি স্বল্প, কিন্তু আমোদ বিলক্ষণ আছে। যাহাদিগের অধিক ব্যয় করিতে সামর্থ্য আছে, মধ্যে মধ্যে তাহারা ভক্তদিগের নিমিত্ত অত্যধিক পরিমাণে গাঁজার এবং মধ্যে মধ্যে জল খাওয়ারও প্রয়োজন করিয়া থাকে। আজিকালি গাঁজার পরিমাণ অধিক প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর লোকদ্বারা, তিননাথের মেলা সম্পাদিত হয়, কথক, সেবক, ভক্ত ও গাথকগণ একশ্রেণী, বাটির কার্যকতৃকগণের আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি নিমন্ত্রিতগণ অপর শ্রেণীভুক্ত। পূজা সাঙ্গ না হইলে—বিশেষতঃ প্রদীপ নির্বাপিত না হইয়া গেলে কোন শ্রেণীর ব্যক্তিরই উঠিয়া যাওয়ার নিয়ম নাই। অত্যাবশ্যক প্রয়োজন উপস্থিত হইলে লোক নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া সেই প্রয়োজন সাধন করে। কিন্তু তথাপি নির্বাপিত হইবার পূর্বে কেহ গাত্রোত্থান করে না। উপরে তিননাথের মেলা সম্বন্ধে যে নিয়মাদির কথা উল্লিখিত হইল, তৎপাঠে পাঠকগণ উহার অপকারিতা হয়ত কিছুই অনুভব করিতে পারিবেন না। প্রত্যুত বাহ্য দৃষ্টিতে উহা এক প্রকার দোষশূন্য বিশুদ্ধ আমোদ বলিয়াই বিবেচনা করিতে পারেন। কারণ শ্রমোপজীবী ইতর শ্রেণীস্থ জনগণ দিনান্তে বিশ্রাম লাভ করিয়া দশজনে একক উপবেশনপূর্বক ধর্মের নামে বিশুদ্ধ সংগীতাদি দ্বারা ৪/৬ দণ্ড কাল নিশ্চিন্তে যাপন করিবার, ইহা দৃশ্যত

সুখের বিষয়ই বটে, কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই, সংপ্রতি ইহা দ্বারাও ভয়ানক অনিষ্ট ফল সমুৎপন্ন হইতেছে। আমরা সবিশেষরূপে ধর্মালোচনা করিয়া জানিয়াছি, ইহাতে এমন সকল দোষ নিহিত রহিয়াছে যে শুনিলে নিতান্তই বিস্মিত ও দুঃখিত হইতে হয়। প্রথমতঃ দেবতার প্রসাদ অবহেলীন প্রত্যবায় আছে ভাবিয়াই হউক, প্রচুর প্রলোভনে পড়িয়াই হউক অথবা লোকের দৃষ্টান্ত অনুসারেই হউক এ মেলার প্রভাবে তৎসংক্রান্ত অধিকাংশ লোক গাঁজা খাইয়া থাকে। ইহা প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে। যাহারা ইতপূর্বে অতি সংগোপনীয় কদাচিত দুই-একবার মাত্র গাঁজা সেবন করিত, এই মেলার সংসৃষ্টতা হেতু সেই সকল লোক নিঃসংকোচিত্তে সর্বসমক্ষে এমনকি পিতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা মাতুল প্রভৃতি গুরুজন সমক্ষেও গাঁজা সেবন করে। যে সকল অল্পবয়স্ক যুবক ইতঃপূর্বে একেবারেই গাঁজা খাইত না, আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহারাও এইক্ষণে ঐ মেলার প্রভাবে বিলক্ষণ রূপে গাঁজা খাইতে শিখিয়াছে। ধর্মের নামে লোকের এইরূপ বদভ্যাস শিক্ষা হইতেছে, ইহা কি যারপরনাই শোচনীয় ঘটনা নয়? দ্বিতীয়তঃ এই মেলার অনুষ্ঠানে গ্রাম্য বদমায়েশরা তাহাদিগের দূরভিসন্ধি সাধনে বিলক্ষণ সুযোগ পাইয়া থাকে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, যে সকল ব্যক্তি মেলায় গমন করে, মেলার কার্য বিশেষতঃ প্রদীপ নির্বাণ না হইলে তৎসংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ মেলা ছাড়িয়া স্থানান্তরিত হয় না। বদমায়েশদিগের ইহা অনবগতি নাই। সুতরাং, যাহার উপস্থিতিরূপ প্রতিবন্ধকতায় তাহাদিগের দূরভিসন্ধি সাধনের ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা, তাহারা যদি কোন নিশায় গমন করে, তাহা হইলে ঐ দুর্বৃত্তেরা অক্লেশে যাইয়া তাহাদিগের দুরভিষ্ট সাধন করিয়া বসে। আমরা কেবল অনুমান করিয়া এই কথা বলিতেছি কেহ এইরূপে মনে করিবেন না। অতি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া গিয়াছে, বদমায়েশেরা তিননাথের মেলারূপ সুযোগ পাইয়া তাহাদিগের নানা দুস্প্রবৃত্তির পরিতর্পণ করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে তাহারা এমন সকল লোমহর্ষণ গর্হিতানুষ্ঠান করিয়া বসিয়াছে যে, শুনিলে নিতান্ত অক্রোধ ব্যক্তিরও ক্রোধ উদ্বেল হইয়া উঠে। অতএব যে উপায়ে এই দ্বিবিধ অনিষ্ট নির্বাপিত হইতে পারে, সকলের তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। লোকে স্ব স্ব বিশ্বাসানুসারে নির্বিবাদে যে কোন ধর্মানুষ্ঠান করুক ক্ষতি নাই, কিন্তু সেই সেই ধর্মানুষঙ্গিক নিয়মাদি দ্বারা যদি সাধারণের অনিষ্ট হয়, তবে সে অনিষ্ট যাহাতে দূর করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অবৈধ বা অনুচিত হইতে পারে না।[১]

A visit to Nagullbund Mela :

[বর্তমান সংস্করণের ১৯০, ২১৩, ২৯১, ৯৮৮, ১০২৪ পৃঃ দেখুন]

Very glad were we, last Saturday morning 7th instant to exchange the hot, dusty carriage of the 7-45 train from Dacca (which by the bye, was nearly one hour late) for the trim little steamer awaiting our arriaval at Naraingunge ghat, and which by kindness of a friend, was lent to convey us to the Nagulband mela. Soon we a merry little party of three, were speeding away in high spirits over the sparkling water, a lively contradiction to the time worn adage, that, "Two is company and three is none." Dame Nature, apparently fully aware of the fact that we were amateur photographers had, with obliging kindness, laid herself out in a panorama of tempting snap shot views Tiny hamlets, draped with foliage of wondrous hues, brightly-attired groups of women coming, like Rebecca of old, to fill their waterpots; broad fields of green softened by clusters of buff-coloured oxen, and through the midst of all, rolled the broad river like a huge coil of glittering crystal,

bearing on its bosom hundreds of little vessels, some, with their feathery sails, reminding one of snowy winged seagulls, as they flitted swiftly over the waves, others, of heaviers build, ornamented with gorgeous colors, resembled birds of gayer plumage, whilh some brown heavy-looking boats floundered along like vultures or some other ugly birds of prey. After we had steamed for about a couple of hours, the *mela* came into view, a vast moving mass lining the bank for over a mile, and bounded on the rivers edge by a corresponding line of boats of all sorts and sings, gaily decorated with many coloured flags, amounget which our Union Jack shone out conspicuously. Certainly, if displaying English colors means loyalty to the British rule, than Bengali Babus must be, of all Indians, the most loyal. On the outskirts, of the *mela* were two tents standing like two sentinels to gurad the way. Those, we understood, were the Magistrate's and Police sahibs tents. Further down, we came upon a boat containing Missionaries come to distribute tracts and preach, thus, the law and the gosnel were well represented, even at a Hindu *mela.* Desiring to dive into the mysteries of Hinduism more minutely than was practicable from our launch, we landed, and found ourselves in the midst of a vast crowd of "all sorts and conditions of men", not to speak of numbers of women and children, the former of whom crowd about these *mela* with remarkable freedom, considering the strict zanana so many have to observe in their own homes. Beggars of all descriptions lay about, asking the generous for alms, very much such beggars probably, as those who lined the banks of the pool of Siloam, two thousand years ago, and waited for the angel's visit. Certainly, the beggars of Nagulbund needed as much as they the Word of the Son of God of heal them. *Sunyasie* are devotees were also present, sitting as tiger skins in the midel of four tree, surrounded by an admiring little group of less herole pilgrims. Hindu dances, accompauled by hideous songs, in honour of their deities, were being performed by the merrier spirits of this vast crowed, and little groups of worshippers gathered around the various shrines on which were erected their most popular idols guarded by Brahmins, who must have reaped a rich harrest out of the offerings presented by the people. The central gathering was at the temple of Kali, a cruel goddess, represented with a necklace composed of human skulls and her foot on the dead body of her husband. To propitiate this bloodthirsty goddess kids were ruthlessly sacrificed in a most cruel manner, outside the temple, and offered to this deity. We, with our cameras were objects of great interest to the pilgrims, who declared us to show them then and there, the photos we had taken. On one occassion, the cry of *"Hori bol!" Hori bol!"* was started to counteract, as we supposed, the populaion of our presence, but fortunately, no disturbance occured. Returning to our launch, we walked for some time the pilgrims bathing in the sacred waters of the Brahmaputra (son of God). What a varied

assemblage they were! Mothers carrying their children, young wives holding their *gomtas (sari ends)* tightly over their faces, old men and women, whose feet would soon be entering the waters of the last great river, coarse visaged, lowcaste *sudras*, finely featured, intelligent Brahmins, all anxious to stand for a few minutes, in the river, hoping to realise thereby, a peace not earthborn. Some performed their devotions alone, others repeated *muntras*, told them by attend ant priests, dipping in the water, rubbing river mud on their bodies, and finally, throwing in as offerings to the river, flowers and pan which the prieste put into their hands to offer. How pitiful it all seemed, this groping after *GOD*, of ... they might find Him. May we not trust that the time is not far distant when the people of India, with their strong religious instincts. ... starching out their hands vaguely in the darkness, may touch God's right hand is that darkness and be led to *Him*. Who is the *Light* of the World. [১০]

ঢাকার ঘোড়দৌড় : *[বর্তমান সংস্করণের ১০৯৩ পৃঃ দেখুন]*

"রমনা তখন ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট চার্লস ডস সেই জঙ্গলের একাংশ কেটে পরিষ্কার করেন কয়েদিদের সাহায্যে। সেই পরিষ্কৃত অংশ রেলিং দিয়ে ঘিরে তৈরি হয় রেস কোর্স। ঢাকায় ক্রমশ ঘৌড়দৌড় জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। ঢাকার নবাব খাজা আবদুল গনি ছিলেন ঘৌড়দৌড়ের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। এই ঘোড়দৌড় সম্পর্কে ঢাকা প্রকাশ ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি প্রকাশ করে : "এবার ঢাকাতে অতিশয় আড়ম্বরের সহিত ঘৌড়দৌড় হইয়া গিয়াছে। এখানকার প্রধান ধনী খাজে আবদুল গনি, এখানকার কাপ্তান ও বাবু মধুসূদন দাস, এবারে দৌড়ের ঘোড়া প্রস্তুত করেন। কলিকাতা হইতে একজন মোগলও কয়েকটি দৌড়ের ঘোড়া লইয়া এখানে আসিয়াছিলেন। এবং দৌড়ের পূর্বদিন রাত্রে কলিকাতার কাপ্তান ওয়ার্লোর দুইটা দৌড়ের ঘোড়াও এখানে পৌঁছে। এখানে যে সকল ঘোড়া প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার মধ্যে গনি মিঞার ঘোড়াগুলি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোকে এমত মনে করিত। যদি শেষোক্ত কাপ্তান ওয়ার্লো তাঁহার ঘোড়া এখানে না পাঠাইতেন, তাহা হইলে এখানকার ঘোড়ার দৌড় হইয়াই গনি মিঞার ঘোড়া শ্রেষ্ঠ কী অশ্রেষ্ঠ নিশ্চয় হইত। কিন্তু, উক্ত কাপ্তানের ঘোড়া দুইটা এমত উত্তম ছিল যে এখানকার কোন ঘোড়া কোন বাজিতেই তাহার একটার সঙ্গেও জয়লাভ করিতে পারে নাই। এবার এখানে সমুদায় অর্থাৎ ৪ দিনে ১৬ বাজি খেলা হয় তাহাতে সমষ্টিতে প্রায় ৬ হাজার বাজি হইয়াছিল। ইহার অধিকাংশই কাপ্তান ওয়ার্লো সাহেবের ঘোড়ায় জিতিয়াছে।"...

ঢাকার "পাখি দল" :

"ঢাকাতে একপ্রকার সম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়াছে, তাহাদিগকে পাখির দল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সম্প্রদায় শিক্ষিত সমাজের বিকার সম্ভূত। ঢাকার শিক্ষিত সমাজ, এম. এ. ... বিদ্যারত্ন এবং এম. এল., বি. এল. প্রভৃতি উপাধিকারী ব্যক্তিগণ কর্তৃক সংগঠিত। এই ত্রিবিধ শক্তি সমবেত বলে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে প্রত্যেক স্থানেরই সামাজিক উন্নতি বৃদ্ধির ভূয়সী সম্ভাবনা করা যাইতে পারে। ইহারা স্বতন্ত্র হইয়া কার্য করিলে বিপরীত ফল প্রসব এবং ইহাদের কোন এক শক্তি অন্যতর শক্তি অপেক্ষা অধিকতর বলে প্রযুক্ত হইলে সমাজের বিকার সংঘটিত হয়। ঢাকার পাখির দল, এই শেষোক্ত প্রক্রিয়া হইতেই উদ্ভুত। এই

সম্প্রদায়ভুক্ত মহাপুরুষগণ আপিসের আপন আপন কার্য হইতে অবকাশ পাইবামাত্র বাসগৃহে আপিসের পোশাক পরিত্যাগ করিয়া তোফা তোফা ঢাকায়ী জামদানি ধুতি জামদানি চাদর এবং নূতন নূতন ফেশনের কোট পরিধানপূর্বক "ময়ূরপঙ্খী" হইয়া বেড়াইতে বাহির হন। সদর রাস্তায় বহির্গত হইবামাত্র দুটি একটি করিয়া ক্রমে দল জুটিয়া যায় এবং স্ব স্ব আপিস সংক্রান্ত কিছুটা আলাপ-শালাপের পর "অপ্সরী মহালের" আন্দোলন উপস্থিত হয়। অপ্সরী মহালে ইহাদের বিশেষ আদর এবং ইহাদের নিকটও অপ্সরিগণের সমধিক গৌরব। পাঠক মনে করিবেন না যে ইহাদের সকলেই পরিবারশূন্য। মাসের ৫/৭ দিন ব্যতীত অবশিষ্ট সময় মহালের চিন্তায়, মহালের ভাবনায়, মহালের উন্নতি সংবর্ধনেই তাহারা ব্যতিব্যস্ত থাকেন। তহশিলদারগণও প্রতিক্ষণে মহালের অবস্থাজ্ঞাপন করিতে শশব্যস্ত রহে। মহাল এরূপ সুশাসিত যে কখনও "নাটে" হটিবার আশঙ্কা জম্মে না। ব্রাহ্মমন্দিরে আপন যষ্টির শিরোভাগে স্বকীয় করতল বিন্যাসপূর্বক তদুপরি মস্তক সংস্থাপন করিয়া দেখাদেখি মুদ্রিত নেত্রে ব্রাহ্মোৎপসার (না অপ্সরী উপাসনায়) নিয়মিতকাল ঘোর চিন্তায় অপেক্ষা করিতেও তাঁহাদিগকে দেখা যায়। আবার বাটিতে দেব পূজায় ও সমধিক যত্নশীল থাকেন। পাঠক যদি ইহাদিগকে জানিতে ইচ্ছা করেন তবে যদু মণ্ডলের দোকানে কিছুকাল সন্ধ্যার পর অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন, পাছে পাছে থাকিলে, কখন কখন ব্রাহ্মমন্দিরে কখন কখন যদুবাবুর দোকানে পাখির ন্যায় স্থানে স্থানে উড়িয়া বেড়াইতে দেখিতে পারিবেন। তাই বলি ইহারা ঢাকার "পাখির দল" এবং সমাজের বিষময় কণ্টক ও বিদ্যার নাশক।" [১১]

সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান :

সজলনয়না দেবীর "সেকালের ঢাকা শহর" নিবন্ধে জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের নানাবিধ অনুষ্ঠানের বিবরণ আছে। তিনি লিখেছেন : "...তখন ঢাকার রাস্তায় ফুটপাত ছিল না, গ্যাসের আলো ছিল না, কেরোসিনের আলো অবশ্য ছিল, বাড়িতে জলের কল ছিল না—সব বাড়িতে পাতকূয়া ছিল। সবরকম জিনিসই খুব সস্তা ছিল, আমি তখন ছোট, সুতরাং কিসের কত দাম তা অবশ্য জানতাম না। তবে খুব সস্তা তা জানতাম। সোনা ষোল টাকা ভরি ছিল শুনেছি, রূপো ছিল এক টাকা ভরি। খাবার জিনিসের খুব বাহুল্য ছিল। পাতক্ষীর (কলাপাতার উপর খোয়া চাপড়া করে দিয়ে তার উপর আর একটি পাতা চাপা দেওয়া), সানি ক্ষীর (হাঁড়ির ভিতর নালী ক্ষীর), ছাপার মাখন (খাঁটি মাখনের ছাপা দেওয়া) ইত্যাদি সমস্ত দিন ফেরিওয়ালারা বিক্রি করত। মাছও খুব সস্তা ছিল, খুব ছোট ছোট একরকম মাছ পেতাম খুব আস্বাদী, তার নাম সোনা খড়্কে। সবরকম ফল, বিশেষত কমলালেবু, আনারস, পেয়ারা, মাখ্না (দেখতে উপরে গোল, ভিতরে পদ্মচাকার মত ছোট ছোট ফল) এইসকল অপর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত। ঢাকার মোরব্বা অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল। শ্রীহট্ট থেকে মোরব্বা আমদানি হত। কমলালেবু, নারেঙ্গালেবু, আমলকি, হরিতকি, শতমূল এইসব মোরব্বা ছিল আমাদের অত্যন্ত প্রিয়। ঢাকায় এতদিন ছিলাম, কিন্তু গরিব ভিখারি একদিনও দেখিনি। সমস্ত শহরের বেশিরভাগ লোকই সামান্য ক্রিয়াকর্মে আড়ম্বরটা খুব পছন্দ করত। বিবাহ ব্যাপারের ত কথাই নেই, বিবাহের উৎসব দশ দিন পর্যন্ত হবে আর গাড়ি বোঝাই লোক (এক গাড়িতে দশ-বারোজন পর্যন্ত) কেবলই নিমন্ত্রণ খেতে যাবে। কুটুম্বর নাম হল ইষ্ট। বিয়ের সময় কনে নিজে "ফুল কোটা" নিয়ে বরকে বরণ করবে। ('ফুল কোটা'একরকম ক্রিয়া, ফুল নিয়ে বরের সম্মুখে নানারূপ অঙ্গভঙ্গি করা; তা দেখতে বেশ সুন্দর)। তারপর তত্ত্ব পাঠান। আজকালের মত থালায় সন্দেশ পাঠান নয়, সমস্ত জিনিস বাঁকে করে আন্দাজ ত্রিশজন লোক নিয়ে, সঙ্গে বাজনা বাজতে বাজতে যাবে, সে এক বিরাট দৃশ্য। তত্ত্বর নাম ছিল হাড়ু।

"আমার মাতামহ ফৌজদারীর সেরেস্তাদার ছিলেন। মাইনে পেতেন দুশো টাকা। বড়লোক অবশ্য নন, কিন্তু উদার চরিত্র, সদালাপী, ধার্মিক, পরোপকারী ছিলেন। ঢাকার প্রায়

সমস্ত বড়লোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ ছিল। তখন ঢাকার নবাব ছিলেন আবদুল গনি, তাঁকে সচরাচর লোকে গনি মিঞা বলত। আমার মাতামহ তাঁর বাড়িতেও মাঝে মাঝে যেতেন। ...

"সে সময়ে ঢাকায়, সনাতন, রূপ, রঘু তিনভাই খুব বড়লোক ছিলেন, তাঁরা দাদামশায়কে খুব মান্য করতেন। রূপবাবুর স্ত্রী দিদিমাকে মা বলতেন। দিদিমার দুই বোন অল্প বয়সে বিধবা হয়ে সর্বত্যাগী হয়েছিলেন। দিদিমাও তাঁদের জন্য সর্বত্যাগী হয়েছিলেন, কেবল এয়োস্ত্রীর চিহ্নস্বরূপ মোটা লালপেড়ে কাপড় আর দুই গাছা বালা ছাড়া তিনি আর কোন গহনা পরতেন না। বড়লোকের বাড়ি নিমন্ত্রণ, তাও সেই বেশেই যেতেন, কিন্তু তাঁকে কেউ অনাদর করত না। ঢাকার মেয়েদের আবার তেমনি সাজ বাহারের ধুম ছিল, কী রাশিকৃত গহনা যে পরত তা বলে শেষ করতে পারি না। সব আমার মনে নেই, তবে যা মনে আছে বলছি। মাথায় ফুল-চিরুণী, কানে কানবালা, চৌদানী, মাকড়ি, গলায় হাঁসুলি, আরও চার পাঁচটি কি ঠিক মনে নেই। উপর হাতে তাবিজ, যশম, অনন্ত,বাজু। নিচের হাতে পিন খাড়ু, চুড়ি, যবদানা, মর্‌দানা, নারিকেল ফুল, পুঁইছে, বালা ইত্যাদি। কোমরে গোট, চন্দ্রহার। পায়ে গুঁজরী - পঞ্চম, পাঁছর, বাঁকমল, চরণপদ্ম। গায়ের কোন জায়গায় ফাঁক থাকত না।

"রঘুবাবুর মেয়ের ছেলের ষষ্ঠীপূজার সময় আমরা আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। ষষ্ঠীপূজায় এত ঘটা কখনও দেখিনি। ষষ্ঠী পূজার নাম হল থুয়ানি। বাই নাচ, সাহেব বিবির নাচ, ইংরেজী বাজনা এসব ত হলই, আর কত লোক যে এসে খেয়ে গেল, তার সীমা সংখ্যা নেই। ছেলের বাপের বাড়ি থেকে দোলনা খাট, বেনারসি মশারি, সোনার একটা গামলা করে সোনার খেলনা প্রভৃতি এসেছিল। তারপর গহনা পোশাক ত আছেই।

"রূপবাবুর ছেলের বিয়ের সময়েও আমরা গিয়েছিলাম। কনের বাড়ি আমাদের বাড়ির কাছেই ছিল। দিনের বেলা রাস্তার দুধারে বড় বড় বাজি পুঁতে দিয়ে গেল, রাত্রে বাজনা, আলো, সাজানো হাতি, ঘোড়া, শোলার পাহাড়, সং ইত্যাদির সঙ্গে বর চতুর্দোলা চড়ে এল। তখন সেইসব বাজিতে আগুন দেওয়া হল। রূপবাবুর ছেলের নাম ছিল রাধাবল্লভ। মেয়ের নাম নরেশ। তার সঙ্গে আমার মাসীমার খুব ভাব ছিল, মাসীমার সঙ্গে সেখানে আরও একবার গিয়েছি।

"ঢাকায় বিয়ের আর একটা বিশেষত্ব—বাড়িতে যখন বিয়ে হবে মেয়েরা সমস্ত দিন চীৎকার করে গান গাইবে। আবার তাদের ভাষা এমন যে আমি কিছুই বুঝতে পারতাম না। শুনতেও বিশেষ ভাল লাগত না। তবে রূপবাবুরা অনেকটা মার্জিত রুচিসম্পন্ন ছিলেন। তাদের কথা পরিষ্কার। আর গহনার ভিতর যেগুলো নিতান্ত সেকেলে বাদ পড়েছিল।

"ঢাকায় মেয়েদের আব্রু বেশি ছিল। তখন মোটর, বাস ইত্যাদি হয়নি। যারা খুব বড়লোক তাদের বাড়িতে হাতি থাকত। হাতির উপর হাওদা দিয়ে সকলে চড়ত। সাধারণ লোকে ঘোড়া-গাড়ি ভাড়া করেই যাওয়া-আসা করত। মেয়েরা যখন কোথা যাবে বাড়ির ভিতর থেকে গাড়ি পর্যন্ত দুদিকে দুখানা কাপড় কিংবা চাদর দিয়ে আড়াল করে রাখত। যাতে বাইরের লোক না দেখে ফেলে। গরিব মুসলমানের মেয়েরা বোরখা পরে রাস্তায় বেরুত। ব্রাহ্ম সমাজের ভিতরেও মেয়েরা চিকের আড়ালে থাকতেন।

"বিবাদের অত্যন্ত শুচিবাই ছিল, ভাঁড়ার কিংবা ঠাকুরঘরে ঢুকে চুনকাম করবার দরকার হলে নিজেরাই করত, মুসলমান রাজমিস্ত্রি যেতে দিত না।

"ঢাকায় বৈষ্ণবধর্মের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। কার্তিক মাসে নিয়ম সেবার সময়ে ভাগবত পাঠ, কীর্তন প্রভৃতি বাড়ি বাড়ি হত। রাস্তায় যখন কীর্তনের দল চলে যেত, তখন দু'পাশের বাড়ি থেকে খই বাতাসা প্রভৃতি ছড়ানো হত। কীর্তনের পর সকলে সেই পথের ধূলায় গড়াগড়ি দিত, এমনকি খুব বড়লোকেরাও পথের ধূলায় গড়াগড়ি দিতেন।

"হরির লুটের খুব ধুম ছিল। হরি লুটে বাতাসা, কদমা ও এলাচ দানার লুট দেওয়া হত। কোন কিছু বিষয় উপলক্ষ্য করেই হরির লুট মানা হত। একজন বড়লোক (রূপবাবু কি

রঘুবাবু তা মনে নেই) হরির লুট মেনেছিলেন, পাঁচশো টাকার। পাঁচশো টাকার লুট মেনে ভাবলেন, এত টাকার বাতাসা এলাচ দানা কি হবে? এই চিন্তা তাঁর মনে হবা মাত্র ভয় হল এবং নিজেই দুই কান মলে বললেন, "অপরাধ হয়েছে, জরিমানা পঞ্চাশ দিব।" সুতরাং তিনি পাঁচশো পঞ্চাশ টাকার হরির লুট দিলেন।

"তখন ঢাকার বাসিন্দা প্রায় সকলেই সাহা ছিলেন। কায়স্থ ছিলেন আমার দাদামশায়, তাঁর জ্ঞাতি দুই ভাই আর আমার পিসেমশায় মতিলাল বক্সি। পিসিমার ছেলে তড়িৎকান্তি বক্সি আমার বয়সী ছিলেন। আর আমার বড়মামার শ্বশুরবাড়ি ফুলবাড়িয়ায় (শহরের শেষে) ছিল। তাঁদের একটু ইতিহাস আছে। গোপাললোচন মিত্রের পূর্বপুরুষ সিপাহী বিদ্রোহের সময় কতকগুলি ইংরেজকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সেইজন্য গভর্নমেন্ট থেকে বংশপরম্পরায় রায়বাহাদুর উপাধি, আর জায়গা জমিদারি অনেক দিয়েছিলেন। তাঁদের খুব প্রকাণ্ড বাড়ি—বড়লোকের বাড়ির মত সব ছিল, একটা ঘরে কেবল ঝাড়লণ্ঠনই বোঝাই ছিল, রূপার বাঁট দেওয়া বেনারসী ছাতা ইত্যাদি সমস্ত ছিল। ... [১২]

শ্রীমতী শোভা ঘোষের বিবরণেও ধনী সাহা ও বসাক সম্প্রদায় প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে : "তাহাদের সব বাড়িতেই খুব গানবাজনার মজলিস বসিত। তাঁহা খুব ধনী ছিলেন। তাঁহাদের প্রাসাদের মত বাড়িতে খুব ঘটা করিয়া ঝুলন, দোলযাত্রা ইত্যাদি হইত। বহু লোক নিমন্ত্রিত হইত এবং বাইজীর নাচ হইত, ও নানা দেশের ওস্তাদদের আহ্বান করিয়া মস্ত মস্ত গানবাজনার আসর বসানো হইত। তখনকার দিনে বাড়িতে বাইজির নাচগান হইলে, কেহ নিন্দা করিত না, বরং প্রশংসা করিত। এইসব ব্যবসায়ীদের আরও আনন্দ করিবার রকম ছিল। যেমন পায়রা উড়ান, ঘুড়ি খেলা, ইত্যাদি। এক এক সময় ইঁহারা ঘুড়ির লেজে পাঁচ টাকার নোট বা দশ টাকার নোট জুড়িয়া দিতেন। বাড়িতে বিবাহের উৎসব হইলে মস্ত মিছিল করিয়া চৌদোলার উপর বরকে বসাইয়া শহর প্রদক্ষিণ করান হইত। ইঁহাদেরই এক একজনের বাড়িতে ঠাকুরের আসন (সোনায় রূপায় মোড়া) প্রায় ৩/৪ হাত উঁচু করিয়া তৈয়ারি করা হইত। ঝুলনের সময় ইহাদের বাড়িতে নানারকম পুতুল তৈয়ারি করিয়া এক একটা হলঘরে গাছ-লতা দিয়া গোচারণ মাঠ সাজান হইত। সেখানে গোপী বালকদের সঙ্গে ধেনু লইয়া বাঁশী হাতে বালক কৃষ্ণ-বলরামের মূর্তি দেখা যাইত। জনসাধারণের সেইখানে প্রবেশাধিকার ছিল। আমরা ঝুলনের সময় বহুবার ইহাদের বাড়িতে ঠাকুর দেখিতে গিয়াছি।...[১৩]

১. Statistical Account of Bengal Vol. V P 81-82
২. সেকালের গৃহবধূর ডায়েরি—মনোদা দেবী পৃঃ ৪২-৪৩
৩. আজও তারা পিছু ডাকে—শোভা ঘোষ পৃঃ ৪৮
৪. ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯৩। পৃঃ ৪৫৮
৫. আট দশক—ভবতোষ দত্ত। পৃঃ ৪৭-৪৯
৬. আজও তারা পিছু ডাকে পৃঃ ৪৪-৪৮
৭. সেকালের গৃহবধূ ডায়েরি—মনোদা দেবী। পৃঃ ৪৪
৮. ঢাকা প্রকাশ ২১ নভেম্বর, ১৮৬৯
৯. ঢাকা প্রকাশ ১১ আগস্ট ১৮৭২
১০. Dacca News 14 April 1900
১১. ঢাকা প্রকাশ ৩১ অক্টোবর ১৮৮০
১২. সেকালের ঢাকা শহর—সজলনয়না দেবী। সেকালের কথা : শতকসূচনায় মেয়েদের স্মৃতিকথা। অভিজিৎ সেন ও অভিজিৎ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও সংকলিত। পৃঃ ১৫৬-১৫৯
১৩. আজও তারা পিছু ডাকে—শোভা ঘোষ। পৃঃ ৪৪-৪৫



৯. ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান

প্রাচীন কীর্তি ● কবর ● মাজার ● মন্দির ● দেবদেবী

ঢাকা নগরীর ইতিহাস নানান ঘটনাপূর্ণ। বিক্রমপুর, সোনারগাঁর উজ্জ্বল দিনগুলি হারিয়ে গেছে বহুকাল আগেই। বর্তমান বৃহত্তর ঢাকা জেলার বুকে এখনও ছড়িয়ে রয়েছে তার কিছু কিছু নিদর্শন। ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধানে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বিভিন্ন কালপর্বের বিবিধ মূল্যবান তথ্য ও বিবরণ। যতীন্দ্রমোহন রায় লিখেছিলেন 'ঢাকার ইতিহাস', যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লেখেন 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' এবং স্বরূপচন্দ্র রায় লেখেন 'সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস'। ঢাকার অতীত পর্যালোচনায় বিক্রমপুর আর সোনারগাঁ অপরিহার্য। সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস সুদীর্ঘকাল পরে আবার প্রকাশিত হয়েছে বর্তমান প্রকাশনা থেকে। এই গ্রন্থে পাবেন একটি সমৃদ্ধ জনবসতির বিবরণ। নতুন সংস্করণের সংযোজিত অংশে সংগৃহীত প্রাচীন কীর্তি ও স্থানসমূহের বিবরণে আছে ঃ লাঙ্গলবন্ধ ও পঞ্চমীঘাট, গিয়াসউদ্দিন আজমশাহের সমাধি, মগরাপাড়া নহবৎখানা ও 'তহবিল', খানকাহ ও কবরস্থান, বল্লালের প্রস্তরময় রথ, গোয়ালদির প্রাচীন মসজিদ, শাহ আবদুল হামিদ মসজিদ, বাড়ি মখলস, পানাম, দুলালপুরের পুল, চাঁপাতলির পুল, বাবা লোকনাথ আশ্রম, কদমরসুল, পাঁচপীরের মাজার ও মসজিদ, বাবা সালেহর মসজিদ, সোনাকান্দা দুর্গ, পাগলা সাহেবের দরগা, পীরখন্দকার মহম্মদ ইউসুফের দরগা, দমদমা দুর্গ, সাহ আবদুল আলা বা পোকাই দেওয়ানের সমাধি, আমিনপুর, বন্দরশাহী মসজিদ, ইব্রাহিম দানেশমন্দের সমাধি, উদ্ধবগঞ্জ, কর্তাভু বা কত্রাপুর, কলাগাছিয়া, জাঙ্গালিয়া, ত্রিবেণী, দলৈরবাগ, মোয়াজ্জেমাবাদ, রাণী ঝি, লক্ষ্মণখোলা, সোনারগাঁ, হাইড়া, হামছাদি, হাজিগঞ্জ দুর্গ, বিবি মরিয়মের মসজিদ ও মাজার এবং দেওয়ানবাগ মসজিদ সম্পর্কিত বিবরণ। আগ্রহী পাঠক ঢাকার ইতিহাসের বহু অজানা তথ্য জানতে পারবেন এই আলোচনা থেকে। বর্তমান আলোচনায় ওপরে উল্লিখিত স্থানগুলির পুনরুল্লেখ করা হল না।

জাঁ-বাপটিস্ট তাভারনিয়ের প্রথম ঢাকা আসেন ১৬৪০ খ্রিঃ। ১৬৬৬ খ্রিঃ আবার আসেন ঢাকায়। মূলত ব্যবসায়িক কারণেই বার বার এদেশে তাঁর পদার্পণ। এই সময়কালের মধ্য বেশ কয়েকবার এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ঘুরে গেছেন। শেষ বয়সে লেখা তাঁর স্মৃতিচারণায় ঢাকা সম্পর্কে আছে :

বিকাল নাগাদ ঢাকা পৌঁছান। দৈর্ঘ্যের দিক থেকে ঢাকা বেশ বড় শহর। শহরটি গড়ে উঠেছে বুড়িগঙ্গার উত্তর কূল বরাবর। এই নদী আর পদ্মা আগে ছিল অভিন্ন। শহরটি লম্বায় দু-ক্রোশের বেশি। ঢাকা শহর পর্যন্ত ছাড়া ছাড়া বাড়িগুলো বাঁশ আর আর কঞ্চির গায়ে কাদা দিয়ে তৈরি। শহর সুবাদারের বাড়ি উঁচু পাঁচিল দেওয়া হলেও ভিতরে বাড়িটি কাঠের তৈরি। তার চেহারাও ভদ্রস্থ নয়। সুবাদার তাঁবুতেই থাকেন সেই ঘেরা জায়গায়। এইসব বাড়ি নিরাপদ না হওয়ায় ডাচরা মজবুত ও সুদৃশ্য বাড়ি বানিয়েছে। ইংরেজদের তৈরি বাড়িটিও দর্শনীয়। কারিগরি দক্ষতার ছাপ আছে অগাস্টিন ফাদারদের তৈরি গির্জায়।

তাভারনিয়ের যখন শেষবার ঢাকায় আসেন, তখন বাংলার সুবাদার নবাব শায়েস্তা খানের সঙ্গে আরাকান রাজের যুদ্ধ চলছে। আরাকান রাজের নৌবাহিনীতে সে সময়ে নৌবহরের

মধ্যে ছিল প্রায় ২০০ গ্যালি। এই গ্যালি কেবল বঙ্গোপসাগরে টহল দিত না, জোয়ারের সময় গঙ্গায় ঢুকে ঢাকা পেরিয়ে দেশের ভিতরে প্রবেশ করত। আরাকান রাজের নৌবাহিনীর পতুর্গিজ কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে হাত করেন শায়েস্তা খান। তাঁদের প্রচুর বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। সাধারণ নৌসেনাদেরও বেতন বাড়ান হয়। আরাকান রাজের বেশ কিছু গ্যালি মোগল পক্ষে যোগ দেয়। এইসব গ্যালি ছিল বেশ লম্বা। এক এক পাশে দাঁড়ের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ। এইসব গ্যালির কিছু কিছু ছিল বেশ রঙিন। ডাচ ও পতুর্গিজ জলদস্যুদের সহযোগিতায় শায়েস্তা খান ১৬৬৬ সালে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। ডাচদের এরকম গ্যালি আছে পণ্যসামগ্রী বহনের জন্য। গ্যালি ভাড়াও পাওয়া যায়। এইসব গ্যালিতে মাঝিমাল্লার কাজ করে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে।

ঢাকা পৌঁছবার পরদিন ১৪ জানুয়ারি বেশ কিছু উপহার নিয়ে তাভারনিয়ের নবাবের সঙ্গে দেখা করতে যান। বিকেলে নবাব তাঁকে কিছু ফল পাঠান। তার মধ্যে ছিল ডালিম, চিনা কমলালেবু, দুটি পারসিক তরমুজ ও তিন রকমের আপেল। পরদিন তাভারনিয়ের যেসব দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য এনেছিলেন তা নবাবকে দেখালেন। প্রায় দশবছরের নবাব পুত্রকে উপহার দেন সোনার কলাই করা একটি ঘড়ি, রূপার কারুকাজ করা একটি পিস্তল এবং একটা দূরবীন। নবাব বেশ কিছু জিনিসপত্র কেনেন। তার দামও ঠিক হয়। কিন্তু সেই সময়ে তাভারনিয়ের ছিলেন ডাচ কুঠিতে। সেখানকার লোকজনরা তাকে জানায় টাকা বয়ে নিয়ে কাশিমবাজার যাওয়ার বিপদ আছে। নৌকার মাঝিদের থেকেও বিপদ ঘটতে পারে।

২০ তারিখে নবাবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করেন। নবাবের কাছ থেকে হুণ্ডি নিয়ে যাবেন কাশিমবাজার। যাত্রার সময়ে নবাব তাকে একটি ছাড়পত্র দেন এবং আবার আসার আমন্ত্রণ জানান। স্থানীয় ডাচরা তাভারনিয়েরের সম্মানে যে ভুরিভোজের ব্যবস্থা করেছিল, সেখানে কয়েকজন ইংরেজ ও পতুর্গিজও আমন্ত্রিত হয়েছিল। ইংরেজ কোম্পানির স্থানীয় প্রধান টমাস প্রাটের সঙ্গে ও পতুর্গিজ ফাদারের সঙ্গে দেখা করেন। বেশ কিছু মূল্যবান দ্রব্য কিনে ২৯ জানুয়ারি নৌকা চেপে ঢাকা থেকে বিদায় নেন। সশস্ত্র ডাচ নৌকাগুলি তাকে দুক্রোশ পথ এগিয়ে দেয়। ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নদীপথেই ছিলেন। তারপর হজরাহাট এবং মিরদাপুর হয়ে কাশিমবাজার পৌঁছান।

তাভারনিয়েরের আগে এসেছিলেন পাদ্রী সেবাস্তিয়ান মানরিক। ১৬২৯ সালে তিনি আসেন বাংলায়। তাঁর বিবরণে আছে : "আরও কিছুকাল পরে আমাদের সম্প্রদায়ের পাদ্রীরা দেশের ভিতরকার অন্যান্য রাজ্যে প্রবেশ করে শেষে ঢাক [Dacck] বা পতুর্গিজরা যাকে [Daca] বলে সেই নগরে পৌঁছল। এটি বাংলার প্রধান শহর, আর প্রধান নবাব বা সম্রাটের নিযুক্ত রাজপ্রতিনিধির রাজধানী। সম্রাট এই পদ কয়েকবার নিজের ছেলেদের দিয়েছেন। নগরটি প্রশস্ত সমতল ভূমির ওপরে প্রসিদ্ধ গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। গঙ্গার ধার দিয়ে শহরটি চলে গেছে দেড় লিগ। একদিকে শহরতলী মানাশোর (Manaxor) এবং অন্যদিকে দুটি প্রসিদ্ধ শহরতলী নরন্দিন আর পুলগরি (Narandin & Pulgari)। এইসব শহরতলীতে আমাদের সম্প্রদায়ের লোকরা বাস করে। এখানে আমাদের একটি মঠ ও একটি সুন্দর গির্জা আছে। ...

"এই শহরের বিরাট ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে এখানে জানা-অজানা বহু জাতের মানুষ এসে বাস করে। এখানকার মাটি সুফলা। নানারকম ফসল জন্মায়। তারই ফলে এই শহরে অবাক করা সম্পদ সঞ্চিত হয়েছে। ক্ষেত্রিদের (Catari) বাড়ির টাকা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। এত টাকা যে গোনা শক্ত। তাই সাধারণত ওজন করে পরিমাণ জানা যায়। শুনেছি গঙ্গার ধারের এই বাণিজ্যকেন্দ্রে স্থানীয় লোক দু'লক্ষের ওপর। তাছাড়া বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা লোকও বহু। কিছু লোক আসে ব্যবসার কারণে। অন্য কিছু লোক আসে যুদ্ধে যোগ

দিয়ে বেশি বেতনের লোভে। এখানকার অগুনতি বাজারে নানা রকম খাবার আর নানাবিধ জিনিস দেখে বিস্মিত হতে হয়। নানারকম পোষমানা আর জঙ্গলি পাখি বিক্রি হতে দেখে আশ্চর্য হয়েছি। যেমন চার আনায় (একরূপার real-এ) পাওয়া যায় কুড়িটা ঘুঘু বা ষোলটি জঙ্গলি পায়রা। অন্য জিনিসও এরকম সস্তা। সম্রাট আর অন্য মুঘল শাসকরা এই শহর থেকে যে কর ইত্যাদি পান তা প্রায় অবিশ্বাস্য। একমাত্র পান (betele) বা ভারতীয় পাতা থেকে তারা দিনে চার হাজার টাকা কর আদায় করেন। এই শহরের সমৃদ্ধির আর একটি কারণ এই যে এর কাছেই বাকলা, সেলিমানবাদ আর কাটরো বলে তিনটি উর্বর দেশ আছে।

প্রথমে যে পাদ্রীরা এখানে আসেন, তারা নিজেদের বাসস্থানের কাছেই একটি গির্জা বানান। পরে তারা আরও দুটি গির্জা বানান, সিরিপুরে একটি, অপরটি নরিকুল ব্যাণ্ডেলে।"[১]

বাকলা — বর্তমান বাকরগঞ্জ

সেলিমানবাদ — সেলিমাবাদ পরগনা

কাটরোবা — মানিকগঞ্জের কটিবারি বা কঠোরবো তপ্পা

সিরিপুর — শ্রীপুর — চাঁদ রায়ের রাজধানী

নরিকুল ব্যাণ্ডেল — ঢাকার ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।

পর্তুগিজ ও মগ দস্যুদের দমন এবং ভূস্বামীদের অসন্তোষজনিত বিবিধ কারণে ঢাকাকে প্রশাসনিক প্রধান কেন্দ্র হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছিল। ঢাকা ছিল সামরিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকেই দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল সহজসাধ্য। ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরের পর দ্রুত শহর গড়ে উঠতে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে ঢাকা সে সময়েই প্রাধান্য পায়। কিন্তু পলাশী যুদ্ধের পর ঢাকার গুরুত্ব হ্রাস পায়। গৌরবপূর্ণ একটি অধ্যায় শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ১৯০৫ খ্রিঃ বঙ্গভঙ্গের পর ঢাকা আবার রাজধানীর মর্যাদা ফিরে পায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পূর্বে এশিয়ায় সামরিক অভিযানের কারণে ঢাকা সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ কর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ১৯৪৭ খ্রিঃ দেশভাগের পর ঢাকা হয় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে ১৯৭১ খ্রিঃ ১৬ ডিসেম্বর। আজ গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা।

ঐতিহাসিক ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার ঢাকা প্রসঙ্গের আলোচনায় বলেছেন ঃ "... গুপ্তবংশীয় সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে তদীয় সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অর্থাৎ সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রহিসাবে সমতট (কুমিল্লা অঞ্চল), ডবাক, কামরূপ (গৌহাটি অঞ্চল), নেপাল এবং কর্তৃপুর (কুমায়ুন-গাড়োয়াল অঞ্চল) রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্বে কেহ কেহ এই 'ডবাক' নামের সঙ্গে 'ঢাকা শব্দটির সাদৃশ্য কল্পনা করে এটাই 'ঢাকা'র প্রাচীন রূপ, এই মত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সিদ্ধান্তটি অনেকেই নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে পারেননি। আজকাল মনে করা হয় যে, প্রাচীন ডবাক রাজ্য বর্তমান আসামের অন্তর্গত নওগাঁ অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। যা হক, এখন আর আধুনিক ঢাকা অঞ্চলকে গুপ্তযুগের ডবাক রাজ্য বলে মনে করা হয় না।

"সাধারণের বিশ্বাস, ঢাকা নগরীর সমৃদ্ধি ও গৌরব মুঘলযুগের পূর্ববর্তী নয়। সত্যই হিন্দু আমলের কোনও দলিল-পত্রে ঢাকার উল্লেখ নেই। হিন্দু-যুগের শেষ ভাগে ঢাকা অঞ্চলে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমপুর নগর পূর্ব দক্ষিণ বাংলার রাজনীতিক কেন্দ্র ছিল বলে জানা যায়। এই নগরের অবস্থিতি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন, প্রাচীন বিক্রমপুর নগর বহুকাল পূর্বেই পদ্মা নদীর গর্ভে বিলীন হয়েছিল। তবে বিক্রমপুর ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত সোনারগাঁয়ের নিকটে অবস্থিত ছিল, তার কিছু প্রমাণ আছে। বিক্রমপুরের রাজা অরিরাজ দনুজমাধবকে মুসলমান ইতিহাসে সোনারগাঁয়ের রাজা দনুজ রায় বলা হয়েছে। পূর্বভারতে মুসলমান অধিকার বিস্তারের অনেকদিন পরেও কিন্তু ঢাকা নগরীর অস্তিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ পাই নে। এই সময়ে ঢাকার নিকটবর্তী সমৃদ্ধ নগর

সোনারগাঁ পূর্ববাংলার রাজনৈতিক কেন্দ্রের গৌরব লাভ করে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুঘল সম্রাট জহাঁগীরের রাজত্বকালে শেখ আলাউদ্দিন ইসলাম খাঁ (১৬০৮-১৩ খ্রিঃ) বাংলা প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী রাজমহল হতে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেছিলেন। ইসলাম খাঁ ঢাকা নগরীতে একটি ইষ্টকের দুর্গ এবং একটি রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করান এবং তৎকালীন মুঘল সম্রাটের নাম অনুসারে ঢাকার নাম রাখেন জহাঁগীরনগর। এই সময় থেকেই ঢাকার রাজনৈতিক গৌরব সূচিত হয়। কথিত আছে বাংলার পূর্বদক্ষিণ অঞ্চলে উপদ্রবকারী মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের দমন করাই ইস্‌লাম খাঁর রাজধানী পরিবর্তনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল।

"অতএব ঢাকা নগরীর সমৃদ্ধি ও রাজনীতিক গৌরবের সূচনা মুঘল-আমল হতে ; কিন্তু প্রাঙ্-মুসলমান যুগেও সম্ভবত স্থানটির কিঞ্চিৎ রাজনীতিক গুরুত্ব ছিল। অন্তত 'ঢাকা' নামটি এই অনুমানের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। নামটি স্পষ্টতঃই সংস্কৃত 'ঢক্ক' বা 'ঢক্কা' শব্দের প্রাদেশিক রূপ। ...'ঢক্ক' এবং 'ঢক্কা' শব্দ মূলত অভিন্ন মনে করা যায়। সুতরাং পণ্ডিতেরা সত্যই অনুমান করেছেন যে, শুরপুরে, (বর্তমান হরপোর) প্রাচীন কাশ্মীর রাজ্যের একটি 'প্রহরি নিবাস' (watch station) অবস্থিত ছিল। শত্রুসৈন্যের আগমন অথবা অনুরূপ কোনও বিশেষ ঘোষণা প্রকাশের জন্য ঐ স্থানে রক্ষিত ঢক্কা নিনাদিত হত। ... বর্তমান ঢাকা প্রাচীনকালে হিন্দুরাজগণের একটি স্থায়ী প্রহরি নিবাস ছিল বলে মনে হয়। সুতরাং প্রাঙ্-মুসলমান যুগেও স্থানটির কিছু রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়।"[২]

ঢাকার আত্মপ্রকাশের প্রথমপর্বে নৌপথই ছিল প্রধান। নদীরেখা বরাবর সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিতে মুন্সিগঞ্জ থেকে ঢাকা পর্যন্ত একাধিক কেল্লা বা দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছিল। ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার (১৯৯৩) থেকে জানা যায়—সেকালের সমরনায়করা প্রথম প্রতিরক্ষা সুব্যবস্থা করেন বর্তমান মুন্সিগঞ্জের ইদরাকপুরে। স্থানটি ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মেঘনা মোহনা বরাবর এগিয়ে আসা আক্রমণকারীদের খুব সহজেই এই দুর্গ বা কেল্লা থেকে প্রতিহত করা সম্ভব হত। ঠিক এর পিছনে প্রতিরক্ষা ব্যূহ হিসাবে একটি দুর্গ নির্মাণ করা হয় শীতলাখ্যা নদীর পূর্ব তীরে, বর্তমান আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন টার্মিনালের বিপরীতে। এটি পরিচিত ছিল সোনাকান্দা দুর্গ নামে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল ফতুল্লা থেকে বুড়িগঙ্গা-শীতলাখ্যার সঙ্গে সংযোগকারী একটি ছোট নদীর সংযোগ স্থলে খিজিরপুরে। সামরিক দিক থেকে স্থানটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুর্গটি ছিল খিজিরপুর কেল্লা। এই ফতুল্লার কাছে বুড়িগঙ্গা পশ্চিমদিকে বাঁক নিয়ে মেশে ধলেশ্বরী নদীতে। এখানে বুড়িগঙ্গার পূর্ব পারে ছিল ধাপার কেল্লা। কিন্তু পশ্চিমপারে যে দুর্গটি ছিল তার নাম অজানা থেকে গেছে। "চতুর্থ পর্যায়ে প্রতিরক্ষা হিসাবে ঢাকার খুব নিকটে আরো দুটি কেল্লা ছিল। বেগমুরাদ নামে পরিচিত এই দুটি কেল্লার অবস্থান ছিল বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ধোলাই খালের সংযোগস্থলের উভয় পার্শ্বে বর্তমান গেণ্ডারিয়া পুলের সামান্য দক্ষিণে। সর্বশেষ প্রতিরক্ষা হিসাবে আদিতে ছিল বর্তমান কারাগার সংলগ্ন একটি কেল্লা। এটি প্রাচীর কেল্লা হিসাবে খ্যাত। পরবর্তী সময়ে লালবাগে আরও একটি কেল্লা নির্মাণের কাজ শুরু হলেও অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়। এটিই বর্তমানে লালবাগ কেল্লা নামে পরিচিত। এই কেল্লাগুলোর মধ্যে ইদরাকপুর, লালবাগ, সোনাকান্দা ও খিজিরপুর কেল্লাই বর্তমানে সংরক্ষিত। অপরগুলোর কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।"[৩]

ফতুল্লার জোড়া কেল্লার দক্ষিণের সেতুটি নির্মাণ করেছিলেন মীর জুমলা। বাংলার সুবেদার হয়ে আসেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র শাহজাদা আজিম ১৬৭৭ খ্রিঃ। তিনিই লালবাগ প্রাসাদ দুর্গ নির্মাণ শুরু করলেও শেষ করতে পারেননি। তিনি দুর্গের নামকরণ করেন "আওরঙ্গাবাদ দুর্গ"। ১৬৮০ খ্রিঃ শায়েস্তা খান দ্বিতীয়বার সুবেদার হয়ে এসে লালবাগ দুর্গ পুনর্নির্মাণ শুরু করেন। কিন্তু প্রিয়কন্যা পরিবিবির মৃত্যু হওয়ায়, ১৬৮৪ খ্রিঃ দুর্গ নির্মাণ

বন্ধ হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে হান্টার উল্লেখ করেছেন : "...The palace of the Lal-bagh was commenced by Sultan Muhammad Azim, the third son of the Emperor Aurangzeb and was left by him in an unfinished state to his successor in the government. It was built in a quadrangular form, and enclosed a considerable extent of ground. It originally stood close to the Buriganga but there is now an intervening space between it and the river covered with huts and trees. The walls on the western side, and the terrace and battlement towards the river, are of a considerable height and present a commanding aspect from the water. These out works, with a few of its gateways, the audience hall, and the baths are the only parts of the building that survived in 1839. Since then their dilapidation has made rapid strides ; but even in ruin they still show the extensive and magnificent scale on which this princely residence was originally designed. Shaista Khan, the successor of Sultan Muhammad Azim, appears never to have completed the structure. When Tavernier visited Dacca, about the year 1666, the Nawab was residing in a temporary wooden building in its court. He afterwards erected within its walls a mausoleum to the memory of his daughter, the wife of Sultan Muhammad Azim. The inner apartment of this structure, containing the tomb is built of marble and *Chanar* stone, surmounted with fine dome ; the passage surrounding it being divided into compartments embellished with mosaics. Most of its decorations, however, together with the aqueducts that supplied its fountains, have long since been destroyed ..."[৪]

লালবাগ দুর্গের ভিতরের অংশে আছে পরিবিবির মাজার, লালবাগ মসজিদ। একটি দোতলা অট্টালিকা (যাকে বলা হত দরবার হল), স্নানাগার (হাম্মামখানা) এবং একটি বড় পুকুর। পরিবিবির মাজার শায়েস্তাখান নির্মাণ করেন ১৬৮৪ খ্রিঃ। মুসলিম ও হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন সমৃদ্ধ মাজারটির জন্য রাজমহলের কালো পাথর, চুনার থেকে বেলে পাথর এবং জয়পুর থেকে আনা হয়েছিল সাদা পাথর। মাজারটি অবস্থিত লালবাগ মসজিদের ১৩০ ফুট পূর্ব দিকে। ফুল ও লতা পাতার নকশা আঁকা আছে সমাধিগাত্রে এবং ঘরের মেঝের মার্বেল পাথরে। মাজারের দক্ষিণ-পূর্বদিকে মার্বেল পাথরের তৈরি শামশাদ বানুর সমাধি এবং মাজারের দক্ষিণ দিকে আছে মির্জা বাঙালির সমাধি।

"শহরের পশ্চিম প্রান্তে বুড়ী-গঙ্গার নিকটে লালবাগ কেল্লা অবস্থিত। ধ্বংসপ্রাপ্ত এই দুর্গের তোরণদ্বার, প্রাকার ও স্তম্ভ প্রভৃতির যে অংশ দাঁড়াইয়া আছে তাহাও দেখিবার মত। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ আজম যখন সুবাদার রূপে অল্পকাল ঢাকায় অবস্থান করেন সেই সময়ে তিনি এই কেল্লা ও প্রাসাদ নির্মাণ আরম্ভ করেন। শায়েস্তা খাঁর সময়ে নির্মাণকার্য আরও অগ্রসর হয়। দুর্গ-মধ্যে একটি জলাশয়ের পশ্চিমে পরী বিবির মকবরা নামক একটি মনোরম সমাধি-সৌধ আছে। পরী বিবি নবাব শায়েস্তা খাঁর কন্যা ছিলেন। মক্‌বরটি নির্মাণের জন্য চুনার, গয়া ও জয়পুর হইতে প্রস্তরাদি আনীত হইয়াছিল। সমাধি-সৌধে নয়টি কক্ষ আছে। এবং এগুলিতে নানা রঙের মর্মর প্রস্তরের সুন্দর কাজ আছে। সৌধের ছাদটির নির্মাণরীতিতে বিশেষত্ব আছে ; কানিংহাম সাহেবের মতে ইহা হিন্দু স্থাপত্যের পরিচায়ক ; মক্‌বরার চন্দন কাষ্ঠের দ্বারগুলিও হিন্দু রীতির সাক্ষ্য দিতেছে। কেল্লার ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বেই একটি পুরাতন ফটকের বাহিরে সুবৃহৎ লালবাগ মসজিদ অবস্থিত। সম্রাট আওরঙ্গজেবের

পৌত্র আমিজ-উশ-সানের পুত্র সম্রাট ফরুখ শিয়র যখন পিতার প্রতিনিধিরূপে ঢাকায় অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। লালবাগ কেল্লার নিকটেই বুড়ীগঙ্গা তীরে আমিজ-উশ-সান নির্মিত সুপ্রসিদ্ধ পোস্তাপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল ; এখন ইহা বুড়ীগঙ্গা গর্ভে গিয়াছ। সুপ্রসিদ্ধ বিশপ হেবব পোস্তা প্রসাদা দেখিয়া লিখিয়াছিলেন যে ইহার স্থাপত্য রীতি মস্কো নগরীর সুবিখ্যাত ক্রেমলিন প্রাসাদের অনুরূপ এবং ঢাকা শহর তাঁহাকে পদে পদে মস্কোর কথা মনে করাইয়া দিয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে লালবাগে বিদ্রোহীদের সহিত ইংরেজ নাবিকদলের একটি ক্ষুদ্র সংঘর্ষ হইয়াছিল, বিদ্রোহীরা পরাজিত হইয়া জামালপুর ময়মনসিংহ অভিমুখে পলায়ন করে।"[৫]

ঢাকার বিখ্যাত নবাব পরিবারের বাসস্থান "আহসান মঞ্জিল" নামে বিখ্যাত। "আব্দুল হাকিম নামক এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী এই বংশের আদিপুরুষ—তৎপরে যথাক্রমে হাফিজুল্লা, খোজা আলিমুল্লা এবং আব্দুল গনি এই সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন। আবদুল গনিই এই বংশের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে ইনি সি এস আই উপাধি এবং সেই বৎসরেই বংশানুক্রমে নবাব উপাধি পাইয়াছিলেন। নবাব বাহাদুর জীবনে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা সাধারণের হিতার্থে ব্যয় করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কে সি এস আই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।'[৬] ইসলামপুরের কুমারটুলি মহল্লায় যেখানে আহসান মঞ্জিল, সেখানে ছিল ফরাসিদের বাণিজ্যকুঠি বা ফ্যাক্টরি। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে সেই ফ্যাক্টরি কিনে নেন নবাব আবদুল গনির পিতা খাজা আলীমুল্লাহ। ফ্যাক্টরি সংস্কার করে তিনি বাসোপযোগী যে ভবন নির্মাণ করেন, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে নবাব আবদুল গনি সেই ভবন নতুন করে নির্মাণ করেন। প্রিয়পুত্র আহসানুল্লাহর নামে প্রাসাদটির নামকরণ করেন "আহসান মঞ্জিল"। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ এপ্রিলের প্রলয়ংকর ঘূর্ণিঝড়ে প্রাসাদটির ব্যাপক ক্ষতি হয়। কিন্তু নবাব আহসানুল্লাহ পুনরায় সংস্কার করেন। নবাব পরিবারের ঐশ্বর্য ক্রমশ ম্লান হয়ে আসছিল। বিশেষ করে, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে নবাব সলিমুল্লাহর মৃত্যুর পর আহসান মঞ্জিলের জৌলুস ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। পঞ্চাশের দশকে ভবনটি কোর্ট ওয়ার্ডেসের অধীনে যায়। এই ঐতিহাসিক ভবনটি রক্ষার জন্য "আহসান মঞ্জিল" এবং সংলগ্ন ৫.৬৫ একর জমি সরকার অধিগ্রহণ করে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ নভেম্বর। এই "আহসান মঞ্জিলে" ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর যাদুঘরের উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।

'আহসান মঞ্জিলে'র মূল প্রাসাদ ভবনের পশ্চিমদিকে তৈরি হয়েছিল অন্দর মহল। দুটি ভবনের মধ্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল প্রথম থেকেই।

নবাব পরিবারের আভ্যন্তরীণ বিরোধ ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে উঠেছিল। ক্রমশ তা প্রকাশ্যে এসেও পড়ত। প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে জানা যায় : "ঢাকার প্রসিদ্ধ ও বহুমানিত নবাব খাজে আবদুল গনি ও নবাব আসানুল্লার সুনাম বঙ্গদেশের সর্বত্র বিঘোষিত। হায়! বুঝি এতদিনে, ধনীদের বিমাতা অলক্ষী সেইগৃহে প্রবেশ করিল। তাঁহাদের পরিবারে দুষ্পরিহার্য আত্মকলহ উপস্থিত। সম্পত্তি সম্পর্কে শীঘ্রই বিষম বিপদ উপস্থিত হইবে। বৈমাত্র ভ্রাতা বৃত্তির টাকা না পাওয়ায় বলপূর্বক খাজাঞ্চী হইতে টাকা গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া খাজে আসানুল্লা সাহেব ফৌজদারিতে শান্তিভঙ্গ ও ৩৮০ আত্মধারার মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন। পরিবারস্থ সকলেই একপক্ষ। তাঁহারা সম্পত্তির মালিক বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন। কোন পক্ষ দোষী, সে বিষয়ে আমরা এখন মতামত প্রকাশ করিতে চাই না। কিন্তু পরিবারস্থ লোকেরা অত্যন্ত দীনদশাপন্ন। ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট বিচার হইতেছে। এই অলক্ষী প্রবেশ করিল, কি হয় বলা যায় না, শেষ কথা, "জ্ঞাতিশ্চেদন লেন কিং।"[৭]

ষোল ও সতের শতকে বিদেশি বণিকরা এদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাণিজ্যকেন্দ্র বা ফ্যাক্টরি

স্থাপন করে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হুগলিতে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থান করে ১৬৬৯ খ্রিঃ। তার আগে ঢাকায় বিদেশি বণিকদের মধ্যে পর্তুগিজরা প্রথম বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছিল তেজগাঁও। তারা আসে সতের শতকের প্রথমে। পর্তুগিজদের পর আগমন ঘটে ওলন্দাজ বণিকদের। ১৬৬৩ খ্রিঃ তারা প্রথম ফ্যাক্টরি স্থাপন করে তেজগাঁও অঞ্চলে। পরে এই ফ্যাক্টরি সরে আসে বর্তমান মিটফোর্ড হাসপাতালের জায়গায় বুড়িগঙ্গার তীরে। কিন্তু তাদের ব্যবসার পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকায় ১৭৮১ খ্রিঃ ফ্যাক্টরি বিক্রি করে দেয় ইংরেজ কোম্পানিকে। ফরাসিদের ফ্যাক্টরি ছিল তেজগাঁও-এর আহসান মঞ্জিল প্রাঙ্গণে। কিন্তু ফরাসিদের ব্যবসায় মন্দা শুরু হয় পলাশী যুদ্ধের পর। ১৭৭৪ খ্রিঃ তাদের ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যায়। ইংরেজরা প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে তেজগাঁও এলাকায়। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে মোগল শাসকদের সংঘর্ষের সময় ঢাকার বাণিজ্য কুঠি বন্ধ হয়ে গেলেও, ১৭২৩ খ্রিঃ আবার চালু হয়। এই ফ্যাক্টরি ১৭৩৮ খ্রিঃ তেজগাঁও থেকে উঠে আসে বর্তমান জগন্নাথ কলেজ হোস্টেলের প্রাঙ্গণের জায়গায়।

"...The English factory appears to have been built about 1666. The central part of the building (লালবাগ দুর্গ) was used as a court for some time, but on its falling into a state of ruin it was pulled down about 1829 on 1830, and the only portion of the building that remained in 1839 was the outward wall. The French Factory, an extensive building on the bank of the river, was repaired and converted into a dwelling house, and in 1839, when Dr. Taylor wrote his book, was occupied by a native gentleman of the dutch factory there are no traces existing except the walled terrace on which it stood. The French and Dutch Factories were taken possession of by the English in the years 1778 and 1781 respectively." [৮]

মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় নির্মিত হয়েছিল সইফ খানের মসজিদ। রাজা মোহন সিং মসজিদটি নির্মাণ শুরু করলেও, সইফ খান মসজিদ নির্মাণ কাজ শেষ করেন। তারপর থেকে এটি মুসলমানদের নমাজের স্থান হিসাবে নির্ধারিত হয়। কুর্‌আনের আয়াত, নানাধরনের অলংকৃত কারুকাজ আছে। একসময়ে মসজিদে তিনটি অলংকৃত গম্বুজ ছিল। মসজিদের ছাদটি ভেঙে যায় ১৮১১ খ্রিস্টাব্দের বর্ষাকালে।

"...বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত ঢাকা একটি প্রাচীন নগরী। গোয়ালন্দ-নারায়ণগঞ্জ স্টিমার পথ ব্যতীত কলকাতা হইতে সিরাজগঞ্জ ঘাট ট্রেনে, তথা হইতে জগন্নাথগঞ্জ স্টিমারে ও জগন্নাথগঞ্জ হইতে ট্রেনে কিংবা তিস্তামুখ ঘাট পর্যন্ত ট্রেনে, তথা হইতে বাহাদুরাবাদ স্টিমারে এবং বাহাদুরাবাদ হইতে ঢাকা পর্যন্ত ট্রেনে আসা যায়। খ্রিস্টিয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় পর্যটকগণ বেঙ্গালা নামে একটি বর্ধিষ্ণু নগরীর উল্লেখ করিয়াছেন, কাহারও কাহারও মতে ঢাকা ও বেঙ্গালা একই শহর। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সুবাদার ইসলাম খাঁ কর্তৃক ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত করিবার পূর্ব হইতেই যে ঢাকা নগরীর প্রাধান্য ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পূর্বে মহারাজ মানসিংহ এখানে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ইসলাম খাঁ আসিবার বহু পূর্বে এই স্থানে দুইটি প্রাচীন মসজিদ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী বসাকগণ বাণিজ্য উপলক্ষে এই স্থানে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। রাজধানী স্থানান্তরের কারণ ছিল রাজমহলের নিকট গঙ্গার গতি পরিবর্তনে ব্যবসায়ের অসুবিধা ও পর্তুগিজ, মগ ও আহোমদের আক্রমণ হইতে বাংলার পূর্বপ্রান্ত রক্ষার সুব্যবস্থা করা। সম্রাটের নাম অনুসারে রাজধানী ঢাকা জাহাঙ্গীরনগর নামে পরিচিত হয়। ইসলাম খাঁর নাম হইতে ঢাকা শহরের নবাবপুর ও

ইসলামপুর মহাল্লার নাম হইয়াছে। ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার মৃতদেহ তাঁহার জন্মস্থান ফতেপুর-শিক্রীতে লইয়া গিয়া সমাহিত করা হয়। তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতা কাসিম খাঁ কয়েক বৎসর সুবাদার ছিলেন এবং ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভ্রাতা ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ কাসিমের পরিবর্তে সুবাদার নিযুক্ত হন। পাঁচ বৎসর শান্তিতে শাসন করিবার পর বিদ্রোহী রাজকুমার শাহ্জাহানের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন ; শাহ্জাহান অল্পকালের জন্য ঢাকায় বাস করিয়াছিলেন। শাহ্জাহান বাংলা ত্যাগ করিলে পর পর কয়েকজন সুবাদারের পর ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম খাঁ মশদী সুবাদার নিযুক্ত হন। ইনি চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া উহার নাম ইসলামাবাদ রাখেন। পর বৎসর ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহ্জাহান ইসলাম খাঁকে দিল্লিতে উজির পদে নিযুক্ত করেন এবং পুত্র শাহ্ শুজাকে বাংলার সুবাদার করিয়া প্রেরণ করেন। শাহ্ সুজা ঐ বৎসরই রাজধানী পুনরায় রাজমহলে লইয়া যান। কুড়ি বৎসর দক্ষতার সহিত শাসন করিবার পর পিতার কঠিন পীড়া হইলে সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয় ও ভ্রাতা আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমলা কর্তৃক শাহ্ শুজা পরাজিত হইয়া সপরিবারে আরাকান রাজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আরাকানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মীরজুমলা বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হইয়া রাজধানী ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে আবার ঢাকায় আনয়ন করেন।

"মীরজুমলার মৃত্যুর পর ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে সম্রাজ্ঞী মমতাজের ভ্রাতা ও নূরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্র শায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। তাঁহার সময়ে ঢাকা উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করে। সুদীর্ঘকাল শাসন করিয়া ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং অল্পকাল পরেই আগ্রায় পরলোক গমন করেন। অতঃপর বাহাদুর খাঁ, ইব্রাহিম খাঁ ও আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম উশসান ঢাকায় সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে আজিম উশসানের সহিত দেওয়ান মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর মনোমালিন্য হেতু মুর্শিদকুলী খাঁ রাজধানী মুর্শিদাবাদে লইয়া যান এবং আজিম উশসান বিহারের সুবাদার নিযুক্ত হন। তখন হইতে ঢাকার শাসনভার নায়েব নাজিমের উপর অর্পিত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি পদ পাইলে তৎকালীন ঢাকার নায়েব নাজিম নবাব জসারৎ খাঁর শাসন ক্ষমতা লুপ্ত হয় এবং তিনি মাসোহারা প্রাপ্ত হন। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে গাজীউদ্দিন হায়দার বা পাগলা নবাবের মৃত্যুর পর তাঁহার সন্তানাদি না থাকায় নবাব নাজিমের পদ উঠিয়া যায়। দেনার দায়ে তাঁহার সম্পত্তি বিক্রিত হইয়া যায় ; তাঁহার একটি হাওদা নবাবপুরের বসাকগণ ক্রয় করেন এবং জন্মাষ্টমীর মিছিলের সময়ে উহা এখনও বাহির করা হয়। তারিখ-ই-ঢাকা অনুসারে ঢাকা নগরীর চরম উন্নতির সময়ে পশ্চিমে জাফরাবাদ হইতে পোস্তাগোলা পর্যন্ত ১০ মাইল ও উত্তরে টঙ্গ নদী পর্যন্ত ১৫ মাইল বিস্তৃত ছিল এবং ইহার লোকসংখ্যা ছিল ৯,০০,০০০। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে টাভার্নিয়ার ঢাকায় আগমন করেন। ১৯০৫ হইতে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামক নবগঠিত ও অল্পকালস্থায়ী প্রদেশের রাজধানী ছিল।...

"মুঘলদের সময়ে মগেরা ঢাকা ২/৩ বার লুণ্ঠন করে। পলাশী যুদ্ধের পর সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময় ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা নগরী লুণ্ঠিত হয়।...

"বর্তমান ঢাকা নগরী দৈর্ঘ্যে ৪ মাইল ও প্রস্থে ১ মাইল। ইহা বাংলার দ্বিতীয় শহর। ঢাকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে প্রথমেই বুড়িগঙ্গা তীরে বাক্ল্যান্ড বাঁধের উল্লেখ করিতে হয়। ইহার দৃশ্য সত্যই সুন্দর বিশেষত বর্ষাকালে যখন নদী কানায় কানায় ভরিয়া উঠে। ইহার জন্যই ঢাকাকে কেহ কেহ প্রাচ্যের ভিনিস্ বলিয়া থাকেন। বাঁধের পশ্চিম প্রান্তে ঢাকার নবাবদের বৃহৎ ও সুদৃশ্য আধুনিক প্রাসাদ আহসান মঞ্জিল অবস্থিত। বাঁধের পূর্ব প্রান্তেও সুন্দর অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাঁধের উপরই ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ নর্থব্রুক হল অবস্থিত ; নিকটেই বাঁধের উপর একটি পুরাতন কামান রক্ষিত আছে। বাঁধের ধারে ধারে সুন্দর সুন্দর

বাসভবন প্রভৃতি অবস্থিত ; ইহাদের মধ্যে সুদৃশ্য প্রাচীন ইমারত বড় কাটরা ও ছোট কাটরা উল্লেখযোগ্য। সুপ্রসিদ্ধ শাহ্ শুজা বড় কাটরা নামক সরাইখানাটি নির্মাণ করেন। বড় কাটরার নিকটেই শায়েস্তা খাঁ নির্মিত সরাইখানা ছোট কাটরার মধ্যে বিবি চম্পার সমাধি দৃষ্ট হয় ; তিনি কে ছিলেন জানা যায় নাই ; তাঁহার নাম হইতে স্থানটি চাঁপাতলি নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। বড় কাটরার ঠিক সম্মুখে বুড়িগঙ্গার অপর পারে জিঞ্জিরার বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ কর্তৃক ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই জিঞ্জিরায় প্রাসাদেই পলাশীর যুদ্ধের পর আলিবর্দী-দুহিতা ঘেসেটি ও আমিনা বেগম ও সিরাজউদ্দৌলার বেগম ও শিশুকন্যা বন্দিনী ছিলেন। মীরজাফরের পুত্র মীরন মুর্শিদাবাদে লইয়া যাইবার ছল করিয়া ধলেশ্বরী নদীতে নৌকা ডুবাইয়া ইহাদের হত্যা করেন বলিয়া কথিত ; মৃত্যুকালে ঘেসেটি ও আমিনা বেগম মীরনকে বজ্রাঘাতে মৃত্যুর অভিশাপ দেন। মীরন বজ্রাঘাতেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। বুড়ীগঙ্গার তীর হইতে প্রত্যহ গহেনার নৌকা মানিকগঞ্জ, ধামরাই, বহর, তালতলা, লৌহজঙ্গ, শ্রীনগর, কলাকোপা প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করে।

"বাকল্যান্ড বাঁধ ছাড়িয়া একটি রাস্তা নদীর সমান্তরালে পশ্চিমে পটুয়াটুলি, ইসলামপুর, বাবুবাজার, মুঘলটুলী, চক বাজার হইয়া শহরের প্রান্তে লালবাগ পর্যন্ত গিয়াছে। আর একটি প্রধান রাস্তা বাকল্যান্ড বাঁধ হইতে উত্তরে কাছারি প্রভৃতি হইয়া রেলওয়ে স্টেশনের দিকে গিয়াছে। ইহা নবাবপুর রাস্তা নামে পরিচিত। নবাবপুর, উয়ারি, তাঁতিবাজার, বাংলাবাজার, সূত্রপুর, লক্ষ্মীবাজার, শাঁখারিবাজার, আরমানিটোলা, কায়েতটুলি, রমনা প্রভৃতি মহাল্লার নাম ঢাকার বাহিরেও পরিচিত। নবাবপুর রাস্তার নিকটে মানোয়ার খাঁর বাজার সুপ্রসিদ্ধ ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলির প্রপৌত্রের নাম বহন করিতেছে। চকবাজারের চক-মসজিদটি ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ কর্তৃক নির্মিত হয় ; এই মসজিদে চওড়া ও বড় কিন্তু অনুচ্চ খিলানগুলি আওরঙ্গাবাদ ও আহমদনগরের রীতি অনুসারে শায়েস্তা খাঁ এদেশে প্রচলন করেন ; এজন্য ইহা শায়েস্তখানী ধরন নামে পরিচিত। মুর্শিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ কাট্‌রা মসজিদ এই ধরনে নির্মিত। বুড়ীগঙ্গার তীরের মত চকবাজারেও মুঘল যুগের একটি তোপ পড়িয়া আছে। বাবু বাজারে শায়েস্ত খাঁ নির্মিত আর একটি মসজিদ আছে। চকবাজারের নিকট যে স্থানে এখন জেল-হাসপাতাল অবস্থিত ঐ স্থানে মুঘল আমলে ইসলাম খাঁর দুর্গে টাকশাল ছিল। এই টাকশালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির টাকাও মুদ্রিত হইয়াছিল। শহরের নারিন্দা মহাল্লায় ১৪৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিনট বিবির মসজিদ ঢাকার সর্বাপেক্ষা পুরাতন মসজিদ। মুর্শিদকুলী খাঁ নির্মিত বেগম বাজারের মসজিদ ঢাকার সর্বাপেক্ষা ঢাকার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মসজিদ ; ইহা দেখিতেও অতি সুন্দর। আরমানিটোলায় ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত আরমানি গির্জাটি সুবৃহৎ। খ্রিস্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বহু আর্মেনীয় বাণিজ্যসূত্রে ঢাকায় আগমন করেন। রেল স্টেশনের সম্মুখেই খাজা আম্বরের মসজিদ ও কূপ দেখিতে পাওয়া যায় ; খাজা আম্বর শায়েস্তা খাঁর প্রধান খোজা ছিলেন।[১]

The City of Dacca

We have a map of it before us, prepared 'under the superintendence of N. T Davey, Esq., Revenue Surveyor,' It was published in the year 1859, and is a very correct delineation of the city. In scanning it, we have been struck with the gradual inroads of jungle, and the gradual shifting, lower and lower down the river, of the habitable city. When Dacca was in its glory, under Mahomedan rule, the city evidently extended far into what in jungle now. Bhowal, Capassia, and the surrounding country, immense cotton-fields is the days of the old Romans, have long since been reclaimed by jungle,

and now constitute the hunting-ground of Eastern Bengal. Tigers, leopards, panthers. bears, deer, and a countless host of other wild animals roam on land the once yielded the fine cotton which, woven into webs of wind, were the delight of the wives and daughters of Roman Emperors. The city too, extended far north into what is now all but irreclaimbable forest land. An inspection of map will show that in these jungles there are still to be found weed-choked tanks and wells, ruins of Mahombedan mosques, old walls, the foundations of ancient brick buildings, and innumerable Mahomedan tombs. The mouths of old wells over grown with jungle have over and over again proved fatal traps to tigers and leopards, which have tumbled into them and perished. As the trade of the city diminished, and there was a proportionate decrease in the population, the inland section of the city was abandoned, and the people moved nearer and nearer to the river side. They spread themselves along the bank of the river in an easterly direction, until now, the breadth of population is greater in the eastern than in the western portion of the city. The main features of the city have not altered since the occupation of it by the English. In other parts of the country, and especially, in the North-West Provinces, what is called the 'station' is distinct from the city. The 'station' is purely of European origin. It is that section of a town or city which is exclusively given up to European dwllings ; the 'city' is the section inhabited by the natives, and in which all the principal bazars are located. This is not the case in Calcutta, where the hovels of shoemakers crowd under the walls of stately European mansions, and stinking native *parahs*. send up their smoke and malaria into the windows of palaces and it it not the case in Dacca, where houses intended for Europeans to dwell in, are to be found scattered in all parts of the town. Bazars are to be met with in every directin, and houses down the bazars ; but these houses are far from deserving the character that has been given to them. In a short description of the town inserted at the bottom of the map, we find it stated that the houses of the European residents are 'large and well-built, and give to the town a somewhat imposing appearance on the approach to it from the south.' 'Large' Yes, the open sky is large too, but nobody would like to live under it ! Dacca houses are large, but they have no doors and windows worthy of the name. They are so constructed that every room in a house necessarily becomes a thoroughfare, and the tenant is obliged to submit to a sort of public life which is any thing but agreeable. An then, what a plesant fiction it is to talk of these houses as being 'well-built'. Let the and occurrence that deprived a family of the flower of the flock cry "shame !" on outr Native landlords. Let the frequent house-inspecting committees that the Magistrate has had occasion to appoint, testify to the safety of our houses. There is scarcely a private dwelling or a public office, that is safe. Almost every house ought to

have props to its beams ; a sound arch would be stared at with unbelieving amazement ; cracked walls are too common to be noticed. The only security one enjoys in his house is the hope that he may not happen to be in a room at the time when it comes down ! Such are our 'large and well built' houses ! A more correct description is that of the native huts and lanes of the city: 'The numerous streets that intersect the town are extremely narrow and crooked ; and only a few are metalled and wide enough to admit of a wheeled conveyance passing through them. The intermediate spaces are filled up with houses and huts, usually arranged in the form of chouks or squares, which are separated from each other by foot-paths, and generally surrounded by jungle and deep pits, from which earth has been dug for the purpose of building, serving as depositories for all the refuse animal and vegetable matter and filth of the neighbourhood.' This is Dacca. Who will say that it dose not require the sweeping hand of reform ?*

Dacca News. 22.6.1878

ঢাকেশ্বরী মন্দির : *[বর্তমান সংস্করণের ২১১, ৭১৮ পৃঃ দেখুন]*

ঐতিহাসিক ঢাকা শহরের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেবী ঢাকেশ্বরীর নাম। এই ঢাকেশ্বরী দেবী কোথা থেকে কবে এখানে আবির্ভূত হলেন, সে সম্পর্কে ছড়িয়ে আছে নানান কিংবদন্তী।

"শহরের উত্তর-পশ্চিম কোণে ঢাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ঢাকেশ্বরীর মন্দির অবস্থিত...। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে ঢাকেশ্বরীর উল্লেখ আছে। ঢাকেশ্বরী মন্দির মহারাজ বল্লালসেন কর্তৃক নির্মিত বলিয়া প্রবাদ। কথিত আছে, তাঁহার জননী নির্বাসিতা হইয়া ঢাকার ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে স্থিত রাণীঝি গ্রামে বাস করিতেন ; তাঁহাকে লোকে রানি-ঝি বলিয়া ডাকিত এবং সেই জন্য গ্রামটির নামও রানি ঝি হয় ; বনমধ্যে এই গ্রামে বল্লাল সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম বন-লাল বা বল্লাল হয়। ইহার নিকটে লক্ষ্মণ-খোলা গ্রামে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন একটি হাট বসাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত। এই অঞ্চলের সহিত মহারাজ বল্লালের সম্বন্ধ জনপ্রবাদ দ্বারা সূচিত হয়। ঢাকেশ্বরীর মন্দির বহুবার সংস্কৃত হইলেও উহার পশ্চাদ্‌ভাগ প্রায় আদি ও অবিকৃত অবস্থায় আছে। ঢাকেশ্বরী সম্বন্ধে অপর কাহিনী প্রচলিত আছে যে, মহারাজ মানসিংহ শ্রীপুরের কেদার রায়কে পরাস্ত ও নিহত করিয়া তাঁহার গৃহদেবী শিলাময়ীকে লইয়া প্রথমে ঢাকায় আসেন এবং তথায় ঠিক অনুরূপ আর একটি মূর্তি নির্মাণ করান। আসল ও নকল মূর্তিতে ভেদ ধরিবার উপায় ছিল না। মানসিংহ কেদার রায়ের শিলাময়ীকে জয়পুরে লইয়া যান এবং অপরটি ঢাকেশ্বরী নামে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত করেন।" [১২]

জনশ্রুতি দক্ষ আয়োজিত যজ্ঞে অ-নিমন্ত্রিত ছিলেন মহাদেব। সতী সেই যজ্ঞ সভায় উপস্থিত হলে, মহারাজ দক্ষ মহাদেবের নিন্দাবাদ করায় সতী সেখানেই দেহত্যাগ করেন। সমাচার জেনে মহাদেব প্রাণহীন সতীর দেহ নিজ স্কন্ধে তুলি নিয়ে শুরু করেন প্রলয় নৃত্য। পৃথিবী ধ্বংসের উপক্রম হলে ভগবান বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করেন। সতীর দেহ একান্নটি খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে সব স্থানে ছড়িয়ে পড়ে সেখানে পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে পীঠস্থান। সতীর অলংকারের একটি অংশ যে স্থানে পড়ে, সেই স্থানটি পরবর্তীকালে পরিচিত হয় ঢাকা নামে। দেবীর নাম হয় ঢাকেশ্বরী।

* See *Journal of the Society of Arts for February 9.* 1877. ..pp. 226, vol. XXV.

"আর একটি জনশ্রুতি মানসিংহ মহারাজ বিক্রমপুরাধিপতি বীরাগ্রগণ্য কেদার রায়কে পরাজিত করে গৃহদেবী শিলাময়ীকে নিয়ে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। পরে কর্মকারগণকে ঠিক ঐ মূর্তির অনুরূপ হিরন্ময় মূর্তি নির্মাণের জন্য নিয়োগ করেন। তাহারা যাতে কোনরূপে মূল্যবান দ্রব্য অপহরণ বা অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করে তজ্জন্য সর্বদা রক্ষীগণকে তত্ত্বতালাশ নেয়ার জন্য নিযুক্ত করেন। কর্মকারেরা শীলাময়ীর মত অন্য একটি প্রতিমা নির্মাণ কার্য যে দিবস শেষ করে, সে দিবস তারা রাজসদনে উপস্থিত হয়ে বলেন মহারাজ আমরা একবার এই নব নির্মিত মূর্তিকে পুকুর হতে স্নান করিয়ে আনতে ইচ্ছা পোষণ করি। রাজা তাদের কথায় স্বীকৃত হলে, নির্মাতারা অলক্ষ্যে তাদের নির্মিত মূর্তিটিকে দেবীর আসনোপরি রেখে যথার্থ দেবী মূর্তিকে স্নান করিয়ে নিয়ে আসে। পরে উভয় মূর্তি একত্রে হলে কোনটা পূর্ব নির্মিত আর কোনটা নতুন নির্মিত কেউই তা সনাক্ত করতে পারলেন না। পরে কারিগররা এ রহস্য প্রকাশ করে দিলে রাজা মানসিংহ তাদের যথাযোগ্য পুরস্কার দান করে চাঁদ রায়ের দেবীকে ভারতের জয়পুরে নিয়ে যান। অপরটিকে ঢাকার সংস্থাপিত করেন। উহাই ঢাকেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ" [১৩]

অপর জনশ্রুতি অনুসারে বল্লালসেন এই দেবীমূর্তির প্রতিষ্ঠাতা। মানসিংহ ঢাকায় অবস্থানকালে বিগ্রহ ও মন্দিরের সংস্কার করেন। আদিসুরের পুত্র বল্লালসেন ছিলেন বিক্রমপুরের সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা। বল্লালের মা ছিলেন আদিসুরের প্রিয় মহীষী। একবার কোন কারণে ক্রুদ্ধ রাজা রানিকে প্রাসাদ থেকে বহিষ্কার করে দেন। রানি তখন গর্ভবতী। রানি ঝাঁপিয়ে পড়েন ব্রহ্মপুত্রের জলে। কিন্তু নদী তাকে অপরপারে নিয়ে গিয়ে দেবী দুর্গার হাতে সমর্পন করে। সেখানে জঙ্গলে বসবাসের সময় জন্ম হয় বল্লাল সেনের। দেবী নবজাতককে লালনপালন করতে থাকেন। বল্লাল ক্রমশঃ নানান বিদ্যায় পরদর্শী হয়ে ওঠেন। একদিন জঙ্গল মধ্যে সে আবিষ্কার করে দেবী দুর্গার বিগ্রহ। অভিভূত বল্লাল দেবীর মন্দির তৈরি করে দেয়। জঙ্গলে আবৃত বা ঢাকা ছিল বলে দেবীর নাম হয় "ঢাকেশ্বরী"।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, মন্দিরটির নির্মাণ কাল দুশ বছরেরও বেশি। সম্ভবত মানসিংহ মন্দিরটি সংস্কার করেছিলেন মাত্র। আরও জানা যায়, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জনৈক হিন্দু এজেন্ট বর্তমান মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। অবশ্য পরবর্তী কালে মন্দিরটির সম্প্রসারণ ঘটেছে। চারটি শিখর বিশিষ্ট মন্দিরে আছে শিব লিঙ্গ। মন্দিরের জলাশয় ও বিশ্রামাগারের পূর্বদিকে আছে কয়েকটি সমাধি।

মন্দিরের দশভূজাদেবী বিগ্রহ ছিল স্বর্ণ নির্মিত। উচ্চতা ছিল এক ফুটের মত। রৌপ্য খোচিত কাঠের আসনে দেবী বিগ্রহ স্থাপিত ছিল। ১৯৭৫ খ্রিঃ ২৫ নভেম্বর এই বিগ্রহ চুরি হয়ে যায়। যাবতীয় স্বর্ণ ও রৌপ্যালংকারও অপহৃত হয়। মূর্তি চুরির পর একটি ফটো রেখে নিত্য পূজা হত। ১৯০৮ খ্রিঃ ভাওয়ালের রাজা দেবীর সেবার জন্য দশবিঘা জমি দান করেন। সে সব জমির বেশির ভাগ পরে দখল হয়ে যায়। মন্দিরে নতুন করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয় ১৩৭৮ সালে।

"আজও চৈত্রের শেষ দিবসে বহু হিন্দু নর-নারীর আগমন ঘটে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে। আগমন ঘটে ১লা বৈশাখ, হিন্দু ব্যবসায়ীগণ নতুন হিসেবের খাতা নিয়ে আসে মায়ের মন্দিরে ব্যবসায়ের শুভ মহরৎ তথা সাফল্য কামনায়। তবে আগের দিনে চৈত্র মাসে এই ঢাকেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গনে বিরাট মেলা বসত। বহু রং বেরং-এর দোকানে এ স্থান সরগরম হয়ে উঠত। অগণন পূণ্যার্থী এখানে এসে মন্দির দর্শন করে পূণ্য সঞ্চয় করে বাড়ি ফিরে যেত। হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসী লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ ব্রহ্মার পদতলে আশ্রয় লাভ ও পাপ স্খালনের আশায় চৈত্র মাসের শুক্লাষ্ঠমীতে লাংগলবন্ধে মিলিত হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীতে স্নান করে চির মোক্ষ লাভ করত, আর একই প্রেরণায় দেবী-দুর্গার আর্শীবাদ লাভকল্পে পূণ্যর্থীরা সারা দিন পিপীলিকার

সারির মত বিভিন্ন পথ ধরে নানা দিক থেকে ত্রস্তপদে এগিয়ে আসত ঢাকেশ্বরী মন্দিরের দিকে। এটি ছিল তাদের কাছে সারা বছরের সেরা পর্ব। বহু আশা বহু প্রত্যাশা নিয়ে ঘর থেকে বের হত পূণ্যার্থীরা। চোখে মুখে ফুটে উঠত তাদের প্রাণের ব্যাকুলতা পাপ মোচন করে ফেলার ঐকান্তিক আগ্রহ। অবনত মস্তকে তারা ভগবানের ধ্যান করতে করতে নীরবে এগিয়ে চলত মন্দিরের দিকে। কোন দিকে তাদের মন নেই, আহার নিদ্রা, পথের ক্লান্তির প্রতি ভ্রুক্ষেপ নেই। মনে তাদের প্রবল বিশ্বাস সিদ্ধিলাভ হবেই। এইসব তীর্থ যাত্রী এক একটি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত, প্রতি দলে দশ থেকে বিশ জন। দলে সবাই স্ত্রীলোক। তাদের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য এক একজন মাত্র পুরুষ। গ্রামের মুরুব্বী ধরনের লোক। বহু দূর-দূরান্ত থেকে এমন ভাবে দল বেঁধে আসত তারা। অতি বৃদ্ধ, দুর্বল, লোলচর্ম ও বয়সের ভারে নুব্জ এ রকম বৃদ্ধারও সমাবেশ ঘটত। মন্দিরের নিকটতম ও শহরের বিভিন্ন মহল্লা থেকে যুবকরা আসত স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাজ করার জন্য। দূরে নাগরদোলা বাদ্য ও নানা ধরনের আমোদ-প্রমোদে অনেকে যোগদান করলেও পূণ্যার্থীর অধিকাংশই সেখানে যেত না। তারা মন্দিরের দেবী মূর্তির কাছে গিয়ে পয়সা, ফল-মূল ও অর্ঘ দান করত একান্ত নিবিষ্ট মনে। স্ব স্ব আকুতি ও প্রার্থনা নিবেদন করত এবং মাঝে মাঝে ওম ঢাকা ঈশ্বরী বলে প্রণাম জানাত। আস্তে আস্তে দিন শেষ হলে তীর্থ যাত্রীরা গৃহাভিমুখে রওয়ানা দিত।

"এছাড়া এখানে দুর্গা পূজায় ভিড় হত অনেক। এসকল পুজোয় মহা উল্লাসে পাঠা বলি দেয়া হত। এই দৃশ্য দেখার জন্য মুসলমান ছেলে-ছোকরারা মাঝে মাঝে যেত। আজও এ সকল পুজো পার্বন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পর বহু-হিন্দু ভারতে চলে যাওয়ায় তেমন আকর্ষনীয় হয় না। তেমন ভিড়ও হয় না। আর তেমন জাঁকজমকের মেলাও বসে না। এই ঢাকেশ্বরী মন্দিরের খ্যাতি দেশ বিদেশে আজও অম্লান রয়েছে।[১৪]

"... The development of nationalist sentiment has, in fact, been the means of bringing about a reaction in favour of Hinduism. Not long ago, many famous temples showed by their ruinous condition that no one felt sufficient interest in them to undertake their repair. The Dhakeswari shrine near Dacca, for instance, some years back had lost its old prestige. The buildings were overgrown with jungle and were gradually falling into decay. But, according to Mr. Allen, the author of the "Gazetter of the Dacca District", the pendulum has swung back and "the Hindu religion has profited by the growth of national feeling and tendency to reject the teachings and influences of the west. The Dhakesware temple is no longer buried in jungle and its clean white washed building receive their decent modicum of worshippers and their offerings of goats". The same may be said of many other shrines..."[১৫]

[বর্তমান সংস্করণের ২১৩ পৃঃ দেখুন]

সিদ্ধেশ্বরী মন্দির/আখড়া :

একদা বিখ্যাত ও সুপরিচিত মন্দির ও আখড়া পরিত্যক্ত—ধ্বংসপ্রাপ্ত বলা যেতে পারে। কিংবদন্তী মন্দিরের কালী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চাঁদ রায়। মন্দিরের প্রাঙ্গনে ছিল একটি রক্তচন্দন বৃক্ষ। চারদিকে গাছপালা ছিল অজস্র। সূর্যের আলো ঢোকার পথ ছিল না। একটি বড় পুকুর এবং কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরও ছিল। একে বলা হত মালিবাগের আখড়া। আগে এখানে একমাসব্যাপী একটা মেলা হত। শারদীয় উৎসবে দেবী বিগ্রহের সামনে ঘটস্থাপন করে পূজা হত।

রমনার কালীবাড়ি :

"শহরের উত্তরে রমনার ময়দানে বুড়া শিব ও রমনার কালী প্রতিষ্ঠিত আছেন। বুড়া শিব ঢাকার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দেবতা ; কেহ কেহ বলেন ইনি শঙ্করাচার্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ; ইহা ঠিক হইলে বুড়া শিবের বয়স দেড় হাজার বছর হইবে। রমনার কালী শঙ্করাচার্য সম্প্রদায়ের দশনামী উদাসীন সন্ন্যাসীদের মঠের মধ্যে অবস্থিত ; ইহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম। মন্দিরটি যে রীতিতে গঠিত পূর্ববঙ্গেও সেরূপ মন্দির বেশি দেখিতে পাওয়া যায় না। বহরের নিকট অধুনালুপ্ত রাজাবাড়ি মঠ ও রাজনগরে রাজবল্লভের একুশরত্ন মন্দিরের চূড়া এই ধরনের ছিল। কালী মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটি বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড সাধক ব্রহ্মানন্দ গিরির সিদ্ধাসন বলিয়া পূজা পাইয়া থাকে। প্রবাদ, তাঁহার প্রস্তরাসনখানি লইয়া উমা ও তারা দেবী মিলিয়া ভক্তের সঙ্গে চলিতেন আর লোকে দেখিত যে, ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে প্রস্তরখানি শূন্য দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে।" [১০]

শিখসঙ্গত :

"রমনার কালীবাড়ির পশ্চিমে ফুলার রোডের দক্ষিণে একটি পুরাতন শিখ সঙ্গত আছে। প্রাচীর বেষ্টিত সঙ্গতটির প্রাঙ্গণে বহু শিখ মোহান্তের সমাধি বর্তমান। একটি কক্ষে 'গ্রন্থসাহেব' ও কালো পাথরে অঙ্কিত গুরু নানকের পদচিহ্ন রক্ষিত আছে। প্রাঙ্গণে গুরু নানকের ইন্দারা নামে পরিচিত একটি অষ্টকোণ কূপ আছে ; প্রবাদ, গুরু নানক একবার ঢাকায় আসিয়াছিলেন এবং এই কূপ হইতে জল পান করিয়াছিলেন এবং এই কারণে ইহার জলের রোগ-শান্তির ক্ষমতা আছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস। গুরুমুখীতে লিখিত কূপের একটি প্রস্তর-ফলক হইতে জানা যায় যে, মোহান্ত প্রেমদাস কর্তৃক ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্দারটির একবার সংস্কার হয়। কেহ কেহ বলেন, সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে নবম গুরু তেগ বাহাদুর ঢাকায় আসিয়া এই সঙ্গতটি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহার অনেক শিষ্য হইয়াছিল। কেহ বা বলেন ষষ্ঠ গুরু হর গোবিন্দের সময়ে নথা সাহেব ধর্মপ্রচারের জন্য ঢাকায় আগমন করেন এবং তিনিই এই সঙ্গত প্রতিষ্ঠা করেন ; সঙ্গতটি নথা সাহেবের সঙ্গত নামেও পরিচিত।" [১১]

লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির : *[বর্তমান সংস্করণের ২১৪ পৃঃ দেখুন]*

শহরের নবাবপুর মহল্লায় বসাকদের আদিপুরুষ কৃষ্ণদাস মুচ্ছদ্দি ষোড়শ শতাব্দীর শেষে সুবিখ্যাত নবাবপুরের লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কিংবদন্তী, বিগ্রহটি আগে বার ভূঁইয়ার অন্যতম চাঁদরায়-কেদার রায়ের ছিল। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ জন্মাষ্টমীর মিছিল লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশে কৃষ্ণদাস প্রবর্তিত করেন। মিছিলে বাঁশ ও কাগজ প্রভৃতি দিয়ে দুই-তিনতলা বাড়ির চেয়ে উচ্চ 'চৌকী'গুলি থেকে নানারূপ কৌশলে পৌরাণিক, সামাজিক ও সাময়িক ঘটনাবলীর অভিনয় করা হত। জন্মাষ্টমীর বড় চৌকিটির শিল্পকৌশল ছিল অসাধারণ। বিভিন্ন স্থান থেকে বহু লোক এই মিছিল দেখতে ঢাকায় আসত। জন্মাষ্টমীর মেলা থেকে লোকশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করত মানুষ। লক্ষ্মীবাজারের লক্ষ্মীনারায়ণ, ঠাঠারিবাজারের জয়কালী মন্দির ও পঞ্চরত্ন মঠ ও এক্রামপুরের বীরভদ্রাশ্রমও ছিল বিখ্যাত। বৈষ্ণব-প্রধান নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী ধর্মপ্রচারার্থে ঢাকায় এসেছিলেন তাঁরই নামে বীরভদ্রাশ্রম।

জয়কালী মন্দির :

এই মন্দিরটি ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নবাবী আমলে এই মন্দির নির্মাণ করেন কলকাতার তুলসীনারায়ণ ঘোষ ও নরনারায়ণ ঘোষ। এরা ছিলেন নবাবদের দেওয়ান। মন্দিরে প্রস্তর নির্মিত কালী, ২১টি শিবলিঙ্গ, লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ, ৩টি শালগ্রাম চক্র ও বনদুর্গার বিগ্রহ ছিল। সেবা, পূজা ও অতিথি অভ্যাগতদের ব্যয় নির্বাহের জন্য দেবোত্তর সম্পত্তিও দান করা হয়। মন্দির সংলগ্ন আরও ছিল পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, শিবমঠ, অতিথিশালা। প্রথম সেবায়ত ছিলেন বাঞ্ছারাম ব্রহ্মচারী। পরবর্তীকালে মন্দিরটি অযত্ন ও অবহেলায় নষ্ট

হয়ে যায়। বর্তমানে একচূড়া বিশিষ্ট জয়কালী মন্দির এবং তার পশ্চিমে একটি পঞ্চরত্ন মন্দির আছে। মন্দিরে কোন বিগ্রহ নেই।

রূপলাল হাউস :

এক সময় ঢাকার নবাববাড়ি "আহসান মঞ্জিলের" সঙ্গে পাল্লা দিত "রূপলাল হাউস"। জানা যায় আজ সেখানে মশলাপাতির আড়ত। রূপলাল হাউসের রূপলাল দাসের পূর্বপুরুষ মথুরানাথ দাস ঢাকা আসেন আঠার শতকের শেষে। বাট্টার কারবারে বিত্ত সঞ্চয় করেন। পরে এই কারবার ছেড়ে হুন্ডির কারবার ও ব্যবসা শুরু করেছিলেন। তিনি স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসেন। মথুরানাথের দুই ছেলে স্বরূপচন্দ্র ও মধুসূদন পিতৃ ব্যবসায় জড়িত হয়ে পারিবারিক সম্পদকে বৃদ্ধি করেন। পরে তারা হয়ে ওঠেন ঢাকার প্রতিপত্তিশালী জমিদার। মহাজনি কারবারে প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিলেন তারা। মধুসূদনের তিন ছেলে সনাতন, রূপলাল ও রঘুনাথ। ৬ হেমেন্দ্র দাশ লেনে মথুরানাথ প্রথমে বাড়ি তৈরি করেন, সেই বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করলেও পরে রূপলাল তৈরি করেন রূপলাল হাউস। রঘুনাথের জন্ম ১৮৪৫ খ্রিঃ। কিছুটা লেখাপড়াও শেখেন। ঢাকার প্রখ্যাত ব্যবসায়ী রূপলাল ছিলেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক। লর্ড ডাফরিন ১৮৮৮ খ্রিঃ ঢাকায় এসে রূপলাল হাউসের বল নাচের আসরে যোগ দেন। রূপলাল, মারা যান ১৯১৩ খ্রিঃ। এই পরিবার সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্প ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে সুনাম অর্জন করেন।

মুনতাসীর মামুন লিখেছেন, আরমেনি জমিদার আরাতুনের বাড়ি ছিল রূপলাল হাউসের জায়গায়। রূপলাল সেই বাড়ি কিনে নিয়ে কলকাতার মার্টিন কোম্পানিকে দিয়ে পুনর্নির্মাণ করেন। রূপলাল এবং রঘুনাথের বাড়ি পাশাপাশি ছিল। রূপলাল হাউস নির্মাণে গ্রীক স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করা হয়েছিল। বাড়িটির মাথায় একটা ঘড়ি ছিল যা দেখা যেত নদী থেকে। রূপলালের উত্তর পুরুষরা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পর বাড়ি হস্তান্তর করে কলকাতায় চলে যায়।

সাধনা ঔষধালয় :

গোটা ভারত জুড়ে ছিল সাধনা ঔষধালয়ের খ্যাতি। বাঙালির হাতে গড় এই প্রতিষ্ঠানটি ছিল ঢাকার গর্ব। তা আজও সুনামের সঙ্গে পরিচালিত। ফরিদপুরের অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র ঘোষ প্রতিষ্ঠা করেন সাধনা ঔষধালয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছাত্র যোগেশচন্দ্র ভাগলপুর কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে ঢাকায় এসে এই ব্যবসার সূচনা করেন। তিনি ছিলেন রসায়ন শাস্ত্রের এম. এ.। বিদেশে বহু স্থানে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা ছিল।

আমলীগোলা :

আমলীগোলা অঞ্চলটি মোগল আমলে পরিচিত ছিল বাগ নামে। এই আমলীগোলার নদী তীরে ছিল ধনকুবের ফতেচাঁদ জগৎশেঠের একটি ব্যাঙ্ক। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ছিল এই ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব। ব্যাঙ্ক বাড়িটির চিহ্ন না থাকলেও ভবনের পূর্বদিকের মঠ ও পুকুরের ঘাটটির চিহ্ন দেখা যেত দীর্ঘকাল। ব্যাঙ্ক ব্যবসায় এদের সাফল্য ছিল কিংবদন্তী তুল্য। বহু ব্যবসায়ীর আগমন ঘটত। নদী তীরের ঘাটটি ক্রমশ শেঠের ঘাট নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। কিন্তু পরবর্তীকালে স্থানটি বুদ্ধপাড়া নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। বুদ্ধপাড়া শব্দটি এসেছে আরবের কলহপ্রিয় বুদ্ধদের নাম থেকে। আমলীগোলার স্থানীয় মানুষরা সে সময়ে ছিল কলহপ্রিয়। তাদের এই স্বভাব লক্ষ্য করেই স্থানীয় রসিক ব্যক্তি মোল্লা আবদুল "বুদ্ধপাড়া" নামকরণ করেছিলেন।

রাজা শ্রীনাথ স্ট্রিটের দক্ষিণে ছিল ভাগ্যকুলের জমিদার শ্রীনাথ রায়ের প্রাসাদবাড়ি। স্থানটি ছিল প্রাচীন আমলীগোলার অংশ। জমিদার বাড়ির দক্ষিণদিকের বাগানটিও ছিল বিখ্যাত। এই

বংশের উপাধি ছিল কুণ্ড। একসময় এদের পরিবার চরম দারিদ্র্যে বসবাস করত। কিং দেবী লক্ষ্মীর কৃপায় এদের কোন একজন পূর্বপুরুষের ভাগ্য পরিবর্তন ঘটে। বিপুল ঐশ্বর্য লাভের পর পদ্মাপাড়ে সুবৃহৎ প্রাসাদ বাড়ি নির্মাণ করেন। ধীরে ধীরে সমগ্র এলাকাটি ভাগ্যকুল নামে পরিচিত হয়। ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে এরা রাজা উপাধি পায়। এদের দানধ্যানের খ্যাতি ছিল। কিন্তু এই ধনী পরিবারের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে একসময়। সে সম্পর্কে প্রচলিত জনশ্রুতি হল, একজন অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি রাজবাড়িতে ভিক্ষার জন্য যায়। কিন্তু তাকে কোন ভিক্ষা না দেওয়ায় সে বিষণ্ণ ভাবে ফিরে আসতে থাকে। পথে দেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা হলে তিনি সব জানতে পারেন। তিনি নিজে এক বৃদ্ধার বেশে গিয়ে রাজবাড়িতে অবশ্য ভিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু তদন্ত করে দেখেন, বৃদ্ধ মিথ্যা বলেনি। ক্রুদ্ধ দেবীর অভিশাপে রাজপরিবারের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। প্রমত্ত পদ্মায় ভেঙে যায় রাজবাড়ির অর্ধাংশ। বাকি অংশ লক্ষ্মীঘর নামে পরিচিত ছিল। শেষদিকে বাড়িটি জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে ছিল দীর্ঘকাল। কিন্তু বিপদের আশংকায় জীর্ণ বাড়িটি ভেঙে ফেলা হয়।

ভাগ্যকুলের শেষ জমিদার রাজা শ্রীনাথ রায় পূর্বপুরুষদের মত বিলাসবহুল জীবন যাপন করতেন। ঢাকা শহরের বিবিধ উন্নয়নমূল ক্রিয়াকর্মে তাদের দান কম ছিল না। মিটফোর্ড হাসপাতালের পশ্চিম দিকের প্রধান ফাটকের কাছেই চক্ষুরোগীদের চিকিৎসার জন্য যে লাল ভবনটি আছে, সেটি নির্মাণ করে দেন ভাগ্যকুলের জমিদার পরিবার রাজমাতা শুভদ্রামণি চৌধুরীর স্মরণে। ব্যয় হয়েছিল ত্রিশ হাজার টাকা।

দেশভাগের পর রাজবাড়ি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। স্থানীয় উর্দুভাষীরা বাড়িটি দখল করে, সেখানে উর্দুমাধ্যম "রহমতউল্লাহ মডেল হাইস্কুল" স্থাপন করে। এই রহমত উল্লাহ ছিলেন ঢাকার প্রথম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এস. এম. রহমতউল্লাহ। কিছুকাল বাদেই বিদ্যালয়টি লালবাগ অঞ্চলে উঠে গেলে, পরিত্যক্ত বাড়িটি দুষ্কৃতির আড্ডা কেন্দ্রে পরিণত হয়। পরে অবশ্য ওখানে স্থাপিত হয়েছিল "রহিম বখ্স মেমোরিয়াল হাইস্কুল"। এটিও উঠে যায়।

ঢাকা এক সময় বিখ্যাত ছিল রথযাত্রা ও মেলার জন্য। "বিভাগ পূর্বকাল এখানে রথযাত্রা উপলক্ষে বেশ জমকালো মেলা বসতো। ঢাকা শহরের অন্যান্য অঞ্চলের রথগুলো অপেক্ষা এখানকার রথটি বেশ বড় ও উঁচু ছিল। শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের এই রথযাত্রা উৎসবে বহু এলাকার নারীপুরুষ এই রাজা শ্রীনাথ স্ট্রিটে সমবেত হত। এপথটিতে রথযাত্রা হত বলে রাস্তা এবং মহল্লাটি ঢাকাবাসীর নিকট রথখোলা নামে পরিচিত ছিল। এই রথখোলায় বৈরাগী নামে এক খ্যাতনামা কাবাডি খেলোয়াড় ছিল। সাধারণত ঢাকা শহরের হিন্দুগণ কাবাডি খেলত না। এ যুবকটি আমলীগোলার মুসলমান খেলোয়াড়দের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে চমৎকার ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করত। আজও কাবাডি খেলোয়াড়গণ তার কথা স্মরণ করে। বিভাগের পর হিন্দুরা এখান থেকে ভারতে চলে যাওয়ায় এখানে আর রথযাত্রা উৎসব উদ্‌যাপিত হয় না। কাঠের তৈরি রথটিও বহু বৎসর পড়ে থাকতে থাকতে রাজা শ্রীনাথ রায়ের ভবনটির মতই বিলীন হয়ে গেছে।[১৬]

আমলীগোলার একদিকে বিশ শতকের প্রথমে একটি রাস্তার নামাকরণ হয় হরমোহন শীল স্ট্রিট। হরমোহনের ছেলে ঢাকার অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট অনুকূলচন্দ্র শীল ছিলেন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা। এখানেই ছিল তাদের বাড়ি। তখন স্থানটির পরিচিত ছিল শেখসাহেব বাজার বা লালবাগ রোড নামে।

হরমোহন শীল স্ট্রিট এলাকা ইংরেজ আমলে হিন্দু প্রধান অঞ্চলে পরিণত হলেও, এখানে বহু মুসলমান বসতিও ছিল। বসবাসকারী মুসলমানদের অন্যতম ছিলেন চিরুনী ব্যবসায়ী চাঁদসদাগর ওরফে সদা মিঞা। এখানে ছিল তার চিরুনী নির্মাণ কারখানা। এই অঞ্চলে বসবাসকারী হিন্দুরা প্রধানত কাগজের ব্যবসায় জড়িত ছিল।

"হরমোহন শীল স্ট্রিটের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়িতে দুর্গা পুজোর সময় প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে অত্যন্ত ধুমধামের সঙ্গে দুর্গোৎসব পালন করা হত। বাড়িটিতে প্রতিমা স্থাপন করার মানসে বিশেষ রূপে তৈরি করা হয়েছিল। তজ্জন্য এলাকাবাসী বিশেষ করে মুসলমানরা এ বাড়িটিকে দেবীওয়ালা বাড়ি বলে আখ্যায়িত করত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ থাকলে মুসলমান ছেলে মেয়েরাও দলবেধে দুর্গাপূজা ও প্রতিমা দেখতে যেত নানা স্থানে। ঢাকা শহরের হিন্দু মহল্লার মন্দির আখড়া ব্যতীত বহু বিত্তশালী ব্যক্তি বাড়িতে এরূপ প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে দুর্গোৎসব পালন করত। শারদীয় পূজার কয়েকদিন হিন্দু মহল্লাগুলো আনন্দ উৎসবে মুখরিত থাকত। দশমী বা পূজার শেষ দিবসে প্রতিমা বিসর্জনকালে বহু লোকের কাঁধে পরবর্তীতে ট্রাকে করে তরুণ যুবকগণ নান রং তামাসা ঢাকঢোল করতাল বাজিয়ে ধূপধুনা জ্বালিয়ে নিয়ে যাওয়া হত সদর ঘাটে। অধিকাংশ প্রতিমা বিসর্জনকারী দল সদর ঘাট হতে নৌকায় মিছিল করে তৎপর নদীতে বিসর্জন দিত। আবার কোন কোন মহল্লার নিকটস্থ নদীতে কিংবা পুকুরে প্রতিমা বিসর্জন করা হত। ঢাকার ২/৩টি প্রতিমা বিসর্জন করা হত না। এগুলো নাকি স্বপ্নে নির্দেশিত হয়েছে বিসর্জন না করার জন্যে। এমন একটি আমাদের লালবাগ ঋষি পাড়ায় আছে। দুর্গাপূজার সময় অনেক হিন্দু, মুসলমান প্রতিবেশী বা ব্যবসায়ী সম্বন্ধ যাদের সঙ্গে থাকত, তাদের বাড়ি লাড্ডু (মিষ্টি) পাঠিয়ে দিত। ঢাকার মুসলমানরা দশমীকে দশহরা বলত। আজও অনেক মন্দির ও মহল্লায় দুর্গোৎসব ধুমধামের সঙ্গেই প্রতিপালন হয়ে থাকে।" [১৭]

নাজিমুদ্দিন রোডের উত্তর পাড়ে আছে হোসেনী দালান। সবসময়ে জনসমাগম থাকলে, মহরমে ভিড় হয় সবথেকে বেশি। এক সময়ে আলো দিয়ে সাজান হত এবং গরিবদের খেতে দেওয়া হত। কিন্তু ভবনটি কে নির্মাণ করেছিলেন, তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন নবাব নসরৎজঙ্গ, কেউ বলেন মির মুরাদ। জনশ্রুতি, মির মুরাদ স্বপ্ন দেখেন, ইমাম হোসেন একটি তাজিয়াখানা বা শোকের বাড়ি তৈরি করছেন। তারপর মির মুরাদ বাড়িটি তৈরি করে নাম দেন হোসেনী দালান। দালানের নিচে ছোট ছোট ঘরে আছে কয়েকটি কবর।

ঢাকা যাদুঘর :

ঢাকার অন্যতম আকর্ষণ সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের পশ্চিম দিকে অবস্থিত জাতীয় যাদুঘর। বাঙালি সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান শাহবাগের অন্যতম সংস্কৃতিকেন্দ্র। এখানে সংগৃহীত আছে অজস্র পুরাকীর্তি ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন। বিভিন্ন মনীষীর তৈলচিত্র, চারুশিল্পকর্ম এবং মুক্তিযুদ্ধের নানান সম্পদে সমৃদ্ধ। বর্তমানে যেখানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ, আগে সেখানে ছিল ইংরেজ সরকারের সেক্রেটারিয়েট। সেক্রেটারিয়েটের একটি ছোট ঘরে ঢাকা যাদুঘরের উদ্বোধন করেন লর্ড কারমাইকেল ১৯১৩ সালের ৭ আগস্ট। একবছর বাদে ১৯১৪ সালের আগস্টে যাদুঘরের অধ্যক্ষ হিসাবে যোগ দেন নলিনীকান্ত ভট্টশালী। যাদুঘরের প্রাথমিক পর্বে তাঁর অবদান আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়ে থাকে। ১৯১৫ সালে যাদুঘর সরিয়ে আনা হয় নিমতলীর বারদুয়ারীতে। সেখানে দীর্ঘদিন থাকার পর ১৯৮৩ সালে সরিয়ে আনা হয় শাহবাগের নতুন ভবনে। এই বাড়ির নকশা তৈরি করেছিলেন মাহবুবুল হক। মূল ভবনটির আয়তন ২,১৪,৮৯২ বর্গফুট। এখানে আছে মোট ৩০৯টি কক্ষ। একতলায় ১৮৭, দোতলায় ৩৮, তিনতলায় ৩৭ এবং চারতলায় ৪৭টি কক্ষে সুসজ্জিত রয়েছে সংগৃহীত দ্রব্য। গ্যালারির সংখ্যা হল দোতলায় ২২, তিন তলায় ১৮ এবং চার তলায় ৩টি।

সোহরাওয়ার্দি উদ্যান :

ইংরেজ আমলের ঘোড়দৌড়ের মাঠ—রেসকোর্স ময়দানই আজকের সুপরিচিত সোহরাওয়ার্দি উদ্যান। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ এই ময়দানেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান

ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। উদ্যানের চারপাশে অসাধারণ সব প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাকেন্দ্র। পূর্বদিকে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট, রমনা পার্ক, শিল্পকলা আকাদমি এবং শিক্ষাভবন ; পশ্চিম দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন, চারুকলা ইনস্টিটিউট, বাংলা আকাদমি, আনবিক শক্তিকমিশন এবং ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তন কেন্দ্র ও জাতীয় যাদুঘর ; উত্তরে শিশুপার্ক, বার্ডেম (ডায়বেটিস) হাসপাতাল, ঢাকা ক্লাব এবং টেনিস কোর্ট ; দক্ষিণে তিন নেতার মাজার, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবালয়, শিশু আকাদমি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল ; দক্ষিণ পূর্ব কোণে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ; উত্তর-পশ্চিম কোণে ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন অ্যান্ড রিসার্চ হাসপাতাল।

বাংলা আকাদমি :

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি গবেষণা, বাংলা ভাষার উন্নয়ন, আঞ্চলিক ভাষা সংরক্ষণ, লোক ঐতিহ্য রক্ষা, বাংলা সাহিত্যের উন্নয়নে বাংলা আকাদমির অসাধারণ অবদান বাঙালি মনে রাখবে শাশ্বতকাল। বাংলা আকাদমি প্রকাশিত অজস্র বিষয়ের গ্রন্থ দুপার বাংলায়ই জনপ্রিয়। আগে বাংলা আকাদমি ৭টি পুরস্কার দিত বিভিন্ন বিষয়ের কৃতীদের। এখন দেওয়া হয় ২টি। বাংলা আকাদমি প্রতি বছরই স্বাতন্ত্র চিহ্নিত দুটি মেলার আয়োজন করে। মেলা দুটি হল : ২১ ফেব্রুয়ারি অমর একুশে গ্রন্থমেলা এবং ১ বেশাখের বৈশাখী মেলা।

শিশু আকাদমি :

পুরনো হাইকোর্ট এলাকায় সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দক্ষিণ পার্শ্বে ১৯৭৭ খ্রিঃ ১৫ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয় শিশু আকাদমি। শিশুদের শিক্ষার বিকাশ, তাদের পাঠোপযোগী গ্রন্থ প্রকাশ করে আকাদমি এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে। আকাদমির আছে মাসিক পত্রিকা এবং শিশু পাঠাগার। বার্ষিক আনন্দমেলার আয়োজন করা হয় শিশু ও কিশোরদের জন্য। তাছাড়া আকাদমি জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা শুরু করে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে।

সুপ্রিম কোর্ট :

কার্জন হলের উত্তর দিকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের দুটি বিভাগ আছে : হাইকোর্ট বিভাগ এবং আপিল বিভাগ। আপিল বিভাগ গঠিত হয়েছে ঐ বিভাগে নিযুক্ত বিচারকদের এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে। প্রধান বিচারপতি থেকে অন্যান্য বিচারকদের নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি। ঢাকাতেই সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী কর্মকেন্দ্র হলেও, প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির অনুমতি নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে যেকোন স্থানে কোর্টের কাজ করতে পারেন।

ঈদগাহ ময়দান :

ঢাকার ধানমণ্ডী এলাকায় অবস্থিত ঈদগাহ ময়দানটি আশপাশ থেকে বেশ উঁচু। প্রতি বছর এখানে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ঈদগাহ সংলগ্ন মসজিদে মুসল্লীগণ জুম্মার নমাজে অংশ নেয়। রাজপুত্র শাহ সুজার নির্দেশে ১৬৪০ খ্রিঃ এই ইদগাহ নির্মাণ করেন মীর আবুল কাশেম।

কার্জন হল/হাইকোর্ট বিল্ডিং :

বাংলা ভেঙে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হয় ১৯০৫ খ্রিঃ। গভর্নরের বাসভবন হিসাবে নির্দিষ্ট হয় কার্জন হল। ১৯০৪ সালে নির্মিত কার্জন হল প্রথমে টাউন হল হিসাবে ব্যবহৃত হলেও, বঙ্গভঙ্গ রদের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের কাজ শুরু হয় এখানে। যা এখনও অব্যাহত আছে। বঙ্গভঙ্গের পর নির্মিত হাইকোর্ট বিল্ডিং গভর্নরের বসবাসের অনুপযোগী বিবেচিত হওয়ায় এখানে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের কাজ শুরু হয়। কিন্তু দেশ ভাগের পর এখানে পূর্ব পাকিস্তান সরকার হাইকোর্ট ভবন হিসাবে বাড়িটি ব্যবহার করতে থাকেন। বর্তমানে এখানে রয়েছে প্রতিরক্ষা দপ্তরের সচিবালয়।

বাহাদুর শাহ্ পার্ক :

ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্ক একটি প্রাচীন স্থান। প্রথমে বলা হত আন্ডা ঘর। তারপর নাম হয় ভিক্টোরিয়া পার্ক। এখানে ছিল আর্মেনিয়দের ক্লাব। আন্ডাঘরই আন্টাঘর নামে পরিচিত ছিল। সামনের বড় মাঠটিকে বলা হত আন্টাঘর ময়দান।

বড় ও ছোট কাটরা :

অনেকেই ঢাকার বিখ্যাত ও বড় কাটরা ও ছোট কাটরার নাম শুনেছেন। কাটরা বা কুটেরা। বুড়িগঙ্গা নদীর পূব পাড়ে বড় কাটরা। আর ছোট কাটরা হল বড় কাটরার পূব দিকে। বড় কাটরার স্থাপত্যশৈলী অনন্য। যুবরাজ মুহম্মদ শুজার প্রাসাদ হিসাবে নির্মিত হলেও, শাহজাহানের অপছন্দ হওয়ায় নির্মাণ-তত্ত্বাবধায়ক পীর আবুল কাশিমকে দান করেন। পরে মুসাফির ও বণিকদের সরাইখানায় পরিণত হয়। বড় কাটরায় আছে নানান আয়তনের কক্ষ, আটকোনা উঁচু মিনার—যেখান থেকে গোটা শহর দেখা যায়। ছোট কাটরা সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় ১৬৬৩ খ্রিঃ নির্মাণ করেন শায়েস্তা খান। এখানে আছে একটি অনিন্দ্যসুন্দর মসজিদ।

কমলাপুর রেল স্টেশন :

আগে ফুলবাড়িয়ায় ছিল ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন ও ইয়ার্ড। ১৯৫৮ খ্রিঃ এখান থেকে রেলওয়ে স্টেশন ও ইয়ার্ড সরাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তারপর কাজ শুরু হয়ে যায়। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে কমলাপুর স্টেশনে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান রেলওয়ে জংশন স্টেশন কমলাপুর। রেলপথে দেশের সর্বত্র যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। অসাধারণ স্থাপত্য নিদর্শনে বিশিষ্টতায় চিহ্নিত স্টেশন ভবন।

বিমানবন্দর :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তেজগাঁও-এ সেনাবাহিনীর ব্যবহারের জন্য একটি বিমানক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। যুদ্ধের পর ঐ বিমান বন্দর প্রয়োজনে সরকারি কাজে ব্যবহৃত হত। ১৯৪৭ খিস্টাব্দ পূর্ব পর্যন্ত ঢাকায় বেসরকারি বিমান চলাচলের ব্যবস্থা ছিল না। দেশভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-কলকাতা, ঢাকা-করাচি এবং ঢাকা-লাহোর বেসামরিক বিমান চলাচল শুরু করে। পূর্ব পাকিস্তান এবং নবগঠিত বাংলাদেশে ১৯৭৯ খ্রিঃ ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত এটি ছিল প্রধান বিমানবন্দর। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় আরও বড় আকারের বিমানবন্দর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে কুর্মিটোলায় নির্মিত হয় জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এই বিমানবন্দর চালু হয় ১৯৭৯ খ্রিঃ ২৮ ডিসেম্বর। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসাবে কাজ শুরু করে ১৯৮০ খ্রিঃ ৪ ডিসেম্বর। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নামে এই বিমানবন্দর। দেশের অভ্যন্তরে প্রায় সর্বত্র এই বিমানবন্দর থেকে যাতায়াত করা সম্ভব। স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলাদেশ বিমানের জন্ম ১৯৭২ খ্রিঃ জানুয়ারি মাসে। বর্তমানে তেজগাঁও বিমান বন্দর সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। এখানে বিমান বাহিনীর বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। তেজগাঁও-এর পুরনো বিমানবন্দর ভবনে এখন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অফিস।

ফিরিঙ্গিবাজার : *[বর্তমান সংস্করণের ২৬৪ পৃঃ দেখুন]*

ইছামতীর একটি শাখার পাশে ফিরিঙ্গিবাজার আজও সুপরিচিত স্থান। কিংবদন্তী শায়েস্তা খাঁ-র আমলে এখানে এসে প্রথম বসতি করে পর্তুগিজরা। ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে মোঘল সেনাপতি হোসেন বেগ আরাকানের রাজাকে পরাস্ত করে চট্টগ্রাম দখল করেন। আরাকানরাজের পর্তুগিজ সৈন্যরা মোঘল পক্ষে যোগ দিলে এই স্থানে তাদের বসতি গড়ে ওঠে। একসময় ফিরিঙ্গিবাজার ছিল বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে। ঢাকায় ব্যবসাবাণিজ্যের অধোগতির কারণে পরে পরিণত হয় ক্ষুদ্র গ্রামে। ১৮৩৯ সালেও বেশ কিছু ইটের তৈরি বাড়ি ছিল এখানে।

ইদ্রাকপুর : *[বর্তমান সংস্করণের ২৪৬ পৃঃ দেখুন]*

ইছামতী নদীর তীরে ফিরিঙ্গি বাজারের দক্ষিণে ইদ্রাকপুর আওরঙ্গজেবের আমলে বাংলার শাসন কর্তা মীর জুমলার তৈরি একটি দুর্গ ছিল। বেশি কিছু ইটের তৈরি বাড়ি এবং নদীঘাট ছিল। ১৮৩৯ সালেও দুর্গটির ধ্বংসাবশেষ দেখা যেত।

এ প্রসঙ্গে 'বাংলার ভ্রমণে' উল্লেখ আছে ঃ "শহরের হাজিগঞ্জ ও সোনাকান্দা মহাল্লায় দুইটি পুরাতন গোলাকার জলদুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। মুন্সিগঞ্জের নিকটস্থ প্রসিদ্ধ কলাগাছিয়া সঙ্গমের উপরে ইদ্রাকপুরে ঠিক অনুরূপ একটি জলদুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। ইহাদের মধ্যে সোনাকান্দার দুর্গটি দেখিলে পূর্বাবস্থা বুঝিতে পারা যায়, বর্ষাকালে এখনও দুর্গটির চারিদিকে নৌকাযোগে ঘোরা যায় ; গোল দেওয়ালে একহাত-দুইহাত অন্তর কামান বসাইবার ছিদ্র এবং একটি মুর্চ্চার উপর বড় কামান বসাইবার স্থান। সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বাংলার সুবাদার মীর জুম্‌লা কর্তৃক পতুর্গিজ ও মগ দস্যুদের আক্রমণ হইতে রাজধানী ঢাকা নগরী দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিবার জন্য এই তিনটি দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। এই জাতীয় জলদুর্গ বোম্বাই প্রদেশের থানা জেলা ভিন্ন ভারতবর্ষের আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। হাজিগঞ্জের দুর্গটি পরিধিতে প্রায় দেড় মাইল এবং উহা এখন ঢাকার নবাবদের হাফেজ-মঞ্জিল নামক বাগানের মধ্যে পড়িয়াছে। সম্ভবত মীর জুম্‌লার পূর্বেও এখানে একটি দুর্গ ছিল। প্রবাদ, বার ভুঁইয়ার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ চাঁদ রায়ের কন্যা তথা ঈশা খাঁর পত্নী সোনা বিবি এই দুর্গে থাকিয়া মগদিগের সহিত সবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং নিশ্চিত পরাজয় বুঝিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন।"

সাভার : *[বর্তমান সংস্করণের ৮৭, ২৭৬, ৫৪৬ পৃঃ দেখুন]*

ধলেশ্বরী নদীতীরে অবস্থিত সাভার ছিল ভুইঞা রাজা হরিশচন্দ্রের রাজধানী। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে এই রাজধানীর ধ্বংসস্তূপ দেখা যেত। তখন ছিল জঙ্গলে পরিপূর্ণ। আজ কিন্তু সাভার পরিবর্তিত এক আধুনিক জনপদে। ঢাকা মহানগরী থেকে সাভারের দূরত্ব ২৬ কিমি। ঢাকা-আরিচা সড়কের পাশে নির্মিত হয়েছে জাতীয় স্মৃতিসৌধ। স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মত্যাগী দেশপ্রেমিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতিসৌধের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। নকশা করেন স্থপতি মইনুল হোসেন। সাতটি ফলকযুক্ত স্মৃতিসৌধের উচ্চতা ১৫০ ফুট। এই অসাধারণ শিল্পকর্মটির উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি হুসেনইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৮২ খ্রিঃ ১৬ ডিসেম্বর।

বর্তমানে সাভার একটি থানা এবং থানার সদর। আগে ছিল ঢাকার সদর উত্তর মহকুমার একটি থানামাত্র। সাভারের পূব দিকে মিরপুর ও মোহাম্মদপুর থানা, দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদী, উত্তরে কালিয়াকৈ থানা, পশ্চিমে সিঙ্গাইর ও ধামরাই থানা। সাভারের অন্যতম আকর্ষণ জাতীয় স্মৃতিসৌধ। তাছাড়া আছে একটি বিশাল সরকারি ডেয়ারি ফার্ম, বিভিন্ন সরকারি ও আধা সরকারি অফিস, সেনানিবাস, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আণবিক শক্তি কমিশন, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, পশু প্রজনন কেন্দ্র, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিবিধ সংগঠন।

"ঢাকা হইতে ১৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ধলেশ্বরী ও বংশী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। পূর্বে এই স্থানে সম্ভার বা সম্ভাগ নামে একটি রাজ্য ছিল বলিয়া কথিত ; পরে ইহা সর্বেস্বর নগরী নামে পরিচিত হয়। প্রবাদ, রাজা হরিশ্চন্দ্র পাল মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে এই স্থানে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। সাভারের পূর্বদিকে বলীমোহর নামক স্থানে তাঁহার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। তাঁহার দুর্গটি এখন 'কোঠা বাড়ি' নামে একটি মৃত্তিকা স্তূপ; ইহার মধ্যভাগের একটি গহ্বর হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া সৈন্যগণ নিরাপদে যুদ্ধ করিত। ইহা আধুনিককালের ট্রেঞ্চের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। হরিশ্চন্দ্রের দুই মহিষী কণাবতী ও

ফুলেশ্বরীর নাম হইতে নিকটস্থ কণপাড়া ও ফুলবাড়িয়া গ্রামের নাম হয় ও তাঁহার দুই কন্যা উদুনা ও পদুনার সহিত পোটিকা নগরের রাজা গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া কথিত। কর্ণপাড়ার রাজার 'তাম্বুল বাড়ি' বলিয়া পরিচিত স্তূপটি একটি বিরাট চৈত্যের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনেকে মনে করেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র ৫০টি জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন, উহা আজও 'সাড়ে বার গণ্ডা' নামে খ্যাত। তিনি ধর্মের জন্য স্বীয় পুত্রকে পর্যন্ত বলি দিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। এ অঞ্চলের জঙ্গল মধ্যে খ্রিস্টিয় নবম-দশম শতাব্দীর কারুকার্যখচিত বহু পাথর ও ইটের টুকরা দৃষ্ট হয়। সাভার প্রভৃতি গ্রামে এই কবিতাটি চলিত আছে, —

বংশাবতী পূর্বতীরে সর্বেশ্বর নগরী
বৈসে রাজা হরিশ্চন্দ্র জিনি সুরপুরী ॥"

"সাভার হইতে ৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ও ঢাকা হইতে ২১ মাইল দূরে নান্নার ও সুয়াপুর গ্রামদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত প্রায় অর্ধ মাইল ব্যাপিয়া বাজাসনের ভিটা নামে যে মৃত্তিকা স্তূপটি দৃষ্ট হয়, অনেকের মতে উহা সুপ্রসিদ্ধ বজ্রাসন বিহারের ধ্বংসাবশেষ। দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া স্বনামধন্য দীপঙ্কর অতীশ এই বিহারে শিক্ষালাভ করেন। নাগার্জুন প্রবর্তিত মাধ্যমিক মাহযান সম্প্রদায়ের তান্ত্রিক সাধনায় বজ্রাসন নামে পরিচিত এক আসন আছে।[১৮]

মিরপুরে শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ :

বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর পাকবাহিনী নৃশংসভাবে খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীদের রাতের অন্ধকারে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। বাংলাদেশের মানুষ সেইসব কৃতীদের কথা ভুলে যায়নি। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মিরপুরে নির্মিত হয়েছে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ।

ঢাকা চিড়িয়াখানা :

ঢাকা মহানগরীর ২০ কিমি দূরে তুরাগ নদীর ধারে মিরপুরে ২০৪.৭৬ একর জমির ওপর গড়ে উঠেছে ঢাকা চিড়িয়াখানা। ইংরেজ আমলে ঢাকা শহরে কোন চিড়িয়াখানা ছিল না। দেশভাগের পর পঞ্চাশের দশকে পশুপাখি সংরক্ষণ এবং প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে একটি চিড়িয়াখানা স্থাপনে প্রবল উৎসাহ সৃষ্টি হয় সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে। উপদেষ্টা কমিটিও গঠন করা হয়। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয় জমি অধিগ্রহণের কাজ। নবাবের বাগ মৌজা, গরানচটবাড়ি মৌজা, মহরম বাড়ি মৌজা, সেনপাড়া পর্বতা মৌজা, বিশিল মৌজা থেকে যে ২১১.৪১ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, তার মধ্যে ৬.৬৫ একর জমি চলে যায় তুরাগনদীর পূর্ব পাড়ে বন্যা নিরোধ বাঁধের নিচে। চিড়িয়াখানার ভিতরে দুটি কৃত্রিম লেক ও দুটি কৃত্রিম দ্বীপ তৈরি হয়। প্রাণী বসবাস ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির পর শুরু হয়ে যায় প্রাণী সংগ্রহের কাজ। হাইকোর্ট মাজার সংলগ্ন ছোট চিড়িয়াখানার যাবতীয় প্রাণী নিয়ে আসা হয় নবগঠিত চিড়িয়াখানায়। চিড়িয়াখানার দ্বার জনসাধারণের জন্য মুক্ত করে দেওয়া হয় ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে। চিড়িয়াখানায় পশু হাসপাতাল, বিদ্যুৎ সাবস্টেশন, গুদাম ঘর, তথ্যকেন্দ্র এবং প্রাণী যাদুঘর আছে। প্রাণী যাদুঘরে বিলুপ্ত প্রাণী সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে।

বাংলাদেশ টেলিভিশন :

ঢাকা টেলিভিশনের প্রধান কেন্দ্র রামপুরায়। ১৯৬৪ খ্রিঃ ২৪ ডিসেম্বর তৎকালীন পাক প্রেসিডেন্ট যখন কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন তখন কেন্দ্রটি ছিল ডি আই টি ভবনে। রামপুরার টেলিভিশন কেন্দ্রটি নির্মাণের দায়িত্ব পায় কনসোসিয়েটেস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড। ভবন পরিকল্পনার দায়িত্ব দেওয়া হয় সুইডেনের অধ্যাপক পিটার সেলসিংকে। সঙ্গে ছিলেন মাহবুব-উল-আলম। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের কারণে নতুন ভবন নির্মাণের কাজ বন্ধ থাকে। যুদ্ধের পর

নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং শেষ হয় ১৯৭৫ খ্রিঃ ৬ মার্চ। ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্র থেকে রঙিন চিত্র সম্প্রচার শুরু ১৯৮০ খ্রিঃ। সম্পূর্ণ রঙিন ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় ১৯৮৪ খ্রিঃ থেকে।

সচিবালয় :

দেশের অন্যতম উঁচু বিশতলা ভবন আছে এখানে। ঢাকা জিরো পয়েন্টের কাছে বেশ কয়েকটি বাড়ি মিলে সচিবালয়ের কাজকর্ম চলে। প্রথমে ইডেন গার্লস কলেজের দ্বিতল ভবনে কাজ শুরু হলেও, পরে স্থান সংকুলান না হওয়ায় এই ভবনটিকেই চারতলা করা হয়। তারপর দুটি নয়তলা ভবন এবং বিশতলা ভবনটি নির্মিত হয়েছে।

বিক্রমপুর :

Celebrated as the ancient seat of government under the Hindu Kings of Bengal, from the reign of Vikramaditya up to the time of the overthrow of the dynasty by the Musalmans. The place where the Hindu princes resided is still pointed out as Rampal, a little to the west of Firinghi Bazar. The site of the palace of king Ballal Sen consists of a quadrangular mound of earth, covering an area of about three thousand square feet, and surrounded by a moat about two hundred feet wide. There are no traces of buildings within this enclosed space, but in its vicinity, and in the country for many miles around, mounds of bricks, and wall foundations at a great depth below the surface, are met with, and were formerly used as building materials for the coustruction of houses in the city. Near the site of Ballal Sen's palace there is a deep excavation called Agnikunda, where it is said the last Hindu prince of Bikrampur and his family burned themselves on the approach of the Musalmans. Tradition relates that the Prince, when he went out to meet the invaders of his territory carried with him a messenger pigeon, whose return to the palace was to be regarded by his family as an intimation of his defeat, and a signal to put themselves to death. It appears that the prince gained the victory, but unfortunately, while stopping to drink from the river after the fatigues of the day, the bird escaped from his garment in which it was concealed, and flew to its destination. The Raja hurried home, but arriving too late to avert the consequences of the unhappy accident, he cast himself upon the funeral pile, still smoking with the ashes of his family, and thus closed his dynasty. The large Rajnagar temple on the banks of the Ganges in the Fiscal division of the same name is also an object of interest, and in 1870 was reported to me as in danger of being washed away by the river."[১৯]

রামপাল : *[বর্তমান সংস্করণের ৫৪৬ পৃঃ দেখুন]*

"রামপাল নামক এক প্রকাণ্ড দিঘির পাড়ে, প্রাচীন রাজধানী বিক্রমপুর অবস্থিত ছিল বলে জানা যায়। দিঘিটির দৈর্ঘ্য এক মাইলের তিন চতুর্থাংশ এবং প্রস্থে এক চতুর্থাংশ। এ দিঘির উত্তরে অবস্থিত ছিল বল্লাল বাড়ি বা সেনরাজা বল্লাল সেনের প্রাসাদ। এর ভগ্নাংশ এখন প্রায় ৩০০০ বর্গফুট বিস্তৃত একটি চতুষ্কোণা মাটির ঢিবিমাত্র যা চারদিকে ২০০ বর্গ ফুট বিস্তৃত একটি খালের দ্বারা বেষ্টিত। এই দিঘির প্রায় দেড় কিলোমিটারের মধ্যে অন্যান্য ভবনাদির ভিত্তি এবং ভগ্নাবশেষের চিহ্ন পায়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সত্তর হাজার টাকা

মূল্যের একটি হীরক খণ্ড এ এলাকার একজন চাষী জমি চাষকালে পেয়েছিলেন। বল্লাল বাড়ির অভ্যন্তরে একটি স্থান খনন করে অগ্নিকুণ্ড নামে একটি গভীর গর্ত পাওয়া গেছে। প্রচলিত কাহিনী থেকে জানা যায় বিক্রমপুরের শেষ রাজপুত্র মুসলমানদের আগমনের ফলে নিজেদেরকে স্বপরিবারে অগ্নিদগ্ধ করেন। এই বল্লাল বাড়ির নিকটেই বাবা আদম শহিদের মাজার অবস্থিত। বাবা আদমের মসজিদটির দৈর্ঘ্য ৪৩ ফুট, প্রস্থে ৩৬ ফুট এবং ৬½ ফুট বিস্তৃত এর দেয়াল। এরমধ্যে রয়েছে ৬টি মিনার। বাবা আদম সম্পর্কে অনেক প্রচলিত কাহিনী থাকা সত্ত্বেও তিনি যে একজন দরবেশ বা সাধক ছিলেন সে সম্পর্কে সবাই একমত। তিনি সুদূর মক্কা থেকে এখানে এসেছিলেন, একজন হিন্দু রাজা কর্তৃক একজন মুসলমানের উপর সংঘটিত অবিচারের প্রতিকার করার জন্য। তিনি রাজার হাতে নিহত হলেও এর অল্পদিনের মধ্যেই রাজার পতন ঘটে।"[২০]

...বহুবার এই পরগণার সীমানা পরিবর্তন হওয়ার জন্য ইহার কিয়দংশ বর্তমানে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত হইয়াছে। উত্তরে ধলেশ্বরী নদী, দক্ষিণে ইদিলপুর পরগণা, পূর্বে মেঘনা ও পশ্চিমে পদ্মা—সাধারণত এই চতুঃসীমার অন্তর্গত ভূভাগ বিক্রমপুর নামে পরিচিত। বিক্রমপুরের বহু প্রাচীন কীর্তি লোপ করায় এই অঞ্চলে পদ্মার নাম যে কীর্তিনাশা হইয়াছে। ...বিক্রমপুর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ যে, প্রাচীন-কালে এই স্থানে বিক্রম নামক জনৈক রাজার রাজ্য ছিল।

"মুন্সিগঞ্জ হইতে তিন মাইল পশ্চিমে বিক্রমপুরের প্রাচীন রাজধানী রামপাল অবস্থিত। প্রবাদ অনুসারে, পালবংশীয় নৃপতি রামপালদেবের নাম হইতেই এই স্থানের 'রামপাল' নাম হইয়াছে। বিক্রমপুর অঞ্চলে যে এক সময়ে পাল রাজগণের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, বিক্রমপুরের বিভিন্ন প্রাচীন স্থান হইতে প্রাপ্ত পালযুগের বহু শিল্পদ্রব্য, প্রস্তরমূর্তি ও মৃত্তাকর্য হইতে তাহার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেনবংশীয় নৃপতি বল্লাল সেনের সীতাহাটি তাম্রফলকে 'স খলু শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ' এইরূপ লিখিত আছে। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকে অনুমান করেন যে, এই শ্রীবিক্রমপুর ও বর্তমান রামপাল অভিন্ন।

"মুন্সিগঞ্জের দেড় মাইল উত্তর-পশ্চিমে ধলেশ্বরীর দক্ষিণে কূলে সুপ্রসিদ্ধ গঞ্জ মীর কাদিম অবস্থিত। মীর কাদিম হইতে আর দেড় মাইল পশ্চিম ফিরিঙ্গিবাজার গ্রাম। নবাব শায়েস্ত খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া ফিরিঙ্গি বন্দিদিগকে আনিয়া এই স্থানে বসতি স্থাপন করেন। এখানে একটি পুরাতন রোমান ক্যাথলিক গির্জাঘর আছে।

"বিক্রমপুরের বহু গ্রামে বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবী মূর্তি অনেক আবিষ্কৃত হইয়াছে। বহুকাল ধরিয়া সংস্কৃতচর্চা ও জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনার জন্য বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধি ছিল। বিক্রমপুরের পর নবদ্বীপে পঞ্জিকা প্রস্তুত আরম্ভ হয়। বিক্রমপুরের স্থানীয় সময় উজ্জয়িনী হইতে ইহার দেশান্তর দুই দণ্ড চৌত্রিশ পল ঠিকভাবে গণনা করিয়া পঞ্জিকায় দেওয়া হইত। নবদ্বীপ ও কলিকাতায় পঞ্জিকা প্রস্তুত আরম্ভ হইলে তাহাতে বিক্রমপুরের স্থানীয় সময়ই দেওয়া হয়। আধুনিককালের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বিচারপতি স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ, বিজ্ঞানাচার্য স্যর জগদীশ চন্দ্র বসু প্রভৃতি বাংলার বহু খ্যাতিমান পুরুষ বিক্রমপুরের লোক। বিপ্রকল্পলতিকা নামক গ্রন্থ অনুসারে সেনবংশীয় বিক্রমসেন বিক্রমপুরের প্রতিষ্ঠাতা। এ অঞ্চলের পাতক্ষীর, দই, সন্দেশ ও নারিকেলের জিবা-চিড়ার খ্যাতি আছে। বাংলার শেষ হিন্দু রাজবংশ রামপাল নগরে বহুকাল রাজত্ব করেন। এই স্থানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্রদেবের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। খড়্গবংশের পতনের পর চন্দ্রবংশীয় রাজগণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। শ্রীচন্দ্রদেবের রাজধানী বিক্রমপুরে ছিল। তাঁহার মাতার নাম ছিল কাঞ্চনা। এই তাম্রশাসন দ্বারা শ্রীচন্দ্রদেব পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির নেহকাষ্ঠীগ্রামে পীতবাস গুপ্তশর্মাকে ভগবান

বুদ্ধের উদ্দেশে কিছু জমি দান করেন। "লঘুভারত" গ্রন্থ অনুসারে মহারাজ লক্ষ্মণসেন রামপালে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ বল্লালসেন নির্মিত বলিয়া কথিত একটি বৃহৎ প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা বল্লালবাড়ি নামে পরিচিত। রামপাল দিঘি, বল্লাল দিঘি প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দিঘি এখানে বর্তমান। গত শতাব্দীতে এই স্থানে একজন কৃষক মাটি খুঁড়িতে গিয়া ৭০ হাজার টাকা মূল্যের একখণ্ড হীরক পাইয়াছিল। রামপালের নিকট ধামদ গ্রামে একখানি সোনার পুঁথি পাওয়া গিয়াছিল, ইহার ২৪টি পাতার প্রত্যেকটি ৩০ ভরি ওজনের। রামপাল একটি বিস্তীর্ণ নগরী ছিল; ইহার নিকটস্থ পঞ্চসার, দেওভোগ, বজ্রযোগিনী, সুখবাসপুর, জোড়াদেউল প্রভৃতি বহু স্থানে প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কাহারও কাহারও মতে নালন্দা মহাবিহারের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যক্ষ শীলভদ্র রামপালে জন্মগ্রহণ করেন। রামপালের সেনবংশের পতন সম্বন্ধে কথিত আছে, সেনবংশীয় রাজা দ্বিতীয় বল্লালসেন যখন রাজা তখন একজন মুসলমান প্রজা ফকিরের আশীর্বাদে পুত্র-সন্তান লাভ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য রাজনিষেধ সত্ত্বেও একটি গোহত্যা করেন। এক টুকরা মাংস চিলে রাজপ্রাসাদে নিক্ষেপ করিলে রাজা অনুসন্ধান করিয়া ঘটনার কথা জানিতে পারিয়া মুসলমান প্রজার শিশু-পুত্রটিকে বধ করিতে আদেশ দেন। রাজাদেশে শিশুপুত্র নিহত হইলে শোকসন্তপ্ত পিতা মক্কাশরীফে গমন করেন; তথায় হজরত আদম তাঁহার করুণ কাহিনী শুনিয়া বহু অনুচর লইয়া রামপালের নিকট আসিয়া কয়েকটি গোবধ করেন। সুতরাং রাজা দ্বিতীয় বল্লালের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। কথিত আছে, চৌদ্দ দিন যুদ্ধের পর হজরত আদম যখন সন্ধ্যায় নমাজ পড়িতেছিলেন সেই সময়ে দ্বিতীয় বল্লাল সহসা আসিয়া তরবারির আঘাতে তাঁহাকে হত্যা করেন। যুদ্ধে আসিবার সময়ে দ্বিতীয় বল্লাল সঙ্গে করিয়া একটি শিক্ষিত পারাবত আনিয়াছিলেন এবং পরিবারবর্গকে বলিয়া আসিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে হারিয়া যাইলে তিনি পারাবতটি ছাড়িয়া দিবেন এবং প্রাসাদে উহা পৌঁছাইলে পরিবারবর্গ তাঁহার পরাজয়ের কথা জানিতে পারিবেন। হজরত আদমকে নিহত করিয়া দ্বিতীয় বল্লাল যখন দিঘিতে স্নান করিতেছিলেন, সেই সময়ে পারাবতটি হঠাৎ ছাড়া পাইয়া রাজপুরীতে চলিয়া যায়। রাজ পরিজনের সকলে তখন একটি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন করেন। রাজা তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিয়া মনের দুঃখে নিজেও অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দেন; এই জন্য তিনি পোড়া রাজা নামে পরিচিত। রামপালের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড নামে একটি জলাশয় এখনও বিদ্যমান; উহা খনন করিলে বহু পরিমাণে অঙ্গার পাওয়া যায়। প্রবাদ, এই অগ্নিকুণ্ডেই রাজা দ্বিতীয় বল্লালসেন সপরিবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। রামপালের ঠিক উত্তরে কাজি-কস্‌বা গ্রামের দুর্গাবাড়ি নামক স্থানে আদম শহিদ বা বাবা আদমের মসজিদ ভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। ইহার শিলালেখ হইতে জানা যায় যে, ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইহা সুলতান জালালউদ্দীন ফতে শাহের রাজত্বকালে মালিক কাফুর কর্তৃক নির্মিত হয়। ইহা ঢাকা জেলার প্রাচীনতম মসজিদ; মসজিদের প্রবেশদ্বারের নিকটে দুইটি প্রস্তরস্তম্ভ হিন্দু মুসলমান রমণীগণ কর্তৃক সিন্দুর লিপ্ত হইয়া থাকে। বামপার্শ্বের পশ্চিমে আবদুল্লাপুর ও পাইকপাড়া গ্রামের মধ্যে কানাইচঙ্গের মাঠ নামে একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, এই স্থানে রাজা দ্বিতীয় বল্লালসেনের সহিত মুসলমানদিগের যুদ্ধ কানাইচঙ্গ নামক একজন সৈনিক দ্বিতীয় বল্লালের পক্ষে বিশেষ সাহস ও দক্ষতা প্রদর্শন করেন এবং তাঁহার নাম হইতে যুদ্ধক্ষেত্র কানাইচঙ্গের মাঠ নামে পরিচিত হয়। ইহা আবদুল্লাপুরের যুদ্ধ নামে অভিহিত। কাহারও কাহারও মতে এই যুদ্ধেই দ্বিতীয় বল্লালসেন নিহত হন এবং তাহার পর হইতে পূর্ববঙ্গে হিন্দু রাজত্বের অবসান হয়। আবদুল্লাপুর গ্রামে মহারাজ বল্লালসেন নির্মিত মীরকাদিম খালের উপর একটি পুরাতন সাঁকো আজও বিদ্যমান।[২১]

বিক্রমপুর সম্পর্কে ধনঞ্জয় দাসমজুমদার তাঁর 'বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয়

খণ্ডে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কিছুটা আবেগতাড়িত হলেও, তাঁর বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক তথ্যের কিছু সন্ধান মেলে। তিনি লিখেছেন সমুদ্র থেকে উত্থিত ঢাকার বিক্রমপুর, চন্দ্রপ্রতাপ এবং বরিশাল নিয়ে গঠিত রাজ্যটি দেব বংশের রাজাদের তাম্রলিপিতে 'বিক্রমপুর ও নাব্য রাজ্য' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন রামপাল। তাঁর পূর্বপুরুষ ভারত সম্রাট বীরবিক্রম বা সম্রাট ধর্মপালের নামে স্থাপন করেন বিক্রমপুর রাজ্য এবং রাজধানীর নাম দেন রামপাল। রামপাল তাঁর মাতস্বসা, পুত্র, ভূষণার স্বাধীন রাজা হরিবর্মার বৈমাত্রেয় ভাই শ্যামল বর্মাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। "শ্যামল বর্মাই সম্রাট রামপাল প্রতিষ্ঠিত বিক্রমপুর নাব্য রাজ্যের প্রথম সন্ধিবদ্ধ স্বাধীন রাজা ও বঙ্গের প্রতিরাজরূপে রাজত্ব করেন এবং তাঁহারই বংশধর মন্দা রায় এই রাজ্যের স্বাধীন রাজারূপে ১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের সহিত সন্ধি করিয়া বার ভুঁইয়া নাম ধারণ করেন। সুতরাং শ্যামল বর্মার বংশধরগণ দেব ও রায় উপাধি গ্রহণ করিলেও একমাত্র তাঁহারাই ধারাবাহিকরূপে এই বিক্রমপুর রাজ্যে রাজত্ব করেন ...।' শ্যামলবর্মা রামপালের কাছ থেকে রাজ্য পেয়েছিলেন ১০৮৪ খ্রিস্টাব্দে। শ্যামল বর্মার পর তাঁর পুত্র ভোজবর্মা রাজা হন। এই বংশেরই উত্তরপুরুষ দশরথদেব দনুজমাধব। দনুজ মাধবের পুত্র রামচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপ শাসন করতেন। বিক্রমপুরে রাজা শ্যামল বর্মার রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। তাছাড়া শ্যামল বর্মা ও ভোজবর্মার বহু তাম্রলিপি ও শিলালিপিও পাওয়া গেছে। সোনারগাঁয়ে তাদের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। যতীন্দ্রমোহন রায়ের 'ঢাকার ইতিহাসে' আছে, রাজপ্রাসাদের সামনে পরিখার ওপর ছিল চলন্ত সেতু। এখানে যে বন্দর ছিল, সেই বন্দর থেকেই ইবন বতুতা যবদ্বীপ যাত্রা করেছিলেন। দশরথদেব দনুজ মাধবের বংশধর রাজা মন্দা রায় ওরফে মন্দ্রি রায় বা মুকুট রায় বিক্রমপুরের রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন অন্যতম বার ভুঁইয়া। তাঁর পতন ঘটে মগ-পর্তুগিজ এবং কেদার রায়ের মিলিত আক্রমণে। এই রায় বংশই ছিল ঢাকার নান্না অঞ্চলের বিখ্যাত জমিদার। ইংরেজ আমলের শেষ পর্যন্ত এদের জমিদারি ছিল।

বজ্রযোগিনী : *[বর্তমান সংস্করণের ২৬৫ পৃঃ দেখুন]*

"বিক্রমপুরের রাজধানী রামপাল নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সুপ্রসিদ্ধ বজ্রযোগিণী গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামটিকে একটি ছোটখাট পরগনা বলা যাইতে পারে ; ইহা সাতাইশটি পাড়ায় বিভক্ত। ইহার এক-একটি পাড়া এক-একখানি গ্রামের সমান। এই গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় তিনটি ডাকঘর আছে ; ইহা হইতেই গ্রামখানির বিশালতা অনুমান করা যাইতে পারে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে এই গ্রাম সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের জন্মস্থান। এই গ্রামে ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে বিশিষ্ট বৌদ্ধ জ্ঞানী ও পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ এক রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া কথিত। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণশ্রী ও মাতার নাম প্রভাবতী। বার বছর ধরিয়া দীপঙ্কর সুপ্রসিদ্ধ বজ্রাসন বিহারে অধ্যয়ন করেন। পরে তৎকালের প্রাচ্য বৌদ্ধদের সর্বপ্রধান স্থান সুবর্ণদ্বীপের (ব্রহ্মের পেগু জেলার সুধর্ম নগর—বর্তমান নাম থেটন) মহাসংঘিকাচার্যের নিকট আরও বার বছর অধ্যয়ন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় বৌদ্ধপণ্ডিত দ্বিতীয় ছিল না। মহারাজ নয়পাল তাঁহাকে বিক্রমশিলা মহাবিহারের সর্বাধ্যক্ষ পদে বরণ করেন। তথা হইতে তিব্বতীয়গণ কর্তৃক সনির্বন্ধ অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি তিব্বতে গমন করিয়া তথায় বৌদ্ধধর্ম পুনরুজ্জীবিত করেন। তিব্বতে তাঁহার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তিব্বতে দীপঙ্কর প্রতিষ্ঠিত বজ্রযোগিণী মূর্তির নামকরণ স্পষ্টতই তাঁহার জন্মস্থানের নাম হইতেই হইয়াছে। দীপঙ্কর শতাধিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দান-শ্রীও অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। বজ্রযোগিণী গ্রামে দীপঙ্করের গৃহ এখনও নাস্তিক পণ্ডিতের বাড়ি বলিয়া পরিচিত।" [২২]

রঘুরামপুর/সুখবাসপুর/কামারপাড়ার মঠ :

"রামপালের দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রঘুরামপুর গ্রামে বিক্রমপুরের চাঁদরায় কেদার রায়ের অব্যবহিত পূর্বে রঘুরাম রায় নামে একজন স্থানীয় রাজা ছিলেন। তাঁহার বীর সেনাপতি রাম মালিক পল্লী কবিতায় স্থান পাইয়াছেন—

রাম মালিকের লাঠি। গুলি ফিরে ঝাঁকে।
রঘু রামের মাটি।। রামের লাঠির পাকে।।
উঠলে লাঠির ডাক। মালিক ধরে লাঠি।
দৌড়ে পালায় বাঘ।। যম যেন সে খাটি।।

(ঢাকার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ৪৯৮ পৃষ্ঠা, যতীন্দ্রমোহন রায়)

"রঘুরামপুরের পশ্চিমে সুখবাসপুর গ্রামের দিঘির ধারে রাজা রঘুরায়ের একটি প্রমোদ ভবন ছিল বলিয়া গ্রামটির নাম সুখবাসপুর হয় বলিয়া কথিত। এই গ্রামে একটি সুন্দর তারা মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল।

মুন্সীগঞ্জ হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে সেরাজাবাদ গ্রামে বিক্রমপুরের বাউল সম্প্রদায়ের প্রবর্তক সুধারাম বাউলের আখড়া অবস্থিত। তাঁহার রচিত বহু বাউল সঙ্গীত এ অঞ্চলে চলিত আছে। সেরাজাবাদ হইতে প্রায় ৩ মাইল আরও দক্ষিণে কামারখাড়া গ্রামের উচ্চ মঠটি এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ; এই গ্রামে একটি দিঘির সংস্কারকালে লব্ধ অতি সুন্দর রজত-নির্মিত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী একটি চতুর্ভুজ ত্রিবিক্রম মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। পদ্মের উপর দণ্ডায়মান মূর্তিটি সর্বসুদ্ধ ১৪ ইঞ্চি। দুই পার্শ্বে রজত-নির্মিত লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্তি ; পাদদেশে অষ্টধাতুর গরুড় ও উপরে অষ্টধাতুর চাল বিদ্যমান। বিগ্রহটি সম্বন্ধে নানারূপ অলৌকিক ঘটনার কাহিনী প্রচলিত আছে।" [১৫]

নারায়ণগঞ্জ : *[বর্তমান সংস্করণের ৮৮ পৃঃ দেখুন]*

নারায়ণগঞ্জ বর্তমানে বৃহত্তর ঢাকা জেলার অন্যতম একটি জেলা। মহকুমা গঠিত হয়েছিল ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে। তখন এই মহকুমার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল ঢাকা সদর মহকুমার নারায়ণগঞ্জ, রূপগঞ্জ, রায়পুরা পুলিশ স্টেশন এবং মুন্সিগঞ্জ মহকুমার নরসিংদি এবং বৈদ্যের বাজার পুলিশ ফাঁড়ি। নারায়ণগঞ্জ মহকুমার তখন আয়তন ছিল ৬৪১ বর্গমাইল এবং গ্রামের সংখ্যা ছিল ২,১১৭। মহকুমা গঠনের আগে ১৮৭৬ খ্রিঃ তিনটি ওয়ার্ড নিয়ে গঠন করা হয়েছিল নারায়ণগঞ্জ পুরসভা।

Naraianganj is, after Dacca city, the town of next importance in the District. It is situated on the western bank of the Lakhmia river, at its confluence with the Dhaleswari, and with its bazars extends for about three miles along the river. The town also includes Madanganj, a little lower down on the opposite side of the river. It is in reality a portion of the Narainganj mart, and was established by the merchants of that place, who were pressed for space in the town. In the vicinity of the town are several forts, built by Mir Jumla, and almost opposite stands the Kadam Rasul, a place of some antiquity, and in great repute among pious Musalmans in this part of the country. A stone with the impression of the Prophet's foot upon it is kept in a small mosque surrounded by the huts of religious mendicants, who live on charity bestowed by pilgrims who come to worship this relic. Narainganj is distant from Dacca about nine miles by land, and about sixteen or eighteen miles by water. It possesses steam communication with Calcutta, Assam,

Silhet and Kachar and is a great mart for country produce, as also a depot for boats and boatmen engaged in the inland trade. Within the last fourteen years the trade in country produce has considerally increased in spite of the rivalry of the great Sirajganj mart on the banks of the Jamuna in Pabna District.[২৪]

নারায়ণগঞ্জ তখন ছিল পাটের বড় বাজার। ত্রিপুরা এবং মৈমনসিং থেকে আসত পাট। সেই পাট নারায়ণগঞ্জে প্যাক করার পর চালান যেত কলকাতায়। ১৮৩৮ খ্রিঃ নারায়ণগঞ্জের জনসংখ্যা ছিল ৬৩৫২ ; ১৮৭১ সালে ৬৪০০। নদীর অপরপারে মদনগঞ্জের জনসংখ্যা ছিল ৩০০০। ১৮৭২ সালের সেন্সাসে আসমসুমারিতে পাওয়া যায় মোট জনসংখ্যা ১০,৯১১। তার মধ্যে

হিন্দু	মুসলমান	খ্রিস্টান
পুরুষ ৩৬৮৫	পুরুষ ৩৪০৫	পুরুষ ১১
নারী ১৫১৫	নারী ২২৮৯	নারী ৬
মোট ৫২০০	মোট ৫৬৯৪	মোট ১৭

সব সম্প্রদায়ের মানুষ মিলিয়ে পুরুষ ৭১০১, নারী ৩৮১০, মোট ১০,৯১১।

"নারায়ণগঞ্জ বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী বন্দর, দেশের তৃতীয় বৃহত্তম বন্দর ও প্রাচ্যের ডাণ্ডি। মহকুমা থাকাকালীন সময়ে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিসগুলো ঢাকাতে অবস্থিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে জেলা অফিস নারায়ণগঞ্জ শহর স্থানান্তরিত। ফতুল্লা থানার অন্তর্ভুক্ত কুতুবপুর ইউনিয়নের পাগলা গ্রামে ধ্বংসপ্রায় পাগলাপুল, চলচ্চিত্র নির্মাণ স্টুডিও, সামুদ্রিক মৎস প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প অবস্থিত। এনায়েতনগর ইউনিয়নে ঢাকা ভেজিটেবল অয়েল মিল, যমুনা ও মেঘনা অয়েল মিল পঞ্চবতী গ্রামে অবস্থিত। সিদ্ধিরগঞ্জ থানার সিদ্ধিরগঞ্জ ইউনিয়নে সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন এবং সুমিলপাড়া ইউনিয়নে দেশের বৃহত্তম চটকল আদমজী জুটমিল অবস্থিত। গোদনাইল ইউনিয়নে হাজিগঞ্জ গ্রামে সুবেদার ইসমাইল খান নির্মিত হাজিগঞ্জ কেল্লা ও শায়েস্তা খানের দ্বিতীয় কন্যার মাজার ভগ্নপ্রায় অবস্থায় রয়েছে। সদর থানার পৌরসভার অধীন ৪ নং ওয়ার্ডের পোর্ট রোডে লঞ্চ টার্মিনাল রেল এবং বাসস্ট্যান্ড অবস্থিত।"[২৫]

ঢাকা শহর থেকে ১৯ কিমি দূরে দেশের বৃহত্তম চটকল আদমজী নগর অবস্থিত। সড়ক, নদী ও রেলপথে যোগাযোগ করা যায়। পূব দিকে শীতলক্ষ্যা নদী, উত্তরে সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন এবং পশ্চিম দিকে ডেমরা-নারায়ণগঞ্জ সড়ক। স্যর আদমজী হাজি দাউদের নামানুসারে হয়েছে আদমজীনগর। ১৯৫০ খ্রিঃ স্থাপিত মিলের ১ন ইউনিটে উৎপাদন শুরু হয় ১৯৫১ খ্রিঃ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইউনিটে উৎপাদন শুরু হয় ১৯৫২ এবং ১৯৫৬ খ্রিঃ। একসময় এই মিলে ২৫,০০০ শ্রমিক্ কাজ করত। কিন্তু পাটের বিকল্প হিসাবে সিনথেটিক তন্তুর আবির্ভাবের ফলে প্রতিষ্ঠানটি পরিণত হয়েছে অলাভজনক সংস্থায়। কোটি কোটি টাকা সরকারি ভর্তুকি সত্ত্বেও মিলটিতে প্রাণ সঞ্চার করা সম্ভব হয়নি।

নারায়ণগঞ্জ শহরের পূর্বদিকে শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব পাড়ে বন্দর থানা একটি ঐতিহাসিক স্থান। এখানে আছে সোনাকান্দা ঈশা খাঁর কেল্লা, কদম রসুল দরগাহ, বন্দরশাহী মসজিদ এবং লাঙ্গলবন্ধ তীর্থস্থান। বন্দর থানার উত্তরে সোনারগাঁ, দক্ষিণে ধলেশ্বরী নদী, মুন্সিগঞ্জ সদর থানা, পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদী ও সোনারগাঁ এবং পশ্চিম দিকে শীতলাখ্যা নদী ও নারায়ণগঞ্জ সদর থানা। বেশ কয়েকটি সরকারি কার্যালয় আছে এখানে।

... ঢাকা প্রকাশের পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট আজ একটি সাহেবের স্বাবলম্বন, সহিষ্ণুতা,

চেষ্টা, উদ্যোগ ও পরিশ্রম-সহিষ্ণুতার বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। পূর্ববঙ্গের জ্ঞানী, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, সবমান্য কৃষক সকলেরই মিঃ ডেভিড সাহেবের নাম শুনা আছে। মিঃ ডেভিড অতি সামান্য অবস্থায় দরিদ্রবেশে নারায়ণগঞ্জ আসেন ; তখন নারায়ণগঞ্জ মাত্র একখানা সামান্য মছুয়া বাজার ও সামান্য কয়েক ঘর মুদী তেল, লুন বেচিত, অনেক স্থান জঙ্গলময় ও সামান্য অবস্থার মুসলমান দ্বারা বসবাস ছিল। মিঃ ডেভিড এইরূপ স্থানে কোন সামান্য ধনীর আশ্রয় নিয়া পাটের কারবার খুলেন। এক বৎসর নয়, দুই বৎসর নয়, ক্রমাগত ১০/১২ বৎসর অবিরত পরিশ্রম করিয়া পূর্ববঙ্গে পাটের চাষ প্রচলন করেন। এইরূপ পাটের চাষে চাষারা লাভবান হইয়া ধান, কলাই ইত্যাদি চাষে অবহেলা করিয়া পাটের চাষ বহুল পরিমাণে বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। ঘাটে, মাঠে, বাজারে, বন্দরে, নৌকা ইত্যাদিতে পাটের বেপারীগণ সারি বাঁধিয়া পাটের গান গাহিয়াছিল।

মিঃ ডেভিড আশানুরূপ মালের আমদানি পাইয়া যথেষ্ট লাভ করিতে লাগিলেন ; শীতলক্ষা নদীর এপারে ; ওপারে নারায়ণগঞ্জ, মদনগঞ্জে দালান কোঠা, গোলাবাড়ী ইত্যাদি নির্মাণ করিয়া বাণিজ্যের বহু বিস্তার করিলেন।

উঠিত যথায় দিবাভাগে শিবারব।
লোকে কোলাহলময় হয়েছে তা সব।

মিঃ ডেভিডের যত্ন চেষ্টার ফলে নারায়ণগঞ্জ পূর্ববঙ্গের প্রধান বাণিজ্য স্থান হইয়াছে। এখানে শত শত ইংরেজ বণিক কারবার করিতেছেন, তাঁহাদের অধীনে হাজার হাজার লোকজন কাজকর্ম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। আদালত, ফৌজদারী রেজিষ্টরী অফিস, মিউনিসপালিটী এন্ট্রেন্স স্কুল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নারায়ণগঞ্জ অতি স্বাস্থ্যকর ও পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন স্থান দেখিলে বোধ হয় যেন এখানে চঞ্চলা লক্ষী অচলা হইয়া বসে আছেন। দিবা, রাত্র ট্রেন, ষ্টিমার, কলকারখানার শব্দে ও যাতায়াতের ধুম ধামে দিন কাটিয়া যাইতেছে। যাঁহার প্রসাদে নারায়ণগঞ্জ ও মদনগঞ্জের এত শ্রীবৃদ্ধি সেই মহাত্মা মিঃ ডেভিড কয়েক মাস হইল তাঁহার নিজ বাসস্থান সুদূর ইংলন্ডে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

আজ মিঃ ডেভিড নাই, তাঁহার অতুলকীর্তি পূর্ববঙ্গে পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের দেশে অনেক ধনী, জ্ঞানী আছেন বিদেশের উন্নতি করিবেন দূরে থাকুক নিজের দেশের উন্নতিতে কুম্ভকর্ণ। অনেক স্থানের স্কুল পাঠশালা যত্ন ও সাহায্য অভাবে উঠিয়া যাইতেছে ও যাহা আছে তাহাও গেলাম গেলাম শব্দে ডাক ছাড়িতেছে। এই দারুণ নিদানকালে অনেক ধনীর গ্রামে একটা পুকুরেও জল নাই, জলাভাবে জনপ্রাণী মহাকষ্টে বর্ষার আশায় দিন পিছনে ফেলিতেছে ; জলাভাবে ধোপা কাপড় কাচিতে পারে না, ময়লা কাপড় গ্রামবাসীর অঙ্গের ভূষণ হইয়া কাকের ন্যায় শ্রীবৃদ্ধি ধারণ করিয়াছে। গ্রামবাসীর এই প্রকার কত দুঃখের কথা প্রকাশ করিব? ঢাকা প্রকাশ অনেক দুঃখের কথা অনেক অভাবের কথা পাঠক পাঠিকাদিগকে জানাইয়াছেন কিন্তু কাল-গুণে সকলেই শুনে ও বুঝে অথচ বধির ও হাবা। ইংরেজের ঘেসাঘেসিতে ইংরেজের সদ্‌গুণের পরিবর্তে হ্যাট, কোট, চুরুট নিয়া দিন কাটাইতেছি, তাঁহাদের অনুকরণ না করিবে ততদিন তোমার দেশের গৃহের দারুণ দুর্ভিক্ষ, দুঃখ, দারিদ্র দূর হওয়া সুদূর পরাহত।

শ্রী গিরিশচন্দ্র দাস [২৬]

"কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ পর্যন্ত রেলপথে এবং তথা হইতে স্টিমারে সব সুদ্ধ প্রায় ২৫৯ মাইল দূর। লাক্ষ্যা, শীতলাক্ষ্যা বা শীতল লক্ষ্মী নদীর উপর অবস্থিত এই প্রসিদ্ধ বন্দর হইতে পূর্ব-বঙ্গ রেলপথের মাঝারি মাপের একটি লাইন ঢাকা, টঙ্গী জংশন, ময়মনসিংহ জংশন, সিংহজানি জংশন প্রভৃতি হইয়া ১৪২ মাইল দূরবর্তী বাহাদুরাবাদ পর্যন্ত গিয়াছে। পূর্ব-বঙ্গ রেলপথের ইহা একটি বিচ্ছিন্ন অংশ। নারায়ণগঞ্জ হইতে স্টিমার-পথে একদিকে মুন্সিগঞ্জ,

তারপাশা, ভাগ্যকুল, টেপাখোলা প্রভৃতি হইয়া গোয়ালন্দ ও অপর দিকে চাঁদপুর ও মেঘনা-পথে ভৈরব, সুনামগঞ্জ, ছাতক প্রভৃতি হইয়া শ্রীহট্ট পর্যন্ত যাওয়া যায়।

শীতলক্ষ্যা নারায়ণগঞ্জের ৩ মাইল দক্ষিণে ধলেশ্বরী নদীর সহিত মিশিয়াছে এবং পূর্ব দিকে অল্প কিছুদূর গিয়া পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই মোহনা কলাগাছিয়া নামে খ্যাত। কয়েক মাইল দক্ষিণে গিয়া এই মিলিত জলধারা পদ্মায় গিয়া পড়িয়াছে। ইহার পর হইতে পদ্মা মেঘনা নামেই পরিচিত। শীতলক্ষ্যা সাতখামাইর স্টেশনের ১০ মাইল পূর্বদিকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র হইতে নির্গত হইয়াছে ; উপরের দিকে ইহা বানার নামে পরিচিত ; এককালে শীতলক্ষ্যা পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের প্রধান খাত ছিল। ধলেশ্বরী ময়মনসিংহ জেলার সেলিমাবাদের উত্তরে নূতন ব্রহ্মপুত্র বা যমুনা হইতে উঠিয়া এলাশিন, কেদারপুর, সাভারের পাশ দিয়া বহিয়া আসিয়াছে ; ধলেশ্বরী যমুনা হইতে অনেক পুরাতন নদী এবং ইহার খাত দিয়া এক কালে ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হইত। মেঘনা মণিপুর রাজ্যের উত্তর সীমাস্থ পর্বতশ্রেণী হইতে বাহির হইয়া প্রথমে সুরমা ও পরে মেঘনা নামে পরিচিত হইয়াছে ; নিচের দিকে ইহা ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলার সীমা রক্ষা করিয়াছে। নারায়ণগঞ্জের ৪ মাইল পশ্চিমে বুড়ীগঙ্গা ধলেশ্বরীর পূর্বকূলে আসিয়া মিশিয়াছে ; বুড়ীগঙ্গা সাভার থানার ৪ মাইল দক্ষিণে ধলেশ্বরী হইতে বাহির হইয়া ঢাকা নগরীর পশ্চিমপ্রান্ত বাহিয়া আসিয়াছে ; কালিকাপুরাণে বৃদ্ধগঙ্গা বা বুড়ী-গঙ্গার উল্লেখ আছে ; এককালে ইহা গঙ্গার কোনও খাত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বুড়ীগঙ্গা-ধলেশ্বরী সঙ্গমের ২ মাইল দক্ষিণে বিক্রমপুরের ইছামতী নদী ধলেশ্বরীর পশ্চিমকূলে আসিয়া মিশিয়াছে ; পাবনা, যশোহর, চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি স্থানেও ইছামতী নদী দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এক কালে ইছামতী পুণ্য-সলিলা করোতোয়ার শাখা ছিল ; কার্তিকী পূর্ণিমায় যেমন এখনও করতয়ায় লোকে তীর্থ-স্নান করেন, সেইরূপ বিক্রমপুরে ইছামতীর পঞ্চতীর্থ ঘাটে আজও লোকে উক্ত তিথিতে স্নান করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করেন। এতগুলি নদীর সঙ্গমস্থলের নিকট অবস্থিত বলিয়া নারায়ণগঞ্জ একটি স্বাভাবিক বন্দর।

আন্দাজ ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান নারায়ণগঞ্জটি স্থাপিত হয়। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দেও এখানে একটি বড় লবনের গোলা ছিল এবং তথা হইতে প্রতি বৎসর পাঁচ লক্ষ মণ লবণ আমদানি হইত। তৎকালে চীনা ও মগ বণিকেরা কারবারের জন্য এখানে আসিত। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে নারায়ণগঞ্জ স্বাধীন বন্দর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে নারায়ণগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত হয়। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ১২ মে হইতে নারায়ণগঞ্জ চট্টগ্রাম বন্দরের অধীন বন্দর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। মুসলমান যুগেও নারায়ণগঞ্জ একটি বন্দর ছিল ; তখন ইহার কী নাম ছিল ঠিক জানা নাই। কথিত আছে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী ভিখনলাল ঠাকুর কোনও সন্ন্যাসীর নিকট হইতে পাঁচটি নারায়ণ-চক্র পাইয়া একটি এই স্থানে, একটি পুরাতন ব্রহ্মপুত্র কূলে পঞ্চমী ঘাটে, একটি ইদ্রাকপুরে, একটি ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে ও আর একটি নরসিংহজীর আখড়ায় স্থাপিত করেন। এই বন্দরের আয় হইতে এই পাঁচটি নারায়ণ বিগ্রহের সেবার ব্যবস্থা করেন বলিয়া স্থানটির নাম নারায়ণগঞ্জ হইয়াছে।

নারায়ণগঞ্জ নগর এখন শীতলক্ষ্যার উভয় তীরে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এখানে বহু পাটের কল, ঢাকেশ্বরী ও লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি কাপড়ের কল, কাচের কল ইত্যাদি স্থাপিত আছে। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার পাট এখান হইতে রপ্তানি হয়। শীতলক্ষ্যার পশ্চিমকূলে রেল স্টেশন, হাজিগঞ্জ, ভগবানগঞ্জ, তানবাজার প্রভৃতি মহাল্লা এবং পূর্বকূলে নবীগঞ্জ, সোনাকান্দা, মদনগঞ্জ প্রভৃতি শহরের অংশ অবস্থিত।

প্রসিদ্ধ বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে নারায়ণগঞ্জ কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'আমি প্রথমে যে নারায়ণগঞ্জ দেখিয়াছিলাম, সে নারায়ণগঞ্জ আজ আর নাই। সে নারায়ণগঞ্জ ছিল একটা গ্রাম ও বাজার। আজিকার নারায়ণগঞ্জ হইয়াছে একটা বড়

বন্দর ও শহর। ঢাকা—নারায়ণগঞ্জে তখনও রেল হয় নাই। পাটের গুদাম দুই একটা হইয়াছে। বোধ হয় র‍্যালী ব্রাদার্সের আফিস বসিয়াছে। আর ছাতকের ইংলিস কোম্পানীর বড় একটা আফিস ছিল। নারায়ণগঞ্জে তখন হোটেল ছিল না। কতকগুলি আখড়া ছিল। এই সকল আখড়াতেই যাত্রীরা আশ্রয় ও আহার পাইত। এজন্য যথাসম্ভব প্রণামী দিতে হইত। এই প্রণামীর উপরে প্রসাদের গুণাগুণ নির্ভর করিত। সামান্য প্রণামী দিলে সাধারণ ডাল ভাত মিলিত ; বেশি প্রণামী দিলে উৎকৃষ্ট আতপান্ন, গব্য, ঘৃত, দৈ, সর, দুধ এবং মিষ্টান্ন মিলিত। আখড়ার নাট-মন্দিরে শুইবার স্থান মিলিত। গত পঞ্চাশ বৎসরে ইহার শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে।'

শহরের নবীগঞ্জ মহাল্লায় কদম রসুল বা হজরৎ মহম্মদের পদচিহ্নযুক্ত এক খণ্ড প্রস্তর একটি সৌধ মধ্যে রক্ষিত আছে। বার ভুঁইয়ার অন্যতম প্রধান ভুঁইয়া সুপ্রসিদ্ধ ঈশা খাঁর প্রপৌত্র মানোয়ার খাঁ খ্রিস্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইহা নির্মাণ করেন এবং ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে গোলাম নবী নামক একজন মুঘল কর্মচারী কর্তৃক ইহা পুনর্নির্মিত হয়।

খিজিরপুর : *[বর্তমান সংস্করণের ২৫০ পৃঃ দেখুন]*

'বাংলা ভ্রমণে' উল্লেখ আছে ঃ "নারায়ণগঞ্জের এক মাইল উত্তরে হাজিগঞ্জ মহাল্লার পার্শ্বেই খিজিরপুর গ্রাম। বার-ভুঁইয়ার অন্যতম প্রধান ভুঁইয়া ঈশা খাঁ মশ্‌নদ-ই-আলির রাজধানী এই স্থানে ছিল। কথিত আছে, ঈশা খাঁ রাজপুত বংশীয় হিন্দু ছিলেন এবং মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া সুলতান করবানীর পুত্র বায়াজিদের সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করেন এবং শীঘ্রই প্রতিভাবলে আড়াই-হাজারী সেনানায়ক হন। সুলতান দায়ুদের সময়ে তিনি রাজমহলের যুদ্ধে বিশেষ সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। দায়ুদের মৃত্যুর পর তাঁহার বহু সৈনিক ঈশা খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি পূর্ববঙ্গের সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁওয়ের অন্তর্গত খিজিরপুরে আসিয়া রাজত্ব স্থাপন করেন। শ্রীপুরের সুপ্রসিদ্ধ ভুঁইয়া চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের সহিত প্রথমে বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা সোনামণিকে বিবাহ করায় সেই আঘাতে চাঁদ রায় শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং কেদার রায় প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আজীবন বিদ্বেষবহ্নি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন। ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে ঈশা খাঁ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করায় দিল্লীশ্বর কর্তৃক শাহবাজ খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। শাহবাজ খাঁ বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। অতঃপর মহারাজ মানসিংহ তাঁহাকে দমন করিতে আগমন করেন। ঈশা খাঁ খিজিরপুর হইতে হাঁটিয়া সাতখামাইরের ১০ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত এগার-সিন্ধু দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কথিত আছে, ঈশা খাঁ মানসিংহকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করেন এবং তাঁহার বীরত্বে ও সাহসিকতায় প্রীত হইয়া মানসিংহ তাঁহার সহিত সন্ধি করেন ও বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হন। ঈশা খাঁ তখন মানসিংহের সহিত আগ্রায় গিয়া বাদশাহের নিকট হইতে ২২ পরগনার জমিদারী ও মসনদ-ই-আলি উপাধি প্রাপ্ত হন। খিজিরপুরের একটি উদ্যান-মধ্যে শ্বেত মর্মর প্রস্তরের একটি সমাধি সম্রাট জাহাঙ্গীরের এক কন্যার বলিয়া প্রবাদ। ইহা কাহার সমাধি তাহা ঠিক জানা নাই। খিজিরপুর হইতে ৬ মাইল উত্তর-পূর্বে দেওয়ানবাগ নামক স্থানেও ঈশা খাঁর একটি দুর্গ ছিল, তাঁহার প্রপৌত্র মানোয়ার খাঁর এই স্থানে বাস ছিল। দেওয়ানবাগে একটি মৃত্তিকা-স্তূপ হইতে খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর সাতটি কামান আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলি ঢাকার চিত্রশালায় রক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি কামান সম্রাট শের শাহের ; তৎকর্তৃক আনীত কনস্তানতিনোপল নিবাসী সৈয়দ আহমদ নামক বিখ্যাত কারিগর কর্তৃক ইহা নির্মিত।

বারদি : *[বর্তমান সংস্করণের ২২৯ পৃঃ দেখুন]*

'বাংলায় ভ্রমণে' উল্লেখ আছে ঃ "মেঘনাকূলে নারায়ণগঞ্জ মহকুমার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। নারায়ণগঞ্জ হইতে মেঘনা-পথে ভৈরব হইয়া শ্রীহট্ট যে স্টিমার যায় ঐ পথে বারদি স্টিমার-ঘাট মাত্র ৪ ঘণ্টার পথ। এই গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ সাধক লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রম ছিল। তাঁহার

সম্বন্ধে নানারূপ অলৌকিক ঘটনার কথা শোনা যায়। ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের কোনও গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। কথিত আছে, তাঁহার পিতা বংশের উদ্ধার-সাধন মানসে বালক লোকনাথকে উপবীত দিয়া আচার্য গুরু ভগবান গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে সন্ন্যাস-জীবনের জন্য সঁপিয়া দিয়া চিরতরে বিদায় দেন। তিনি বহুকাল হিমালয়ে তপস্যা করিয়াছিলেন এবং আরবদেশ, ইউরোপ খণ্ড প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। তাঁহার দৃষ্টি এত প্রখর ছিল যে, লোকে তাহা সহ্য করিতে পারিত না। তিনি জাতিস্মর ছিলেন এবং সাময়িকভাবে দেহ ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিয়া পুনরায় দেহে ফিরিয়া আসিতেন বলিয়া কথিত। চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে বারদিতে ৭ দিন ধরিয়া মেলা হয়।"

মুন্সিগঞ্জ : *[বর্তমান সংস্করণের ৮৮ পৃঃ দেখুন]*

"কলাগাছিয়া মোহনার দক্ষিণে নারায়ণগঞ্জ হইতে ৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। নারায়ণগঞ্জ হইতে গোয়ালন্দ ও ভৈরব-শ্রীহট্টগামী স্টিমার এখানে ধরে। ঢাকা জেলার ইহা অন্যতম মহকুমা। শহরের নিকটেই মীরজুমলার ইদ্রাক্‌পুর জলদুর্গের মধ্যে সদর-আলার বাসভবন অবস্থিত। মুন্সিগঞ্জের প্রায় অর্ধ মাইল উত্তরে ধলেশ্বরী কলাগাছিয়া মোহানার দক্ষিণ কূলে সুপ্রসিদ্ধ ও সুবৃহৎ কার্তিক-বারুণীর মেলা বসিয়া থাকে। এ অঞ্চলে এত বড় মেলা আর কোথাও নাই। পূর্বে এই মেলা কার্তিক-পূর্ণিমায় আরম্ভ হইত, এখন কিছু পরে আরম্ভ হইয়া ৩/৪ মাস স্থায়ী হয় ; বহু দূরদেশ হইতে ব্যবসায়ীরা এখানে আসিয়া থাকে। মুন্সিগঞ্জে সম্প্রতি একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

লাঙ্গলবন্ধ : *[বর্তমান সংস্করণের ১৯০, ২৯১, ২৬৩, ৯৮৮ পৃঃ দেখুন]*

'বাংলায় ভ্রমণে' লাঙ্গলবন্ধ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ "নারায়ণগঞ্জ হইতে ৪ মাইল উত্তর-পূর্বে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের কূলে অবস্থিত। চৈত্রমাসে অশোকাষ্টমীর সময়ে দূর-দূরান্তর হইতে বহুলোক এই স্থানে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে আসেন। এ সময়ে দুই-তিন দিন স্থায়ী চৈত্রবারুণী নামে একটি মেলা বসিয়া থাকে ; মেলায় লোকশিল্পের নিদর্শন-স্বরূপ কিছু কিছু দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। অশোকাষ্টমী তিথিতে জগতের সকল তীর্থ, নদী ও সাগর ব্রহ্মপুত্র নদে উপস্থিত হয় বলিয়া কথিত। অনেকে এই সময়ে এক মাস ধরিয়া লাঙ্গলবন্ধে তীর্থবাস করেন ; ইহা প্রয়াগে কল্প-বাসের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

কথিত আছে, পরশুরাম মাতৃহত্যা করিলে তাঁহার কুঠারটি হস্ত হইতে আর বিচ্ছিন্ন হয় না ; তখন পিতার আদেশে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া মাতৃহত্যা জনিত পাপ হইতে মুক্ত হন ও কুঠারটি হস্ত হইতে স্খলিত হয়। তখন তিনি মানবের কল্যাণের জন্য কুঠারটিকে লাঙ্গলরূপে ব্যবহার করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের জলরাশি সমতল ক্ষেত্রে লইয়া আসেন ; কিন্তু এই স্থানে পৌঁছিয়া তাঁহার কুঠার বা লাঙ্গল আটকাইয়া যায়। ব্রহ্মপুত্রকে শীতলক্ষ্যার সহিত মিলিতে নিষেধ করিয়া তীর্থরাজে পরিণত করিবার মানসে পরশুরাম তীর্থযাত্রা করেন। ইতিমধ্যে ব্রহ্মপুত্র পরশুরামের অজ্ঞাতে শীতলক্ষ্যার দর্শনে গমন করেন। খবর পাইয়া শীতলক্ষ্যা বৃদ্ধার বেশে পথিমধ্যে বসিয়া থাকেন। ব্রহ্মপুত্র তাঁহাকেই আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন শীতলক্ষ্যা আর কতদূরে। বৃদ্ধা তখন বলিলেন যে, তিনিই শীতলক্ষ্যা, ব্রহ্মপুত্রের তাণ্ডবে ভীত হইয়া ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া ব্রহ্মপুত্র লজ্জা পাইয়া লাঙ্গলবন্ধে ফিরিয়া গেলেন। তীর্থ হইতে ফিরিয়া পরশুরাম সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া ব্রহ্মপুত্রের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। অবশেষে ব্রহ্মপুত্রের অনুনয়-বিনয়ে শান্ত হইয়া তিনি বলেন যে, বৎসরে মাত্র একদিন অশোককাষ্টমী তিথিতে ব্রহ্মপুত্র নদ তীর্থরাজ হইবে ও ইহার পশ্চিম কূলে স্নান করিলে সকল তীর্থ স্নানের ফললাভ হইবে। ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীরের স্থান পাণ্ডব-বর্জিত বলিয়া কথিত।

"লাঙ্গলবন্ধে জাগ্রত প্রাচীন জয়কালী দেবী ব্যতীত বহু দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন।

স্নানঘাটের নিকট একটি বটতলা প্রেমতলা নামে খ্যাত ; অশোকাষ্টমীর সময়ে বৈষ্ণবগণ এই স্থানে সমবেত হইয়া অহোরাত্র নামকীর্তন করেন বলিয়া ইহার নাম প্রেমতলা। কথিত আছে, পাণ্ডবগণ বনবাস-কালে এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। লাঙ্গলবন্ধ হইতে ৪ মাইল উত্তর-পূর্বে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমকূলে পঞ্চমীঘাট নামক স্থানে তাঁহারা স্নান ও তর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত ; তথায় এখনও যাত্রীরা স্নান ও তর্পণ করিয়া থাকেন। অশোকাষ্টমীর এই স্থানেও লোকে স্নান করিয়া থাকেন।"

তেজগাঁও : *[বর্তমান সংস্করণের ২৫৮ পৃঃ দেখুন]*

যতীন্দ্রমোহনের বিবরণে জানা যায়, তেজগাঁও ষোল শতকেই ব্যবসাকেন্দ্র জনপথ হিসাবে গড়ে ওঠে। নারায়ণগঞ্জ থেকে তেজগাঁও-এর দূরত্ব বেশি। ঢাকা থেকে সরাসরি যাওয়া যায়। সেনাবাহিনী বিমানক্ষেত্র আছে এখানে। তাছাড়া ব্যবসা ও শিল্প কেন্দ্র হিসাবে স্থানটি পরিচিত। বাংলায় ভ্রমণে আছে ঃ "১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি পর্তুগিজ গির্জা এখানে আছে ; গির্জাটি ব্যাণ্ডেলের প্রসিদ্ধ গির্জার অব্যবহিত পরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্থানে ইংরেজ, পর্তুগিজ, ফরাসি ও দিনেমারদের কুঠি ছিল। তেজগাঁও-এ একটি বিস্তৃত সরকারি কৃষিক্ষেত্র আছে। এই কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে ৩৭ ফুট উচ্চ একটি পুরাতন ইষ্টক-স্তম্ভ বিদ্যমান। কাহারও কাহারও মতে ইহা মগদিগের বিজয়স্তম্ভ, অপর মতে ইহা একটি সমাধি-স্তম্ভ। ইহার অনতিদূরে মণিপুর গ্রাম। এই গ্রামে মণিপুর রাজবংশের দেবেন্দ্র সিংহ ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের পর নজরবন্দি ছিলেন ; এই জন্য গ্রামটির নাম মণিপুর হইয়াছে।

টংগি জংশন : *[বর্তমান সংস্করণের ২০৮ ও ৮৭০ পৃঃ দেখুন]*

নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রায় ২৩ মাইল দূরে অবস্থিত। ভৈরববাজার জংশন থেকে আসাম-বাংলা রেলপথের একটি শাখা আসে এখানে। স্টেশনের এক মাইল দক্ষিণে টংগি নদীর ওপর মীরজুমলা একটি সেতু তৈরি করেছিলেন।

ভাওয়াল : *[বর্তমান সংস্করণের ২৮ পৃঃ দেখুন]*

১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে এখানে ৫০০ বাড়ি ছিল। বেশির ভাগ ছিল দেশিয় খ্রিস্টান ও পর্তুগিজদেরই বসতি। একটি রোমান ক্যাথলিক মিশন ছিল ভাওয়াল ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির জমিদার।

'কথিত আছে মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পরে, ঢাকায় কোন কোন স্থান গাজিরা অধিকার করিয়াছিলেন। ঐ জেলার সুয়াপুর গ্রামে প্রান্তবাহী 'কানাই' নদের নাম পরিবর্তন করিয়া ইহারা 'গাজিখালি' নাম দিয়াছিলেন। পাল ও চাঁদ গাজির পুত্র ভাওয়াল গাজির নামানুসারে ঢাকার উত্তরবর্তী ভূ-ভাগের 'ভাওয়াল' নাম হইয়াছে। গাজি-বংশীয় ফজল গাজির পুত্র দৌলত গাজির এক ব্রাহ্মণ দেওয়ান ছিলেন। ইনি বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী গ্রামবাসী এবং ইহার নাম ছিল কুশধ্বজ, দেওয়ানজী বর্তমান জয়দেবপুরের পশ্চিমে চান্দনা গ্রামে গৃহ নির্মাণ করান। কুশধ্বজের পুত্র বলরাম গাজিদের সম্পত্তির নয় আনা অংশ নিলামে ক্রয় করিয়া নবাব সরকার হইতে রায়চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হন, তারপর রাজা উপাধি হয়। বলরামের পরে শ্রীকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, জয়দেব রায়চৌধুরী, গোলোকনারায়ণ রায়চৌধুরী এবং কালীনারায়ণ রায়চৌধুরী যথাক্রমে রাজা হন। কালীনারায়ণ গভর্নমেন্ট হইতে 'রাজা' উপাধি পাইয়াছিলেন। কালীনারায়ণের পুত্র রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন, ইঁহারই দেওয়ান ছিলেন পূর্ববঙ্গের উজ্জ্বলরত্ন রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ। রাজেন্দ্রনারায়ণ ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে স্বর্গীয় হন। তাঁহার তিনপুত্র কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ, কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ এবং কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ— সকলেই স্বর্গীয় হইয়াছিলেন—এই কথাই প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু সম্প্রতি রমেন্দ্রনারায়ণ চিতা-শয্যা হইতে উঠিয়া স্বীয় অধিকারের দাবি করিতেছেন। খবরের কাগজে

এই কথা পড়া যাইতেছে। সে বিচার এখনও শেষ হয় নাই।' (বৃহৎ বঙ্গ-দ্বিতীয় খণ্ড-দীনেশচন্দ্র সেন ১১৩৩-৩৪)

ভাওয়াল জমিদারির অন্তর্গত ছিল একসময়ে প্রাচীন বাজার ও ব্যবসাকেন্দ্র পোড়াদিয়া। বর্তমানে স্থানটিতে বেশ কয়েকটি নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা এবং ব্যাংক রয়েছে। প্রতিবছর এখানে ইসলামী সম্মেলন হয়। পোড়াদিয়ার ৫ কি. মি. পশ্চিমে হাবিজপুর। এখানে আছে হযরত শাহ ইরানির মাজার শরিফ। সম্ভবত এই সাধক মোগল আমলের অন্তিম পর্বে এখানে এসে পৌঁছান ইসলাম ধর্মের প্রচার উদ্দেশ্যে। তিনি এখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার পর একটি বিরাট দিঘির পাড়ে মাজার শরিফ নির্মিত হয়। প্রতি বছর ওরশে বিপুল সংখ্যক ভক্ত আগমন ঘটে।

ভাওয়াল পরগনার জমিদার বংশের বাসস্থান ছিল জয়দেবপুরে। ভাওয়াল মোকর্দমার জন্য ভাওয়ালের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই বংশের বিখ্যাত ও বদান্য জমিদার কালীনারায়ণ রায় ও রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহী ও মুক্তহস্ত বলিয়া পরিচিত। ভাওয়াল রাজবাড়ির বিরাট অট্টালিকা, মন্দিরগুলি ও এই বংশের শ্মশানের স্মৃতিসৌধ বা মঠগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার প্রসিদ্ধ পল্লী-কবি গোবিন্দ দাস ভাওয়ালের অধিবাসী ছিলেন। বাংলার অন্যতম সাহিত্যরথী কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয় একসময়ে এই জমিদারীর প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। বারভূঁইয়ার অন্যতম ফজল গাজি ভাওয়ালের অধিপতি ছিলেন। ফজল গাজি প্রথমে ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলির একজন সহকারী ছিলেন। ফজল গাজির বংশীয়গণ প্রথমে কালীগঞ্জে ও পরে জয়দেবপুর হইতে প্রায় ১৬ মাইল পশ্চিমে মাধবপুর গ্রামে বাস করিতেন ; সেই জন্য মাধবপুর পরে গাজিবাড়ি নামে পরিচিত হয়। এই বংশের দৌলত গাজি মুঘল সরকারে ঠিক মত খাজনা দিতে অক্ষম হওয়ায় মুঘল সরকার তাঁহাদের কাছ হইতে জমিদারি বর্তমান বংশের হাতে অর্পণ করেন।

জয়দেবপুর স্টেশন হইতে প্রায় ২৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ময়মনসিংহ জেলার মীর্জাপুর গ্রাম ও থানা। টাঙ্গাইল মহকুমা হইতে ইহা ১৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। মীর্জাপুরের ২ মাইল দক্ষিণে কাঁটালিয়া গ্রামে প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে বৈদ্যবংশীয় কবি ভবানীপ্রসাদ রায় জন্মান্ধ হইয়াও মার্কণ্ডেয় অনুবাদ করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। মীর্জাপুরের ৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে শাকাসার গ্রামে ৬ ফুট উচ্চ একটি অতি পুরাতন অষ্টকোণ প্রস্তরস্তম্ভ আছে। ইহা এখন সিদ্ধ মাধব নামে পূজা পাইতেছে ; হিন্দুগণ ইহার নিকটে বন্য-বরাহ ও মুসলমানগণ কুক্কুট বলি দিয়া থাকেন। ইহার গাত্রে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলি ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়াছে ; অস্পষ্ট যাহা দেখা যায় তাহা হইতে মুদ্রাসীন ধ্যানস্থ মূর্তি—মস্তকে কিরীট ও কর্ণে কুণ্ডল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। অনেকে মনে করেন এগুলি বুদ্ধ মূর্তি। "ঢাকার ইতিহাস" রচয়িতা যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, ভারতের অন্য স্থানে প্রাপ্ত অশোকস্তম্ভের সহিত এই স্তম্ভের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে এবং শাকাসার হইতে ধামরাই বহু দূর নয় বলিয়া তিনি অনুমান করেন যে, ইহা ধামরাই-এর ধর্মরাজিকা-স্তম্ভ হওয়া অসম্ভব নয়।

ভাওয়ালের প্রসিদ্ধ জঙ্গল ঢাকা জেলার উত্তরভাগ হইতে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমা পর্যন্ত বিস্তৃত মধুপুর জঙ্গলের পূর্বাংশ। পশ্চিমাংশটি কাশিমপুরের গড় বা জঙ্গল নামে খ্যাত। গজারি গাছের প্রাধান্য হেতু এই বনভূমি গড়গজারি নামেও অভিহিত হয়। এই বনে বাঘের অভাব নাই। পূর্বে এই বুনো হাতি পাওয়া যাইত। এই জঙ্গলে ভালো মধু ও মোম পাওয়া যায়।

ভাওয়াল পরগনার অন্তর্গত সুবৃহৎ বেলাই বিলের বর্গফল ৮ বর্গমাইল ; পূর্বে ইহা একটি নদী ছিল এবং স্থানীয় ভূস্বামী খট্টেশ্বর ঘোষ ইহা হইতে ৮০টি খাল কাটিলে ইহা ক্রমে বিলে পরিণত হয় বলিয়া কথিত। স্থানীয় লোকসঙ্গীতেও এই ঘটনা স্থান পাইয়াছে। যথা,—

খাইডা ডোস্কা ছিল রাজা মহাতেজা কায়েতের কুলে।
নানা স্থানে স্থানে শুভক্ষণে পুষ্করিণী কাটিল।
বেলাই বিল শুষ্ক করি নিজ প্রতাপ দেখাইল।
ভাই অদ্ভুত কাহিনী।।

ভাওয়ালের অন্তর্গত নাগরী গ্রামে ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত পতুর্গিজদের একটি গির্জা আছে।

মানিকগঞ্জ : *[বর্তমান সংস্করণের ৮৭০ পৃঃ দেখুন]*

নারায়ণগঞ্জের পরেই গুরুত্বপূর্ণ মানিকগঞ্জ। হান্টারের বিবরণ থেকে জানা যায়—উনিশ শতকের শেষে ধলেশ্বরী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত মানিকগঞ্জ বাজার এলাকা বিস্তৃত ছিল দুই বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে। শুকনো সময় বাদে অন্য সময়ে একমাত্র পরিবহন মাধ্যম ছিল নৌকা। শুকনোর সময় ঘোড়ায়ও চলাচল করা যেত। এখানে বড় ব্যবসা ছিল সরষের তেল এবং তামাকের। আসত রংপুর এবং কোচবিহার থেকে। চালান যেত নারায়ণগঞ্জ এবং কলকাতায়। সে সময়ে জনবসতি কম ছিল না। ১৮৭২ সালে এখানে বাস করত ১১,৫৪২ জন। এর মধ্যে হিন্দু ৬,৩৮১, মুসলমান ৫,১৫৯।

১৯৮৪ খ্রিঃ ১ মার্চ পর্যন্ত মানিকগঞ্জ ছিল ঢাকা জেলার একটি মহকুমা। বৃহত্তর ঢাকা জেলা গঠিত হওয়ার পর মানিকগঞ্জ বর্তমানে একটি জেলা। এই জেলায় অবস্থিত সাতটি থানা হল ঃ মানিকগঞ্জ, সিঙ্গাইর, সাটুরিয়া, ঘিওর দৌলতপুর, হরিরামপুর ও শিবালয়। জেলার উত্তরে টাংগাইল, দক্ষিণ, পশ্চিম ও দক্ষিণ, পশ্চিমে যমুনা ও পদ্মা নদী (নদীর ওপারে পাবনা ও ফরিদপুর জেলা)। পূর্ব, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্বে ধামরাই-সাভার, কেরানিগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ থানা। মানিকগঞ্জ ঢাকার সঙ্গে সরাসরি সড়ক পথে যুক্ত। ঢাকা-আরিচা সড়ক গেছে মানিকগঞ্জের ওপর দিয়ে। তাছাড়া ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গা নদী পথে ঢাকা এবং মানিকগঞ্জের মধ্যে লঞ্চ যাতায়াত করে।

"বর্ধমান মানিকগঞ্জ শহরের গোড়াপত্তন হয় বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। প্রাচীন শহরটি বর্তমান শহর থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে মূল ধলেশ্বরী নদীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত ছিল। ১৮৪৫ সনে মহকুমা ঘোষণার পূর্বে মানিকগঞ্জ বৃহৎ বাণিজ্যিক বন্দর এলাকা হিসেব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। হান্টার শহরের বিবরণ অনুযায়ী, উক্ত বন্দর দুই বর্গ মাইল এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছিল। ... ১৮৫৫ সন থেকে ১৮৬৫ সন পর্যন্ত সময়কালে প্রাচীন মহকুমা সদরের উত্তর পূর্ব প্রান্তের গুরত্বপূর্ণ এলাকা ধলেশ্বরী নদীর স্রোতে বিলীন হয়ে যায়। এর ফলে বাণিজ্য ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নদী তীরবর্তী পূর্ব দক্ষিণাঞ্চলে সরে আসে এবং তা উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত টিকে ছিল। ..." (ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার-১৯৯৩। পৃঃ ৭৯৯)।

বর্তমান মানিকগঞ্জ পুরসভার আয়তন ২৬,২৮ বর্গ কি. মি এবং জনসংখ্যা ৫৮ হাজার। এখানে আছে ২টি সরকারি কলেজ, ১টি বেসরকারি কলেজ, ১টি ল কলেজ, ২টি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ৮টি বেসরকারি বিদ্যালয়, ১৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৯টি মাদ্রাসা, ১৮টি মসজিদ, ৩ টি মন্দির। তাছাড়া সরকারি প্রশাসনিক অফিস, পুরসভা অফিস, জেলা পরিষদ অফিস ও সিভিল সার্জন আফিস রয়েছে।

মানিকগঞ্জর একটি ঐতিহাসিক স্থান ফোর্ড নগরী ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে গেছে। নগরটি গায়ে এখন আধুনিক জীবন যাত্রার প্রভাব। সিঙ্গাইর থানার ফোর্ড নগরীর পত্তন করেছিল আফগান শাসকরা। আবার শতকের মাঝামাঝি সময়ে এখানে এসে বসতি করে পর্তুগীজরা। কোম্পানি আমালের প্রথমে পতুর্গিজরা চলে যায় এখান থেকে।

মানিকগঞ্জের গুরুত্বপূর্ণ নদী বন্দর শিবালয় থানার আরিচা ঘাট ঢাকা থেকে ৮০ কি. মি. দুরে অবস্থিত। শিবালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে যমুনা ও পদ্মা নদী উত্তরে দৌলতপুর থানা, পূর্বদিকে হরিরামপুর ও ঘিওর থানা।

মানিকগঞ্জ থানায় চন্দ্রপ্রতাপ রাজ্যর ধ্বংসাবশেষ ছিল। "দশরথদেব দনুজমাধবের বংশধররা এই রাজ্যের পত্তন করেন। এখানেই ছিল তাদের রাজধানী। 'আইন-ই-আকবর-ই' ও 'আকবর নামার' তথ্যে এই রাজ্যের রাজা 'নবুদ' বা 'মদন রায়' মহারাজ বলির উত্তরাধিকার সূত্রে রাজা ছিলেন বলিয়া আকবর তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া সন্ধিবদ্ধ স্বাধীন রাজারূপে তকশীম জমার অন্তর্ভুক্ত করিয়া বার ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া করিয়াছিলেন। 'বাহারস্থান ঘাইবী' মতে এই নবুদ রায় বা মদন রায় জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বিদ্রোহ করেন, কিন্তু মহারাজ সত্রাজিতের দৌত্যে তিনি পুনরায় মোগলের সন্ধির শর্ত মানিয়া লইয়াছিলেন।' (বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস— ধনঞ্জয় দাস মজুমদার। পৃঃ ২৫৬)। নবুদ রায় মগ, পর্তুগিজ ও কেদার রায়ের মিলিত শক্তির কাছে পরাস্ত হন। পরে রাজ্য উদ্ধার হলেও নবুদ রায় রাজ্য ফিরে পাননি। তিনি পাটগ্রামে ছোটখাট তালুক পেয়েছিলেন। পাটগ্রামের রায়েরা তাঁর বংশধর।

দুরদুরিয়া : *[বর্তমান সংস্করণের ২৫৯ পৃঃ দেখুন]*

At Durduria, situated upon the banks of the Banar, about eight miles above the village of Ekdala, are found the remains of a strong fort, and opposite to it the foundations of a town, both of which, it is said, were built and occupied by the Bhuiya Rajas. Dr. Taylor states that the fort is laid out in the shape of a crescent, bounded by the river. The outer wall is composed of red earth intermixed with clay, and in 1839 was twelve or fourteen feet high. It is upwards of two miles in circuit and is surrounded by a moat about thirty feet broad, but now filled up with earth washed away from the wall and adjacent ground. At some distance with in this rampart there are traces of a second defence of a similar construction; and further on are the remains of a brick-built wall, the extent and figure of which are distinctly marked out by a ridge of earth and loose bricks, and by the foundations of the wall. Like the outworks, it forms the segment of a circle surrounded by a ditch. This enclosure, or eitadel, as it appears to have been has three openings into it, and contains the sites of two buildings, which are some what elevated and stand close upon the banks of the river. The southern site consists of circular mound of bricks, and appears to be the remains of a tower surrounded by a wall with four bastions, the foundations of which are still visible. The figure of the northern site is not so well defined; it exhibits two square elevations, and beyond them the remains of a tank were visible. The fort is known among the natives by the name of the Rani-bari, and is said to have belonged to Rani Bhabani, the last of the line of Bhuiyas, who occupied it at the time of the Muhammadan invasion. Of the city on the opposite side of the river the only vestiges existing in 1839 were mounds and loose bricks scattered over the surface of the lain. They covered a cousiderable extent of ground. About two miles inland there are two magnificent tanks, said to have been dug by the Bhuiya Ragas, of great depth, and in all probability are supplied by springs. Several forts survive at Idrakpur, Hagiganj, Sonakandi, and Sabhar, all of which were coustructed by the Muhammadans to resist the invasious and raids of the Maghs and Portugaese (S.A. of Bengal. vol. v. P 73-74)

ধামরাই : *[বর্তমান সংস্করণের ২১১, ২১৯, ২২১, ২২২, ২২৩, ২৬০ পৃঃ দেখুন]*

বংশী নদী ও বুড়িগঙ্গার সংযোগস্থলের কাছেই ধামরাই। ঢাকার অন্যতম উৎপাদক কেন্দ্র হিসাবে ধামরাই ছিল বিখ্যাত। রেনেলের মানচিত্রে এই অঞ্চলের গণকপাড়া, ঘোরি এবং গোরিয়াপাড়া চিহ্নিত আছে। ডঃ টেইলারের বিবরণ থেকে জানা যায়, মোঘলদের কাছে পরাস্ত হওয়ার পর বহু আফগান এখানে এসে বসতি করে। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে কয়েক বছর আগেও, একটি পাঁচিলের অংশ, উচ্চ প্রবেশ দ্বার এবং মসজিদ দেখা যেত। সম্ভবত, সেগুলি নদী জলে ভেসে যায়। ধামরাই-এ পাঠানতলি নামে একটি গ্রামে ছিল বহু পাঠানের বাস। ইসলাম খাঁ গণকপাড়াকে রাজধানী হিসাবে নির্বাচন করলেও পরে সিদ্ধান্ত বদল করেন। কারণ পার্শ্ববর্তী এলাকা ছিল ভয়ঙ্কর নিচু। তিনি ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন।

এককালে ধামরাই ছিল হিন্দুদের তীর্থস্থানের মত। নানারকম দেব-দেবী মূর্তি মন্দির ছিল। বিশেষ করে যশোমাধব বলদেব ও কানাই, রাধানাথ, মদনোৎসব, বনদুর্গা, বাসুদেব এবং মুসলমানদের পাঁচ পীর ছিল বিখ্যাত। ধামরাই সম্পর্কে 'বাংলায় ভ্রমণ'-এ উল্লেখ আছে ঃ ...পুরাতন কাগজ-পত্রে ধামরাই ধর্মরাজিয়া নামে উল্লিখিত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, সম্রাট অশোক-প্রতিষ্ঠিত ৮৪ হাজার ধর্মরাজিকাস্তম্ভের একটি এই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানে একটি বৃহৎ কারুকার্যখচিত রথ আছে ; ইহা এবং এখানকার যশোমাধব বিগ্রহ মাধবপুরের রাজা যশোপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া কথিত। ধামরাই-এর ৬ মাইল উত্তরে বর্তমান গাজিবাড়ি পূর্বে মাধবপুর নামে পরিচিত ছিল। প্রবাদ, রাজা যশোপাল একবার একদন্ত শ্বেতহস্তী চড়িয়া ভ্রমণকালে ধামরাই গ্রামের এক উচ্চ ঢিবির সম্মুখে আসিলে তাঁহার হস্তী আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহিল না এবং পিছনের দিকে চলিতে লাগিল। তখন রাজাদেশে স্থানটি খনিত হইলে মাধবের মূর্তি ও মন্দির আবিষ্কৃত হয়। যশোপালের নাম হইতে দেবতা যশোমাধব নামে পরিচিত হন। আরও প্রবাদ, পুরীধামের প্রথম জগন্নাথ মূর্তি নির্মাণ করিয়া যে কাষ্ঠ অবশিষ্ট ছিল তাহা দিয়া যশোমাধবের মূর্তি নির্মিত হয়। রথের সময়ে এখানে বৃহৎ মেলা ও সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হয়। এই মেলায় লোক-শিল্পের নিদর্শন কিছু কিছু দ্রব্যাদি দৃষ্ট হয়। যশোমাধবের ভোগ বিনা লবণে প্রস্তুত হয়। যশোমাধব ব্যতীত ধামরাই গ্রামের আদ্যাশক্তি, বাসুদেব ও রাধানাথেরও বিশেষ খ্যাতি আছে। রাধানাথের নিকটে অনেকে চক্ষুপীড়ার শান্তির জন্য মানসিক করিয়া থাকেন। ধামরাই গ্রামে চৈত্রমাসের শুক্লা-ত্রয়োদশী ও পরদিন মদন-চতুর্দশী তিথিতে মদনোৎসব ও কামদেবের পূজা হইয়া থাকে ; একটি কলাগাছ পুতিয়া এবং বহু লোক মিলিয়া ঢোল বাজাইয়া সুর করিয়া ছড়া আবৃত্তি করিয়া কামদেবের পূজা করা হয়। ছড়াটির প্রথম চার ছত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

এই থলিতে আয়রে কামা এই থলিতে আয়।
ধবল পাঠা দিমু তোরে এই থলিতে আয় ॥
লোচা বাচা দিমু তোরে এই থলিতে আয়।
ভাঙ্গ ভুজনা দিমু তোরে এই থলিতে আয় ॥

এ অঞ্চলে শূকর বলি দিয়া বনদুর্গা পূজার প্রথা আছে। কেহ কেহ ইহাকে বৌদ্ধ যুগের চিহ্ন বলিয়া মনে করেন। ধামরাই সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য খ্যাত ; এই স্থানে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ফরাসিদের একটি কুঠি ছিল।"

মেঘনা সেতু :

ঢাকা শহর ২৮ কি. মি. দক্ষিণপূর্ব দিকে সোনারগাঁও-এর কাছে মেঘনা নদীর ওপর নবনির্মিত মেঘনা সেতু। এই সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয় ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৪ মার্চ। শেষ হয় ১৯৯০ খ্রিঃ। জাপান সরকারের অনুদানে ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে সেতুটি নির্মিত হয়। যে কারণে সেতুটির নামকরণ হয়েছে বাংলাদেশ-জাপান মৈত্রী সেতু। সেতুটির সম্পূর্ণ দৈর্ঘ ৯

হাজার ৯৫ ফুট। সেতুর মূল দৈর্ঘ্য ৩ হাজার ৫১ ফুট। ঢাকার দিকে অ্যাপ্রোচ রোড ৩ হাজার ফুট এবং কুমিল্লার দিকে ২ হাজার ৭৯ ফুট। এই সেতুটি নির্মাণের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিস্ময়কর যুগান্তর ঘটেছে। রাজধানী ঢাকার সঙ্গে বন্দর নগরী চট্টগ্রামের সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। আগেকার তুলনায় বর্তমানে অনেক কম সময়েই চলাচল সম্ভব।

সোনারগাঁও : *[বর্তমান সংস্করণের ৪৪, ২৭৯, ৬৪৭ পৃঃ দেখুন]*

একদা বাংলার রাজধানী সোনারগাঁও বা সুবর্ণগ্রাম নারায়ণগঞ্জ জেলায় জেলা সদরের পূর্ব-উত্তর কোনে অবস্থিত। সেন বংশ ১২০৪ সনে লক্ষণাবতী থেকে চলে আসে বিক্রমপুর। ১২৪২ সন পর্যন্ত তারা বিক্রমপুর থেকে শাসন কাজ চালাত। এই সময়ে সোনারগাঁও-র দেবরাজ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিক্রমপুরের সঙ্গে শুরু হয় সংঘাত। ১২৮০ সনে দিল্লির সুলতান সোনারগাঁও দখলের পর পরিণত হয় সমগ্র বাংলার রাজধানীতে। সোনারগাঁও থেকে প্রথম মুদ্রা প্রচারিত হয় ১৩০৫ সনে। ১৩৩৮ সনে ফকরউদ্দীন মোবারক শাহ স্বাধীনতা ঘোষণার পর বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমলের সূচনা হয় এবং সোনারগাঁও স্বাধীন রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ সিংহাসন আরোহন করে ১৩৫৩ সনে। সে সময় থেকে ১৫৮৯ সন পর্যন্ত গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ-র রাজত্বকাল পর্যন্ত (১৫৮৯ সন) ছিল সোনারগাঁও স্বাধীন বাংলার রাজধানী। বার ভুইয়ার ঈশা খাঁ ষোলশতকের দ্বিতীয়ার্ধে সম্রাট আকবরের বাহিনীকে পরাস্ত করেন। মোঘল সুবাদার ইসলাম খাঁ পরাস্ত করেন ঈশা খাঁর পুত্র মুসা খানকে। তারপর থেকে ঢাকা পরিণত হয় সুবে বাংলার রাজধানী। সোনারগাঁও থেকে শুরু হয়েছিল শেরশাহের গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড।

[সোনারগাঁও সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য আছে দে'জ পাবলিশিং প্রকাশিত স্বরূপচন্দ্র রায়ের 'সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থে।]

সোনারগাঁ সম্পর্কে ডবলু হান্টারের বিবরণে আছে ঃ "Sonargaon, the ancient Muhammadan capital of the District, now called Painam, is situated about two miles inland from the Brahmaputra Creek, in a grove of areca, tamarind, mango and other trees, which completely hide the village from view until within a few yards of it. In the dry season it is approached by narrow winding foot paths, but during the rains it is partially inundated, and is almost inaccessible except by small boats or by elephant or on horseback. The village, which has a bad name for unhealthiness, consisted in 1839 of two narrow streets of straw huts, and some well-built brick houses of two and three stories high. Surrounding it is a deep muddy ditch, originally excavated as a moat. Upon an old bridge across the ditch are the remains of gateway, which in former times was closed every night, and no person allowed either to enter or leave the place till the following morning. In the vicinity of the village are the ruins of several mosques and hamlets probably residences of the early Musalman Governors. Dr. Hamilton, who visited the District some years before Dr. Taylor wrote his work, was informed by the natives that the ancient Sonargaon had been carried away by the river, and that it had stood on the opposite side of the Meghna. Dr. Taylor believed this to be a mistake. He says that in the vicinity there had been no encroachment of the river, but, on the contrary, an accession of soil by the filling up of the Brahmaputra Creek, which was originally the main channel

of that river. The city on the opposite sitde of the Meghna was not Sonargeon, but Sripur, which stood in Bikrampur Fiscal Division, and was destroyed by the Kirtinasa river. Sonargaon, although celebrated as a seat of trade and the Musalman metropolis of Eastern Bengal, does not appear to have ever had any pretensions to architectural grandeur. Fitch who visited the place in 1586, gives the following account of it:— "Sonargaon is a town six leagues from Serripur, where there is the best and finest cloth made in all India. The houses here, as they be in most parts of India, are very little, and covred with straw, and have a few mats round about the walls, and the door to keep out the tigers and the foxes. Many of the people are very rich. Here they will eat no flesh, nor kill no beast. They live on rice, milk, and fruits. They go with a little cloth before them, and all the rest of the body is naked." In 1839, when Dr. Taylor wrote, the weaving of muslin was still the chief occupations of inhabitants, and in this village maintained the same reputation which it enjoyed in the time of Abul Fazl and Fitch. A great proportion of the weavers were Musalmans, engaged in manufacturing the *Jamdani* or flowered fabrics a considerable quantity of which was annually exported to different part of the countury. (A Statistical Account of Bengal. vol. V–W. W. Hunter P. 71-72)

সোনারগাঁয়ের বিভিন্নস্থানে আছে নহবৎ খানা, খাজাঞ্চি খানা, গোলাবাড়ি, জালালুদ্দিন ফতে শাহর মসজিদ (১৪৮৪ খ্রিঃ নির্মিত), মোঃ কামেল মান্না শাহর সমাধি, প্রাচীন ইসলামি আকাদমি, হজরত মোহাম্মদ ইউসুফের সমাধি ও মসজিদ, পানাম নগর, পংখীরাজ সেতু।

পানাম : *[বর্তমান সংস্করণের ১০৩ পৃঃ দেখুন]*

একদা বিখ্যাত স্থানটি এখনও অস্তিত্ব নিয়ে বর্তমান। রাজধানী ছিল রামপাল। বেশ কয়েকটি ধর্মস্থান ছড়িয়ে ছিল যার কিছু এখনও দেখা যায়। সম্পন্ন বহু হিন্দু পরিবারের বসবাস ছিল এখানে। 'বাংলায় ভ্রমণ'-এ উল্লেখ রয়েছে ঃ "নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রায় ৮ মাইল পূর্বদিকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মধ্যস্থলে পানাম গ্রামটি আজ জঙ্গলাকীর্ণ হইলেও পূর্বকালে প্রসিদ্ধ সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁও নগরী এই স্থানে অবস্থিত ছিল ; গড় ও প্রাকারের ভগ্নাবশেষ এখনও এই স্থানে দৃষ্ট হয়। প্রবাদ, মহারাজ জয়ধ্বজের সময়ে, এই অঞ্চলে সুবর্ণ বৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া এই স্থান সুবর্ণগ্রাম নামে পরিচিত হয়। ইহা একটি বিস্তৃত ভূখণ্ড ছিল, ইহার উত্তরের ছিল পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, পূর্বে আড়িয়লখা (বাকরগঞ্জ জেলার এই নামে বড় নদী আছে) ও মেঘনা এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা। মহম্মদ বিন বখ্তিয়ার খিল্‌জী কর্তৃক গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী অধিকৃত হইলে সেনবংশীয় রাজগণ প্রায় ১২০ বৎসর পর্যন্ত বিক্রমপুরের রামপাল ও সুবর্ণগ্রামে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পশ্চিম হইতে নবাগত মুসলমানগণের ও দক্ষিণ-পূর্ব হইতে আরাকানের মগগণের বার বার আক্রমণে সেনরাজগণ ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়েন এবং খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গ মুসলমান অধিকারে আসে। মধুসেন ও দনুজমাধব বা দনুজরায় ব্যতীত সুবর্ণগ্রাম তথা পূর্ববঙ্গের অপর স্বাধীন হিন্দু রাজার ঐতিহাসিক প্রমাণ বিশেষ নাই। মুসলমান যুগে রামপালের অবনতি ও সোনারগাঁও-এর বিশেষ উন্নতি হয়। ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইহা পূর্ববঙ্গের মুসলমান শাসকগর্ণের রাজধানী ছিল এবং এই স্থানে টাকশাল প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে আহোম, মগ ও পর্তুগিজদের উৎপাত নিবারণার্থে বাংলায় রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত

হয়। তখন হইতে পূর্ববঙ্গের শাসনকেন্দ্রও ঢাকায় অবস্থিত হয়। খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ইবন বতুতা সোনারগাঁও আগমন করেন এবং তথা হইতে যবদ্বীপগামী একটি বাণিজ্য-পোত দেখিয়াছিলেন। ফকরুদ্দীন এই সময়ে সোনারগাঁও-এর সুলতান ছিলেন। ইবন বতুতা রাজপ্রাসাদ বিশেষ সুদৃঢ়ভাবে রক্ষিত দেখিয়াছিলেন, আজিও পরিখার উপরের একটি পুরাতন পুলের সম্মুখে তোরণদ্বারের ভগ্নচিহ্ন দেখিতে পাওয়া। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে ভ্রমণকারী র‍্যালফ ফিচ্ এই স্থানে আগমন করেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন সোনারগাঁও-এর কাপাস-বস্ত্র ভারতবর্ষের মধ্য সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার সময়ে সোনারগাঁও-এর রাজা ছিলেন ঈশা খাঁ। পাঠান যুগে সোনারগাঁও হজরত-ই-জালাল নামে অভিহিত হইত। চীন সম্রাট লুইতি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পলাতক হইলে তাঁহার শত্রুপক্ষ তাঁহার পশ্চাতে পশ্চিম মহাসাগরে যাত্রা করিয়া সোনা-উরকং ও পান-কো-লো নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন বলিয়া লিখিত আছে। সোনা-উরকং ও পান-কো-লো সোনারগাঁও ও বাংলা বলিয়া অনুমিত হয়।

পানামের নিকটেই সোনারগাঁওয়ের অন্তর্গত মগরাপাড়া গ্রামে মগ দিঘি নামক একটি জলাশয়ের তীরে গৌড়রাজ গিয়াস-উদ্দিন আজমশাহের সুন্দর কারুকার্য খচিত কষ্টিপাথরের সমাধি বিদ্যমান। সম্ভবত পূর্ববঙ্গের রাজধানী সোনারগাঁও-এ অবস্থানকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। সমাধির সিকি মাইল পশ্চিমে বাঘালপুর গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে পাঁচ পীরের দরগাহ নামে পাঁচটি দরগাহের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এগুলি গয়েসদি, সমসদ্দি, সিকন্দর, গাজি ও কালু নামক পাঁচজন যোদ্ধ্ ফকিরের নমাজের স্থান বলিয়া কথিত। এ অঞ্চলে মাঝি-মাল্লারা নদী পারাপারের সময়ে পীর বদরের সহিত পাঁচ পীরের নাম লইয়া থাকে। মগরাপাড়ায় পীর শাহ আবদুল আলা বা পোকাই দেওয়ানের সমাধি বিশেষ পবিত্র গণ্য হয়; প্রবাদ, ইনি ১২ বছর জঙ্গলের মধ্যে গভীর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন, আহারাদি করিতেন না এবং তাঁহার চারিদিকে প্রকাণ্ড উইঢিবি গড়িয়া উঠিয়াছিল। মগরাপাড়ার নিকটে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র কূলে পোড়ারাজা বা দ্বিতীয় বল্লাল সেন কর্তৃক নির্মিত একটি পাথরের রথের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহার গাত্রে নানারূপ কারুকার্য খোদিত আছে। প্রবাদ, রথ-দ্বিতীয়ার দিন একশত ব্রাহ্মণ রথটিকে টানিয়া লইয়া যাইতেন; কিন্তু অন্য কোনও দিন বহুশত লোকে মিলিয়াও ইহাকে নড়াইতে পারিত না। পানামের নিকটে গোয়ালদি গ্রামে গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের রাজত্বকালে ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে মোল্লা আকবর খাঁ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদ আছে। ইহা সোনারগাঁও-এর প্রাচীনতম মসজিদ। ঘোর লাল রঙের ইট দিয়া মসজিদটি নির্মিত এবং তিনটি গম্বুজের মধ্যকারটি নীল মর্মর প্রস্তরের। পানামের নিকটে আমিনপুর গ্রামে ক্রোড়ী বাড়ি বলিয়া একটি ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। ইহা মহারাজ বল্লাল সেনের সেনাপতি বংশীয় বলরাম দাস নামক, মুসলমান রাজাদের জনৈক কোষাধ্যক্ষের বাটি বলিয়া পরিচিত। পানামের নিকটস্থ ঝিনারদি গ্রাম পূর্বে দীনার দ্বীপ নামে অভিহিত হইত বলিয়া কথিত। দীনার দ্বীপের ষষ্ঠীবর সেন ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন কৃত রামায়ণ, মহাভারত ও পদ্মপুরাণের প্রাচীন পুঁথি পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে পাওয়া যায়। ষষ্ঠীবরের গুণরাজ খাঁ উপাধি ছিল। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—'ষষ্ঠীবরের রচনী সংক্ষিপ্ত সরল ও পরিপক্ক, কিন্তু তৎপুত্র গঙ্গাদাসের রচিত পদ্যচঞ্চলও সুন্দর, তাহা বেশ চিত্তাকর্ষক; তত সংক্ষিপ্ত নহে কিন্তু বিস্তৃত হইয়াও মনোরম।"

নরসিংদি : *[বর্তমান সংস্করণের ১৫৬ পৃঃ দেখুন]*

নরসিংদি জেলার পূর্বে মেঘনা নদী, পশ্চিমে রূপগঞ্জ, উত্তরে শ্রীপুর থানা এবং দক্ষিণে আড়াই হাজার থানা। জেলার আয়তন ১,১৬৯ বর্গ কি. মি.। থানার সংখ্যা ৬। জনসংখ্যা ১৭, ১০,১২৮ জন (১৯৯১)। প্রধানত কৃষিপ্রবণ এলাকা। কৃষি জমির পরিমাণ ২, ১২, ৫১২ একর। নরসিংদি পুরসভার আয়তন ১০.৩২ বর্গ কি. মি। জনসংখ্যা ১,৭৫,০০০ জন

(১৯৯২)। পুরসভার দক্ষিণে মেঘনা নদী, উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদী, পূর্বে হাড়িধোয়া নদী এবং পশ্চিমে ঢাকা-সিলেট বিশ্বরোড। ঢাকা-দৌলতকান্দি রেললাইন টংগি হয়ে নরসিংদির ওপর দিয়ে চলে গেছে। নরসিংদি রেল স্টেশনটি দেশের অন্যতম ব্যস্ততম স্টেশন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, কিশোরগঞ্জ, নোয়াখালি সহ বিভিন্নস্থানে ট্রেনে যাতায়াত করা যায়। লঞ্চ টার্মিনাল হল কাউরিয়া পাড়ার বাউলপাড়া ঘাটে। নরসিংদি পুর এলাকায় ৩০টি মসজিদ, ৫টি মন্দির আছে। মন্দিরগুলির অন্যতম হল গোপীনাথ জিউ-এর মন্দির এবং ভাগবত আশ্রম।

নরসিংদি জেলার বেলাব থানার রাজারবাগ গ্রামে কাচা লোহার খনি আছে। একটি উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র। এখানকার ঐতিহ্যময় গ্রাম ব্রহ্মপুত্র তীরে অবস্থিত নারায়ণপুরে আছে একটি বড় বাজার। স্থানীয় জমিদার লক্ষ্মীনারায়ণের নাম অনুসারে গ্রামটির নাম। গ্রামটি শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চায় অগ্রণী। গ্রামের উত্তরাংশ বৃহৎ বাজারে পরিণত হলেও উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ, প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। জামে মসজিদ অন্যতম ধর্মচর্চা কেন্দ্র। নারায়ণপুর বাজারের পাশ দিয়ে গেছে ঢাকা-সিলেট রোড। সড়ক এবং নৌ যোগাযোগের ফলে জেলার রায়পুরা থানা সদর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ঢাকার সঙ্গে সরাসরি রেল ও নৌপথে সংযুক্ত।

বর্তমান নরসিংদি জেলার প্রাচীন সমৃদ্ধ গ্রাম পাঁচদোনা সম্পর্কে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে প্রিয়বালা গুপ্তার "স্মৃতিমঞ্জুষা" গ্রন্থে। এই গ্রামে নবাব আলিবর্দি খাঁর দেওয়ান দর্পনারায়ণ রায় বসতি স্থাপন করেন। প্রিয়বালা রায়পরিবারের উত্তরসূরী। তিনি লিখেছেন ঃ "আমার পিত্রালয় ঢাকা জেলার অন্তর্গত পাঁচদোনা গ্রামে। ...তাঁদের আদি পূর্বপুরুষ ছিলেন দেওয়ান দর্পনারায়ণ রায়। তিনি নবাব আলিবর্দি খাঁর সময়ে মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে একটি উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। ...তিনি পূর্ব বাংলায় দূর পল্লীগ্রামে নিজের পছন্দমতো জায়গা বেছে নিয়ে পাঁচ একর জমির উপর তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করলেন। তিনি তাঁর দুই ভ্রাতা, আত্মীয় পরিজন এবং ব্রাহ্মণ, শূদ্র, কায়স্থ, আচার্য, শাঁখারি, রজক, ক্ষৌরকার, কুম্ভকার ইত্যাদি বারোজাতের সমন্বয়ে রাজকীয়ভাবে 'পঞ্চদ্রোণ' বা পাঁচদোনা গ্রামের পত্তন করলেন। পথের পাশে বিরাট দিঘি—এ-পারের মানুষ ও-পার থেকে চেনা যায় না। তার পূর্বদিক ঘেঁষে উঠল রকমারি দ্বিতল দালান, কোঠাবাড়ি পঞ্চরত্ন দোলমঞ্চ, দুর্গাবাড়ি, শিবালয়, দেবমন্দির। হাটবাজার, লোকজনের কোলাহলে সবসময় গ্রামখানা শহরের মত গমগম করত। দোল, দুর্গোৎসব, বারোমাসে তেরো পার্বনে দেওয়ান বাড়ির সিংহদরজা সবার জন্য উন্মুক্ত।

কালপ্রবাহে দেওয়ান পরিবারের সমৃদ্ধি একদিন ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। স্থানটিও পরিত্যক্ত হয়। প্রিয়বালা লিখেছেন ঃ "শরতের লঘুপক্ষ মেঘখণ্ডের মত মনের আকাশে কত স্মৃতির আনাগোনা। ছোটবেলায় যখন বাবার সাথে বাবার পিতৃভূমিতে বেড়াতে যেতাম তখন চোখে পড়ত দেওয়ান রায়ের ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত নানা শিল্প অলংকৃত ভগ্নপঞ্চরত্ন, দোলমঞ্চ, বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ-সমাকীর্ণ পাঁচদোনাকে। সেই ভগ্নস্তূপের আনাচে-কানাচে মন আমার ঘুরে বেড়াত। কতদিন ভাঙ্গা সিঁড়ি দিয়ে অতিকষ্টে দোতলায় উঠে যেতাম, ঘরে ঘরে কীসের আশায় ঘুরে বেড়াতাম, কিন্তু কিছুই পেতাম না। শুধু দেখতাম উপরের ছাদ ভেদ করে বিশাল বটগাছ দোতলার অর্ধেকটা দখল করে নিচের তলায় তার শিকড়ের আসন বিস্তার করে চলেছে। পঞ্চরত্নের পাঁচটি গম্বুজের নিচে ছিল প্রাসাদের দেউড়ি। দু'পাশে ভোজপুরী দারোয়ানদের ঘর। দু'পাশে গলির মত লম্বা, টানা দু'টো ঘর ছিল। ভীষণ অন্ধকার। সেখানকার সঙ্গীরা বলত, ও দু'টোর ভিতরে দু'টো কুঁয়ো আছে। প্রজারা খাজনা না দিয়ে বিদ্রোহী হলে ওই কুঁয়োর ভিতর তাদের ফেলে দেওয়া হত। ভয়ে আর ওমুখো হতাম না। বিরাট বিরাট সব অট্টালিকা। কোনটার শুধু জানালা সমেত একটা দেওয়াল ; কোনটায় শুধু চারপাশের দেওয়াল ক'খানা ; কোন জায়গায় বিরাট পাকা উঠোনটা মাটির নিচে অনেকখানি নেমে গেছে। কোথায় কারা থাকতেন কিছুই ভেবে কূল পেতাম না। ভূমিকম্পের পর যা

হোক করে মাটি আর মুলিবাঁশের বেড়া দিয়ে বড় বড় ঘর তৈরি করে মানুষ আবার জীবনযাত্রা শুরু করেছিল। সেসময় করোগেটেড টিন ছিল না। খড়ের ছাউনি দেয়া বাঁশ ও বেতের সুন্দর সুন্দর কারুকার্য খচিত ঘরবাড়িগুলি নতুন সাজে সেজে উঠল। ভূমিকম্পের ক্ষতি সবাই ভুলে যেতে চেষ্টা করল। এমনিভাবে পাঁচশ ঘরের পত্তন হলো। কিন্তু খুব বেশিদিন সুখভোগ করা গেল না। একদিন দুপুর বেলা রান্না করার সয়ম কেমন করে নাজানি মস্ত কড়াইয়ের তেলে আগুন লেগে যায়। সেই আগুনের লেলিহান শিখা ঘরের চাল স্পর্শ করল। আর যায় কোথায়? চালায়-চালায় ঘর। মহা উৎসাহে আগুন এঘর থেকে ওঘরে, ওঘর থেকে আর এক ঘরে বহ্নুৎসবে মেতে উঠল। সেটা নাকি ছিল জ্যৈষ্ঠ মাস। চারিদিকে জলের হাহাকার, মানুষ জ্ঞানহারা হয়ে ছুটোছুটি করে শুধু বিশৃঙ্খলারই সৃষ্টি করল, আগুন নেভান আর হল না। সুসমৃদ্ধিশালী পাঁচদোনা ভস্মস্তূপে পরিণত হল। শুধু জায়গায় জায়গায় ভূমিকম্পের সাক্ষীস্বরূপ প্রাচীর ইত্যাদি ধোঁয়া-কালির আবরণে আবৃত হয়ে বড় বড় দৈত্যের মত এখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। সেই থেকে পাঁচদোনার মানুষের সুখের সংসার ভাঙ্গন ধরল। বহুলোক নিজ নিজ বসত বাড়ি ছেড়ে ভিন্ন জায়গার সন্ধানে চলে গেলেন।..." (স্মৃতিমঞ্জুষা—প্রিয়বালা গুপ্তা। পৃঃ ৩-৬)-এরপর বসতি গড়ে ওঠে পাঁচদোনার কাছাকাছি আমদিয়া, পাকুড়িয়া, মাত্‌রা, ভাটপাড়া এবং কাছাকাছি অন্যগ্রাম নির্ভর করে।

ঢাকার মসজিদ :

মসজিদ নগরী হিসাবে পরিচিত ঢাকার মসজিদগুলি কয়েকটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলিকে বিন্যস্ত করা হল এইভাবে ঃ

১. সুলতানি আমলে নির্মিত মসজিদ ঃ

১.	বিনত বিবির মসজিদ	—	নারিন্দা
২.	শাহী মসজিদ	—	লক্ষ্মীবাজার
৩.	বাবা আদমের মসজিদ	—	রামপাল
৪.	মুয়াজ্জেম মসজিদ	—	মুয়াজ্জেমপুর
৫.	গোয়ালদি মসজিদ	—	গোয়ালেদি

২. মোগল আমলে নির্মিত মসজিদ ঃ

৬.	চুড়িহাট্টা মসজিদ	—	ইসলামপুর
৭.	জামে মসজিদ	—	চকবাজার
৮.	শাহবাজের মসজিদ	—	রমনা উদ্যান
৯.	আম্বরের মসজিদ	—	তেজগাঁও
১০.	আল্লাকুরীর মসজিদ	—	কাটাজোর (মুহম্মদপুর)
১১.	সাতগম্বুজ মসজিদ	—	"
১২.	লালবাগদুর্গ মসজিদ	—	লালবাগ
১৩.	বিবি মরিয়মের মসজিদ	—	হাজিগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
১৪.	কারতালাব খানের মসজিদ	—	বেগমবাজার
১৫.	মিরধার মসজিদ	—	
১৬.	মুসাখানের মসজিদ	—	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৭.	মগরাপাড়া মসজিদ	—	মগরাপাড়া
১৮.	সিতারা বেগমের মসজিদ	—	সিংটোলা
১৯.	তারা মসজিদ	—	বংশাল
২০.	কসাইটুলি মসজিদ	—	কসাইপট্টি
২১.	মিরপুর মাজার মসজিদ	—	

২২. ইসলাম খাঁ জামে মসজিদ	—	নয়াবাজার
২৩. আগামাসি লেন মসজিদ	—	
২৪. আগাসাদেক রোড মসজিদ	—	
২৫. বংশাল জামে মসজিদ	—	
২৬. শায়েস্তা খানের মসজিদ	—	
২৭. শাহী মসজিদ	—	বেগমবাজার

৩. ইংরেজ আমলে নির্মিত মসজিদ ঃ

২৮. জামে মসজিদ	—	বাবুবাজার
২৯. জামে মসজিদ	—	গুলশান
৩০. জামে মসজিদ	—	বনানী
৩১. জামে মসজিদ	—	কলুটোলা
৩২. জামে মসজিদ	—	কারকুন বাড়ি লেন
৩৩. ছোট দায়রা শরীফ মসজিদ	—	আজিমপুর
৩৪. কাকরাইল মসজিদ		
৩৫. জামে মসজিদ	—	ছুবহানবাগ
৩৬. জামে মসজিদ	—	বনানী

৪. পাকিস্থান আমলে নির্মিত মসজিদ ঃ

৩৭. জামে মসজিদ	—	উত্তর বাড্ডা
৩৮. জামে মসজিদ	—	নিউ ডি.ও. এইচ. এস.
৩৯. মাজার মসজিদ	—	তেজগাঁও স্টেশন রোড
৪০. জামে মসজিদ	—	পিয়ার বাগ
৪১. পীরজঙ্গী মাজার মসজিদ	—	মতিঝিল কলোনি
৪২. বায়তুল মুকাররম মসজিদ	—	ঢাকা শহর
৪৩. জামে মসজিদ	—	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪৪. জামে মসজিদ	—	আরজাবাদ
৪৫. জামে মসজিদ	—	আজিমপুর এস্টেট

৫. বাংলাদেশ আমলে নির্মিত মসজিদ ঃ

৪৬. আর্মি ইঞ্জিনিয়াস মসজিদ	—	
৪৭. ক্যান্টনমেন্ট কেন্দ্রিয় মসজিদ	—	
৪৮. জামে মসজিদ	—	নাবিক কলোনি
৪৯. জামে মসজিদ	—	উত্তর গুলশান
৫০. কেন্দ্রিয় মসজিদ	—	গুলশান অ্যাভেনিউ
৫১. জামে মসজিদ	—	তেজগাঁও পলিটেকনিক গভঃ হাইস্কুল
৫২. বায়াতুল আতিক মসজিদ	—	পশ্চিম নাখালপাড়া
৫৩. মসজিদ বায়তুশ শরফ	—	এয়ারপোর্ট রোড (ঢাকা)
৫৪. কলাবাগান মসজিদ	—	কলাবাগান (মিরপুর রোড)
৫৫. দারুছ ছালাম মসজিদ	—	

৬. উল্লেখযোগ্য মাজার ও কবর ঃ

১. শাহজালাল দাখিনির কবর	—	বঙ্গভবন অঙ্গন
২. শাহ আলী বাগদাদীর মাজার	—	মিরপুর
৩. মালিক পির ইয়েমেনির মাজার	—	সচিবালয়ের দক্ষিণ-পূর্বে

৪.	পিরজঙ্গী মাজার	কমলাপুর রেলস্টেশনের উত্তর-পশ্চিমে
৫.	শাহ আবদুর রহিমের কবর	লক্ষ্মীবাজার
৬.	শাহনুরীর কবর	মগবাজার
৭.	শাহ মর্তুজা	আবুল হাসনাত রোড
৮.	সুফি মোহাম্মদ দাইমের দায়রা শরিফ	আজিমপুর
৯.	শাহ সাহেবের কবর	পরিবাগ
১০.	দারা বেগমের কবর	মোহম্মদপুর
১১.	শাহবাজের কবর	সোহরাওয়ার্দি উদ্যান
১২.	আমিরুদ্দীনের মাজার ও মসজিদ	বাবুবাজার ব্রিজের পূর্বে বুড়িগঙ্গা তীরে
১৩.	দারুল হাবিব খানকা শরিফ ও মসজিদ	হাবিবনগর

১. বঙ্গবৃত্তান্ত—অসীমকুমার রায়। পৃঃ ১৮-১৯
২. সাংস্কৃতিক ইতিহাসেব প্রসঙ্গ—ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার। প্রথম খণ্ড। পৃঃ ১৮৬-৮৮
৩. ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯৩। পৃঃ ৭৬০
৪. Statistical Account of Bengal Vol V. W. W. Hunter p.66-67
৫. বাংলায় ভ্রমণ—অখণ্ড সংস্করণ। পৃঃ ২৭৩-২৭৪
৬. বৃহৎবঙ্গ—দীনেশচন্দ্র সেন। পৃঃ ১১৩৬
৭. ঢাকা প্রকাশ, ৩০ মে ১৮৮০ খ্রিঃ
৮. Statical Account of Bengal, Vol V W. W. Hunter. p.67
৯. বাংলায় ভ্রমণ—অখণ্ড সংস্করণ। পৃঃ ২৬৯-২৭২
১০. বাংলায় ভ্রমণ—অখণ্ড সংস্করণ। পৃঃ ২৭৩
১১. বাংলায় ভ্রমণ—অখণ্ড সংস্করণ। পৃঃ ২৭৩
১২. বাংলায় ভ্রমণ—অখণ্ড সংস্করণ। পৃঃ ২৭২
১৩. কিংবদন্তীর ঢাকা— নাজির হোসেন। পৃঃ ৩৪৯-৩৫০
১৪. কিংবদন্তীব ঢাকা— নাজির হোসেন। পৃঃ ৩৫২-৩৫৩
১৫. The Statesman--25th February 1931
১৬. কিংবদন্তীর ঢাকা— নাজির হোসেন। পৃঃ ৪৫০
১৭. কিংবদন্তীর ঢাকা— নাজির হোসেন। পৃঃ ৪৫১-৫২
১৮. বাংলায় ভ্রমণ—অখণ্ড সংস্করণ। পৃঃ ২৭৭-২৭৮
১৯. Statical Account of Bengal Vol. V. p.70-71
২০. ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯৩। পৃঃ ৮০৩-০৪
২১. বাংলায় ভ্রমণ—অখণ্ড সংস্করণ। পৃঃ ২৬৬-২৬৮
২২. বাংলায় ভ্রমণ—অখণ্ড সংস্করণ। পৃঃ ২৬৮
২৩. বাংলায় ভ্রমণ—অখণ্ড সংস্করণ। পৃঃ ২৬৮-২৬৯
২৪. Statical Account of Bengal Vol. V. p.69
২৫. ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯৩। পৃঃ ৭৯০-৯১
২৬. ঢাকা প্রকাশ, ১৫ এপ্রিল ১৮৯৪
২৭. বাংলায় ভ্রমণ—অখণ্ড সংস্করণ। পৃঃ ২৬৩

১০. ঢাকা জেলার লোকসঙ্গীত ছড়া ● ধাঁধা



রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান

১

বল বল, অ সুবল ভাই,
কেমন আছে বিধুমুখী, কমলিনী রাই।
যার কারণে বৃন্দাবনে, রে সুবল, আমি কান্দিয়া সদা বেড়াই।।
আমি গিয়াছিলাম মান সাধিতে, সাধলাম রাইয়ের চরণ ধরে ;
নয়ন মেইলে চাইল না গো রাই।।
মনে ছিল আশা, ছিল পগারে,
আমার এই পিরীতের কার্য নাই।।

২

কৃষ্ণপ্রেম রাধার নাম যার অন্তরে।
তার দাগ লেগেছে দাগের মত ; সদা দু'নয়ন ঝরে।।
কৃষ্ণপ্রেমের প্রেমিক যে জনা,
কথা কয় বা না কয় প্রাণ-সজনী, দেখলে যায় চিনা ;
অ তার সাক্ষী আছে উপাসনা,
প্রেমরসে হেলে পড়ে ঢুলে পড়ে।।
কৃষ্ণপ্রেমে যে জন মইজাছে,
রাধা প্রেম সাগর মাঝে সে রত্ন পাইয়াছে ;
তারা পার হইয়ে ওপারে গেছে, কুল মান ত্যজ্য করে।।

৩

আমার মন ত ভাল না রে।
হ'ল এ কি জ্বালা।
শাশুড়ী ননদী বৈরী, সে ঘরে বসতি করি।
ঘরে জ্বালার ননদিনী গো, বাইরে জ্বালায় কালা।।
হল একি জ্বালা।।
যখন কালার কথা মনে পড়ে,
প্রাণ কান্দে আর চিত্ত কান্দে, যেন পাগল করে ;
আমার মনে বলে বনে যাইগে, বাদী হয় কুটীলা।।
হ'ল একি জ্বালা।।
যখন আমি রান্তে বসি, তখন কালা বাজায় বাঁশি,
নাই গো তার নিশি দিশি, বাঁশির গানে পাগল করে ;
আমার প্রাণ করে উতালা।।
হল কি জ্বালা

৪

তোরা বাইর হলো, বাইর হলো, দূতী, কোন্ বনে লুইকাইল কানাই।
দূতীর গলায় কুন্দের মালা বৃন্দার গলায় দিয়ে,
যায় গো সুন্দরী রাধে মথুরা বেড়াইয়ে।
এইখানেতে সেখলাম কৃষ্ণ, এইখানেতে নাই,
ফল বৃন্দাবনে আমি হারাইলাম কানাই।
আমি যদি মরি প্রাণে তোমরা সবে আইও,
তোমরা লইও কৃষ্ণের নাম মোর কানে শুনাইও।
আমি যদি মরি প্রাণে, অ গ দূতী, পা ভাসাইও জলে,
মোরে নিয়া বাইন্ধা রাইখ তমাল গাছের ডালে।।

৫

আমার হৃদাসনে দাগ লাগাইল গো,
শ্যামবন্ধু কালীয়ায়—।
সাপের বিষ ঝাড়িলে নামে গো,
প্রেমের বিষ উজান ধায়।
যত ওঝা বৈদ্যের নাইগো সাধ্য
ঝাড়িয়া বিষ নামাইয়া যায়।
আমি নগর দিয়ে হাঁইটে যাইতাম গো
কত লোকে মন্দ কয়।
ওগো পরের নিন্দা পুষ্পচন্দন
অলঙ্কার পড়্যাছি গায়।।
কোন বনে বাজায় গো বাঁশী,
কেমন জানি শুনা যায়।
ইচ্ছা হয় গো ভ্রমর হইয়ে
উড়ে পড়ি বন্ধুয়ার গায়।।

৬

রাধা বিনে প্রাণ বাঁচে না, কেমনে পাসরি তায়।
যারে, উদ্ধপ,* ব্রজের সংবাদ জেনে আয়।
অকস্মাতে মধুপুরী, মনে পৈল সে মাধুরী,
প্রাণ উদ্ধপ।
সেদিন হতে ব্রজ ছেড়ে এসেছি রে নদী যায়।।
যে সুখে পোহায় রজনী, মন জানে আর আমি জানি,
রে প্রাণ উদ্ধপ,—
আমি শুইলে স্বপনে দেখি, জাগিলে না দেখি তায়।।
রাধা আমার প্রেমের সুরু, মনবাঞ্ছা কল্পতরু,
রে প্রাণ উদ্ধপ,—
নিজ হস্তে দাসখত লিখে দিলাম রাঙ্গা পায়।।

* *উদ্ধপ-উদ্ধারের প্রাদেশিক উচ্চারণ।*

৭

কল্পতরু রে, তোমরা নি দেইখাছ শ্যামরায়।
জবাফুলে গৌরব করে আমার সব অঙ্গ লাল,
আমায় নিয়া খেলা করে ব্রাহ্মণের ছাওয়াল।
কচুয়ে গৌরব করে আমার লম্বা লম্বা ফুল,
আকালে পাকালে আমি রাখি জাতি কুল।
সাপলায় গৌরব করে আমি উত্তম জলে ভাসি,
সারারাত্র ভরিয়া আমি চন্দ্রের লগে হাসি।
কদম্ব ফুলে গৌরব করে আমার সর্ব অঙ্গে রেণু
মোরে নিয়া খেলা করে নন্দের ঘরের কানু।
চাঁদে ত গৌরব করে আমি লয়ে উঠি তারা,
রাধিকার গৌরব করে আমি কানুর গলের মালা।

৮

শ্যামের বাঁশি রে, তুমি আর বাজিও না।
সই, গ সই, উচ্চ পর্বতে বসি, কৃষ্ণে বাজায় মোহন বাঁশী,
বাঁশীর স্বরে হৈরা নিল অবলার প্রাণ।
সই, গ সই, বাঁশিটি বাজাইয়া কৃষ্ণে থুইল কদম ডালে,
লিলুয়া বাতাসে বাঁশি রাধা রাধা বলে।
সই যেই না দেশের বাঁশি ছিল, সেই দেশ করল আন্ধ,
আমার দেশে আইল বাঁশী যেন পূর্ণিমার চান্দ।
সই, যেই না ঝাড়ের ছিল বাঁশি, ঝাড়ের লাগাল পাই.
ঝরে পড়ে উপাড়িয়া দরিয়ায় ভাসাই।

হোলির গান

আজি হোলি খেলব শ্যাম, তোমার সনে,
একলা পেয়েছি তোমায় নিধুবনে।
ওলো ওলো ছুঁড়ী, মার পিচকারী,
কুমকুম লাগায়ে দাও ঐ রাঙাচরণে।
কোমরতে লাল ঘাঘ্রী, পরাব কাশ্মিরী শাড়ি,
মারিব লাল পিচকারি, ফাগুয়া নয়নে।

দুর্গাপূজার গান

পুণ্যধাম বাপের বাড়ি, যাইতে চাহে সকল নারী,
ঐ দেখনা দুর্গাদেবী সিংহবাহিনী।
গণেশের কোলত করি আইসেন জননী।।
সম্মুখেতে নন্দী আইয়ের আশাছোটা ধরি।
ডিঙি চলে পাছে পাছে ধুতুম তুতুম করি।
মেনা আইলো বারাই নিতে আদরের ঝি।
ঝি নাতি দেখি মেনা হাসে ভাসে সুখে।
বাটা ভরি আনে পান দিতে ঝিয়ের মুখে।।

আগ বাড়াইয়া নিল মায়ে বাড়ির ভিতর।
পূজা দিল বলি দিল খাবাইল বিস্তর।।
তিনদিন রাখিল মায়ে বড় যতন করি।
চারি দিনর দিন বিদায় দিল যাইত নিজের বাড়ি।।
শিব বোলে কি আনিলা আমার কারণ।
আলুনি কচুশাক টুনি পোড়া পানিভাত,
গরিব বাপের বাড়ি আমার ভোজন।।

কালীপূজার গান

মাগো, গঙ্গা জলে বিল্বপত্রে বামনের ছেইলা করছে পূজা।
কার বাড়ি গেছিলা, মাগো, কে করছে পূজা.
মাগো, শিরে দেখি রক্ত-চন্দন কমল গদে জবা গো,
মা গো, গঙ্গাজলে,
দশরথের ঘাটের আগে মালসী সারি সারি।
সেই মালসী তুইলা আমরা চরণ সেবা করি।
মা গো, গঙ্গাজলে।।

দেহতত্ত্বের গান

ডুবল সাধের মানব তরী
ভব-সাগরের পাকে পড়ে!
এমন বান্ধব কে আছে আর,
কে তুলিবে কেশে ধরে?
মানব তরীর মাল্লা ছয় জনা,
ছয় দিকে ছয় জনা টানে কেউ তো শোনে না ;
গুণ ছাড়িয়া রে মন!
গুণ ছাড়িয়া সব পলাইল,
একলা মাঝি বলেন পড়ে।।
এসেছিলেন ভরের (ই) হাটে,
শঠে মোরে লাগুড় পেয়ে
সব নিল লুটে ;
কর্মদোষে রে মন!
কর্মদোষে সব হারাইলাম,
এই দোষ আমি দিব কারে?
ভবনদীর তরঙ্গ ভাবি,
যেদিকে চাই সেদিকে নাই পারের কাণ্ডারী।
গুরু বিনে রে মন।
গুরু বিনে আর লক্ষ্য নাই,
ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে।।

আধ্যাত্মিক সঙ্গীত

ওগো দরদী,
ওগো দরদী, আমার মন কেন উদাসী হইতে চায়।
ও তার ডাক নাহি, হাঁক নাহি গো, আপনে আসি চইলে যায়।
বৈরয না ধরে অন্তরে—
সদা কেঁপে ওঠে মন লিহরি, নয়ন ঝরে,
যেন নীরবে, সুরবে সদা-ডাকিতেছে, আয় গো আয়।
যেন ভাটার স্রোতে ভাটার গড়ান, সাগর যেমন সদা গো টানে নদীর পরাণ,
সে টান এতই সরল, মনেরই গরল অমৃত হইয়ে যায়।

গাজির গান

[বাঘের দেবতা : হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মানুষের পূজ্য।]

হারে দোম্ দোম্ বলিয়া গাজি ছাড়িল জিগির।
নন্দ ঘোষের মায় বলে, এই আইল ফকির।।
নন্দ ঘোষের মায় বলে কালুঘোষের ঝি।
বাড়ি আইল গাজির ফকির ভিক্ষা দেব কি।।
ভিক্ষা করতে আইছি আমি ভিক্ষা লইয়া ফিরি।
বাটায় করিয়া আন চাউল পয়সা কড়ি।
দধিদুগ্ধ থাকে যদি গাজির থানে দেব।
সিন্নি দিয়া গাজির নামে দোয়া কইরা যাব।।
তখন, সুবুদ্ধি গোয়াইলার মাইয়ার কুবুদ্ধি জাগিল।
ছিকার ওপর দৈথুইয়া মিথ্যা কথা কইল।।
ফকির বলে, মিথ্যা কথা কইলি গাজির থানে।
ইহার সাজা দিব আমি গোয়াইলার বাতাসে।।
ঘরে মইল গোয়ালিনী, বাতানে মইল গাই।
হাইলা গরু মইল কত ল্যাকা জ্যোকা নাই।।
গোয়াইলা তখন কাইন্দা কাইট্টা গেল গাজির কাছে।
গাজির নামে হাজত দেব গরু যদি বাঁচে।।
তখন দোম্ দোম্ বলিয়া গাজি, পিষ্ঠে দিল বাড়ি।
সাতদিনের মরা গরু হাইটা ওঠল বাড়ি।।

ত্রিনাথের গান—

[নাথ সম্প্রদায়ের গুরু গোরক্ষনাথ, মীননাথ ও জালন্ধরী পার পুজো'
পুজোর প্রধান উপকরণ গাঁজা। এই পুজোকে 'সেবা' বা 'মেলা' বলে।]

১

তিন পয়সাতে হয় যার মেলা।
কলিতে তিন নাথের লীলা।।
এক পয়সার পান সুপারি তাতে নাই মশলা,
খেয়ে, পানের খিলি সাধু মিলি গায়ে আর বাজায় একতালা।
এক পয়সার তেল দিয়ে তিনবাতি সাজায়ে,
মেলা দিচ্ছে তার চেলা।

বাতি জ্বলছে ধীরে নিবে নারে, একি এক আজবলীলা।
(ঠাকুর তিন নাথের মেলার মাঝেরে)
বাতি জ্বলছে....।
এক পয়সার গাঁজা দিয়ে তিন কলকি সাজায়ে
মেলা দিচ্ছে তার চেলা।
গাঁজায় মারছে দোম বলছে বোম্
ববম্ ববম্ বোম্ ভোলা।

২

এল রে তিন নাথ ঠাকুর জগতে।
আজগুবি তামাসা হল কলিতে।।
কলিতে হরি সর্বময়,
পূবেতে পাগলের আশ্রয়,
চিতুইলাতে শম্ভুচাঁদ আপনি উদয়।
ডেক্‌রা বইট্টার সিদ্ধেশ্বরী ধামরাইর মাধব রথেতে।।

৩

আসরেতে কর আগমন,
(ত্রিলোকের জীবনপ্রভু) কর আগমন।
আমি অতি মূঢ়মতি না জানি ভজন।
তিননাথ রূপে প্রভু বসিলেন আসনে,
ছয় জোকার দেও সবে তোমরা নারীগণে:
এ দেহ জলের বিম্ব কখন জানি মরি,
ত্রিনাথ আনন্দ ভাই বল হরি হরি।
তোমার তাল তোমার মন্ত্র কর এসে খেলা,
অধম বালকে দিছে তিননাথের মেলা।
যন্ত্র যদি পড়ে থাকে লক্ষ জনার মাঝে,
যন্ত্রী না হইলে যন্ত্র কখনও না বাজে।।

কুলের মাগনের গান

[পৌষ মাস পড়লেই গ্রাম বাংলার জনজীবনে নতুন প্রাণের সাড়া জাগত। চারদিকে নতুন শাকসব্জি। গোলায় নতুন ধান। গ্রামের ছোট ছোট বালক বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল, শাকসব্জি সংগ্রহ করত গান গেয়ে।]

সাজ সাজ সাজ গো সব রাখাল।
কুলের মাগনে যাবে নন্দের রাখাল।
সাজিয়া কাজিয়া গোপাল নূপুর দিল পায়।
ঘর থেকে বাহির হতে নিষেধ করে মায়।।
সাজ সাজ বলিয়া রে নগরে পড়িল ধ্বনি।
আজিকের মাগনে যাবে আমাদের নীলমণি।।
সাজিয়া কাজিয়া গোপাল মুখে দিল পান।
ঘর থেকে বার হল যেন পূর্ণিমার চান।।
সাজ সাজ বলিয়ারে নগরে পড়ল সাড়া।
আজিকে মাগনে মোরা যাব সকল পাড়া।।

গরুবাদী সংগীত—

চল গুরু দুজন যাই পারে,
আমার একা যেতে ভয় করে।
পার ঘাটেতে মাল্লা ছয় জনা,
সঙ্গী বিনে তারা আমায়
পার করে দেয় না,
মাঝি বলে দেই পার করে,
মাল্লায় যে নিষেধ করে।।
আমার দেহ ছিল শ্মশানের সমান,
গুরু, তুমি মন্ত্র দিয়ে করলা ফুলবাগান,
আমার সে বাগানে ফুল ফুটেছে।
গোঁসাই অধরচাঁদ বিরাজ করে।।

গৌর পদাবলী—

গৌর প্রেমসাগরে, প্রেমসাগরে সাঁতার খেলে,
ওগো আমি মরমে মজিয়ে থাকি সই।
ও সে যে গৌর-প্রেমতরঙ্গ নদী।
(ওগো ওগো প্রাণসখী গো)
সে নদীর ধারা বহে নিরবধি সই।
ও সেই গৌর প্রেম কলঙ্কের ডালি,
সে ডালি সদায় রাখি মাথায় তুলি সই।

ঘটনামূলক সঙ্গীত—

বামনায় লইয়া যায় বৈদেশী বন্ধুয়ার নায়।
আরে, কইও কইও কইও গো খপর গো শ্বশুরের আগে,—
আমারে যেন তালাস করে গাঙ্গের কুলে কুলে রে।
আরে, কইও কইও কইও গো খপর শাশুড়ীর আগে,
কোলের ছোওয়াল শুইয়া রইছে মশৈরের তলে রে।
আরে, কইও কইও কইও গো খপর নদনদীর আগে—
অখন যেমুন কাইজা করে জলের কল্‌সীর লগে রে।
আরে, কইও কইও কইও গো খপর সোয়ামীর আগে,
হালের বলদ বেইচা যেন আরেক বিয়া করে রে।

পাত্রী সাজান অনুষ্ঠানের গান—

সখি, সাজাও সাজাও সাজাও যেয়ে বিজয় বসন্তেরে।
আমি এই চলিলাম বস্ত্র আন্‌তে কাপইড়ার দোকানে,
সখি, সাজাও, সাজাও, সাজাও।
আমি এই চলিলাম মটুক আন্‌তে মালীর বাড়িতে,
সখি, সাজাও, সাজাও, সাজাও।
সখি সাজাও সাজাও যেয়ে বিজয় বসন্তেরে।।

আমি এই চলিলাম, আমি এই চলিলাম চন্দন আন্‌তে
বনিয়ার বাড়িতে।
সাখি, সাজাও সাজাও যেয়ে বিজয় বসন্তেরে।।
আমি এই চলিলাম, কাজল আন্‌তে অযোধ্যা ভুবনে।
সখি, সাজাও সাজাও সাজাও যেয়ে বিজয় বসন্তেরে।।
আমি এই চলিলাম বাজু আন্‌তে কামারের বাড়িতে,
আমি এই চলিলাম।।

বরকে দানের বন্ধনমুক্তির গান—

চন্দ্র, সূর্য, দেবগণ, চিন্তাযুক্ত হৈল মন।
না হইলে নাপিতের দাম, শুদ্ধ হয় না কোন কর্ম।
বেদে আছে বিধি নাই, চল যাই ব্রহ্মার ঠাঁই।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, সূর্যদেবে দিল বর।
সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্ম যিনি নাপিত সৃজিলেন তিনি।
নাভিতে নাপিতের জন্ম হইল, শিলাতে নিয়া রাখিল।
অষ্ট অঙ্গ শুদ্ধ হইল, কুলশীল নাম থুইল।
গঙ্গাতে করিয়া স্নান, নাপিতেরে করিল দান।
কতমত কত নারী বৈসেছেন সারি সারি।
জামাতা দক্ষিণ স্থিত, বৈসছেন পুরোহিত।
চন্দ্রসূর্য কুলের নন্দন, বেদ নিয়া গাভীর বন্ধন।
বন্ধন গাভীর মোচন হয়, হর গৌরীর বিয়া হয়।
ডানে শঙ্কর বামে গৌরী, সর্বলোকে বল হরি।
অমুকে গৌরবচন কয়, পাঁচ টাকা তার দক্ষিণা হয়।

২

ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ ব্রহ্মা অবতার চতুর্বেদে ব্রহ্মা বিধিতে সঞ্চার।
শাস্ত্রে ছিল বিয়ার বিধি তীর্থবাসী বারাণসী।
শিবের সম্বন্ধ করিতে চলিলেন গিয়া নারদ মহামুনি,
উত্তরিলেন গিয়া নারদ হিমইল রাজার বাড়ি।
হিমইল রাজা বসতে দিলেন সুবর্ণের সিংহাসন।
কোথার থনে আসছ নারদ, কোথায় চইলা যাও।।
আস্‌ছি, হিমইল বাজা, তোমারই স্থানে।
একটি কথা কইতে বড় ভয় লাগে।
তোমার একটি কন্যা আছে নাম তার গৌরী।
শিবের সঙ্গে সম্বন্ধ কর যাইয়া।
কি কহিলা, নারদমুনি, এমনি কথা কয়।
কোথাকার পাগলের সঙ্গে সম্বন্ধ করিতে।
পাগল নহে শিব জগৎ ঈশ্বর।
খনে খায় ভাঙ ধুতুরা খনে মহেশ্বর।
ডাইনে শঙ্কর বাঁয়ে গৌরী।
হরগৌরীর বিয়া অইল বন্ধন গাভীর মোচন হইল, নাপিতস্য গরগরি।
অমুকে কয়, পাঁচ টাকা দক্ষিণা হয়।

শুভদৃষ্টি সময় মেয়েদের গান—

ধইরা তোল ধইরা তোর রামের সিংহাসন।
ধইরা তোল সীতারই আসন।।
রামের গলে শোলার মালা।
সীতার হস্তে সোনার বালা।
দুই মুখে চারি চোখে হইল দরশন।।
পুরোহিত আসিয়া বলে হইল শুভক্ষণ।।
রাজহংসের পঞ্চডিম্ব ভাঙ গো নিছিয়া।
ধৃতরার সহস্র প্রদীপ ধর গো তুলিয়া।।

বিয়ের আগে ভাবী বরকন্যার কল্যাণ কামনায় গঙ্গাপূজা—

১

বরণকুলা নিয়া হস্তে রানী চলেছেন গঙ্গার ঘাটে, ও মা তারিণী।
তোরা কে কে যাবি গঙ্গার ঘাটে, ও মা তারিণী।।
পঞ্চ আইয়ো লইয়ে রানী চলেছেন গঙ্গার ঘাটে,
ও মা তারিণী

২

সে তো বাদ্য বাজে ও কলসী গো সাজে।
সে তো কমলিনী রাই, ওগো সখী, চল যাই।।
যাব রস বৃন্দাবনে, ওগো সখী, চল যাই,
যাব মধুর বৃন্দাবনে, ওগো সখী, চল যাই
সে ত তৈল সিন্দুর, দিয়া গো রানী
রানী কলসী সাজাইল।
যাব মধুর বৃন্দাবনে, যাব রস বৃন্দাবনে, সখী চল যাই।।
সে ত কলসী লবে, ও বৃন্দা গো দূতী,
সে ত ঘটি লবে কালো শশী গো চল যাই,
যাব মধুর বৃন্দাবনে গো সখী চল যাই।।

জল ভরার গান—

১

চল চল সহচরী জল ভরিতে চল যাই।
যমুনার জল এনে রামেরে শন করাই।।
চল নাগরী নিয়ে ঘাঘরী যমুনার জল আন্তে বারি।
সখীগণ সঙ্গে নিয়ে চলগো এখনে।

২

রাজরানী পরণ শাড়ি, কুম্ভ নেয় কাঁখে।
জল ভরিতে চলছেন রানী ঐ গঙ্গার ঘাটে।
রাস্তার হস্তে খাড়া আইযোর হস্তে কুলা।
রাজা যাইবেন জল ভরিতে সঙ্গে যাইবেন কে।।
সোয়া শ বাজইনার ছেলে সঙ্গে চলেছে।

শত শত আইয়োগণ সঙ্গে চলেছে
আইয়ো সবে চল, রাজায় দিবেন জল কাটিয়া।
রানী ভরবেন জল।

৩

জল ভর, সুন্দরী রাধে রাধে গো, যমুনারি ঘাটে।
আঁখি বাইরে কওনা কথা কউতো নাহি ঘাটে।
জল ভর, সুন্দরী রাধে।
কেহর পৈরন লাল নীলী কেহর পৈরন শাদা,
রাধিকা সুন্দরীর পৈরন কৃষ্ণ নামটি লেখা গো।
জল ভর, সুন্দরী রাধে।
রাধে গো, যমুনার ঘাটে,
আঁখির ঠারে কও না কথা,
কেউতো নাহি ঘাটে গো।
কেহর হাতে ঘটিগাড়ু, কেহর হাতে ঝারি।
রাধিকা সুন্দরীর হাতে সুবর্ণের কলসী গো।
জলভর, সুন্দরী রাধে।।

স্নানের সময় মেয়েদের গান—

১

অষ্টগাছি রামকলা, যোলেঝাড়ি জল।
তাহার মধ্যে স্নান করেন রূপের বিদ্যাধর।।
ঘরের থনে বাহির হইলেন রাজ-মহারানী।
ডাইন হস্তে ক্লহরিদ্রা, বাম হস্তে ঝাড়ি।।
সভার মধ্যে গিয়া রানী চতুর্দিকে চায়।
কারো হরেন হস্ত রানী, কারো ধনের পায়।।
সীতার মায় মিনতি করে, শুন আইয়োগণ।
শুস্তে শুস্তে মাখ হলুদ অতি দুঃখের ধন।।
নাওয়াইয়া ধোয়াইয়া সীতার অঙ্গ করিলেন শুচি।
বাম পায়ে ভাঙেন সীতা কুমারের মুছি।।

২

তোরা আয় গো সকালে,
আমার রামসীতাকে স্নান করাব সুশীতল জলে।
স্বর্ণ কুম্ভ ভরিয়া আন গঙ্গা জল, ঢাল গো রামের শিরে।
বাদ্যকর ডেকে আনরে, ধোপার ছেলে ডেকে আন,
ছুঁতারের পিঁড়ি আন, নবগঙ্গার জল আন।
তোরা আয় গো সকালে,
আমার রামসীতাকে স্নান করার মনের আনন্দে।

বরকে স্নান করাবার গান—

সবে মিলি যাব মোরা, যমুনা পুলিনে ত্বরা
কাঁখে নেব হীরার কলসী,
সাড়ি পরব কিরণশশী, জল ভরিয়া গৃহে আসি
স্নান করাব রামধনে।

বাসিবিয়ের গান—

শ্রীরামচন্দ্রের বাসিবিয়া মিথিলায়।
দেখতে রামের বিয়া স্বর্গপুরের বাসী যারা
গোপনে থেইকে চায়।
যেমন রাম সাজিল কমল আঁখি,
তেমনই সীতা বিধুমুখী তরুতলে দাঁড়াইল।
ও তার জগতে রূপ মোহিল।
স্বর্গ থাইকে দেবগণ পুষ্প পরিষণ করে,
ঐ রূপ যে দেখিল নয়ন ভইরে,
তার জন্ম সফল হইল।

বৃদ্ধিকার্যের সময়গীত—

ওগো রানী গো, ভাল বৃদ্ধি করেন দশরথে।
বিচিত্র সায়ভানার নিচে, বৃদ্ধি করেন দশরথে।।
ওগো, বৃদ্ধিকার্যে কি কি লাগে, ষোল মন চাউল লাগে।
ওগো, ষোল মণ মুগ লাগে গো, ওগো শুভ বৃদ্ধি করেন দশরথে।।
ওগো, বৃদ্ধি কার্যে কি কি লাগে, ষোল ছড়া কলা লাগে,
ষোল রাইড় দই লাগে, ষোল রাইড় গুড় লাগে;
ওগো, ষোলখানা সিন্দুর লাগে গো।
বিচিত্র সায়ভানার নিচে ভাল বৃদ্ধি করেন দশরথে।।
ওগো রানী গো, ভাল বৃদ্ধি করেন দশরথে।
বৃদ্ধি কার্যে কি কি লাগে, ষোলখানা কাপড় লাগে,
ওগো রানী গো, ভাল বৃদ্ধি করেন দশরথে,
বৃদ্ধির কার্যে কি কি লাগে, ষোলখানা গামছ লাগে,
ওগো রানী গো, ভাল বৃদ্ধি করেন দশরথে।
বৃদ্ধির কার্যে কি কি লাগে, ষোল বিড়া পান লাগে,
ওগো রানী গো, ভাল বৃদ্ধি করেন দশরথে।।
বৃদ্ধির কার্যে কি কি লাগে, ষোল ছড়া সুপারি লাগে
বিচিত্র সায়ভানার নিচে, বৃদ্ধি করেন দশরথে।।

অধিবাসের আগের গান—

আকাশে উঠল তারা, অধিবাসের পড়ল সাড়া।
বল শুনি ও রোহিনি, অধিবাসের আয়োজন।
ভরি ঘটে গঙ্গাজলে, সাজায়ে কদলী ফালে,
কর শীঘ্র অধিবাস, পুরইত রইছেন উপবাস।।

দধিমঙ্গল উৎসবের গান—

রামে করলো দধিমঙ্গল দধি নাই রে ঘরে।
দধির লাইগা পাঠাইয়াছি গোয়াল নগরে।
চিড়ার লাইগা পাঠাইয়াছি চিরকুটী নগরে।
রামের মাগো, তুমি ওঠো গো সকালে।
গোপাল, গা তোল নিশি প্রভাত হইয়াছে।
তোমার শিয়রে পিতা নন্দ ডাকিতেছে।
তোমার শিয়রে দধির ভাণ্ড রইয়াছে।
তোমার শিয়রে মা যশোদায় ডাকতেছে।

২

দধিমঙ্গল করে সীতারানী গো,
আয় সকলে আমার নীলমণি।।
আন গো দধির ভাণ্ড, ভেঙে কর অষ্ট খণ্ড,
আয় সকলে—ইত্যাদি।
আন গো ক্ষীরের ভাণ্ড, ভেঙে কর অষ্টখণ্ড,
আয় সকলে—ইত্যাদি।
আন গো চিনির ভাণ্ড, ভেঙে কর অষ্ট খণ্ড,
আয় সকলে—ইত্যাদি।

পাশা খেলার সময় মেয়েদের গান—

১

পাশা খেলে কে গো, পাশা ঢালে কে গো,
পাশা খেলে কিশোর আর কিশোরী।
খেলিতে খেলিতে পাশা, হারিলেন শ্রীহরি।
রামে ঢালে পাশা বারো, সীতায় ঢালে তেরো,
লক্ষ্মণে উঠিয়া বলে, দাদা, বুঝি হারো।
রামে যদি হারে পাশা নিব হাতের বাঁশি,
সীতায় যদি হারে পাশা হব নিজ দাসী।
পাশা খেলে গো।

২

দেখ দেখি কি তামাসা, খেলছে পাশা, কন্যা বরে।
সীতায় যদি হারে পাশায় দাসী হয়ে মন যোগাবে।।
রামে যদি হারে পাশায়, সর্বস্বশধন পণ করিবে।
ঢাল পাশা সভার মাঝে দেখ্‌ব বলে সকল লোকে,
চপলা বীরজাবালা তারা জানে দুবইন খেলা।

বৌ-ঘরার গান

[বর নববধূকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। আনুষ্ঠানিক ভাবে তখন গান গেয়ে নব বধূকে বরণ করে নেওয়া হয়।]

কালী তারা ধূমাবতী চরণে চরণে চতুর অতি,
সিংহপৃষ্ঠে ভগবতী মিথিলাতে আগমন।
বরণ করে বধূগণ, বরণ করে আইয়োগণ।।

লৌকিক প্রেমসঙ্গীত

১

সোনা বন্ধুয়া রে,
বিকাইলেম ঐ রাঙা পায়।
বিকাইলে কি করবে বাপ মায়।
সোনা বন্ধুয়া রে।।
মনপ্রাণ দিয়া বন্ধেরে কইও গিয়া,
বিকাইলে নি কিনবে গো আমায়।
সোনা বন্ধুয়ারে।।

২

কাইল বলে গেলারে, বন্ধু, কত যে কাল হইল,
ও বন্ধুরে—
আর কতদিন বাকি সেই কাইলের বন্ধু
এবার এইসে বল, বন্ধুরে।
তুমি ত দূর দেশে গেছ, বন্ধু, আমি রইলাম ঘরে, বন্ধু রে—
তোমার পায়ে আমার বুকে, বন্ধুরে, বান্ধা কিসের জোরে—
যৌবন জোয়ারের পানি রে, বন্ধু, ভাটা লাগলেই যাবে,
নারীর জনম মিছা হইলে, বন্ধুরে, তুমিও দুঃখ পাইবে।
বন্ধু রে,—
আন্ধাইর নিশিতে, বন্ধু, আমি তোমার মুখ দেখি,
বিনাইতে মাথার বেণী রে, বন্ধু, ঝড়ে দুইটি আঁখি।
বন্ধুরে! আইস আইস, প্রাণের বন্ধু, তুমি রে জুড়াও আমার হিয়া—
অভাগিনী নারী তোমার কান্দে পন্থ চাহিয়া, বন্ধু রে।

৩

তামাক খেয়ে গেলে না রে, কবিরাজ, কত দুঃখ মনে যে বল,
ঐ যে চান্দের পাশে তারা হাসে 'তেতুলপাত শুকাল।
মরা গাঙ্গে কুমির ভাসে শুকায় মুঙ্গীর ফুল,
এই ভরাকালে হলেম, রাঁড়ী, কবিরাজ যৌবনে ফুটিল ফুল।।

৪

এ ফুল পানি কান লো ছোট বউ সাঁজের বেলায়।
জল আনিতে গিয়াছিলাম সানবান্দা ঘাটে,
ভেসে যেতে চাঁপা ফুল তুলে নিলাম হাতে।

৫

বাঁশের ছোবে বক পৈড়াছে ভাইক ডাহে বিলে।
নয়ান বন্দু হিনান করেগো, হারি থুইয়া টিলে।।
বন্দুর বাড়িতে যাবার চাইছিলাম (ও হায়—) পৈষ মাহাও যায়।
কেমন কৈরা হুজাইরে, বন্দু, হাতুরি সাই মারে গায়।।
ইর‍্যান, দুক্কু রাখমু কনে (ও হায়রে—) ওরে আমার বন্দু আইলকৈ।
মার পূজিত হাইরে চীনা, খরায় হুধকী চৈ।। (রেচৈ)।।
ওরে আমার, বন্দুরে, আর দুক্কু না সয় দিলে।।

ওরে ও, বগিলা, তুই পাহা দিয়া ডাক।
ই বছরডা গেলে হুজ্‌মু দিয়া নাইলা হাগ।। (রে হাগ)।।
ওরে আমার বন্দুরে, আর দুঙ্কু না সয় দিলে।।

৬

যা রে, কোকিলা, তুই আমার পতি গেছে যে দেশে,
অমন করে জ্বালাতন কারিসনে আর নিত্তি এসে।
শুনে তোর কুহুস্বর, উস্কে উঠে পরাণ আমার,
প্রাণপতি মোর দেশান্তর, ছাড়্‌গে তথায় তোর কুহুস্বর;
কাঁচা বুকে লাগলে আঘাত পাইনে কোন দিশে।।

৭

দরদি নিগম কথা শুন্‌লি নে হলায়,
আমি অচল পয়সা হলাম ভবের বাজা রে,
তোরা বুঝ্‌লিনে, দেখ্‌রে বেলা যায়।

৮

ও ভাইরে, ঝাঁকে ওড় ঝাঁকে পড় তারে বল সাড়া
বল মোর বঁধুয়ার কাছে, ভাই, পিরীতি প্রাণ মরারে।
ওরে নলের আগায় নলফুল বাঁশের আগায় টিয়া,
কইয়ো মোর বঁধুয়ার আগে না যেন করে বিযা রে।
কি জঞ্জাল করিলি, ভাইরে।
যখনে কল্লাম পেরেম্‌ সানবাঁধা ঘাটে,
আকাশের চন্দন যেন, ভাই, তুলে দিল হাতে রে,
তুলে দিল হাতে।।

৯

ওরে ওরে অসমতি হুন হুন ও! বরা যৈবনে নিকুশ যাহ্ন যায়।
উনুর ঝুনুর কইরা নিছে পরাণ তোমার পায়।। (ও কইলজারে!)
বরা বান্দরে দ্যাহ গাঙ্গৎ ডাহে বান,
ছোলা হুক্যায় কান্দার পাড়ো বুন্‌ছি আমুন দান।
আলের মুঠ্‌ঠি করছি হৈলা (ওরে হায়)—
আমার, দহীনদারী গর বৈরাছি বল্‌দেব পাহায়। (ও কইলজারে;)
আলান্‌ পালান উজার অইল গো—কে হেচিবে পানি,
আমার, কাইন্দা কাইন্দা নানীনর ওগো চহৎ পড়ছে ছানি।। (ও কইলজারে)

১০

কোন দেশে গেলারে, পবাণ কোন্‌ দিকেতে গেলা,
তোমার লাগি ভাত বাইয়াছি—ভাটি ধরছে বেলা রে পরাণ,
বাগুন সিদ্ধ দিছি রে, পিঙ্কু, আর কাঁঠালের হালি,
গরম গরম খাও আইসেরে পিয়ু মিছা বাড়াও বেলা।।
নতুন লনী ঘনরে মাঠা, খাওন হৈবে ভালা।
আইস আইস, বন্ধুরে, আমি রইয়াছি একেলা।।
ভাতের উপর তেলের গো হাত মোর বুলাইছি যতনে,
মাছিয়ে বসিছে, পিয়ু, কইর না আর বেলা।।

১১

ও প্রাণ কানাইও, তৈলের বাটি গামছ হাতে,
চল যাই যমুনার ঘাটে, কলসী ভাসাইয়া দিব জলে,
ও প্রাণ কানাইও!

ছড়া

খোকন দোলে
মল্লিকা চম্পা দোলে।
দখিনা বাতাস বয়
নতুন দোলে।।
বকুল ঝরে দলে দলে
পাখিরা চলে
নতুন বোলে
খরার নদী চলে
গাছে মুকুল দোলে
আকাশে তরা দোলে
মল্লিকা চম্পা দোলে।
তারি সাথে খোকন দোলে।।

২

দে দোল দে দোল
খোকন দোলে।
আমের গাছে গাছে
মুকুল দোলে
কৃষ্ণ চূড়ার ফুল দোলে,
গাছের ডালে ডালে
খাল নদী দোলে।
খোকন দোলে।।
আকাশের কোলে কোলে
মেঘ দোলে
মাটির কোলে কোলে
সবুজ দুব্বা দোলে।
খোকন দোলে

৩

কোথায় আমার চাঁদমণি
মুচকি হাসি মুখখানি
ঝাপিয়ে কোলে আয় দেখি না,
গাল ভরে দি হাজার চুমা
খোকন খোকন গন্ধ কয়।
খোকন ছুঁলে নাইতে হয়।

৪

ঠাকুর বাড়ির ফুল গাছটি সদাই ঝুর ঝুর করে,
তারি তলে কিষ্ট রাধিকা সদাই নৃত্য করে।।
গোপ কাঁদে গোপিনী কাঁদে আর কাঁদে লতা।
কিষ্ট আমার একা; কিষ্ট আমার বাঁকা,
কিষ্টর চিতখানি যে আকুল ব্যাকুল, লোকে বলে ক্ষ্যাপা।।

৫

খোকা যাবে বিয়ে করতে হস্তী রাজার দেশে,
তারা রূপার খাটে পা রেখে, সোনার খাটে বসে।
ঘন আওটা দুধের উপর পুরু সর ভাসে।
খোকামণিকে সোহাগ করে যৌতুক দিবে কি?
শাল দিবে, দোশালা দিবে, দিবে রূপবতী ঝি?

৬

সোনা নাচে কোণা
বলদ বাজায় ঢোল
সোনার বউ রেঁধে রেখেছে
ইলিশ মাছের ঝোল।

৭

কা-কা-কা-কাকের ছানা,
দুধ খায় না খোকন ধনা।
খোকন আমার পেটের বাছা
চাঁদ পানা মুখ।
গাল বেয়ে দুধ পড়ে
টুপ টুপ টুপ।।

৮

সোনামণি সোনা,
আদা দিয়ে মুগের ডাল
ঘন দুধের ছানা।
চাঁদবদনী চাঁদের কণা
সবাই বলে দেনা-দেনা;
দিলে যে আমার দিন চলে না,
সেই কথাটি কেউ বোঝে না।

৯

বুলবুল টিয়া
খোকার দিমু বিয়া
ও বৌ
ধনে কুড়াতে যাবি না?
বুড়া দ্যায় লেপমুড়ি
ক্যামনে যাই বল না?
পরাণ মণ্ডলের ছেলে
তার যে বিয়া

লাল টুকটুক বৌ
ঢাকা ঢোল দিয়া।
বুলবুল টিয়া
খোকার দিমু বিয়া।
হীরুর বিয়ে
মাথায় টোপর দিয়ে
হীরু কত খুসি
বলে খোকার মাসি
বুলবুল টিয়া
খোকার দিমু বিয়া।

১০

বুলবুল টিয়া
খোকার দিমু বিয়া।
ডাকাত বৌ আসে
খন্তি হাতে নিয়া।।
খোকা করে বিয়া
ডাকাত বৌ মারে
খুন্তি দিয়া।
বুলবুল টিয়া
খোকার দিমু বিয়া।

১১

খোকন যাবে শ্বশুর বাড়ি খেয়ে যাবে কি?
ঘরে আছে গরম ময়দা শিকেয় আছে ঘি।
একটুখানি দাঁড়াও খোকা জিলিপি ভেজে দি।
খোকন যাবে শ্বশুর বাড়ি খেয়ে যাবে কি?
ঘরে আছে তপ্ত মুড়ি মেনা গাইয়ের ঘি।

১২

অ্যাংটুল ব্যাংটুল ঘোড়াটুল সাজে।
ঢাল মেঘর ঘোঘর বাজে।।
বাজতে বাজতে চললো ডুলি।
ডুলি গেলো সেই কর্ণ ফুলি।।
কর্ণফুলির টিয়েটা।
সূয্যি মামার বিয়েটা।
অ্যাংটুল ব্যাংটুল হাটে যায়।।
পানসুপারি কিনে খায়।।
একটি পান ফোঁপরা।
মায়ে ঝিয়ে চোপড়া।।
হলুদ বনে কলুদ ফুল।
মামার নামে টগর ফুল।।

১৩

ও পেনটি বাইস্কোপ,
টানটুন টেইস্কোপ।
আমপাতা জোড়া জোড়া,
মারবে চাবুক চড়বো ঘোড়া।
ওরে বিবি সরে দাঁড়া,
আসছে আমার পাগলা ঘোড়া।
পাগলা ঘোড়া ক্ষেপেছে,
বন্ধুক ছুঁড়ে মেরেছে।
আলরাইট ভেরিগুড্,
পাউরুটি বিস্কুট।।

১৪

ইচিং বিচিং জামাই চিচিং
তায় পল্লো মাকড় বিছিং।
মাকড়েরা লড়ে চড়ে,
সাতকুমড়ার ডিম পাড়ে।
এলের পাত্ বেলের পাত্
ঠাকুর গেলেন জগন্নাথ।
জগন্নাথের হাঁড়ি কুড়ি
দুয়ারে বসে চাল কাড়ি।
চাল কাড়তে হলো বেলা—
খলস্ মাছের চোকা,
উড়ে বসে পো-কা।।

১৫

নিন্দল মাসি
নিন্দল মাসি
কাল বাদুড়ের ছাও।
একটি কলাই
মাটিত প'লো
ধুইয়া ধুইয়া খাও।
আর খাইও না
ফেউ ডাক্যাছে।
দুইটি চিতলের মাছ
তাল ধর‍্যাছো।
একটি নিল পবন ঠাকুর
একটি নিল টিয়া।
টিয়ার বিটির বিয়া
শাল শাড়ি খানা দিয়া
লাল শাড়ি নিব না,
তসর কিনে দাও।
তসর করে খসড় মসড়

গরদ কিনে দাও।
নিন্দল মাসি
নিন্দল মাসি
কালবাহড়ের ছাও।

১৬

বগাবগী হাটে গেছে কিনা আনছে রুই,
বগার মাথায় বোঝা থুইয়া বগী গেছে কই?
ও বগী, তুই বাড়িতে আয়,
তোর দুইটি ছাও কান্দে আধারি চায়।
নিত্যি নিত্যি খায় রে বগী ঝিলে আর বিলে,
আইজ বুঝি গেছে বগী ক্ষীরোদ নদীর কূলে।
ক্ষীরোদ নদীর কূলে গিয়া ধরছে শউলের পোনা,
মাড়ুর মুড়ুর ভাঙছে পোনা রক্তে দিছে থানা।
ও বগী তুই বাড়িত আয়।
তোর দুইটি ছাও কান্দে আধারি চায়।।

১৭

তাইরে নাইরে বন্ধু রে,
কলা খাইল ইন্দুরে।
কলার ভিতরে আলি নাই,
পয়সা দিতে মানা নাই।

১৮

খোকা মোর লক্ষী।
ধর‍্যা দিব পক্ষী।।
খোকা মোর উক্ষু।
ধর‍্যা দিব ঘুঘু।।
খোকা মোর হাওই।
ধর‍্যা দিব বাওই।।
খোক মোর টিয়া।
খোকার দিব বিয়া।।
খোকা আমার ময়না।
বৌযের চায় গয়না।।
পা দিলে ত হয় না।
খোকা মোর ভাল।
খোকার বউ এলে,
ঘর করবে আলো।।
খোকা মোর ভাল।
আম কুড়াতে গেল,
আমের জালি নিয়া,
হাসিতে হাসিতে এল।।

ধাঁধা

বিয়ের আসর। পাত্রপক্ষ এসে বসেছে। তাদের দেওয়া হল পান-সুপারি।
কিন্তু পান খাওয়ার আগে কন্যাপক্ষের কেউ প্রশ্ন করল—

পান খাও পণ্ডিতের ব্যাটা
কতা কওঠারে,
পান সুপারির জন্মবার্তা
কইয়া দ্যাও আমারে।
পান-সুপারির জন্ম কতা
যে না কইয়া পারে;
পানের বদল বটের পাতা
আইন্যা দিমু তারে।

পাঠান্তর—

পান খাও পাইন্যা বাই
কতা কওঠারে
পান সুবারির জর্ম অইচে
কোন অবতারে?
যুদি না কইয়া পান খাও,
ছাগল অইয়া গেচু-কচুর পাতা খাও।

বর পক্ষের চতুর ব্যক্তির উত্তর—

পান খাই পাইন্যা বাই
কতা কই ঠারে,
পান-সুবারীর জর্ম আইল
কিষ্ট অবতারে।
যুদি হয় বিষ্টি
পানের অয় চিষ্টি
ছাও পাও তুইল্যা বেচে আটে আর বাজারে।

২

তিন তেরো দিয়া বারো
নয় দিয়া মিলন কর;
আমার স্বামীর এই নাম
পার কইর‍্যা দাও নাইওর যাম।

[আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'লোক সাহিত্য' থেকে]



প্রাসঙ্গিক সংযোজন (ক)

সুর-শহরের সান্নিধ্যে :

> 'গানবাজনায় ঢাকার নাম ছিল। অনেক ধ্রুপদী গায়ক ছিলেন। ভগবান সেতারীর বাজনা ছিল অপূর্ব, কেশব বন্দ্যোপাধ্যায়ের তবলা-বাদনের খ্যাতি ঢাকার বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। মধ্যবিত্ত সমাজে দুটি ছোট মেয়ের খুব নাম—একজন রানু সোম, প্রতিভা বসু নামে যাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি, এবং অন্যজন রেণুকা সেনগুপ্ত—যাঁর "যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এলে" গানটির রেকর্ড বিক্রি হয়েছিল রেকর্ড ভেঙে। অন্য গায়ক ও সংগীতজ্ঞ আসতেন বাইরে থেকে। একবার এলেন দিলীপ রায় এবং মাতিয়ে দিয়ে গেলেন। আর একবার এলেন আলাউদ্দীন খাঁ, যিনি সৃষ্টি করলেন ইন্দ্রজাল। নজরুল ইসলাম এসেছিলেন—যেখানে ডাকা হয় সেখানেই আবৃত্তি করতেন। "বিদ্রোহী" আর গেয়ে শোনালেন "দুর্গম গিরি কান্তার মরু"। (আট দশক - ভবতোষ দত্ত। পৃঃ ৫৪)

ঢাকা যখন সুরের আগুনে দীপ্তমান, তখন শহরটার, আজকের মত আভিজাত্য ছিল না। ঘরোয়া আঙিনায় বিলাসী মানুষের সখের আসরে, গুণীজনের আগমণ ঘটেছে একের পর এক। এভাবেই গড়ে উঠেছিল ঢাকার সংগীত জগতের প্রাথমিক বনিয়াদ। সেই ঐশ্বর্য মোড়া দিনগুলি, অনন্য মুহূর্তগুলি বাঙালি জীবনের অপরিমিত সম্পদ। কেবল কলকাতাই নয়, ঢাকা ঘিরে বাঙালি মানসিকতার যে অসাধারণ পরিমণ্ডল একদা গড়ে উঠেছিল, তারই একটি অভিজ্ঞান হল সংগীত। যাকে বাদ দিয়ে শহরের ইতিহাস অপূর্ণ থেকে যায়।

ঢাকার জনজীবনে বিনোদনের ছিল নানান উপকরণ। সে বিষয়ের পূর্ববর্তী আলোচনায় আলোকপাত করা হলেও, আলোচনাটি পূর্ণাঙ্গ নয়। ঢাকার জনসাধারণের সাংগীতিক ঐতিহ্য সুপ্রাচীন কাল থেকে। রাজা লক্ষ্মণ সেন অসাধারণ সুরসৃষ্টির জন্যই স্মরণীয় হয়ে আছেন। চোদ্দশতকে ইবন বতুতার বিবরণে পাওয়া যায় সংগীতচর্চার পরিচয়। সতের শতকে ইসলাম খাঁর দরবারে ছিল ১২০০ সংগীত ও নৃত্যশিল্পী। চৈত্র সংক্রান্তি ও নববর্ষ উৎসব সে সময়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, যার অন্যতম মাধ্যম ছিল সংগীত। হিন্দুমুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মানুষ সমবেত সংগীতে অংশগ্রহণ করত। হিন্দুদের মধ্যে চৈত্র সংক্রান্তির কালীনাচ ছিল সমাদৃত। তাছাড়া ছিল বিবিধ লোকসংগীতের জনপ্রিয়তা। কিন্তু মোঘল আমলে উচ্চাঙ্গ সংগীতচর্চা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পঞ্জাবী ভাগ ও সারং ছাড়াও টপ্পা খেয়াল, ধ্রুপদ, ঠুমরী চর্চায় বহু বিশিষ্ট সংগীত সাধক সেকালেই সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন রওশন খান, গোপাল, রহিম বসাক, মিঞা হাবিব, স্বপন খান, হামিক মোহাম্মদ, হোসাইন, ঈমাম বক্স, মিতান খান, মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক, কালু খান, রাজা কালীনারায়ণ রায়, মোহাম্মদ খান, মিঃ আলি মাহদী, মিঃ গুলাম মোস্তাফা, হাকিম রমজান, খাজা শাহজাদা প্রমুখ। "খাজা আহসানউল্লাহ হারমোনিয়াম বাজানোতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। সালাম ও আখতার সেইসময়ের প্রসিদ্ধ হারমোনিয়াম বাদক। নবাবপুরের বসাকরা পাখোয়াজ জনপ্রিয় করেছিলেন। রামকুমার কিশোরী, মোহন বসাক, কৃষ্ণলাল সূত্রধর ও হরিনাথ কর "পাখোয়াজ"-এ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এনায়েত খান

সরোদের মাস্টার ছিলেন। নবাব খান (সাবহান, দেওয়ান মিনু মিএগ্রা, ভাবান দাস বৈরাগী ও *শ্যামদাস প্রমুখ দক্ষ সেতার বাদক ছিলেন। শ্যামদাস সরোদ বাজানোতে দক্ষ ছিলেন।* (ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯৩। পৃঃ ১৪৭)

জেমস টেলরের বিবরণে আছে, তাঁর সময়ে ঢাকার হিন্দুদের মধ্যে বেহালার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। ভায়োলিন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ভায়োলিন তৈরির কারখানাও স্থাপিত হয় ঢাকায়। প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ ভায়োলিন তৈরি হত। গোঁসাই ও বৈরাগিরাই এই বাদ্যযন্ত্র বেশি ব্যবহার করত। মুসলমানরা পছন্দ করত সেতার।

ধীরে ধীরে ঢাকা পরিণত হয়েছিল সংগীত নগরীতে। ধনী গৃহে সংগীতচর্চার রেওয়াজ ছিল। তাছাড়া যে কোনও আনন্দানুষ্ঠানে বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম ছিল বাঈজি নাচ। ঢাকার ধনীরা এইসব বাঈজিদের নিয়ে আসতেন কলকাতা থেকে বা ভারতের অন্য কোথা থেকেও। এই বাঈজিদের কেউ কেউ ঢাকায় থেকে গিয়েছিলেন। ঢাকায় সংগীত ও নৃত্যকে জনপ্রিয় করে তোলার পিছনে বাঈজিদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। সে সম্পর্কে বহু বিবরণও পাওয়া যায়। মোঘল আমল থেকেই ঢাকায় তাদের সমাদর বাড়ছিল। ঢাকায় পরবর্তীকালে বাঈজি নাচ-গানের সঙ্গে খেমটা নাচ-গানেরও ব্যাপক প্রসার ঘটে। যদিও খেমটা নাচ-গান ছিল চটুল এবং আদি রসাত্মক। আর বাঈজিদের নাচ-গান ছিল আভিজাত্যের রুচিসম্মত। ঢাকার সেকালের নামী বাঈজিদের মধ্যে ছিলেন সুপন জান, এলাহীজান, আবেদি বাঈ, আন্নু, গান্নু ও নওয়াবীন, পিয়ারী বেগম, আচ্ছি বাঈ, ওয়াসু বাঈ, বাতানি, জামুরাদ, হীরা বাঈজি, পান্না বাঈজি, ইমানি বাঈজি, আমিরজান বাঈজি, রাজলক্ষ্মী বাঈজি, অতুল, লক্ষ্মী, কালীবাঈ, আখের খুকি, আচ্ছন্নবাঈ, মুলতারী বাঈ, জানকি বাঈ, মালকাজান, জগ্গন বাঈ, দেবী বাঈজি, হারমতি বাঈজি, নওবান বাঈজি, কুসুমা, সরোজিনী, হরি, সীতা, ষোড়াশ, ভূবনেশ্বরী, কোহিনুর প্রমুখ। (পুরনো ঢাকার সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ-অনুপম হায়াৎ। পৃঃ ৭১-৭৭)। গহরজান প্রসঙ্গে অনুপম লিখেছেন ঃ "উপমহাদেশের কিংবদন্তির গায়িকা নর্তকী গহরজানও ছিলেন ঢাকার বিনোদন জীবনের সংযোজন। ১৮৭৩ সালে জন্ম তাঁর। মা প্রখ্যাত বাঈজি মালকাজানের সর্বরূপ, গুণ, ছলাকলা শিক্ষাকে ধারণ করে মেয়ে গহরজান হয়ে উঠেছিলেন আলাদা অসামান্যা এক রূপবতী ও গুণবতী বিনোদিনী। ৪০টি ভারতীয় ভাষায় গান গাইতেন তিনি। ১৯০২ সালে তাঁর গাওয়া গানের রেকর্ড প্রথম বের হয়। তিনি ছিলেন খুবই শৌখিন। সবসময় সেজেগুজে থাকতেন। গান রেকর্ড করার সময় বা মুজরায় অংশ নেওয়ার সময় তিনি নিজেকে আরো মোহনীয় আকর্ষণীয় করে তুলতেন নানা অলংকার পরে ও সাজসজ্জা করে। রেকর্ডে গীত তাঁর বিখ্যাত গানের মধ্যে রয়েছে, 'আজ কেন বধূ', 'নিমেষের দেখা যদি', 'হরি বলে ডাকে রসনা' প্রভৃতি। ১৯৪৩ সালে যখন তাঁর বয়স চল্লিশ তখন তাঁর রেকর্ডের সংখ্যা ৩০ ছাড়িয়ে যায়। তিনি গানও লিখেছেন। সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুরের লেখা থেকে জানা যায়, ১৮৯০-এর দশকে ঢাকার কাজীর বাড়ির এক বিয়ের অনুষ্ঠানে তাকে নাচতে ও গাইতে দেখেছেন। গহরজান ১৯২৯ সালে ডিসেম্বর মাসে মারা যান। কাজী নজরুল ইসলামের ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁ গহরজানের কাছে গান শিখেছিলেন।"

ঢাকার নবাব পরিবার ছিল সংগীত ও নৃত্যের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। "নওয়াব আবদুল গনি খান (১৮১৩-১৮৯৬) ও নওয়াব আহসানল্লাহর (১৮৪৬-১৯০১) সময়ে নিয়মিতভাবে আহসান মঞ্জিল দরবারে, শাহবাগ, দিলকুশবাগে, কখনো কোন অনুষ্ঠান উৎসব পাল-পার্বণ, জন্মদিন, বিয়ে এমনকি কৎনা অনুষ্ঠানে নাচ-গান হত। দুই নওয়াবের আমলেই নাচ-গানের শিল্পীদের (বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাঈজি) এস্টেট থেকে মাসিক বেতন-ভাতাদি দেওয়া হত। এদেরকে লখনৌ, কানপুর, কলকাতা, বেনারস, পাটনা এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে আনা হত। ঢাকা এবং পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পীদের সংখ্যা ছিল কম। দরবারিভাবে নৃত্যগীতের

পৃষ্ঠপোষকতা চলে ১৮৭০ থেকে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে নওয়াব আবদুল গনির মৃত্যু পর্যন্ত। দুজনের দরবারে উপমহাদেশের বিখ্যাত সংগীতবিশারদ ও বাঈজিরা অংশ নিতেন নিয়মিত। ১৯০১ থেকে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নওয়াব সলিমুল্লাহর সময় দরবারীভাবে নৃত্যগীতের পৃষ্ঠপোষকতা হ্রাস পায়। এর প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক এবং নওয়াব সলিমুল্লাহের মৃত্যুর পর নওয়াব পরিবারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নৃত্য-গীত আবার চালু হয়। এতে বিভিন্ন বাঈজিরাও অংশ নিত। নওয়াব হাবিবুল্লাহ ও নওয়াবজাদা আতিকুল্লাহ ছিলেন বাঈজি নৃত্যগীতের সমঝদার। ১৯৩০-এর দশক থেকে নওয়াব পরিবারের নৃত্যগীতের ভাটা পড়তে থাকে। এর প্রধান কারণ, বায়োস্কোপ, ক্রীড়া, রাজনীতি, সংবাদপত্র, শিক্ষা, চাকরি, সাহিত্যক্ষেত্রে পরিবারের বিভিন্নজনের পদচারণা। এছাড়া ছিল আধুনিক রুচি ও মূল্যবোধের স্পর্শও।" (পুরনো ঢাকার সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ - অনুপম হায়াৎ। পৃঃ ৭৯)

মেহেদি হোসেনকে মনে রাখেনি কেউ। এই অসাধারণ শিল্পীর শেষ জীবনের একটা ছবি এঁকেছেন প্রতিভা বসু। "আমরা যখন প্রথম ঢাকা এসেছিলাম, মেহেদি হোসেন নামে একজন বিখ্যাত ওস্তাদ ছিলেন সে পাড়ায়। ঠুংরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। সারা ভারতে বড় বড় সংগীত সম্মেলনিতে গান গেয়ে বেড়ান। সব ওস্তাদ তাঁকে একবাক্যে মানেন, চারু দত্তও মানতেন। বিকেলবেলা বাবা আপিস থেকে এলে চা-জলখাবার খাওয়া হলে আমি আর বাবা বাড়ির সামনের জমিটুকুতে যখন বাগান করতাম, খোলা গেট দিয়ে দেখতে পেতাম, সরু পাজামা আর হাঁটু পর্যন্ত লক্ষ্ণৌর কাজ করা পাঞ্জাবি আর টুপি পরে হাতে ছড়ি নিয়ে তিনি হাঁটতে বেরিয়েছেন। মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যাবেলা মা আমাকে বারান্দায় গান অভ্যাস করতে বসিয়ে দিতেন। এইরকম এক সন্ধ্যায় তিনি ঢুকে এসেছিলেন বাড়ির মধ্যে। আমার মা-বাবা কৃতার্থ হয়ে তাঁকে বহু সম্মান দিয়ে আদর করে বসালেন। চা-খাবার খাওয়ালেন। তিনিও সানন্দে তা গ্রহণ করে বসে গেলেন আমাকে গান শেখাতে। তার পাজামা-পাঞ্জাবি মলিন ছিল, সর্বাঙ্গে দারিদ্র্যের ছাপ ছিল, যা ছিল না তার নাম লোভ। সংগীত শিল্পের এমন একটা স্তরে তিনি বিচরণ করতেন যেখানে অর্থ বিত্ত তাঁকে ছুঁতে পারত না। মেহেদি রাঙা দাড়ির ফাঁকে তাঁর হাসিটি সব সময়েই অমলিন। আমাকে গান শেখানোটা বোধহয় তিনি ধর্ম মনে করতেন। যখনি সময় পেতেন হাজির হতেন এসে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে মিষ্টি করে ডাকতেন, খোকিই! অসুস্থ মানুষ ছিলেন মেহেদি হোসেন। অবশ্য বেশিদিন তিনি গান শেখাতে পারেননি।"

এইসময়ে বলদার জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ-রায়চৌধুরীর স্ত্রীকে গান শেখাতেন ভোলানাথ মহারাজ। তিনি ছিলেন এলাহাবাদের ওস্তাদ। জমিদার গৃহিনীকে গান শেখাতে এসেছিলেন। কিছুদিন তাঁর কাছে গান শিখেছিলেন প্রতিভা বসু। তারপর গুরু হিসেবে পেয়েছিলেন আগ্রার ওস্তাদ গোল মহম্মদ খাঁকে। তিনি সংগীত সম্মেলনে ঢাকায় আসেন এবং এখানেই থেকে যান। চারবছর খেয়াল ঠুংরি শেখান। ওস্তাদজি অবশ্য আসরে খেয়ালই গাইতেন।

ঢাকায় এসেছিলেন সমকালের সুখ্যাত সংগীতশিল্পী দিলীপকুমার রায়। তিনি ঢাকায় আতিথ্য পেয়েছিলেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাসভবনে। অধ্যাপক বসু ছিলেন অসাধারণ সুর-রসিক। তাঁর বাসভবনের সংগীত-আসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী অধ্যাপকদের সঙ্গে এসে যোগ দিতেন বহু বিশিষ্ট মানুষ। এমনই একটি আসরে উপস্থিত ছিলেন প্রতিভা বসু। তাঁর বিবরণে আছে : "বাংলা ভাষায় সংগীত সুধা বলে একটা শব্দ আছে। দিলীপ রায়ের গান ছিল এই শব্দের আভিধানিক বিকল্প। শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল শ্রবণ কোন পার্থিব জগতের সুধারসে আপ্লুত নয়, যার নাম স্বর্গসুধা সেই সুধাই দিলীপ রায়ের কণ্ঠস্বরের মর্মস্থানে গিয়ে প্রবিষ্ট হচ্ছে। ... দিলীপদা আমার বাংলা গানের গুরু হলেন। প্রতিদিন সকালে সেই রমনা থেকে বনগ্রামে আমাদের বাড়ি চলে আসতেন, বেশিরভাগ দিন হেঁটেই আসতেন, যাবার সময় ঘোড়ার গাড়ি ডেকে দিতাম আমরা...।"

কিছুকাল বাদে ঢাকায় এসে হাজির কাজি নজরুল ইসলাম। কাজি মোতাহার হোসেনের আতিথ্যে ছিলেন তিনি। প্রতিভা বসু তাঁর কাছেও গান শেখেন। ঢাকায় হারীতকৃষ্ণ দেবের কথাও বলেছেন প্রতিভা বসু।

এ সবই তো হাল আমলের সংগীত সমাচার। কিন্তু প্রথম যুগে ঢাকার সংগীত জগতের কথা জানা যায় হাকিম হাবিবুর রহমানের বিবরণে।

তবলা এবং গান

হাকিম হাবিবুর রহমান

বাংলায় সাধারণভাবে এবং ঢাকাতে বিশেষভাবে তবলার পৃষ্ঠপোষকতার শখ সার্বজনীন। এর বড় কারণ এই যে, এখানে হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ তবলাবাদক সব সময়েই আসা-যাওয়া করতেন... ওয়াজেদ আলি শাহর বিশেষ তবলাবাদক হোসাইন বখশের পুত্র আতা হোসাইনও বাবার মত তবলাবাদনে বিখ্যাত ছিলেন এবং বলা হয়ে থাকে তার বাজানোতে এতই নৈপুণ্য ছিল যে লোকেরা শুধুমাত্র তবলা শ্রবণ করেই মুগ্ধ হয়ে যেত। আতা হোসেইন দীর্ঘদিন ঢাকায় থেকেছেন এবং এখানকার শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরা (আমীরগণ) তাঁর সম্মান করতেন। স্থানীয় তবলা বাদক ছিলেন খয়রাতী জমাদার, ইনি প্রকৃতপক্ষে মাহুতদের জমাদার ছিলেন কিন্তু এই বিদ্যায় তার পূর্ণতা ছিল। দুনী খান যিনি প্রসিদ্ধ তবলা বাদক ছিলেন, প্রথমত তিনি খয়ারতী জমাদারের শিষ্য ছিলেন। অতঃপর মাটিয়া বুরুজ গিয়ে হোসাইন বখশের শিষ্য হন। হোসাইন বখশও কয়েক বার ঢাকায় এসেছেন। অন্য একজন আতা হোসাইন ছিলেন যাকে আতা হোসাইন 'পাথরচাক' বলা হত। ইনি লক্ষ্ণৌর অধিবাসী ছিলেন এবং পূর্বে বর্ণিত আতা হোসেইনের শিষ্য ছিলেন। একশ বছরেরও পূর্বের কথা যে, মিঠন খান যিনি লক্ষ্ণৌর অধিবাসী এবং খুব বড় গায়ক ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তবলা বাজাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে হাত এবং গলা একত্রে খুবই কম দেখা যায়। তিনি এখানে আসেন এবং অধিবাস গ্রহণ করেন। এই মিঠন খান, সুপন খানের নানা ছিলেন। সুপন খানকে আমিও দেখেছি এবং তার বাজানোও শুনেছি। আমাদের বাল্যাবস্থায় সুপন খানের দুর দূরান্ত পর্যন্ত প্রসিদ্ধি ছিল। সুপন খানও প্রথমত জমাদারের শিষ্য ছিলেন এবং পরে যখন হোসাইন বখশ ঢাকা এসে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন, হোসাইন বখশের শিষ্য হন। সুপনের শিষ্যদের মধ্যে খাজা আহম্মদ বখশ এবং বাহাদুর খান, কাজী আলাউদ্দীন মরহুম খুবই ভাল তবলা বাদক ছিলেন। উভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব থাকা সত্ত্বেও সাহসী ছিলেন না এবং কখনই প্রতিযোগিতায় আসতেন না। সুপন খানের স্ত্রীর নামও সুপন ছিল এবং সে ছিল ঢাকার নামকরা ঢারণ এবং নিজেও খুব সুন্দর বাজাত।

এটা ঐ সময়ের কথা যখন সমস্ত হিন্দুস্থানের নামিদামী গায়ক, রবাব এবং সেতার বাদক মর্যাদা লাভের আশায় এখানে বারংবার আসতেন, বছরের পর বছর এখানে থাকতেন এবং ঢাকার এরূপ অনুরাগী হয়ে পড়তেন যে, মিঠন খানের মত এখানেই রয়ে যেতেন। কিন্তু এমনও ছিলেন যে বসবাস তাদের ঢাকায় থাকত এবং ময়মনসিংহ কুমিল্লা এবং সিলেট পর্যন্ত রইসদের দরবারে ঘুরে বেড়াতেন। কাশেম আলী খান রবাব বাদক ছিলেন। রবাব বাজানোর পূর্ণতার জন্য আগরতলা-রাজ তাকে ৫০০ টাকা মাসিক ভাতা প্রদান করতেন। ফয়েজ উদ্দীন খান প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীরী ছিলেন। তাঁর সুরেলা কণ্ঠের চর্চা আজও বিদ্যমান। রওশন খান একজন পঞ্জাবি গায়ক ছিলেন, যিনি সারেঙ্গী ভাল বাজাতেন এবং বেহাগ রাগ বাদনে তার দক্ষতা ছিল। টপ্পাও খুবই ভাল গাইতেন। বলা হয়ে থাকে টপ্পা গানের রেওয়াজ তাঁর থেকেই চালু হয়। মুহম্মদ খানও পঞ্জাবি ছিলেন, তার ভাই কাল্লু খানও গায়ক ছিলেন। মুহম্মদ খান খেয়াল গানে পারদর্শী ছিলেন এবং কালুখান ধ্রুপদ আলাপে পারদর্শী। তিনি মুহম্মদ খানের শিষ্য ছিলেন। হাকিম রমজান

থাকতেন চৌধুরী বাজারে, ঠুমরী রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং তার নাম ছিল 'রম্‌জ'। মিঠন খান যার কথা আগেই বলা হয়েছে, তার খ্যাতনামা শিষ্য ছিলেন শহরের প্রসিদ্ধ ধনী মীর আলি মেহেদী। মীর আলী মেহেদী, মাঝলে সৈয়দ এবং 'আওধ পাঁচ' এর বিখ্যাত পত্র-সম্পাদক নবাব সৈয়দ মুহম্মদের দাদা ছিলেন। তিনি খেয়াল গাইতেন। মীর গোলাম মুস্তাফা মরহুম খাঁটি গদ্য রচনায় বিখ্যাত ছিলেন এবং তাঁকে মির্জা গালিবের অনুসারী বলা হত। তিনিও খেয়াল গাইতেন। দীর্ঘজীবন পেয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর গানও আমি শুনেছি। তাঁর পোশাক আশাকে ছিল বিশেষ ধরনের চেকের এক বহরের পাজামা এবং ঐ চেকেরই হাঁটু অব্দি জামা (কুর্তা), মাথায় কালেবহীন লাল তুর্কি টুপি। এই ছিল মীর সাহেবের সুরত পোশাক।

শেষপর্বের শরিফদের মধ্যে খাজা আবদুর রহিম আছিম যিনি আসলেই 'হরফন মওলা' ছিলেন এবং গান ছাড়া নাচও খুব ভাল জানতেন, অথচ তিনি ছিলেন খোঁড়া। দ্বিতীয়ত ছিলেন খাজা শাহজাদা সাহেব, যিনি অনেক বিষয়ে পারদর্শী, যুবক এবং হাসিমুখ ছিলেন। হারমোনিয়াম বেশি বাজাতেন, সঙ্গীত সম্পর্কেও ভালই জ্ঞাত ছিলেন এবং গান গাইতেন। নবাব স্যার আহসানউল্লাহও সমঝদার ছিলেন এবং হারমোনিয়াম ভাল বাজাতেন। জয়দেবপুরের রাজা রামেন্দ্র নারায়ণ রায় তবলা খুব ভাল বাজাতেন। এই দলের তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ গায়কদের মধ্যে খাজা শাহজাদা মরহুমও ছিলেন। তিনি এবং নবাব সাহেব ঠুমরি এবং হোলির গান লিখতেন এবং অধিকাংশ সময়ে নিজস্ব রচনাই গাওয়া হত। কাশিমপুরের জমিদার সারদাবাবু তবলায় খুব দক্ষ ছিলেন। আমি বৃদ্ধ বয়সে তার তবলা শুনেছি। শহরের প্রসিদ্ধ জমিদার, রাজাবাবু যিনি ভেকন ঠাকুরের জমিদারির মালিক ছিলেন, গান-বাজনার খুব অনুরাগী ছিলেন। তিনি নিজে হোসাইন বখশের ভাল শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন এবং আতা হোসাইন তার বেতনভুক্ত কর্মচারী ছিলেন। তিনি তবলা ভালই বাজাতেন। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের পিতা রাজা কালীনারায়ণ রায়ও ভাল গাইতেন এবং ধ্রুপদ ও খেয়াল বেশি গাইতেন, সঙ্গে সঙ্গে গজলও ভাল গাইতেন। শেষপর্যায়ে তাঁর টপ্পা গাওয়ার শখ হয়ে গিয়েছিল। নবাবপুরের বসাকদের মধ্যে পাখোয়াজের রেওয়াজ বেশি ছিল। খয়রাতি জমাদারের শিষ্য রামকুমার, কিশোরীমোহন বসাক এবং আনন্দমোহন বসাক, এঁরা সকলেই তবলা এবং পাখোয়াজ বাজানোতে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। শেষ উস্তাদ প্রসন্নকুমার বসাককেও আমিও দেখেছি। রামকুমার বসাক বেশিরভাগ আগরতলায় থাকতেন। মহারাজা বীরচাঁদ মাণিক্য যিনি নিজে এই বিষয়ের উস্তাদ ছিলেন এবং খেয়াল ও ধ্রুপদ সংগীত বেশি গাইতেন, রামকুমারের মুরব্বী এবং অনুরাগী ছিলেন। পূর্ণিয়ার জমিদার রাধিকাবাবুও গান গাইতেন এবং তবলা ভাল বাজাতেন। লোকেরা বলে যে, তাঁর গলা খুবই ভাল ছিল। তিনি দুনী খানের কাছ থেকে তালিম পেয়েছিলেন।

এই সময়ে ঢাকাবাসীদের মধ্যেও সংগীত বিষয়ে পারদর্শী বড় বড় গায়ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল এবং পেশা হিসেবে তাঁরা গানবাদ্য করতেন। আমি হাসুগায়কের গান শুনেছি। খাটো শরীর, দেখতে কম আকর্ষণীয় লোক ছিলেন, লক্ষ্মীবাজারে থাকতেন। ছোট তানে মজাদার (সুন্দর) গান গাইতেন। হরি কর্মকার গান এবং বাজনা দুটিতেই পারদর্শী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন উস্তাদের কাছ থেকে শিখেছিলেন। তার খুবই তৈরি গলা (যে কোন ধরনের গানের উপযোগী কণ্ঠ) ছিল। তার শিষ্য এমদাদ মণ্ডীতে থাকতেন। খুব বৃদ্ধ বয়সে কিছুদিন হয় মারা গেছেন। হিন্দু ঘরানাতে তার খুবই কদর ছিল। এই শিল্পের প্রতি খুব একটা আকর্ষণ ছিল না, হয়ত এ কারণে তার গান আমার কখনও ভাল লাগেনি। পেশাদার গায়কের মধ্যে আলি আহম্মদ খান এবং কাশেম আলি খান বাইরের ছিলেন এবং এখানেই অধিবাস গ্রহণ করেছিলেন। কেষ্টদাস সূত্রধর, হরিনাথ কর্মকার দুজনেই পাখোয়াজে পারদর্শী ছিলেন। এনায়েত খান যার কবর জয়দেবপুরে অবস্থিত খুবই নামকরা বাদক ছিলেন। এখানে সেতারের অনুরাগও সর্বদাই ছিল। আর কেনই বা থাকবে না, সেতারের উদ্ভাবক আমির খসরু অনেকদিন বাংলার অবস্থান করেছিলেন। নবাব সৈয়দ

আবদুস সোবহান, যিনি আসলে ঢাকার মুকিমপুরের ছেলে, ভাল সেতার বাজাতেন। দীওয়ান মিনু মিয়াও সেতার সুন্দর বাজাতেন। আমি উভয়ের সেতার বাজান শুনেছি। পেশাদারদের মধ্যে ভগবান দাস বৈরাগী এবং তার ভাই শ্যামদাসও ভাল বাজাতেন কিন্তু শুধু গীত বাজাতে পারদর্শী ছিলেন। শ্যাম এস্রাজও ভাল বাজাতেন। উভয়েই মনের দিক থেকে খুবই সৎ ছিলেন এবং শান্তিপুরের নবীনচাঁদ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। উভয়েই বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

আমি খুবই ছোটবেলায় গনি মিয়ার চাখানার নাম শুনেছি। অর্থাৎ নবাব স্যর আবদুল গনির বাড়িতে সকালে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা টেবিলে জমা হতেন এবং চা পান করতেন। এটা তেমন কিছু গুরুত্ববহ নয়। কিন্তু বাড়তি ব্যাপার এই ছিল যে, ঐ টেবিলে শহরের নামকরা বাঈজিরা (তাওয়ায়েফ) উপস্থিত হত। তাঁদের সফরসঙ্গীরা অন্য কামরায় থাকত। যদি ইচ্ছা হত তা হলে কেউ কিছু রাগ আলাপ করত। এভাবে শ্রবণ সুখও লাভ হত। বাঈজি যারা টেবিলে উপস্থিত হত, তাদের এক লম্বা তালিকা রয়েছে। নবাব সাহেবের সরকার থেকে তাদেরকে মাসিক বেতন দেওয়া হত। এদের সকলেই আবার আপার ইন্ডিয়াবাসী ছিল। এঁদের মধ্যে দু'চারজনের নাম যা স্মরণে আছে, পেশ করছি। আন্নু, গান্নু এবং নওয়াবীন তিন বোন ছিল, নওয়াবীন খুবই খ্যাতি পেয়েছিল এবং এটিই ছিল সবচেয়ে কমবয়েসি। এই কিছুদিন হল বৃদ্ধ হয়ে মারা গেছে। এরা তিনজনে বাড়িঘর, বাগিচা সবকিছু তৈরি করেছিল। এদের আত্মীয়স্বজন এখনও রয়েছে। এলাহীজান... এখানেই অধিবাস গ্রহণ করেছিল। তার ভাইয়ের সন্তানসন্ততি এবং তার নাতনি জীবিত আছে। আবেদি সম্ভবত পাটনার। তার এক মেয়ে এখনও জীবিত। পিয়ারী সন্তানহীনা বিহারের অধিবাসী ছিল। আছি একেবারে লক্ষ্ণৌর এবং নৃত্যপটিয়সী ছিল। ঢাকায় এরূপ নৃত্যপটিয়সী আর আসেনি। ত্রিশ বছর হল মারা গেছে। তার কাছ থেকে অনেকে নাচ শিখেছিল। দাসু প্রকৃতপক্ষে 'ঢারণ' ছিল এবং খুব লম্বা চওড়া মহিলা, পাটনার দিকের অধিবাসী ছিল। নিজের পেশা ছেড়ে বাঈজি হয়ে গিয়েছিল। তার মেয়ে জমরদ যুবতী বয়েসেই মৃগিতে আক্রান্ত হয়েছিল। উস্তাদি গান গাইত। আমি তার গান অবুঝ বয়েসে শুনেছি। হীরার নাচ তার বৃদ্ধাবস্থায় দেখেছি। কালো মুখ মহিলা কিন্তু তার কন্যা পান্না গজল পরিবেশনে সুনাম অর্জন করেছিল এবং নাচেও ভাল ছিল। সেও ইউপি'র বাসিন্দা এবং সেই একমাত্র, যে জীবিত এখান থেকে ফিরে গেছে অন্যথায় আর সকলে এখানেই সমাহিত হয়েছে। আমিরজানও প্রসিদ্ধ নাচ-গান-ওয়ালি মহিলা। এছাড়া শহরে স্থানীয় কিছু বাঈজি হিন্দু (তাওয়ায়েফ) ছিল যাদের মধ্যে অতুল বাঈ, লক্ষ্মী বাঈ, রাজলক্ষ্মী প্রসিদ্ধ। রাজলক্ষ্মীর একটি স্মারণিক ইসলামপুরের জিন্দাবাহার গলির মোড়ের কালী মন্দির, যা বড় ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং রাজলক্ষ্মীই পুনর্নির্মাণ করিয়েছিলেন। যা হোক এ সকল বাঈজিদের (তাওয়ায়েফ) কারণে ঢাকার সংগীত পিপাসা নিবৃত্ত হতে থাকে। খুবই অবিচার করা হবে যদি 'খেমটা' নাচওলাদের সম্পর্কে কিছু বলা না হয়। খেমটা বাংলার প্রসিদ্ধ নাচ, যা একাকী নাচা যায় না এবং জোড় বেঁধে নাচা হয়ে থাকে। অবশ্যই এ নাচ পৃথক এবং অনেক কিছু 'কবুতরনী' নাচের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। এরা অধিকাংশই বাংলা গান গায় এবং কখনও হিন্দি ঠুমরিও', যদিও এদের মধ্যে কেউ উন্নতি করে তবে তাওয়ায়েফ বলে গণ্য হয়। সুতরাং শেষপর্বের হিন্দু বাঈজি 'কুহকী' নামের তাওয়ায়েফ এ ধরনের একজন।

আমি নিজের বালক বয়সে এবং কিশোর, ১৪, ১৫ বছর বয়েসেও দেখেছি যে, ঢাকার অনেক অনেক মহল্লায় বৈঠকখানা রয়েছে। এসব বৈঠকখানা কী? একটি বাড়ি যা বেশিরভাগ দোতলা হত, যার ঘর ভাড়া নেওয়া হত। ভাড়া চাঁদা থেকে পরিশোধ করা হত। প্রত্যেক বৈঠকখানার আলাদা আলাদা সদস্য ছিল। এদের মধ্যে বৃদ্ধরাই থাকতেন। তাস, পাঁচিছি, দাবা, গুনজাফা, পাশা ইত্যাদি খেলার সরঞ্জাম থাকত, যার যা পছন্দ হত খেলত। ঢোল, তবলা, মজিরা, সেতার, তাম্বুরা, বাঁশি, বয়লা, হারমোনিয়ামও পাওয়া যেত। আর এদের অনুরাগীরা নিজেদের কাজ

করত। কখনও কখনও এসব বৈঠকখানায় বা-কায়দা মাহফিল হত এবং যদি কোন নামকরা উস্তাদ এসে যেতেন তা হলে আমন্ত্রণ দেয়া হত। এগুলি যেন ঐ সময়কার ক্লাব ছিল। এসব বৈঠকখানার ব্যাপারে নবাবপুর সমগ্র শহরে মর্যাদার অধিকারী ছিল। কেননা সেখানে অনেক বৈঠকখানা ছিল এবং সম্ভবত আজও এক আধটি বর্তমান। এসব বৈঠকখানায় সন্ধ্যার পর চাকুরীজীবী এবং দোকানদাররা অবসর সময়ে উপস্থিত হত এবং গান বাজনা করে প্রফুল্ল হত বা খেলা করে মস্তিষ্কের ক্লান্তি দূর করত। এসব বৈঠকখানা থেকে চারিত্রিক ফায়দা এই হত যে, যুবকরা এদিক ওদিক বিপথগামী হতে পারত না এবং এভাবে তাদের চরিত্র মাধুর্য বজায় থাকত। আমি বলি যে, এগুলি ছিল তৎকালীন সংগীত বিদ্যানিকেতন, কেননা বৈঠকখানার সদস্যদের ছাড়াও প্রত্যেক বিষয়ে পারদর্শী গুণীদের আসা-যাওয়া অধিকাংশ সময় থাকত এবং এভাবে তালিমের ধারা অব্যাহত থাকত। আমার জানা আছে যে, বাইরে থেকে যখন কোন উস্তাদ আসতেন তখন তাকে কোন নামী বৈঠকখানার অভিভাবকত্বের আশ্রয় নিতে হত। অন্যথায় ধনী গণ্যমান্যদের বাড়িকে তিনি পৌঁছতেই পারতেন না।

চারণ এবং মীরাসীদের একটি দল ছিল। নবাব স্যর আহসানউল্লাহ এবং তদীয় পিতা নবাব স্যর আবদুল গনির অভিভাবকত্বে লক্ষ্ণৌ, রামপুর এবং বানারস থেকে ডোমনিদের কাফেলা আসত এবং বছরের পর বছর থাকত। খোদ ঢাকাতেই মীরসীদের প্রাচীন ঘরানা ছিল। কিন্তু এখন তাদের মধ্যে একমাত্র যে জীবিত সত্তা সেও কবরে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। সে অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আজও আসে যদিও তার গান আজ আর গান নয় বরং অতীত যুগের ওপর ক্রন্দনই এবং তাও বিরূপ ক্রন্দন। অবশ্য, হ্যাঁ, নতুন এক আধজনা বেরিয়েছে সত্য, কিন্তু না কোন তালিম না দীক্ষা এবং আগামীতে উন্নতির সম্ভাবনা, যেন সেই বাগিচাই জ্বলে গেছে। যেখানে বসন্ত আসার কথা ছিল।...

ঢাকা পঞ্চাশ বছর আগে। পৃঃ ৮৫-৮৯

ঢাকার সংগীত-সমাজ

সুকুমার রায়

...গান-বাজনার পথটা ঢাকায় তিরিশ দশকেও বড়ো হেয় বলে গণ্য করা হত। কিন্তু সেইসঙ্গে একদিকে স্বদেশি গানের রেয়াজ আর অন্যদিকে ছিল ব্রহ্মসংগীতের প্রচলন। দেশাত্মবোধক নানা গানের প্রচলনের সঙ্গত কারণ ছিল। মুকুন্দ দাসের যাত্রা ঘুরে ফিরে পাড়ায় পাড়ায় চলত। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের গানগুলোও প্রচলিত হয়েছিল। বিপ্লবী ভূপেন রক্ষিতের পিতা যোগেশ রক্ষিত, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালের গান শেখাতেন। তখন বাড়ির মেয়েরা, যারা স্কুলে যেত, তাদের মধ্যে হারমোনিয়াম বাজিয়ে সা রে গা মা সাধার প্রচলন হয়েছে। নিতান্ত ছেলেবেলায় স্কুলের প্রাইজ বিতরণী অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের গান করেছিলাম। সেই থেকে বাড়িতে বাধা সত্ত্বেও গানের টান থেকে গেল। পাড়ায় কিশোরদের থিয়েটারের জন্য দাদার (বিপ্লবী অনিল রায়) ডাক এল। লীলাদির (তখনকার লীলা নাগের) বাড়িতে থিয়েটার। লীলা নাগকে কে না জানত? বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সম্মানিত ছাত্রী। সেই থিয়েটারসূত্রে ঢুকে পড়লাম তরুণ দলে। কুস্তি করা, বই পড়া, শেষ রাতে উঠে মাঠে দৌড়ঝাঁপ, কুচকাওয়াজ, হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা চালান— এসবই হল নিত্যকার রুটিন। এরমধ্যেই চলত গান শেখা, ঘুরে ঘুরে গান করে চাঁদা আদায়, জনসভায় গান—এসব নিয়ে দিন কেটে গেছে। দল বা দলের কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার উপায় ছিল না সেদিন।

বাড়ির কাছাকাছি জগন্নাথ হল। ছেলেবেলা থেকেই আমরা কমনরুমে যাতায়াত করি। পত্রিকা দেখা, বড়োদের সঙ্গে টেবিল টেনিস ও কেরাম খেলার সুযোগ পাওয়া যেত। বড়োরা স্নেহের চোখে দেখতেন। জগন্নাথ হল আর ঢাকা থিয়েটার, বক্তৃতা, সরস্বতী পুজোয় যাত্রা গান

আর অন্যান্য উৎসবে কোন না কোনভাবে আমরা ঢুকে পড়তাম। ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথকে তো এখানেই দেখেছিলাম। মনে পড়ছে, রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় আসবেন। সাড়া পড়ে যায় চারদিকে। লাইন করে আমরা—স্কুলের ছেলেরা—সদরঘাটের নর্থব্রুক হলের সামনে দাঁড়িয়ে, নারায়ণগঞ্জ থেকে তিনি আসছেন। এরপর আমরা দৌড়ে গিয়েছিলাম পিনিসবোটের কাছে যেখানে কবির প্রথম থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এখানে ছাত্রীরা ও অনেকে সংবর্ধনা করেছিল রবীন্দ্রনাথকে, মেয়ের দলসহ লীলাদিকে দেখেছিলাম মালা পরিয়ে দিতে। সদরঘাটের পার্কে যেখানে মঞ্চ তৈরি হয়েছিল, সেখানে নদীর ওপার থেকে অস্তরবির সোনালি রশ্মি এসে কবির মুখে পড়েছিল। রঙের অজস্র ধারায় রঙিন রবীন্দ্রনাথ অস্তাচলগামী সূর্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে অপূর্ব বাণী বিস্তার করেছিলেন, আজও হয়ত কারো কারো মনে থাকতে পারে। এরপর রমনায় রমেশচন্দ্র মজুমদার মশায়ের কুঠিতে ঘুর ঘুর করে বার বার কবিকে দেখে নিয়েছিলাম। সেদিনের কবি-দর্শন প্রথম প্রেমের মতো সজীব।

সে যুগে ছোরাখেলা, লাঠিখেলা, কুচকাওয়াজ আর অগ্নিদীক্ষার দিন কেটে যাচ্ছিল দ্রুতবেগে। আমাদের মধ্যে দু-একটি ধন্যি ছেলে আগ্নেয় অস্ত্র হাতড়াতো, তাদের মধ্যে ভীষণতম দায়িত্ব নিয়ে কেউবা কিছুদিনের মধ্যেই চলে গেছে জেলে, কেউবা নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। এমনি করেই ১৯২৯ সালের পর থেকে দিনগুলো এসেছিল অগ্নিস্ফূরণ নিয়ে। সতীর্থ, সহপাঠী, ভাই দাদাদের অনেকে বন্দি হতে লাগল। আগুনের খেলায় প্রাণ দিতে এগিয়ে গেল অনেকে। মোটামুটি দুটো বছরের মধ্যে অনেকেই যখন রাজবন্দি, তখন কতকটা পালিয়ে ফিরছি। নেহাৎ ভাল মানুষটি সেজে সংগীতেব আশ্রয় নিয়েছিলাম। ১৯৩১ সাল থেকে এস্রাজ যন্ত্রটি অবলম্বন করে সংগীত শেখার শুরু। কতকটা ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ না করলে এ সময়ের কথা লেখা যায় না, কারণ বিষয়বস্তুর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্কিত ছিলাম। গানের সঙ্গে তত্ত্ব শেখার চেষ্টা সেই সংগীত শেখার সূত্রে। বীণামন্দির নামে সংগীতযন্ত্রের ছোট একটি দোকানে বসে সংগীতের আড্ডা মন্মথ রায় বা পিলু বাবুকে কেন্দ্র করে। এবারে পুলিশের নেক নজর থেকে মুক্ত হওয়া গেল। পিলুবাবু সিলেট সুনামগঞ্জের জমিদার পরিবারের লোক, যদিও বাড়ি ছিল ঢাকা মানিকগঞ্জে। সুশিক্ষিত সংস্কৃতিসম্পন্ন এই পরিবারের কয়েকজনই অধ্যাপক ছিলেন। পিলুবাবু সেকালের গ্র্যাজুয়েট, প্রথম জীবনেই স্ত্রী বিয়োগের পর থেকে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেননি। পাড়ায় হোমিওপ্যাথি ওষুধ বিতরণ, যন্ত্র তৈরি দেখাশোনা আর সারাদিন এস্রাজে রাগালাপ করে দিন কেটে যেত। সখের বাদ্যযন্ত্র তৈরির দোকান বললে ভুল করা হবে। কারণ রাজেন্দ্র মিস্ত্রি নামে এক সুদক্ষ কারিগর এই দোকানটির প্রাণকেন্দ্র ছিল। রাজেন্দ্রর হাতে তৈরি যন্ত্রের নাম ছিল খুবই, বহু সংগীতজ্ঞ এসে উপস্থিত হতেন। এখানেই সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। ময়মনসিংহ থেকে তিনি এসেছিলেন যন্ত্র কেনার জন্য, আর তাঁর অধ্যাপক, পিলুবাবুর অনুজ ড. সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। পরে সতেন্দ্রনাথ রায় চারুচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন কিছুকাল। সুরেশবাবুর আলোচনা আমাদের অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। তিনি তখন পণ্ডিত ভাতখণ্ডের মতামতের সমালোচনা করছেন আর এস্রাজের চমকপ্রদ মসিদখানি গৎ শোনাচ্ছেন।

পিলুবাবু ছিলেন আলাপি। গতের প্রস্তুতি তাঁর ছিল না। কিন্তু গতে নোটবই পূর্ণ ছিল। রাগের রঙ ও রূপের বৈশিষ্ট্য সন্ধানী তিনি আলাপের সরল রূপ প্রকটিত করতেন। সৌন্দর্যতত্ত্বের বোধ দিয়ে পিলুবাবুর সংগীত আলোচনা ভাল লাগত। পিলুবাবুর কাছে রাগালাপ শুনতেন প্রফেসর সত্যেন বোস। তাঁকে কখনো জগন্নাথ হলের আসরে আমন্ত্রণ করাও হত।

তখন ঢাকায় ছাত্রসমাজের মধ্যে সংগীতসচেতনতা ধীরে ধীরে জাগছে। কোথায় গান জমে? কোন এলাকায় গান-বাজনা চলে? কোথায় গানের নিয়মিত আসর আছে?—এ খবর জানতে আর বাকি নেই। ধ্রুপদে আর পাখওয়াজ বাদনে নবাবপুরে আসর জমে বেশি। এ এলাকায়

সেকালেও হরি কর্মকারের সাগরেদ এমদাদ খাঁর পসার কিছুটা ছিল। কিন্তু বিষ্ণুপুরী ভঙ্গির গানের প্রতি সাধারণের আকর্ষণ ছিল না। ধ্রুপদের আসরে মারধর চলত বেশি—গায়ক জেতে না বাদক জেতে। তবু অন্যান্যের চেয়ে এমদাদ খাঁর প্রতিপত্তি কিছুটা বেশি ছিল।

ঝুলনের রাত্রিতে এদিকে-ওদিকে বহু ঠাকুরবাড়িতে বসত গানের আসর। নবাবপুর, বনগ্রাম, নারিন্দা, ফরাশগঞ্জ, তাঁতিবাজার—সর্বত্রই ঝুলনের গান। জাঁকিয়ে আসর জমে বহু রকমের—গায়ক, বাঈজি, যন্ত্রী, কীর্তনিয়া প্রভৃতিদের নিয়ে। ছাত্রদল বেরিয়ে পড়ে গানের সন্ধানে ঝুলনের রাত্রিগুলিতে। হরি ওস্তাদ যে ধ্রুপদীয়া রেখে গিয়েছিলেন যুগরুচি সম্পন্ন যুবকেরা তা মোটেও গ্রাহ্য করেন নি। তাই ওরা বলতেন, এ পথে নয়। ধ্রুপদের মারধরের আসর থেকে বেরিয়ে খেয়ালের খোঁজ করে। সুরেলা কণ্ঠের অভাবে আর গায়কীর দুর্বলতার জন্যে ওরা তাল নিয়েই বেশি ব্যস্ত। ঢাকার বিখ্যাত তবলাবাদক প্রসন্ন বণিক কলকাতায় তখন বেশি সময় থাকেন। প্রসন্ন বণিকের শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ তখন ভাল বাজিয়ে। কিন্তু প্রসন্ন বণিক তাঁর গ্রন্থ ও বাজনার দ্বারা যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছিলেন তা বজায় থাকেনি। ঢাকার তবলার খ্যাতি চারদিকে। প্রাচীন যুগে সাধু ওস্তাদ, সুর্পন খাঁ, দারিকা সফরদার ছিলেন নামজাদা তবলাবাদক। প্রসন্ন বণিক মশায় নাকি মুর্শিদাবাদের আতা হোসেনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

বেরিয়ে পড়ি ঝুলনের রাত্রিতে। সারা শহরময় ঘুরতে ঘুরতে যেখানে মন বসবে সেখানেই বসে পড়ব। লক্ষ্মীনারায়ণজীর বিখ্যাত মন্দিরে দুই মহেন্দ্র বসাককে ঘিরে আসর জমেছে ধ্রুপদের—একজন গায়ক অন্যজন পাখওয়াজি। গান কিছুদূর এগিয়েছে। মাত্র গুটিকয় শ্রোতা। হঠাৎ গান পড়ে গেল তালের গর্তে। গান মাঝামাঝি এসে মারামারিতে সমাপ্ত হবার উপক্রম। সুর তো পালিয়েই ছিল। আমাদেরও পলায়ন। ঘুরে ঘুরে এলাম এবারে লালমোহন সাহার বিরাট নাটমন্দিরে। এখানে বাঈজির আসর জমেছে। ঢাকা শহরের নানা জায়গায় রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের ছড়াছড়ি। ঠাঁটারিবাজার, বনগ্রাম, নবাবপুর, তাঁতিবাজার, লক্ষ্মীবাজার, নারিন্দা—কোথায় নেই? অনুরূপ নাটমন্দির ছিল নবাবগঞ্জ ও চৌধুরীবাজারে। বিশিষ্ট জন্মাষ্টমি মিছিল হত দুটো এলাকাকে কেন্দ্র করে—নবাবপুর একদিকে, তাঁতিবাজার, ইসলামপুর অন্যদিকে। সে কথা থাক। লালমোহন সাহার ঠাকুরবাড়িতে ঢুকতে যাওয়া এক সমস্যা। হঠাৎ পথ পাওয়া গেল। নিচের চত্বরে রাশি রাশি আলোকমালা ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। ঘিরে বসে দর্শকমণ্ডলী। পান, পানীয় ও আতরের সুগন্ধ ছড়িয়ে গিয়েছে আসরে। তিন-চারজন বয়স্কা নাচনেওয়ালির দিকে চেয়ে দেখি এখানে শ্রাব্য কোন বিষয় নেই এখন, শুধুমাত্র গোলমাল আর তালগোলের দৃশ্য। কাছাকাছি দুটো লোক ঘুরে ঘুরে বাজাচ্ছে সারিন্দা। বেশিক্ষণ দাঁড়ান হল না। বেরিয়ে পড়লাম অন্য সংগীতের সন্ধানে। উত্তর মৈশুণ্ডির এক সাধারণ মন্দিরে অসাধারণ ভিড়। তখন চলেছে ভগবান সেতারির সেতার বাজনা আর গোলাপ তবলচির সঙ্গত। ভগবান সেতারির বাজনা সুত্রাপুরে গিয়ে কাছে বসেই শুনেছি, এখানে আর শোনা সম্ভব হল না।

বনগ্রামের পথ দিয়ে ফিরে যাচ্ছিলাম। নবাবপুরের শেষ মাথায় লালু পাল আর টোকানি পালের দুটো নাটমন্দির—এখানে পাল্লা দিয়ে ঢপকীর্তন চলে। কীর্তন শোনার মানসিকতা নেই। কাজেই যুগীনগরে গলির মধ্যে নিরিবিলি একটি আসরের দিকে এগিয়ে গেলাম। খেয়াল গান চলেছে। টপ্পা হবে। ঠুমরিও হবে। ঢাকায় এককালে হস্মু মিয়ার টপ্পা আর রোহিনী ঠুমরির সমধিক খ্যাতি ছিল। হস্মু মিয়া পশ্চিমাঞ্চল থেকে এসে বসতি স্থাপন আগরতলা রাজবাড়িতে তার নিয়মিত মুজরা হত। ইসলামপুরের বিশিষ্ট কয়েকটি মুসলমান গায়ক দলের মধ্যে গজল এবং কাওয়ালির সমধিক প্রচার ছিল। এখানেই হস্মু মিয়া বেশি সময় কাটাতেন শুনেছি। যেখানে এলাম—খেয়াল গান চলেছে। গাইছে দুজন তরুণ গায়ক হারমোনিয়াম বাজিয়ে। ভাল লেগে গেল। মাথায় টুপি পরে মাঝখানে বসে আছেন ওস্তাদ হেকিম সাহেব—হেকিম মুহম্মদ হোসেন, ঢাকায় মামুদ হোসেন নামেও পরিচিত। এখানকার

গান টেনে নিয়েছে তরুণদের। বসে পড়লাম।

তরুণ কণ্ঠের কায়দা আর ভঙ্গি আকর্ষণ করে নিয়েছিল অনেককে। দুজন গায়ক একসঙ্গে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইছিল। গান শেষ হল। এবারে অনুরোধ হল : 'হেকিম সাহেব গান করবেন'। সেকালে ঘোষণার রীতি ছিল না মোটেও। হেকিম সাহেব তানপুরা মিলিয়ে নিলেন। গান করলেন মধ্যলয়ে কয়েকটি খেয়াল। গানগুলো দীর্ঘ নয়। তানও কয়েকটি মাত্র, কিন্তু গানের স্থায়ী অন্তরা শুনে ভাল লাগল সকলের। এরপর অনুরোধ হল ঠুমরি-টপ্পার। হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিল সাগরেদ রাধাগোবিন্দ ঘোষ। আসর এখানেই সমাপ্ত।

হেকিম সাহেবের সঙ্গে কথা বলছিলাম। জিগ্যেস করি তিনি কি কি গান করলেন?

কানে কানে বললেন, বাগেশ্রীর প্রাচীন বন্দেশ, তারানা, কাশীর টপ্পা আর ঝুলন। আপনি কোথায় থাকেন?

উত্তর শুনেই বললেন, ও আমাদের ওদিকে? আমি নবাবগঞ্জ চৌধুরী বাজার যাব। সেখানেই আমার বাড়ি। ঘোড়ার গাড়ি দিচ্ছেন ওঁরা। চলুন আমার সঙ্গে।

সেকালে ঢাকায় গায়ককে এভাবে যত্ন করা সহজ ছিল না। সঙ্গে জুটে গেলাম। হেকিম সাহেবের চেহারাটি শান্ত, দীর্ঘদেহী, তীক্ষ্ণ নাক ও চাপা ঠোঁট, দাড়ি-গোঁফে সবটা মিলে দেখেই মনে হবে স্বতন্ত্র একজন। গাড়িতে ফিরতে ফিরতে আমার সব খবব জেনে নিলেন—বাড়িতে গান করবার অনুমতি আছে কি না, গাইবার ইচ্ছে কিরূপ? ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহলে অনেক গতিবিধি, তাঁর কাছে গান শেখেন কাজি মোতাহার হোসেন, অঙ্কের অধ্যাপক। পিলুবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডঃ বিনয় রায়ও গান শিখেছেন ওঁর কাছে। আমাকে বললেন, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল সমরেশ রায় মহাশয়কে চেনেন? রেলওয়ে লাইনের পাশেই কোয়ার্টারে থাকেন, প্রতি মঙ্গল-শনিবার ওখানে গান বাজনা হয়। ওখানে আসবেন।

আমন্ত্রণ বিশেষভাবে মনে পুষে রেখেছি। এরপর থেকে সমরেশবাবুর ওখানে বসে শিক্ষা, ওখানে গান করা, গানের রেওয়াজ চলতে থাকে। কোনও সময়ে আমাদের বাড়ি আসেন। এস্রাজ শেখার মারফতে স্বরলিপি আর সংগীতশাস্ত্রের সঙ্গে যে পরিচয় হচ্ছিল, সেইসঙ্গে সমরেশবাবুর তবলা সংগতে গানের কতকটা উন্নতির পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম। সমরেশ রায় চৌধুরী বিশেষ ভারিক্কি লোক ছিলেন। স্যর আশুতোষের মত ছিল তাঁর গোঁফ, চোখ দুটো জ্বলন্ত গুলির মত তীব্র, তৎকালীন সংগীতসভা ইত্যাদিতে সমরেশবাবু প্রধান ছিলেন। তিনি বলতেন, উর্দুর দুর্গালালার কাছে তিনি শিখেছিলেন তবলা, আতা হোসেনের (মুর্শিদাবাদের) বোল তিনি বাজাতেন। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তিনি একজন গানের বিচারকরূপে গণ্য ছিলেন। বহু উদ্দীপনায় ঘটা করে মুহম্মদ হোসেনের কাছে গাণ্ডা বাঁধা সমাপ্ত হল। নিয়মিত আসতেন তিনি। আমাদের বাসার সংলগ্ন মসজিদে নামাজ সেরে এসে বসতেন আমাদের বৈঠকখানা ঘরে। পান খেতেন আর অজস্র খেয়াল, ঠুমরি, টপ্পা শোনাতেন। শিখতে চাইলেই বলতেন, 'হবে, হবে। ভাল করে রেয়াজ করতে হবে। পাকাপাকি করে টপ্পা আয়ত্ত করুন, তাহলে অন্যান্য গানও স্বাভাবিক হয়ে আসবে। 'মুশকিলাৎ' আর 'জমাজমা' তাল সহজ করে নিতে হবে গলার আড় ভেঙে। আমি শিখেছিলাম হস্নুমিয়ার কাছে আর তিনি শিখেছিলেন হবিব মিয়ার কাছে। হবিব মিয়া পাঞ্জাব ও পরে লক্ষ্ণৌতে শিখে ঢাকায় এসেছিলেন। খেয়াল গানের শিক্ষায় গান আরম্ভ হল। সঙ্গে সঙ্গে গলার আড় ভাঙবার জন্য চারটি টপ্পা গান অভ্যাস করতে দিয়েছিলেন। মুহম্মদ হোসেনের কণ্ঠ সুমিষ্ট কিন্তু দীর্ঘকাল অনভ্যাসে গলার গতিশক্তি শিথিল হয়ে গিয়েছিল। মাঝে সাংসারিক বিপর্যয়ে কয়েক বৎসরে গান ছেড়ে দিয়েছিলেন। বেশি বয়সে কয়েকজন শিষ্য মিলে তাঁকে আবার গানের পথে নিয়ে আসেন। নিয়মিত শিক্ষার পরেও তিনি প্রথম বয়সে বহুজনের কাছেই শিখেছিলেন। কলকাতায় কিছুকাল থেকে সেকালে রমজান খাঁ ও মোরাদ আলি খাঁর কাছ থেকে কিছু আদায় করেছিলেন। কলকাতায় কয়েকজনের কাছে কিছুকাল শিখে ঢাকায় আবার ফিরে

আসেন। পঞ্জাবের কালে খাঁ তখন ঢাকায় এসে কিছুদিন ছিলেন। বড়ে গোলাম আলি খাঁর পিতৃব্য কালে খাঁর কাছ থেকেই কিছু সংগ্রহ করেছিলেন ঢাকাতেই। এরপর রামপুরের তসুদ্দুক হোসেন খাঁ ঢাকায় এসে কিছুকাল ছিলেন, পরে তিনি থাকতেন ময়মনসিংহে। তসুদ্দুক হোসেন বিচিত্র রকমের গানের ভাণ্ডারি ছিলেন। মুহম্মদ হোসেন অনেকের সঙ্গেই এই প্রবীণতম ওস্তাদের কাছে বহু সংগ্রহ করেন। যে সময়ে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, সে সবসময়ে ঢাকায় আলাউদ্দীন খাঁও (এদেশে পরিচিত 'আলম') অনেক সংগ্রহ করেছিলেন। পরে ময়মনসিংহে গিয়েও যথেষ্ট সংগ্রহ করেছিলেন। একথা আমার শোনবার সুযোগ হয়েছিল আলাউদ্দীন খাঁ আর মুহম্মদ হোসেনের পরস্পরের আলোচনা শুনে ও চীজ সম্বন্ধে ভাবের আদান-প্রদান লক্ষ্য করে। আলাউদ্দীন খাঁ ১৯৩৬-৩৮ সালে যখন ঢাকায় এসে থাকতেন, পটুয়াটুলির যতীন কোম্পানিতে বসতেন, তখন এ সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের সেকালের অনেক কথা শুনেছি।

মুহম্মদ হোসেনের সংগ্রহ ব্যাপক ছিল। পরবর্তীকালে বহু স্থায়ী, অন্তরা, বহু রাগের গান ভাতখণ্ডে সংগ্রহের সঙ্গে আমরা মিলিয়ে দেখেছি তাঁর গানগুলোর মৌলিকতা।

মোগলটুলি ছাড়িয়ে আরমানিটোলা। চকবাজারের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত। নবাবপুরে যেমন গায়কবন্ধুদের আড্ডা ছিল, আরমানিটোলাতেও তেমনি ছিল কয়েকটি আস্তানা। সরস্বতী পুজো উপলক্ষে গান হত 'জনসন মেডিকেল মেসে'। ঢাকার সংগীতপ্রেমিক ছাত্রসমাজ এখানে ভেঙে পড়ত। প্রতি বছরেই সেখানে আসর বসে পচা নন্দীর, যিনি কালিমপুরের 'পচা' বলে খ্যাত ছিলেন। পচা এমন গান করতেন যে এরপর সেখানে আর কেউ গান জমাতে পারত না। বাঈজিরা একবার যারা জেনেছে পচাকে, তারা মুখ খুলে পচার সামনে গায় না—পাছে পচা চুরি করে নেয়। এসব কিংবদন্তি।

রাত ন'টার পর আসর জমে গেল মেসের দোতালার একটি বড়ো নাতিদীর্ঘ ঘরে। পচা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান শুরু করেছে। তবলিয়ারা ভিড় করে বসেছে চারদিকে—কায়েতটুলির গোলাপের ভাই মহতাব চাঁদ তবলা বাজাচ্ছেন। তবলিয়ারা পচার সঙ্গে সাবধানী। সেকালের গানের সঙ্গে তবলিয়ার সাথ সঙ্গতের রীতি ছিল। লয়কারী ব্যাপারটা গায়কের পক্ষে স্বাভাবিক। পচা একটির পর একটি গান গাইছেন। স্কেল্ এফ্ অথবা এফ্‌শার্প। গানের মুখ আরম্ভ করেই অবলীলাক্রমে জমাট প্যাঁচ কষেন। তৎকালে ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, আর কৃষ্ণচন্দ্র দের রেকর্ডে গাওয়া কতকগুলো গান তাঁর সম্বল। বাংলা গানের চমকদার কতকগুলো মুখ, ভাবোচ্ছল কতকগুলো শব্দবিন্যাস নিয়ে সুরে ও তালে এমন খেলা কখনো দেখা যায়নি। সুললিত কণ্ঠের জোরে ঠোক্ ঠমকে, তানে, কায়দায় রস রসিক যেন নেচে উঠতেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রোতা বসে থাকেন। পচার কাছে বিচার নেই, রবীন্দ্রনাথ নেই, অতুলপ্রসাদ নেই, দ্বিজেন্দ্রলাল নেই, নজরুল নেই—আছে শুধু তাঁদের গানের মূল সুর বজায় রেখে কতকটা নিজের মত করে গাওয়া, আজকাল যাকে রাগপ্রধান বলি সেই রূপের প্রাথমিক ভঙ্গিতে। পচার আসরে সকলেই সমাগত—ওস্তাদ, গায়ক ও ছাত্রসমাজ। কিন্তু পচা ক্লান্তিহীন—এ গানের সীমা নেই, বাঁধন নেই। পচা আপন রুচি ও রসবোধের একটা পথ বেঁধে দিয়েছেন। মধ্যলয়ের কতকগুলো সহজ খেয়াল অত্যন্ত প্রচলিত রাগে গাইবার পর বাংলা গান চালাতেন সম্পূর্ণ ঠুমরি ভঙ্গিতে। শাস্ত্রীয় সংগীতপন্থীরা অশাস্ত্রীয় গানের নিন্দা করেন। গানের নাক-কান উড়িয়ে দেয় পচা—কিন্তু সকলেই শ্রোতা।

পরদিন সকালের আসরে আসেন কুমিল্লার খসরু মিয়া (এঁর নামও মোহম্মদ হোসেন)। খসরু আর একটি হারামোনিয়াম নিয়ে একসঙ্গে দুজনে গানের একটি বিশেষ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে নেন। খসরু মিয়া ভঙ্গি দ্বারা কতকটা শ্রোতাকে আকর্ষণ করেন, কিন্তু পচা সেক্ষেত্রে প্রধান থেকে যায়। খসরু মিয়ার ওস্তাদি ও কৃতিত্ব তবু সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

খসরু মিয়ার প্রকৃত নাম মাহমুদ হোসেন। কুমিল্লার দারোগাবাড়ির ছেলে। কলকাতা থেকে

বি. এ. পাস করেন। প্রথম জীবনে বাঁশি বাজাতেন—ভাল বাদক ছিলেন। শিক্ষাজীবনে বহুদিন কলকাতায় কাটান। গানের আসরে ঘুরে বেড়ান নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। ছেলেবেলা থেকে বাংলা গানেও অভ্যাস ছিল কিন্তু মন ছিল রাগসংগীতের দিকে। কলকাতায় কোনও আসরে খেয়াল গান শুনতে শুনতে গায়কের সঙ্গে নিজ মনে গুন গুন করে তান, পল্টা করতে আরম্ভ করেন। কোন বিশিষ্ট ওস্তাদ গায়কের দৃষ্টিতে এলে পর তিনি খেয়াল গান শিখতে শুরু করেন। সংগ্রহের নেশায় মেহেন্দি হোসেন খাঁ এবং অন্য অনেকের কাছেই যাতায়াত করেন, আসরেও গান করতেন। বি এ পাসের পর তাঁর বাবা তাঁকে এম এ পড়ার জন্য ঢাকা সলিমুল্লাহ হলে আলি নূরের অভিভাবকত্বে রেখে আসেন। কিন্তু খসরু ঢাকা এবং অন্যান্য স্থানে গান করেই বেড়াতেন। সমরেশবাবুর আসরে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। হেকিম সাহেবের কাছ থেকেও কিছু সংগ্রহ করেছিলেন। হেকিম সাহেব তাঁকে ভালবাসতেন। কিন্তু এম এ পড়া আর হল না। এরপর খসরু মিয়া আবার কলকাতায় বেঙ্গল কো-অপারেটিভ, রাইটার্স বিল্ডিং-এর পেছনে 'মিটারস বিল্ডিং'-এ চাকরি করতেন। ঢাকা-কুমিল্লায় যাতায়াত অব্যাহত ছিল। খসরু মিয়ার সাগরেদদের মধ্যে কুমিল্লার সমরেন্দ্র পাল সুখ্যাত ছিলেন। শৈল দেবী সমরেন্দ্র পালের কাছেই শিখেছিলেন। খসরু মিয়ার অন্যান্য সাগরেদ সম্বন্ধে আমাদের আর জানা নেই। নিরন্তর গানের আসরে ফিরে গুণী হিসেবে এমন পরিচিত হয়েছিলেন যে আজকালও কলকাতার কোনও কোন প্রবীণ গায়কের মুখে খসরু মিয়ার কথা শুনেছি। সংগীতে শেষপর্যন্ত তিনি ভাতখণ্ডে সংগ্রহের ওপর খুব বেশি জোর দিতেন। দেশ বিভাগের পর খসরু মিয়া ঢাকায় চলে যান। ঢাকাতেই তিনি লোকান্তরিত হন।

মুহম্মদ হোসেনের দেহান্ত হয়েছিল '৪৬-৪৭ সালে। জ্ঞান গোস্বামীও লোকান্তরিত হন কিছু সময়ের ব্যবধানে। এই দু'জনকে নিয়ে তৎকালীন ঢাকার সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলাম। প্রবন্ধটি ডঃ এস. কে. দে'র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং তিনি আমাকে ডেকে কয়েকটি কথা বলেছিলেন যা আজো মনে পড়ছে। বলেছিলেন, 'টপ্পা গাইবার রীতিকে ভাষায় ভালভাবে কোথাও ব্যাখ্যা করা হয়নি। তুমি মুহম্মদ হোসেনের বক্তব্যগুলোকে আরও গুছিয়ে কখনও সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে লিখবে।' ডঃ দে কেন সংক্ষেপে একথা বলেছিলেন তখনই ভাবতে পারিনি, উনি প্রবন্ধ পড়ে খুশি হয়েছেন ভেবেই ভাল লেগেছিল। পরে বুঝতে পেরেছিলাম, ডঃ এস কে দে-র History of Bengali Literature in the Nineteenth Century, Calcutta 1919, গ্রন্থ পাঠ করে। এই অমূল্য গবেষণাগ্রন্থটি রচনার পূর্বে এ বিষয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান করেছিলেন। টপ্পা গানের রীতি সম্বন্ধে মুহম্মদ হোসেনের মতামত যা কথায় কথায় আলোচনা হয়েছিল তা এই : ১. টপ্পা গানের পঞ্জাবি ভাষায় স্থায়ী অন্তরা বিলম্বিত পঞ্জাবি ঠেকাতে গাইতে হবে। প্রাচীন রীতি অনুসারে বিলম্বিত লয়ে কখনও কখনও দ্রুত তানের সঙ্গে সম্পূর্ণ স্থায়ী বা অন্তরা একেবারে একওয়ার্ধা তালে একেবারে গাইতে হবে। এই রীতিটি বাংলা টপ্পা গানে প্রচলিত নয়। বাংলা গানে তাল যেমন সরল, তানও তেমনি সরল ও স্তরে স্তরে গাঁথা। ২. মূল টপ্পায় একবার তান কথাকে মিশিয়ে আরম্ভ করলে তাকে জমজমা রীতিতে গেয়ে প্রতিবারে সমে ফিরে আসতে হবে। ৩. তানগুলো এক বিশেষ পদ্ধতির বোলতানের মত শোনাবে। বাংলা টপ্পাতে এ ভঙ্গিটা ব্যবহৃত হয় খুবই কম অথবা একেবারেই হয় না ; কারণ বাংলা টপ্পায় ভাবাবেগের প্রকাশ প্রাধান্য লাভ করে। ডঃ এস কে দে এই লক্ষণ বর্ণনা কোন প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন তা তাঁর নিধুবাবুর গান আলোচনা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যায়।

কাশিমপুরের পচার কথা পরের জীবনে কত আলোচনা হয়েছে। ঢাকা রেডিও স্টেশন শুরু হবার পর পচা নন্দী গান করতে আসে। আমরা ভেবেছিলাম তানপুরার যুগে পচা নন্দীর সুবিধে হবে না। কিন্তু রেডিওতে শুনে দেখেছি—সেই উদ্দাত্ত কণ্ঠে, সেই তীক্ষ্ণ সুর প্রতিস্থাপনা, অনায়াস আবেদন আর লয়ের কারিগরি বজায় ছিল। রেডিওর উপযুক্ততা অর্জন করবার জন্য

পচা কিছু চীজ সংগ্রহ করে নিজের ছকে সাজিয়ে নিয়েছিল। আসলে পচা নন্দী ছিল ছেলেবেলায় যাত্রাগানের দলের ছোকরা-গায়ক। অল্প বয়সেই জয়দেবপুরের অন্তর্গত কাশিমপুরের সারদাবাবুর ওখানে আসরে গান করতে শুরু করে দেয়। শেখার সুযোগ ছিল না তেমন। গ্রামোফোন রেকর্ডে জহরাবাঈ আগ্রাওয়ালির গান নকল করে প্রথম পর্যায়ের শিক্ষা। এরপর গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে গান শেখা—এইসব ছিল পচা নন্দীর বিশেষ লক্ষ্য। শুনেই গান দখল করার পটুত্ব ছাড়াও, মনমাতানো হাল্কা ঢং-এ গান উপস্থাপিত করার একটা চমকপ্রদ রীতি উদ্ভাবন করে নিয়েছিল। আমাদের সে বয়সে নির্বিচার মনমাতানো মাইফেল গাইয়ে পচা নন্দী থেকে নিবিড় উন্মাদনা লাভ করা যেত। বিশেষ করে ঢাকা কুমিল্লা ময়মনসিংহে বিভিন্ন গানের আসরে পচা ছিল প্রধান অনুপ্রেরণার উৎস। পরে যখন পচার সঙ্গে গান করবার সুযোগ হয়েছিল তখন লক্ষ্য করেছি ঠুমরি গানে, প্রেমের গানে ওর প্রাণ ছিল অভিষিক্ত। লেখাপড়া জানত না পচা, কিন্তু এই গায়কের কানে পূর্ব বাংলার সংগীতপ্রিয় তরুণ সমাজ ধীরে ধীরে ভাল শ্রোতা হবার পথে এগিয়ে গিয়েছিল। চল্লিশ দশকের পর কখন যে পচার প্রাণবিয়োগ হয়েছিল মনে নেই।

গানের আসরের খোঁজে ঢাকা শহর সাইকেলে চষে বেড়াই। গোয়ালনগরের ওদিকটায় একাধিক আড্ডা ছিল। কোর্টের পেছনদিক দিয়ে খগেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়িতে উপস্থিত হতাম। খগেশবাবু নাট্যক্ষেত্রে আজও পরিচিত। তিনি আগ্রার গুল মহম্মদ খাঁর কাছে গান শিখতেন। সেখানেই প্রথম দেখা। উনিশশো তিরিশের কিছুকাল পরেই গুল মহম্মদ খাঁর গান শুনে প্রথমে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠ, কতকটা চেরা ভারি আওয়াজ। স্থির হয়ে বসে গান করেন, বড় বড় হাত দুটি সুদৃশ্য ভঙ্গিতে বিস্তার ও তানের সঙ্গে অঙ্গুলি সঞ্চালন করে গান করেন। এ যেমন রাগের মীরের অংশ বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা, আবার তেমনই আত্মপ্রকাশেরও দিক। গুল মহম্মদ খাঁ যখন এসেছিলেন তখন তাঁর কণ্ঠে তৈরির আমেজ বেশি ছিল না, প্রচুর সারগম করতেন, রাগের তানগুলোকে সারগম করেই বোঝাতেন। সুদক্ষ ছিলেন। কণ্ঠকে কি করে সুরে নানাভাবে ধ্বনি সামঞ্জস্যে বড় ছোট করে তোলা যায় জানতেন। গান করবার এমন ভঙ্গি ঢাকায় শোনা যায়নি। খগেশবাবুকে শেখাবার সময় লক্ষ্য করা গেল প্রাচীন রীতির 'মেরে সাথ গাও' পদ্ধতিটি। অর্থাৎ এ গান শিখতে হলে থিওরি এবং স্বরলিপি ইত্যাদির চেয়ে শুধু সঙ্গে গাইতে হবে। পরে বহু ক্ষেত্রে গান শুনে অনেককে শেখানো দেখে মনে হল গুল মহম্মদ খাঁ গানের আর একটি রাজ্যের সন্ধান জানেন। যা আমরা এতকাল ঢাকায় শুনেছি তা থেকে স্বতন্ত্র রাজ্য। ওখানে থেকে যে গান আমরা আবদুল করিম খাঁর রেকর্ডে প্রথম শুনেছি। গানের মূল উৎস রাগের ধীর বিস্তার, ধীর ভঙ্গির গান, রাগকে আস্তে আস্তে আয়ত্তের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করা, ছন্দে ছন্দে স্তরে স্তরে সারগমের নানা বিন্যাস দেখান—যদিও সমস্তটাই বাঁধারূপেই বিকাশ। গুল মহম্মদ খাঁ বলতেন তাঁর ঘরানার মূলে বৈরম খাঁ। গুল মহম্মদের পিতার সঙ্গে জহরাবাঈ আগ্রাওয়ালির সম্পর্কও সুবিদিত ছিল। গুল মহম্মদ খাঁ ঢাকায় এসে বসতি স্থাপন করবার পর তাঁর পসার কিছুটা জমে ওঠে। কিন্তু অধিক বয়সে আশ্চর্যরূপে রেয়াজ করে গলার গতিবেগ বাড়িয়ে ফেলেছিলেন। আমরা গুল মহম্মদ খাঁর গান শোনার সময়েই আবদুল করিম খাঁ আর পরে ফৈয়াজ খাঁর রেকর্ডের গান শুনে উত্তর ভারতীয় সাংগীতিক পরিমণ্ডলে খেয়াল গানের ব্যাপকতা সম্বন্ধে আঁচ করতে পেরেছিলাম। পরে কলকাতায় যাতায়াত করে আরও বৃহত্তর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা গেছে। গুল মহম্মদ খাঁ গম্ভীর ও গভীর ভাবদ্যোতক গানের ভঙ্গির দিকে মন টেনেছিলেন। অবশেষে মুহম্মদ হোসেনের অনুমতি নিয়ে একদা গাণ্ডা বেঁধে সাগরেদও হয়েছিলাম। কিছুকাল শিখেওছিলাম। গান সংগ্রহের দিকে অভাব আমাদের তেমন ছিল না, কিন্তু ভঙ্গিটাই ছিল লক্ষ্য। পরবর্তীকালে ইন্দোরের গায়কদের মধ্যে এ ভঙ্গি লক্ষ্য করেছি।

গুল মহম্মদের সমসাময়িককালে আর একজন গায়ক ঢাকায় আসর জমিয়ে বসেছিলেন—

তিনি মহারাষ্ট্রের নারায়ণ রাও, যাকে যোশী বলে অভিহিত করা হয়। হাল্কাভঙ্গির ঠুমরিচালের গান এবং মধ্যলয়ের খেয়াল গেয়ে ঢাকার শ্রোতাসমাজকে মুগ্ধ করেছিলেন নারায়ণ রাও। বহু গায়কের মধ্যে শ্রুতিমাধুর্যের জন্য নারায়ণ রাও-এর ঠুমরি ও খেয়ালের বিশেষ সমাদর হয়েছিল। নিজ ছাত্রছাত্রীদের কেন্দ্র করে তিনি বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ঢাকায়ই থেকে যান। ১৯৩৫/৩৬-এর পর থেকে কলকাতার বিখ্যাত গায়কেরা প্রায় প্রতি বৎসরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও নানাস্থানে আসতে থাকেন। পরে সংগীতের প্রসার হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে গানের আসর বেশি জমে।

মনে পড়ছে কোনও এক শারদ দুপুরে ওস্তাদ হেকিম সাহেব এসে বললেন, চলুন আজ দুপুরে শুভ্যাঢ্যা যাব।

শুভ্যাঢ্যাতে কেন?

বনোয়ারীবাবুর বাড়ি। বনোয়ারীলাল বসুর কথা অনেকেই শুনেছে। বনোয়ারীলাল বসু তখন পাবনা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল। অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে গান শিখতেন—খেয়াল গান করতেন। আমরা তাঁকে দেখেছি ঢাকার গানের আসরে সত্যি যেন সুরসিক গন্ধর্বের উপস্থিতি। ওস্তাদজির সঙ্গে এলাম সদরঘাটে বুড়িগঙ্গার পাড়ে। সেখান থেকে নৌকো করে ভরা নদী পার হয়ে শুভ্যাঢ্যা যেতে বড় ভাল লাগত। নদী কানায় কানায় ভরা। ওপারে পৌঁছে ওখান থেকে মাইলখানেক হাঁটা পথের পর অনেক বাড়িঘর পেরিয়ে গিয়ে ফের নৌকো করে বনোয়ারীবাবুর বাড়ি পৌঁছান গেল। বহু দালানবাড়ি সমন্বিত শুভ্যাঢ্যা গ্রাম ছিল পারজোয়ারের সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু অঞ্চল। শুভ্যাঢ্যাতে আগে আরও এসেছিলাম, শীতকালে বাদামতলি পার হয়ে হেঁটে এবং পরে এসেছি সহপাঠী বন্ধুর বাড়িতে, মুহম্মদ হোসেনের সাগরেদ বিরাজ দাশের বাড়িতে, আরও অনেককাল পরে এক সাহিত্য সভায়।

বনোয়ারীবাবু সাদর সম্বর্ধনা জানালেন। ওস্তাদজির জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বই পড়ছিলেন। গানের আলোচনা শুরু হয়ে গেল। ভাল ঢং-এর লক্ষণ কি হতে পারে? কোনও কোনও ঘরানায় রাগের স্ফূর্তি খুব সুন্দর হয়? ইত্যাদি। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর আলাপ ও তান পল্টা, আবদুল করিম খাঁর গান—এসব আলোচনা হতে হতেই জনৈক লক্ষ্ণৌর গায়ক এলেন বনোয়ারীবাবুকে গান শোনাতে। জানতে পেরেছেন বনোয়ারীবাবু গানের বিশিষ্ট রসিক। তাঁকে গান গাইবার অনুরোধের উত্তরে তিনি বললেন, 'এখন শুধু মৌলিক শ্রোতা হবার চেষ্টায় আছি। অধ্যাপনা শুরুরও পূর্বে ওস্তাদ মুহম্মদ হোসেনজিকে অবলম্বন করে যেভাবে গানের ভেতর ঢুকেছিলাম তাতে আজও গান বোঝার আনন্দ লাভ করছি শুধু।' এরপর সারারাত ধরে খেয়াল গানের আসর হল বনোয়ারীবাবুর বাড়িতে।

১৯৩৬-৩৭ সালে ঢাকায় গানের জোয়ার এসে গেছে—খেয়াল ও ঠুমরির চর্চা চলেছে, নানা গায়ক-বাদকের আনাগোনা বাড়ছে। তখন সুত্রাপুর ছাড়িয়ে কেশব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা নতুন গানবাজনা শোনাবার বিশেষ কেন্দ্র। অন্যদিকে ফরাশগঞ্জে রূপবাবু রঘুবাবুর বাড়ির জমিদারি আমলের পরিবর্তন হয়েছে—কিন্তু নানা ঘরে গানের আসর জমে। যোগেশ দাশ তাঁর জলসাঘরে মাঝে মাঝে আসর জমিয়ে তোলেন। উল্টোদিকের বাড়িতে ওস্তাদ হেকিম সাহেবের ছাত্র রাধাগোবিন্দ ঘোষের আসর জমে। রাধাগোবিন্দ কিছু ঠুমরি আদায় করেছিলেন।

কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একদিকে যেমন বহু বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, কলকাতার কাউন্সিল, বহু সংগীত সম্মেলন ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তেমনি তাঁর জীবন কেটেছে তবলার সাধনায়। তাঁর বড় ছেলে নির্মলকে মসিদ খাঁর কাছে শিখতে দিয়েছিলেন। অত্যন্ত ভাল তবলিয়াতে পরিণত হয়েছিল নির্মল, ঢাকা রেডিও শুরু হবার পর কেশববাবু নিজ পুত্রকে নিয়ে ঢাকাতে তবলার লহরা বাজাবার প্রচলন করেন। যদিও প্রথম জীবনে কেশববাবুর শিক্ষা ছিল প্রসন্ন বণিকের কাছে, পরবর্তী জীবনে অনেকের কাছে শিখে বাদকরূপে সুপরিচিত

হয়ে ভারতের বহু সংগীত সম্মেলনে বাজিয়েছেন, বিখ্যাত গায়কবাদকের সঙ্গে। ঢাকায় কেশববাবুর অবদান অতুলনীয়। ১৯৩৯-এ বেতার কেন্দ্র ঢাকায় শুরু হবার পর থেকে বহু সংগীতজ্ঞ এসেছেন, অনেকেই কেশববাবুর বাড়ি ও তাঁর আসরকে কেন্দ্র করতেন, বিশেষ করে যন্ত্রীদের তো কথাই নেই। এখানেই মসিদ খাঁর বাজনা শোনা হয়েছিল। কেশববাবু শেষ জীবনে নিজে তবলায় দিল্লিবাজ শিখেছিলেন সুপ্রসিদ্ধ নাথু খাঁর কাছে। যন্ত্রীদের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতদার ছিলেন কেশববাবু, ঢাকায় সংগীতক্ষেত্রে সে যুগে তিনি ছিলেন মধ্যমণি।

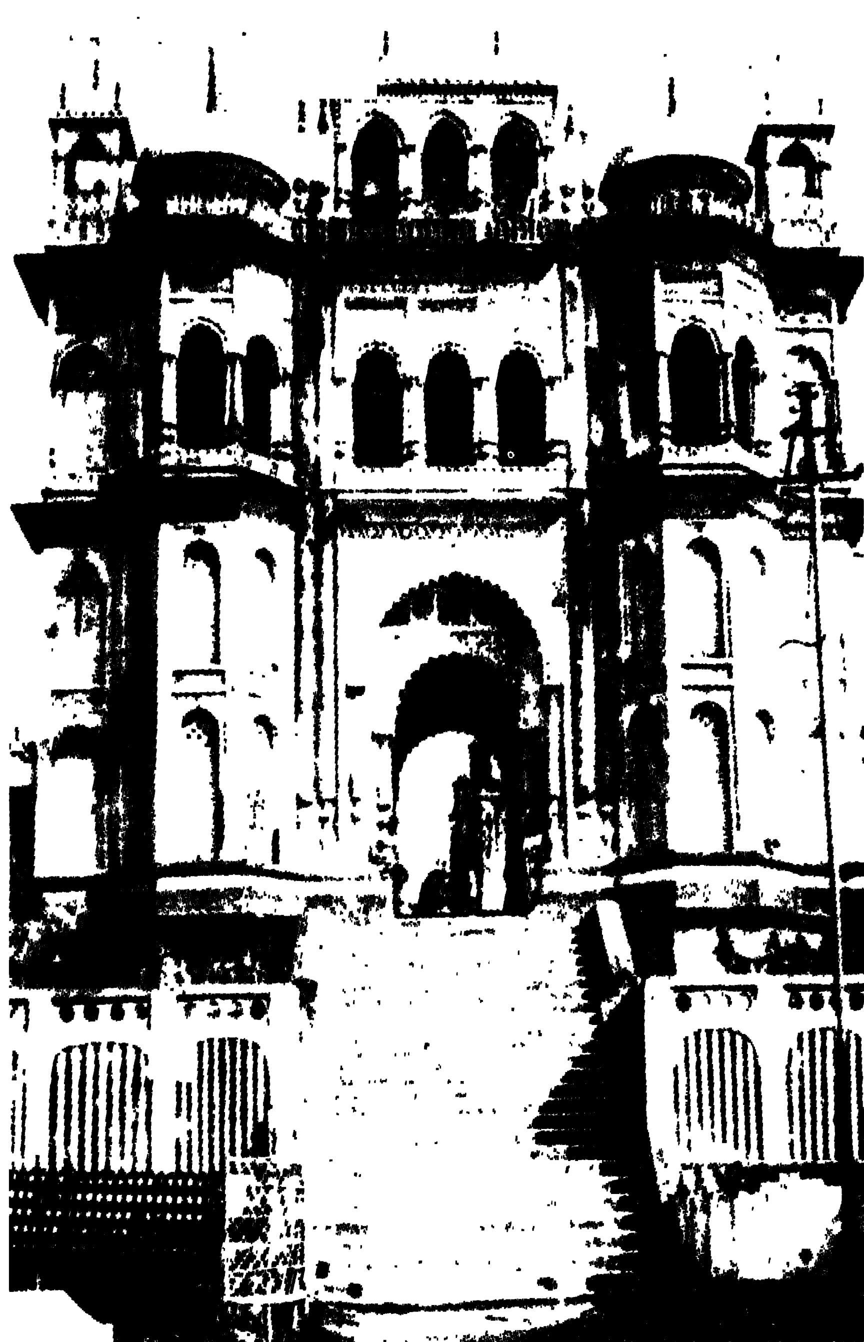
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে রাগ-সংগীতের প্রচারের লক্ষণও উল্লেখযোগ্য। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার জগন্নাথ হলে ছাত্রদের জন্য একটি সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। গৌর দাস সেখানে গান শেখাতেন। কিন্তু এ ব্যবস্থা বেশিদিন চালু থাকেনি। প্রথম যুগে জগন্নাথ হলে চলত মেয়েদের সংগীত প্রতিযোগিতা। কয়েকটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান হয়েছিল। ঢাকা হলে ছেলেদের সংগীত প্রতিযোগিতা কিছুকাল ভালই চলছিল, এতে সার্থক প্রতিযোগীদের সোনার মেডেল দিয়েও গানের নৈপুণ্য স্বীকার করা হত। যে সময় থেকে প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে গেল তাও মনে পড়ছে। জনৈক প্রতিযোগী-গায়ক, গান করবার পর বললেন, ওর সঙ্গে যে তবলা সংগত করছে সে প্রকৃত তাল বাজায়নি, ইচ্ছে করে তাকে বিব্রত করেছে। ব্যাস, কার্জন হলে এ নিয়ে মারধর হয়ে গেল। উপস্থিত ছিলাম ওখানে। যারা গোলমালের পাণ্ডা, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তো নয়ই, গানবাজনাও জানত কি না সন্দেহ।

কার্জন হলের বহু সংগীত আসরের মধ্যে একটি বিশেষ করে মনে পড়ে। তখন আমাদের বয়স সামান্য। আলাউদ্দিন খাঁর বড়ো ভাই আফতাবুদ্দিনকে ছাত্ররা সংবর্ধনা দিয়েছিলেন। আফতাবুদ্দিন সেখানে আসর মাতিয়ে বাঁশি বাজিয়েছিলেন, বাঁশির পর বাজালেন দোতরার মতই উন্নত সংস্করণের একটি যন্ত্র—নিজের তৈরি। আর অবশেষে বাজিয়েছিলেন হারমোনিয়াম। সাধারণ শ্রোতার সমক্ষে সর্বাঙ্গ দিয়ে এরূপ অদ্ভুত হারমোনিয়াম বাজানোর দৃষ্টান্ত বিরল। কার্জন হলে ঢাকা হলের উদ্যোগে আরও দু-একটি যন্ত্র-সংগীতের আসরের কথাও উল্লেখ করা যায়।

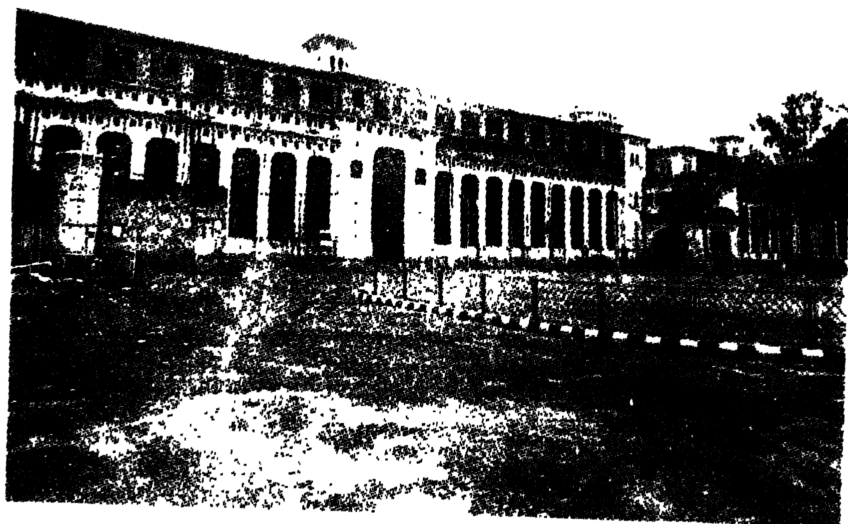
ভগবান সেতারির বাজনার রীতি ছাত্রসমাজে কমে এসেছিল। তখন ময়মনসিংহ থেকে এনায়েত খাঁর শিষ্য ও প্রশিষ্যের দল ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ঢাকায় কেউ কেউ এসে এনায়েত খাঁর সেতার বাদনের ভঙ্গিটিকে চালু করেন। গৎও কিছু কিছু ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মনে পড়ছে, মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ঢাকায় এসে সংগীত শিক্ষাদান আর সংগীতের চর্চার শুরু করেন। মনোরঞ্জনবাবুর ছাত্রগোষ্ঠী বেশ ছড়িয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ভঙ্গির যন্ত্র তৈরি, যন্ত্র বিক্রি এবং এ ধরনের সংগীত শিক্ষার একটা কেন্দ্র দাড়িয়ে যায়। পরবর্তীকালে আলাউদ্দীন খাঁর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত, অথবা আয়েত আলির শিষ্য তাঁদের বংশের বাজিয়েরাও ঢাকায় আসতে থাকেন।

আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবকে ঢাকায় সাধারণ সংগীত-রসিকগণ ভাল করে চিনতে আরম্ভ করেছেন এবং যখন জেনেছেন যে আলাউদ্দিন খাঁ নানাভাবে ঢাকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তখন থেকে আলাউদ্দীন খাঁর কথা ঘরে ঘরে জানা হয়ে গেছে। বহু পূর্বে আফতাবুদ্দিন ও আলাউদ্দীন ভগবৎ প্রসন্ন শাহ শঙ্খনিধির কাছে ছিলেন, পরে আলাউদ্দীন খাঁ স্বতন্ত্রভাবে এসে কিছুদিন ছিলেন। এরও পরবর্তীকালে কুমিল্লা যাবার পথে তিনি যখন এসে পাটুয়াটুলির ওদিকে থাকতেন তখন তাঁর সঙ্গে আমরা দেখা করেছি, তাঁর সঙ্গে নানা আলোচনাও করেছি। এই দশকেরই শেষভাগে ওস্তাদ ওয়ালিউল্লাহ্ খাঁ এসে বাস করতে শুরু করেন নবাব বাড়ির উল্টোদিকে এক গলিতে। ওয়ালিউল্লাহ্ খাঁ আমাদের বড় সমাদর করে আমন্ত্রণ জানাতেন। তাঁর বাড়িতেও বেশ কতকগুলো গানের আসর বসেছে, আমরা সেখানে জলসা জমিয়েছি। ঢাকায় রেডিও আসার পর একে একে সুধীরলাল, চিন্ময় লাহিড়ী কিছুকাল বাস করেন, সেই সূত্রে সাধারণের মধ্যে গানের উদ্দীপনা জাগে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সে সময়ে যাঁদের কাছে আমরা গানের আসর জমিয়েছিলাম তাঁরা হলেন প্রফেসর সত্যেন বসু, ডঃ এস এন রায়। মাঝে-মাঝেই জলসার আয়োজন হত। মনে পড়ে ঢাকার ভাইস চ্যান্সেলর হাসান সাহেবের বাড়িতে হয়েছিল একটি গানের আসর। খেয়াল গান শোনানোর জন্য তবলিয়া নিয়ে উপস্থিত হওয়া গেল। প্রফেসর বোস সেখানে ছিলেন। আদেশ করলেন বাহার আর আড়ানা রাগের দুটো খেয়ালের তারতম্য দেখিয়ে দাও। গান শোনানোর পর তত্ত্ব জানতে চাইলেন। হাসান সাহেব নিজে গজল গান করতেন, সংগীত রসিক ছিলেন। আরও দু-একজন অধ্যাপকের বাড়িতে জলসা বসতো, ডঃ নির্মলচন্দ্র সেন (ঢাকা ইন্টার কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক) তবলা বাজিয়ে হয়ে আসতেন। এ আসর জমতো ডঃ সেনের ব্যবস্থাপনায়।... *চল্লিশের দশকের ঢাকা। পৃঃ ৬৯-৮০*



কদমরসুল—নবীগঞ্জ



ঢাকা মেডিকেল কলেজ



বিবিচম্পার সমাধি—ডয়েলির আঁকা



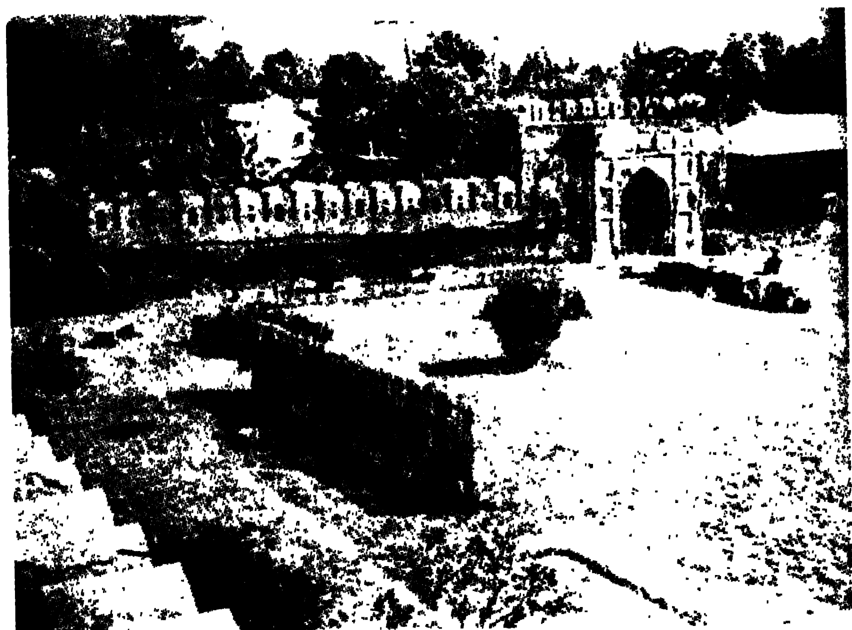
রোজ গার্ডেন



বাবা আদম মসজিদ—মুন্সিগ



রেবতীমোহন



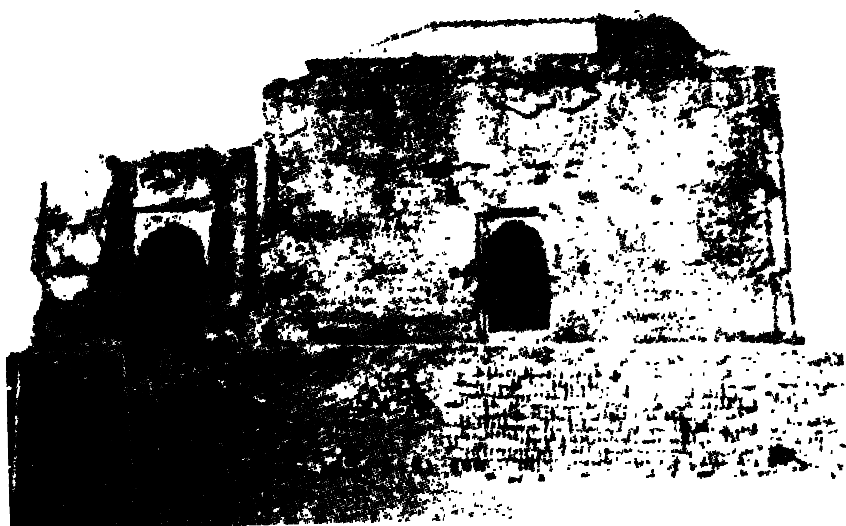
সোনাকান্দা দুর্গ—মুন্সিগঞ্জ



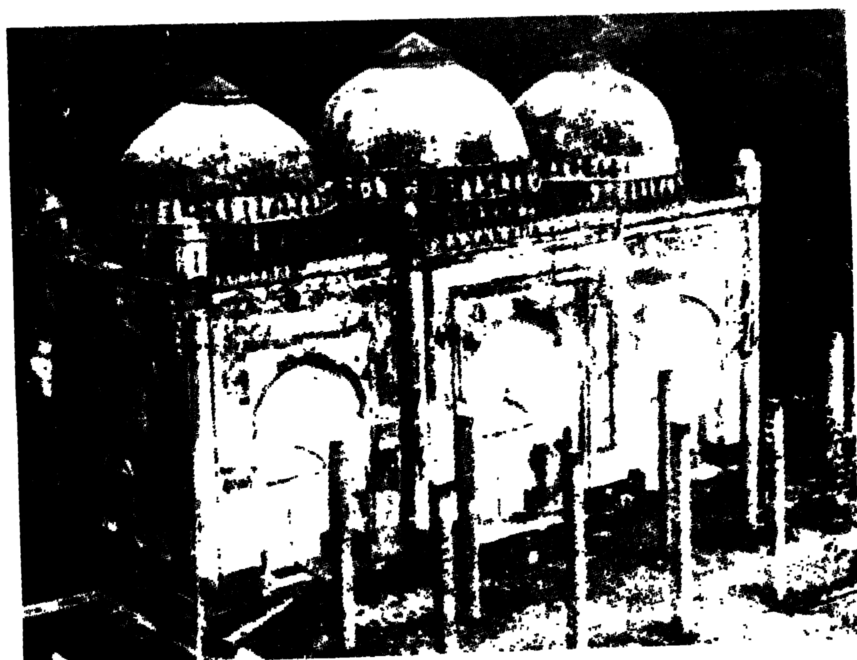
ইদ্রাকপুর দুর্গ—মুন্সিগঞ্জ



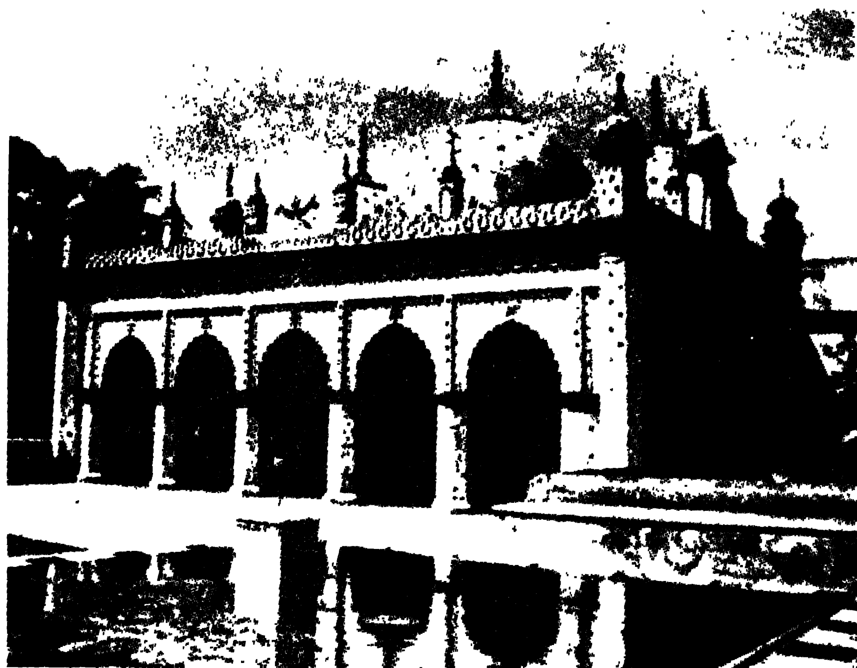
সাতগম্বুজ মসজিদ



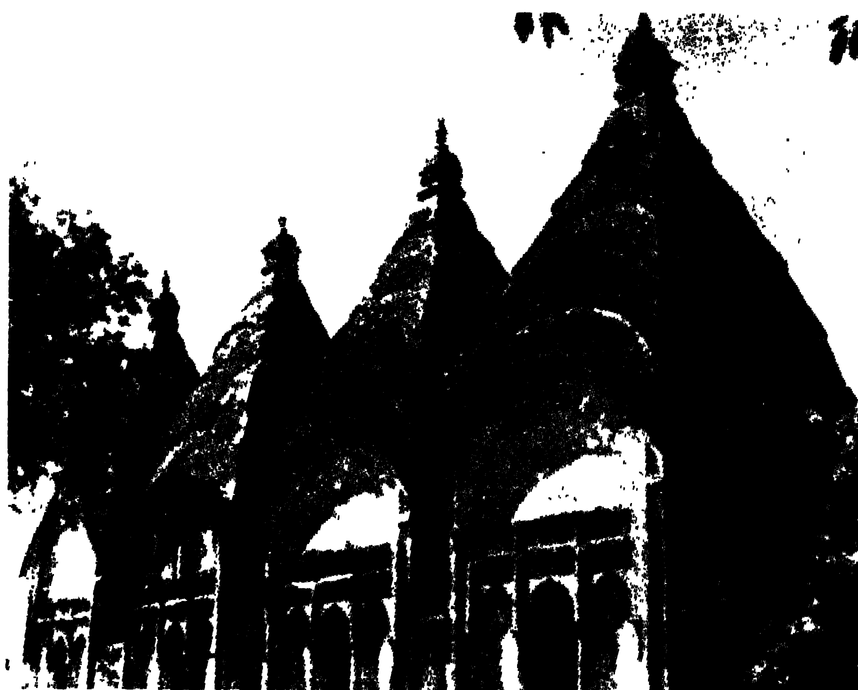
দারাবেগমের মাজার



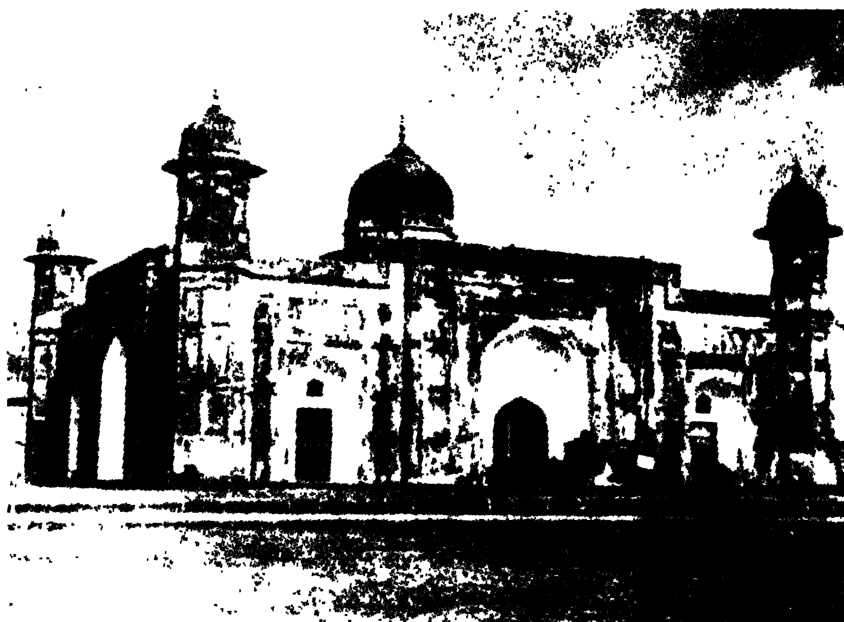
বিবিমরিয়ম মসজিদ—নারায়ণগঞ্জ



তারা মসজিদ



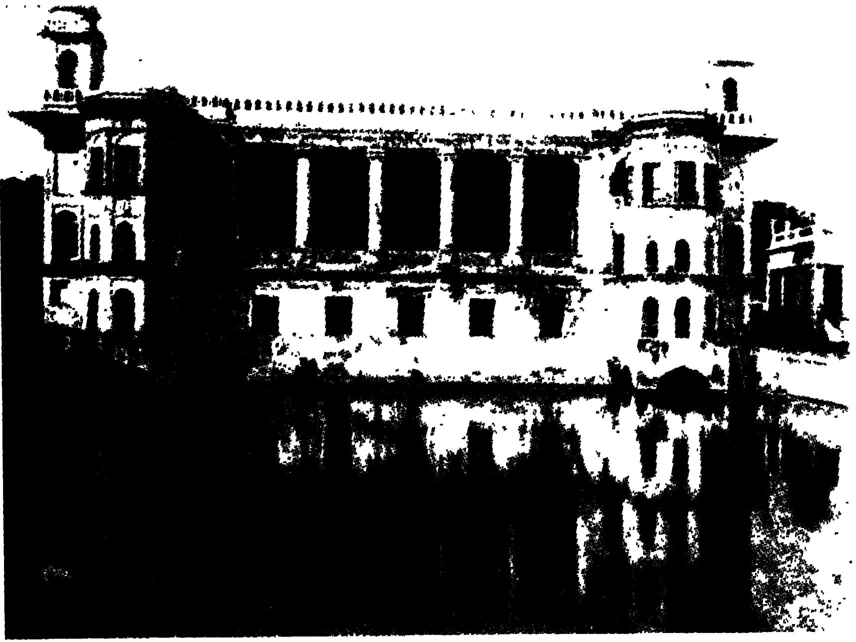
ঢাকেশ্বরী মন্দির



লালবাগ দুর্গ—পরীবিবির মাজার



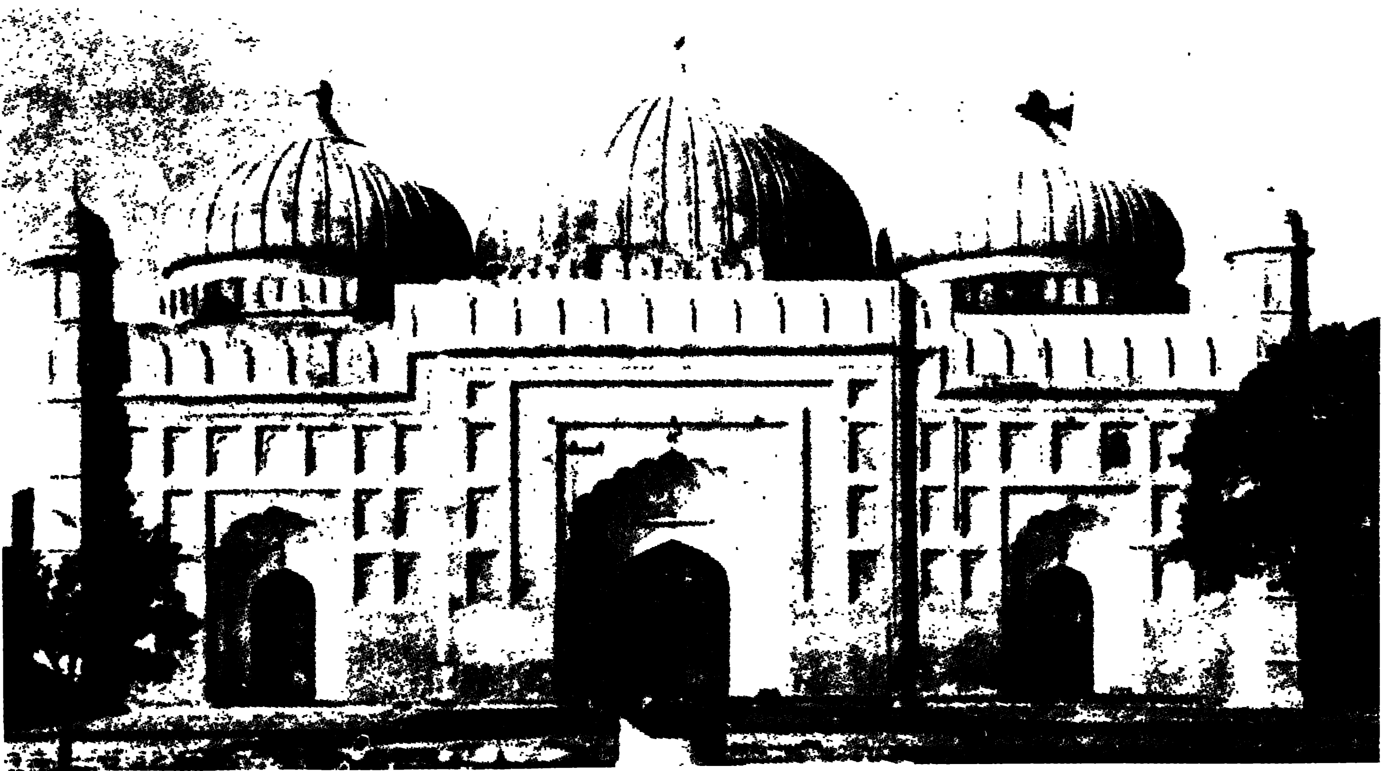
খান মহম্মদ মৃধার মসজিদ



হোসেনি দালান—মুঘল আমল



সেন্ট টমাস চার্চ—১৮১৯ খ্রিঃ স্থাপিত



লালবাগ দুর্গের মসজিদ



পোগজ স্কুল—১৮৪৮ খ্রিঃ স্থাপিত



ঢাকা মাদ্রাসা—১৮৭৪ খ্রিঃ স্থাপিত



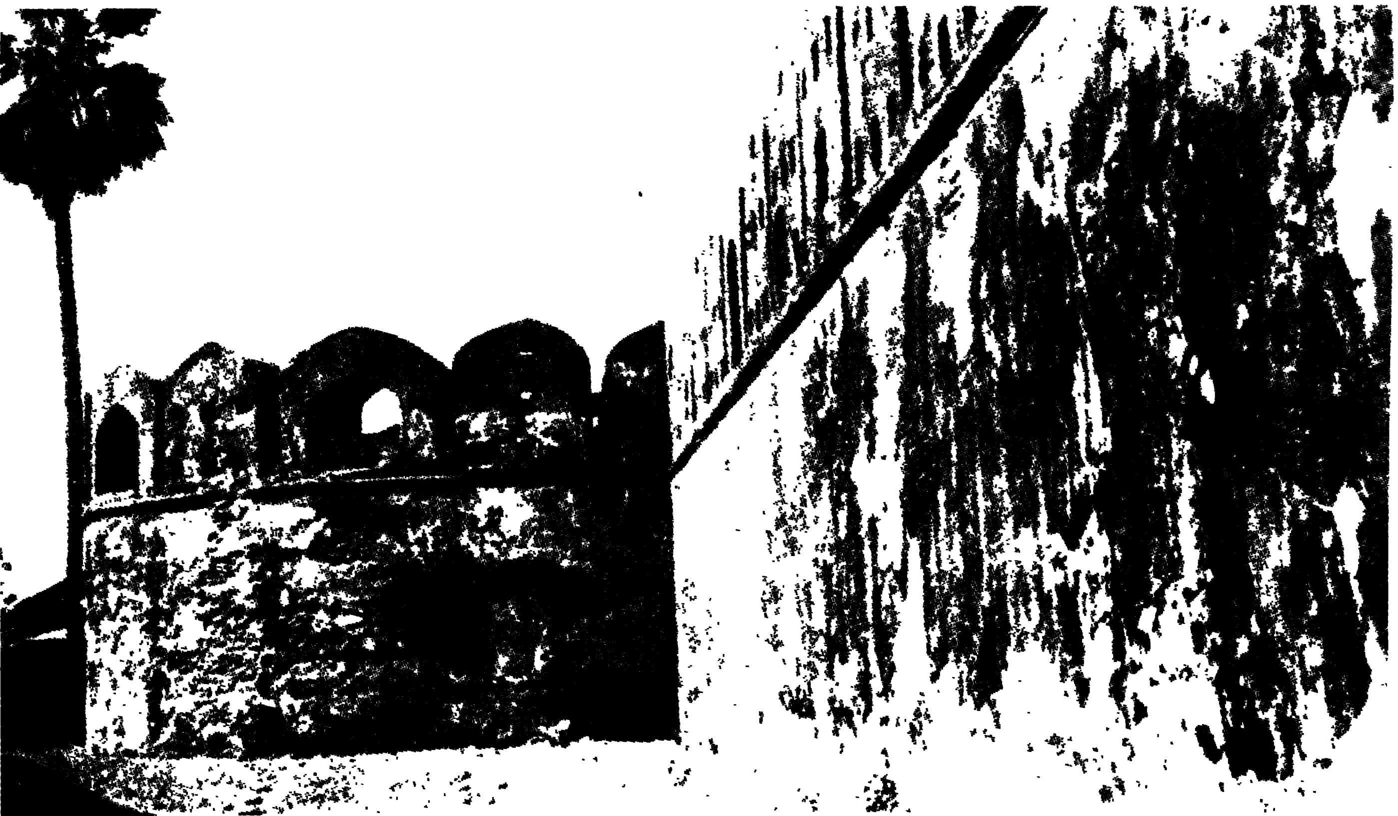
আহসান মঞ্জিল



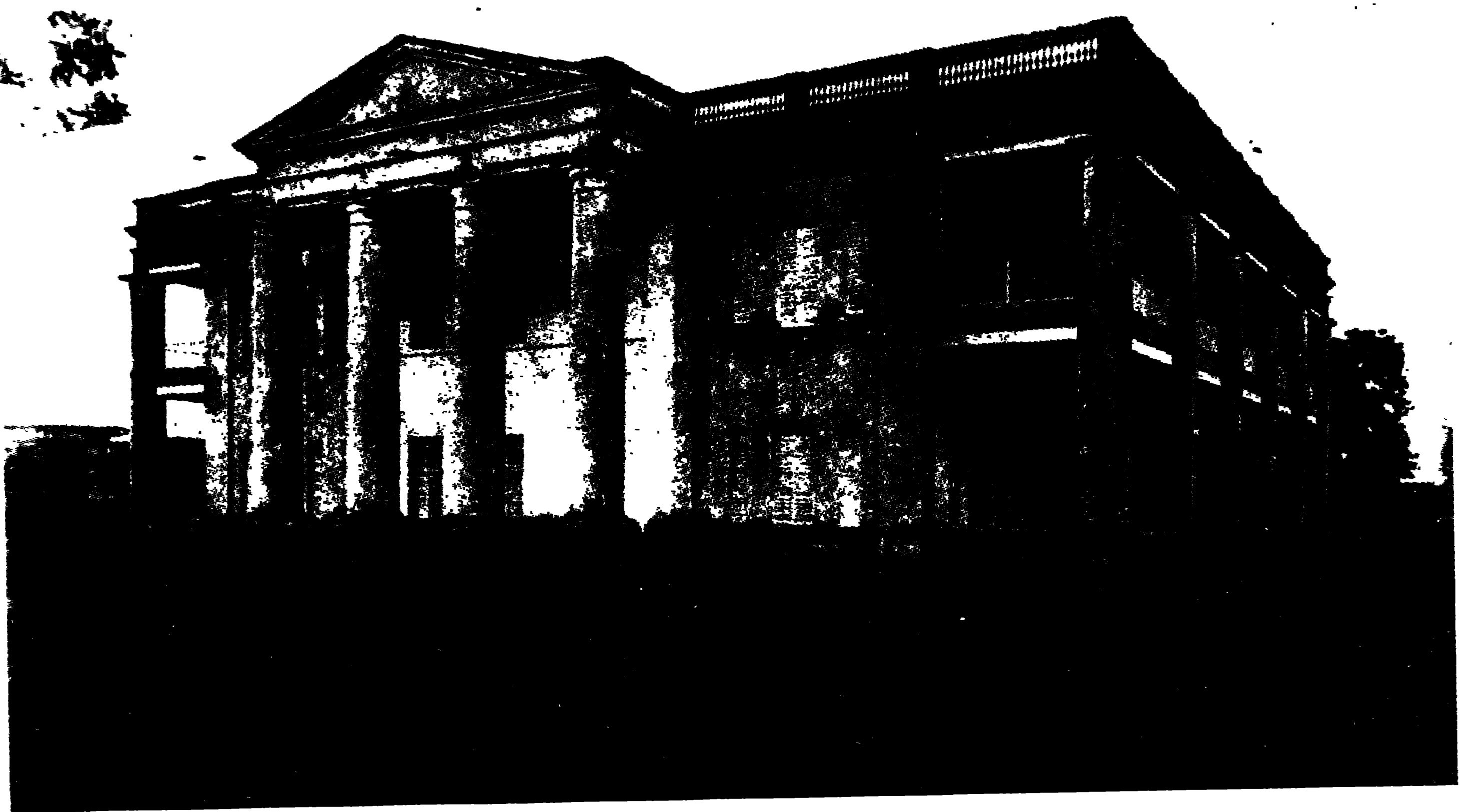
জগন্নাথ কলেজ—১৮৮৪ খ্রিঃ স্থাপিত



নর্থব্রুক হল—১৮৮০ খ্রি; উদ্বোধন



হাজিগঞ্জ দুর্গ—নারায়ণগঞ্জ



ঢাকা কলেজ—১৮৪১ খ্রিঃ স্থাপিত



প্রাসঙ্গিক সংযোজন (খ)

চল্লিশ দশকের ঢাকা :

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে ঢাকার রাজনৈতিক জগতের মানচিত্রটা বদলে যায় অনেক। তারপর প্রথম যুদ্ধ—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানব সভ্যতার গতিধারাকে প্রবাহিত করে সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে। সোভিয়েত ইউনিয়নের আত্মপ্রকাশ ভারতের রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলে যায়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের অভূতপূর্ব পদক্ষেপ, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ কোন্দল এসব তো ছিলই। '৩০ সালের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ভারতীয় বিপ্লবীদের মেরুদণ্ডকে অনেকখানি শক্ত করে দিয়েছিল কেবল নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বুকে ভীতির কম্পন জাগিয়েছিল। তাছাড়া বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতির সংকট ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলে যায়। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে সুভাষচন্দ্র বসু গঠন করেন সর্বভারতীয় ফরোয়ার্ড ব্লক। কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন সংগঠন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতে নতুন দিগন্তের সূচনা করে। ফ্যাসিস্ট শক্তির উন্মেষ ভারতীয় রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলে। যা থেকে ঢাকা মুক্ত ছিল না। সে সময়কার দুটি স্মরণীয় মানুষের স্মৃতিচারণ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত হল।

সরদার ফজলুল করিম :

১৯৪০-এর পরবর্তীকাল যুদ্ধ বেধে গেছে ইউরোপে। সে যুদ্ধ ক্রমে সম্প্রসারিত হচ্ছে বিশ্বের চারদিকে। '৪২-এর গোড়াতে এশিয়াতে যুদ্ধ চলছে। জাপান এগুচ্ছে চীনের দিকে এবং বর্মার দিকে। ভারতবর্ষে প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতার আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠছে। প্রধান ধারার বাইরে মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ জিন্নাহ সাহেবের নেতৃত্বে দাবি তুলেছে পাকিস্তানের। '৪০-এর মার্চে লাহোরে পাশ হয়েছে পাকিস্তান প্রস্তাব। মুসলিম সমাজের ছাত্রদের মধ্যেও পাকিস্তান আন্দোলন সাড়া জাগাচ্ছে। মুসলিম ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান এই আন্দোলন সমর্থন করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রগণ বোধহয় এই প্রথম দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে উঠছে। রাজনৈতিক মঞ্চের ঘটনা-দুর্ঘটনা, দাবি প্রতি-দাবির প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তাদের মধ্যে। তারা আন্দোলিত হচ্ছে তার দ্বারা।

"বঙ্গদেশ এবং তার রাজধানী কলকাতায় তখন এই রাজনীতিই নানা জটিলতা লাভ করছে। বঙ্গদেশের অন্যতম জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। তিনি এতদিন মুসলিমদের অন্যতম প্রতিষ্ঠান মুসলিম লিগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু জিন্নাহ সাহেবের সঙ্গে তাঁর বিরোধিতা ঘটেছে। তিনি মুসলিম লীগের বাইরের শক্তি এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে সঙ্গী করে কলকাতায় আইন পরিষদে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। এই মন্ত্রিসভাকেই মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ এবং অনুসারীগণ নিন্দাসূচকভাবে 'হক-শ্যামা' বা 'শ্যামা-হক' মন্ত্রিসভা বলে অভিহিত করছে। এই মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ঢাকার নওয়াব হাবিবুল্লাহ। পুরাতন ঢাকা তথা ঢাকার স্থানীয় মুসলিম সমাজের পর নওয়াব পরিবারের তখনো বিপুল প্রভাব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্ররা প্রধানত ঢাকার বাইরে থেকে আগত। তাদের বাস ছাত্রাবাসগুলোতে। মোটকথা বৃহত্তর ক্ষেত্রে যেমন, ঢাকাতেও তেমনি হক সাহেবের মন্ত্রিসভার পক্ষের, বিপক্ষের একটি রাজনৈতিক শক্তি সংগঠিত হয়ে ওঠে।"

"...১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ৮ মার্চ, অসামান্য সম্ভাবনার আকর, রেলশ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, তরুণ লেখক সোমেন চন্দ একটি শ্রমিক মিছিল পরিচালনাকালে প্রতিপক্ষীয়দের দ্বারা নির্মমভাবে নিহত হয়েছিলেন। আমি তখন আই এ পরীক্ষা পাশ করে ঢাকা ইউনিভার্সিটির দরজায় মাত্র পা রেখেছি। প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সাথে তখনো হয়ত হৃদ্যতা ততো তৈরি হয়নি। সোমেনের নির্মমভাবে নিহত হওয়ার ঘটনাই হয়ত চুম্বকের মত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম প্রগতিশীল সাহিত্যকর্মীদের আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছিল প্রগতি লেখক সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে, আলোচনায়, ক্রিয়াকর্মে। আমার ভাগ্য যে, আমিও সে আহ্বানের বাইরে সেদিন থাকতে পারিনি।

"১৯৪২ সনের মার্চ মাসে সোমেন চন্দ যখন নিহত হয়, আমাদের মুসলমান ছাত্র সমাজের বৃহত্তর অংশ তখন নিজেদের নেতৃবৃন্দের মান-অপমানের পরিমাণ নির্ধারণ লইয়া ব্যস্ত। কোন বিশিষ্ট নেতাকে পুষ্পমাল্য প্রদান বা অপর কাহাকেও কালো পতাকা প্রদর্শন, ইহাই ছিল আমাদের রাজনীতির তখনকার বৈশিষ্ট্য। আমাদের সেই চেতনাহীন অবস্থাতে সোমেন চন্দের মৃত্যুকে আমরা হয়ত ঠিকভাবে দেখিতে পারি নাই। এমনি সময়ে শুনিয়াছিলাম সোমেনের মৃত্যুর কথা। ঢাকা শহরের চিরপুরাতন দাঙ্গা ব্যতীত সেইদিন তাহাকে কিছু ভাবিতে পারি নাই। কিন্তু তথাপি সেই অবস্থাতেও পরিচিত-অপরিচিত কাহারো মুখে সোমেন চন্দের মৃত্যু-সংবাদের সাথে বক্র হাসি দেখিয়া সন্দেহ জাগিয়াছিল।

"তাহার পরে বাহিরের আলোবাতাসে আসিলাম—বক্রহাসি সেদিন কাহারা হাসিয়াছিল, কেন হাসিয়াছিল পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম। সোমেনের কাহিনী তো পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন নহে। জীবনের কল্যাণের বিরোধী গুণ্ডার দল অনেক সোমেনকে হত্যা করিয়াছে কিন্তু তাই বলিয়া জীবনের জয়কে ওরা রোধ করিতে পারে নাই। সেদিনও কাপুরুষ ফ্যাসিস্ত গুণ্ডার দল সোমেনকে হত্যা করিয়া সোমেনের জীবনের আদর্শকে নষ্ট করিতে পারে নাই। তাই আজ যদি দিনের আলোতে তাদের কারুকে দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে জোর গলায় বলিতাম : সোমেনের সঙ্কেতধ্বনি স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে—তোদের দিন শেষ হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, দিনের আলোয় আজ আর উহারা বাহির হয় না—পৃথিবীর জনগণের অগ্রগতির প্রতিটি শক্তিতরঙ্গ ওদের বুকে শেল হানিয়াছে—চোরা গর্তে উহারা আত্মরক্ষার পথ খুঁজিয়াছে। তাই আজকাল নিশাচরের বেশে ওদের দুর্বল ছোবল ওদের বিলোপের আভাস দেয়।"

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত :

'১৯৩৯ সালে ঢাকায় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের কাজ শুরু হওয়ার সময় থেকে আমার চিন্তা ও ভাবনায় যেন নতুন কিছু যোগ হল। বাকল্যান্ড বাঁধের ধারে সান্ধ্য ভ্রমণের সময় একদিন সোমেন চন্দ জানাল যে ঢাকায় প্রগতি লেখক সঙ্ঘ সংগঠিত হচ্ছে এবং আমাকে যোগ দিতে ও সাহায্য করতে অনুরোধ জানালে আমি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলাম। সন্ত্রাসবাদী দল থেকে বিযুক্ত হবার পর কিছুকাল দায়মুক্ত ছিলাম, সোমেনের অনুরোধে আবার দায়বদ্ধ হতে চললাম একথা তখন একবারও মনে জাগেনি। প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রথম সভায় যারা এসেছিলেন তাদের প্রায় সকলকেই ভাল লাগল তাঁদের কথাবার্তা ও আলোচনা শুনবার পর। রণেশ দাশগুপ্ত, সরলানন্দ সেন, অমৃত দত্ত, অচ্যুত গোস্বামী, সোমেন চন্দ ছাড়াও আরো কেউ কেউ ছিলেন। এক বছরের মধ্যেই ঢাকা প্রগতি লেখক সঙ্ঘ দস্তুর মত একটি প্রভাবশালী সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। সোমেনকে আমি জানতাম ছেলেবেলা থেকেই। কেননা ১৯৩০ পর্যন্ত একই পাড়ায় আমরা বসবাস করতাম। বড় হয়ে দুজনেই লিখতে শুরু করি এবং ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। দেশ পত্রিকায় সোমেনের প্রথম ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৭-এ। তখন তার বয়স ১৭ বছরের বেশি নয়। ১৯৪০-এ যখন পশ্চিম ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া ও অন্যান্য দেশ পদানত করেছে সেই সময় বাকল্যান্ড বাঁধের পরিবর্তে আমাদের সান্ধ্য আড্ডা বসতে শুরু করেছে ভিক্টোরিয়া পার্কে, অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি এলাকায়। .. ভিক্টোরিয়া পার্কে

আমরা যখন বসতাম তখন থেকেই বয়স্কমনত্যার চিহ্ন আমাদের মুখেচোখে, দেশ-বিদেশের আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী বেশ গভীরভাবেই আমাদের মনকে নাড়া দিতে শুরু করেছিল। ...

১৯৩৯ সনে কলকাতা থেকে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের উদ্যোগে 'প্রগতি' নামের সঙ্কলন গ্রন্থ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। রণেশবাবু প্রস্তাব করলেন ঐ ধরনের একটি সঙ্কলন যেন আমরা ঢাকা থেকে প্রকাশ করি। আরো স্থির হল যে ঢাকা জেলা 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র লেখকরাই শুধু ঐ সঙ্কলনে লিখবেন। তদনুযায়ী ১৯৪০ সালে বেরুল 'ক্রান্তি' নামের ১৬০ পাতার একটি সঙ্কলন। লেখকসূচির অন্যতম ছিলেন রণেশ কুমার দাশগুপ্ত, সোমেন চন্দ, অচ্যুত গোস্বামী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সরলানন্দ সেন এবং আরো কেউ কেউ। প্রগতিশীল চিন্তাধারার পরিপোষক এরূপ একটি সাহিত্য সঙ্কলন প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ সাড়া পড়ে যায় এবং কলকাতার লেখক সমাজও এই লেখক গোষ্ঠীকে স্বাগত জানান। ..." 'ক্রান্তি'ব প্রকাশক ছিলেন প্রগতি লেখক সঙ্ঘের পক্ষে সোমেন চন্দ। সংকলনে সোমেনের 'বনস্পতি' গল্পটি ছাপা হয়েছিল। 'ক্রান্তি' প্রকাশের পর ঢাকার প্রগতি লেখক সঙ্ঘের আসর লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশে জমজমাট হয়ে উঠেছিল।

হিটলার ১৯৪১ সালের জুনে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের পর 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' রূপান্তরিত হল ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘে। ঢাকায় গঠিত হল 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'। সমিতির সম্পাদক ছিলেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এই সুহৃদ সমিতির উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল ঢাকার ব্যাপটিস্ট মিশন হলে সপ্তাহ ব্যাপী এক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন। বিষয়—সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থায় জনজীবনের বহুমুখীন রূপকে তুলে ধরা। "... আজ শুনতে অবাক লাগবে যে তখনকার দিনে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজজীবন সম্পর্কিত চিত্রাবলী সংগ্রহ সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। অল্প সময়ের মধ্যে যেসব বই দ্রুত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল তা থেকেই বিভিন্ন ছবি ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে স্থানীয় চিত্রশিল্পীদের সাহায্যে বড় আকারের প্রায় শ'খানেক ছবির এই প্রদর্শনী যথাসময়ে উদ্বোধন করা হয়েছিল। ঢাকা শহরে এই ধরনের একটি ব্যাপার তখনকার দিনে একেবারেই নতুন। ..." প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন করেছিলেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি এই প্রদর্শনীর নাম দেন সোভিয়েত মেলা। প্রতিদিন ঢাকার অজস্র সব শ্রেণীর মানুষ আসত প্রদর্শনীতে। হলঘরের প্রদর্শনীতে ঢোকার মুখে ছিল একটি খাতা। সেই খাতায় মন্তব্য লিখে যেতেন সবাই। প্রদর্শনীর সব থেকে উৎসাহী কর্মী ছিলেন সোমেন চন্দ। তিনি দর্শকদের ছবির ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন। এই প্রদর্শনী শেষ হওয়ার পর ঢাকার বাইরে কয়েকটি স্থানে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। ঢাকার সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি ঢাকায় ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলনের ব্যবস্থা করে। সেই সম্মেলনে যাওয়ার পথে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ৮ মার্চ সোমেন চন্দ নৃশংসভাবে নিহত হয়।

সোমেন চন্দ মারা যাবার পর ঢাকায় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের যে সম্মেলন হয়, ঐ সম্মেলনে যোগ দিতে কলকাতা থেকে এসেছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। "১৯৪০-এর সন্ধ্যায় ঢাকা জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অ্যাসেম্বলি হলে ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক সঙ্ঘের বার্ষিক প্রীতি সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানটি নানা কারণে স্মরণীয়। তখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জগতের সঙ্কট ক্রমবর্ধমান এবং আমরা প্রগতি লেখকরা, লেখক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে চিন্তা ও ধ্যানধারণার দিক থেকে ব্যাপক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলাম। ১৯৪০-এর এই সভায় সভানেতৃত্ব পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু, উদ্বোধনী সঙ্গীত গেয়েছিলেন সুকুমার রায় (পরবর্তীকালে আকাশবাণীর প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ এবং সঙ্গীতশাস্ত্রের বই লিখে রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত) এবং বার্ষিক কার্য বিবরণী পাঠ করেছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত। কবিতা গল্প ও প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, ভবানীপ্রসাদ দত্ত, নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য, অনিল

চক্রবর্তী, অমৃতকুমার দত্ত এবং সোমেন চন্দ।" আলোচনায় অংশ নেন অমলেন্দু বসু, নবেন্দু বসু এবং অধ্যাপক জুলফিকার আলি। তখন ঢাকা প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সম্পাদক ছিলেন অচ্যুত গোস্বামী। "ইতিপূর্বেই অবশ্য ঢাকায় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের উদ্যোগে আরো দু'চারটি স্মরণযোগ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল রমনা ও পুরানা পল্টন সংলগ্ন এলাকায়। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক অমিয়কুমার দাশগুপ্ত, অধ্যাপক পৃথ্বিশ চক্রবর্তী প্রভৃতি কোন কোন সবায় উপস্থিত থেকে আমাদের উৎসাহিত করেছিলেন।"

প্রগতি লেখক সঙ্ঘ সম্পর্কে কিরণশঙ্করের বিবরণে আরও জানা যায় : "১৯৩০-এর মন্বন্তর শুরু হবার পরেই সারা বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে আমরাও অভূতপূর্ব দুর্যোগের মুখোমুখি হয়েছিলাম। চাল, তেল, নুন যেমন পাওয়া যায় না তেমনই দুষ্প্রাপ্য মুদ্রণের কাগজ 'প্রতিরোধ' পত্রিকার প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়ল। শেষের দিকে মিলের কাগজের অভাবে দেশি তুলোট কাগজেও দু'তিনটি সংখ্যা ছাপা হয়েছিল। এই সময় প্রতিরোধ পাবলিশার্স নাম দিয়ে ঢাকায় জি ঘোষ লেনে একটি পুস্তক প্রকাশক ও বিপণন কেন্দ্রও খোলা হয়। দেশি-বিদেশি প্রগতিশীল বই ও পত্র-পত্রিকা ছাড়াও ঢাকার লেখকদের কিছু কিছু বই পুস্তিকা প্রতিরোধ পাবলিশার্স-এর তরফ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। উল্লেখ্য, এই ধরনের বইয়ের অন্যতম ছিল অনিল মুখার্জির 'সাম্যবাদের ভূমিকা', সরলানন্দ সেনের 'মাও সে তুং' এবং সোমেন চন্দের 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প'। এছাড়া সোমেনের স্মৃতিতে ঢাকা কোর্ট হাউস স্ট্রিটে সোমেন পাঠাগার নাম দিয়ে একটি নতুন পাঠাগারও স্থাপিত হয়েছিল। জি ঘোষের গলিতে একটি ত্রিতল বাড়ির একতলায় ছিল প্রতিরোধ পাবলিশার্স, দোতলায় ঢাকা প্রগতি লেখক সঙ্ঘের ঘর। যেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হত। ঐ সময় ঢাকায় লেখকদের উদ্যোগে বেশ কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে যাঁরা কলকাতা থেকে এইসব অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকায় এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিনয় রায়, বিনয় ঘোষ, গোপাল হালদারের নাম মনে পড়ছে। একসময় ঢাকা শহরের ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও অধ্যাপকদের প্রগতি লেখক সঙ্ঘের তরুণ লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছিল। এঁদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পরিমল রায়, অমিয়কুমার দাশগুপ্ত, পৃথ্বিশ চক্রবর্তীর নাম উল্লেখ্য। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং কাজী মোতাহার হোসেনের উৎসাহ থেকেও 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' বঞ্চিত হয়নি। একসময় পুরানা পল্টনের একটি বাড়িতে প্রগতি লেখকদের উদ্যোগে একটি সাহিত্যের আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রফেসর সত্যেন্দ্রনাথ বসু। সংস্কৃতি কেন্দ্র ঢাকা শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সমাজের এই সক্রিয় ভূমিকা পাকিস্তান হবার পর আরো ব্যাপকতা লাভ করেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো ছিল ছাত্র সমাজের সংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের ক্ষেত্র। ..."

সোমেনচন্দর মৃত্যু যেন ঢাকার যুব সমাজকে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়ে গিয়েছিল। প্রগতি সঙ্ঘের সদস্যরা তখন এক জটিল রাজনৈতিক অবস্থার মুখোমুখি। বিশ্বযুদ্ধ ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। ঘনীভূত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঢাকার প্রগতি সঙ্ঘের মুখপত্র 'প্রতিরোধ' প্রকাশিত হয় পাক্ষিক হিসাবে। প্রথম সংখ্যা বেরোয় ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৯৪৯। সম্পাদক কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এবং অচ্যুত গোস্বামী। সে সময়ে পত্রিকাটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন সত্যেন সেন, অজিত কুমার গুহ, সরলানন্দ সেন, অসিত সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, মুনীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, সানাউল হক, সৈয়দ নুরুদ্দিন, রণেন মজুমদার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক।

"ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলন যখন দানা বেঁধে উঠেছে তখন বোঝা গেল সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করতে হলে কিছু সময়োচিত গণসঙ্গীত রচনা করা দরকার। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ-নজরুল যেমন এখন, তেমনি তখনকার দুর্যোগপূর্ণ সময়েও ছিলেন মুখ্য অবলম্বন। কিন্তু গণসঙ্গীতের

প্রবর্তনও দরকার হয়ে পড়েছিল। মনে পড়ছে, এইসময় এগিয়ে এসেছিলেন একজন তরুণ সাধন দাশগুপ্ত। তিনি নিজে গান লিখতেন এবং গাইতেন। মাত্র দু-চার জন সঙ্গী নিয়ে তিনি সে সময় পূর্ববঙ্গের নানা সভায় লোকসঙ্গীতের সুরে নানা গান পরিবেশন করেন। গ্রামের বিভিন্ন স্তরের লোকের কাছে ফ্যাসিস্ট বিরোধী ও স্বদেশ প্রেমে অনুরণিত এই গানগুলো একসময় খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিল। লোকসঙ্গীতের সুরে তিনি সোমেন চন্দকে নিয়ে স্মরণীয় একটি গান লিখেছিলেন। এছাড়া ঢাকায় মুসলিম ওস্তাগরদের ছাদ-পিটানো গানের সুরের অনুসরণে তাঁর 'দে দে স্ট্যালিন ভাই পায়ে পড়ি ছাইড়া দে, আর্য হিটলার মরি লাজেতে' গানটি সে সময় খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। সত্যেন সেন এই সময়ই তাঁর গণসঙ্গীতগুলো লেখা শুরু করেছিলেন।"

ঢাকার প্রগতি সঙ্ঘের যুবকদের আর একটি সংকটের মুখোমুখি হতে হয় এসময়ের। যুদ্ধ, দাঙ্গা আর দুর্ভিক্ষ এই তিন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁদের ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছিল। কলকাতায় ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ এবং ২০ ডিসেম্বর নিখিলবঙ্গ ফ্যাসিস্ট বিরোধী সম্মেলনে ঢাকার প্রতিনিধিত্ব করেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এবং অচ্যুত গোস্বামী। ২০ ডিসেম্বর হল জাপানি বোমারু বিমান হানা। ঢাকার অস্বাভাবিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে প্রগতি সঙ্ঘের সদস্যরা মানুষকে সচেতন করে তুলতে থাকেন। দেখা গেল শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। আর ববিবারের সাপ্তাহিক বৈঠকে অনুরাগীরা আসতে শুরু করেছে বেশি সংখ্যায়।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের রসদ জোগাতে আর ভারতীয় মুনাফাখোরদের লালসা মেটাতে সৃষ্টি হল পঞ্চাশের মন্বন্তর। নৌবিদ্রোহ, রশিদ আলী দিবস, ছাত্র ও যুব সমাবেশ, ঢাকায় ছাত্রদের দাঙ্গাবিরোধী শান্তি মিছিল এক নতুন পর্বের সূচনা করে।

** চল্লিশ দশকের ঢাকা-সাহিত্য প্রকাশ। ঢাকা*

কলকাতা থেকে তখন ফ্যাসিস্ট বিরোধী প্রগতিশীল পত্রপত্রিকা বেরোচ্ছে—'পরিচয়', 'অগ্রণী' এবং 'অরণি'। হাওড়া থেকে বেরোত 'অভিবাদন'। সম্পাদক ছিলেন শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ঢাকার 'প্রতিরোধ'।

'প্রতিরোধ' পত্রিকার ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত রণেশকুমার দাশগুপ্তর একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এখানে উদ্ধৃত হল ঃ

যুদ্ধ-সাহিত্যের রূপান্তর

রণেশকুমার দাশগুপ্ত

গত মহাযুদ্ধের (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের) ঠিক পরবর্তী সাহিত্যের একটা বড় অংশই ছিল যুদ্ধ-সম্পর্কিত। বিষাদ, ক্ষোভ, জ্বালা ও বিদ্রোহ একটা প্রশ্নকে ঘিরে ফুলে ফুলে উঠছিল। গত মহাযুদ্ধের শ্মশানে বসে সাহিত্যিক প্রশ্ন করেছিলেন : মানুষের জীবন নিয়ে একি পরিহাস? একি রোগজীর্ণ সভ্যতা? মানুষের বিরুদ্ধে নিয়োজিত মানুষ। যে মানুষ প্রতিমুহূর্তে বিকশিত হচ্ছে, যার শত সহস্র অনুভূতি দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার অন্ধকার হাতড়ে জ্যোতির্ময় ভবিষ্যতের আশায় বলছে, মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে, একটামাত্র ইস্পাতের টুকরোর আঘাতে সে যে মুখ থুবড়ে পড়েছে, আর উঠবে না, আর চোখ চাইবে না। না জানি কোথায় বসন্তকাল এসেছে, তার আয়োজনে আয়োজনে ভরে গিয়েছে ধরাতল! মহাসমরের অব্যবহিত পরবর্তী সাহিত্যে এই জীবন তৃষ্ণার তাগিদের সামনে কোন দূরপ্রসারী চিন্তা দাঁড়াতে পারেনি। জীবনতৃষ্ণার সুরকারেরা জীবনের মর্যাদা দাবি করেছিলেন মাত্র। তখন প্রত্যেকটি গৃহকোণে যুদ্ধের ঘোলাটে ও পঙ্কিল বন্যাপ্রবাহ প্রবেশ করে তলা খেয়ে ফেলেছে। মানুষের মৃদু ও স্থূল সব কিছু অনুভূতি দলিত ও নিষ্পিষ্ট। পূর্বকালের মত একটা রক্তপাত, ধ্বংসস্তূপ উৎখাত, দুর্ভিক্ষ ও মৃতদেহপূর্ণ গভীর পথরেখা মাত্র না হয়ে, মহাযুদ্ধ সারা পৃথিবী ভরে মরণ ও ক্ষুধার জাল বিছিয়ে দিয়েছিল।

সাহিত্যিক সহ্য করতে পারেননি। মানুষ কি বাঁচতেই চায় না? লক্ষ লক্ষ যুবাপুরুষের কাছে জীবনতৃষ্ণা মেটাবার আবেদন রইল এই সাহিত্যে, এই ধরনে।

কিন্তু আবার যুদ্ধ এগিয়ে আসতে লাগল। ওয়েল্‌স্‌ যে ইঙ্গিত করেছেন, উচ্ছৃঙ্খল যৌবনকে এর জন্য দায়ী করে, তা ঠিক নয়। ফ্যাসিস্টরা পৃথিবীকে নতুন করে ভাগ বাঁটোয়ারা করবার জন্য নিয়ে এল যুদ্ধকে। চাপা দেওয়া জঙ্গীবাদকে উস্কে দিয়ে ফ্যাসিস্টরা এগিয়ে চলল সোভিয়েত-পুরীর দিকে। অস্ত্র কারখানার মালিকদের উদর-দেশ প্রসারিত হল ; তাদের চোখে দেখা গেল লালসার অবারিত শিখা। জীবন-তৃষিত লেখকেরা হলেন নির্বাসিত, কারাগারে নিক্ষিপ্ত। ফ্যাসিস্টরা খোলা পেল পথ। যুদ্ধ খোলা পেল পথ।

যুদ্ধকে কি তাহলে আটকানো যাবে না? ফ্যাসিস্টরা যে বলছে, 'চিরন্তন যুদ্ধেই পৃথিবী উর্বর থাকবে', এই যুক্তির কাছে মাথা পেতে দিতে হবে? না, তা হতে পারে না। লেখকেরাই কাঁধে তুলে নিলেন রাইফেল। নিছক জীবন-তৃষ্ণার কাল নয় আর। এই হোক শেষ যুদ্ধ। ফ্যাসিস্টদের ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের বেদী ধূলিকণায় মিশে যাবে। ...পৃথিবীতে ফ্যাসিস্টরা জয়ী হলে, প্রতি ধূলিকণা হবে অশ্রুসিক্ত, রক্তরঞ্জিত, ক্রীতদাসেব স্বেদে জড়িত। জীবন হয়ে পড়বে চিরন্তন প্রহসন।

জীবনের মর্যাদারক্ষার জন্য এই বলিষ্ঠ ও কার্যকরী প্রয়াসের মধ্য থেকেই এল যুদ্ধ সাহিত্যের রূপান্তর। স্পেন ও চীনের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে এই সাহিত্যধারা প্রবলবেগে উৎসারিত হল। যুদ্ধকে চিরকালের জন্য নির্বাসিত করার উদ্দেশ্যে, যুদ্ধের ভিত্তিকে ধ্বংস করার আবাহন ঘোষিত হল। অবশ্য এই আবাহনের সূত্রপাত হয়েছিল বহু পূর্বেই সোভিয়েত সাহিত্যে এবং সোভিয়েতের বাইরে দুই একটি গ্রন্থে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছায়ায় এই ধারা ছড়িয়ে পড়ল সারা বিশ্বে।

অবশ্য সাহিত্যে সাময়িকভাবে পরাজিত হল। পৃথিবীব্যাপী ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রাম তখনই গড়ে উঠল না। পুরাতন সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রে নবীন সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিস্টরা বাধাহীনভাবে অগ্রসর হয়ে গেল। তোষণনীতির পরিণতি হল মিউনিক চুক্তিতে। তথাকথিত সমাজতন্ত্রীরা কমিউনিস্টদের ফ্যাসিস্টবিরোধী ও শান্তিকামী জনব্যূহে আনল ভাঙন। সাহিত্য স্তব্ধ।

তারপর এল যুদ্ধ। কিন্তু এল সেই যুদ্ধ, যাতে কোন পক্ষকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করার কোন যুক্তি রূপান্তরিত সাহিত্য খুঁজে পেল না। মার্কিন লেখক থিওডোর ড্রাইজার এই যুদ্ধকে মর্যাদা দিতে অস্বীকার করলেন। এই মহাসমর এল সাম্রাজ্যবাদীরূপে। দেখা গেল, এই যুদ্ধের সাফল্য যারই হোক, এর লাভ লোকসানের হিসাব নিকাশে আরও বহু যুদ্ধের বীজ থাকবে! রূপান্তরিত সাহিত্যে মহত্তর যুদ্ধের যে ছবি ছিল, তার সঙ্গে এর কোন মিল পাওয়া গেল না। অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী নাৎসী-ফ্যাসিস্ট হওয়া সত্ত্বেও ফ্যাসিস্ট-বিরোধী যুদ্ধ-সাহিত্য ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরের যুদ্ধে কোনরূপ একাত্মতা অনুভব করল না। তার দৃষ্টি গেল ভিন্ন দিকে। যে যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী বিরোধ, শোষণ ও ক্ষুধাকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই শুরু হল, তার কবল থেকে মানুষকে মুক্ত করাই হল সাহিত্যের কর্তব্য।

কিন্তু মোড় ঘুরে গেল ১৪৪১ সালের জুন মাসে। ফ্যাসিস্টরা সোভিয়েত রুশকে আক্রমণ করে বসল। সঙ্গে সঙ্গে এই যুদ্ধ প্রকৃত ফ্যাসিস্টবিরোধী যুদ্ধে পরিণত হলো। সোভিয়েত রাশিয়া পৃথিবীর জনগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করল সেই যুদ্ধে, যে যুদ্ধে ফ্যাসিস্টরা ধ্বংস হবার সঙ্গে সঙ্গে চিরদিনের জন্য নিভিয়ে দেওয়া হবে জীবন-দাহী অগ্নিশিখাগুলিকে। ...

১৯৪২ সালের বসন্তদিনে সাহিত্য আবার ডাক দিচ্ছে। সোভিয়েত লেখক এলেক্সি টলষ্টয় ও শলোকভ লালফৌজের মাঝখানে মিশে গিয়েছেন। প্রাণসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ রূপকারেরা আজ সোভিয়েত, চীন ও জগতের প্রতি প্রান্ত থেকে জীবনের বলিষ্ঠ আহ্বান বাণী শোনাচ্ছেন। ফ্যাসিস্টদের ধ্বংস করো। এই মুহূর্তে তোমার, আমার, সকলের এ ছাড়া আর অন্য কোন কাজ নেই। ফ্যাসিস্ট জঙ্গীবাদীদের ধ্বংস করো। উঠে দাঁড়াও, আগে চলো।



প্রাসঙ্গিক সংযোজন (গ)

"স্কুল জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা রবীন্দ্রনাথ-দর্শন। ঢাকাতে আসতেন সবাই—দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন, বিনয় সরকার এবং আরো অনেকে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে ১৯২৬-এর ফেব্রুয়ারির গোড়ায়—হেডমাস্টারমশাই ডেকে পাঠালেন এবং বললেন যে রবীন্দ্রনাথ স্কুলে (ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল) আসছেন সেদিনই, আমাকে অভিনন্দনপত্রটি পড়তে হবে। আগের দিন সন্ধ্যায় করোনেশন পার্কে কবিকে দেখে এসেছি—অস্তমান সূর্যের দিকে তাকিয়ে কবি বলেছিলেন, মনে রাখতে যে এই সন্ধ্যায় তাঁদেরই কবি তাঁদের মনের মধ্যে নিজেকে সম্প্রসারিত করেছিলেন। ঢাকাতে তাঁর অন্তরঙ্গ কয়েকজন অনুরোধ করেছিলেন যে তাঁর ঢাকা-আগমণ স্মরণীয় করে রাখবার জন্য একটি কবিতা বা গান লিখতে। কবি লিখেছিলেন "এই কথাটি মনে রেখো, তোমাদের এই হাসি খেলায় আমি যে গান গেয়েছিলাম জীর্ণপাতা ঝরার বেলায়।" সময়টা ছিল শীতের শেষ আর কবিকে অতিথি রাখবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়াবার জন্য তিনি ছিলেন ঢাকার নবাবের একটি বজরাতে।

"এই রবীন্দ্রনাথকে স্কুলে অভিনন্দন দেওয়া হবে আর আমি সেটা পড়ব—গর্বে আমি দশ হাত। যথাসময়ে হেডমাস্টারের নির্দেশমত টুইলের শার্টের বদলে পরলাম পাঞ্জাবি আর চাদর এবং বালখিল্য ভদ্রলোকের বেশে স্কুলে উপস্থিত হলাম। যথাসময়ে কবি এলেন, অভিনন্দনপত্র পড়া হল, প্রণাম করলে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। প্রশান্ত ঋষি প্রতিম, মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না, কিন্তু উচ্ছ্বাসপূর্ণ অভিনন্দন (বোধ হয় কোন মাস্টারমশায়ের লেখা) আর আবেগপূর্ণ পাঠ শুনে কবি কি ভেবেছিলেন জানি না। তবে তিনি ত এসবে অভ্যস্ত, আমার কাছে সবটাই নতুন এক অভিজ্ঞতা।"...

আট দশক—ভবতোষ দত্ত। পৃঃ ৪৫-৪৬

ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ

নলিনীকান্ত ভট্টশালী

...বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের এক অধিবেশন ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় আহূত হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তখন ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ও পৃষ্ঠপোষক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ঢাকা-অধিবেশনের অভ্যার্থনা-সমিতির সভাপতি নির্বাচন লইয়া সাহিত্য-সমাজে ও সাহিত্য-পরিষদে তুমুল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। পরিষৎ দাশ সাহেবকে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি করিতে চাহে, সমাজ চাহে ঢাকার বিখ্যাত উকিল আনন্দ রায়কে। এই দ্বন্দ্বের ফলে অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য-সংখ্যা হুহু করিয়া বাড়িয়া চলিল। অর্থাভাবে এই সম্মিলনকে আর কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। যাহা হউক, বিষম ভোটযুদ্ধে দাশ সাহেবই জয়লাভ

করিলেন। আমি অভ্যর্থনা-সমিতির অন্যতম সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলাম। সম্মিলনের সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথকে পাইতে আমরা আগ্রহবান হইলাম এবং কলিকাতায় গিয়া রবীন্দ্রনাথকে সম্মত করাইবার ভার আমার উপর প্রদত্ত হইল।

এই আনন্দময় ভার গ্রহণ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম। কলিকাতা পৌঁছিয়া বিকালবেলার দিকে 'প্রবাসী' অফিসে গিয়া বন্ধুবর চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। চারুবাবু আমাকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে লইয়া গেলেন। সেই সন্ধ্যায় "বিচিত্রা" নাম্নী সাহিত্য-সভার এক অধিবেশন ছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। আমি আর চারুবাবু সভাকক্ষের বারান্দায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কতক্ষণ পরে ছন্নছাড়া উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র মোটা চরুট ফুঁকিতে ফঁকিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, চারুবাবু আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। অল্প পরে আরও কয়েকজন সাহিত্যিক আগমন করিলেন, বিস্তর মহিলা আসিয়া সভার একার্ধ ভরিয়া ফেলিলেন। ফরাশ পাতা, সকলে তাহার উপরই বসিতেছিলেন। মেয়েরা এক ধারে, পুরুষেরা অপর ধারে। এইবার রবীন্দ্রনাথ সভাস্থলে আগমন করিলেন, তাঁহার সেই দীর্ঘ কালো পোশাক পরিয়া। শরৎবাবু তাঁহার কাছ ঘেঁষিয়া বসিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে শরৎবাবু পরবর্তী অধিবেশনে স্বরচিত নূতন গল্প পড়িয়া শুনাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাহার পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। আমরা বারান্দায় বসিয়াই প্রবন্ধ শুনিতে লাগিলাম।

সে তো প্রবন্ধ নয়,— যেন বিশ্বামিত্রের নূতন সৃষ্টি! এই ছন্দসম্রাটের লেখনীমুখে বাণী যেন নূতন নূতন ছন্দ সৃষ্টি করিয়া নূপুরশিঞ্জিত পদে কঙ্কময় চপল চরণে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। চৌদ্দ অক্ষরে যে কত রকম ছন্দ হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্তে কবি যে উদাহরণগুলি দিয়াছিলেন, তাহার একটি চমৎকার নমুনা অদ্যাপি মনে আছে—

নয়নের সলিলে যে কথাটি বলিলে,
রবে তাহা স্মরণে জীবনে ও মরণে।

সভা ভঙ্গ হইলে এবং সভাস্থল জনবিরল হইলে পর চারুবাবু আমাকে কবির নিকট লইয়া গেলেন এবং পরিচয় করাইয়া আমার উদ্দেশ্য নিবেদন করিলেন। কবির অপরিচিতের নিকট সঙ্কোচ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তিনি যেন চোখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া কথা কহিতে পারিতেছিলেন না। এই দিনের কিছুকাল আগে তিনি বড়লাটকে সেই বিখ্যাত পত্র লিখিয়া জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করিয়া নাইটত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। চারুবাবু নানারূপ জনরব কবিকে শুনাইয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ভারত-সরকার কবিকে নির্বাসিত করিতে পারেন। কবি মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "সর্বদা তৈয়ের হয়েই আছি।" ক্লান্ত কবিকে আর অধিক বিরক্ত করা সঙ্গত হইবে না বিবেচনা করিয়া আমি সানুনয়ে তাঁহাকে ঢাকাবাসীর আগ্রহ ও অনুরোধ জানাইলাম। কিছুতেই তাঁহাকে রাজি করাইতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিলাম।

ইহার পর আরও আট বছর চলিয়া গেল। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ। একদিন খবর পাইলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে রবীন্দ্রনাথ ঢাকার আসিতেছেন। বর্তমান ভাইস্‌চ্যান্সেলর পূর্বতন ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, তদানীন্তন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অপূর্বকুমার চন্দ প্রভৃতি মহোদয়গণ এই ব্যাপারে অগ্রণী। রবিবার, ৩১ জানুয়ারি ১৯২৬, ১৭ মাঘ ১৩৩২, মঘানক্ষত্রে জগন্নাথ কলেজ-গৃহে রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিতে এক সভা আহূত হইল। অপূর্ব চন্দ প্রমুখ দলের অভিলাষ, রবীন্দ্রনাথ আগে শহরে উঠিবেন, তথায় তাঁহার অভ্যর্থনাদি হইবে। পরে তিনি রমনায় বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে যাইবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করিবেন। ডক্টর মজুমদার তাহাতে রাজি নহেন। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা হইতে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত তুমুল তর্কবিতর্ক

ও কোলাহল হইল, কোন মীমাংসাই হইল না। দুই পক্ষেরই যেন রীতিমত জিদ চড়িয়া গেল, কেহই নিজের কোট ছাড়িতে সম্মত নহেন। পরে একটা আপোষ বন্দোবস্ত হইয়াছিল, কিন্তু একদিন পরেই আমাকে ঢাকা ছাড়িয়া আমার এক জ্যেঠতুতো ভ্রাতার বিবাহে যোগ দিতে ফরিদপুর যাইতে হয়। তাই আমার ডায়েরিতে এই আপোষের কথার কোন উল্লেখ নাই।

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬, রবিবার, ২৪ মাঘ ১৩৩২, রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় আগমন করিলেন। অপরাহ্নে নর্থব্রুক হল বা লালকুঠিতে ঢাকা মিউনিসিপালিটি কবিকে অভিনন্দন করিলেন। পরে বুড়িগঙ্গা তীরে করোনেশন পার্কে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বিরাট জনসভার অধিবেশন হইল। পার্কের এক ধার হইতে অপর ধার পর্যন্ত এবং পার্ক ও নদীর তীরের মধ্যস্থ বাক্‌ল্যাণ্ড বাঁধ নামক রাস্তায় লোক আর ধরে না। জনসাধারণের পক্ষ হইতে একটি, করদাতা-সমিতির পক্ষ হইতে একটি এবং হিন্দুমোস্লেম সেবাশ্রমের পক্ষ হইতে একটি অভিনন্দনপত্র পঠিত হইল। কবি উত্তর দিতে উঠিবামাত্র সেই বিশাল জনসমুদ্র জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। মুখের উপর সান্ধ্য সূর্যের রক্তিম রশ্মি আসিয়া পড়িয়া কাব্যলক্ষ্মীর এই বরপুত্রকে যেন অপার্থিব গন্ধর্বলোকের অপরূপতায় মণ্ডিত করিয়া তুলিল। তিনি বলিতে আরম্ভ করিবামাত্র সেই বিশাল জনসঙ্ঘ একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল। কবি বলিলেন—

> আমি আর একবার ঢাকায় এসেছিলাম, রাজনৈতিক সভা-সমিতিগুলির কার্যাবলী যাতে বাংলা ভাষায় অনুষ্ঠিত হয় তার ওকালতি করতে। আমার সেই ওকালতি সফল হয়েছিল। আমার দিন ফুরিয়ে এসেচে। আমার কাজকর্মের অবসানকাল উপস্থিত। আপনাদের সকলের সঙ্গে সাহিত্যের যোগে আমার নিগূঢ় পরিচয় স্থাপিত হয়েচে। আজ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় গ্রহণ করবার জন্য আমি আপনাদের দ্বারে এসেচি। আমি বঙ্গলক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে অনেক অর্ঘ্য নিবেদন করেচি, অনেক পুষ্প সাজিয়েচি। তার দুই একটি যদি আপনারা সঞ্চয় করে রাখবার মত মনে করেন, তবেই আমার জন্ম সার্থক। আজ বাংলা দেশের তীর্থে তীর্থে জনগণের মধ্যে সঞ্চিত বঙ্গলক্ষ্মীর চরণরেণু সংগ্রহ করতে আমি বেরিয়েচি। আকাশে ঐ আমার মিতা রবি অস্তাচলের দিকে চলেচে, সে আমায় ডাকচে তার সঙ্গে যেতে। আজ এই সুন্দর সূর্যাস্তের সম্মুখে, এই কুলকুলুনাদিনী নদীর তীরে আপনাদের রবি-কবি আপনাদের কাছে বিদায় নিতে এসেছে।

কবির এই বিদায়-গ্রহণের আকুল করুণ কণ্ঠ সভাস্থলে যেন একটা অপূর্ব উচ্ছ্বাসের বন্যা বহাইয়া দিল। সেই বিশাল জনসঙ্ঘ স্তব্ধ অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সেই বিদায়বাণী শুনিতে লাগিল, সকলের চোখেই জলের আভাস। আমার পার্শ্বে প্রবীণ উকিল বন্ধুবর অমূল্য রায় ছিলেন; চোখ হইতে অশ্রুধারার রেখা হাত দিয়ে মুছিয়া ফেলিয়া একটু লজ্জিত হাস্যে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, লোকটার কাণ্ড দেখেছেন? আমার মত কালাপাহাড়ের চোখেও জল এনে ছেড়ে দিলে!

রবীন্দ্রনাথের বসিবার মঞ্চখানি আম্রপল্লব পতাকা ইত্যাদি দিয়া সজ্জিত ছিল। জনগণের অনুরোধে উহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া কবিকে যাহাতে সমস্ত দিক হইতে পূর্ণভাবে দেখা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা হইল। কবি পাথরের মূর্তির মত কতক্ষণ যেন ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া রহিলেন। নির্বাক জনসমুদ্র তাহাদের প্রিয় কবিকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইল। তারপরে ধীরে ধীরে তিনি মঞ্চ হইতে নামিয়া গেলেন।

২৭ মাঘ বুধবার কার্জন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসঙ্ঘ হইতে কবিকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হয়। দুপুর আড়াইটায় কার্যারম্ভ। কবি কিছু আগেই সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাইস্‌চ্যান্সেলর লেঙ্গলী সাহেবের কবিকে সর্বাগ্রে অভ্যর্থনা করিবার কথা, অথচ তখন পর্যন্ত তিনি আসিয়া পৌঁছান নাই। খবর পাইয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া তিনি মঞ্চে দাঁড়াইলেন, কর্তব্যের ত্রুটিজ্ঞান মার্জিতরুচি সুশিক্ষিত ইংরেজ-তনয়কে এমন অভিভূত করিয়া

ফেলিল যে, কিছু বলিতে আরম্ভ করিয়া তিনি হতভম্ব হইয়া থামিয়া গেলেন এবং সম্বিৎহারার মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, ফিট হইয়া পড়েন আর কি! মিসেস লেঙ্গলী বুদ্ধি করিয়া মঞ্চের নিচ হইতে আগাইয়া কি একটা কথা বলিয়া দিতেই তিনি সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন, এবং দুই কথায় বক্তব্য শেষ করিয়া ডক্টর মজুমদারকে অভিনন্দনপত্র পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

অভিনন্দনপত্রের উত্তরে কবি অনেক কথাই বলিয়াছিলেন, আমার ডায়েরিতে শুধু সূচীরূপে মোট কথাগুলির উল্লেখ আছে। তাহা হইতে সেই আশ্চর্য বক্তৃতার সারমর্ম উদ্ধার করিয়া দেওয়াও কঠিন। শুধু মোট কথাগুলি যেমন টুকিয়ে রাখিয়াছিলাম, তেমনই উদ্ধৃত করিলাম।—

> সভা-সমিতিকে তিনি চিরদিন ভয় করেন। সভামঞ্চে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া নিচের অসহায় শ্রোতাগণের মস্তকে শিলাবৃষ্টির মত বক্তৃতাবৃষ্টি করা নিতান্ত নিষ্ঠুরতা। ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের মধ্যে ছাত্রগণকে পাইতে ইচ্ছা। নিজের ছাত্রজীবনের ইতিহাস। দুই বার প্রাইজ পাওয়ার ইতিহাস। তাঁহার বয়স সম্বন্ধে লোকের ভুল বিশ্বাস। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গনিয়া বয়সের হিসাব করিতে তাঁহারা বেজায় ভুল করেন। কারণ তিনি সকল যুগের ছাত্রদের সমবয়সী। ছাত্রদের অন্তরঙ্গরূপে তিনি ছাত্রদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বেশ পরিচিত। তাঁহার নিজের যুগের ছাত্র জীবনের সঙ্গে এই যুগের ছাত্র জীবনের বিভিন্নতা। তখন ছাত্রদের কোন ভবিষ্যৎ ছিল না। বর্তমান ছাত্রদের হাতে দেশের ভবিষ্যৎ। তাঁর নিজের নিস্ফল জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা উত্তরাধিকারসূত্রে ভবিষ্য ছাত্রগণের হাত তিনি নিঃশেষে দিয়া যাইতেছেন। বাক্যে ও কর্মে সংযম চাই, অনর্থক হৈ চৈ করিয়া শক্তির অপব্যয় করা ভয়ানক বোকামি। বাঁশি ফুকিতে ইঞ্জিনের সমস্ত ষ্টীম খরচ হইয়া গেলে গাড়ি চলিবে কিসের জোরে? আমাদের আরব্ধ প্রত্যেক কর্মের বিফলতার মূল ঐখানে। প্রকৃত শিক্ষার আদর্শ—ছাত্রদের গ্রহণ-ক্ষমতা ও আগ্রহ জোগাইয়া তোলা। ইত্যাদি।

প্রায় আধ ঘণ্টা বলিয়া কবি উপবেশন করেন। এখানকার ব্যাপার সারিয়া কবি ডক্টর মজুমদারের গৃহে যাইয়া অতিথি হন এবং মজুমদারগৃহিণী আলিপনা, খই, ফুল, শঙ্খধ্বনি সহকারে কবির অভ্যর্থনা করেন। পরে মুস্লিম হলের ছাত্রদের অভিনন্দন গ্রহণ করিতে তথায় গমন করেন। অভিনন্দনের উত্তরে সেখানেও নাকি অনেকক্ষণ বক্তৃতা করেন। আমি উপস্থিত ছিলাম না। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় আবার কার্জন হলে তাঁহার ইংরেজী-লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিলেন। বিষয়—Meaning of Art। বেশ উচ্চ সুস্পষ্ট কণ্ঠে প্রায় এক ঘণ্টা বলিলেন। প্রকাণ্ড হলের দূরতম কোণ হইতে সবাই স্পষ্ট শুনিতে পাইল। আমি এই চিন্তা করিতে করিতে বাসায় ফিরিলাম যে, সারাদিনব্যাপী এই কোলাহল ও পরিশ্রমের টান ঐ অসুস্থ শরীরে সহিলে হয়।

২৮ মাঘ বৃহস্পতিবার সকাল আটটায় ডক্টর মজুমদারের বাড়ি গিয়া দেখি, লেঙ্গলী সাহেব আগেই আসিয়াছেন। দোতলার বারান্দায় বসিয়া কঠিন কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত আলোচনা জুড়িয়া দিয়াছেন। ঐ "মটর-কড়াই-কাঁকর"-জাতীয় আলোচনায় যোগ দিবার যোগ্যতার অভাবে চুপ করিয়া পিছনে বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। প্রোগ্রাম বা দৈনিক কর্তব্যের তালিকার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতেই আমি মিউজিয়মের দাবি অগ্রসর করিলাম। ডক্টর মজুমদার পরিচয় করাইয়া দিলে বলিলেন, ওঁর কথা অনেক শুনেছি। আমি বিনীতভাবে বলিলাম, সবাই আপনাকে দোহন করছে। আমার চিত্রশালায় চলুন, ঝুলি ফের ভর্তি করবার কিছু কিছু মাল-মসলা আমার ওখানে মিলতে পারে। দেখিলাম, কেমন যেন উন্মনস্ক ভাব, কথা বলিতে বলিতে যেন খেই হারাইয়া ফেলেন। এমন সময় ছাত্রদের দাবিতে তাঁহাকে নিচে নামিয়া যাইতে হইল। সেখানে গিয়া দেখি, নিতান্ত লাজুক মুখচোরার

মত তিনি যেন কতকটা অসহায়ভাবে বসিয়া আছেন, কাহারও মুখের দিকে চাহিতেছেন না। ইতিমধ্যে কবির "তিন বছরের প্রিয়া" নাতিনীটি আসিয়া ভারি আসর জমাইয়া বসিল, কবি তাহার সহিত নানা রহস্য করিতে লাগিলেন। নাতিনীটির একটি প্রশ্ন ছিল বোধ হয়, ঢাকায় বাঘ আছে কি না। কবি বলিলেন, মেলা বাঘ, রাশি রাশি বাঘ। বাঘে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যায় আর বলে, বক্তৃতা দাও, না হয় গল্প বল। বিকালে জগন্নাথ হলে কবির অভিনন্দন ছিল, যথাসময়ে গিয়া শুনি, কবি গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। কথা বলিতে বলিতে কেমন নাকি তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িতেছেন! বুঝিলাম, প্রকৃতির প্রতিশোধ! এত অত্যাচার মানুষের শরীরে সয় না। কবি বেপরোয়া হইয়া সকলই সহিয়া যাইতেছিলেন, তাই ঢাকানগরী তাঁহার নিকট বক্তৃতা-গল্প-রসপিপাসু ব্যাঘ্র-সমাকুল অরণ্যবৎ বোধ হইতেছিল। ইহার পর কবিকে বুড়িগঙ্গা-বক্ষে বোটে লইয়া যাওয়া হয় এবং দর্শনকারীদের আনাগোনা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কয়েকদিন পরে কবি ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

আর দুইটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া আমার এই অক্ষম স্মৃতিতর্পণ শেষ করিব।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" এবং উহার ইংরেজী অনুবাদ The Master's Will প্রকাশিত হয়। আমাদের শাসকসম্প্রদায় দেশের সাহিত্য ও কর্মণাধারার অনেক সংবাদই রাখেন না, দেশে জাতীয়তার উদ্বোধনে রবীন্দ্র-সাহিত্যে কতখানি কাজ করিয়াছে, সেই খবরও তাঁহারা রাখিতেন না। The Master's Will পড়িয়া তাঁহারা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। যাঁহাকে এতকাল নিছক কবি ভাবিয়াই তাঁহারা এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাঁহার মুখে আবার এ কেমনধারা কথা শুনা যায়! ইঙ্গভারতীয় কাগজগুলিতে রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া ঠাট্টাবিদ্রূপ সুরু হইল। 'স্টেট্স্ম্যান' বলিলেন, কদলী বৃক্ষ ও ফলের বিকাশ সম্বন্ধে আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিত্বপূর্ণ গান শুনিতে রাজি আছি, কিন্তু রাজনীতি তো কবিত্ব নহে! রবীন্দ্রনিন্দা বা তাঁহার মহিমা খর্ব করিবার চেষ্টা প্রত্যেক রবীন্দ্রভক্তেরই অসহ্য, পূর্ববঙ্গবাসীর অসহিষ্ণুতা আবার সর্বদাই একটু সক্রিয় ও প্রবল আকার ধারণ করিয়া থাকে। আমি নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট রাজনৈতিক রচনার নমুনাস্বরূপ তাঁহার স্বদেশী আন্দোলনের যুগের একটি চমৎকার লেখা অংশত অনুবাদ করিয়া, এবং রবীন্দ্রনাথকে রাজনীতির ক্ষেত্রে আনাড়ী বলিয়া ধরা যে কত বড় মূঢ়তা এই সম্বন্ধে নিজস্ব লম্বা ভূমিকা দিয়া Sir Rabindranath and Politics নাম দিয়া একটা লেখা পত্রের আকারে 'স্টেট্স্ম্যানে' প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া দিলাম। 'স্টেট্স্ম্যানে'র সম্পাদক উহা মহা সমাদরে সম্পাদকীয় মন্তব্যের সংলগ্ন করিয়া ৭ অক্টোবর রবিবার, ১৯১৭ তারিখের কাগজে প্রায় পূরা দুই কলমে ছাপিলেন। এই লেখাটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিলে সুখী হইতাম, কিন্তু রচনা দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে বলিয়া বিরত হইলাম। সম্পাদকীয়ের পার্শ্বে মুদ্রিত এই দীর্ঘ এবং বেশ গরম প্রবন্ধ ইঙ্গভারতীয় কাগজগুলির রবীন্দ্রপরিহাসের সুর থামাইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া অনুমান করি। কারণ ইহার পরে আর ঐ রকম রবীন্দ্র-তাচ্ছিল্যের সুর নজরে পড়ে নাই। A well wisher of the Empire ছদ্মনামী লেখাটি খবরের কাগজে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। এক দৈনিক কাগজে সম্পাদকীয়ভাবে লেখা হইল, রবীন্দ্রনাথের কোন শত্রু তাঁহার লেখা ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া ইংরেজ সরকারের নিকট তাঁহাকে ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই প্রবন্ধ বাহির হওয়ার কয়েকদিন পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে ঢাকায় আসেন। লক্ষ্মীবাজারে তাঁহার এক আত্মীয়ের বাসায় তিনি উঠিয়াছিলেন। অপরাহ্নে তথায় তাঁহাকে ঘিরিয়া বেশ এক মজলিস বসিল, তথায় কথাপ্রসঙ্গে এই প্রবন্ধের কথা উঠিল। দেশবন্ধু বলিলেন, এমন জোরদার লেখা জস্টিস উড়রফের বলিয়াই বোধ হয়। নানা জনে নানা মন্তব্য করিলেন। মজলিস ভাঙিলে সকলে উঠিয়া পড়িলাম, দেশবন্ধুর জামাতা

সুধীরবাবুকে কানে কানে বলিয়া আসিলাম, দাশ মহাশয়কে বলিবেন, লেখাটি এই অধমের পরের দিন দেখা হইলে দেশবন্ধু সম্ভবত অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন, কিন্তু স্পষ্ট কিছু মনে নাই।

এই ঘটনার কয়েক মাস আগে আমার সম্পাদনে ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে "মীনচেতন" নামে একখানি প্রাচীন পুথি প্রকাশিত হয়। সাহিত্যবিশারদ মুন্সী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম পরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে 'গোরক্ষবিজয়' নামে এই পুথিরই এক সংস্করণ প্রকাশিত করেন। 'মীনচেতন' বাহির হইবামাত্র রবীন্দ্রনাথকে আমি একখানি উপহার পাঠাই নিজেকে 'আলসে-কুড়ে' বলিয়া আজীবন প্রচারকারী রবীন্দ্রনাথ বস্তুত কিরূপ সুশৃঙ্খল ও কর্মতৎপর ছিলেন, ইহা সকলেরই জানা আছে। বহুদিন পর্যন্ত সমস্ত চিঠির উত্তর তিনি স্বহস্তে দিতেন এবং তাঁহার নিকট পত্র দিয়া ফেরত ডাকে অথবা অবিলম্বে উত্তর পান নাই, এই নালিশ কাহাকেও করিতে হয় নাই। 'মীনচেতন' পাইবামাত্র তিনি জবাব দিলেন, ভিতরে তারিখ দেখিতেছি ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪। খামের উপর পোস্ট-অফিসের ছাপ বড়বাজার, ১৬ মে ১৯১৭—

"বিনয় সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—মীন-চেতন বইখানি পাইয়া উপকৃত হইলাম। বাঙ্গালা ভাষার শব্দতত্ত্ব আলোচনায় আমার স্বাভাবিক ঔৎসুক্য আছে, সেই কারণে এ বইখানি আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান। এরূপ গ্রন্থ আবিষ্কার ও প্রচার করিয়া ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ গৌরব লাভ করিতেছেন এবং এই উদ্যোগে আপনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, সে জন্য স্বদেশের হইয়া আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলাম। ইতি ২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪—ভবদীয় শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

ঢাকায় বিবেকানন্দ

৯ই চৈত্র অপরাহ্নে সর্বজন পরিচিত স্বামী বিবেকানন্দ ঢাকায় পদার্পণ করেন। ঢাকার পক্ষে পূর্ববঙ্গের পক্ষে সেই দিন বড়ই শুভ দিন গিয়াছে। কিন্তু ঢাকার শিক্ষিত সমাজের দুরদৃষ্ট-পূর্ব বঙ্গীয় সমাজের দুরদৃষ্ট ঢাকাবাসীরা স্বামীজির আগমন সম্বন্ধে পূর্বে কোন আভাস পান নাই যাহা হউক স্বামীজি অনাহূত অবস্থায় ঢাকা আসেন নাই ইহাই সুখের বিষয়। রামকৃষ্ণ মিশন নামক কোন এক সমিতি তাহার আদর অভ্যর্থনার জন্য বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরই উৎসাহ উদ্যোগে সশিষ্য স্বামীজি পরোলোকগত মোহিনীবাবুর গৃহ পবিত্র করিলেন অভ্যর্থনাপর্বের যবনিকা এখানেই পতন হইল।

বিবেকান্দ ঢাকায় আসিলেন—ঢাকায় হুলস্থূল পড়িল না আশ্চর্যের বিষয় নয় কি? যিনি মার্কিন বিজয় করিয়া আসিলেন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীকে স্তম্ভিত করিয়া আসিলেন, বিদেশে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া বিশেষ সামদৃত এবং পূজিত হইলেন সেই বিবেকানন্দ আমাদের পূর্ব পরিচিত সেই নরেন্দ্রনাথ দত্ত পূর্ববঙ্গে পূজা অর্চনা তাদের অভ্যর্থনা পাইলেন না ক্ষোভের বিষয় নয় কি? স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় বেদজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি বেদ শিক্ষা দিতে শাস্ত্র প্রচার করিতে, এত পরিশ্রম করিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিলেন কিন্তু পূর্ববঙ্গের কি দূরদৃষ্ট. সমাজের কি অধঃপতন জনসাধারণ স্বামীজির নিকট বেদ শিক্ষা করিতে, শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিতে যাতায়াত করিলেন না।

ঢাকাবাসীর এই অস্বাভাবিক ব্যবহারে অনেকেই আশ্চর্য হইয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজির ঢাকা অবস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের অস্বাভাবিক ব্যবহারের রহস্য উদঘটিত হইল। আমরাও দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া আস্বস্ত হইলাম। পূজ্যপাদ পরমহংস দেবের প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিবার জন্য অনেকেই হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে মোহিনীবাবুর বাড়ি যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনেকেই স্বামীজির দর্শন লাভে বঞ্চিত হইতে লাগিলেন। স্বামীজিকে দরবার

কক্ষে প্রায়ই পাওয়া যাইত না। কাজেই স্বামীজির দর্শনলাভে ঐকান্তিক আগ্রহ থাকিলে শিষ্য সেবকদিগকে (প্রতিহারিদিগকে) অনুনয় বিনয় করিয়া স্বামীজির দর্শন লাভ ঘটিত। এ দর্শনই কি আবার স্বাভাবিক দর্শন। তিনি হয়ত দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় অর্দ্ধশায়িত, কোন ভদ্রলোক শ্রীচরণ দর্শনেচ্ছু অগত্যা হয় তিনি শয়নকক্ষে নীত হইলেন, নয় স্বামীজি স্বয়ং দরবার কক্ষে শুভাগমন করিলেন। অনেক সময়ই তাঁহার শান্ত সৌম্য মূর্তি দৃষ্ট হইত। তাঁহার আচার ব্যবহার বড়ই মধুর। শিষ্টাচার বিনয় বড়ই চমৎকার। অনেকেই মনে করেন এই শিষ্টাচার সদাচার মর্তের নয়—স্বর্গের। যিনি স্বামীজির দর্শন একবার পাইলেন তিনি কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। পুনরায় দর্শন বাসনার ইতি দিলেন। সুতরাং যাতায়াত করিবেন কি করিয়া।

ঢাকাবাসীর মত প্রথম আমরা বিশ্বাসযোগ্য মনে করি নাই। যিনি হিন্দুধর্মের জন্য এত আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, স্বীয় ভোগবিলাসিতায় জলাঞ্জলি দিয়া আত্মীয় পরিজনহীন দেশে স্বধর্ম প্রচারে এত কষ্ট করিয়াছেন, তিনি সদাচারী নন, সদালাপী নন, বিনয়ী নন—এই কথাগুলি বিশ্বাস করিতে প্রথম কেমন কেমন ঠেকিত। কিন্তু হিন্দু সমাজের অদৃষ্ট মন্দ, অধঃপতিত হিন্দুরা তাঁহার আলাপের মর্ম, সদাচারের উদ্দেশ্য বুঝিল না। তাঁহারা তাঁহার পরনিন্দায় সায় দিতে পারিলেন না। জনৈক ভদ্রলোক তাঁহার নিকট ধর্মোপদেশ পাইতে গিয়াছিলেন, তাঁহার ধর্মোপদেশ শুনিয়া ত অবাক। স্বামীজির নিকট কোন এক সাধু পুরুষ সম্বন্ধে মত জানিতে চাহিলে স্বামীজি তাঁহার নিন্দাবাদ আরম্ভ করিলেন। ভদ্রলোকটি বলিলেন, আমি ত আপনার নিকট পরনিন্দা শুনিতে আসি নাই, ধর্মোপদেশ পাইতে আসিয়াছি। নিন্দাধর্ম ধার্মিকের লক্ষণ নহে। ইহার পরে ভদ্রলোকটি চলিয়া আসিলেন।

আমরা একটা সাধারণ প্রবাদ বাক্য শুনিতে পাই "গুরু মিলে লাখে লাখে শিষ্য নাহি মিলে এক।" অনেকেই মনে করিলেন স্বামীজির শিষ্যগণ বুঝি নানা গুণালঙ্কৃত। কিন্তু তাহারাও গুরুর শিষ্য। কাজেই এক কাটি সরস। তাঁহাদের ভূষণ দাম্ভিকতা, অলঙ্কার পরনিন্দা। সংসারে (অন্ততঃ তাঁহাদের আলাপ ব্যবহারে যাহা বুঝা যায়) তাঁহাদের ন্যায় পণ্ডিত লোক অতি বিরল। ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছে পরিণত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ বেদ জানে না, বেদ দূরের কথা, বেদ পুস্তকখানা কি তাহাও দেখে নাই ইত্যাদি প্রকারের আলাপ ব্যবহার শুনিয়া তাহাদিগকে শফরীবৎ অল্প বুদ্ধি ও অল্প প্রাণ জীব মনে করিয়া জনসাধারণ তাহাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। বরং সযত্নে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। এদিকে শুনিলাম স্বামীজি ঢাকাবাসী সম্বন্ধে একটি মতও প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঢাকার জনসাধারণ ভক্তিহীন। পশ্চিমাঞ্চলে গেরুয়াবসন পরিহিত সাধু সন্ন্যাসীকে অনেকেই ভক্তি করে। আমরাও বলি ঢাকায় বস্তুতঃই ভক্তি নাই নতুবা স্বামীজি ঢাকা আসিলেন তাঁহাকে কোন ভদ্রলোক স্বগৃহে আহবান করিয়া সেবা অর্চনা করিলেন না কেন? ভক্তিহীনতার ইহা হইতে প্রকৃষ্ট লক্ষণ আর কি হইতে পারে। ঢাকাবাসীর এই আশ্চর্য ভক্তিহীনতায় অবাক হইতে হয় না কি? কিন্তু অবাক হই কি করিয়া। আমরা জানি যাহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদির বশবর্তী তাহার ধর্মোপদেষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, ধর্মশ্রমেরই অধিকারী নহে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ. এ., বি. এ., পরীক্ষা শেষ হয় এমন সময়ে স্বামীজি পূর্ববঙ্গে পদার্পণ করিলেই মনে করিলেন আমাদের পতিতপাবন Ewirse Exception স্বামী বিবেকানন্দ এবার Young Bengal-কে উদ্ধার করিতে ঢাকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। পরীক্ষার্থিগণ বক্তৃতা শুনিবার আশায় পরীক্ষার পরও ২/৪ দিন অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু তাহাদের ভাগ্যে স্বামীজির দেবদুর্লভ অমৃত বর্ষণের আস্বাদ ঘটিয়া উঠিল না। তাহারা ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে গমন করিলেন। একদিন দুই দিন করিয়া অনেকদিন কাটিল সশিষ্য স্বামীজির অনেক গুণগ্রাম ইত্যবসরে বাহির হইতে লাগিল তবুও ঢাকাবাসী তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত ভাবে সময় কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! বক্তৃতার বিজ্ঞাপণ আর জারি হয় না। অবশেষে

শুনা গেল তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। বক্তৃতা দিবেন কয়েকদিন পর। আমরা এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি স্বামীজি ঢাকা পদার্পণের অব্যবহিত পরেই বক্তৃতা দিলেন না কেন? তাঁহার অসুখের বিষয় ত তখন কেহ বলে নাই। তবে আমরা জানি কৈফিয়ৎ গড়ান অতি সহজ। এদিকে ব্রহ্মপুত্র স্নান আসিল স্বামীজি অষ্টমী স্নানে চলিলেন। 'বজরায়' নদীর হাওয়ায় তীর্থ মাহাত্ম্যে দুগ্ধ ফেননিভ শয্যার কোমলতায়, সোডাওয়াটার ও লেমনেডের অনুকম্পায় তাঁহার শরীর শুধরাইল কি না জানি না তবে বক্তৃতা দিবেন বিজ্ঞাপন প্রচারিত হওয়ায় আমাদের ব্যাকুলতা অনেকটা শোধন প্রাপ্ত হইল। দেখিতে দেখিতে বক্তৃতার নির্দিষ্ট সময় আসিল, জগন্নাথ কলেজ মন্দির প্রাঙ্গণ, লোকে লোকারণ্য হইল। কিন্তু হায়রে অদৃষ্ট! বিলাতের মাটি স্পর্শ করিয়াও স্বামীজি বাঙ্গালি সুলভ গুণ ছাড়াইতে পারিলেন না। তিনি নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইলেন না। আর উপস্থিত বা হন কি করিয়া, একে ত স্বামী বিবেকানন্দ তায় আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী সাধু পুরুষ, জুরি গাড়ি ব্যতিরেকে আসেন কি করে? যা হোক স্বামীজিও পৌঁছিলেন, বক্তৃতাও আরম্ভ হইল এবং শেষ হইল। ঢাকা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রহিয়া গেল। এ বক্তৃতায় ঢাকাবাসীর আকাঙ্খা পুরিল না। ভক্তবৃন্দের বাসনা তৃপ্ত হইল না। তাই পগোজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ভক্তের বাঞ্ছা পুরাইতে (বা পুড়াইতে) স্বামীজি আর এক বক্তৃতা দিলেন। সেই বক্তৃতায় তিনি পূর্ব অবতার রূপে আসরে অবতীর্ণ হইলেন। 'ষটদর্শন' তাহার চক্ষের সামনে ভাসিতে লাগিল, 'চতুর্বেদ' তাঁহার কণ্ঠস্থ হইল। পৃথিবীর সমগ্র শক্তি তাহাতে সমাকৃষ্ট হইল, তিনি তাঁর স্বরে বলিলেন (অবশ্য ইংরাজীতে) দেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নাই, বেদজ্ঞ থাকা ত দূরের কথা সমগ্র বেদ দেখেছেন এমন ব্রাহ্মণও নাই। আর যদিই বা থাকেন আমি বাকযুদ্ধে আহ্বান (challenge) করিতেছি। স্বামীজির এ বক্তৃতায় ঢাকা সমাজ একটু বিচলিত হইল। স্বামীজির (challenge) গ্রহণ করা ঢাকার শিক্ষিত সমাজ যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। এতন্যমর্মে স্বামীজির নিকট পত্রও প্রেরিত হইল।

৪টি ভদ্রলোক পত্রবাহকের কার্য করিলেন। স্বামীজির নিকট পত্র শিষ্য মারফত পৌঁছিল। কিন্তু স্বামীজি, সভ্য সমাজের অনুরোধে শিষ্টাচার প্রভৃতির অনুরোধেও কোন উত্তর দেওয়া যেন অবমাননার কাজ মনে করিলেন। তিনি শিষ্য মারফত পত্রখানা ফেরত দিলেন। তাঁহার শিষ্যদের নিকট প্রত্যুত্তরের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা যে উত্তর দিলেন তাহা সমাজ বিগর্হিত, লোকনিন্দিত। যাঁহারা পত্রবাহকের কার্য করিতেছিলেন তাঁহারা স্বামীজি অথবা তাঁহার শিষ্যদের নিকট বিনয় বিবর্জিত, শিষ্টাচার বিরুদ্ধ ব্যবহার পাইবেন ইহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। স্বামীজি ধর্ম জীবনযাপন করিতেছেন। শিষ্যরাও মহাজন প্রদর্শিত পথে চলিতে চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহারা কেন আদর্শ চরিত্রবান হইবেন না। তাঁহাদের শরীরে কেন অসুরবৃত্তিনিচয়ের আধিক্য দৃষ্ট হইবে? তাঁহারা কেন কাম ক্রোধাদির বশবর্তী হইবেন, ইহার কারণ বুঝা দুস্কর। কোন ভদ্রলোক এক শিষ্যকে পত্রোত্তর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় শিষ্যজি রাগতঃ বলিলেন 'আপনাদের যা ইচ্ছা হয় করুন। স্বামী পত্রোত্তর দিবেন না।' আমরা জানি এমতাবস্থায় পত্রোত্তর দেওয়াই প্রচলিত নিয়ম। পত্রোত্তর চাওয়ায় রাগ কেন? ইহা বুঝি ধর্মের লক্ষণ। না? যাঁহারা বিনয় শিষ্টাচারের ধার ধারে না যাঁহারা কাম ক্রোধাদির সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন, যাঁহারা অভিমান ভরে ধরাকে সরা জ্ঞান করেন, যাঁহারা পরনিন্দায় বিশেষ আনন্দলাভ করেন, হিন্দু নামে পরিচয় দিয়ে হিন্দুর ঘরে আত্মকলহের সূত্রপাত করেন, তাঁহারা ধর্ম শিক্ষা দিতে কিসে, কোন গুণে উপযুক্ত ইহা বোধকরি কেহই বুঝে না। স্বামী বিবেকানন্দের নামে একদিন এদেশীয় হিন্দুর আনন্দাশ্রু ঝরিত, স্বামী বিবেকানন্দের প্রশংসাবাদে হিন্দুর দেহ শক্তি সঞ্চয় হইত, নরেন্দ্রনাথের অমানুষিক শক্তির প্রশংসাবাদ শ্রবণে হিন্দু জনসাধারণ পুলকিত হইত, তাঁহাকে আশীর্বাদ করিত, স্নেহ করিত, ভালবাসিত ভক্তি করিত। কিন্তু আজ পূর্ববঙ্গে তাহার প্রতি সেই স্নেহ ভালবাসা, সেই ভক্তি বিশ্বাস, তাঁহার প্রতি আলাপ পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাইল। হায় রে কপাল। সাধে কি কবি বলিয়াছিলেন—

ভূধর দুরধিগম্য দূর হতে অতিরম্য
ধূম শ্যাম তুষার কিরীটি।
নিকটে বিকট শীর্ণ, বন্ধ্য কঙ্করাকীর্ণ
শুষ্ক যেন উকিলের চিঠি।

তিনি তাঁহার মতের মীমাংসা করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় হিন্দু সাধারণের হিতার্থে ইংরেজি পত্রখানার অবিকল প্রকাশিত হইল। সভ্যজগৎ এক্ষণ বুঝিতে পারিবেন তাঁহার বক্তৃতা শুধু অসংলগ্ন, অপ্রাসঙ্গিকভাব পরিপূর্ণ ছিল তবুও তাঁহার বাগ্মিতায শত্রু মিত্র সমস্তেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিয়াছিলেন। হিন্দু সাধারণ স্বামীজিকে তাঁহাদের একজন মনে করেন। তাঁহারা কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনা করেন। তিনি আরও সংযমী হন ইহাও তাহারা পরমেশ সমীপে প্রার্থনা করেন। ঢাকা প্রকাশ, ২১ এপ্রিল ১৯০১

দাঙ্গা ১৯০৪

'ভীষণ দাঙ্গা'— বিগত রবিবার রাত্রি অনুমান ৯ ঘটিকার সময় স্থানীয় নবাবপুর পুলের উত্তর পারবর্তী মসজিদের নিকটে হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। সহোদরসম উভয় জাতির মধ্যে কেন পুনরায় এই বৈরিভাব সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত কারণ আজিও আমরা জানিতে পারি নাই। বঙ্গ বিভাগের আন্দোলনকালে ঢাকার যে হিন্দু মুসলমানকে এক মাতৃগর্ভজাত সন্তানের ন্যায় গলাগলি ধরিয়া কাঁদিতে দেখিয়াছি, আজ সহসা কেন তাহাদের মধ্যে ভাবান্তর উপস্থিত হইল, ইহা বস্তুতই বিশেষ ভাবনার বিষয়। যাহা হউক, ঘটনার বিবরণ যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে নিম্নে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল। রবিবার সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রী রক্ষাকালীর ভাসান উপলক্ষে শাঁখারি বাজার হইতে সংকীর্তনাদিসহ দেবীমূর্তি বাহির করা হইয়াছিল সংকীর্তনদল নবাবপুর পুলের নিকটে উপস্থিত হইলে, মসজিদস্থিত মুসলমানগণ নাকি তাহাদিগকে প্রথম গান বাদ্যাদি বন্ধ করিয়া মসজিদেব নিকটবর্তী স্থান অতিক্রম করিয়া যাইতে অনুরোধ করে। সংকীর্তনের গোলযোগে মুসলমানদিগেব নিষেধ শুনিতে না পাইয়াই হউক, বা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই হউক, সংকীর্তনদল গান বাদ্যাদি বন্ধ না করিয়া ক্রমে নবাবপুরের দিকে চলিয়া যায়। এইরূপে কয়েকদল সংকীর্তন চলিয়া গেছে, সর্বশেষে দেবীমূর্তিবাহী সম্প্রদায় বাদ্যোদ্যমসহ মসজিদ সমীপে উপস্থিত হইল। দৈব দোষে এখানে গোলযোগের সূত্রপাত। মুসলমানদিগের উক্তিতে প্রকাশ তাহাবা নাকি ইহাদিগকেও বাদ্যোদমাদি গোলযোগ করিতে নিষেধ করিয়াছিল। হিন্দুগণ ঐ কথায় উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্বক গোলযোগ করিয়া মুসলমানদিগের সমাজে বাঁধা দেওয়াতে এই দাঙ্গা সংঘটিত হইয়াছে। এদিকে হিন্দুগণ বলিতেছে, "মুসলমানেরা তাহাদিগকে ঐরূপ কোন নিষেধাদি করে নাই। দেবীমূর্তিব সঙ্গে মশাল হস্তে কয়েক জন বৃদ্ধ ও কতকগুলি বালক ব্যতীত আব কেহই ছিল না। সুতরাং মুসলমানদিগের নিষেধ অমান্য করিয়া ইহারা গোলযোগ করিবে তাহার সম্ভাবনা কোথায়? দেবী মূর্তিবাহী সম্প্রদায় মসজিদ সমীপে উপস্থিত হইলেই মুসলমানগণ বংশ দণ্ডাদিসহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। কোন পক্ষের উক্তি সত্য, বিধাতাই বলিতে পারেন। ফলে হিন্দুপক্ষের ৭/৮ টি লোক গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। যাহা হউক শুনিতেছি, গোলযোগের মূল কারণ সন্ধান করিবার জন্য স্থানীয় পুলিশেব অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব তদন্তভার গ্রহণ করিয়াছেন। ভরসা করি অনুসন্ধানে প্রকৃত তত্ত্ব উদঘটিত হইবে। লোকমুখে প্রকাশ, এই দাঙ্গার গোলযোগ দেবীমূর্তির শরীরস্থিত স্বর্ণ নির্মিত দুইগাছি অনন্ত ও একছড়া দড়িয়া হার নাকি পাওয়া যাইতেছে না। অনুসন্ধান ফলে, সময়ে সকল সন্ধানই জানা যাইবে। উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই গোলযোগের ফলে যাহাতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পুনরায় বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া না ওঠে, তজ্জন্য সমাজহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য। এই গোলযোগ আপোষে

মিটিয়া যাইতে পারে কিনা, তজ্জন্য একবার সাধ্যানুরূপ যত্ন করিবার জন্য আমরা হিন্দু ও মুসলমান সমাজের অগ্রণীদিগকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

ঢাকা প্রকাশ, ২০ নভেম্বর ১৯০৪

এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটির আপোষে মীমাংসা হতে সময় লাগেনি। তখনকার সমাজে আজকের মত এমন বিষদৃশ মলিন মানসিকতার উন্মেষ ঘটেনি। ভ্রাতৃত্ব বোধ মমত্ব, প্রীতি বোধ, সহমর্মিতা বোধ ছিল প্রবল। যা ক্ষণিকের উন্মাদনাকে দ্রুত প্রশমনে ছিল সক্ষম।

"নবাবপুর পুলের পর পারবর্তী মসজিদের সম্মুখে গত পূর্ব রবিবার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে সংঘর্ষ হইয়াছিল, যথাসময়ে তাহা পাঠকবর্গের গোচরীভূত হইয়াছে। উভয় পক্ষের অবিবেচনার ফলে যে শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে কল্পনা কালিমা দ্বারা তাহার বিষময় চিত্র অঙ্কিত না করিয়া সহজে যাহাতে তাহা বিস্মৃতি সলিলে বিসর্জন দেওয়া যাইতে পারে, তজ্জন্য যথোচিত যত্নকরা সমাজহিতৈষী মাত্রেরই একমাত্র কর্তব্য মনে করিয়া আমরা বিগত সপ্তাহে তৎপ্রতি সমাজপতিগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণে যত্নবান হইয়াছিলাম। ঢাকাতে যে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে স্মরণাতীত কাল হইতে সৌহার্দ্য সংস্থাপিত হইয়াছে, ক্ষণিকের অবিমৃষ্যকারিতা দেখিয়া সে প্রীতিবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে অগ্রসর হইবে, ঢাকাতে এমন কুলকুঠার কেহ আছে কি না, জানি না। হইতে পারে, উভয় পক্ষেরই দোষ ছিল, অথবা এক পক্ষে দোষের মাত্রা অধিক, কিন্তু ক্ষণিক উত্তেজনার বিষময় ফল লইয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায় চির শত্রুতার সৃষ্টি করা কখনই বুদ্ধিমানের কর্তব্য নহে। ঢাকার মঙ্গলকামিগণ শুনিয়া অবশ্য সুখি হইবেন, আমাদের সহৃদয় ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ র‍্যাঙ্কিন্ মহোদয়ের প্রযত্নে এই অশুভ ব্যাপার সহজেই মিটিয়া গিয়াছে। সুযোগ্য ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় বিগত শুক্রবার, উভয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গকে গোলযোগ মীমাংসার নিমিত্ত স্বগৃহে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্ররোচনায় মাননীয় খাঁন বাহাদুর শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ ইয়ুসুফ মহোদয় মুসলমানদিগের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করাতে, এবং ভবিষ্যতে যেন এরূপ গোলযোগ না ঘটিতে পারে তাহার সমুচিত প্রতিবিধনে অবলম্বিত হইবে এরূপ আশ্বাস প্রদান করায়, উভয় জাতির মধ্যে পূর্ব সৌহার্দ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সর্বসম্মতিক্রমে ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, অতঃপর কোন মিছিল প্রভৃতি, উপাসনার সময়, কোনও ভজনালয়ের উভয়দিকে ৫০ হাতের মধ্যে কোন প্রকার গোলমালের কার্য করিতে পারিবে না। উপসংহারে ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় বলিয়াছেন যে, তিনি প্রত্যেক মহল্লার পঞ্চায়েত দিগকে ডাকাইয়া ভবিষ্যতের সম্বন্ধে বিশেষ রূপে সতর্ক করিয়া দিবেন। মহানুভব ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ র‍্যাঙ্কিন্ মহোদয় এই শুভঙ্কর কার্যে, হস্তক্ষেপ করিয়া তিনি যে ঢাকাবাসীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধ এবং আন্তরিক অনুরাগ লাভের সর্বাংশে উপযুক্ত তাহারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভগবৎ কৃপায় এই পরিহিতব্রত পুরুষপ্রবর দীর্ঘকাল ঢাকা অবস্থান করিয়া ঢাকাবাসীর কল্যাণ সাধনে নিরত থাকুন, ইহাই প্রার্থনীয়। ঢাকা প্রকাশ, ২৭ নভেম্বর ১৯০৪

ঢাকায় নজরুল

"সেই আমি প্রথম দেখলাম নজরুলকে, অন্য অনেক অসংখ্যের মতোই দেখামাত্র প্রেমে পড়ে গেলাম। চওড়া কাঁধে বলিষ্ঠ তাঁর দেহ, মাঝখান দিয়ে সোজা-সিঁথি-করা কোঁকড়া চুল গ্রীবা ছাপিয়ে প্লাবিত, মুখখানা বড়ো ও গোল ছাঁদের, নেত্র আয়ত ও কোণ রক্তিম। গায়ে গেরুয়া রঙের খদ্দর পাঞ্জাবি, কাঁধে সূর্যমুখী হলুদ চাদর। কণ্ঠে তাঁর হাসি, কণ্ঠে তাঁর গান, প্রাণে তাঁর অফুরান আনন্দ—সব মিলিয়ে মনোলুণ্ঠনকারী একটি মানুষ। তাঁর জন্য আমি জগন্নাথ হল-এ যে-সভাটি আহ্বান করেছিলাম তাতে ভিড় জমে ছিল প্রচুর। দূর শহর থেকে ইডেন কলেজের অধ্যাপিকারাও এসেছিলেন, তাঁর গান ও কবিতা আবৃত্তি শুনে সকলেই মুগ্ধ ঃ মৃত অথবা বৃদ্ধ অথবা প্রতিষ্ঠানীভূত না-হওয়া পর্যন্ত কবিদের বিষয়ে, যাঁরা স্বাস্থ্যকরভাবে সন্দিগ্ধ, সেই প্রাজ্ঞদেরও মানতে হয়েছিল যে 'লোকটার মধ্যে কিছু আছে।'

সে-যাত্রায় আমার নজরুল-সংসর্গ সেখানেই অবশ্য শেষ হয়নি। তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলাম সবান্ধবে আমার পুরানো পল্টনের বাড়িতে ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বারে এক অধ্যাপক ভবনে তাঁকে গান রচনা করতে দেখেছিলাম। তাঁর স্বকণ্ঠে তাঁর গান যাঁরা শুনেছেন, তাঁর রচনা-প্রক্রিয়ার দর্শক ছিলেন যাঁরা, শুধু তাঁরাই জানেন নজরুলের পক্ষে গান জিনিসটা কত সত্য ছিল। কত স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। একটি হার্মোনিয়াম, প্রচুর পরিমাণে পান এবং ঘণ্টায়-ঘণ্টায় চা ঃ এই উপকরণ নিয়ে তিনি সারাদিন ধরে গেয়ে যেতে পারেন—অনুরোধের অপেক্ষা না রেখে, প্রাণের আবেগে, অক্লান্তভাবে, মাঝে মাঝে শ্রোতাদের দিকে দৃষ্টিবাণ হেনে কোন বিশেষ পঙক্তি বা শব্দবন্ধে এসে অকস্মাৎ গলা ছেড়ে হেসে উঠে। গাইয়ের মাজা গলা নয় তাঁর, বরং একটু ভাঙা-ভাঙা, কিন্তু সেই ত্রুটি বিপুল ভাবে পুষিয়ে দেয় তাঁর অপর্যাপ্ত বাধাবন্ধহীন উৎসাহ। আর গীতরত নজরুলকে শ্রবণ এবং দর্শন করে আমরা আরো বেশি আনন্দ পাই এই কারণে যে সেই নবোদ্ভূত নবরসান্বিত গজলগুচ্ছের প্রতিটি পঙক্তি 'কল্লোলে'র পৃষ্ঠা থেকেই আমাদের মুখস্থ, 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর মুখে মুখে সেগুলি সুরে-বেসুরে আবর্তিত হয়ে থাকে। যেমন তাঁর গান গাওয়া নিষ্কুণ্ঠ তেমনি তাঁর রচনাও এক প্রকাশ্য ঘটনা ঃ সৃষ্টিকর্মটি যে নির্জনতা দাবি করে ব'লে আমরা চিরকাল শুনে এসেছি, তার তোয়াক্কা, রাখে না নজরুল, ঘর-ভর্তি লোকের উপস্থিতি তাঁকে বিব্রত করেনা মুহূর্তের জন্য—বরং অন্যদের চোখে-চোখে তাকিয়ে হাসির উত্তরে হাসি ফুটিয়ে, তিনি যেন নতুন প্রেরণা সংগ্রহ করেন। সামনে হার্মোনিয়াম, পাশে পানের কৌটা, হার্মোনিয়ামের ঢাকনার উপরে খোলা থাকে তাঁর খাতা আর ফাউন্টেনপেন—তিনি বাজাতে-বাজাতে গেয়ে উঠলেন একটি লাইন, তাঁর বড়ো-বড়ো সুগোল অক্ষরে লিখে রাখলেন খাতায়, আবার কিছুক্ষণ বাজনা শুধু—দ্বিতীয় লাইন—তৃতীয়—চতুর্থ—দর্শকদের নীরব অথবা সরব প্রশংসায় চর্চিত হ'য়ে ফিরে-ফিরে গাইলেন সেই সদ্যরচিত স্তবকটি ঃ এমনি ক'রে, হয়তো আধ ঘণ্টার মধ্যে 'নিশিভোর হ'লো জাগিয়া পরান-পিয়া' গানটি রচনা করতে আমি তাঁকে দেখেছিলাম—দৃশ্যটি আমার দেবভোগ্য ব'লে মনে হয়েছিলো। 'প্রগতি'তে প্রকাশিত নজরুলের লেখা সেই গানটাই বোধ হয় প্রথম।" আমার যৌবন, বুদ্ধদেব বসু, পৃঃ ৭-৯

মঠ প্রতিষ্ঠা :

ঢাকার অন্তর্গত মুড়াপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ববঙ্গে কেবল যে একজন প্রধান জমিদার বলিয়াই বিখ্যাত এরূপ নহে ধার্মিকতা, সৎকার্য প্রিয়তা ও অজস্র দানশীলতার নিমিত্ত তিনি সর্বত্র প্রসিদ্ধ ও সর্বথা সম্মানিত। ঢাকার হিন্দুধর্ম সভা তাহারই বিশেষ যত্ন উৎসাহ ও অর্থবলে অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে। তাঁহার সার্বক্ষণিক দানে এদেশের অনেক সৎকার্য অনুষ্ঠিত ও অনেক দৈন্য দশাপন্ন ব্যক্তি প্রতিনিয়ত উপকৃত হইতেছে। তদ্বিষয়ক সবিস্তর বিবরণ অদ্যতন প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। প্রতাপ বাবু গত ২৯ পৌষ নিজ বাটিতে মঠ প্রতিষ্ঠা, শিবস্থাপন ও তুলা পুরুষ দান প্রভৃতি হিন্দুধর্মানুমোদিত যে সমস্ত ব্যয় সাধ্য ধর্মক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহারই সবিস্তর বৃত্তান্ত প্রকাশ করা অদ্যকার প্রস্তাবের অভিপ্রেত। বস্তুত প্রতাপবাবু অতি সমারোহে ও মনের উৎসাহে পূর্বোক্ত কর্মগুলি সমাধান করিয়াছেন।

...এই ক্রিয়া উপলক্ষে নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, কলকাতা, কাশী, বাকলা, বিক্রমপুর, ফরিদপুর, চন্দ্রপ্রতাপ পার জোয়ার, ঢাকা, মহেশ্বরী, স্বর্ণগ্রাম ও ভাওয়াল প্রভৃতি স্থানের প্রধান প্রধান অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও আত্মীয় কুলীন শ্রেত্রিয়, বংশজ প্রভৃতি কুটুমগণ নিমন্ত্রিত ও উপস্থিত হইয়াছিলেন। নবদ্বীপে পাথেয় সহিত ১৫৬ টাকা, ভাটপাড়ায় পাথেয় সহিত ১২৫ টাকা বিদায় দেওয়া হইয়াছে। বিক্রমপুর ও ঢাকায় পণ্ডিতদিগকে ২০ টাকা ও চন্দ্রপ্রতাপে ১৬ টাকা সহকারে এবং অন্যান্যস্থানের পণ্ডিতদিগকে সামাজিক নিয়মানুসারে অপেক্ষাকৃত ন্যূন সহকারে বিদায় করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতদিগের যাহার

যে পাথেয় ব্যয় পড়িয়াছিল, সমস্তই প্রদান করা গিয়াছে। অধিকন্তু বিদায় সময়ে নবদ্বীপ প্রভৃতির পণ্ডিতদিগকে এক একটি কলস ও বিক্রমপুর প্রভৃতির পণ্ডিতদিগকে এক একখানি থাল দেওয়া হইয়াছে। প্রতাপবাবুর ইহা কর্ম, অবশ্য কর্তব্য নিত্য কর্ম নহে। এই কার্যে কর্মে এইরূপ বিদায় লাভ করিয়া, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বস্তুতই বড় প্রীত হইয়া গিয়াছেন। এ দেশে সাধারণ একটা প্রণালী আছে যে, লোকে মাতৃপিতৃ শ্রাদ্ধে যে হারে বিদায় করিয়া থাকে, কার্য কর্মে উহার অর্দ্ধহারে বিদায় করিলেই যথেষ্ট হয়। এত দ্বারা এই কর্ম কিরূপ উচ্চাঙ্গে নির্বাহিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই অনুমিত হইবে।

এই ক্রিয়ার বিস্তর রবাহুত ব্রাহ্মণ ও বিস্তর দীন দরিদ্র ব্যক্তি অন্নার্থীও বিদায় প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১৫০০০ পনর হাজার হইবে। এই পনর হাজার লোককেই লুচি, কচুরী, অমৃতি, লাড্ডু, ছানাবড়া, বুঁদিয়া, বরফি সন্দেশ, দধি, ক্ষীর প্রভৃতি উপাদেয় আহারীয় দ্বারা ভোজন করান হইয়াছে। আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম যে, অন্নার্থী প্রায় ১৫০০০ পনর হাজার লোকের মধ্যে একটি ব্যক্তিও অপরিতৃপ্ত যায় নাই। এইরূপে তাদৃশ বহু সংখ্যক লোককে বিবিধ পক্কান্ন দ্বারা সমভাবে পরিতৃপ্ত করা সামান্য বুদ্ধিমত্তা বা সামান্য কার্য দক্ষতার কর্ম নহে। রবাহুত ব্রাহ্মণ, দুঃখী ও দরিদ্রগণ যে কেবল পক্কান্নেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, এরূপ নহে, আশাতিরিক্ত দান লাভ করিয়াও ততোধিক পরিতুষ্ট হইয়াছে।

অলীক ব্রাহ্মণদিগকে এক টাকা, বৈরাগী বৈষ্ণব প্রভৃতিকে আট আনা করিয়া ও প্রত্যেক শ্রেণীর ইন্দ্রিয় বিকলদিগকে উহার দ্বিগুণ দান করা হইয়াছে। দানের পরে আবার উহাদিগকে চিড়া ও চিনি প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন এই মহতী জনতা তিন সন্ধ্যা পর্যন্ত মুড়াপাড়ার জমিদার বাটির অতিথিশালায় অন্নগ্রহণ করিয়াছে। ঈদৃশ প্রশংসনীয় ব্যাপার, হিন্দুসমাজে বস্তুতই মনোযোগ সহকারে শ্রবণের বিষয় সন্দেহ নাই।—

এই ক্রিয়ায় প্রায় পনর শত সামাজিক ব্রাহ্মণকে বিবিধ পক্কান্নে ভোজন করাইয়া উহাদের প্রত্যেককে এক একটি গেলাস ও চারি আনা করিয়া দক্ষিণা দেওয়া হইয়াছে। নিমন্ত্রিত কুলিনদিগকে বাটির নিয়মানুসারে বিদায় ও পাথেয় দেওয়া গিয়াছে।...

আজিকালি হিন্দু সমাজের অবস্থা অতি শোচনীয়। এই সময়ে হিন্দু ধর্মের অনুমোদিত কার্যকর্মের অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক, অনেকে মাতৃপিত্র শ্রাদ্ধকে গলগ্রহ বোধ করেন। ঈদৃশ দুঃসময়ে যিনি বহুব্যয় স্বীকার করিয়া মনের আগ্রহে ও উৎসাহে ধর্মক্রিয়া সম্পাদন ও সমাজে ধর্ম প্রবৃত্তি সন্ধুক্ষণের নিমিত্ত, আপনাকে জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রদর্শন করেন, কে তাহাকে অগন্য ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে? বস্তুত প্রতাপবাবু এই ক্রিয়ায় ধর্মভাবে যেরূপ, মাতৃভক্তি প্রভৃতিতেও সেইরূপ উদ্দীপ্ত হইয়া আর এক বিষয়েও দৃষ্টান্ত স্থল হইয়াছেন...।

ঢাকা প্রকাশ ১৯ জানুয়ারি ১৮৯০

ঢাকায় ধর্মমন্দির

যে ধর্ম স্বয়ং ভগবানের উপদিষ্ট ; যাহা পরম যোগীগণের শত সহস্র বর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যার ফল ; যাহার জন্য সাম্রাজ্যাধিপতিগণও অনায়াসে বিষয় ভোগ তুচ্ছ করিয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশপূর্বক গলিত পত্রাদি ভক্ষণ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা শ্রেয়োবোধ করিতেন ; যে সারবান্ ধর্মকে বিনাশ জন্য কত শত দৈত্য রাক্ষস সমুদ্যত হইয়াও কিছু করিতে পারে নাই ; যাহা অনন্তকাল হইলে অনন্ত লোকের সদগতির একমাত্র নিদান স্বরূপে বিরাজমান, সর্বজ্ঞ মহর্ষিদিগের ভষ্যিৎবাদিতা সাফল্য করিবার জন্যই যেন এই কলিকালে সেই ধর্মে লোক সমূহ আস্থাহীন হইয়া নানা অসৎপথে বিচরণ করিতেছে। মহাকাল পুরুষ মহাপ্রলয়ের হেতুভূত পাপরাশি সঞ্চিত করিবার জন্য জীবসমূহকে নিয়তই পাপের দিকে নানা প্রলোভন দ্বারা টানিতেছে, তাহারই কৌশলে সামান্য বুদ্ধি আধুনিক মানবের আপাত মনোমুগ্ধকর মত

সমূহদ্বারা ভ্রান্ত মান সমূহ পারলৌকিক বহু কষ্টের নিদান অসৎপথের পন্থী হইতেছে, জন্ম জন্মান্তরীণ অশেষ কল্যাণের হেতুভূত হিন্দুর অবিনশ্বর ধর্ম দুর্ভাগ্য মানবদিগকে অল্পে অল্পে পরিত্যাগ করিতেছে ; ধর্ম সম্বন্ধে শোচনীয় দশা উপস্থিত। এই কঠিন সময়ে ধর্মরক্ষার উপায় না করিলে কেবল যে ভবিষ্যৎ বংশের অপকার হইবে, তাহা নহে ; যদি ইহজন্মের পুণ্যবলে পুনরায় মানব জন্ম লাভের আশা কাহারও থাকে, তবে সঙ্গে সঙ্গে পরজন্মে তাঁহারও বাধ্য হইয়াই অসৎধর্ম গ্রহণ দ্বারা অসৎগতি লাভ করিতে হইবে। অতএব যাহাতে এ ধর্ম রক্ষা পায়, তাহার উপায় করা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য।

বলা বাহুল্য যে, সুদপদেষ্টবর্গের শাস্ত্রার্থ প্রচার ও ধর্মবিষয়ক আলোচনা ধর্মজ্ঞান লাভের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। সুদপদেষ্টার পরিমাণ অতি অল্প, প্রত্যেক গৃহে গিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান তাঁহাদের পক্ষে সহজ নহে, অতএব সর্বসাধারণের জন্য এক একটি নির্দিষ্ট স্থান হওয়া আবশ্যক। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় পূর্ববঙ্গের রাজধানী এই ঢাকানগরীতে এমন একটি স্থান নাই, যাহা ঐ উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে সাধারণের সুবিধাজনক। কোন সাধু মহাপুরুষ আগমন করিলে, তাঁহারও আতিথ্য সৎকারের একটি সর্বজনপরিচিত স্থান হয় না। বারোয়ারীর দেবার্চনা মহোৎসবাদি করিতে হইলে স্থানাভাবেই তাহা ঘটেন। অবশ্য ঢাকাতে এমন শত শত মহৎ ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা ঐ সমস্ত কার্য নির্বাহোপযুক্ত স্থান দিতে পারেন ও দিয়া থাকেন ; কিন্তু সেরূপ ব্যক্তিগত অনুগ্রহের প্রার্থনায় সাধারণ ভদ্রলোকদিগের কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয় না। আর একটি গুরুতর অসুবিধা। মোকদ্দমাদি নানা কারণে অনেককে ঢাকায় আসিতে হয়, কিন্তু অনেককেই স্থানাভাবে নিতান্ত কষ্ট পাইতে হয়। অতিথি অভ্যাগতের (সেবা) হিন্দুর অন্যতম কর্তব্য। সাধ্যানুসারে তাহা না করিলে পাপ আছে। কিন্তু ঢাকাবাসী এই পাপে চিরকাঙ্ক্ষিত। পূর্ববঙ্গের শীর্ষস্থান ঢাকার এ কলঙ্কে পূর্ববঙ্গবাসী মাত্রেই সম্পর্কিত এবং সময় সময় অসুবিধাগ্রস্ত। এই সকল কলঙ্ক, অসুবিধা ও ধর্ম কার্যের অন্তরায় সমূহ নিরাকরণ জন্য ঢাকায় একটি ধর্ম মন্দির প্রতিষ্ঠা করা স্থির হইয়াছে। এই মহৎকার্যে ঢাকার অধিকাংশ গণ্যমান্য লোক সমুৎসাহী হইয়াছেন। সত্বরেই অনুষ্ঠান পত্রপ্রচার হইবে। তাহাতেই পাঠক দেখিবেন যাঁহারা একার্যে ব্রতী, তাঁহাদের পদ মর্যাদা এই কার্য সম্পাদনের বিশেষ অনুকূল। এই কার্যে প্রায় পঁচিশ সহস্র টাকার প্রয়োজন। শুনিতে যদিও অধিক বোধহয়, তথাপি ইহা হিন্দুসমাজের পক্ষে অতি সামান্য। পূর্ববঙ্গেই এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদের একজন ইচ্ছা করিলে এ অশেষ পুণ্যের নিদান অসাধারণ প্রতিষ্ঠার কার্যে সমস্ত ব্যয় প্রদান করিতে সমর্থ। কিন্তু যে পর্যন্ত তেমন কোন মহাত্মা আমাদিগের আশা ফলবতী না করিতেছেন, ততকাল হিন্দুমাত্রকেই আমরা অনুরোধ করিতেছি, যাহাতে এই কার্য সুসম্পন্ন হয়, তৎপক্ষে সকলেই মনে প্রাণে যত্নবান হউক। ঢাকা প্রকাশ ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯১

ধর্মানুষ্ঠানের স্থান :

ঢাকাতে হিন্দু সাধারণের ধর্মানুষ্ঠান জন্য উপযুক্ত স্থান নাই। ঢাকেশ্বরীর বাড়ি সহরের অধিকাংশ লোকের পক্ষে অগম্য। অধিকাংশ লোকের সুবিধাজনক একটিও স্থান কেন নাই, তাহার উত্তর সর্বজনপরিজ্ঞাত। ঢাকায় বাসিন্দা ভদ্রলোক কেহ নাই। যাঁহাদিগকে ভদ্রলোক না বলিলে হয় ত রাগিয়া অগ্নিশর্মা হইবেন, এমন মৌখিক ভদ্র হয় ত ঘরে ঘরেই আছে। এই ভদ্র মহাশয়দিগের কার্যে শৌণ্ডকের শ্রীবৃদ্ধি, বেশ্যার বাড়ি হর্ম নিকেতন, আর বিড়ার কুত্তার বিবাহে লাক টাকা ব্যয় দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু যাহা করিলে সাধারণের ধর্মলাভ হয়, যদ্দ্বারা ধার্মিক সমাজে চিরস্মরণীয় হওয়া যায়, এমন কার্য একটিও দেখিবার উপায় নাই। এই স্থানে এই ৫/৭ শত বৎসর মধ্যে কত সহস্র বড়লোক জন্মিয়াছে, কিন্তু তিন পুরুষ পরে যে, লোকে নাম করিবে, এমন কার কি কীর্তি আছে? যেমন লক্ষ লক্ষ নির্ধন এই ভূমিতে মিশিয়া গিয়াছে, তদ্রূপে সেই অগণিত ধনের ভাণ্ডারিগণও এই মাটিতে অচিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে ;

সে প্রচুর অর্থের স্বার্থকতা কি এই? অবশ্য বিদেশ হইতে ভিখাই রাম ঠাকুর আসিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের কৃপায় কয়পুরুষ আপনার নাম রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। জন্মাষ্টমীর জন্য রাম সরদার ও কৃষ্ণচন্দ্র সরদারের নামও কিছুদিন থাকিবে, বোধ হইতেছে; কিন্তু সমস্ত ঢাকাবাসীর পক্ষে ইহাই কি প্রচুর? যাহারা বেশ্যার জন্য বৃথা জেদ বা শখ মিটাইবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে পারে, তাহারা ১৫/২০ হাজার টাকা ব্যয় বা স্বার্থত্যাগ স্বীকার করিয়া কি সাধারণ ধর্মঢাকা কলেজিয়েট স্কুলকার্যের জন্য একটি বাড়ি করিয়া দিতে পারে না? দেখিতেছি, যেমন মুক্তাগাছার প্রাতঃস্মরণীয় লক্ষ্মীদেব্যা দ্বারা ময়মনসিংহের দুর্গাবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ময়মনসিংহের গৌরব রক্ষা পাইতেছে তদ্রূপ অন্য স্থানের কোন্ ধার্মিক ব্যক্তি দ্বারা ঢাকায় এইরূপ ধর্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলে তবে ঢাকাবাসীর নাম রক্ষা পাইবে। সম্প্রতি আমাদিগকে কোন মহাশয় জানাইয়াছে, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যে দশ সমগ্র টাকা হইবে, তাহা সমস্ত দ্বারা এই ধর্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে তিনি অকাতরে অবিলম্বে তাহা দিতে সম্মত আছেন। কিন্তু এই কার্য দশ হাজার টাকায় নির্বাহ হওয়া সন্দেহস্থল; ধর্মসভার বিবেচনায় এজন্য বিশ সহস্র টাকা লাগিবে। অতএব তাঁহার দশ সহস্র টাকা গ্রহণ করিলে তৎসহ অন্যান্য ব্যক্তি হইতে বাকী টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে, সুতরাং কেবল তাঁহার নামে ঐ ধর্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করা সঙ্গত হইবে না। পক্ষান্তরে আমরা দেখিতেছি, এমন একটি কার্যের জন্য—যাহার ফল ঢাকার ৮২০০ অধিবাসী নিত্য ভোগ করিবে, এবং ঢাকায় আগন্তুক অন্যান্য স্থানের লক্ষ লক্ষ লোক উপকৃত হইবে, এমন ধর্মকার্য দ্বারা আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিতে ২০ হাজার টাকা ব্যয় স্বীকার করা অনেকেই শ্লাঘ্য মনে করিবেন। আমরা আশা করি, এই মহৎ কার্যে যাঁহারা সমুৎসুক তাঁহারা অচিরে আমাদিগকে পত্র দ্বারা জানাইয়া বাধিত করিবেন। তাঁহারা অত্রত্য ধর্মসভার হস্তেই টাকা দিউন—অথবা নিজ লোক দ্বারা উপযুক্ত স্থলে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত করুন। উভয় প্রকারেই এই মহৎ কার্য সম্পাদন করিতে পারেন। যে সভা বিক্রমপুরস্থ কুলীন সমাজের প্রধান ব্যক্তি নবাব সরকারের দেওয়ান বাবু চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ও ভাওয়াল রাজমন্ত্রী বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে, ঐ জন্য অর্থ প্রদানে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে কোনই সন্দেহ নাই।

ঢাকা প্রকাশ ৩১ জানুয়ারি ১৮৯২

সহমরণ

'সহমরণ'-ধাইয়ের পাড়া বিক্রমপুরের একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। সুধন্যচন্দ্র দাস দেখুর বাড়ি উক্ত ধাইয়ের পাড়া গ্রামে। সুধন্য ওলাউঠায় আক্রান্ত হইয়া হঠাৎ মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। সুধন্যের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তাহার পুণ্যবতী পত্নীরও ওলাউঠার ন্যায় ভেদ হইতে থাকে। কালের শাসনে সুধন্যের জীবন বায়ুটুকু অনন্তে মিলিয়া গেলে, তদীয় সাধ্বী পত্নী আত্মজীবনে হতাশ হইয়া পড়িল। হৃদয়ের দেবতার অনুগমন করিবার নিমিত্ত অভাগিনীর অন্তরাত্মা বুঝিবা বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল। তাই পতিব্রতা রমণী আপন ৫/৬ ক্ষুদ্র শিশুসন্তানটিকে জনৈকা আত্মীয়ার হাতে সমর্পণ করিয়া সকলের নিকট চিরবিদায় প্রার্থনা করিয়া লইল। পতির মৃতদেহ তখনও প্রাঙ্গণে শায়িত ছিল। সাধ্বী কম্পিত কলেবরে ধীরে যাইয়া তৎপার্শ্বে শয়ন করিল। ক্রমে রমণীর নয়নযুগল স্থির নিশ্চল হইয়া আসে, যেন পতির চিরবাঞ্ছিত চরণযুগলতন্ময়চিত্তে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া সতী চিরশান্তি লাভ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে সকল ফুরাইয়া গেল। মুহূর্ত মধ্যে পতিপ্রাণা পত্নীর জীবনকণিকা পতির অনুগমন করিয়া সেই, চির সম্মিলনক্ষেত্রে চলিয়া গিয়াছে। দম্পতির আত্মীয়বর্গ ইহাদের এই যুগল শব একই শ্মশানে ভস্মীভূত করিয়া সতী সাধ্বীর শেষ বাসনা পূর্ণ করিয়াছে। আজি কালিকার এই অধঃপতনের দিনেও সমাজ পট হইতে সতীর চিত্র একেবারে অর্হিত হয় নাই বলিয়াই আজিও হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

ঢাকা প্রকাশ ১০ মে ১৯০৩

ঢাকায় ঘোড় দৌড়

PROGRAMME OF THE DACCA RACES SEASON 1904-1905

Under C. T. C Rules of Racing

STEWARDS :

THE HON'BLE NAWAB SALIMOLLAH BAHADUR.
W. a. COURT BEADON. ESq.

H. C. STREATFEILD, ESq. I. C. S.
G. MORGAN, ESq.
J. T. RANKIN, ESq., I. C. S.
LT. COL. R. N. CAMPBELL, I. M. S.

Honorary Secretary : — C. H. HOLDER. ESQ

FIRST DAY. TUESDAY. 10TH JANUARY, 1905

THE GUNNY MEAH PURSE.—Rs. 500 with a starting sweepstake of Rs. 20. second pony to receive Rs. 100 out of the entire stakes. For ponies 14/2 and under. English and Australasian ponies 14/2 to carry 9st. 71bs. C. B ponies 14\2 to carry 8st., Arab ponies 14\2 carry 6st. 91bs. W. I. Penalties—winners after 31st March, 1902, of a race value Rs. 200, 71bs. ; of a race value Rs. 900 or over 11lbs. (not cumulative). Winners of races value Rs. 200 or upwards amounting in the aggregate. Rs. 2,000 or over, since 31st March. 1903, 7lbs. in addition to other penalties. Entrance—1st November. Rs. 20, 1st December. Rs. 25, 1st January. when race will close, Rs. 40, 1,000 yards.

THE TRIAL PLATE.—Rs. 500 with a starting sweepstake of Rs. 20. second to receive Rs. 100, and the third pony Rs. 50 out of the entire stakes. For Arabs and c. b's 14/c and other ponies 13/3 and under. English and Australasian ponies 13/3 to carry 9st. 7lbs., Arabs and c. B. ponies 14/c to carry 8st. 12lbs. Entrance 1st November. Rs. 20, 1st December, Rs. 25, 1st January, when race will close, Rs. 40. Three-quarter mile.

THE CACHAR PURSE.—Rs. 500 with a starting sweepstake of Rs. 20. second to receive Rs. 100, and the third pony Rs. 50 out of the entire stakes. For Arabe and c. B. S. 13.0 and other ponies 12.3 and under. English and Australasian penies 12/3 to carry 9st. 7lbs. Arabs and C. B. ponies 13/0 to carry 8st. 12lbs. Entrance—1st November, Rs. 20, 1st December, Rs. 25, 1st January, when race will close, Rs. 40, 1,000 yards.

THE DWARF DERBY.—Rs. 300, out of which Rs. 75 will go to the second and Rs. 50 to the third pony. For C. B. ponies 12/2 and under. Ponies 12/2 to carry 9st. 7lb. s W. 1. Penalties—Winners of a race value Rs. 50 or over, 7lbs. No licence Jockeys allowed to ride. Entrance—Rs. 8. to close on 22nd December., One-half mile.

THE NARAYANGANJ PURSE.—Rs. 500, with starting sweepstake of Rs. 20, second pony to receive Rs. 100 out of the entire stakes. For Arabs 14/2 c. B. S 14/1, and other ponies 14/0 and under. English and Australasian

ponies 14/0 to carry 9st. 7lbs. ; C. B. ponies 14/1 to carry 9st. ; Arab ponies 14/2 to carry 8st. 7lbs. W. I. Penalties—Winners after 31st March, 1902, of a race value Rs. 200, 7lbs., of a race value Rs. 900 or over, 11lbs. (not cumulative). Winners of races value Rs. 200 or upwards amounting in the aggregate to Rs. 2,000 or over since 31st March, 1903. 7lbs. in addition to other penalties. Entrance—1st November, Rs. 25, 1st January, when race will close. Rs. 40,1,00 yeards.

THE ASSAM PURSE.—Rs. 500, with a starting sweepstake of Rs. 20. second to receive Rs. 100, and the third pony Rs. 50 out of the entire stakes. For Arabs and C. B. 13/2 and other ponies 13/1 and under. English and Australasian ponies 13/1 to carry 9st. 7lbs. ; Arab ponies 13/2 to carry 9st. 2lbs. ; C. B. ponies 13/2 to carry 8st. 21lbs. Entrance—1st Novembers, Rs., 20, 1st December, Rs. 25, 1st January, when race will close, Rs. 40. Seven furlongs.

SECOND DAY, THURSDAY, 12TH JANUARY, 1905

THE BARISAL PURSE.—Rs. 500, with a starting sweepstake of Rs. 20, second pony to receive Rs. 100, and the third pony Rs. 50 out of the entire stakes. A handicap for Arabs and C. B. S 14/0 and other ponies 13/3 and under. Entrance—1st November, Rs. 20, 1st December, R.., 25, 1st January, when race will close, Rs. 40,1.00 yards.

THE K. A. O PURSE.—Rs. 1,500 presented to the Fund by the heirs of the late Nawab Sir Ahsunollah Bahadur, K. C. I. E. of which Rs. 300 to the second and Rs. 200 to the third. For Arabs 14/2, C. B's 14/1, and other ponies 14/0 and under. English and Australasian ponies 14/0 to carry 9st. 7lbs. ; C. B. ponies 14/1 to carry 9st. ; Arab ponies 14/2 to carry 8st. 7lb. W. I. Penalties—Winners after 31st March, 1902, of a race value Rs 200, 7lbs ; of a race value Rs 900 or over, 11lbs (not cumulative). Winners of races value Rs 200 or upwards amounting in the aggregate to Rs 2,000 or over since 31st March, 1903, 7lbs. in addition to other penalties. Entrance—1st November, Rs. 50, 1st Decembers, Rs. 75, 1st January, when race will close Rs. 100 Seven furlongs.

THE SYLHET PURSE.—Rs 500, with a starting sweepstake of Rs. 20, second pony to receive Rs 100, and the third pony Rs. 50 out of the entire stakes. A handicap for Arabs and C. B's 13/0 and other ponies 12/3 and under. Entrance—1st November, Rs. 20, 1st December, Rs. 25, 1st January, when race will close, Rs. 40. Six furlongs.

THE SALIMOLLAH PURSE.—Rs. 1,000 presented to the fund by the Hon'ble Nawab Salimollah Bahadur, of which Rs 200 to the second and Rs. 100 to the third pony. For Arabs and C. B.'s 13/2, other ponies 13/1 and under. English and Anstralsaian ponies 13/1 to carry 9st. 7lbs. Arab ponies 13/2 to

carry 9st. 2lbs., C. B. ponies 13/2 to carry 8st. 2lbs. W. I. Penalties—Winners of a race value Rs. 200 or over 4lbs. Winner of the Assam Plate, the first day, 7lbs. in addition to other penalties. Entrance—1st November, Rs. 20, 1st December, Rs. 30, 1st January, when race will close, Rs., 50,1,000 yards.

THE STEWARDS' PURSE.—Rs. 2500 of which Rs. 50 to the second, Rs. 80 to the third, and Rs 20 to the fourth. For C. B's 12/1 and under Ponies 12/1 to carry 9st. 7lbs. W. I. Penalties—Winners of a race value Rs. 50 or over, 7lbs. No licensed jockeys allowed to ride, Entrance—Rs. 8 to close 22nd December, Seven furlongs.

THE ATTICKOLLAH PURSE.—Rs. 500. presented to the Fund by Khajeh Attickollah, of Dacca, to the winner, Rs 100 to the second handicap for ponies 14/2 and under Entrance—1st November, Rs. 20, 1st December, Rs 25, 1st January, when race will close, Rs. 40. with Rs. 20 extra for ponies not struck out by 7 p. m. on Tuesday, 10th January. Six furlongs. 200 from the Fund to the winner, its, 100 .... second, and Rs 50 to the third pony. A handicap for ponies 14/2 and under, entered the first and second days. Entrance—1st November, Rs 20, 1st December, Ifs. 25, 1st January, when race will close, Rs. 30, with Rs 20 extra for ponies not struck out by 7 p. m. on Thursday, 12th January. One and a quarter mile.

THE ... RITERION HANDICAP.—Rs. 250, of which Rs. 50 to the second, and Rs 25 to the third. A handicap for ... 12/1 and under Entrance—Rs 8 to close on 22nd December with Rs. to extra for ponies not struck out by 7 p. m on Thursday, 12th January. No licensed jockeys allowed to ride. Six furlongs.

THE DILKOSHA PALTE.—Rs. 500, with a starting swespatake of Rs. 20, second to receive Rs. 100, and the third pony Rs. 50 our of the entire stakes. A handicap for Arabs 14/2 CBs 14/1, other ponies 14/0 and under, entered the first and second days. Entrance—1st November, Rs. 20, 1st December, Rs. 25, 1st January, when race will close, Rs. 30, with Rs. 20 Extra for ponies not struck our by 7 p. m. on Thursday, 12th January. One and a quarter mile.

THE MERCHANTS PURSE.—Rs. 500, with a starting sweepstake of Rs., 20, second to receive Rs. 100 and the third pony Rs. 50 out of the entire stakes. A handicap for Arabs and C-B's 4/0 and other ponies 13/3 and under, entered the first and second days. Entrance—1st November, Rs. 20, 1st December, Rs. 25, 1st January, when race will close, Rs. 30, with Rs. 20 Extra for ponies not struck our by 7 p. m. on Thursday, 12th January. One and a quarter mile.

THE JANUARY PLATE.—Rs. 500, with a starting sweepstake of Rs. 20, second to receive Rs. 100 and the third Rs. 50, out of the entire stakes. A handicap for Arabs and C-B's 13/0 and other ponies 12/3 and under, entered the first and second days. Entrance—1st November, Rs. 20, 1st December, Rs. 25, 1st January when race will close, Rs. 30, with Rs. 20 extra for ponies not struck out by 7 p. m. on Thursday, 12th January, one mile.

THE JOYDEBPUR CUP. Value. Rs. 1,000 presented to the Fund by Kumar Ranendra Narayan Roy, of Joydebpur, to the winner, Rs. 100 to the second, and Rs. 50 to the third. A handicap for Arabs and C-n's 13/2 and other ponies 13/1 and under, entered the first and second days. Entrance—1st November, Rs. 25, 1st December, Rs. 30, 1st January, when race will close, Rs. 40, with Rs. 20 extra for ponies not struck out by 7 p. m. on Thursday, 12th January, one mile.

GENERAL CONDITIONS

1. In the event of there being less than six entries for any race, such race may be declared void.

In the event of a walk-over only half the added money will be given under Rule 140.

No third money will be given if there are less than five starters.

2. All riders to ride in colours, starting declarations (which must include rider's colours and weights to be carried) to be made to the Honorary Secretary at 10 a. m. the day before the race. Jockey's fee for losing mount, if not already paid, must accompany starting declarations.

3. In all races, other than selling races and handicaps, a landing allowance of 6lbs, will be given to every English and Australasian horse and pony landed in India direct from the country of foaling on or after the 1st July, 1904, the allowance one race and to cease on his winning two races.

4. Owners are entirely responsible for the weight their own horses or ponies should carry and any mistake in the programme shall be notified by owners or trainers in charge to the Clerk of the Scales, who will notify such alteration on the Stewards' Notice Board.

5. A course fee of Rs. 5 will be charged for each horse or pony entered for the Dacca Meeting and trained or schooled on the Dacca Course between 1st November, 1904 and 20th January, 1905 and a course fee for Rs. 10 for every horse or pony between those dates and not so entered.

6. When a race is advertised to close on a particular day, it shall, unless otherwise specified, close at 7 p. m. on that day.

7. Entries must be accompanied by a remittance for the full amount of such entries, otherwise, they will be declined.

8. When a remittance is made to the Secretary without specifying the way in which it is to be applied, the money will be credited to the *stakes* in the order of the programme.

NOTICE

Admission to grand stand enclosure, Rs. 5 a day, Ladies, Rs. 2, subscribers of Rs. 16 to the Fund, free. Losers must settle their account on or before the 9th January.

A POLO TOURNAMENT

Will be held during the meeting, the terms of which will be published hereafter. Dacca News 3. 12./ 1904

DACCA POLO TOURNAMENT
TO BE HELD DURING THE DACCA RACE MEET
JANUARY 9TH TO 14TH, 1905

SILVER CUPS presented by the Hon'ble Nawab Salimollah Bahadur, Messrs. J. T Rankin and C. H. Holder will be presented to a the members of the winning team.

Under the I. P. A. Rules of Polo, with the following conditions.

CONDITIONS

1. Open to any team.
2. 36 minutes actual play, divided into periods of 6 minutes, with an interval of 2 minutes between each period and of one minute after each goal.
3. No entrance fee. Teams are requested to send in their entries as early as possible, so that the necessary arrangements may be made by the Honorary Secretary for stabling, etc. but entries will be accepted up to the 1st January.
4. The right is reserved to the Race Stewards of modifying or altering the conditions.

DACCA RACE OFFICE. C. H. HOLDER
12the October. 1904 Honorary Secretary.
Dacca Races

বাণিজ্য দেশভাগের আগে ও পরে : *[বর্তমান সংস্করণের ৬২২-২৯ পৃঃ দেখুন]*

ডঃ আবদুল করিম মোঘল আমলে ঢাকার বাণিজ্য প্রসার লিখেছেন : "নদীপথে চারিদিকের সকল অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত একটি কেন্দ্র হিসাবে ঢাকার অবস্থান সমগ্র দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক। এই শহরের প্রসার এবং এর ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি শহরে জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন দ্রব্য সরবরাহ এবং বাণিজ্যিক এলাকা ও হাটবাজারের উন্নয়ন অপরিহার্য করে তোলে। যেকোন শহরের প্রসারের কারণে শহরে কারিগর, পণ্য প্রস্তুতকারক, শিল্পী ও বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণীর বসতি স্থাপন জরুরি হয়ে পড়ে যাতে তারা এখানে অবস্থা করে কাঁচামাল ক্রয় এবং তৈরি মালামাল বিক্রয় করতে পারে। ঢাকা মোগল প্রদেশ বাংলার রাজধানী এবং সামরিক ও বেসামরিক সদর দফতরে পরিণত হয়। বণিক ব্যবসায়ীগণ সরকার থেকে পরোয়ানা ও লাইসেন্স গ্রহণ করার জন্য এবং কর সুবিধা ও অন্যান্য বাণিজ্যিক সুযোগ লাভ করার জন্য অথবা শুল্ক বিভাগের কর্মকর্তাদের শোষণ এবং অন্যান্য অবিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করার জন্য এখানে আগমন করত। কিন্তু বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে ঢাকার বিকাশের পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে মোগল সরকার কর্তৃক ঢাকায় শহিবন্দর প্রতিষ্ঠা। এই বন্দর থেকে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে শুল্ক আদায় করে এবং ব্যবসায়ীদের জন্য 'পরোয়ানা' (পাশ বা পারমিট) ইস্যু করে সকল ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা হত। এই বন্দরের মাধ্যমে সকল ব্যবসায়ী বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় জেলা সমূহের সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালনা করত। (মোগর রাজধানী ঢাকা। পৃঃ ৫৫)

সর্বভারতীয় বাণিজ্য ক্ষেত্রে ঢাকার এই ভূমিকা বদলে যায় ইংরেজ আমলে। কোম্পানি শাসনের প্রথম যুগে ঢাকা থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় মুর্শিদাবাদ। তারপর কলকাতায়। কলকাতা পূর্ব এশিয়ায় ইংরেজ স্বার্থরক্ষার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। রাজধানী শহর কলকাতা ছিল অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র। আর এই বাণিজ্য কেন্দ্রের অন্যতম সরবরাহকারী হয়ে ওঠে তৎকালীন ঢাকা। সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য হয়ে পড়ে কলকাতা ভিত্তিক। স্থল ও নদীপথে পণ্য সরবরাহের জন্য কলকাতার সঙ্গে কেবলমাত্র ঢাকা নয়, পূর্ববাংলার প্রায় সমস্ত ব্যবসা কেন্দ্রগুলির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ গড়ে ওঠে। পূর্ব বাংলার ব্যবসাবাণিজ্য নদীভিত্তিক হওয়ায়, প্রায় সব কেন্দ্রগুলিই ছিল নদীতীরে। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ ছাড়া অন্যান্য ব্যবসা কেন্দ্রগুলির কোন সুবিন্যস্ত রূপ ছিল না। কোন ঐশ্বর্যের ছাপ ছিল না তার গায়ে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা হত সেখান থেকে।

বলা যেতে পারে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ কেবলমাত্র ব্যবসাবাণিজ্যই নয়, পূর্ব বাংলার সার্বিক জীবনধারার সনাতন স্বরূপকে আমূল বদলে দিয়ে যায়। ইংরেজ আমলের দ্বিতীয় নগরী পরিণত হল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে। প্রশাসনিক গুরুত্ব বেড়ে গেলেও প্রথম পর্বে কলকাতার সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন বন্ধ হয়ে গেল। জলপথে স্টিমার ও মহাজনী নৌকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গেল একেবারে হারিয়ে। প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক কারণে খুব দ্রুত আভ্যন্তরীণ সংযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। মেঘনা, ভৈরব নদীর ওপর ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত সেতুপথটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও, এটি ছিল দীর্ঘ পথ। যা সময়কে সংক্ষেপ করার অপেক্ষা দীর্ঘায়ত করত। সড়ক পথের ছবিটা দ্রুত বদলাতে থাকে। ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ মাত্র দু ঘণ্টায় পৌছান যায়, অথবা চট্টগ্রাম যে ঢাকার এত কাছাকাছি এসে যাবে তা কারো কল্পনায়ই ছিল না। নদীরেখার ওপর অজস্র সেতু নির্মিত হওয়ায়, সড়কপথে যোগাযোগকে সহজসাধ্য করে তোলা হয়েছে।

দেশভাগের পর ঢাকার সম্ভবপর শিল্পবিকাশ ত্বরান্বিত না হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল, পাকিস্তান সরকারের নীতি। ইংরেজ আমলের মতই পাকিস্তানী শাসকরা পূর্ববাংলাকে তাদের শোষণ কেন্দ্র হিসাবেই দেখত। এর মধ্যে কিছু কিছু শিল্প বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য ব্যবসা ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে চট্টগ্রামের গুরুত্ব ঢাকা থেকে অনেক বেশি। ইদানিং গুরুত্ব বেড়েছে খুলনারও। ১৯৪৭ সালের আগে নারায়ণগঞ্জ ছিল ছোট পরিচ্ছন্ন শহর এবং পাটশিল্পের অন্যতম কেন্দ্র। দেশভাগের পর গড়ে ওঠে আদমজী জুট মিল, অন্যান্য জুট মিল। ঢাকেশ্বরী-চিত্তরঞ্জন-লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিল—তিনটি বস্ত্রকল ছিল আগে থেকেই। বর্তমানে বাংলাদেশের হোসিয়ারি শিল্পকেন্দ্র হল নারায়ণগঞ্জ। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সড়ক বরাবর যেসব কলকারখানা গড়ে উঠেছে তার অন্যতম হল টেনারি শিল্প। গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অফ লেদার টেকনোলজি এখানেই অবস্থিত। পটারি শিল্প, গ্লাস ফ্যাক্টরি এসব সাম্প্রতিককালের বিকাশ। তেজগাঁও পরিণত হয়েছে শিল্পনগরীতে।

"ঢাকা পশুর চামড়া ব্যবসারও একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র বলে পরিচিত। একজন চামড়া ব্যবসায়ীর পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে ৪২ লক্ষ রুপির চামড়া ঢাকা জেলা থেকে বিদেশে রপ্তানি হয়। তারা প্রথমত এই চামড়া কলকাতায় পাঠায় এবং সেখান থেকে বিদেশে পাঠান হয়। গরুর চামড়া সাধারণত উপমহাদেশে, ষাঁড়ের চামড়া তুরস্কে, এবং ছাগলের চামড়া আমেরিকায় পাঠান হত। একটি টেনারি ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল। স্বাধীনতা পর্যন্ত এই শিল্পে বড় ধরনের কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। কলকাতা টেনারি কলেজের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কয়েকজন ছাত্র টেনারি স্থাপনের প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু কেউ সার্থকতা লাভ করতে পারেনি। দেশ বিভাগের পর টেনারি শিল্প যেন নতুন লক্ষ্য খুঁজে পেল এবং ঢাকা শহরের হাজারিবাগে কিছু সংখ্যক টেনারি গড়ে ওঠে। বর্তমানে ঢাকার ৮৭টি টেনারি আছে।" (ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯৩। পৃঃ ৪৪৭)

জেলা গেজেটিয়ারে সম্প্রতিকালে গড়ে ওঠে বেশ কয়েকটি শিল্প ও বাণিজ্য এলাকার উল্লেখ আছে। মতিঝিল দিলকুশ এলাকা থেকে রাজাবাগ, শান্তিনগর, মালিবাগ ও কমলাপুর পর্যন্ত বাণিজ্যিক এলাকা হিসাবে বিকাশ লাভ করেছে। এর মধ্যে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় গড়ে উঠেছে আশরাফ কটন মিল, মুন্নু গ্রুপ অফ টেক্সটাইলস, মেঘনা কটন মিল, অলিম্পিক কটন মিল এবং আরো কিছু কটন মিল। নবগঠিত ডেমরা শিল্প এলাকা হল ধামগড় ও গোদনাইলের বিপরীত দিকে। কালীগঞ্জে এখনও যে উন্নতমানের শাড়ি তৈরি হয় তার আন্তর্জাতিক বাজার ব্যাপকরূপ পেয়েছে। কুটির শিল্প শিল্প হিসাবে ঢাকার তাঁত শিল্পের যে ঐতিহ্য, যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তার চালচিত্র আজও অম্লান। যদিও অতীতের মত ঔজ্জ্বল্য ততটা প্রকট নয়। ইমামগঞ্জে প্লাস্টিক ও রবার দ্রব্যাদির কারখানার বিকাশও পরবর্তীকালের। টঙ্গিতে আছে সিগারেট কারখানা। এদের শাখা আছে তেজগাঁও-এ। বাংলাদেশের সবথেকে বড় জুতা কোম্পানি হল বাটা সু কোম্পানি। শহরে পরিবহন উপযোগী তেল সরবরাহ করে বার্মা অয়েল, ক্যালটেক্স ও ইন্দো-বার্মা পেট্রোলিয়াম।

আধুনিক দৈনন্দিন প্রয়োজন উপযোগী দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক পরিমাণেই স্বনির্ভর। ছোটখাট কয়েকটি উৎপাদনের অন্যতম হল : মোটর গাড়ি ও সাইকেলের টায়ার টিউব, সূতিবস্ত্র, কার্পেট, মশলাপাতি, জুতো, প্রসাধন সামগ্রী, হিমায়িত মাছ, টিনে সংরক্ষিত তরিতরকারি, গ্যাস, ম্যানথেল, ধাতবপাত্র, চায়ের পেয়ালা, কাঠের ও বেতের আসবাবপত্র, গরুর শিং, কাপড়, বিছানা, কীটনাশক ওষুধ, দেয়াশলাই, কাচের শিট, কাচের চুড়ি, খাদ্য থলি, ওষুধপত্র, প্লাস্টিকের বিবিধ দ্রব্য, গায়ে মাখার সাবান, সেফটিপিন, গুড়, পেয়ালা, চশমার ফ্রেম, ছাতা, মাদুর, শিতলপাটি, মোমবাতি—এরকম আরো বহু দ্রব্যের উল্লেখ করা যেতে পারে, যা বাংলাদেশকে এখন আর আমদানি করতে হয় না।

আমরা মাত্র আড়াইশ বছর পিছিয়ে গেলে অন্য একটা ছবিকে উপলব্ধি করি। তখন কুটির শিল্প নির্ভর বাংলার অর্থনীতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ছিল ঢাকা। নদীপথে সংযুক্ত ছিল বিভিন্ন জনবসতির সঙ্গে। সেখান থেকে দ্রব্যাদি এসে পৌঁছাত ঢাকায় আমদানি ও রপ্তানির লক্ষ্যে। প্রায় সব জেলা থেকে জিনিসপত্র আসত। চট্টগ্রাম, বাকরগঞ্জ, সিলেট ও ময়মনসিংহ থেকে আসত কাঠ ; বৃহৎ চাউল সরবরাহকারী ছিল বাকরগঞ্জ ; ফরিদপুর, নোয়াখালি, বাকরগঞ্জ ও যশোহর থেকে আসত গুড়, ত্রিপুরা ও নোয়াখালির কার্পাস, রংপুর থেকে তামাক—এরকম অজস্র দ্রব্যাদি আসত ঢাকার বাজারে। ঢাকার বাজারে এসব ছাড়া যেসব জিনিস মিলত তার অন্যতম কয়েকটি হল নানাবিধ সূতিবস্ত্র, সোনা রূপার অলঙ্কার, কাঠের আসবাবপত্র, হাতির দাঁত, চটের থলি, পানসুপারি, চাউল, তুলা, সুতো, খেসারি, মুগ, মুসুর, কলাই, মটর, বুট, সরিষা, আদা, মরিচ, ঘি, লবণ, পিঁয়াজ, নৌকা, মাদুর, কাগজ, কালি, লোহা ও তামার জিনিসপত্র, মধু, পাথর, মাছ, তরিতরকারি, শাকসবজি তো ছিল। সূতিবস্ত্রের মধ্যে দেশে ও বিদেশে বড় বাজার ছিল মসলিনের। যতীন্দ্রমোহন রায় ও কেদার নাথ মজুমদারের আলোচনায় তার বিস্তৃত তথ্য আছে। ডঃ আবদুল করিমের গ্রন্থ থেকে এখানে দুটি পরিসংখ্যান সংযোজিত হল। যার থেকে বস্ত্র ব্যবসার পরিমাণ উপলব্ধি করা যাবে।

ইংরেজ কোম্পানির রপ্তানি দ্রব্যের অর্থ পরিমাণ	কোম্পানির কর্মচারির রপ্তানিকৃত অর্থের পরিমাণ
১৭৩৬-৩৭ টাকা ২,২২,৩৬৬-৩-৩	টাকা ৫৯,০০৯-১০-৬
১৭৩৭-৩৮ টাকা ৩,৪৮,৯৬২-১৫-৬	টাকা ২,১২,৪৩৭-৫৯
১৭৪৩-৪৪ টাকা ৫,৬৭,৭৯১-৩-০	টাকা ২,০৬,৮২২-৭-৯
১৭৪৪-৪৫ টাকা ৫,৬৬,৬২৭-১৪-০	টাকা ১,৩৩,০৬৮-৬-৯

১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার সূতিবস্ত্র উৎপাদন ক্ষমতা। ২৮ লক্ষ টাকা (জন টেলরের মতে)। যেমন ঃ

ঢাকা	টাকা ৪,৫০,০০০.০০
সোনারগাঁও	টাকা ৩,৫০,০০০.০০
নারায়ণপুর	টাকা ২,০০,০০০.০০
জংগলবাড়ি, বাজিতপুর	টাকা ৪,৫০,০০০.০০
চাদপুর	টাকা ৫০,০০০.০০
শ্রীরামপুর	টাকা ৫০,০০০.০০
ধামরাই	টাকা ২,৫০,০০০.০০
তিতিবাদ্দি	টাকা ১,৫০,০০০.০০
সাধারণ কাপড় (স্থানীয় ব্যবহারের জন্য)	টাকা ৪,৫০,০০০.০০
	মোট ২৬.০০,০০০.০০

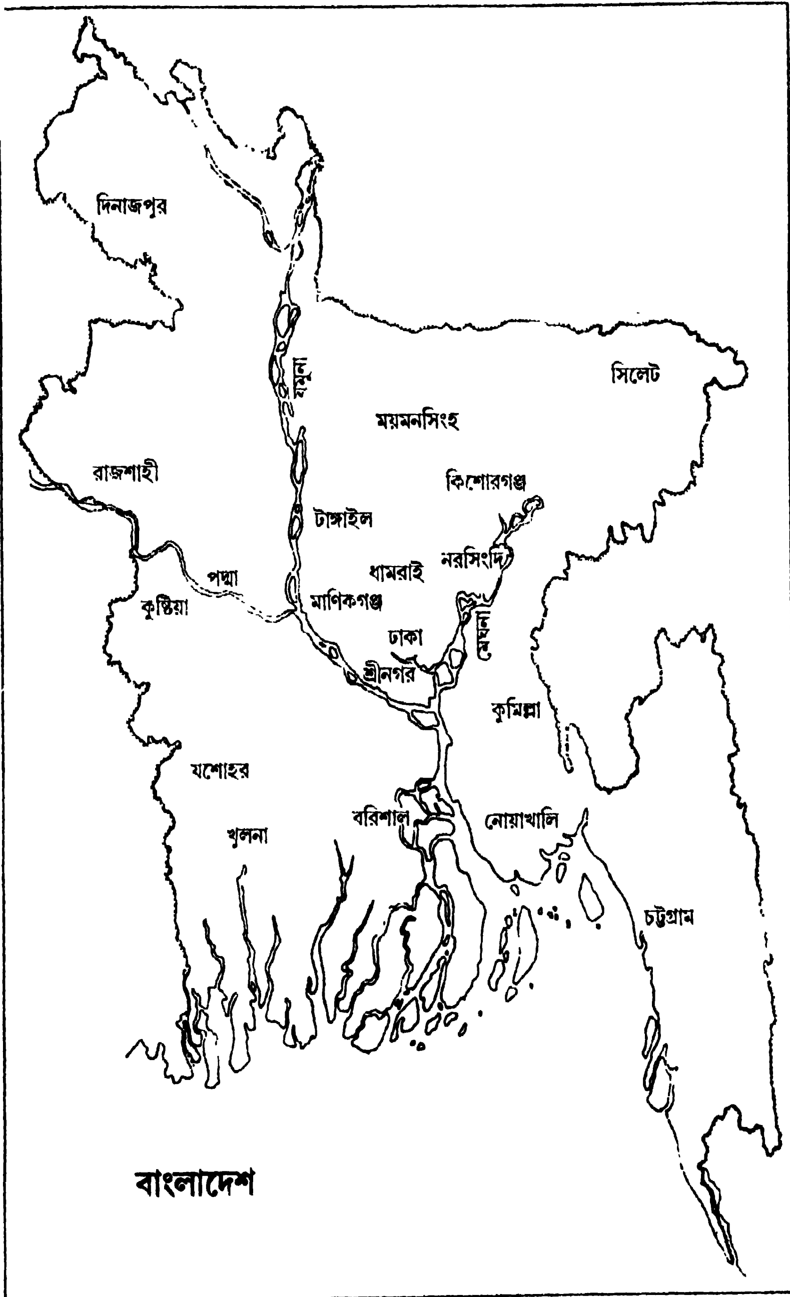
(মোগল রাজধানী ঢাকা-ডঃ আবদুল করিম। পৃঃ ৬৭-৬৮)

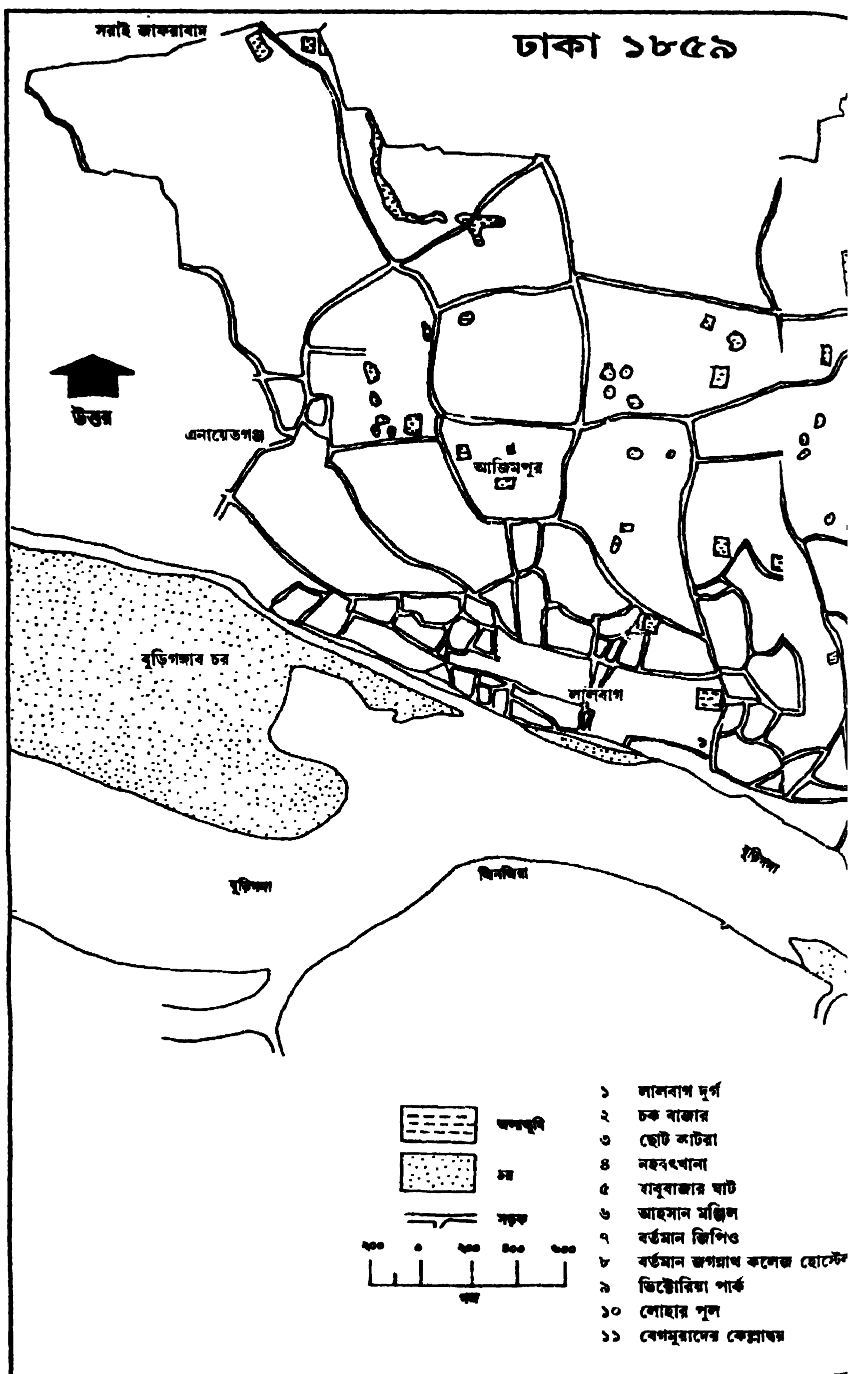
নির্ঘণ্ট

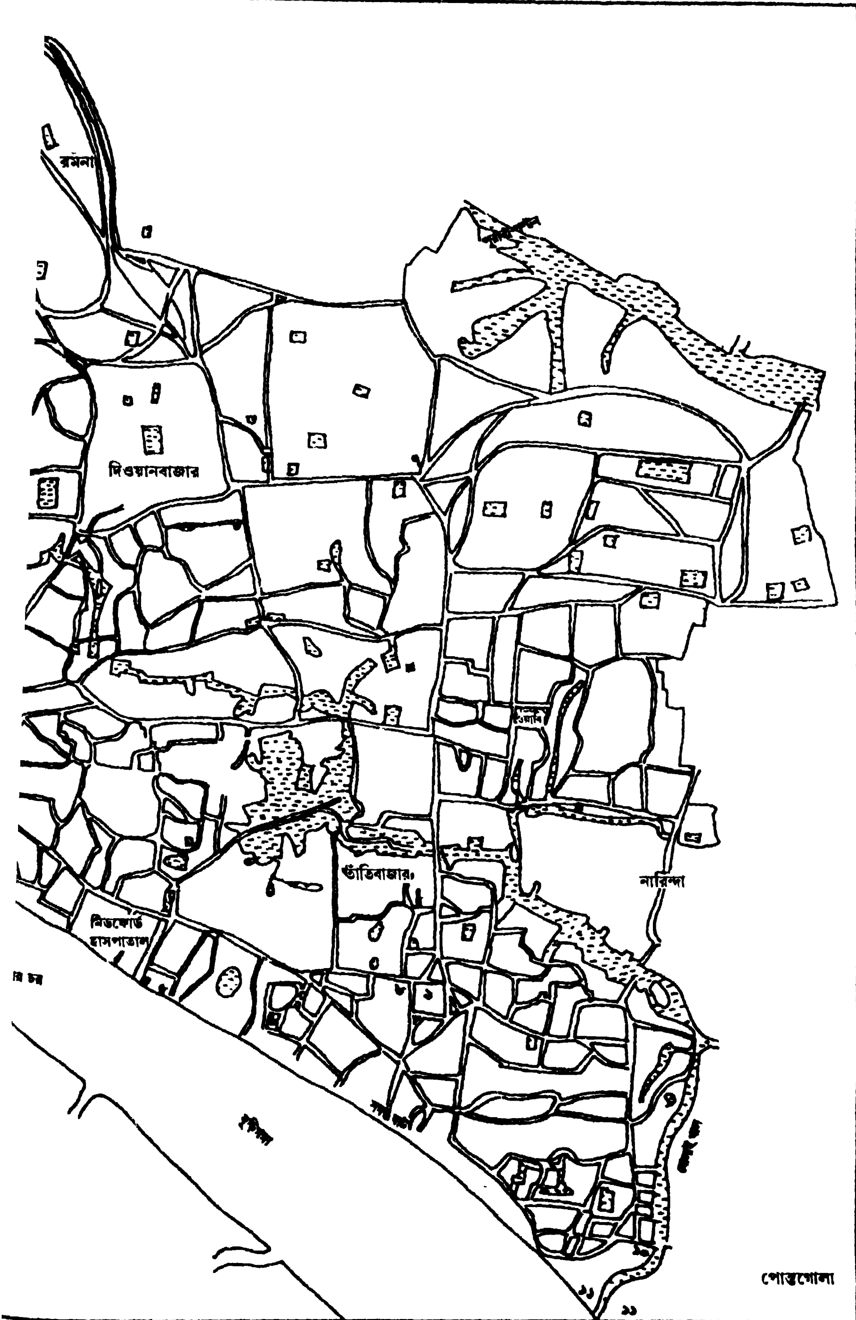
ব্যবহৃত গ্রন্থ

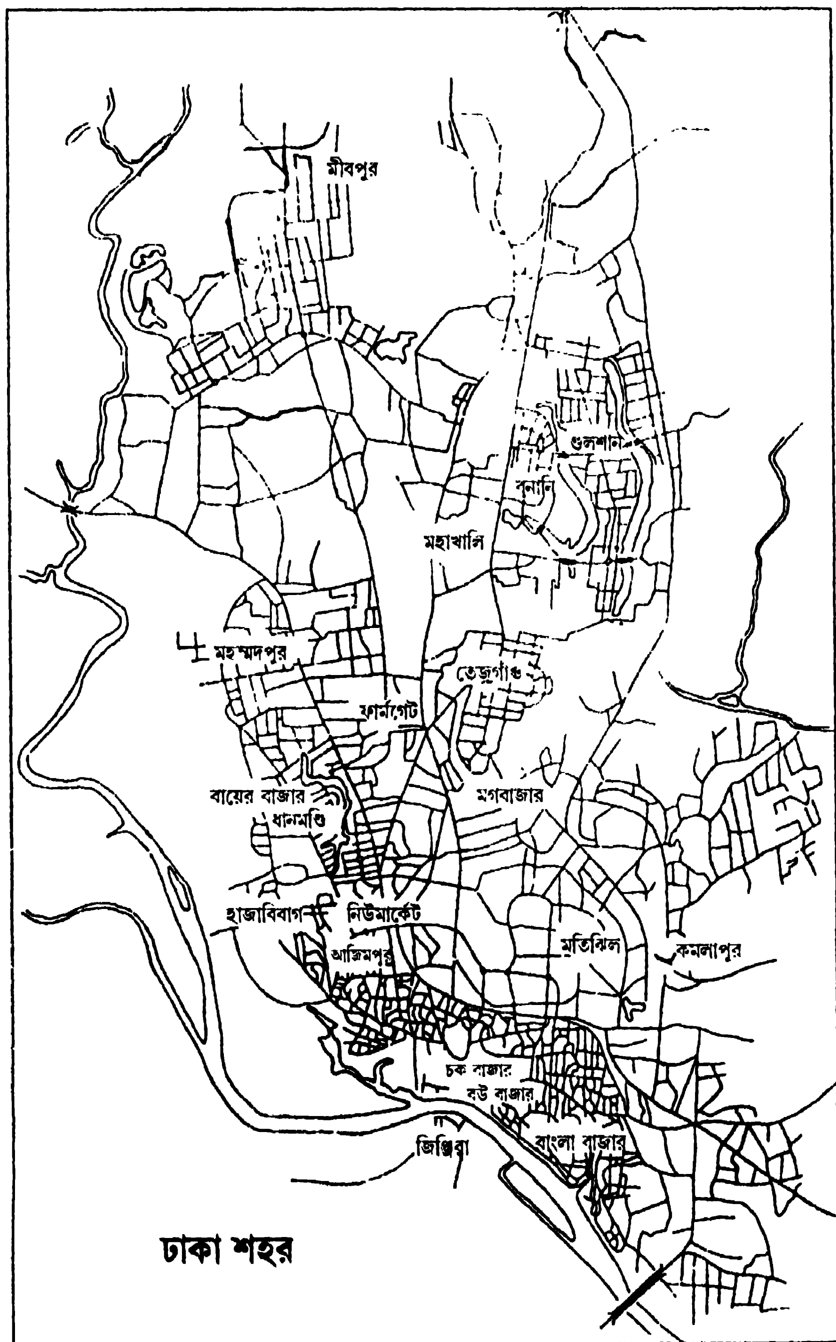
১. ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯৩। ঢাকা
২. ঢাকা ঃ ইতিহাস ও নগর জীবন—শরীফউদ্দিন আহমেদ। ঢাকা ২০০১
৩. ঢাকা ঃ পঞ্চাশ বছর আগে—হাকিম হাবিবুর রহমান। ঢাকা ১৯৯৫
৪. মোঘল রাজধানী ঢাকা—ডাঃ আবদুল করিম। ঢাকা ১৯৯৪
৫. প্রাচ্যের রহস্য নগরী—এফ বি ব্রাডলে বার্ট। ঢাকা ১৯৭৭
৬. কোম্পানি আমলে ঢাকা—জেমস টেলর। ঢাকা ১৯৭৮
৭. ঢাকার কথা—হরিদাস বসু। ঢাকা ১৯২৪
৮. ঢাকার কথা—নির্মল গুপ্ত। কলকাতা ১৯৪০
৯. চল্লিশ দশকের ঢাকা—কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত—সরদার ফজলুল করিম। ঢাকা ১৯৯৪
১০. পুরানো ঢাকার সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ—অনুপম হায়াৎ। ঢাকা ২০০১
১১. জিন্দাবাহার—পরিতোষ সেন। ১৯৯৬
১২. জীবনের স্মৃতিদীপে—রমেশচন্দ্র মজুমদার। কলকাতা
১৩. আট দশক—ভবতোষ দত্ত। কলকাতা ১৯৮৮
১৪. আমার ছেলেবেলা—বুদ্ধদেব বসু। কলকাতা ১৯৭৩
১৫. আমার যৌবন—বুদ্ধদেব বসু। কলকাতা ১৯৭৬
১৬. ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। কলকাতা
১৭. বাংলায় ভ্রমণ (২ খণ্ড)—ভারতীয় রেল। কলকাতা
১৮. বাংলায় ভ্রমণ (অখণ্ড)—শৈব্যা প্রকাশন। কলকাতা
১৯. বৃহৎ বঙ্গ। দীনেশচন্দ্র সেন কলকাতা দে'জ সংস্করণ।
২০. সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস—স্বরূপচন্দ্র রায়। দে'জ সংস্করণ। কলকাতা।
২১. বাঙ্গালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায়। দে'জ সংস্করণ। কলকাতা
২২. ঢাকা ঃ স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী—মুনতাসীর মামুন। ঢাকা ১৯৯৩
২৩. ঢাকার প্রথম—মুনতাসীর মামুন। ঢাকা ১৯৯৫
২৪. উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র (৯ খণ্ড)-মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত। ঢাকা।
২৫. জীবনস্মৃতি—সুদক্ষিণা সেন। কলকাতা।
২৬. আজও তারা পিছু ডাকে—শোভা ঘোষ। কলকাতা।
২৭. অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস—অমিতাভ চন্দ্র। কলকাতা ১৯৯২
২৮. Statistacal Account of Bengal, Vol V. W. W. Hunter
২৯. The Dutch East India Company and the Economy of Bengal 1630-1720 —Om Prakash O. U. P. 1988

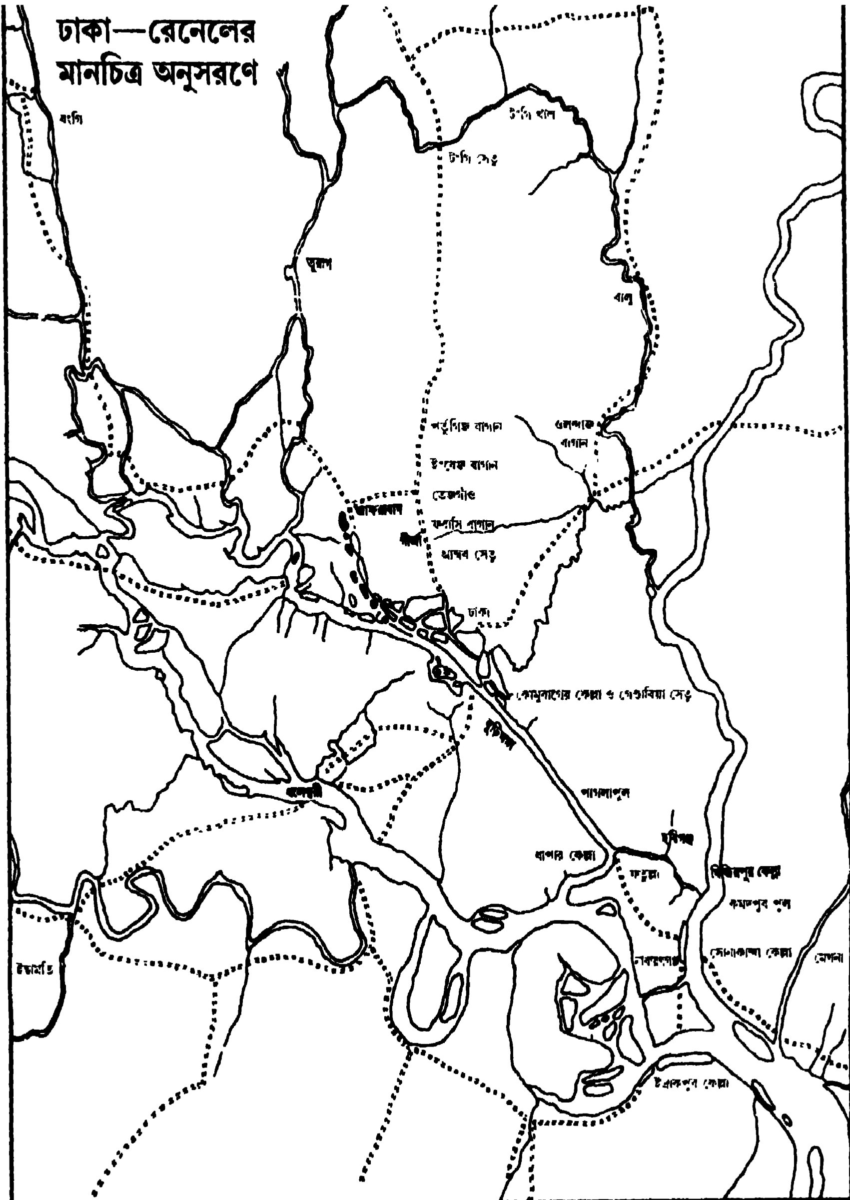
৩০. প্রাক-পলাশী বাংলা—সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়। কলকাতা ১৯৮২
৩১. বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী)—সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়। কলকাতা ১৯৮৫
৩২. সেকালের গৃহবধূর ডায়েরি—মনোদা দেবী। কলকাতা ১৯৯৬
৩৩. আমার জীবন কাহিনী—পুলিনবিহারী দাস। কলকাতা ১৯৮৭
৩৪. সেকালের কথা : শতক সূচনায় মেয়েদের স্মৃতিকথা—অভিজিৎ সেন ও অভিজিৎ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। কলকাতা।
৩৫. উত্তাল চল্লিশ : অসমাপ্ত বিপ্লব—অমলেন্দু সেনগুপ্ত। কলকাতা।
৩৬. ঢাকার কথা—রফিকুল ইসলাম। ঢাকা ১৯৮২
৩৭. উনিশ শতকের ঢাকার সমাজ জীবন—নূর আহমদ। ঢাকা ১৯৭৫
৩৮. গৌড়ের ইতিহাস—রজনীকান্ত চক্রবর্তী। দে'জ সংস্করণ। কলকাতা।
৩৯. বিক্রমপুরের ইতিহাস—অম্বিকাচরণ ঘোষ। দে'জ সংস্করণ। কলকাতা।
৪০. কিংবদন্তীর ঢাকা—নাজির হোসেন। ঢাকা।
৪১. বাংলার লোকসাহিত্য—আশুতোষ ভট্টাচার্য। ৩ খণ্ড। কলকাতা।
৪২. লোকসঙ্গীত রত্নাকর—আশুতোষ ভট্টাচার্য। ৩ খণ্ড। কলকাতা।

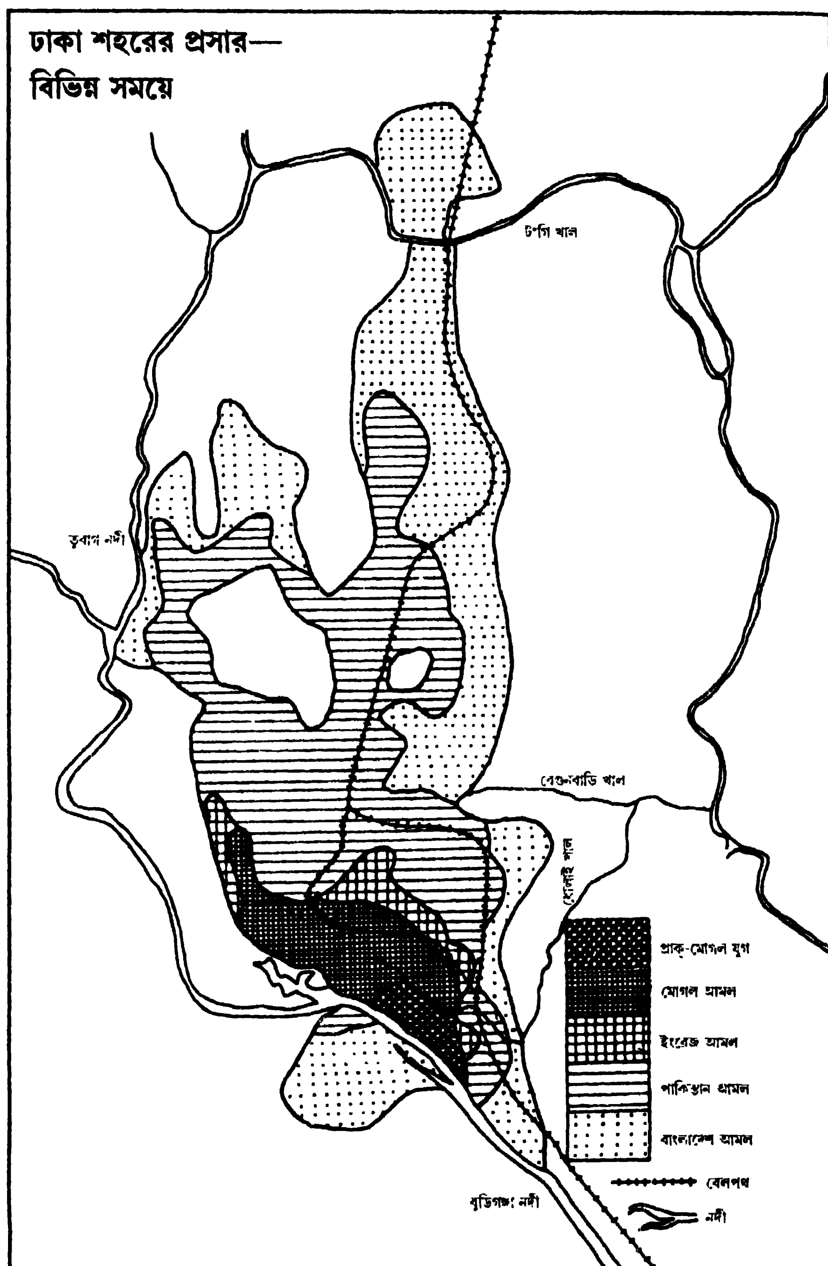

দিনাজপুর
সিলেট
ময়মনসিংহ
রাজশাহী
কিশোরগঞ্জ
টাঙ্গাইল
ধামরাই
নরসিংদী
পদ্মা
কুষ্টিয়া
মাণিকগঞ্জ
ঢাকা
শ্রীনগর
কুমিল্লা
যশোহর
বরিশাল
নোয়াখালি
খুলনা
চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ


ঢাকা ১৮৫৯
সরাই জাফরাবাদ
উত্তর
এনায়েতগঞ্জ
আজিমপুর
বুড়িগঙ্গার চর
লালবাগ
বুড়িগঙ্গা
জিনজিরা
জলাভূমি
চর
সড়ক
গজ
১ লালবাগ দুর্গ
২ চক বাজার
৩ ছোট কাটরা
৪ নহবৎখানা
৫ বাবুবাজার ঘাট
৬ আহসান মঞ্জিল
৭ বর্তমান জিপিও
৮ বর্তমান জগন্নাথ কলেজ হোস্টেল
৯ ভিক্টোরিয়া পার্ক
১০ লোহার পুল
১১ বেগমুরাদের কেল্লাছয়


রমনা
দিওয়ানবাজার
তাঁতিবাজার
নারিন্দা
মিডফোর্ট
হাসপাতাল
পোস্তগোলা


মীরপুর
গুলশান
বনানি
মহাখালি
মহম্মদপুর
তেজগাঁও
ফার্মগেট
বায়ের বাজার
মগবাজার
ধানমণ্ডি
হাজারিবাগ
নিউমার্কেট
মতিঝিল
কমলাপুর
আজিমপুর
চক বাজার
বউ বাজার
জিঞ্জিরা
বাংলা বাজার
ঢাকা শহর


ঢাকা—রেনেলের মানচিত্র অনুসরণে
বংগি
তুরাগ
টংগি খাল
টংগি সেতু
বালু
পর্তুগিজ বাগান
ওলন্দাজ বাগান
ইংরেজ বাগান
তেজগাঁও
ফরাসি বাগান
ঢাকা
পাগলাপুল
ধাপার কেল্লা
ফতুল্লা
খিজিরপুর কেল্লা
নারায়ণগঞ্জ
সোনাকান্দা কেল্লা
ইদ্রাকপুর কেল্লা



সৌজন্যে ঃ ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী—মুনতাসীর মামুন

ঢাকা দেশবাসীর প্রতি নিবেদন।

ঢাকাতে জন্মাষ্টমী মিছিল উপলক্ষে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে গোলমাল হইয়াছিল সৌভাগ্যক্রমে তাহা থামিয়া গিয়াছে। ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে হিন্দু ও মুসলমানগণ নিম্ন স্বাক্ষরকারী ছয় জন হিন্দু ও ছয় জন মুসলমানকে প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া এক কমিটি গঠন করিয়াছেন এবং ঢাকার নবাব বাহাদুরকে উক্ত কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কমিটি ঢাকার প্রত্যেক হিন্দু ও মুসলমানের পাড়ার যাইয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া তাহাদের গোলমাল মিটাইয়া দিয়াছেন। এখন ঢাকাতে কোন গোলমাল কি অশান্তি নাই। ঢাকা জিলার মফঃস্বলবাসিগণ স্বার্থপর লোকের প্রচারিত মিথ্যা গুজব শুনিয়া উত্তেজিত না হন, ইহাই আমাদের বিনীত নিবেদন। যদি কোন প্রকার গুজব মফঃস্বলে প্রচারিত হয়, তাহা হইলে আপনারা নিম্ন স্বাক্ষরকারিগণের মধ্যে যে কেহকে তার কি চিঠিদ্বারা ঐ বিষয় জানাইবেন। গুজবের উপর নির্ভর করিয়া কোন কাজ করিবেন না। ঢাকা, ১৩৩৩ সন, ২৯শা ভাদ্র।

নবাব খাজে হবিবুল্লা, ঢাকা।

খাজে নাজিমুদ্দিন।	মিঃ পি, কে, বসু।
ছৈয়দ আবদুল হাফেজ।	শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
খাজে ছোলেমান কাদের।	শ্রীসূর্য্যকান্ত বানার্জ্জি।
হেকিম হবিবর রহমান।	শ্রীশ্রীশচন্দ্র চাটার্জ্জি।
আবদুল কাহার (দুদু মিঞা)	শ্রীমনোরঞ্জন বানার্জ্জি।
আবদুল মন্নান।	শ্রীপঙ্কজকুমার ঘোষ।

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা রোধে বিশিষ্ট ঢাকাবাসীদের আবেদন।

THE BENGAL TIMES.

SATURDAY, JANUARY 22, 1876.

ACKNOWLEDGMENT.

Report on the Police Administration of the Province of Assam. 1874. Shillong: 1875.

OUR "ZOO." From the published accounts, we see that the donations towards the Calcutta Zoological Gardens amount to Rs. 170,000. Couldn't Dacca have its Zoo? We are sure we have specimens enough of all sorts of animals, both wild and domesticated.

NAGA ATTACK. Another account of the attack upon Captain Butler's party in the Naga Hills, is thus given by a contemporary:—

"Captain Butler and the party, it will be remembered, were to leave Golaghat on the 17th December. They then went forward to Wokha, five and thirty miles off, which was to be the advanced base of operations. Here they found the people very friendly; though, about a twelvemonth ago, these same people had made themselves exceedingly troublesome. Last year Captain Butler reached Wokha on the 3rd January, and his reception was 'anything but cordial; for instead of coming to meet us, and helping to build our huts for us, talking and laughing the while with all around, as Nagas generally do when their intentions are friendly, they assumed a very sulky manner towards us.' Then a coolie was murdered, and men from seven villages.

বেঙ্গল টাইমসের প্রথম পাতা।

ঢাকাপ্রকাশ

ঢাকা প্রকাশের প্রথম পাতা

THE DACCA NEWS.

No. 3. SATURDAY 10th MAY. 1856. PRICE 2 ANNAS.

STEAM TO DACCA AND ASSAM.—The one point on which the residents in the districts lying to the east and north east of the Ganges, whether Civil or Military, Europeans or Natives, Missionaries or Planters, are agreed; is the absolute necessity of railway communication with Calcutta. Despairing however of, for several years at least, obtaining this, they agree that the next best thing is regular and frequent steamers on the Berhampooter and Megna. The inhabitants of Dacca have petitioned Government to put steamers on this line;—the Commissioner of Dacca has constantly written that the only boon he requires for the districts under his care is steamers;—the Assam Tea Company has petitioned for steamers;—and at last we seem to have got steamers. We say *seem* because there is a rumour that those now running are to be taken off the line in September, when they will be required by Government, for the purpose of moving troops.

A few steamers put on a line for a short time; officered by men whose interest it is to show that the line does not pay, in order that they may be removed to one where they make a profit from the table money of a number of passengers; with Steam Agents receiving only Rs 20 a month; and without wharves or godowns for landing and storing goods, can neither prove profitable as a speculation, nor can they assist much in increasing production, because dealers will not employ carriers who are irregular in their arrivals and departures, nor will they keep goods for a down-steamer which may be full.

That we may not be accused of supposing cases which may never occur we may mention;—that we have known a Captain of a Government Steamer refuse to take on board the sample boxes of a batch of Indigo, weighing a few pounds, and which it was of the utmost consequence should reach Calcutta as soon as possible, *because his vessel was overloaded:*—that we have known a Captain of a Government Steamer accept freight for the down trip, in consequence of which the goods were kept waiting for him for nearly a month, and when he arrived his

For all these reasons we are glad to learn, that there is some hope of a private Company being formed, for the navigation of these rivers.

The following letter has been kindly placed at our disposal.

"I shall now lay before you the result of my enquiries regarding the cost of 3 River steamers suitable for keeping up a monthly communication between Calcutta and Assam.

The cost of three Steamers with Flats may be estimated in round numbers at Rs.4,00,000

This estimate is based on the cost of the last three new Boats and Flats belonging to the India General Steam Navigation Co.

The Steamers will be [illegible] feet long and [illegible] feet wide. Engines 80 Horse power, with Tubular Boilers capable of working up to 100 Horse power.

The Flats [illegible] feet long and 27 feet wide capable of carrying 400 Tons of General Cargo.

The monthly expense of the steamer

Captain & Mate	Rs. 300		
Engineer	,, 250		
Crew	,, 470	1,020	
Ditto of Flat			
Captain & Mate	,, 180		
Crew	,, 200	380	1,400

multiply by 12 equal to 16,800 multiply by 3 equal to total for 3 steamers per annum Rs 50,400

30 Days steaming at 200 mds. Coal per day equal to 6000 mds. per mensem or 72,000 mds. per annum at an average of 10 ans. per md. ,, 45,000

95,400

Repairs & Stores per annum say Rs. 10,000

Agency charges &c. ,, 20,000

দি ঢাকা নিউজের প্রথম পাতা